পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন

যতীন সরকার

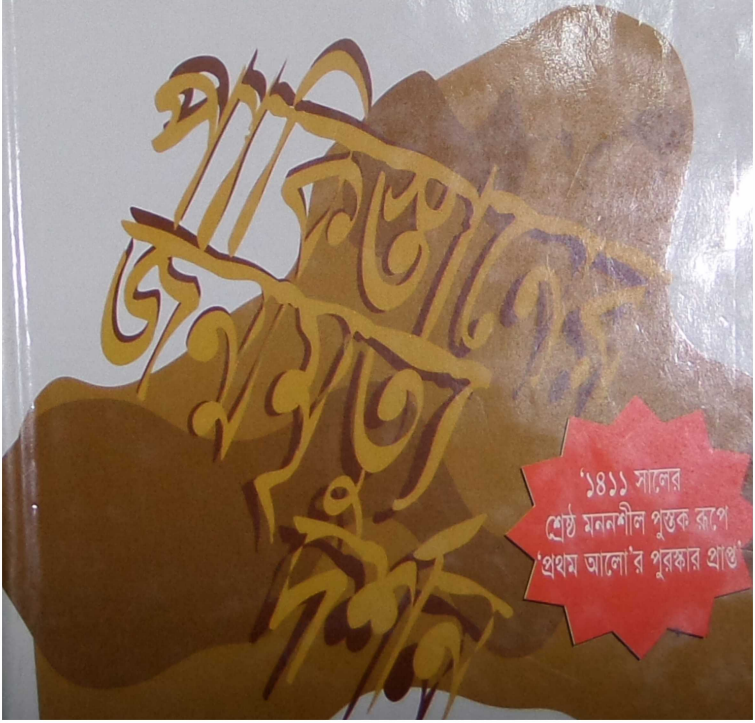

'১৪১১ সালের
শ্রেষ্ঠ মননশীল পুস্তক রূপে
'প্রথম আলো'র পুরস্কার প্রাপ্ত

'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন'কে বলা যেতে পারে লেখকের স্মৃতিকথা। স্মৃতির আধারেই বিধৃত হয়েছে ইতিহাস। এ ইতিহাস কোনো বইয়ে পাওয়া যাবে না। মানুষের মনোলোকের ইতিহাস উঠে এসেছে এখানে।

এ বইয়ের 'দর্শন' শব্দটি 'দেখা' ও 'ফিলসফি'-দুটো অর্থই ধারণ করেছে। পাকিস্তানের জন্ম ও মৃত্যুকে লেখক যেভাবে দেখেছেন তার বর্ণনা যেমন আছে এ বইয়ে, তেমনই আছে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম ও মৃত্যুর পেছনে সক্রিয় ছিল যে দর্শন তারও অনুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ। পাকিস্তানের জন্মের দর্শনটি ছিল একান্তই অপদর্শন। অপদর্শন ছিল বলেই পাকিস্তানের মৃত্যু ছিল অপরিহার্য। বাংলাদেশের জন্মের যে দর্শন, সেই দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল পাকিস্তানের মৃত্যুর দর্শন। পাকিস্তানের এই জন্মমৃত্যুর দর্শন সম্পর্কে এ-রকম মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। লেখকের জীবন কেটেছে গ্রামে ও মফস্বল শহরে। আমাদের ইতিহাস বইগুলোতে গ্রামের চিন্তা-চেতনার পরিচয় কিংবা মফস্বল শহরের মানুষের অবদান সম্পর্কে কিছুই লেখা হয় না। 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' এক্ষেত্রেও একটি ব্যতিক্রমী পুস্তক। সাধারণ পাঠক যেমন, তেমনই ইতিহাস লেখকগণও এ বইয়ে অনেক ভাবনার খোরাক পাবেন।

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন

যতীন সরকার

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন

যতীন সরকার

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রচ্ছদ : সুখেন দাস। বর্ণবিন্যাস : রুক্কু শাহ্ কম্পিউটার, ঢাকা ১১০০। মুদ্রণে : মৌমিতা প্রিন্টার্স, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৫, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৮, তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১।

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র।

PAKISTANER JANMOMRITTU DARSHON. By Jatin Sarker. Published by : Kamolkanti Das. Jatiya Sahitya Prakash, 67 Ryaridas Road, Dhaka-1100. Copyright : Author. Cover Design : Sukhen Das. Printer : Mowmita Printers. Dhaka-1100. Date of Publication : First Edition : February 2007, Second Edition : January 2008, Third Edition : April 2011.

Price : Tk. 400.00, US $ 10.00

ISBN : 984-70000-0009-5

উৎসর্গ

ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া
মতীন্দ্র ও নেলী
ভগিনী ও ভগিনীপতি
মায়া ও উপেন্দ্র

পাকিস্তানের জন্মদর্শন না করলেও
পাকিস্তানের মৃত্যুদর্শনের স্মৃতি যাদের
চৈতন্য থেকে কোনোদিনই মুছে যাবে
না।

১৯৯৪-এর আগস্ট থেকে ১৯৯৬ -এর ডিসেম্বর—দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ'-এ 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল। আবুবকর চৌধুরী এটি প্রকাশে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। সে সময়েই এটি অনেক পাঠকের অভিনন্দন লাভ করে।

আমার মূল পাণ্ডুলিপিটি কী করে জানি খোয়া গিয়েছিল। এরপর আমার একান্ত সুহৃদ ও 'নিরন্তর'-সম্পাদক নাঈম হাসান 'খবরের কাগজ'-এর পাতা থেকে লেখাগুলো পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ১৯৯৫-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত লেখাগুলো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। সে সময়েই আকস্মিকভাবে আমার সঙ্গে দেখা হয় 'খেলাঘর'-এর অমল কুমার নাগের। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সেই লেখাগুলো আমার হাতে তুলে দেন। নাঈম হাসান ও অমল কুমার নাগের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' কোনোমতেই গ্রন্থরূপ পেতে পারত না। এঁদের কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম।

বইটির রচনায় ও প্রকাশে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের নাম বলে শেষ করা যাবে না। তবু অধ্যাপক নূরুল হক, গোলাম ফারুক খান, ডাক্তার বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, ডাক্তার প্রদীপ কর, প্রবীর সরদার, অধ্যাপক খগেশ কিরণ তালুকদার, এমদাদুল হক মিল্লাত, আবদুল মোতালেব লাল ও আবিদ হোসেন—অন্তত এই কয়েকটি নাম উল্লেখ না করলেই নয়। উল্লেখ করতে হয় ছোট্টমণি কাঙ্ক্ষিত সিংহ এবং আমার কন্যা সুদীপ্তার কথাও। এরা সবাই আমার স্নেহভাজন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার বদলে স্নেহ দিয়েই তাদের অভিষিক্ত করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রকাশক কমলকান্তি দাসের প্রতি।

প্রুফ দেখায় আমি নিতান্তই আনাড়ি। তাই বইয়ের মুদ্রণ প্রমাদের দায় কেবল ছাপাখানার উপর চাপিয়ে দিয়ে আমি রেহাই পেতে পারি না। বানানরীতিতে যে ঐক্যরক্ষা করা যায়নি—এই অমার্জনীয় অপরাধও আমারই। সহৃদয় পাঠকের কাছে করজোড়ে মার্জনা ভিক্ষা ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না।

যতীন সরকার

সূচিপত্র

দর্শন, দার্শনিক ও ভূত : ১১, এক ইঁচড়ে পাকা দার্শনিক : ১৪, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে 'ভদ্র হিন্দু'র মানস সংকট : ১৯, ব্রাত্যজনের পাকিস্তান ও কবি ইউনুস আলী : ২৪, বাংলার লোকজীবনে পাকিস্তানের দুষ্ট হাওয়া : ২৭, গান্ধী হত্যার অভিনব প্রতিক্রিয়া : ৩০, পাকিস্তানের জন্মের আগে : হিন্দুদের কংগ্রেস-ভাবনা : ৩৪, ছেচল্লিশের নির্বাচনে কংগ্রেসী বক্তৃতাবাজী : ৩৮, পঁয়তাল্লিশ সনে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সম্মেলন : ৪২, ছেচল্লিশের নির্বাচন ও কম্যুনিষ্ট পার্টি : ৪৭, চল্লিশের দশকের 'মুসলমান কম্যুনিষ্ট' : ৫০, 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'দের কথা : ৫৫, নাসির সরকার : একজন অখ্যাত অসাধারণ মানুষ : ৫৯, নাসির সরকারের রাজনীতি ও আত্মসমালোচনা : ৬৪, ধুতি-লুঙ্গি দ্বন্দ্বসমাস ও দ্বিজাতিতত্ত্ব : ৬৯, ঢাক-ঢোলের বাদ্য, গোহত্যা ও দ্বিজাতিতত্ত্ব : ৭৪, মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও পাকিস্তানের জবাবা : ৭৮, বালক মনেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সংক্রমণ : ৮২, 'কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা' : ৮৬, হিন্দুর জাতপাত ও হিন্দু মহাসভার 'প্রগতিশীল' ভূমিকা : ৯২, হিন্দু সমাজের ছ্যুৎমার্গ ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের 'অকূল অতল কালাপানি' : ৯৬, পাকিস্তানের জন্মব্যাখ্যার তিন তত্ত্ব : ১০০, পাকিস্তানের জন্মদাতাই পাকিস্তানের মৃত্যুবীজ রোপণ করলেন : ১০৪, পাকিস্তানের জনকের মৃত্যু ও তারপর : ১০৮, হিন্দুদের দেশত্যাগ ও মানসিক যন্ত্রণা : ১১১, পঞ্চাশ সালের দাঙ্গা : ১১৫, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' ও বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্য : ১১৮, পঞ্চাশের দাঙ্গার পরে : ১২২, 'মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে?' : ১২৬, 'বৃথায় তিলক ফোঁটা, পাঁচ ওয়াক্ত মাথা কোটা' : ১৩১, সামন্ততন্ত্রের অচলায়তন ও তার পাচিলের ফাঁক ফোকড় : ১৩৫, পাকিস্তানের আসমানে তুই হেলাল যদি সে হবি : ১৩৮, আপনি, তুমি, তুই ও ভাববাচ্য : ১৪৩, গ্রামবাংলায় শূদ্র প্রজার জীবনমান ও মান-অপমান : ১৪৬, 'নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ' : ১৪৯, অনক্ষর কৃষকের ভাবলোক : ১৫৩, হিন্দুর জাত যেনো কচুপাতার পানি : ১৫৭, জাতে মুসলমান থেকে মুসলমান জাতি : ১৬১, 'আকবর বাদশার সঙ্গে সলিমুদ্দিন চাষীর কোনো ভেদ নেই' : ১৬৫, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে পাপের ছিদ্র ও শনির প্রবেশ : ১৬৯, ইতিহাসের ভ্রান্তিবিলাস, নব্যহিন্দুত্ব ও দ্বিজাতিতত্ত্ব : ১৭৪, পাকিস্তানের শত্রুরাই পাকিস্তানের জন্মবীজ রোপণকারী! : ১৭৮, বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ও গ্রামবাংলার মানুষ : ১৮৩, বায়ান্ন-পরবর্তী রাজনীতিতে নতুন হাওয়া : ১৮৮, তেপ্পান্ন সালের গণমানুষের ভাবনা : ১৯২, ভোট দেবেন কিসে? নৌকা মার্কা বাক্সে : ১৯৬, সাদা আর সবুজ নিশান, বংশদণ্ড ও পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস : ২০০, ছুয়ান্নর নির্বাচন ও হিন্দু সমাজ : ২০৪, রাজনীতিকদের দেউলিয়াপনা ও বাঙালির স্বার্থহানি : ২০৯, পাকিস্তান ইসলামী জমহুরিয়াত ও সদরে রিয়াসত : ২১৩, দুর্ভিক্ষের দুঃসহ যাতনা ও জঙ্গী দৌরাত্ম্য : ২১৭, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতি : ২২১, কাছে থেকে দেখা নীলকণ্ঠ কম্যুনিস্টগণ : ২২৫, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী দর্শন ও চেতনার রূপান্তর : ২৩০, সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাববাদী বিভ্রম ও হতাশা : ২৩৪, জঙ্গী শাসকদের জংলী আইন : ২৩৮, গ্রাম বাংলায় শিক্ষার হাল হকিকত : ২৪২, 'অগত্যা', গোলাম মোস্তফা ও রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর স্মৃতি : ২৪৩, আইউব-বিরোধী আন্দোলনের বীজতলা তৈরি : ২৫১, ছাত্র আন্দোলন বনাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : ২৫৫, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নানা জনের নানা রূপ : ২৬০, জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে সাম্যবাদীদের নেপথ্য বিধান :

২৬৩, ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়াল ভাঙা : ২৬৭, দেয়াল ভাঙার সূচনা: পাকিস্তানের আগে : ২৭১, বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি বনাম পাকিস্তানি তমদ্দুন : ২৭৭, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দ্বান্দ্বিক চরিত্র : ২৮১, পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও : ২৮৪, পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধ: সাম্প্রদায়িকতার অন্যরূপ : ২৮৭, পঁয়ষট্টির যুদ্ধের বিপরীত ফল: বাংলার স্বাধীনতার রক্তবীজ : ২৯২, ছয় দফার শক্তি ও বাঙালিত্বের জাগরণ : ২৯৭, ষাটের দশকে ভাবাদর্শের সংগ্রাম : ৩০১, ভাবাদর্শের সংগ্রামের ব্যাপক বিস্তৃতি : ৩০৬, মুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনানী রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল : ৩১১, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সংগ্রামে কতিপয় অখ্যাত সৈনিক : ৩১৬, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথা : ৩২০, উনসত্তরে জনতার আত্মশক্তির উন্মেষ : ৩২৪, নানান কিসিমের ডান-বামের প্রাদুর্ভাব : ৩২৮, উদ্‌ভ্রান্ত বামপন্থা ও মওলানা ভাসানীর দুর্বোধ্য চরিত্র : ৩৩৩, ভোটের রাজনীতি ও জনগণের প্রজ্ঞা : 'ভোটের আগে ভাত চাই' কিংবা : ৩৩৭, সত্তরের নির্বাচনে পর্যুদস্ত সাম্প্রদায়িকতা : ৩৪১, সত্তরের নির্বাচনের তাৎপর্য : ৩৪৪, 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো?' : ৩৪৭, 'পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি' : ৩৫১, ইতিহাসের একটি অমোচনীয় কলঙ্কচিহ্ন : ৩৫৫, সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের শুরুতে : ৩৫৯, প্রত্যাশার ফুল ও সংশয়ের কাঁটা : ৩৬৪, মুক্তিযুদ্ধ ও কৃষকের মনোলোক : ৩৬৮, গাঁও গেরামে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি : ৩৭২, মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব : ৩৭৬, সমাজমানসের বহুমুখী দ্বন্দ্ব ও মুক্তিযুদ্ধ : ৩৭৯, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ও একাত্তরের বাংলাদেশ : ৩৮৩, ক্ষয়িষ্ণুতার অন্ধকারে প্রগতির আলোকরেখা : ৩৮৮, অনিশ্চিত ও শঙ্কিত পদযাত্রা : ৩৯২, 'মাটির দেহ খাঁটি কর খুলে তোমার দ্বীল-কোরান' : ৩৯৬, কৃষক-সমাজের ভেতর মহলে : ৪০০, অনক্ষর মেহনতি মানুষ ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব : ৪০৪, 'ক্ষিদা লাগলে দারুণ পেট বাঘের চিৎকার মারে' : ৪০৮, স্বজাতি-বিরোধী কুকুর ও পাকিস্তানের দালাল : ৪১১, মুক্তাঞ্চলের মুক্ত মানুষ ও গণ-আত্মশাসন : ৪১৫, নিরাপত্তার সন্ধানে দেশত্যাগ : ৪১৯, টঙ্ক আন্দোলন-খ্যাত হাজংদের সঙ্গে : ৪২২, প্রাণের ভয়ে ধর্মান্তর গ্রহণের ছেলেখেলা : ৪২৬, বাঘমারা শিবিরে শরণার্থী জীবন : ৪৩০, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতমানস : ৪৩৩, মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবদান : ৪৩৮, মুক্তিযুদ্ধে সংকট ও সম্ভাবনার জোয়ারভাটা : ৪৪২, 'সুতীক্ষ্ণ কৃপাণের প্রতি অজস্র সালাম' : ৪৪৬, 'নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত': ৪৫১।

দর্শন, দার্শনিক ও ভূত

দর্শন ও দার্শনিক বলতেই একান্ত গুরুগম্ভীর বিষয়ের ও মানুষের কথা আমাদের মনে পড়ে। তবে *'দর্শন'* শব্দের অর্থ যখন *'দেখা'* তখন সেটি অবশ্য খুবই সাধারণ বিষয়। কারণ আমরা সকলেই জন্মের পর থেকেই অনেক কিছু দর্শন করছি বা দেখে আসছি। কিন্তু তাই বলে আমরা দার্শনিক নই নিশ্চয়ই। যারাই দর্শন করে তারাই দার্শনিক—এমন সরল সংজ্ঞা দর্শনশাস্ত্রে নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হবে না। ভাষাশাস্ত্রও তা অনুমোদন করবে না। যে দর্শন করে সে দর্শক—দার্শনিক অবশ্যই নয়।

তবে, আমি একবার আমার গ্রামের একজন অতি সাধারণ অনক্ষর মানুষের মুখে এর বিপরীত কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। দূর থেকে একটি পুকুরের চারপাশে অনেক লোকের ভীড় হতে দেখে আমি ওই মানুষটিকে এই ভীড়ের কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি জানিয়েছিলেন যে, পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এতো লোক ওই ছোট্ট পুকুরে মাছ ধরছে'! উনি হেসে বলেছিলেন, 'না। যারা মাছ ধরছে, তাদের চেয়ে দার্শনিকের সংখ্যা অনেক বেশি।'

দার্শনিক! যারা মাছ ধরা দেখছে তারা সবাই দার্শনিক! তা হলে তো আমরা সবাই, সব সময়ই দার্শনিক। দর্শন তো আমাদের সর্বক্ষণের কাজ।

এই অনক্ষর মানুষটির কথা আমার খুব মনে ধরে গিয়েছিল। আমি তাঁর কথাটি আজও ভুলতে পারিনি।

পণ্ডিতরা কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য যেভাবে নির্দেশ করেন তাতে জটিল পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় অবশ্যই, কিন্তু অপণ্ডিত সাধারণ মানুষের শব্দার্থ নির্ণয়ে যে সরল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় মেলে তেমনটি পণ্ডিতদের কাছে আশা করা যায় না। এ কারণেই 'লোক ব্যুৎপত্তি'কে গুরুত্ব না দিয়ে পারেন না জাঁদরেল ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতরাও।

আমিও আমার গ্রামের ওই সরল লোকটির দেয়া 'দার্শনিক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিকে অবজ্ঞা করতে পারি না। সাধারণ অর্থে দর্শন বলতে যা বোঝায়, এই শব্দটির বিশেষ অর্থও তা থেকেই উপজাত। ইংরেজি 'ফিলসফি' শব্দটি জ্ঞান-অন্বেষা-বোধক একটি গ্রীক শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে—সে কথা আমরা জানি। আবার, বাস্তবকে দর্শন না করে (অর্থাৎ না দেখে) যে কোনো প্রকার জ্ঞান-অন্বেষাই সম্ভব নয়—তাও তো আমাদের জানা। এদিক দিয়ে তাই সংস্কৃত 'দর্শন' শব্দটি বরং ইংরেজি ফিলসফির চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। 'দর্শন' বলতে আমি, সে কারণে, একই সঙ্গে সাধারণ 'দেখাকেও' বুঝি, ফিলসফিকেও বুঝি। দার্শনিক বলতেও আমার কাছে 'ফিলসফার' যেমন মান্য, তেমনি 'দর্শক' শব্দটির প্রতিশব্দ রূপেও 'দার্শনিক' শব্দটির ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করতে পারি না।

এই অর্থে আমিও একজন দার্শনিক। সারা জীবন ভরে অনেক কিছুই দেখেছি এবং দেখছি। সব দেখা নিয়ে কথা বলা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। অনেক সময় কোনো কথা না বলে কেবল দেখে যাওয়া ও শুনে যাওয়াই বরং বুদ্ধিমানের কাজ। কোনো কিছু নিয়ে কারো ওপর অভিমান হলে আমার ঠাকুরমা বলতেন, 'কানেরে কই হুন (শোন), চক্ষেরে কই দেখ।' বাচালতা যদিও আমার স্বভাবধর্ম, তবু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমিও আমার ঠাকুরমার মতোই কানে শোনা ও চোখের দেখাকে কান ও চোখের এলাকাতেই প্রায়শ বন্দি করে রাখি, মুখের এলাকায় প্রবেশ করে গেলেও ওদেরকে ঠোঁটের সীমানা পার হতে দিই না। ঠোঁট-মুখের

বেয়াড়াপনাকে কখনো কখনো প্রশ্রয় দিলেও কাগজ কলমের ব্যবহারে সব সময়ই সংযত থাকতে চেষ্টা করি। 'শতং বদেৎ একং মা লিখ'-মুখে একশো কথা বলবে, কিন্তু কলমে এক কথাও লিখবে না—আমাদের সাবধানী নীতিবেত্তারা এ রকমই উপদেশ দিয়ে গেছেন। সব সময় যে তাঁদের উপদেশ মেনে চলতে পারি, তা নয়। মানলে তো আর কিছুই লেখা হতো না। দেখাকে লেখায় রূপ দেয়ার জন্য হাত নিশপিশ করে বলেই না লিখে থাকতে পারি না।

যাকে বলে অজ পাড়া গাঁ, বাংলাদেশের তেমন একটি গাঁয়ে আমার জন্ম। এরকম সকল গাঁয়েরই সকল ছেলে বুড়ো পাকিস্তানের জন্মের সময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল—কেউ উল্লাসে, কেউ ভয়ে, কেউ অহ্লাদে, কেউ বিস্ময়ে, কেউ আশায়, কেউ আক্রোশে। তবে সকলের মধ্যেই ছিল টানটান উত্তেজনা। এই সব কিছুই আমি গাঁয়ের মানুষের একেবারে ভেতর মহল থেকে দেখেছি এবং স্মৃতির কৌটায় এতোকাল ধরে রেখেছি।

যে বছরে পাকিস্তানের জন্ম, সে বছরে আমার বয়স এগারো। তাই, বলতে পারি : একান্ত বালক বয়সে পাকিস্তানের জন্ম আমি দর্শন করেছি, আমি পাকিস্তানের জন্মের দার্শনিক। শুধু জন্ম নয়, বয়:প্রাপ্ত হয়ে তার মৃত্যুও দেখেছি; তাই, আমি পাকিস্তানের মৃত্যুরও দার্শনিক। সুতরাং 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' লেখার অনধিকারী আমি নই। আবার, এককালের পাকিস্তানের প্রবক্তা এবং এ-কালেরও বাংলাদেশী পাকিস্তানপন্থীরা যে পাকিস্তানের দর্শন বা ফিলসফির কথা বলে, সেই দর্শনটিকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছি। পাকিস্তানের জন্মের দর্শনটি ছিল একান্তই অপদর্শন। অপদর্শন ছিল বলেই পাকিস্তানের মৃত্যু ছিল অপরিহার্য। বাংলাদেশের জন্মের যে-দর্শন, সেই দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল পাকিস্তানের মৃত্যুর দর্শন। পাকিস্তানের এই জন্মমৃত্যুর দর্শন সম্পর্কে লেখার জন্যই আমি কলম ধরেছি।

অর্থাৎ আমার লেখার লক্ষ হচ্ছে সেই দর্শন, যার অর্থ দেখা এবং ফিলসফি দুই-ই।

কেউ কেউ অবশ্যি এই বলে তর্ক তুলতে পারেন যে, পাকিস্তানের তো মৃত্যু হয়নি, সে তো এখনো বহাল তবিয়তে বিদ্যমান, পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান-উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে তার প্রতাপান্বিত অবস্থান।

তাঁদের কথা মেনে নিয়েও বলতে পারি : অন্য যেখানেই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে পাকিস্তান যে জীবিত নেই সে কথা সুনিশ্চিত। পাকিস্তান তো এমন কোনো স্বাভাবিক সত্তা ছিল না যে, তার সবকিছু ঘটনা স্বাভাবিক নিয়ম মতো ঘটবে। এমন একটা অপ্রাকৃতিক ও পৌরাণিক রাক্ষসের কথা যদি কল্পনা করা যায় যার শরীরটার ছিল পূর্বে-পশ্চিমে প্রলম্বিত দুটো আলাদা অংশ, দু'অংশের আবার অবস্থান ছিল এক হাজার মাইলের ব্যবধানে এবং তাদের সংযোগ রক্ষার কোনো প্রাকৃতিক সূত্র ছিল না, ধর্মান্ধতা-দিয়ে-তৈরি দ্বিজাতিতত্ত্ব নামক একটা অপ্রাকৃত মাদক অলৌকিকভাবে এই দুই বিচ্ছিন্ন অংশকে এক করে রেখেছিল—তবে সেটিরই নাম পাকিস্তান। এমন অদ্ভুত ও অসম্ভব পাকিস্তানের এক অংশ মরে গিয়ে আরেক অংশের বেঁচে থাকা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হবে কেন?

পাকিস্তানের এরকম মৃত্যুই এখানে আমরা নিজ চোখে দেখেছি। শুধু দেখিনি, আমরাই তার মৃত্যু ঘটিয়েছি।

তবে মরার পরও যে পাকিস্তান এখানে আছে—সে কথাও অস্বীকার করতে পারি না। আছে ভূত হয়ে। ছেলেবেলায় ভূতের ভয় পেতাম খুব। জানতাম : মানুষ, বিশেষ করে খারাপ মানুষ, মরে গিয়ে ভূত হয়। যারা আত্মহত্যা করে তারাও ভূত হয়ে মানুষের ওপর সময়ে-

অসময়ে চড়াও হয়ে। আমাদের গাঁয়ের মংলা নমদাস ছিল পিত্তশূলের রোগী। শূল ব্যথার জ্বালা সইতে না পেরে একদিন সে গলায় দড়ি দিয়ে বাড়ির সামনে আম গাছের ডালে ঝুলে পড়ে। জীবিত থাকতে নিতান্ত গরিব ও গোবেচারা মংলাকে কেউ ভয় পেতো, এমন কথা শুনিনি। কিন্তু মরার পর তার কী সে প্রতাপ! বর্তমানকে মানুষ নাও মানতে পারে, কিন্তু ভূতকে না মেনে উপায় নেই। মংলাও ভূত হয়ে গাঁয়ের সব মানুষের মান্যতা আদায় করে নিয়েছিল।

মংলার মতো এ রকম কতো ভূত যে আমাদের গাঁয়ে আদাড়ে বাদাড়ে ছড়িয়ে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। এসব ভূত অনেক সময় দিনে দুপুরেও গাঁয়ের বৌ-ঝিদের ওপর ভর করতো। আর রাতের বেলায় (বিশেষ করে সে রাত যদি শনি-মঙ্গলবার ও অমাবস্যার হয়) কোনো সুন্দরী তরুণী যদি শ্মশান ঘাটের পাশ দিয়ে অথবা শেঁওড়া কিংবা গাবগাছের তলা দিয়ে এলোচুলে হেঁটে যেতো, তবে তো আর তার রক্ষাই থাকতো না। কোনো না কোনো মামদো ভূত, ব্রহ্মদত্যি বা শাকচুন্নি তাকে আছর করতোই। সেই আছরে লজ্জাবতী তরুণীটির লজ্জা-টজ্জা সব ঘুচে যেতো, প্রচণ্ড শক্তিশালিনী হয়ে উঠতো সে। গাঁয়ের প্রতাপশালী মোড়ল মাতব্বরও তার ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়তো। মানুষ ভূতকে তো ভয় পায়ই, ভূতগ্রস্তকে আরো বেশি ভয় পায়।

ঝোঁপ-ঝাড়ে ভরা অন্ধকার গ্রাম ছেড়ে দালান-কোঠা-সমাকীর্ণ বিদ্যুতালোকিত শহরে আসার পর ভূতের ভয়কে জয় করে ফেলেছি বলেই আমার ধারণা ছিল। ভূতের কোনো অস্তিত্বই নেই—গলার জোরে এমন কথা বলে ভূত-বিশ্বাসীর সঙ্গে এঁড়ে তর্কও করেছি অনেক। এখন কিন্তু তর্ক করতে আমার সাহস হয় না। ছেলে বয়সে গাঁয়ে থাকতে ভূতকে যতো ভয় পেয়েছি, এখন বুড়ো বয়সে শহরবাসী আমি তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পাই। তবে সে-ভূত মানুষের নয়, রাষ্ট্রের। মানুষ মরে ভূত হয়—এমন ধারণাকে আমি কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারি—কিন্তু কোনো রাষ্ট্র মরে ভূত হতে পারে না—এমন কথা যতো বড়ো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীই বলুন না কেন, আমি তা কিছুতেই বিশ্বাস করবো না। কারণ আমি তো পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রকে আমার চোখের সামনে মরে যেতে দেখেছি এবং মরার পর সেটিকে ভূত হয়ে নবজাত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘাড়ের ওপর চেপে বসতেও দেখেছি। আর এতোকাল যে শুনে এসেছি ভূতের পা থাকে পিছন দিকে, তাও এখন নিজের চোখেই দেখলাম। একেবারে যাকে বলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হওয়া। নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন বা জ্বলজ্যান্ত দেখাকে অস্বীকার করবো? অসম্ভব।

তাই শুধু পাকিস্তানের জন্ম ও মৃত্যু দর্শন নয়, পাকিস্তানের ভূত দর্শনের কথাও আমাকে বলতে হবে। আর সেই ভূত ও ভূতগ্রস্তরা যে দর্শন বা ফিলসফি আওড়ায়, ভূতের পায়ের মতোই যে-দর্শনের লক্ষ কেবলই পিছন দিকে ফিরে যাওয়া, তার কথাও না-বললে চলবে না। পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন তার ভূত দর্শন ছাড়া একেবারেই অসম্পূর্ণ।

ভূত হয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানের পুনরাগমন তো আমার বুড়ো বয়সের ঘটনা। কাজেই এদেশে পাকিস্তানের ভূত ও ভূতগ্রস্তদের দর্শন করা ও তাদের 'দর্শন'কে বোঝার চেষ্টা করা—এই দুটো কর্ম একই সঙ্গে করেছি। পাকিস্তানের মৃত্যুর ব্যাপারেও তাই। কিন্তু তার জন্মের ব্যাপারটি আমার নিতান্ত বালক বয়সে ঘটেছে বলে, স্বীকার করতেই হবে, সেই জন্মের ঘটনাটি যখন দর্শন করেছি ঠিক তখনই তার 'দর্শন' বা অপদর্শনকে তেমনভাবে বুঝে উঠতে নিশ্চয়ই পারিনি। বলাবাহুল্য আমার নিজস্ব জীবন দর্শনটিও সে-সময়েই রূপলাভ করেনি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলায় দেখা পাকিস্তানের জন্মের ঘটনাবলির 'দার্শনিক' তাৎপর্য যে-রকম উপলব্ধি করেছি, আমার বর্তমান বয়ানে যে তারও ছায়াপাত ঘটবে—সেকথা আগে ভাগেই কবুল করে নিচ্ছি।

এক ইঁচড়ে পাকা দার্শনিক

পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু দর্শনের কথা বলতে গিয়ে আমার নিজের কথা, আমার বাপ-ঠাকুরদার কথা, আমার পরিবার-পরিজন-বন্ধু-বান্ধবের কথা এবং যে যে স্থান থেকে পাকিস্তানের জন্মগ্রহণ, মৃত্যুবরণ ও তাঁর ভূত হওয়াকে দেখেছি, সে-সবের কথা আমাকে বলতেই হবে। কারণ এটি তো কোনো নৈর্ব্যক্তিক দর্শন নয়, এর দার্শনিক ব্যক্তিটি আমি নিজে। সেই 'আমি'টিকে আড়াল করে রাখার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আবার, সেই অকৃতি অভাজন একান্ত অকিঞ্চিৎকর 'আমি'টির অকারণ আত্মবিজ্ঞাপন প্রচারই যাতে মুখ্য না হয়ে ওঠে, সে-বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে বৈকি! কারণ এই 'আমি' তো নিষ্ক্রিয় দার্শনিক মাত্র, সক্রিয় নির্মাতা নই কোনো মতেই।

বলেছি, পাকিস্তানের জন্মসময়ে আমি এক এগারো বছর বয়সী গ্রাম্য বালক মাত্র। বিজ্ঞজনরা প্রশ্ন করতে পারেন : এমন একটি পুঁচকে ছোঁড়া চোখের সামনে একটি মানুষের জন্ম হতে দেখলেও তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝবে কি? বিশেষ করে যে ছোঁড়াটি আসলে ছিল একটি গেঁয়ো ভূত? তাই 'ফিলসফি' অর্থে তো দূরের কথা, সাধারণ 'দেখা' অর্থেও একটি রাষ্ট্রের জন্মের দার্শনিক হওয়ার স্পর্ধা সে পায় কোথায়?

খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। তবে তখনকার গেঁয়ো ভূত পুঁচকে ছোঁড়াটির সমর্থনে কিছু বক্তব্য আছে এখনকার এই জেলা শহরবাসী বুড়ো হাবড়া কথকটির। আশা করি, বিজ্ঞজন একান্ত বিজ্ঞতা ও সহমর্মিতার সঙ্গে ওর বক্তব্যের সারবত্তা বিচার করে দেখবেন।

প্রথমেই বলে রাখি, ছেলেবেলাতেই আমি ছিলাম ইঁচড়ে পাকা। এ-রকম হওয়ার পুরো দায়িত্বটা কিন্তু আমার একলার নয়। আমার অভিভাবকবৃন্দই আমাকে ইঁচড়ে পাকা হতে সাহায্য করেছেন, তাঁরাই আমার সমবয়সীদের চেয়ে অন্যরকম ভাবনা ভাবতে আমাকে শিখিয়েছেন, আমার মুখে অনেক পাকা পাকা কথা যুগিয়ে দিয়েছেন। আমার সমবয়সীদের বাপ-চাচারা তাঁদের ছেলে-ভাইপোদের হাতে ইস্কুলের পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোনো 'অপাঠ্য' বই দেখলে তা শুধু কেড়েই নিতেন না, তাদের পিঠে দু'চার ঘা বসিয়েও দিতেন। অথচ, আমার প্রতি আমার বাপ-ঠাকুরদার ব্যবহার ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলা অক্ষরগুলোর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর পরই তাঁরা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন অজস্র 'অপাঠ্য' পুস্তক। এমন কি সে বয়সের জন্য নিষিদ্ধ সব পুস্তকও। এ সবকে বলা হতো 'আউট বই'। ছাত্র জীবনে 'আউট বই' পড়লে চরিত্র নষ্ট হয়—এমন কথা গ্রামাঞ্চলের অনেক শিক্ষিত অভিভাবকের মুখেও শুনেছি। কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। আমার তো জীবনের প্রায় শুরু থেকেই চরিত্র নষ্ট হওয়ার সূচনা ঘটে। শুড বয়ের সুনাম আমি একদিনের জন্যও অর্জন করতে পারিনি। নানা অপাঠ্য ও নিষিদ্ধ পুস্তক আমাকে এমনই নেশা ধরিয়ে দেয় যে, পাঠ্যপুস্তক দেখলেই আমার বমি আসতো। বিশেষ করে অঙ্ক বইটা তো ছিল আমার দু'চোখের বিষ। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কি করে যে অঙ্কে তেত্রিশ নম্বর পেয়েছিলাম, তার রহস্য আজো আমি উদঘাটন করতে পারিনি। তখন ত্রিশ ছিল অঙ্কের পাস মার্ক। পাস মার্কের চেয়ে যে তিন নম্বর বেশি পেয়েছি, এটাই ছিল আমার গর্ব।

তার মানে অঙ্ক ছাড়া আর সব সাবজেক্টে আমি খুব আহামরি নম্বর পেয়েছি, তা-ও কিন্তু নয়। ম্যালেরিয়া রোগীর কুইনিন গেলার মতো করে পরীক্ষার পড়া গলাধঃকরণ করেছি। এভাবেই, পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই, কেবল কোনো রকমে টেনে টুনে পার পেয়ে গিয়েছি মাত্র। ছাত্র হিসেবে আমি এক্কেবারে রদ্দি মার্কা না হলেও 'মিডিওকার'-এর সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারিনি। ভালো ছাত্র হওয়ার মতো মেধা ও প্রতিভা যেমন আমার ছিল না, তেমনি ছিল না পরিশ্রম ও সাধনাও।

তবুও, একান্ত মেধাহীন হয়েও মুখ থেকে মায়ের দুধের গন্ধ শুকোবার আগেই যে আমি চারপাশের সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়ন-আন্দোলন ও ঘটনা-দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম, তার মূলে ছিল আমার বাবা ও ঠাকুরদার অতি আগ্রহ। তাঁরা যেসব আড্ডায় ও বৈঠকে সমাজ ও রাজনীতির অনেক বড়ো বড়ো বিষয় মন্থন করতেন, চলতি কথায় রাজা-উজির মারতেন, সেসব স্থানে আমার যে শুধু প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করেছিলেন তাই নয়, আমার অংশগ্রহণকেও তারা উৎসাহিত করতেন। আমার ছোট মুখে বুড়ো কথা শুনে আড্ডাধারীদের কেউ কেউ অবশ্যই বিরক্ত হতেন, তবে অধিকাংশ 'এতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ' বের হতে দেখে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে পড়তেন, তাঁদের চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে যেতো। আর এতে আমার বাবা ও ঠাকুরদার ছাতি যে অস্বাভাবিক রকম ফুলে উঠতো, সেখানে উপস্থিত যে-কেউ তা বুঝতে পারতেন। আমাকে দ্রুত ইঁচড়ে পাকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা এঁরাই সবাই মিলে করে ফেলেছিলেন।

ঠাকুরদা রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্নান করে গীতা পাঠ করতে বসতেন। আমাকেও পাশে নিয়ে বসাতেন। গীতা যে মহাভারতের একটি অধ্যায়, সেই মহাভারতের গল্প বড়ো সরস ভঙ্গিতে আমার কাছে বলে যেতেন, শুনতে শুনতে আমার তন্ময়তা এসে যেতো। আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম আঁচ করতে পেরে পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের চিত্তে যে-বিষাদ উপজাত হয়েছিল, সে-বিষাদ দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন সেই উপদেশের নামই যে শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, সে-কথা আমি সাত বছর বয়সেই জেনে গিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, ওই বয়সেই আমাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন আমার ঠাকুরদা। সে-সময়ে এসব কথা খুব একটা বুঝি বা না বুঝি, ঠাকুরদার কথাগুলোর কিছু ছাপ আমার মস্তিষ্ককোষে পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। গীতার 'চর্তুবর্ণ' বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সম্পর্কে ঠাকুরদার র‍্যাডিকেল ব্যাখ্যাও তখনই আমার চিত্তকে স্পর্শ করেছিল। তিনি বলতেন—জন্ম থেকেই কেউ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র হয় না, গুণ ও কর্ম দিয়েই মানুষের বর্ণ বা জাতি নির্ধারিত হয়। প্রচলিত হিন্দু বিধান অনুযায়ী আমরা জাতে কায়স্থ, অর্থাৎ অব্রাহ্মণ। কিন্তু ঠাকুরদা যখনই এই জন্মগত জাতকে অস্বীকার করে নানা শাস্ত্র থেকে চোখা চোখা সংস্কৃত শ্লোক আউড়িয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতেন এবং ওই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অতি সহজেই রণে ভঙ্গ দিতো, তখন আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকতো না। হিন্দু সমাজের নানা জাতপাত ও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বৈষম্য সম্পর্কে সে-সময় থেকেই আমার মনে নানা প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর অবশ্যই পাইনি, কিন্তু তখন থেকেই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমার খুব ভালো লাগে।

ঠাকুরদার মতো বাবাও আমার মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন। ভোরবেলায় যখন ঘুম ভেঙে যেতো, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়েই বাবা আমার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্প

জুড়ে দিতেন। সেসব বিষয়ের মধ্যে ভারতের ইতিহাসের প্রসঙ্গ যেমন থাকতো, তেমনি থাকতো সে-সময়কার যুদ্ধের কথা, টোকিও-বার্লিন-রেঙ্গুন-সিঙ্গাপুরের কথা, হিটলার-চার্চিল-স্তালিন-রুজভেল্টের কথা, তখনকার রাজনীতির কথা, মহাত্মা গান্ধী নেতাজী সুভাষ বসু-পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু-হোমাম্মদ আলী জিন্নাহ্-শেরে বাংলা ফজলুল হক-হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা। আমাদের পাশের গাঁয়ে ছিল পোস্ট অফিস, তার পোস্টমাস্টার ছিলেন আমাদের গাঁয়েরই নগেন্দ্র দত্ত। পোষ্ট অফিস থেকে তিনি হাতে করে নিয়ে আসতেন কতকগুলো পত্র-পত্রিকা। বিশেষ দুটো পত্রিকার নাম আমার মনে আছে—'অর্ধ সাপ্তাহিক আনন্দ বাজার আর 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'। নিজেই তিনি এগুলোর গ্রাহক ছিলেন কিংবা অন্য কারোর পত্রিকাই নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতেন কি-না, আমি জানি না। নেত্রকোনার সেই গ্রামাঞ্চলে পত্রিকার গ্রাহক হতেন খুব কম লোকই। তবে যে-কেউই গ্রাহক হোন না কেন, তঁর পত্রিকাটি পড়ে দেখার অধিকার পেয়ে যেতেন এলাকার যে কোনো পাঠক। গ্রাম্য পোস্টাপিসের পোস্ট মাস্টার বা পোস্টম্যানরাও পত্রিকা নিজের কাছে দুয়েক দিন রেখে গ্রাহকের কাছে পৌছে দিতেন, এতে কোনো গ্রাহকই কিছু মনে করতেন না। নগেন্দ্র দত্তর নিয়ে আসা পত্রিকাগুলোকে ঘিরে তাঁর বাড়ির কাছারি ঘরে রীতিমতো ভীড় জমে যেতে দেখেছি। ভীড়ের মাঝখান থেকেই কেউ একজন একটি পত্রিকা হাতে তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে পড়ে যেতেন, আর অন্য সকলে তা অধীর আগ্রহে কান খাড়া করে শুনতো। ১৯৪৫ সালে আমি যখন প্রাইমারী স্কুলে ক্লাশ থ্রি-এর ছাত্র, তখনই দত্তবাড়ির বৈঠকখানায় পত্রিকা পাঠক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়ে গিয়েছিল। শুধু দত্তবাড়িতেই নয়, পত্রিকা পড়ার জন্য আমি চলে যেতাম আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে কবিরাজ জগদীশচন্দ্র নাগ কাব্যতীর্থ সাহিত্যশাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদ ভিষগাচার্যের কুলনন্দ আয়ুর্বেদ ভবন-এ। কবিরাজ মহাশয় ছিলেন 'দৈনিক যুগান্তর' আর 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকার গ্রাহক। অবশ্যি কলকাতা থেকে দৈনিক পত্রিকা গাঁয়ে গিয়ে পৌছুতে দুই বা তিন দিন লেগে যেতো। তবু গাঁয়ের মানুষ এই বাসি কাগজের খবরকেই টাটকা বলে গ্রহণ করতো। 'আয়ুর্বেদ ভবন'-এ মাসিক 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ'-ও দেখেছি। কম্পাউণ্ডার হেমেন্দ্র নাগ রোগীদের হাতে শুধু কবিরাজী ওষুধের পুরিয়াই তুলে দিতেন না, দেশ-বিদেশের রাজনীতি—বিশেষ করে যুদ্ধের খবর—সম্পর্কে নিরক্ষর রোগীদের অনেক কৌতূহলও তাঁকে মেটাতে হতো। কখনো কখনো হেমেন্দ্র দার নির্দেশেই 'যুগান্তর'-এর পাতা থেকে বিশেষ বিশেষ খবর আমি রোগীদের পড়ে শোনাতাম।

আমার বাবা ছিলেন হোমিও চিকিৎসক। তিনি অবশ্যি সে-সময় কোনো পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন না। কিন্তু কোনো কোনো রোগীকে দেখেছি বাবার ফার্মেসিতে হাতে করে সংবাদপত্র নিয়ে আসতে। যুদ্ধ বা দাঙ্গার কোনো চাঞ্চল্যকর খবর থাকলে সেদিন তা নিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের রীতিমত ঝড় বয়ে যেতো। সে-ঝড় আমার জন্য হতো খুবই উপভোগ্য।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল—পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে পাকিস্তানের জন্ম। মাঝে পঁয়তাল্লিশ সালে নেত্রকোনার নাগরার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সারা ভারত কৃষক সম্মেলন'। সে-বছরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি। ছেচল্লিশে সাধারণ নির্বাচন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। আমার জন্মের পর সাত থেকে এগারো বছরের মধ্যে সংঘটিত এসব ঐতিহাসিক ঘটনা ও দুর্ঘটনা।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের আমি নিজেই ভুক্তভোগী। সাত বছর বয়সেই সেই দুঃস্বস্মৃতি এখনো আমাকে তাড়া করে ফেরে। ভাত-কাপড়ের ভয়াবহ অভাব তো ছিলই, কাপড় কাচার জন্য

সামান্য সাবান-সোডা আর রাতে বাতি জ্বালানোর দু'ফোটা তেলও মিলতো না। কলার খোসা পুড়িয়ে তার ছাই থেকে পাওয়া যেতো যে ক্ষার, তাই দিয়েই গাঁয়ের মানুষ পরনের কাপড় পরিষ্কার করার চেষ্টা করতো। বদ্যিরাজ গাছের বীজ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তেল বার করে তা দিয়ে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালতো। সন্ধ্যার পর পরই সারা গ্রাম জুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। গাঁয়ের পনেরো আনা লোকই ছিল হতদরিদ্র, সারা জীবন ধরেই তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কোনো রকমে ছতর ঢাকা ছাড়া কাপড়ের অতিরিক্ত ব্যবহার ছিল তাদের স্বপ্নেরও অগোচর। রাতের অর্ধপ্রহরের বেশি প্রদীপের টিমটিমে আলোও তাদের ঘরে জ্বলতো না কোনোদিন। এই ছিল তাদের স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু মন্বন্তর তাদের এই অস্বাভাবিক ধরনের স্বাভাবিকতাকেও একেবারে তছনছ করে দিলো। স্বচ্ছল লোকের বাড়ি থেকে এক আধটু ভাতের ফ্যান জোগাড় করে এনে প্রচুর পরিমাণে কচু-শালুক বা কলমি সিদ্ধ করে তার সঙ্গে মিশিয়ে তাই দিয়েই কোনো রকমে ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে চেষ্টা করতো তারা।

দুর্ভিক্ষ শেষ হলো অঘ্রানে ক্ষেত্রে ফসল ওঠার পর, কিন্তু অখাদ্য, কুখাদ্য-খাওয়া মানুষগুলো আক্রান্ত হলো কলেরায়। দুর্ভিক্ষে যারা কোনো রকমে ধুকে ধুকে বেঁচেছিল, মহামারী তাদের অনেকেরই জীবন কেড়ে নিলো। সারা চল্লিশের দশক জুড়ে গ্রাম বাংলায় ম্যালেরিয়া তো ছিলই, সেই ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তির আশায় কুইনিনের বড়ি গিলতে গিলতে দেখা দিলো অন্য রকম বিপদ-কানে ভোঁ ভোঁ, মাথায় চক্কর, চোখে সর্ষে ফুল। 'কুইনিন সারায় ম্যালেরিয়া, কুইনিনকে সারাবে কে?' বাংলা ভাষায় যুক্ত হলো নতুন একটি প্রবাদ বাক্য। তার ওপর প্রাদুর্ভাব ঘটলো কালাজ্বরের। ভাগ্যিস, তখন বাঙালি বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেছিলেন 'ইউরিয়া স্টিবামিন' 'ব্রহ্মচারী ইনজেকশন' যার লোকপ্রিয় নাম। কালাজ্বর চিকিৎসায় একমাত্র ধন্বন্তরী। আমার বাবা ভীষণ গোঁড়া হোমিওপ্যাথ হলেও কালাজ্বরের রোগীরা তাঁকে ব্রহ্মচারী ইনজেকশনের সিরিঞ্জ হাতে নিতে বাধ্য করলো।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর ক্ষত সেরে উঠতে না উঠতেই এলো ছেচল্লিশের ইলেকশান। ঘোলাজলের ডোবার মতো যে গ্রামজীবন, তারও তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ে রাজনীতির উথাল-পাথাল ঢেউ। সে ঢেউয়ে টালমাটাল হয়ে ওঠে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের ডিঙ্গি নৌকাগুলো। সেই টালমাটাল অবস্থাতেই কারা যেন চিৎকার করে ওঠে—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

সেই চিৎকারে গলা মিলাতে দেখি আমার গাঁয়ের ও পাশের গাঁয়ের নিরক্ষর ও প্রায়-নিরক্ষর যুবক ও মধ্যবয়স্ক মফিজ শেখ, ইসমাইল, আশ্রাফ উদ্দীন, আমজাদ আলী, গোমেজ খাঁ এবং এমনকি প্রাইমারি স্কুলে আমার সহপাঠী, আমারই মতো পুঁচকে ছোঁড়া হোসেন আলী, হামিদ, গফুর, হাশিম উদ্দীনদেরও। কিন্তু তারই পাশাপাশি আমার বাবা, ঠাকুরদা, পোস্টমাস্টার নগেন্দ্র দত্ত, কবিরাজ জগদীশ নাগ, পাঠশালার শিক্ষক সুরেশ পণ্ডিত এবং আমারই অন্য সহপাঠী প্রাণেশ, সুশীল, গোপাল, ক্ষিতীশ, দীনবন্ধুদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। অথচ কয়েক মাস আগেই এদের সকলের আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে সময়ে অসময়ে শোন যেতো—বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই 'আল্লাহু আকবর' আর 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর দাপটে মরণদশা ধরলো 'বন্দেমাতরম জয়হিন্দ'-এর। একদিকে আরবি নামওয়ালা মানুষগুলো, অন্যদিকে সংস্কৃত নামওয়ালা।

আরবি নামওয়ালাদের সঙ্গে সংস্কৃত নামওয়ালাদের যে আচারে বিচারে চলনে বলনে অনেক পার্থক্য আছে, সে-কথা আগেও বুঝতাম, কিন্তু এমন করে বুঝিনি। এখন পার্থক্যটা তো

বেশি করে নজরে পড়লোই, সেই সঙ্গে হাড়ে হাড়ে অনুভব করলাম পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের ভাবটি। এ-ভাব যেন হঠাৎ করে স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলে পরিণত হয়ে গেলো। 'সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী*' আর '*অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার*' এই দাবানলে অনবরত বাতাস দিয়ে চললো। এক দুঃসহ সামাজিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আর কিছুদিন পর জন্ম নিলো একটি অদ্ভূত রাষ্ট্র—পাকিস্তান। জন্মের পর থেকে রাষ্ট্রটি নিজেই হয়ে উঠলো নতুন নতুন যন্ত্রণার প্রসূতি।

পাকিস্তান জন্ম নিলো সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগস্ট, এর চারদিন পর আঠারোই আগস্টে আমি বারো বছরে পা দিলাম। পাকিস্তানের জন্ম-যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে আমার শৈশব, পাকিস্তানের সৃষ্ট যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে শুরু হলো কৈশোর। সুকান্তের মতো আমিও বলতে পারতাম—'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি। জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি'। কিন্তু সুকান্তের প্রতিভা নিয়ে তো আমি জন্মিনি, কবি-শিল্পীর সৃজনশীল ও সুতীব্র স্পর্শকাতর অনভূতির অধিকারী আমি নই। তবু মাত্র সাত থেকে এগারো বছর বয়সে ঘটে যাওয়া তেতাল্লিশ সনের দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর) থেকে সাতচল্লিশে পাকিস্তানের জন্ম পর্যন্ত নানা ঘটনা আমি স্পষ্ট রূপেই প্রত্যক্ষ করেছি এবং সে সবের ছাপ আমার করোটিতে বেশ ভালো ভাবেই মুদ্রিত রয়ে গেছে। আমার সমবয়সী, এমন কি আমার চেয়ে চার/পাঁচ বছরের বড়ো, অনেক ধীমান বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি তারা ওই সময়কার ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলতে পারে না। যেমন, আমার বিএ ক্লাসের সহপাঠী শচীন আইচ। আমার পাঁচ বছর আগে সে এই পৃথিবীতে এসেছে। রাজা-জমিদার অধ্যুষিত মুক্তাগাছার নামকরা ইস্কুল রামকিশোর ইনস্টিটিউশনের সেরা ছাত্র শচীন আইচ আমার দু'বছর আগে, ১৯৫২ সালে, সব সাবজেক্টেই খুব ভালো নম্বর পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে। শুধু তাই নয়। ইস্কুল-জীবনেই ইংরেজি ভাষার ওপর সে অসাধারণ অধিকার অর্জন করে ফেলে এবং কলেজ জীবনের শুরুতেই ইংরেজি ভাষার (এবং ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপের অনান্য ভাষার) সেরা সেরা উপন্যাস তার পড়া হয়ে যায়। স্কুলে একান্ত শুড বয় হলেও কলেজে ঢুকেই সে 'পাঠ্য' বইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে 'অপাঠ্য' বই নিয়ে মেতে ওঠে। সে-কারণেই যথাসময়ে সে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের বেড়া ডিঙ্গোতে পারেনি, এবং তারই ফলে ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে বিএ ক্লাসে আমি তার সহপাঠী হতে পেরেছিলাম। তার সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, যদিও পাকিস্তানের জন্ম সময়ে তার বয়স পনেরো, তবু সে-সময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক কোনো ঘটনার ছাপই তার স্মৃতিতে নেই। ও-সময় এসব বিষয় সম্পর্কে তার কোনো চেতনাই জন্মেনি। এ-রকম প্রায় সবার ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে অন্য রকম ঘটলো আমার প্রতি ঠাকুরদা, ঠাকুরমা ও বাবা-মার সৃষ্টিছাড়া আদর ও মনোযোগের অতিরেকের ফলে। বালক-বয়সে তাঁরা আমাকে বালকোচিত জীবন-যাপন করতে দেননি। বলতে গেলে আমার জীবন থেকে বাল্যের নবীনত্বটুকু ছেঁটে ফেলে দিয়ে এক লাফে প্রবীণ বানিয়ে ফেলার সাধনায় মেতেছিলেন তাঁরা। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে দৌড় ঝাঁপ ও খেলাধুলা করা থেকে সব সময় আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তার বদলে আমাকে বই আর পত্র পত্রিকার জগতে আটক করে রাখতে চাইতেন, নবীনের খেলাঘর থেকে টেনে এনে প্রবীণদের আড্ডায় বসিয়ে দিতেন। এরও কারণ আছে। আমার বাবা হলেন আমার ঠাকুরদার একমাত্র সন্তান। আমার জন্মের আগে আমার একটি বোনের জন্ম হয়েছিল এবং পাঁচ বছর বয়সে সে মারা যায়। এরপর আমার ঠাকুরদা তো বংশলোপের আশঙ্কায় একান্ত কাতর ও

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বংশের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সব দেবদেবীর শরণাপন্ন হতে থাকেন আমার ঠাকুরমা। মুসলমান পির-দরবেশের দরগায় শিরনি মানত করাও বাদ যায় না। অবশেষে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় দিবসের রজনীতে এই ধরণীতে আমার আগমন ঘটলো। ধাত্রী মুখে আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদা নাকি বলেছিলেন, "আজ থেকে আমার সব অশান্তি দূর হলো। এই নাতিটাই আমার মনে শান্তি নিয়ে এলো। এর নাম রাখলাম শান্তি।"

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এভাবে আমার নামকরণ হয়ে গেলো। কিন্তু আমার ডাকনাম শান্তি হলে কি হবে, আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, বাবা-মার মনে আমি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি জোগাতে পারলাম না। জন্মের পর থেকেই আমার ওপর কঠিন কঠিন পীড়ার আক্রমণ সব সময় তাঁদের উদ্বিগ্ন করে রাখতো। এই উদ্বেগ ও অশান্তিই আমার প্রতি তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। আমার শরীরের প্রতি তাঁদের এই অতি মনোযোগই শারীরিক দিক দিয়ে আমাকে অকম্মা ও অপদার্থ বানিয়ে ফেলে। খেলাধুলা থেকে তো আমাকে তারা দূরে রাখতেনই, এমনকি গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেদের মতো গাছে উঠতেও দিতেন না। খাল বিলের দেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ছেলেবেলায় আমি ভালো করে সাঁতারটাও শিখতে পারিনি। কাজের মানুষ হওয়ার বদলে আমি বড়ো হতে লাগলাম কেবল দেখার মানুষ, ভাবনার মানুষ আর কথার মানুষ হয়ে।

এমন অস্বভাবিক বাল্য জীবন যাপনের দরুণই আমি ছেলেবেলা থেকে যে রকম দার্শনিক হয়ে উঠেছিলাম, সে রকমটি হতে পারেনি স্বাভাবিকভাবে বড়ো হয়ে ওঠা অন্য কোনো বালক।

অসাধারণ মেধার অধিকারী শচীনও তা পারেনি।

পাকিস্তানের জন্মলগ্নে 'ভদ্র হিন্দু'র মানস সংকট

পাকিস্তানের জন্মের সময়ে আমি ছিলাম মামার বাড়িতে। মুক্তাগাছা থেকে সাত/আট মাইল পশ্চিমে এক গ্রাম—পারুলতলা। মামাদের গ্রামটি আমাদের চন্দপাড়া গ্রামের চেয়ে অনেক দিক দিয়েই অন্যরকম।

আমাদের এলাকাটি ভাটি এলাকার সংলগ্ন। নেত্রকোনো শহর থেকে দশ মাইল দক্ষিণে আমাদের গ্রাম। যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই খারাপ। গাঁয়ের পাশ দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক চলে গেছে বটে, কিন্তু সেই কাঁচা সড়কে এমন খানা-খন্দকের অবস্থিতি এবং সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই এরকম কাদা জমে যায় যে হেঁটে চলাই কষ্টকর, কোনো যানবাহনের চলাচল একেবারেই অসম্ভব। 'গাড়িঘোড়া' এই যুগ্ম শব্দটি আমরা ব্যবহার করতাম বটে, কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপক প্রচলন আমাদের অঞ্চলে থাকলেও গাড়ি দেখা যেতো কদাচিৎ। এমনকি গোরুর গাড়িও না। ময়মনসিংহ বা নেত্রকোনা থেকে কোনো গণ্যমান্য লোক যদি হঠাৎ ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে আমাদের গাঁয়ের পাশের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে এসে পড়তেন, তবে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে তো রীতিমত হৈ চৈ পড়ে যেতো, বয়স্ক লোকেরাও হাতের কাজ ফেলে হাঁ করে ওই গাড়িটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। ওই জলকাদার দেশে বাইসাইকেলেও গাড়ির মর্যাদা পেতো। বর্ষায় এখানে প্রতি বছরই মাঠঘাট ডুবিয়ে ফেলে, আর যে-বছর বন্যা হয় সে-বছরের অবস্থা তো অবর্ণনীয়।

অন্যদিকে মামাবাড়ির চারপাশেই শুকনো খটখটে ঝরঝরে সব সড়ক। বিশেষ করে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সড়কটি সে-সময়ই এমন মজবুত করে তৈরি হয়ে গেছে যে, ও এলাকার এক সদ্য কলকাতা ফেরত যুবক এটি দেখে বলে উঠেছিল, 'বাঃ এ যে দেখছি কলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ!' এ এলাকায় খালবিলের প্রাচুর্য নেই, বন্যার প্লাবনে কখনো সড়ক ডুবে যায় না। গোরুর গাড়ি আর মোষের গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শোনা যায় সারা দিনরাত। যাত্রীদের যাতায়াত তখন ঘোড়ার গাড়িতেই বেশি। তবে, বাস চলাচলও সে সময়ই শুরু হয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম মামাবাড়িতে গিয়ে ভালোই লাগতো। ময়মনসিংহ আর মুক্তাগাছা শহর পার হয়ে মামাবাড়িতে পৌঁছেও এই গ্রাম্য বালকটির মনে শহুরে আমেজ লেগে থাকতো। এখানকার মানুষদের কথাবার্তায় যে নাগরিকতার ছোঁয়া পাওয়া যেতো তা ছিল আমার জন্য একান্তই চিত্তমনোহর। আমার মামাবাড়ির পাশেই মনো চক্রবর্তীর বাড়ি। মনো চক্রবর্তীর স্ত্রী ও মেয়েরা আমার ছোটমামা ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে তাস খেলতেন। মেয়েরা তাস খেলে! তা-ও আবার ছেলেদের সঙ্গে! আমাদের গ্রামে এমনটিতো আমি ভাবতেই পারিনি! আমাদের এলাকার ছোট ছোট মেয়েরা ঘরে বসে 'ষোলগুটি' কিংবা 'বাঘবন্দি' খেলতো। কিন্তু তাস খেলা? বিশেষ করে যুবতী মেয়েরা যুবক পুরুষের সঙ্গে? অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের এলাকায় ছোট ছোট মেয়ে থেকে শুরু করে যুবতী ও বৃদ্ধা পর্যন্ত সকল বয়সের মহিলারাই গান গাইতেন। না, তাকে 'গান' বলতো না। ও-গুলো ছিল 'গীত'! বিয়ে বা অন্নপ্রাশন কিংবা নানা ব্রতপার্বণে মেয়েরা গীত গাইতো। কোনো বাদ্যযন্ত্র সহকারে নয়, খালি গলায়, একা নয়, সমবেত কণ্ঠে। আমার ঠাকুরমা তো ছিলেন অজস্র গীতের ভাণ্ডারী।

কিন্তু পারুলতলায় এসে, ওই মনো চক্রবর্তীর বাড়িতেই, প্রথম দেখলাম কোনো কিশোরী বা যুবতী মেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে, আর পাঁচ/সাতজন নারী পুরুষ তার চারপাশে শ্রোতা হয়ে বসে গেছে এবং একটি গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশস্তি বাক্য উচ্চারণ করে আরো গান গাইবার জন্য গায়িকাকে প্রাণিত করে তুলছে। সমষ্টির বদলে কোনো ব্যষ্টি নারীর কণ্ঠে, এবং 'গীতে'র বদলে 'গান', শুনে আমার সে কী বিস্ময়!

এখানকার নারী-পুরুষ অনেকের মধ্যে নানা রকম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশই আমার মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। হিন্দুদের আচারনিষ্ঠা তথা আচারের বাড়াবাড়ির সঙ্গে জন্মের পর থেকেই আমি পরিচিত। এই আচারের কোনো ব্যতিক্রম ঘটানো বা তার বিপরীত কিছু করা কোনো হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব বলে আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু মামা বাড়িতে এসে এই ব্যতিক্রম ও বৈপরীত্যগুলোই বেশি করে নজরে পড়লো। আমার দিদিমার মধ্যে দেখলাম আচার নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর পুত্রসহ আশপাশের পুরুষরা যেন এক একজন জীবন্ত কালাপাহাড়। দিদিমা ছিলেন একাহারী, অর্থাৎ আতপ চালের ভাত একটু ঘি এবং নিরামিষ ব্যঞ্জন সহযোগে সারাদিনের একবার মাত্র খাওয়া। রাতে সামান্য দু'একটা ফলমূল, কিংবা একটু দুধ। নিজের বাড়ির গাই দুইয়ে দুধ পাওয়া গেলেই সে দুধ তিনি খেতেন, বাজারের কেনা দুধ কখনো নয়। অন্য জাতের ছোঁয়া লেগে কখন জাত চলে যায়, সে ভয়ে থাকতেন সদা তটস্থ।

আর তাঁর পুত্র অর্থাৎ আমার ছোট মামার (দুই মামার মধ্যে বড়ো মামা অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে দিনাজপুর শহরে চলে গিয়েছিলেন বলে তাঁর আচরণ সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জানা ছিল না) নিরামিষ আহারের প্রতি ছিল একান্ত বিতৃষ্ণা, রুচি ছিল মাংস

ভক্ষণে, এবং সে-মাংসও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ কুক্কুট অর্থাৎ মুরগীর মাংস। গোমাংস ভক্ষণে হিন্দুর হয় মহাপাপ ও জাতিচ্যুতি; কুক্কুট মাংস ভক্ষণে অতোটা না হলেও, হিন্দুত্ব রক্ষণে যত্নবান কেউ মুরগি খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারতো না। অথচ আমার ছোট মামা শুধু নিজের বাড়িতেই মুরগি খেতেন না, শুনেছি তিনি নাকি তাঁর কতিপয় ব্রাহ্মণ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মুসলমান বাড়িতে গিয়েও মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে আসতেন। হিন্দু হয়ে মুসলমানদের বাড়িতে ভাত খাওয়া যে কতো বড়ো হিন্দুত্বনাশী ব্যাপার ছিল, আজকের দিনের কোনো ছেলেমেয়েকে তা বোঝানো খুবই কঠিন।

আমার মামা এবং তাঁর হিন্দু বন্ধুদের এরকম হিন্দুত্ব বিরোধী জীবনাচরণও কিন্তু পাকিস্তানের জন্মলগ্নে তাঁদের হিন্দু পরিচয়কে মুছে দিতে পারেনি। ছোটমামার এক বন্ধু যতীন চক্রবর্তী একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "হিন্দু হয়ে যে জন্মেছি, এটাই যেন আমাদের অপরাধ। পাকিস্তানের জোশে কোনো মুসলমান মানুষ বলেই স্বীকার করতে চায় না আমাদের।"

ফণী চক্রবর্তীর কথা, "এদেশে থাকা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। দেশের নানা জায়গায় আত্মীয়-স্বজনরাও খবর পাঠাচ্ছেন, তাঁরাও শিগগিরই দেশ ছাড়ার আয়োজন করবেন। বিশেষ করে সোমত্ত মেয়েছেলে আছে যাদের, তাদের তো আতঙ্কে চোখে ঘুম নেই।"

এরপর কয়েকটি জায়গায় হিন্দু বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়ার লোমহর্ষক বিবরণ দিয়ে গেলেন তিনি।

পারুলতলা গ্রামে তখনকার সবচেয়ে ধনী মানুষ হলেন ডাক্তার তরণী হোড়, সাধারণ্যে যিনি হারু ডাক্তার নামে পরিচিত। আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র 'পাস করা ডাক্তার'—এলএমএফ। ডাক্তার হিসেবে তাঁর দারুণ সুনাম। গাঁয়ের মানুষের মুখে মুখে শোনা যেতো, তাঁকে নাকি একবার কোন এক রোগীর চিকিৎসা প্রসঙ্গে তখনকার ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক বিধান রায় খুবই প্রশংসা করেছিলেন। গাঁয়ের মানুষের চোখে হারু ডাক্তারই হয়ে উঠেছিলেন বিধান রায়।

ডাক্তারী করে তিনি প্রচুর পয়সা রোজগার করেছিলেন অবশ্যই। তবে তাঁর সম্পদের মূল উৎস ছিল পৈতৃক ওয়ারিশ। বিরাট জোতদার পিতা দ্বারিক হোড়ের একমাত্র পুত্র হিসেবে অনেক ক্ষেতখোলা আর হাল লাঙ্গলের মালিক হয়েছিলেন তিনি। লোকে বলতো, হারু ডাক্তার নিজেই তার সবগুলো ক্ষেত চোখে দেখেনি; কয়টা গোরু আর মহিষ তার আছে তাও সে জানে না।

হিন্দুত্ব নিয়ে হারু ডাক্তারের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কতোজন হিন্দু আর কতোজন মুসলমান, তার হিসেব করা কঠিন। একটি দরিদ্র মুসলমান কৃষকের ছেলেকে তিনি পালিত পুত্রের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তার শিক্ষাদীক্ষা ও জীবন যাপনের রীতিমত রাজকীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

হারু ডাক্তারের অনেক ভক্ত, অনেক বন্ধু, অনেক অনুচর। কিন্তু সেই প্রবল প্রতাপান্বিত হারু ডাক্তারকেই দেখা গেলো রাতারাতি ভক্তহীন বন্ধুহীন অনুচরহীন হয়ে পড়তে। এলাকায় যারা পাকিস্তানের হোতা, তাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়লো ডাক্তারের বিপুল সম্পত্তির ওপর। পাকিস্তানের ঘোষিত দর্শনে যতো বড়ো বড়ো কথাই থাকুক না কেন, যতোই বলা হোক না কেন ধর্মের কথা, আসলে এগুলো সবই ছিল কেবল বাইরের প্রচ্ছদে। ভেতরে ছিল লোভের

লকলকানি, এবং সে-লোভ মূলত সম্পত্তির। সেই লোভ চরিতার্থ করার পথটা যদিও ধর্মপথ ছিল না মোটেও, তবু ধর্মের দোহাইটাই দেয়া হতো বেশি বেশি করে। সে-ধর্মও অবশ্যই মানুষের ধর্ম বা মনুষ্যত্ব নয়, বরং মনুষ্যত্বকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিয়েই বড়ো করা হয়েছিল হিন্দুত্ব আর মুসলমানত্বকে। তাই রাতারাতি 'মানুষ' হারু ডাক্তার হয়ে গেলো 'হিন্দু' তরণী হোড়। যে হিন্দুত্ব সম্পর্কে এতোদিন তাঁর কোনো সচেতনতা পর্যন্ত ছিল না, সে হিন্দুত্বই এখন তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে উঠলো। এ যেন 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'। যতীন চক্রবর্তী আর ফণী চক্রবর্তীর মতো একই রকম খেদোক্তি ঝরে পড়লো হারু ডাক্তারের মুখ থেকেও।

আর যাঁরা ছিলেন হাড়মজ্জায় হিন্দু, তাঁরা তো প্রতি মুহূর্তেই হিন্দুত্বের বিনাশ-আশঙ্কায় থরহরি কম্পমান হয়ে উঠলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমার দিদিমা (একান্ত আচার নিষ্ঠাবতী শ্রীমতি নিস্তারিণী দাশ) থেকে শুরু করে প্রায় মূর্খ পুরোহিত আকালু ঠাকুর কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিতীর্থ পর্যন্ত অনেকেই।

আমার দিদিমা নিত্য গীতা পাঠ করতেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারতের তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগিনী। নিজেরও কবি-প্রতিভা ছিল। তাঁর উপাস্য দেবতা কালীর প্রতি তিনি ভক্তি নিবেদন করতেন নিজের রচিত 'মালসী' গেয়ে। সেসব মালসী রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীতেরই উত্তরাধিকারবাহী হলেও তাতে দিদিমার স্বকীয়তা ও স্বকালচেতনারও স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যেতো। কথায় কথায় তিনি ছড়া কাটতেন। তাঁর বেয়াই-বেয়াইনদের কাছে চিঠি লিখতেন কবিতাকারে। দিদিমার লেখা গান বা চিঠিপত্র কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, আমরা কেউই সেসব সংরক্ষণ করতে পারিনি বলে খুবই আফসোস লাগে। একবার তিনি তাঁর বেয়াইকে (অর্থাৎ আমার ঠাকুরদাকে) কবিতাকারে লিখিত একটি দীর্ঘ চিঠিতে পিঠা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে চিঠির একস্থানে ছিল—*কয়েকটি পুলিশে পাটি নিয়ে যায়, মহাশয়, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।*

পুলিশের পাটি নিয়ে যাওয়া বলতে তিনি 'পুলি' ও 'পাটিসাপটা' নামক দু'জাতের পিঠার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় দিদিমার খুব দখল হয়তো ছিল না, অথচ অজস্র সংস্কৃত শ্লোক তাঁর মুখস্ত ছিল। অনেক সংস্কৃত শ্লোকের অনেক অভিনব অর্থ করে তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খুনসুটি করতেন। গুরু প্রণামের মন্ত্রে আছে—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

দিদিমা বলতেন—এর অর্থ বুঝলি না? 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া' মানে অজ্ঞানের কাছে যার ওজন তিন মণ দশ সের, জ্ঞানীর কাছে তাই শোলার মতো পাতলা।....তাই লেখাপড়া শিখে যদি জ্ঞানী হতে পারিস তাহলে কোনো কিছুই ভারি লাগবে না, সব শোলার মতোই পাতলা হয়ে যাবে।

সুতীক্ষ্ণ রসবোধের অধিকারিণী আমার দিদিমা দেবদেবীদের নিয়েও প্রচুর রঙ্গব্যঙ্গ করে নাতিনাতনীদের হাসিখুশিতে মাতিয়ে রাখতেন। বিধবা হবার পর মাছ মাংস তিনি কোনোদিনই স্পর্শ করেননি বটে, কিন্তু তাঁরই ডিরেকশন অনুযায়ী মাছ মাংস রান্না করতে পেলে পাড়ার বৌঝিরা বর্তে যেতো। আর নিজের হাতে তিনি যে নিরামিষ রান্না করতেন, তা তো এককথায় হতো অপূর্ব। বৈষয়িক নানা ব্যাপারেও তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যেতো। আপন আচারনিষ্ঠায় পুরো রক্ষণশীল হলেও ছেলেদের কালাপাহাড়ি আচরণে কখনো বাধা নিতেন না.

নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই একধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তিনি মেনে নিয়েছিলেন। পুত্ররাও এ-কারণে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, মাকে নিয়ে তাঁদের গর্বেরও অন্ত ছিল না। মায়ের নামেই তাদের বাড়িটিকে পরিচিত করার জন্য বাড়ির সামনে নামফলক লাগিয়ে রেখেছিলেন—'নিস্তারিণী কুটির'। তাঁদের চিঠি লেখার প্যাডেও ঠিকানা লেখা থাকতো এই নিস্তারিণী কুটিরের, মায়ের নামটা প্রচার করার মধ্যে ছিল তাদের গর্ব মেশানো আনন্দ।

এহেন নিস্তারিণী দেবী মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মের কথা শুনে হিন্দুত্বনাশের আশঙ্কায় একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। হিন্দুর কাছে ব্রাহ্মণও দেবতা, গোরুও দেবতা—দুই-ই সমান মান্য। মুসলমান সেই ব্রাহ্মণকে তো মানেই না, আর গোরু হলো তার আহার্য। পাকিস্তানে যে সকলকেই গোরু খেতে বাধ্য করা হবে—দিদিমার মনে বোধ হয় এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সেই ধারণাই তাকে পাকিস্তান সম্পর্কে নানা কল্পিত আশঙ্কার জালে জড়িয়ে ফেলেছিল।

দিদিমার এক দূর সম্পর্কের নাতি প্রফুল্লচন্দ্র—আমার প্রফুল্ল দা—দিদিমার সব ধারণা ও আশঙ্কাগুলোকে নানাভাবে উস্কে দিতো এবং পরে সেগুলো দিয়েই তাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলতো। যেমন, সে বলতো, "আচ্ছা ঠাকু মা, তোমরা তো গোরুকে দেবতা বল, আবার ব্রাহ্মণকেও দেবতা মনে কর। তবে মুসলমানকে দেবতা বল না কেন?"

—"কেন, কেন, মুসলমানকে দেবতা বলবো কেন?" দিদিমা মুখিয়ে উঠতেন।

—"কেন আবার। তোমাদের গোরু দেবতাকে তো মুসলমানরা খেয়ে হজম করে ফেলে। তাই মুসলমান তো গোরুর চেয়েও বড় দেবতা—একেবারে মহা দেবতা।" মিটি মিটি হেসে প্রফুল্লদা উত্তর দিতো।

দিদিমা হাতের কাছে যা পেতেন তাই নিয়ে প্রফুল্লদাকে তাড়া করতেন। প্রফুল্লদা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট।

প্রফুল্লদার এ্যাকাডেমিক লেখাপড়া খুব বেশি ছিল না। কিন্তু তার 'কমনসেন্স' ছিল খুবই শক্তিশালী। তার কথাবার্তায় অনেক সময় বেশ বিপ্লবী বিপ্লবী গন্ধ পাওয়া যেতো।

গোরু নিয়ে হিন্দুদের বাড়াবাড়ির বিষয়টি ছিল প্রফুল্লদার খুবই অপছন্দ। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণরাও গোমাংস ভক্ষণ করতো—এ রকম একটি তথ্য কোথা থেকে জানি সে সংগ্রহ করেছিল। সে-তথ্যটা খুব জোরের সঙ্গে ব্যবহার করেই সে বর্তমান কালের গোঁড়া হিন্দুদের নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ছিল তার প্রচণ্ড ক্ষোভ। ব্রাহ্মণ্যবাদই যে হিন্দুর সর্বনাশের কারণ,—এমন কথা অমার্জিত গ্রাম্যতায় প্রফুল্লদা বারবার বলে যেতো। সে আরো বলতো, "ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ হিন্দুদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলে, মুসলমানদের তো মানুষ বলেই মনে করে না। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য হিন্দুরাও এতোদিন ধরে মুসলমানদের শুধু শুধু ঘৃণা করে এসেছে। এবার তো মুসলমানরা তার শোধ তুলবেই।"

দিদিমা প্রফুল্লদার এসব কথা সহ্য করতে পারতেন না। ব্রাহ্মণের প্রতি দিদিমার অচলা ভক্তি। এবং সে ব্রাহ্মণ আকালু ঠাকুরের মতো আকাট মূর্খ হলেও। একাদশী আর জন্মাষ্টমী যে একই দিনে হতে পারে না, এ-জ্ঞানটিও আকালু ঠাকুরের ছিল না। দিদিমা নিজেও আকালুর মূর্খতার কথা জানতেন। তাই আকালু ঠাকুরকে তিনি পূজার জন্যে পুরোহিত নিযুক্ত করতেন বটে, কিন্তু পূজার সর্বক্ষণ এই পুরোহিতের পাশে বসে থেকে তার ভুলচুক শুধরিয়ে দিতেন। আকালু ঠাকুরের পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত থেকেও দিদিমা তাকে পুরোহিতের

মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। কারণ, হাজার হলেও আকালু তো ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের ঘরে যে জন্ম নেয়, মূর্খ হলেও সে অব্রাহ্মণের দেবতা।

অবশ্যি বড়ো কোনো ক্রিয়াকাণ্ডে এ মূর্খ দেবতার ওপর কোনো হিন্দুই নির্ভর করতেন না—আমার দিদিমাও না। বিবাহ, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি ব্যাপারে কিংবা যে-কোনো শাস্ত্রীয় বিধান নেয়ার জন্যে, ডাক পড়তো পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিতীর্থের। ধনী গৃহস্থরাই স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের যজমান। শুধু পারুলতলা বা তার আশপাশের গ্রামগুলোতেই নয়, অনেক দূর-দূরান্ত থেকেও মধুসূদন স্মৃতিতীর্থের ডাক আসতো।

এখন, পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার আগেই, হিন্দুদের মধ্যে দেশত্যাগের ভাবনাচিন্তার যে জোয়ার শুরু হয়ে গেছে তাতে তো মনে হয় অচিরেই দেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। সে-অবস্থায় মধুসূদন স্মৃতিতীর্থ কী করবেন এ-দেশে থেকে? প্রাণ আর মান যদি কেউ না-ও কেড়ে নেয়, জীবিকার উৎস যদি শুকিয়ে যায়, তবে জীবন তো আপনা থেকেই শুকিয়ে যাবে। মূর্খ আকালু আর পণ্ডিত মধুসূদনের হবে একই সমতলে অবস্থান। এঁদের জন্যে আমার দিদিমার অশেষ সহানুভূতি।

মামা বাড়িতে অবস্থান করে, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, গাঁয়ের 'হিন্দু ভদ্রলোক' নামে পরিচিত গোষ্ঠীটির এ-ধরনের মানসিক অবস্থানই আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

ব্রাত্যজনের পাকিস্তান ও কবি ইউনুস আলী

আমার মামা আর তাঁর বন্ধুরা, কিংবা হারু ডাক্তার আর তাঁর আত্মীয়রা, কিংবা আকালু ঠাকুর আর মধুসূদন স্মৃতিতীর্থের মতো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা—সবাইতো হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর মানুষ। পাকিস্তান এঁদের জন্যে এক ধরনের সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। এদের সমস্যার মূলে ছিল পুরুষ-পরম্পরায় গড়ে ওঠা বৈষয়িক ও সামাজিক প্রতিপত্তি হারানোর ভয়।

কিন্তু 'ভদ্রলোক'-এর বৃত্তসীমার বাইরে যাদের অবস্থান, সেই ব্রাত্যজনরা তো কোনো প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল না। ওরা বরং চিরকালই ভদ্রলোকদের প্রতিপত্তির জাঁতাকলে পিষ্ট। অথচ, দেখা গেলো : পাকিস্তান ওদের জন্যেও নতুন ধরনের ভয়, আশঙ্কা ও অনিশ্চিতি নিয়ে এসেছে। পারুলতলা গ্রামের নির্মল পাটনী ও রাজেন্দ্র মান্দাইরা পুরুষানুক্রমেই নিঃস্ব ও রিক্ত, তারা সেই দলের মানুষ 'যাদের হারানোর মতো কিছুই নেই।' নিজেদের গতর খাটিয়েই তাদের জীবন চলে, ভদ্রলোকদের মতো অন্য কাউকে খাটানোর কথা তারা ভাবতেই পারে না। তাদের ছোঁয়া লাগলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য ভদ্রলোকদের জাত যায়। তারা যে 'ছোটজাত' এ কথা শুধু ওই ভদ্রলোকদের মুখেই তারা শোনে না—নিজেরাও বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাস থেকেই বোধ হয় তাদের মনে এ রকম বিশ্বাসও জন্ম নিয়েছে যে, ভদ্রলোকদের বিপদকে নিজেদের বিপদ বলে ভাবাটা ছোট জাতের দায়িত্ব।

এদের এবারের বিপদটা কিন্তু এ রকম সাবজেকটিভ ধরনের নয়। পাকিস্তান ভদ্রলোক হিন্দু আর ছোটলোক হিন্দুর ওপর একই রকম সমস্যা চাপিয়ে দিয়ে তাদের একাকার করে ফেলেছে।

নির্মল পাটনীদের বাড়ি মামাবাড়ির কাছাকাছিই। ওদের বাড়ির ভিটেটুকুই ছিল মাত্র সম্বল, কোনো কৃষি জমির মালিকানা তাদের ছিল না। ভারত চন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর মতো নির্মল পাটনীর পূর্ব-পুরুষরাও হয়তো খেয়া নৌকার মাঝিই ছিল। নির্মল আর তার ভাইদের কিন্তু নদী

বা নৌকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের জীবিকা ছিল বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, চাঙ্গাড়ি ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম তৈরি করে বিক্রি করা। রাজেন্দ্র মান্দাইর কোনো ভিটে বাড়িও ছিল না, আমার মামার বাড়িতেই একটি কুঁড়ে ঘর বানিয়ে তারই নিচে বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকতো। রাজেন্দ্র ছিল ক্ষেতমজুর, আর তার বড়ো ছেলে মদন পাশের গাঁয়ে বেঙ্গা দাসের বাড়িতে 'পেটেভাতে' রাখালের কাজ করতো। মান্দাইরা সম্ভবত গারো উপজাতি থেকেই উপজাত। কী করে তারা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, ইতিহাসবিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদরা তার সুলুক সন্ধান নিয়েছেন। তবে যেভাবেই তারা হিন্দু হয়ে থাক না কেন, তাতে তাদের লাভ যে কিছুই হয়নি, সে কথা বোঝার জন্যে ইতিহাস বা সমাজতত্ত্ব পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। হিন্দু হয়েও তারা 'ভদ্রলোক' হতে পারেনি, ছোট জাতের কাতারেই তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

বেশ আগে থেকেই নির্মল পাটনীদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছিল। জাতে যারা পাটনী নয়, হিন্দুও নয়, যাদের নাম রামচন্দ্র, কালিপদ বা হরিচরণ—এমন কিছু নয়, মালেক, সালেক বা খালেক—এ রকম যাদের নাম তারা অনেকেই ঝুড়ি চাই চাঙ্গাড়ি বানিয়ে হাটে তুলতে শুরু করেছিল। এদেরই কেউ নির্মলকে একদিন গাবতলীর হাটে ঠেস দিয়ে কথা বলে। তাকে ছোট লোক পাটনী তো বলেই, তার ওপর প্রয়োগ করে আরেকটি নতুন শব্দ—মালাউন। মালাউন কথার অর্থ নির্মল পাটনী জানে না; তবে এটি যে প্রিয় সম্বোধন নয়, তা সে বোঝে। ওদের মুখেই শোনে : এখন এদেশ হবে পাকিস্তান—মুসলমানদের দেশ। মালাউনের ঠাঁই এখানে নয়, তাদের চলে যেতে হবে হিন্দুস্থানে। সে জেনে যায় : নির্মল পাটনী বা রাজেন্দ্র মান্দাইরা যেমন মালাউন, তেমনি মালাউন হারু ডাক্তার, মনো চক্রবর্তী, বেঙ্গা দাস, দীনবন্ধু দেব এবং এ-রকম সবাই। ভদ্রলোক আর ছোটলোক হিসেবে তাদের মধ্যে ব্যবধান যে দুস্তর—সেকথা নির্মল পাটনী বা রাজেন্দ্র মান্দাইদের জানা ছিল। এখন জেনেছে যে, মালাউন হিসেবে তারা এক—কোনোই ব্যবধান নেই।

আচার নিষ্ঠাবতী বিধবা শ্রীমতি নিস্তারিণী দাশও অবশ্যই মালাউন। নিস্তারিণীর রোয়াকে আকালু ঠাকুর, মধুসূদন স্মৃতিতীর্থ, নেপাল কর্মকার বা বেঙ্গা দাসদের মতো মালাউনেরা সকালে-বিকালে মেলা বসায়। পাকিস্তান নামক উপদ্রবের বিষয়ে উদ্বেগাকুল কথা বলে। এদের সঙ্গে এসে নির্দ্বিধায় যোগ দেয় নির্মল পাটনী আর রাজেন্দ্র মান্দাইও। রাজেন্দ্রও বলে, "এই দেশে আর থাকন যাইবো না। হারু ডাক্তারের বেবাক জমি না-কি মুসলমানগো অইবো...এইডা যদি অয়, তাহলে আমরা আর কাম পামু কনে? তহন তো না খাইয়াই মরণ লাগবো।"

রাজেন্দ্রর আশঙ্কা : হারু ডাক্তারদের হাত থেকে জমি চলে গেলে সে জমি যাদের হাতে যাবে তারা রাজেন্দ্রদের আর কাজে নেবে না। এমন কি এখন যারা তারই মতো ক্ষেতমজুর, তারা জাতে মুসলমান বলেই তাদের অনেকে ক্ষেতের মালিক শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে যাবে।

অর্থাৎ হারু ডাক্তার থেকে রাজেন্দ্র মান্দাই পর্যন্ত সকলের চৈতন্যে একই বিষণ্ন সুরের অনুরণন : এদেশে থাকা যাবে না, এদেশ মুসলমানের। এই বিষণ্ন সুর আমার কিশোর মনকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। আশার ও আনন্দের সুর কি কোথাও শোনা যাবে না?

হ্যাঁ, এই প্রার্থিত সুরটি অচিরেই একদিন শুনতে পেলাম। শুনলাম একজন কবির কণ্ঠে। সে কবির নাম—ইউনুস আলী।

একদিন গাবতলির হাটে গিয়ে একটি জটলা দেখে এগিয়ে যাই। টিনের চোঙ মুখে লাগিয়ে একজন লোক সুর করে কবিতা আবৃত্তি করছেন। শুনলাম—ইনিই কবি ইউনুস আলী। আবৃত্তি শেষ করে তিনি সকলকে তাঁর কবিতার বইটি কেনার জন্যে আহবান জানালেন। হুড়োহুড়ি করে সকলে বই কিনতে লাগলো। আমিও এক কপি কিনলাম। দাম মাত্র এক আনা। আট পৃষ্ঠার বই। নাম—'পাকিস্তানের কবিতা'।

কবিতার শুরুতে আল্লাহ্ রসুলের বন্দনা, তারপরই পাকিস্তানের সৃষ্টিতে কবির অন্তহীন উল্লাসের প্রকাশ। এরপর দু'টি লাইনে—

ঢাকায় রাজধানী হবে (২) উন্নতি হবে বাংলাদেশের ভাই।
হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে থাকতে যেন পাই।

একেবারে চমকে উঠলাম। গত দু'তিন মাস ধরে মামাবাড়িতে ও তার আশপাশে লোকজনের মুখে যে ধরনের কথা শুনে আসছি, এতো তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

পাকিস্তান হলেই যে হিন্দুদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, কবি তা মানতে রাজি নন। পাকিস্তান হলো, তাঁর মতে, পবিত্রস্থান। পবিত্র স্থানে কোনো মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে পারে না। আর যে দেশে হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর ধরে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, এখন তা পারবে না কেন? কবি ইউনুস আলী একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন—

'দেখ ফজর আলী ঠাকুরদাসের এক উঠাইন্যা বাড়ি।' ফজর আলী আর ঠাকুরদাস—দুই ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দুটো পরিবার একই আঙিনায় বাস করে, তাদের ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের খেলার সাথী, ঈদ আর পূজায় তারা একই রকম আনন্দে মেতে ওঠে, একের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা অন্যের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।—এমন একটি লোভনীয় চিত্র উপস্থাপন করে হিন্দুদের দেশত্যাগকে নিরুৎসাহিত করতে চাইছেন কবি ইউনুস আলী।

কবি ইউনুস আলীর নাম এখনো কেউ মনে রেখেছেন বলে মনে হয় না। তিনি মুক্তাগাছা অঞ্চলের মানুষ ছিলেন, তা জানি। কিন্তু এর বেশি কিছু জানি না। তিনি ছিলেন একজন কৃষক কবি। আবহমান বাংলার কৃষকের অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি-ঐতিহ্যই তিনি বহন করছিলেন। কৃষকের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদের কোনো ঠাঁই কোনোদিনই ছিল না। পাকিস্তান নামক একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের অবদানই সবচেয়ে বেশি—এ কথা ঠিক। কিন্তু তারা সাম্প্রদায়িক চেতনা-তাড়িত হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছেন—সে কথা ঠিক নয়। জমিদার-মহাজনচক্রের হাতে শোষিত-নিষ্পেষিত হচ্ছিল যে কৃষক, সে কৃষকের সামনে পাকিস্তান আন্দোলন একটি অত্যন্ত মোহনীয় ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরেছিল। সে ছবিই মুসলমান কৃষককে পাকিস্তান আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিল, কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় নয়।

এসব উপলব্ধি যে সেই এগারো বছর বয়সেই আমার ভেতর সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, তা তো অবশ্যই নয়। তবে সেই অপরিণত বয়েসেই আমি যা দেখেছি ও শুনেছি তার প্রায় সবকিছুরই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ছবি আমার চেতনায় থেকে গেছে। অনেক ছবিই হয়তো আজ ধূসর হয়ে গেছে; তবু সেই ধূসর ছবিগুলোকেও আজকের চেতনার আলোতে নিয়ে এলে সেসবের অর্থ ও তাৎপর্য আমার কাছে যেভাবে ধরা পড়ে, সেভাবেই সেগুলোকে তুলে ধরা ছাড়া আমার উপায়ান্তর নেই। আজকে আমার মনে হয় পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের প্ররোচনায় অনেক

ধরনের সাম্প্রদায়িক আচরণেই হয়তো কৃষক সমাজের কেউ কেউ কোনো কোনো সময়ে লিপ্ত হয়েছে, তবে তা একান্তই সাময়িক বিভ্রান্তি। অবিশ্যি এরকম সাময়িক বিভ্রান্তিই যে অনেক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছে—সে কথাও অস্বীকার করা চলে না।

এরকম ক্ষতই তারা সৃষ্টি করেছিল নির্মল পাটনী বা রাজেন্দ্র মান্দাইদের মতো নিঃস্ব নির্যাতিত ব্রাত্যজনদের মনেও।

ইউনুস আলীর মতো কৃষক কবি হয়তো তাঁর কবিতাকে সেসব ক্ষত নিরাময়ের মলম রূপেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের মতলববাজ নেতা, তাদের জোতদার চেলা ও সদ্য গজিয়ে-ওঠা গ্রাম্য টাউটরা তখন অনেক বেশি শক্তিধর। ছোট্ট ক্ষতকে অনবরত খুচিয়ে তারা দুরারোগ্য কার্বাঙ্কলে পরিণত করে চলছিল। এদের আসুরিক প্রতাপের দৌরাত্ম্যে সনাতনী কৃষকদের নান্দনিক মূল্যবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল, কৃষক কবি ইউনুস আলীর সদিচ্ছা ও সুবচন ব্যর্থ নমস্কারে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

তবু ইউনুস আলীর কবিতা আমার কৈশোরিক চৈতন্যে যে-সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিল, তার সুবাসে এখনো আমি উজ্জীবিত হই।

বাংলার লোকজীবনে পাকিস্তানের দুষ্ট হাওয়া

পারুলতলার মাইল দেড়েক উত্তরে এক গ্রাম—হাতিল। সে গ্রামের একজন মানুষের খুব নাম ডাক। পেশায় তিনি আইনজীবী, কিন্তু তাঁর খ্যাতি ব্যায়ামবিদ হিসেবে। 'ব্যায়ামে বাঙালি' নামে একটা বইয়ে তাঁর জীবনী ছাপা হয়েছিল। সাধারণ্যে তিনি পরিচিত 'দিগিন্দ্র মাল' নামে। তাঁর আসল নাম দিগিন্দ্রচন্দ্র দেব।

এই মালের বাড়ি আমার মাসিমার শ্বশুরবাড়ি। দিগিন্দ্র মালের বড়ভাই দীনবন্ধু দেব আমার মাসিমার শ্বশুর, আর দিগিন্দ্র মাল কাকা শ্বশুর।

বড়োভাই দীনবন্ধু দেবই দিগিন্দ্রকে মানুষ করেছেন। কলকাতায় রেখে কলেজে পড়িয়ে তাঁকে বিএ ও বিএল পাস করিয়েছেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেবেলায় এসব কথা মামার বাড়িতেই আমি শুনেছি।

কিন্তু এক পর্যায়ে এই দিগিন্দ্র দেবের সঙ্গে বড় ভাই দীনবন্ধু দেবের সম্পত্তি ঘটিত বিবাদ চরমাকার ধারণ করে। দীনবন্ধু দেবকে হাজত বাসও করতে হয়। গ্রামের লোকেরা দুই দলে ভাগ হয়ে একদল বড় ভাই ও আরেক দল ছোট ভাইকে মদদ জোগাতে থাকে। দুই ভাইয়ের কে কতোখানি দোষী ছিলেন, তা জানি না। তবে এক সময় যে হাতিল ও তার আশপাশে গ্রামগুলোতে দিগিন্দ্র দেব ও দীনবন্ধু দেব এই দুই ভাইয়ের ঝগড়া-বিবাদ খুবই মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে পড়েছিল, তা জানি।

সে যাই হোক, পাকিস্তানের জন্ম সময়ে কিন্তু এ সব ঝগড়া-বিবাদের কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল। দিগিন্দ্র দেব সে সময় ময়মনসিংহ শহরে ওকালতি করেন। গাঁয়ের হিন্দুরা তখন তাঁর সান্নিধ্য কামনা করছিল মনে প্রাণে। গাঁয়ে যদি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরুই হয়ে যায়, তবে হিন্দুদের জন্য দিগিন্দ্র মালই হতে পারেন সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল। কয়েক বছর আগে না-কি গুণ্ডারা সদলবলে ময়মনসিংহের কালীবাড়ি আক্রমণ করতে গিয়েছিল। তখন দিগিন্দ্র মাল একাই তাদের হটিয়ে দেন।

দিগিন্দ্র মাল হাত দিয়ে চলতি মোটর গাড়ি আটকে দিতে পারেন, বুকের ওপর হাতি তুলতে পারেন, খালি হাতে হয়তো বাঘও মেরে ফেলতে পারেন—তাঁর শক্তি সম্বন্ধে এ রকম নানা কথা লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে ফিরতো।

তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রেণু দেব। বিএ ও বিটি পাস। ময়মনসিংহ সরকারি বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ফরিদপুর জেলার কোনো এক জমিদার বাড়ির মেয়ে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের এক কালের ডাক সাইটে প্রিন্সিপাল রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্র ভদ্রের দৌহিত্রী। এ রকম একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চ শিক্ষিতা কন্যাটি হাতিলের মতো গণ্ড গ্রামেরই এক বাড়ির বউ হয়ে এসেছে, সেজন্যে গ্রামবাসীর গর্বের অন্ত ছিল না। পাকিস্তানের জন্ম সময়ে হাতিলের হিন্দুরা তাদের মাঝে দিগিন্দ্র মালের সাথে তাঁর স্ত্রী রেণু দেবের উপস্থিতিও মনে প্রাণে কামনা করছিল। উকিল দিগিন্দ্র দেবের মতো তাঁর শিক্ষয়িত্রী স্ত্রীর কাছেও তারা বল-ভরসা পেতে চাইছিল। কিন্তু সে-রকম বল ভরসা দেবার জন্য তাঁরা কেউই সেদিন শহর ছেড়ে গ্রামে আসেন নি।

আসলে বল-ভরসা দেবার ক্ষমতা তখন কারুরই ছিল না। দিগিন্দ্র মালের শারীরিক বল কিংবা তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রী রেণু দেবের বুদ্ধিজাত ভরসা, অন্যের জন্য দূরে থাক, নিজেদের জন্যই অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। এদেশের হিন্দুমাত্রই তখন বল ভরসাহীন।

অবশ্যি যে-কোন মুহূর্তেই এখানকার হিন্দুরা শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, প্রতিপক্ষরা তাদের কচুকাটা করে ফেলবে, তাদের বৌ-ঝিদের ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যাবে—হিন্দুদের এমন বহুপ্রচারিত আশঙ্কা পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক জন্মলাভের পরও সত্য হয়ে ওঠেনি। তার কারণ বাংলার কৃষককূলের মধ্যে দৃঢ়মূল যে লোকায়ত সংস্কৃতি, তার গভীর প্রভাবের দরুণই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে অতি সহজে কেউ তাদের প্ররোচিত করতে পারে না। ১৯৫০ সালের আগে এদেশে বড়ো ধরনের কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি এবং পঞ্চাশেও কোনো গণ্ডগ্রামে দাঙ্গা হয়েছে—এমন শুনিনি।

আমি না শুনলেও অন্য কেউ শোনেনি বা দেখেননি এমন কথা বলার অধিকার অবিশ্যি আমার নেই। তাই, এ-ব্যাপারে কারো সঙ্গে আমি তর্ক জুড়ে দেবো না। কারণ আমিও তো আমার একান্ত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে সেই বালক বয়সেই এমন অনেক ব্যতিক্রমী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, সেগুলোকে কিছুতেই বাঞ্ছিত বা স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া যায় না।

এক গৃহস্থের গোরু আরেক গৃহস্থের ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলেছে, কিংবা এ-বাড়ির একটি নাবালক ছেলে ও-বাড়ির আরেকটি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে বাপ-মা তুলে গাল দিয়েছে, কিংবা এ-গাঁয়ের একটি কিশোরীকে জলের ঘাটে একলা পেয়ে ও-গাঁয়ের একটি উঠতি বয়সের ছোকরা ওর উদ্দেশ্যে কিছু আদিরসাত্মক বাক্য উচ্চারণ করেছে বা গানের কলিতে সুর ভেজেছে—এমন তো গৈ গেরামে হরহামেশাই হয়ে থাকে। এসব নিয়ে 'ঘোলা জলের ডোবা'র মতো নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে যে তরঙ্গ জাগে তার অভিঘাতে কমেডি ও ট্রাজেডি দুই-ই সৃষ্টি হয়। তবে এতোকাল পর্যন্ত এসবের কোনো কিছুতেই সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া লাগেনি। কিন্তু এখন সব কিছুই হয়ে গেলো সাম্প্রদায়িক। গরু ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে, সেটা বড়ো কথা নয়, আসল বিবেচ্য হয়ে উঠলো কার গোরু, আর কার ক্ষেত। গোরুর মালিক আর ক্ষেতের মালিকের মধ্যে কে হিন্দু আর কে মুসলমান। হরমুজ আলীর গোরু মনীন্দ্র দাসের ক্ষেতের কচি চারাগুলো খেয়ে ফেলেছে, তো কী হয়েছে? গোরু তো অবলা প্রাণী, সে যেখানে খাবার পাবে

সেখানেই খাবে, মনীন্দ্র তার ক্ষেত পাহারা দিয়ে রাখে না কেন? কিন্তু মনীন্দ্রর গোরু যদি যায় হরমুজের ক্ষেতে? তা হবে কেন? বেটা মালাউন তো ইচ্ছে করেই তার গোরুটাকে হরমুজের ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। এ নিয়েই মনীন্দ্রর ওপর চলবে হম্বিতম্বি, আর বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে যে, এ-দেশটা এখন পাকিস্তান, মণীন্দ্রদের তাদের নিজের দেশ হিন্দুস্থানে চলে যেতে হবে। অবোধ বালকদের ঝগড়াঝাটি মারপিটও এখন আর আগের মতো ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের ধারক নয়; বালকরা তাদের অতি বুদ্ধিমান অভিভাবকদের মুখ থেকে শুনে শুনে নানা সাম্প্রদায়িক বুলি রপ্ত করে নিয়েছে, আপন আপন সম্প্রদায়-পরিচয় সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সেই সচেতনতার অস্ত্রই তারা সময়ে-অসময়ে প্রয়োগ করে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমবয়সীদের উপর। সে-অস্ত্রের ঘা এসে লাগে তাদের অভিভাবকদের মনেও, এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড উত্তেজনার এবং সে-উত্তেজনায় পাকিস্তান-সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য বড়ো বিশ্রী রকমে প্রকট হয়ে পড়ে। স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি স্পর্শকতার হয়ে দেখা দেয় মেয়েদের নিয়ে ঘটনাগুলো। হিন্দু বাড়ির বৌঝিদের জলের ঘাটে যাওয়া তো বন্ধই, বাড়িতেও চলাফেরা করা দুষ্কর। এ রকম ম্যালা ঘটনা ও রটনার কথা নিয়ে হাতিল গাঁয়ের হিন্দুরা আসে আমার মাসিমার শ্বশুর দীনবন্ধু দেবের কাছে। দীনবন্ধু দেব ছোট ভাই দিগিন্দ্র দেবের মতো নামকরা ব্যায়ামবীর না হলেও শারীরিক শক্তিসামর্থ্যে মোটেই খাটো ছিলেন না। তাঁর যৌবনকালীন দুর্ধর্ষতার অনেক গল্প গাঁয়ের লোকদের মুখস্থ। কিন্তু বৃদ্ধ দীনবন্ধুর অন্য রূপ। তিনি এখন সাধক বৈষ্ণব। গলায় কণ্ঠী, কপালে তিলক, মুখে সর্বদা 'রাধেকৃষ্ণ' বোল। যে যে-কথাই বলতে আসুক তাঁর কাছে, সব কথাতেই তাঁর এক রকমের জবাব।

—"আরে, সবই হলো গিয়ে লীলাময়ের লীলা। তুমি আমি তো তাঁর হাতের পুতুল মাত্র।...পৃথিবী পাপে ছেয়ে গেছে। পাপের ভরা পূর্ণ হলেই নারায়ণ পৃথিবীতে নেমে আসবেন। নৃসিংহ রূপ ধরে তিনি আসেননি অত্যাচারী দানব হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে? রামরূপে রাবণকে আর শ্রীকৃষ্ণ রূপে বধ করেননি কংসকে, জরাসন্ধকে? তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ, তিনি অগতির গতি, তিনিই দুর্বলের একমাত্র ভরসা"—এসব কথা বলেই বারবার যুক্তকর কপালে ঠেকাতেন।

কিন্তু সব কিছুকেই লীলাময়ের লীলা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, কিংবা অগতির গতির ওপর ভরসা রেখে সব দুর্গতিকে তুচ্ছ করা—গাঁয়ের মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। তারা নিজেরাই বর্তমানের বাস্তব ও ভবিষ্যতের কল্পিত দুর্গতির হাত থেকে রেহাই পাবার পথ খুঁজতে লাগলো। সে পথ তো আপাতত একটাই—মুসলমানের দেশ পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে পাড়ি দেয়া।

পাকিস্তানে থাকতে চাইলে মুসলমান হয়েই থাকতে হবে, হিন্দুদের মনে এমন একটা ধারণা তখনকার পল্লীর কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখেও জন্মে গিয়েছিল। হাতিলেই সে সময় একদিন একটা যাত্রাপালার অভিনয় দেখেছিলাম। কী এক বাদশাহর নামে পালাটির নাম। তার কাহিনীটা আজ আর স্মরণ করতে পারবো না। তবে এটুকু মনে আছে যে, মুসলমান বাদশাহর সঙ্গে হিন্দুরাজার ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজা পরাস্ত হলো এবং তারপর রাজা তার রাজ্যের সব প্রজাদের নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো—এই ছিল সে পালার নির্যাস।

গাঁয়ের মানুষ যে পালাগান এখানে পরিবেশন করলো, তার সঙ্গে সনাতন বাংলার লোকসংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যকে কিছুতেই মেলানো যায় না। পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণাই

এ-রকম বিকৃতি ঢেলে দিয়েছে আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির স্বচ্ছ প্রবাহের মধ্যেও। লোক কবি ইউনুস আলীরা যে-সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যকে অম্লান রাখতে চাইছিলেন, তারই পাশাপাশি চলছিল সে-সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িক বিকৃতি ঘটানোর একটা অশুভ প্রয়াস। তবে পরিণত বয়সে ভেবে দেখেছি যে, পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা থেকে (কিংবা তারও কিছুকাল পূর্ব থেকে) বাঙালির লোকায়ত সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক ভাবনা দিয়ে বিকৃত ও কলুষিত করে রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলার যে অপচেষ্টা চালানো হয়েছিলো সেটি সফল হয়নি। সফল হলে বাঙালি জাতি তার মাতৃভূমিতে পাকিস্তানের কবর রচনা করতে পারতো না। আবার সে-সঙ্গে মনে এ-রকম প্রশ্নও জাগে : পাকিস্তানপন্থীরা যদি বাঙালির সংস্কৃতিতে তাদের ভাবধারার অনুপ্রবেশ একেবারেই না ঘটাতে পারতো, তবে মরে যাওয়ার পর ভূত হয়ে আবির্ভূত পাকিস্তান এতো শক্তি কোথায় পায়? চিরকালের মৌলবাদ-বিরোধী বাঙালির একটা বড়ো অংশের মধ্যে মৌলবাদ আছর করে কিভাবে?

গান্ধী হত্যার অভিনব প্রতিক্রিয়া

হাতিল গাঁয়ে হঠাৎ একদিন খবর এসে গেলো : মহাত্মা গান্ধী মারা গেছেন। না, মারা যাননি। তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে।

এমন একটা মানুষকে কে মেরে ফেলবে? মানুষ যাঁকে সম্মান দেয়, তাকে যে মেরে ফেলতে পারে সে কেমন মানুষ?

সেই ১৯৪৮ সালে গাঁয়ে গঞ্জে দূরদূরান্তের খবর মানুষ পেতো বটে, কিন্তু খুব সহজে সে সব তাদের কাছে পৌছে যেতো না। টেলিভিশনের তো তখন নামই শোনা যায়নি, গাঁয়ের মানুষের কাছে রেডিয়োও সহজলভ্য ছিল না। মফস্বল সংস্করণের সংবাদপত্রও পৌছাতো অনেক বাসি হয়ে। অনেক গ্রামেই সংবাদপত্রের গ্রাহক হবার মতো কোনো লোকও ছিল না।

এ-রকম অবস্থায় জল্পনা-কল্পনা আর গুজবের হাত-পা গজানোটাই ছিল স্বাভাবিক। গান্ধীজীর মৃত্যুর খবরটা নিয়েও তেমনটিই ঘটেছিল। খবরটি কে কোথা থেকে গাঁয়ে নিয়ে গিয়েছিল জানি না। তবে সেদিন আমার মাসিমার শ্বশুর দীনবন্ধু দেবের বৈঠকখানায় যে অনেক উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত মানুষের মেলা বসেছিল, সে-কথা আজও মনে আছে। মেলাটা যেহেতু ছিল হিন্দুদের, তাই সেদিনকার সদ্যোজাত পাকিস্তানী ভাবধারার প্রতিক্রিয়া-থেকে-সৃষ্ট অসুস্থ হিন্দুয়ানী ভাবনারই অবাধ প্রকাশ ঘটছিল সেখানে।

—'গান্ধীকে আর কে মারতে পারে মুসলমান ছাড়া? গান্ধী তো হিন্দুর দেবতা, এ যুগে বিষ্ণুর অবতার। সেই অবতারের ওপর কোনো হিন্দু কি হাত তুলতে পারে?'

—'মোটেই না। হিন্দু মারতে যাবে কেন গান্ধীকে? মেরেছে মুসলমানেই।'

—'কিন্তু হিন্দুস্থানের বুকে দাঁড়িয়ে গান্ধীর মতো হিন্দু নেতার বুকে গুলী চালাবে এমন সাহস মুসলমান পাবে কী করে?'

—'ওদের সাহসের কোনো সীমা-পরিসীমা আছে না-কি? ওরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।...তবে এখন বুঝবে ব্যাটারা কতো ধানে কতো চাল। গান্ধীকে মেরেছে ওরা। এখন ওদেরকে হিন্দুস্থানের হিন্দুরা ছেড়ে দেবে মনে করেছো? হিন্দুস্থানের সব মুসলমান কচুকাটা হবে এবার।'

হিন্দুস্থানের মুসলমান কচুকাটা হলে যে পাকিস্তানের হিন্দুদের উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই—এ-কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মতো লোকেরও অভাব ছিল না দীনবন্ধু দেবের বৈঠকখানায়।

—'হিন্দুস্থানে মুসলমানদের মারলে আমাদের কি দশা হবে ভেবে দেখেছো? এদেশের একটা হিন্দু প্রাণে বাঁচবে বলে মনে করেছো?'

মুহূর্তের মধ্যে সকলের মুখ কালো হয়ে যায়। হিন্দুস্থানে মুসলমান হত্যার কাল্পনিক চিত্র এতোক্ষণ তাদের বুঁদ করে রেখেছিল। এবার হঠাৎ যেন তারা বাস্তবের জগতে ফিরে এলো। তাই তো, গান্ধীকে যদি মুসলমানরাই মেরে থাকে, আর তার ফলে হিন্দুস্থানে যদি মুসলমান হত্যা শুরুই হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো পাকিস্তানের কোনো হিন্দুই মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। কে জানে, এতাক্ষণে শহরে-বন্দরে হিন্দু-কাটার ধুম পড়ে গেছে কি-না!

প্রথমে কথা শুরু হয়েছিল গান্ধী হত্যা নিয়ে। সকলের কথায় ছিল বেদনার সুর। গান্ধীর মতো একজন মহামানবের বিয়োগজনিত বেদনা। এরপর এ-মুখে, ও-মুখে লাফাতে লাফাতে কথা চলে গেলো হিন্দুস্থানে মুসলমান-হত্যার কল্পনায়। সে-কল্পনা দীনবন্ধু দেবের বৈঠকখানায় সমবেত হাতিল গাঁয়ের পাকিস্তানী হিন্দুদের মুখে ছড়িয়ে দিল এক বর্বর উল্লাস। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই উল্লসিত মুখগুলো মলিন হয়ে গেলো ভয়ের কালো ছায়ায়। উল্লাসের মতো ভয়টাও দেখা দিয়েছিল কাল্পনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। পাকিস্তানে হিন্দুহত্যা শুরু হওয়ার কল্পনাটাই যেন বাস্তবের চেয়েও বেশি ভয়ংকর রূপ ধরে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ দীনবন্ধু দেব অভয়মন্ত্র শোনান। সেই একই রেকর্ড—সবই লীলাময়ের লীলা, ...অগতির গতি নারায়ণই ভরসা...পৃথিবীর পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে এসেছে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে, নিহত গান্ধীর কথা মনে করে বৃদ্ধ খুবই বেদনাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর যৌবনকালের স্মৃতিচারণ করতে করতে গান্ধীর কথা বলতে থাকেন অনর্গল উচ্ছাসে। সেই স্বদেশী যুগে গান্ধীর ডাকে গাঁয়ে গঞ্জেও কেমন সূতা কাটার ধুম পড়ে গিয়েছিল তার কথা, এক সময়ে ছাত্রদের সব ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা, মদের দোকানে পিকেটিং করার কথা, গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কথা, তারপর এই তো মাত্র বছর দেড়েক আগে দাঙ্গার সময় নোয়াখালিতে গিয়ে হিন্দুদের জানমাল বাঁচিয়েছিলেন তার কথা... । গান্ধী ছাড়া যে দেশ থেকে ইংরেজদের কেউ তাড়াতে পারবে না সে-কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন বার বার। একবার গান্ধী ময়মনসিংহ শহরে এলে এ-গ্রাম থেকে অনেকেই গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে। তিনিও গিয়েছিলেন। গান্ধীর চেহারাটা আজো যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। সেদিন ছিল সোমবার। গান্ধীর মৌন দিবস। সপ্তাহে এই একদিন তিনি কারো সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না, পুরোপুরি মৌন থাকতেন।...সেদিন অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ভীড় ঠেলে তিনিও গান্ধীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জোড়হাত করে নমস্কারের ভঙ্গিতে গান্ধী একটি আসনে বসে ছিলেন। কথা বলছিলেন না, কিন্তু মুখে ছিল স্মিত হাসি। এই হাসিতেই যেন তাঁর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছিল।

'তোমরা তো মনে কর গান্ধী বুঝি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন। না—না। তিনি ছিলেন মহাত্মা, গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী। অহিংসাই ছিল তাঁর পরম ধর্ম। মাছ-মাংস খেতেন না, ছাগলের দুধ আর ফলমূলই ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য। গান্ধী তো এ-যুগের অবতার।' বারবার যুক্তকর কপালে ঠেকাতে থাকেন দীনবন্ধু দেব।

কিন্তু, অবতারকে কোনো মানুষ হত্যা করতে পারে কী ভাবে ক্ষীণকণ্ঠে একজন এমন প্রশ্ন তুললে দীনবন্ধু দেব ধমকে ওঠেন। অনর্গল শাস্ত্রবাক্য আউড়ে যেতে থাকেন। সে-সব উচ্চাঙ্গের কথা বুঝবার ক্ষমতা আমার ছিল না। যাঁরা সেদিন দীনবন্ধু দেবের বৈঠকখানায় একত্র হয়েছিলেন, তাঁদেরও কারুরই হয়তো ছিল না। একে একে সবাই উঠে গেলেন। দীনবন্ধু দেবও স্নান সেরে পূজার ঘরে ঢুকলেন। আজ অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে পূজার ঘরে কাটালেন। দুপুরে কিছুই খেলেন না। মাসিমাকে বললেন, 'বৌমা, মনটা খুবই বিষণ্ন হয়ে আছে। আজকে কোনো খাবারই মুখে তুলতে পারবো না। মহাত্মার মতো এমন একটা লোককে কোন পাষণ্ড না জানি হত্যা করলো। যাই, গাবতলির বাজার থেকে সঠিক খবরটা শুনে আসি গিয়ে।'

রাত্রে বাজার থেকে ফিরে কিন্তু তাঁর একবারেই ভিন্ন রূপ।

গাবতলি বাজারে আমার ছোট মামার দোকান—'ড্রাগ হাউজ'। দোকানটিতে এসে বসেন এলাকার গ্রাম্য ডাক্তাররা। 'পাস করা ডাক্তার' না হলেও গ্রামের লোকের রোগ ব্যাধিতে এরাই ভরসা। আরো আসেন স্থানীয় ইস্কুলের শিক্ষক, কাছারির নায়েব, অবসরপ্রাপ্ত কেরানী এবং এ-রকম আরো নানা ধরনের 'গ্রাম্য এলিট'। এরা সকলে সকালে-বিকালে এখানে আড্ডা দেন, চা খান, পরচর্চা করেন, পত্রিকা পড়েন, রাজনীতি-সমাজনীতির নানা কথা নিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে ওঠেন। সেই ড্রাগ হাউজের আড্ডা থেকেই হয়তো দীনবন্ধু দেব খবর নিয়ে এসেছেন যে গান্ধীকে কোনো মুসলমান মারেনি, তাঁর হত্যাকারী একজন ধার্মিক হিন্দু, নাম—নাথুরাম বিনায়ক গডসে। এই তথ্যটি এবং গাবতলি বাজারে শোনা এ-তথ্যে হিন্দুবাদী বিশ্লেষণই সম্ভবত বৃদ্ধের সব চিন্তা-চেতনাকে উল্টিয়ে দিয়েছে। দিনের বেলা যে মানুষটি গান্ধীর শোকে অনাহারে থেকেছেন, রাত্রে সেই মানুষটিই কিনা নিহত গান্ধীর সম্পর্কের নানা কঠোর ও অশালীন বাক্য প্রয়োগ করে চললেন।

—"ব্যাটা 'অহিংসা অহিংসা' করতো, আসলে ওর ভেতরে ছিল চোরা হিংসা। সবচেয়ে বেশি হিংসা করতো সে বাঙালিদেরকে। নেতাজী সুভাষ বসুকে তো ও-ব্যাটাই রাজনীতিতে দাবিয়ে রেখেছে। নেতাজী যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে এদেশে ঢুকতে পারতেন তাহলে এদেশ সত্যিকারের স্বাধীন হতো, দেশ ভাগ হতে পারতো না, পাকিস্তানের জন্মই হতো না। সুভাষ বসু বাঙালি তো, বাঙালির নেতৃত্ব কি ঐ ছাতুখোর পশ্চিমাদের সহ্য হতে পারে? বাঙালি যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, তার জন্যই বাংলাকে ওরা ভাগ করে ফেললো।...গান্ধী ব্যাটা হিন্দুয়ানীর ভড়ং দেখাতো, তলে তলে ছিল মুসলমানদের দালাল। ওর একটা ছেলে মুসলমান হয়ে যায়নি? মুসলমানদের জন্য তো ওর দরদ একেবারে উপচে পড়তো। দেশ হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে ভাগ হয়ে গেছে, তারপর তুই ব্যাটা হিন্দু, তোর এতো পাকিস্তান দরদ কেন? বলে কিনা, পাকিস্তানকে তার ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। তার জন্য সে অনশন করে।...যতো সব ভণ্ডামি।...নাথুরাম ওকে মেরে ফেলে সাচ্চা হিন্দুর মতো কাজ করেছে। সাবাস ব্যাটা, বাপের ব্যাটা। আরো আগেই হিন্দুকুলের কলঙ্ক ওই গান্ধীকে শেষ করে দেয়া উচিত ছিল। তাহলে আজ হিন্দুদের এমন দুর্দশা হতো না।"

বৃদ্ধ দীনবন্ধু দেব যেন তাঁর যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে গেছেন। এ-ঘর থেকে লাফ দিয়ে ও-ঘরে যাচ্ছেন, উঠোনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারি করছেন, আর অনর্গল মৃত গান্ধীর উদ্দেশে গালাগাল বর্ষণ করে চলছেন। গান্ধীর বুকে গুলি করেছে যে যুবক, সেই নাথুরামকে সামনে পেলে তো বোধ হয় তিনি মাথায় তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করে দিতেন।

তাঁর বৌ-ঝি-নাতি-নাতনীরা তো বুড়োর এই চেহারা দেখে একেবারে থ'।

তাঁর এক নাতনী ঝর্না বোধ হয় ঠাকুরদার দুপুরের আচরণের সঙ্গে রাত্রের আচরণকে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। রান্নাঘরে বসে সে প্রশ্ন করতে চাইছিল, "আচ্ছা ঠাকুরদা, তুমি যে দুপুর বেলায়..."

ঝর্নার মা, অর্থাৎ আমার মাসিমা, তাড়াতাড়ি কন্যার মুখ চাপা দিলেন। তিনি জানেন, এ-সময় এ-রকম প্রশ্ন শুনলে তাঁর বৈষ্ণব শ্বশুরের বৈষ্ণবীয় বিনয় একটুও অবশিষ্ট থাকবে না। শ্বশুরের প্রাক-বৈষ্ণব জীবনের দুর্ধর্ষ রূপটি বোধ হয় পুত্রবধূর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

শুধু দীনবন্ধু দেব নয়, গান্ধী সম্পর্কে এ রকম অদ্ভুত স্ব-বিরোধী অবস্থান তখনকার অনেক হিন্দুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। গান্ধীজী ধার্মিক, মহাত্মা, নিরামিষাশী, সংযমী, গোহত্যাবিরোধী, একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। কাজেই গোঁড়া হিন্দুর তাঁর প্রতি সীমাহীন ভক্তি থাকবে, সে তো খুবই স্বাভাবিক। আর যাঁর প্রতি ভক্তি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তিনিই হিন্দুর দেবতা অথবা দেবতার অবতার হয়ে যান। গান্ধীও অনেকের দৃষ্টিতে তাই হয়েছিলেন।

আবার, গান্ধী জাত মানেন না, মেথর-চামারদের হাতের ছোঁয়া খাবার খান, ওদের নাম দেন 'হরিজন'; এবং তাঁর মতে, অস্পৃশ্যতা হচ্ছে মহাপাপ, এমনকি বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্প হলে তাকে বলেন, হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা রূপ মহাপাপের ফল। গান্ধীর এসব আচরণ ও মতামত গোঁড়া হিন্দুরা মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে, এ সবই হিন্দুত্বের বরখেলাপ। আর সে কারণেই গান্ধীর প্রতি তাঁদের বিরূপতা।

আমার দিদিমার মধ্যেও এ রকম বিরূপতা দেখেছি। ছেচল্লিশ সনে নোয়াখালিতে দাঙ্গার সময় নাকি অনেক হিন্দুকে মুসলমান বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। হিন্দুর মুখে কোনো রকমে একটু গোমাংস ছুঁইয়ে দিতে পারলেই যে হিন্দুর জাত যায়, জাত হারিয়ে মুসলমান হয়ে যায়—আমার দিদিমার মতো অনেকের ভেতরই এমন ধারণা বদ্ধমূল। (এমনকি ঘ্রাণে পর্যন্ত যে অর্ধভোজন হয়, এবং এ-রকম গোমাংসের গন্ধ নাকে যাওয়ার ফলেই যে 'পীরালী' ব্রাহ্মণরা হিন্দুসমাজ থেকে পতিত বা খারিজ হয়ে গিয়েছিল—এ-ধরনের গল্পও তো আমরা শুনেছি)। একবার মুসলমান হয়ে গেলে তার আর হিন্দু হওয়ার কোনোই উপায় থাকে না। অথচ, নোয়াখালিতে গান্ধী এসে করলেন কি, বিপদে-পড়ে-মুসলমান-হয়ে-যাওয়া সব হিন্দুকে রাম নাম জপ করিয়ে আবার হিন্দু করে নিলেন। আমার দিদিমা বলেন, 'এটা হচ্ছে গান্ধীর একটা ভড়ং। একবার কেউ মুসলমান হলে আবার সে হিন্দু হয় কী করে? জাত চলে গেলে কি আর জাত ফিরে পাওয়া যায়? যতোই হিন্দুয়ানী করুক, গান্ধী তো আসলে একটা ম্লেচ্ছ।'

দিদিমার এসব কথার জবাবে আমার প্রফুল্লদা তখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের কথা বলতো, আর্য সমাজের কথা বলতো।

—'কেন, গান্ধী তো নোয়াখালিতে ক'জন মুসলমান-হয়ে-যাওয়া হিন্দুকে আবার হিন্দু বানালেন মাত্র এই সেদিন। এর অনেক আগেই তো স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আর আর্য সমাজের সাধুরা এ-কাজটি শুরু করেছিলেন। এতোদিন তো হিন্দুরা কেবল নানা ছুঁতানাতা ধরে নিজেদের ঘরের মানুষকে বাইরে বের করে দিয়েছে, আর মুসলমানরা বাইরের সকলকে তাদের ঘরে ডেকে নিয়ে গেছে। এখন গান্ধী যদি ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে থাকেন তো দোষটা কী হলো তাতে?'

প্রফুল্লদার কোনো যুক্তিই দিদিমা মেনে নিতে পারেন না। এ-রকম অনেকেই পারেন না। প্রচলিত হিন্দুয়ানীর প্রবল সংস্কারের ফলেই গান্ধীর প্রতি তাদের বিরূপতা দূর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার গান্ধী যে মহাত্মা, গো-দেবতার প্রতি যে তাঁর অচলা ভক্তি, হিন্দুর মান-ইজ্জত যে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন, ম্লেচ্ছ ইংরেজদের যে তিনি আচ্ছা করে প্যাঁদানি দিয়েছেন—এসব কথা মনে করে তো সকল হিন্দুরই বুক ফুলে ওঠে, গান্ধী মহারাজের প্রতি ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে। অর্থাৎ একই সঙ্গে গ্রাম বাংলার সাধারণ হিন্দুদের মনে গান্ধী সম্পর্কে দুই বিপরীত ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। তবে পাল্লাটা কখনো এদিকে বেশি ভারি হয়ে ওঠে, কখনো ও-দিকে।

অবিশ্যি এ সব হচ্ছে গড়পড়তা সাধারণ গ্রাম্য হিন্দুদের কথা। যারা একটু বেশি লেখাপড়া জানে, পত্র-পত্রিকা পড়ে, সভায় গিয়ে নেতাদের বক্তৃতা টক্তৃতা শোনে, গ্রামের সেসব বিশিষ্ট জনদের চিন্তা-চেতনা অন্য রকম। কট্টর কংগ্রেসপন্থি, ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থি, হিন্দু মহাসভাপন্থি, কম্যুনিস্ট পন্থী—এ-রকম নানা ধরনের বিভাজন তাদের মধ্যে। নিজের নিজের দলীয় অবস্থান থেকে তারা গান্ধীর সমর্থন বা বিরোধিতা বা সমালোচনা করে। কিন্তু গান্ধী প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারে না কেউই। বিশিষ্ট জনদের প্রভাব সাধারণ জনদের ওপরও পড়ে। সে-প্রভাবের দরুণ সাধারণের মধ্যে যে টানাপোড়েন দেখা দেয়, তারই ফলে বোধ হয় দীনবন্ধু দেবের সেদিনকার দুপুর বেলা ও রাত্রি বেলার গান্ধী মূল্যায়নের মধ্যে অমন বৈপরীত্য ফুটে ওঠে।

যাই হোক, হাতিল গাঁয়ে সেদিন আমি, বারো বছর বয়সী এক বালক, গান্ধী হত্যার যে-রকম প্রতিক্রিয়া দেখেছিলাম, পরে শুনেছি, সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের শহর-বন্দরে প্রতিক্রিয়াটি সে-রকম ছিল না। ময়মনসিংহ শহরে খবরটি পৌঁছা মাত্র সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অফিস-আদালত, ইস্কুল-কলেজ সব ছুটি হয়ে গিয়েছিল। মৌন মিছিলে মানুষের ঢল নেমেছিল। এসব করার জন্য কোনো সরকারি ঘোষণা লাগেনি, কোনো রাজনৈতিক সংগঠনকে মাইক নিয়ে রাস্তায় নামতে হয়নি। এক স্বতঃস্ফূর্ত শোকাবেগ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম লীগ-হিন্দু মহাসভা-কংগ্রেস-ফরোয়ার্ড ব্লক-কম্যুনিস্ট সবাইকে এক মোহনায় এনে মিলিয়ে দিয়েছিল।

পাকিস্তানের জন্মের আগে : হিন্দুদের কংগ্রেস-ভাবনা

'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কি জয়' 'মওলানা আবুল কালাম আজাদ কি জয়' 'জওহরলাল নেহেরু কি জয়'—এসব স্লোগান দিয়ে আমরা শান্ত পল্লীর পথ মুখরিত করে তুলতাম পাকিস্তানের জন্মের আগের বছর, ১৯৪৬ এর সাধারণ নির্বাচনের সময়। 'নির্বাচন'—এই ভারি বাংলা শব্দটা তখনো চালু হয়নি; শিক্ষিত লোকেরা বলতো 'ইলেকশান' আর বেশির ভাগ মানুষের কাছে এর নাম ভোটাভুটি'। এই 'ভোটাভুটিতে হিন্দু-মুসলমানের এক সঙ্গে যোগ দেয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিধান ছিল : হিন্দুরা দেবে হিন্দু প্রার্থীকে ভোট, মুসলমানরা মুসলমানকে। এই স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে হিন্দুদেরও ভোট ছিল দু'ভাগে বিভক্ত—বর্ণ হিন্দু আর তফসিলি হিন্দু। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য ও নবশাখ সম্প্রদায়ের মানুষ, এবং এ-রকম আর যারা নিজেদের 'ভদ্রলোক' মনে করতো, তারাই হলো বর্ণ হিন্দু। আর তফসিলী হিন্দু হলো তারা, যাদের ছোঁয়া লাগলে বর্ণ হিন্দুদের জাত যায়। ধোপা, মালী, নমশূদ্র, পাটনী, জেলে মুচি, ডোম, বাগদী—এ রকম সব শূদ্র আর অন্ত্যজ-নামে-পরিচিত মানুষরা, যারা সমাজে সব দিক

দিয়েই পিছিয়ে-পড়ার দলে, তারাই বিশেষ তফসিলভুক্ত (অর্থাৎ তালিকাভুক্ত) হয়ে 'তফসিলি হিন্দু' নাম পায়। তবে বাংলা বা ফারসি 'তফসিলি'র চেয়ে ইংরেজি 'সিডিউলড কাস্ট' (Scheduled Caste) কথাটাই বেশি চালু ছিল। কাস্ট হিন্দু আর সিডিউলড কাস্ট হিন্দু—নির্বাচনে এই দুই গোষ্ঠীর মানুষের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল সে-সময়কার নির্বাচন-পদ্ধতিতে। 'তফসিলি ফেডারেশন' নামে একটি সংগঠনও ছিল সিডিউলড কাস্ট হিন্দুদের। কিন্তু বর্ণ হিন্দুই হোক আর তফসিলি হিন্দুই হোক, হিন্দুদের রাজনীতিতে তখন কংগ্রেস দলেরই জয়জয়কার। অন্তত আমাদের এলাকায় তো তাই দেখেছি।

রামপুর বাজারে এসে কংগ্রেস নেতারা বক্তৃতা করেছেন। মাঝারি স্তরের মহকুমা পর্যায়ের নেতা। সে-নেতাদের কারো নাম আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, তাঁদের মাথায় থাকতো 'গান্ধী টুপি'। এই টুপিটা আমার খুবই কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছিল। মুসলমান মৌলবী সাহেবরা টুপি পরেন দেখেছি, তবে তাঁদের টুপির আকৃতি গোল। গান্ধী টুপির লম্বাকৃতিটাই মৌলবীদের টুপি থেকে তাকে পৃথক করেছে। শুধু মৌলবীদের থেকেই বা বলি কেন, গান্ধী টুপি তো সকল মুসলমানের থেকেই হিন্দুদের পার্থক্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ছেচল্লিশ সনের আগে তো গ্রামে কোনো টুপিওয়ালা হিন্দু দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এবার হিন্দুর মাথায় টুপি উঠলো, তবে সে টুপিতেও হিন্দুত্বের চিহ্ন স্পষ্ট করে আঁকা।

কংগ্রেস নেতারা অবশ্য হিন্দুত্বের কথা বলতেন না। মুসলমান-বিরোধী কোনো কথাও তাঁদের মুখে শুনিনি। মহাত্মাজী নেতাজী পণ্ডিতজী সকলেই যে হিন্দু-মুসলমান সকলের নেতা, মুসলমান যাঁকে আল্লাহ্ আর হিন্দু ভগবান বলে যাঁকে তাঁর চোখে সকলেই যে সমান, হিন্দু আর মুসলমান যে একই মায়ের পেটের দুই ভাইয়ের মতো, সাত-সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে আসা ইংরেজরা যে এদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকলের সমান দুশমন—এসব কথাই কংগ্রেস নেতারা সভায় জোর দিয়ে বলতেন। কংগ্রেসের চোখে যে হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ নেই, সে-কথাটা বোঝাবার জন্যই তাঁরা বারবার মওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রসঙ্গ উথাপন করতেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এতো বড়ো একজন মুসলিম শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, তিনি হলেন কংগ্রেসের সভাপতি—মূল নেতা। এরকম একজন শ্রদ্ধেয় মুসলমান যে-দলের নেতা, সে-দল কি কেবল হিন্দুদের দল হতে পারে?

তবে, কংগ্রেসের নেতারা যাই বলুন, আমার কিন্তু সেই ১৯৪৬ সালে—যখন আমার বয়স মাত্র দশ এবং আমি রামপুর ফ্রি বোর্ড প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র—মনে হয়েছিল যে, কংগ্রেস কেবল হিন্দুদেরই পার্টি। কারণ, কংগ্রেসের সভাগুলোতে কোনো মুসলমানকে দেখেছি বলে মনেই পড়ে না। সভার শেষে নির্বাচনী মিছিলে যারা যোগ দিতো, তারাও সবাই হিন্দু যুবক। রামপুরের কামিনী চক্রবর্তীর ছেলে জীবন, মহেন্দ্র চৌধুরীর ছেলে ফণি ও রণি এবং বুধপাশা, নন্দীগ্রাম ও আশুজিয়া গ্রামের এ-রকম বেশ কিছু হিন্দু যুবক কংগ্রেসের এসব মিছিল সংগঠিত করতো, আর রামপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস থ্রি-ফোরের ছাত্র অনিল, সুশীল, ননীগোপাল, প্রাণেশরা চিৎকার করে স্লোগান ধরতো। এ-ব্যাপারে আমার তো ছিল সীমাহীন উৎসাহ। কিন্তু আমারই অন্তরঙ্গ সহপাঠী হোসেন আলী কোনোদিন কংগ্রেসের সভাতেও যায়নি, মিছিলেও যায়নি। যায়নি গফুর, হামিদ, হাশিমউদ্দিন, চান মিয়া, সুরুজ আলী, রশিদ—এ রকম কেউই। তাহলে কংগ্রেসকে হিন্দুদের পার্টি ছাড়া আর কী বলি?

আসলে কংগ্রেসের কথাই বলি বা অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের কথাই বলি, গৈ গেরামের মানুষের কাছে এ-সবের কথা তো ইলেকশনকে কেন্দ্র করেই পৌঁছেছিল। ইলেকশন

হচ্ছিল হিন্দু মুসলমানের আলাদা আলাদা। হিন্দুদের থেকে আলাদা হয়ে খাস করে মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে মুসলিম লীগ মাঠে নেমেছে। মুসলিম লীগের ক্যান্ডিডেট গেছে মুসলমানের কাছে ভোট চাইতে, কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট গেছে হিন্দুর কাছে। আমার মতো দশ বছরের ছেলের ভোট না থাকলেও, আমিতো হিন্দু; আমার বাপ-ঠাকুরদা ভোট দেবেন কংগ্রেসকে, কংগ্রেসের কথা তাঁদের মুখে মুখে, তাঁদের সঙ্গে আমিও কংগ্রেসের সভায় যাই। আমার বয়স অল্প বলে আমার উৎসাহ তো তাঁদের থেকে বেশি হবেই। দৌড় ঝাঁপ খেলাধুলা করতে গুরুজনরা আমাকে সব সময় নিরুৎসাহিত করলেও সভা-মিছিলের ব্যাপারে করতেন তার উল্টোটা। সেই ছেলেবেলায় সভা আর মিছিল আমার কাছে খেলাধুলার বিকল্প হয়ে দেখা দিয়েছিল, এবং সে-বিকল্প ছিল খেলাধুলার চেয়ে অনেক বেশি উদ্দীপক ও আনন্দদায়ক। বেশ মনে আছে, ছেচল্লিশের ইলেকশনের আগে ও পরে কয়েকটা মাস এক নতুন ধরনের আনন্দে একেবারে টৈ টুম্বুর হয়ে ছিলাম। কংগ্রেসের স্লোগানগুলো তো আমার কাছে গানের চেয়েও বেশি চিত্তরঞ্জক হয়ে উঠেছিল। গান্ধী, নেহেরু, আজাদ, সুভাষের নামে জয় উচ্চারণ করার পাশাপাশি আর যে স্লোগানগুলোর সঙ্গে আমরা গলা মেলাতাম সেগুলো হলো—বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ্, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক এবং ইনকিলাব জিন্দাবাদ। শেষের স্লোগানটা ছিল কম্যুনিস্টদেরও। আসলে এটি নাকি আদিতে কম্যুনিস্টদেরই ছিল, পরে কংগ্রেসীরাও তাকে গলায় তুলে নেয়। 'জ্ঞানের আলো' নামে একটি সাধারণ জ্ঞানের বই আমাদের পাঠ্য ছিল। প্রশ্নোত্তরের ধাঁচে তাতে লেখা ছিল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ কথাটার অর্থ কি? উত্তর—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।' এতেও আমার কাছে অর্থটা খুবই একটা পরিষ্কার হয়নি। 'ইনকিলাব' কিংবা 'বিপ্লব' এ দুয়ের কোনোটারই সঠিক তাৎপর্য সে বয়সে আমার চৈতন্যে ধরা পড়েনি। তবু এই স্লোগানটা উচ্চারণ করতে খুব জোশ পেতাম। 'জয়হিন্দ্' শব্দটা তো কয়েকমাস ধরে আমাদের সার্বক্ষণিক বুলিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আমরা বালকরা (অবশ্যই হিন্দু বালকরা) পরস্পরকে 'জয়হিন্দ্' বলে প্রীতি সম্ভাষণ করতাম। আমাদের শেখানো হয়েছিল চিঠির শিরোভাগে লিখতে হয়—শ্রীশ্রীদুর্গা কিংবা শ্রীশ্রী হরি। এখন দুর্গা ও হরির স্থান দখল করলো 'জয়হিন্দ্।'

আমাদের গাঁয়ের পূবদিকে উগরাকান্দা বাজারে চৈত্রমাসে বারুণী মেলা বসতো। এখনো হয়তো বসে। জানি না, এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে সে-মেলার আকর্ষণ কতোখানি। তবে আমি এখনো, এই বুড়ো বয়সেও, চোখ বুঁজলেই বারুণীর মেলার উত্তেজনায় আট-দশ বছরের বালকটি হয়ে যাই। একদিনের মেলা, কিন্তু সারা বছর তার আমেজ লেগে থাকতো আমাদের মনে। মেলায় জিলিপি ভাজা হতো, 'কুড়মুড়' ভাজা' আর শোন পাপড়ি বিক্রি হতো, চিনির তৈরি হাতিঘোড়া ও বিন্নি ধানের খৈ পাওয়া যেতো, আমাদের মতো ছেলেদের মুখে সারাক্ষণ টিনের বাঁশী বাজতো, বেলুন ফাটার ফটাস ফটাস শব্দ হতো, ছেলেমেয়েরা নাগরদোলায় চড়ে মহানন্দে দোল খেতো, ছোট ছোট মেয়েরা আল্লাদী পুতুল কিনতো, ম্যাজিকওয়ালা ম্যাজিক দেখাতো, এক আনার টিকেটে লটারী খেলা হতো—এক দিনের জন্য যেন আমাদের কাছে স্বর্গ নেমে আসতো। ছেচল্লিশ সালে বারুণীর মেলায় আরেকটা নতুন জিনিস এসে যুক্ত হলো। গান্ধী, সুভাষ, নেহেরুর ছবিওয়ালা 'ব্যাজ'। একটা ব্যাজের দাম মাত্র দু'আনা। সুভাষের ছবিওয়ালা ব্যাজই হয়েছিল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বালক-কিশোর-যুবকদের বুকে বুকে শোভা পেতো এই ব্যাজ। ব্যাজ বুকে লাগিয়ে সবাই যেন নিজেকে ভাবতো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এক এক জন সৈনিক।

'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'—এই নামটা আমাদের বুকে কী যে রোমাঞ্চ জাগাতো। আমরা ভাবতাম : আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এই দেশে এসে পৌছলো বলে, এ ফৌজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা এদেশ থেকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাবে, আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হবেন এদেশের রাজা! হ্যাঁ গাঁয়ের লোক তা-ই বলতো, রাজা হবার কথাই বলতো। সুভাষ বসু রাজা হলে দেশের মানুষের আর কোন দুঃখই থাকবে না। এমনকি সে-সময় বাজারে সুভাষ বসুর ছবিওয়ালা এক হাজার টাকার নোটও বিক্রি হতো, দাম মাত্র এক আনা। গাঁয়ের লোক দেদারসে এই নোট কেনা শুরু করেছিল। অনেকেই তারা বিশ্বাস করতো : সুভাষ বসু রাজা হলে এই নোট বাজারে চালু হবে, আজকে এক আনা দিয়ে যে নোট কেনা হলো সেদিন তার দাম হবে এক হাজার টাকা! যারা এমন কথা বিশ্বাস করতো তারা নিশ্চয়ই একান্ত সরলপ্রাণ কিছু মানুষ, কিন্তু এমন সরলপ্রাণ মানুষের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। ১৯৪৫ সনে সুভাষ বসু বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান—এ কথা তো প্রায় কেউই বিশ্বাস করতো না। তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর এক ধরনের অলৌকিকত্ব আরোপ করে তাঁকে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় বসিয়ে দিয়েই অধিকাংশ মানুষ নির্ভরতা জনিত স্বস্তিলাভ করতে চেয়েছিল। গ্রামীণ হিন্দুদের এই মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে চালাক ব্যবসায়ীরাও বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছিল। নেতাজীর নানা ধরনের রঙিন ছবি তারা বাজারে ছেড়েছিল। একটি ছবির নাম ছিল—'ভারতমাতার উপহার।' ভারতমাতার ছবিটি দেবী দুর্গার আদলে আঁকা কিন্তু তাঁর পা শিকলে বাঁধা। সেই ভারতমাতার হাত থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র একটি তরবারি গ্রহণ করছেন, এ-তরবারি দিয়েই তিনি শত্রু নিধন করে ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচন করবেন। অর্থাৎ সুভাষ বসু রক্তমাংসের মানুষ হলেও আস্তে আস্তে অতিমানুষে পরিণত হয়ে যাচ্ছিলেন। অতিমানুষদের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে দেবতাদের, আর দেবতাদের সঙ্গে যার সম্পর্ক তিনি তো দেবতাই হয়ে ওঠেন অনায়াসে। হিন্দুদের মধ্যে এ ভাবেই যুগ যুগ ধরে নতুন নতুন দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, এ প্রক্রিয়াতেই সুভাষ বসুও দেবতা বা প্রায়-দেবতা হয়ে উঠেছেন, দেবতা রূপেই পূজা পেয়ে গেছেন। পাকিস্তানের জন্মের মাত্র মাস ছয়েক আগেও, ১৯৪৭ সালের তেইশ জানুয়ারিতে, সুভাষ চন্দ্রের জন্মদিনে নেত্রকোনা শহরে সুভাষের ছবি সামনে রেখে যে সব অনুষ্ঠান হতে দেখেছি তাতো প্রায় সুভাষ পূজারই মতো।

স্লোগানের পাশাপাশি একটি গানও সেদিন আমাদের উৎসাহ ও প্রবল উত্তেজনার খোরাক যুগিয়েছিল। সেটিও সুভাষের কীর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কওমী সঙ্গীত। আমার গলায় সুরের ছিটেফোটা নেই। যে আমাকে বলা যেতে পারে অসুরের মূর্তিমান অবতার, সেই আমিও সেদিন মনের আনন্দে বায়সকণ্ঠে গেয়েছি—

কদম কদম বাড়ায়ে যা
খুশি কে গীত গা'য়ে যা
.....
চলো দিল্লি পুকারকে
কৌমী নিশান সামহাল কে
লাল কিল্লে গাড় কে
লড়য়ায়ে যা লড়য়ায়ে যা।

ছেচল্লিশের নির্বাচনে কংগ্রেসী বক্তৃতাবাজী

১৯৩৭ সালেও দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনকে উপলক্ষ করেই বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিল। সে-সময় আমার বয়স মাত্র এক বছর। বড়ো হয়ে সে-সময়কার নির্বাচনের খবর বড়োদের মুখে কিছু কিছু শুনেছি, বইয়েও পড়েছি। মনে হয়, ছেচল্লিশের নির্বাচনের মতো এমন জোশ সাঁইত্রিশের নির্বাচনে গ্রাম বাংলায় দেখা যায়নি।

সাঁইত্রিশেও পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার অধীনেই ভোটাভুটি হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ তখনকার নির্বাচনেও প্রধান বিবেচনা হয়ে গিয়েছিল, তবু তখনো মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্রের কথা ওঠেনি, মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়নি। 'কৃষক-প্রজা পার্টিই বরং তখন গ্রাম বাংলার মুসলমানদের স্বপ্নকে ধারণ করেছিল। বাঙালি মুসলমানের প্রাণপ্রিয় নেতা তখনো হক সাহেব (এ, কে, ফজলুল হক) জমিদার-মহাজনের হাত থেকে বাংলার প্রজাকে তিনি মুক্তি দেবেন, কৃষকের দু'বেলা দু'মুঠো ডালভাত খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন, কৃষকের ছেলে যাতে বিনা বেতনে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে তা-ও দেখবেন এই হক সাহেব। তবে জমিদার-মহাজনদের অধিকাংশই যেহেতু হিন্দু, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-খাতক-প্রজা মুসলমান, তাই হক সাহেব মূলত মুসলমানেরই নেতা ছিলেন, কৃষক-প্রজা দলও মুসলমানেরই দল ছিল। তবু সাঁইত্রিশে পাকিস্তানের দাবি উঠে আসেনি বলে, হিন্দু আর মুসলমানের রাজনীতি—পৃথক নির্বাচন সত্ত্বেও—একেবারে আলাদা হয়ে যায়নি। কিন্তু ছেচল্লিশে সব কিছুই অন্য রকম, সব কিছুই আলাদা। হিন্দুদের মধ্যে তখন কংগ্রেস দলের প্রভাব সব চেয়ে বেশি হলেও, আরো অনেক দল-উপদল সে-প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানের তখন একদল—মুসলিম লীগ। অন্য কোনো দল উপদলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা না গেলেও তাদের খুঁজে পেতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগাতে হয়।

ছেচল্লিশে আমাদের নির্বাচনী এলাকায় (তৎকালীন নেত্রকোনা মহকুমার সবগুলো ও কিশোরগঞ্জের আটটি থানা নিয়ে গঠিত) কংগ্রেসের বর্ণহিন্দু প্রার্থী ছিলেন অমূল্য অধিকারী আর তফসিলি প্রার্থী প্রফুল্লচন্দ্র সরকার। অমূল্য অধিকারীর নির্বাচনী প্রতীক ছিল কলস আর প্রফুল্ল সরকারের নৌকা। কংগ্রেসের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি। কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী মণি সিংহ, আর তাঁর প্রতীক গোরুর গাড়ি। প্রতীক শব্দটি অবিশ্য তখন কারো মুখে শুনিনি, কিংবা পোস্টার, লিফলেটেও দেখিনি। চালু ছিল 'মার্কা' কথাটা। টিনের চোঙে মুখ লাগিয়ে একজন বলতো—ভোট দিবেন কিসে? সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারো জন বা আরো বেশি সংখ্যক বালক আকাশ-ফাটানো চিৎকার দিয়ে উঠতাম—'কলস মার্কা বাক্সে' 'নৌকা মার্কা বাক্সে'। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর প্রতীকের পাশে সিল মেরে ভোট দেয়ার নিয়ম তখনো চালু হয়নি। ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর জন্যে আলাদা আলাদা বাক্স থাকতো, আর সেই বাক্সের গায়ে প্রার্থীর প্রতীকটি সাঁটানো থাকতো। এটিকেই বলা হতো মার্কা। হাঁস মার্কা নারকেল তেল বা রাণী মার্কা টিনের মতো ভোটের বাক্সেরও নানা মার্কা। 'মার্কা মারা' কথাটা তো বাংলাভাষার একটি বহুল ব্যবহৃত ইডিয়ম। ইলেকশানে প্রার্থীর মার্কাই প্রার্থীকে আড়াল করে দেয়। ভোটারদের অনেকেই প্রার্থীর নাম পর্যন্ত জানে না, মার্কাটাই তাদের একমাত্র বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়। বরং

অনেক ক্ষেত্রে ইলেকশানের পরেও মার্কাটা একটা স্থায়ী 'প্রতীকী' মর্যাদা পেয়ে যায়। (তখন কিন্তু মার্কার বদলে 'প্রতীক' শব্দটিই ব্যবহার করতে হয়।)

নেতা ও পাতিনেতাদের মুখে কলস মার্কা ও নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার সপক্ষে বক্তৃতা শুনতে শুনতে সব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সভায় বক্তৃতা শুনে এসে আমিও বাড়িতে কিংবা বাড়ির পাশে পুকুর পারের বেলগাছটির নিচে দাঁড়িয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যেতাম। শ্রোতা ছিল আমার ছোট ভাই মতীন্দ্র, এবং আমাদের পাড়ার ক্ষিতীশ, সৌভাগ্য, নীরু, অমূল্য, সুধীর—এসব বালকের দল। সবচেয়ে বেশি উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন আমার বাবা। আসলে, বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমাকে উস্কে দিতেন আমার বাবাই। কোনো সভায় বক্তৃতা শুনে এলেই বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'অমুক বক্তা সভায় কী বললেন?', আমি বক্তার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করলেই তিনি বলতেন, 'না, এভাবে নয়। যেভাবে বক্তৃতা দেয়া হয় ঠিক সেভাবে বলতে হবে।'

বাবা তখন আমাকে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতেন। আমি মহানন্দে বীর বিক্রমে হেঁড়ে গলায় বক্তৃতা করতে থাকতাম। বাবার তখন কী খুশি! সে-খুশিতে যোগ দিতেন মা আর ঠাকুরমাও।

বাবা যে তাঁর এই দশ বছরের ছেলেটিকেই বক্তা বানাবার জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, তার পেছনে বোধ হয় একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। বাবা ছিলেন মিতভাষী এবং সেই মিতভাষিতার কারণ নিহিত ছিল তাঁর জিহ্বার জড়তার মধ্যে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন কিছুটা তোতলা। পরিণত বয়সে সেই তোতলামি যদিও খুব বেশি ছিল না, তবু রাগান্বিত বা আবেগাক্রান্ত হলে তাঁর কথা জড়িয়ে যেতো। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, ছেলেবেলায় এই তোতলামির জন্যে সমবয়সীরা তাঁকে ক্ষেপাতো ও নানা ভাবে হেনস্থা করতো। ঠাকুরমা নাকি বাবার মুখে সীসার বল পুরে রাখতেন এবং ঠাকুরমার বিশ্বাস, এর ফলেই তাঁর তোতলামির মাত্রা কমে গিয়েছিল। যাই হোক, বাবা বোধ হয় ছেলেকে বক্তা বানিয়ে নিজে বক্তা-না-হতে পারার দুঃখটা ঘোচাতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই-পুত্রটির কলিংবেল-নিন্দিত কণ্ঠস্বর যদিও সকলের কর্ণপীড়া উৎপাদন করে, তবুও পিতার কানে বোধ হয় পুত্রের বক্তৃতা মধুবর্ষণ করতো।

কিন্তু আমার বক্তৃতায় সে-সময়ই একবার একটু তাল কেটে গিয়েছিল। তাল কেটে দিয়েছিলেন শহর-থেকে-আসা এক তরুণ।

আমাদের গাঁয়ের বিশ্বাস বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন বীরু বিশ্বাসের শ্যালক। ১৮/১৯ বছরের যুবক। খুবই সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখে চশমা। সম্ভবত আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্র। এতো বছর পরে তাঁর নামটি আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

বিশ্বাস বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁকে ঘিরে প্রায় রোজই ছোট খাটো মজলিস বসে যেতো। বক্তৃতার ঢঙেই তিনি কথা বলতেন। তাঁর কথাগুলো মনে হলো অনেকটা অন্যরকম। গান্ধী সম্পর্কে তিনি নানা ধরনের বক্রোক্তি করতেন। আমার সে বয়সে সেসব বক্রোক্তির তাৎপর্য বোঝার কথা নয়। তবু এটুকু বুঝতাম যে, এই শহুরে তরুণটি গান্ধী-বিরোধী ও সুভাষের অনুরাগী। গান্ধী সম্পর্কে 'বুড়ো শয়তান'-এর মতো বিশেষণও তিনি প্রয়োগ করেছিলেন বলে মনে পড়ে। কংগ্রেসের কোন্ একটা সম্মেলনে সুভাষের প্রতি গান্ধী কী ধরনের অন্যায় আচরণ করেছিলেন—একদিনের মজলিসে সে-সব কথা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

আমার জ্ঞাতি ভাই হীরেন্দ্র দা তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলেন। সে-প্রতিবাদ বিতর্কে, এবং বিতর্ক প্রায় বিবাদে পরিণত হতে যাচ্ছিল। বীরু বিশ্বাসের ভাই জিতু বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে সেই বিতর্ক ও বিবাদ খুব বেশি বাড়তে পারেনি।

বড়োদের মজলিসের একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে একটি বালক যে সকলের উত্তেজিত কথাবার্তা হা করে শোনে—ওই বুদ্ধিদীপ্ত তরুণটি তা লক্ষ করেছিলেন। কৌতূহল বশেই একদিন এই বালকটিকে তিনি সস্নেহে তাঁর কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আমার নাম কী, কোন্ ক্লাসে পড়ি, গাঁয়ের কোন্ বাড়িটি আমাদের—এসব খবর জেনে নিয়ে তিনি আমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে শুরু করলেন। পরীক্ষায় বোধ হয় তিনি আমাকে পাসমার্ক পাওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। তাই, এরপর তিনি সোৎসাহে আমাকে আরো জ্ঞান দিতে প্রবৃত্ত হলেন। তবে জ্ঞানের চেয়ে বোধ হয় আমার মধ্যে আবেগ আর উত্তেজনাই সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন বেশি করে। নেতাজী সুভাষ বসুর নানা কীর্তির প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী ও নেহেরুর প্রতি বিষ ঝরতে লাগলো তাঁর মুখ থেকে। তিনি খুবই আবেগের সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কথা বললেন, আর বললেন ফরোয়ার্ড ব্লকে'র কথা। ফরোয়ার্ড ব্লকই হচ্ছে নেতাজীর দল, আমাদের সকলেরই উচিত এই দলটিকে সমর্থন করা। কংগ্রেস-ফংগ্রেস দিয়ে কিচ্ছু হবে না। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আনবে ফরোয়ার্ড ব্লকই। নেতাজীতো শিগ্‌গিরই ভারতে আসবেন তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে। তাঁরই নেতৃত্বে ভারত হবে স্বাধীন। স্বাধীন ভারতকে গড়ে তুলবে নেতাজীর ফরোয়ার্ড ব্লক।

কথাগুলো শুনে খুবই খটকা লাগলো। ফরোয়ার্ড ব্লক নামটা আমার কাছে একেবারেই নতুন। তা-ও আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাহলে আমরা যে কংগ্রেসকে ভোট দেয়ার কথা বলে আসছি, তার কী হবে?

—'না, না। ভোটের ব্যাপারে কোনো হেরফের হবে না। ভোট তো কংগ্রেসকেই দিতে হবে।...আর তা ছাড়া ফরোয়ার্ড ব্লক তো এখনো কংগ্রেসকে ছেড়ে যায়নি। আরো কিছুদিন কংগ্রেসের ভেতরেই থাকতে হবে। তবে নেতাজী যখন দেশে চলে আসবেন, দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন ফরোয়ার্ড ব্লকই হবে একমাত্র পার্টি। তাই, এখন কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই আমাদের ফরোয়ার্ড ব্লককে গুছিয়ে নিতে হবে।' খুব ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন বীরু বিশ্বাসের তরুণ শ্যালকটি।

তাঁর কথাগুলোর কী অর্থ সেদিন আমার কাছে ধরা দিয়েছিল, কিংবা একবারেই অধরা থেকে গিয়েছিল কিনা, আজ আর তা সঠিক ভাবে বলতে পারবো না। তবে, দু'তিন দিন ধরে তাঁর অন্তরঙ্গ আলাপ শুনতে শুনতে আমার ওপর যে তার আছর পড়ে গিয়েছিল, বাবা সেটা ধরে ফেলেছিলেন। সেদিনও আমি বালক শ্রোতাদের সামনে যথারীতি বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে-বক্তৃতায় ছিল গান্ধী ও কংগ্রেসের নিন্দা, এবং নেতাজী ও ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রশংসা। আবার কংগ্রেসের প্রার্থী অমূল্য অধিকারীকে কলস মার্কায় এবং প্রফুল্ল সরকারকে নৌকা মার্কায় ভোট দেবার জোরালো আহ্বানও ছিল। নেতাজী তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে দেশে এসে পড়লে যে কংগ্রেস ফংগ্রেস কিচ্ছু থাকবে না, ফরোয়ার্ড ব্লকই হবে একমাত্র দল—সেসব কথাও বলতে বাকি রাখিনি।

বালক শ্রোতারা আমার বক্তৃতার অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাতো না। (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তারা 'অর্থলোভী নয়' বলেই হয়তো।) আমার গতকালকের কথার সঙ্গে আজকের কথার কোনো

অসামঞ্জস্য আছে কিনা সেসবও তাদের মাথায় ঢুকতো না। (বালকরা তো অসম্ভব ও অসামঞ্জস্যের জগতেই বাস করে।) তারা শুধু দেখতো আমার হাত-পায়ের খিচুনি আর শুনতো কণ্ঠের প্রচণ্ড গর্জন। মুহুর্মুহু করতালি আর স্লোগান দিয়ে আমার সভাকে তারা সরগরম করে রাখতো।

কিন্তু আমার সেদিনের বক্তৃতার কথাগুলো শুনে বাবা খুবই বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হলো। গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন, কার কাছ থেকে আমি এসব কথা শিখেছি। আমার শিক্ষাগুরু সেই যুবকটির নাম বললে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গ পরিহার করতে উপদেশ দিলেন। গান্ধীজী, নেতাজী কিংবা এরকম অন্য যে কোনো নেতা সম্পর্কেই কোনো রূপ নিন্দাবাদ করা যে অন্যায়, সে-কথা আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বাবার একদিনের উপদেশেই কাজ হলো। আর কোনো দিন আমি গান্ধী-বিরোধী ও সুভাষবাদী বক্তৃতা করিনি। গান্ধী-নেহরু-সুভাষ-আজাদ সকলের সমান গুণগান করেছি। ভুলেও ফরোয়ার্ড ব্লকের নাম উচ্চারণ করিনি। বীরু বিশ্বাসের শ্যালকও কয়েক দিনের মধ্যে শহরে ফিরে গিয়েছিলেন। আর কখনো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

এর অনেক দিন পর স্বদেশী যুগের এক নেতার বক্তৃতা সম্পর্কীয় গল্প শুনেছিলাম। গল্পটি শুনে হাসিও পেয়েছিল, আমার বালক বেলার স্ববিরোধী বক্তৃতার কথাও মনে পড়ে গিয়েছিল।

ময়মনসিংহের মতিলাল পুরকায়স্থ ছিলেন যুগান্তর পার্টির নেতা। ব্রিটিশের চোখে অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টির লোকেরা ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। এঁরা বন্দুক-পিস্তল দিয়ে ইংরেজ ও তাঁর সহযোগীদের মেরেই এ দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার ও দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন। এঁদের বীরত্বের কাহিনী দিয়ে যদিও ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়েছে, তবুও অভিজ্ঞতা দিয়েই এঁরা একদিন নিজেদের পথের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এঁদের একদল গ্রহণ করলেন মার্কসবাদ, আরেক দল গান্ধীবাদ।

মতিলাল পুরকায়স্থ সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে গান্ধীবাদী হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রগ্রহণ করেও তিনি তাঁর সহিংস অতীতকে ভুলতে পারছিলেন না। বিশেষ করে বক্তৃতা দিতে উঠলেই তাঁর রক্ত টগ্‌বগ্ করে উঠতো, অহিংসার কথা বাদ দিয়ে ব্রিটিশের প্রতি একেবারে হিংস্র হয়ে উঠতেন। এ-রকমই ঘটেছিল একবার ময়মনসিংহ টাউন হলের সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে। জোশের সঙ্গে তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এদেশে এসে ইংরেজরা কি চিরকালই আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে থাকবে? ওরা কি মনে করেছে, এদেশের মানুষের কোনো দিন চোখ ফুটবে না? ওদের জানা উচিত, আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাবো না। এবার আমরা রুখে দাঁড়াবো। ওদের প্রত্যেকের মাথা আমরা গুঁড়িয়ে দিতে পারি, ওরা যে-গাড়ি করে চলে সে-গাড়ি আমরা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারি, ওদের আমরা আমাদের খালে-বিলে-নদীতে ডুবিয়ে মারতে পারি। আমরা পিস্তল চালাতে শিখেছি, ওই পিস্তল মেরে আমরা ওদের সব কটাকে শেষ করে দিতে পারি, ঘরে আগুন লাগিয়ে বিবি বাচ্চাসহ ওদের আমরা পুড়িয়ে মারতে পারি..."

পুরকায়স্থের বক্তৃতায় সভাপতি ক্রমে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। তিনি তাঁর পাঞ্জাবী ধরে টান দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আরে, কী বলছেন আপনি? ওসব তো এখন আমাদের কাজ নয়। আমরা এখন গান্ধীবাদী, আমাদের মন্ত্র অহিংসা..."

মুহূর্তে মতিলাল পুরকায়স্থ নিজেকে সামলে নিলেন। গলার স্বর বদলিয়ে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমরা ওদের মেরে তাড়াতে পারি বটে, কিন্তু আমরা কি তা করবো? না, না, মোটেই না। ওদের আমরা মারধর কিছুই করবো না। আমরা এখন গান্ধী মহারাজার শিষ্য। আমাদের মন্ত্র এখন অহিংসা। আমাদের অহিংসা-অসহযোগের ধাক্কাতেই ওরা এদেশ ছেড়ে পালাবে, এভাবেই আমরা স্বরাজ লাভ করবো।"

আমার অবশ্য মতিলাল পুরকায়স্থের মতো এমনটি করতে হয়নি। আমার বালক শ্রোতারা কিছুই বুঝুক আর না বুঝুক, ওদের সামনে আগে যে রকম বলতাম, পরেও সে-রকমই বলে গিয়েছি। মাঝে কেবল একদিনই মাত্র বীরু বিশ্বাসের শ্যালকের-কাছে-শোনা সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থী বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

তবে, সে-সময় কট্টর গান্ধীপন্থী আর সুভাষপন্থী দুই-ই ছিল কম্যুনিস্ট বিরোধী। সে-নির্বাচনে মুসলিম লীগ তো আর পাকিস্তানের পক্ষে হিন্দুদের কাছে ভোট চাইতে আসেনি, তাই কংগ্রেসের মূল লড়াইটা হয়েছিল কম্যুনিস্টদের সঙ্গে। কংগ্রেসের সভাগুলোতে বক্তারা যতো না ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কথা বলতেন, তার চেয়ে বেশি করতেন কম্যুনিস্টদের মুণ্ডুপাত। ওদের কথা শুনে মনে হতো : ইংরেজ নয়, এদেশের মানুষের আসল শত্রু কম্যুনিস্টরাই। কম্যুনিস্টরা হচ্ছে রাশিয়ার দালাল। রাশিয়ার স্বার্থেই তারা ব্রিটিশদের পায়রোবি করেছে, গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এদেশে না আসতে পারে তার জন্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে। এই দেশদ্রোহী কম্যুনিস্টদের যারা ভোট দেবে, তারাও হবে দেশের শত্রু। ওদের কিছুতেই ক্ষমা করা যাবে না।

আমাদের এলাকার কম্যুনিস্ট প্রার্থী মণিসিংহের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কেও কংগ্রেসীরা যা-তা বলতো। এবং অধিকাংশ মানুষই সেসব বিশ্বাসও করতো।

স্বভাবতই, আমার বক্তৃতারও অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল কম্যুনিস্টদের নিন্দাবাদ। অহেতুক কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষ এর পরও বহুদিন আমার মাথায় বাসা বেঁধে ছিল।

পঁয়তাল্লিশ সনে কম্যুনিস্ট পার্টি ও কৃষক সম্মেলন

কম্যুনিস্ট পার্টির নাম শুনেছিলাম নির্বাচনের আগের বছরেই—১৯৪৫ সালে। সে বছর আমি ক্লাস থ্রি-এর ছাত্র।

কম্যুনিস্টরা সে সময় নেত্রকোনায় একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাণ্ড ঘটিয়েছিল। তাদেরই উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে নেত্রকোনা শহর সংলগ্ন নাগরার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'সারা ভারত কৃষক সম্মেলন'। এ-রকম এলাহি কাণ্ড এই এলাকার মানুষ আগে কখনো দেখবে দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারেনি। লাখ খানেক মানুষের নাকি জমায়েত হয়েছিল সেই সম্মেলনে। আমাদের গ্রাম থেকে নয় মাইল দূরে ছিল সম্মেলন-স্থলটির অবস্থান। গ্রামের পাশের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে অজস্র মানুষ যাত্রা করেছিল—সে দৃশ্য এখনো আমি চোখ বুঁজলে দেখতে পাই। আমার বাবাও সে-সম্মেলনে গিয়েছিলেন। আমিও বাবার সঙ্গে যাবার জন্যে বায়না ধরেছিলাম। কিন্তু যেতে পারিনি। আমাকে সভা-সমিতিতে নিয়ে যাবার ব্যাপারে বাবার অমিত উৎসাহ থাকলেও সেই সম্মেলনে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না প্রচণ্ড ভীড়ের কথা ভেবে। আর ঠাকুরমা তো কিছুতেই এই ভীড়ের মধ্যে আমাকে যেতে দেবেন না। এই নাতিটিকে নিয়ে তাঁর কী যে আদেখলাপনা ছিল, তা বলে বোঝাতে পারবো না। তিনি নিজেই বলতেন, 'তোকে

মাটিতে রাখি না পিঁপড়ায় কামড়াবে বলে, মাথায় রাখি না উকুনের ভয়ে। সব সময় রাখতে চাই বুকে আগলে, তাই তুই কি-না...।' বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়তো।

তাঁর এ-রকম আদিখ্যেতায় খুবই লজ্জা লাগতো, রাগও হতো কখনো কখনো। লজ্জা লাগতো প্রতিবেশীদের সামনে এমন সৃষ্টি ছাড়া আদর দেখাতে থাকলে। প্রতিবেশীরা এ নিয়ে সুযোগ পেলেই আমাকে ক্ষেপাতো।

রাগ হতো আমাকে ইচ্ছেমতো বাইরে না যেতে দিলে। বাইরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমি যখন চোখা চোখা বাক্য প্রয়োগ করতাম, তখন যুক্তিতে আমার সঙ্গে না পেরে ঠাকুরমা মুখ ঝামটা মেরে বলে উঠতেন, 'তোর তো আছে কেবল এই মুখটাই। মুখটা না থাকলে কবে যে তোকে শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে যেতো!'

অথচ, আমাকে এই অকর্মণ্য মুখ-সর্বস্ব তাঁরাই বানিয়েছেন, এ-কথা কিন্তু ঠাকুরমা কিংবা আমার গার্জেন পক্ষের কেউই স্বীকার করতেন না।

আমার কান্নাকাটিতে বাবার মন ভিজেছিল, শেষ পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে নিয়েই সম্মেলনে যাবেন বলে ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঠাকুরমাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলেন না, প্রচণ্ড চিৎকার ও হাত পা ছুঁড়ে আমার কান্নাকাটি কিংবা একবেলা অনশনেও কোনো কাজ হলো না।

সম্মেলন থেকে বাবা আমার জন্যে বেশ কিছু মুদ্রিত কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন। সে-সবের মধ্যে ছিল কমরেড মুজফফর আহমদ ও কমরেড মনি সিংহের ভাষণ। এগুলো পড়ে তেমন কিছুই বুঝিনি, তবু পড়েছি প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে। 'কমরেড' শব্দটি নিয়ে আমি পড়েছিলাম খুবই বিপাকে। শুনলাম—কম্যুনিস্ট পার্টির সব লোককেই না-কি বলে কমরেড। কিন্তু কেন বলে, কথাটার আসল অর্থ কী? অন্য কাউকে কমরেড বলা যায় কি-না—আমার এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব কারো কাছেই পেলাম না।

যাই হোক, সম্মেলনের কাগজপত্র পড়ে এবং সম্মেলন প্রত্যাগতদের মুখে ওই অভূতপূর্ব জনসমাবেশটির বিমুগ্ধ বর্ণনা শুনে শুনে এর সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নিতে ও নিজের চোখে না-দেখতে পারার ও নিজের কানে না-শুনতে পারার ক্ষতিপূরণ করে নিতে চেষ্টা করেছি।

সবাই প্রথমে বলেছে, সম্মেলনের গেটে স্থাপিত বিরাট মূর্তিটির কথা। মূর্তিটি সম্পর্কে তাদের উচ্ছ্বসিত বাক্যাবলি শুনতে শুনতে এক সময় আমার মনে হতে লাগলো যে, আমি যেন নিজের চোখেই আমার সামনে মূর্তিটিকে মূর্ত হতে দেখছি। কাল্পনিক ঠাকুর-দেবতার মূর্তি দেখে গাঁয়ের মানুষ অভ্যস্ত, কিন্তু মূর্তি যে হতে পারে তাদেরই মতো রক্তমাংসের মানুষের, তা তারা এর আগে কখনো ভাবতে পারেনি। তা-ও আবার কৃষকের মূর্তি! ভদ্রলোকের চোখে কৃষক তো নিতান্তই করুণার পাত্র; ছোটলোক, চাষা, গেঁয়োভূত—এ-সবই হচ্ছে তার অভিধা। অথচ, সেই কৃষকেরই কি-না মূর্তি তৈরি হলো এবং পেয়ে গেলো 'দেবতার অমর মহিমা'।

পরে এই মূর্তিটি সম্পর্কে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর লেখায় পড়েছি—"প্রথমেই চোখে পড়ে এক বিরাট মাটির মূর্তি। সবল কৃষকের সংগ্রামশীল জীবনের রূপ। কোলে ধানের গুচ্ছ, বাঁ হাতে কাস্তে। উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, জোরালো পেশীগুলো টান টান হয়ে ফেটে বেরিয়েছে, হাতের শৃঙ্খল ভেঙে পড়েছে। পায়ের শৃঙ্খলও যায় যায়। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পী ফণি পাল এটি তৈরি করেছেন হৃদয় নামে এক হাজং কৃষক নেতার চেহারার অনুকরণে। যারা ঢোকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর নানা জল্পনা-কল্পনা।"

আমাদের গ্রাম থেকে যারা সম্মেলনে গিয়েছিল, তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটিই ছিল মহাবিস্ময়ের। সম্মেলন মানে, তাদের মনে হয়েছিল, এক বিরাট মেলা। আমাদের এলাকায় বারুণীর বা অষ্টমীর ঐতিহ্যবাহী মেলা ছাড়াও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে-ওখানে অনেক মেলা বসতো। গ্রামের একশ্রেণীর প্রভাবশালী মানুষই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসব মেলার আয়োজন করতো, লোভনীয় ভাষায় প্রচারপত্র ছেপে দূর দূরান্তের মানুষদের আকর্ষণ করতো। ওসব মেলায় নানা পণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি থাকতো আমোদ-প্রমোদের অঢেল ব্যবস্থা। তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল জুয়া খেলার। জুয়া খেলার পট বসিয়ে তা থেকে মোটা অঙ্কের দক্ষিণা আদায় করার দিকেই ওসব মেলার উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো। মেলায় জুয়া খেলে গাঁয়ের অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যেতো। তাই অনেক সময়ই সচেতন মানুষদের বিরোধিতার মোকাবেলাও এসব মেলার উদ্যোক্তাদের করতে হতো।

সারা ভারত কৃষক সম্মেলনকে একটা বিরাট মেলার মতো মনে হলেও শেষ পর্যন্ত মেলার সঙ্গে তাকে মেলানো যাচ্ছিল না। জুয়া খেলার পট বসা তো দূরের কথা, চেনাশোনা কোনো পাক্কা জুয়াড়িকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। জুয়াই যদি না থাকবে, তবে আর এটা মেলা হলো কী করে? মেলার মতোই এখানে প্রচুর আমোদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সে-আমোদে নেশা ধরেনি, বরং নেশা ছুটিয়ে দেয়ার নানা উপকরণই ছিল তাতে। নেশা ধরানোর বদলে এ-মেলা চেয়েছিল কৃষককে তার নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে, কৃষককে যারা নানা ধরনের নেশায় বুঁদ করে রাখতে চায় তাদের প্রতি কৃষক-মনে পবিত্র ঘৃণার সঞ্চার ঘটাতে। সে-লক্ষ্যেই সম্মেলনের প্রধান ফটকে বসানো হয়েছিল সংগ্রামী কৃষকের উন্নতশির মূর্তিটি। ওই মেলায় গান হয়েছিল, গান গেয়েছিলেন আমাদের এলাকারই বাউল গায়করা। কিন্তু গাঁয়ের কৃষকরা সবিস্ময়ে লক্ষ করলো : বাউল মজিদ মিঞা আর রশিদউদ্দিন গ্রামের বাউল গানের আসরে যে ধরনের গান গেয়ে থাকেন, ওখানে তো সে রকম গান করছেন না। ওখানে তাঁদের গাওয়া গান কাউকে উদাস করেনি, উদ্দীপিত করেছে। গাঁয়ের বিচার গানের আসরে যে-গায়করা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রের নানা কথা নিয়ে নানা কূট প্রশ্ন তোলেন, ওখানে তাঁরাই শাস্ত্র বিচার ছেড়ে কৃষকের জীবনের নানা সমস্যার বিচার করেছেন। তাঁদের গানে এসেছে মাত্র দেড় বছর আগের পঞ্চাশের মন্বন্তরের টাটকা স্মৃতি; এসেছে কন্ট্রোল, রেশন আর কালো বাজারের কথা; এসেছে জোতদার-মহাজনের শোষণ-অত্যাচারের প্রসঙ্গ। নেত্রকোনার মানুষের অতিপ্রিয় বাউল কবি মজিদ মিঞা গেয়েছেন—

হায়রে এমন বোকার দেশ ছিল...
স্ত্রী বলে, ওগো স্বামী
উলঙ্গিনী আছি আমি,
শরম হতে ভালো
গরল আনো না।

কিশোরগঞ্জের এক বাউল গায়কের এক নতুন রূপ উদ্‌ঘাটিত হলো এই সম্মেলনে। সে-গায়কের নাম অখিল ঠাকুর। অখিল ঠাকুরের জাগরণী গান কৃষকের একেবারে 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে' প্রবেশ করে তার তন্দ্রা ছুটিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

আরেকজন কৃষক কবি নিবারণ পণ্ডিত তো পুরো সম্মেলনটাকেই মাতিয়ে রেখেছিলেন।

এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন নেত্রকোনার বিখ্যাত সংগ্রামী গ্রাম বালির কৃষক নেতা মৌলবী আবদুল হান্নান। দীন-ই-ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও মাদ্রাসা-পাস

মৌলবী হয়েও আবদুল হান্নান যোগ দিয়েছিলেন সেই কম্যুনিস্ট পার্টিতে, যে-পার্টির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগটিই হচ্ছে ধর্ম বিরোধিতার—বিশেষ করে ইসলাম-বিরোধিতার। হান্নান মৌলবী আজ নেই। তবে আমাদের সৌভাগ্য, তিনি আমাদের জন্য 'আমার জীবনে কম্যুনিস্ট পার্টি' নামে একটি চমৎকার স্মৃতিকথা রেখে গিয়েছেন। সেই স্মৃতিকথায় নিবারণ পণ্ডিত সম্পর্কেও অনেক কথা আছে। নেত্রকোনায় যখন তৎকালীন সারা ভারতের কৃষকদের সম্মেলনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল অনেকেই। এদের মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদী জমিদার-তালুকদার-জোতদার-মহাজনরা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচররা যেমন ছিল, তেমনি ছিল জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীরাও। তারা নানা গুজব ছড়িয়ে এই সম্মেলন সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কার জন্ম দিতে চাইছিল। কৃষক কবি নিবারণ পণ্ডিত এদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গান বাঁধলেন এবং এক মাস ধরে তাঁর দলবল নিয়ে নানা জায়গায় গিয়ে গাইলেন—

চলরে কিষাণ বাজিয়ে বিষাণ নিয়ে লাল নিশান সম্মেলনে চলরে,
ও ভাই হিন্দু-মুসলমান।
শুনতে পেলাম এই শহরে কারা না-কি প্রচার করে।
এই সভাতে গেলে পরে থাকবে না আর জান,
এই সভাতে বোমা ফেলতে আসতেছে জাপান।
সম্মেলনে চলরে, ও ভাই হিন্দু-মুসলমান।

সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে সম্মেলনটি যখন সত্যি সত্যিই বাস্তব হয়ে উঠলো, তখন এই নিবারণ পণ্ডিত পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন ও লক্ষ লোকের সামনে গাইলেন উদ্দীপক গান—

এক সাথে চল গড়ব মোরা রঙিন দুনিয়া
সবে মিলে থাকবো যেথা বিভেদ ভুলিয়া বিভেদ ভুলিয়া।
হিন্দু-মুসলিম সবাই সমান সবার দুঃখ এক এক অবস্থায় ছোট বড় অনেক...

নিবারণ পণ্ডিত, অখিল ঠাকুর, মজিদ মিঞা বা রশিদউদ্দিনের মতো চারণ কৃষক কবিদের নতুন সুরের গান তো সম্মেলনের কৃষকশ্রোতারা শুনলেনই, যেসব 'ভদ্রলোক' গায়ক-কবিরা ভদ্রলোকী তকমা ছেড়ে কৃষকের কাতারে নেমে এসে কৃষকের সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে চাইছিলেন তাঁদের গানও শুনলো। শুনলো বিনয় রায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হেনা দাস, জিতেন সেনদের মতো গণশিল্পীর গান।

গাঁয়ের মানুষ সম্মেলনে এসে সংগ্রামী কৃষকের মূর্তি দেখলো, শিকল ভাঙার গান শুনলো, অধিকার সচেতন হওয়ার বক্তৃতা শুনে বুকের ভেতর অমিত তেজের উপস্থিতি অনুভব করলো। এ-সবের সঙ্গে, এই প্রথম, প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের একটা কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কারও তারা প্রত্যক্ষ করলো। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে গায়ক গান গাইছেন অথবা বক্তা বক্তৃতা করছেন, আর প্রায় এক মাইল দূরে বসে আছে যে শ্রোতাটি সে-ও সেই গান কিংবা বক্তৃতা শুনতে পেয়েছে। এক লাখ লোকের প্রত্যেকের কানেই গান আর বক্তৃতার প্রতিটি কথা গিয়ে পৌঁছেছে। কী করে হলো এমনটি? সেটাই তো তাজ্জব ব্যাপার। কী একটা যন্ত্রের সামনের মুখ রেখে গায়করা গান গায় কিংবা বক্তারা বক্তৃতা দেয়, আর সভার ভেতরে এখানে-ওখানে খুঁটির মাথায় বেঁধে রাখা ইয়া বড়ো বড়ো অনেকগুলো চোঙের ভেতর দিয়ে সবাই সেই গান বক্তৃতা স্পষ্ট শুনতে পায়।

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপারটি কী? বাবা বললেন—ওটাকে বলে লাউড স্পীকার। তারপর, কীভাবে এর সাহায্যে অনেক দূরে কথা চলে যায়, 'মাইক' বলে কাকে—এসব আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মাইকে গান বক্তৃতা হয় না, এমন কোনো অজপাঁড়াগাঁও সম্ভবত আজকের বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ১৯৪৫ সনের আগে পাড়াগাঁয় তো নয়ই, নেত্রকোনা শহরেও বোধ হয় কেউ মাইক দেখেনি। অন্তত নেত্রকোনার গ্রামাঞ্চলের মানুষ তো কম্যুনিস্টদের কল্যাণেই এই শব্দ প্রসারণ যন্ত্রটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

নাগরার মাঠে অনুষ্ঠিত পঁয়তাল্লিশের 'সারা ভারত কৃষক সম্মেলন'-এর নানা প্রসঙ্গ লোকের মুখে মুখে ফিরেছে বহুকাল ধরে। ম্যাট্রিক পাস করে নেত্রকোনা কলেজে যখন ভর্তি হই, তখনই পরিচয় হয় হান্নান মৌলবী সাহেবের সঙ্গে। এরপর ১৯৬৪ সনে ময়মনসিংহ শহরে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি (অর্থাৎ নাসিরাবাদ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিই) তখন মৌলবী সাহেবও এ শহরে এসেই আস্তানা গাড়েন। বুড়ো বয়সে এখানে ছোট্ট একটি বইয়ের দোকান খুলে বসেন। তাঁর স্নেহধন্য হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কম্যুনিস্ট কর্মীরূপে যে-স্মৃতি সঞ্চয় করেছিলেন, তার ভাণ্ডার তিনি উন্মোচন করে দিয়েছিলেন আমার কাছে। তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে ঘুরে ফিরেই কৃষক সম্মেলনের প্রসঙ্গ উঠে আসতো। পরে প্রমথ গুপ্ত, খোকা রায় ও মণি সিংহের বই পড়েও ওই সম্মেলন সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছি।

দক্ষিণ ভারতের মালাবারে এ-সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকারের নিষেধাজ্ঞার দরুন সেখানে তার অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। তাই, শেষ পর্যন্ত তা স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে নেত্রকোনায়। নেত্রকোনার হাজং-কৃষকদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠন ছিল খুবই শক্তিশালী। এছাড়া হান্নান মৌলবীর বালি গ্রামটি তো সে সময়ে হয়ে উঠেছিল কম্যুনিস্ট পার্টির দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুসলমান কৃষকরাই ছিল সে-দুর্গের অকুতোভয় রক্ষী।

নেত্রকোনায় সম্মেলন অনুষ্ঠানে হান্নান মৌলবীরই ছিল সবচেয়ে বেশি উৎসাহ। কলকাতায় প্রাদেশিক নেতাদের কাছে তিনি অঙ্গীকার করে এসেছিলেন যে সম্মেলনে লাখ লোকের সমাবেশ করা হবে, সম্মেলনের প্যাণ্ডেল তৈরির জন্য যতো বাঁশ লাগে তার যোগান দেয়া হবে।

হান্নান মৌলবী তাঁর কৃষক সহকর্মীদের নিয়ে সব অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

এই বিশাল সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন কমরেড মণি সিংহ। তেত্রিশ বছর জেল খেটে মাত্র তিন দিন আগে বেরিয়ে এসেছিলেন, যে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পাঞ্জাবী নেতা, সেই বাবা কেশর সিং উত্তোলন করেছিলেন সম্মেলনের পতাকা। আরাকানের বিখ্যাত নেতা উপিনার্য ডিহার, মণিপুরের ইরাবত সিংসহ উপমহাদেশের অনেক কম্যুনিস্ট নেতাই সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন। বাঙালি নেতাদের মধ্যে ভবানী সেন আর বঙ্কিম মুখার্জির বক্তৃতার প্রশংসা বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।

এ-রকম একটা বিরাট সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে কম্যুনিস্টরা আমাদের এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ব্যাপক জনসমর্থিত পার্টি যে গড়ে তুলতে পারেননি তা বোঝা গেলো পরের বছরের ইলেকশনেই।

ছেচল্লিশের নির্বাচন ও কম্যুনিস্ট পার্টি

নেত্রকোনা অঞ্চলে কম্যুনিস্টদের মূল শক্তি ছিল হাজং কৃষকরা। আর বালির মতো দু'একটি গ্রামে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান কৃষক ছিল কৃষক সমিতি তথা কম্যুনিস্ট পার্টির জঙ্গী কর্মী। এর বাইরে মুসলমান কৃষক তথা জনসাধারণের মধ্যে কম্যুনিস্টদের প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। রামেশ্বরপুরের মতো কিছু গ্রাম ছাড়া অন্যত্র হিন্দু কৃষকদের মধ্যেও কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। গ্রামের মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে তো মূলত কংগ্রেসী আবেগই ছিল প্রবল, কংগ্রেসী প্রচারের মাদকে তারা বুঁদ হয়ে থাকতো। তবে বিভিন্ন গ্রাম থেকে দু'চারজন করে সচেতন কম্যুনিস্ট কর্মী ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে আসছিলেন বৈকি। এঁদের কারো কারো হাতেখড়ি হয়েছিল সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে। এরপর জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই বেয়ে, নানা রকম ঘা খেয়ে, এবং অনেক ঠেকে তাঁরা শিখেছিলেন : সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে ভ্রান্ত পথ, এ-পথে মুক্তি নেই। এঁদেরই কয়েকজন কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়ে নতুন ধরনের রাজনীতিতে নেমেছিলেন। বালির শচীন হোম ছিলেন এ রকমই একজন রাজনীতিক। কৈশোরেই তিনি অনুশীলন পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ধনীদের বাড়িতে ডাকাতি করে অনুশীলন পার্টির তহবিল সংগ্রহ করা হতো। এ রকম ডাকাতিকে বলা হতো স্বদেশী ডাকাতি। আমার জন্মের বছর (কিংবা তার আগের বছরও হতে পারে) আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকের কুনিহাটি গ্রামে এক ধনী জোতদারের বাড়িতে দুর্দান্ত স্বদেশী ডাকাতি হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে সে-ডাকাতির অনেক গল্প শুনেছি। স্বদেশী ডাকাতিতে বালির শচীন হোমের ছিল সবচেয়ে বেশি নামডাক। ডাকাতি করতে গিয়েই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর দ্বীপান্তর হয়ে যায়—অর্থাৎ তাঁকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৩৮ সালে আন্দামান থেকে ফিরে এসে তিনি কম্যুনিস্ট হয়ে যান। ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন কুখ্যাত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাহামকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নেত্রকোনার আরো দু'জন স্বদেশপ্রেমিক বীর খুশু দত্ত ও শশীন্দ্র চক্রবর্তীকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল। এ রকম আরো একটা কী অভিযোগে সাজা হয়েছিল ভূপেন ভট্টাচার্যের। এঁরা সবাই শচীন হোমের সঙ্গে একই সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

সুসং-এর মহারাজের ভাগ্নে মণিসিংহও সন্ত্রাসবাদী দলেরই সদস্য ছিলেন, তবে তাঁর দ্বীপান্তর হয়নি। তিনি কমিউনিজমের দীক্ষা নিয়েছিলেন মস্কো থেকে বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নিয়ে-আসা কম্যুনিস্ট গোপেন চক্রবর্তীর কাছে।

সুসং অঞ্চলের এক গণ্ডগ্রামের সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে অক্ষয় সাহা কেমন করে জানি ১৯২৬ সালের দিকে ফ্রান্সে চলে যান। ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে, জার্মানি থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায়। রাশিয়ান মেয়ে তাতিয়ানাকে বিয়ে করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাতিয়ানা সাহা এদেশে এসে মণিসিংহদের সঙ্গে যোগ দেন, এবং গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সভাসমিতিতে কমিউনিজম প্রচার করতে থাকেন। কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়ে মণিসিংহ প্রথমে কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন, কিন্তু পরে সুসং এলাকারই নির্যাতিত কৃষকদের আহবানে, সাড়া দিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে আসেন, এবং কৃষকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেমে তাঁর জমিদার মামাদের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব দিয়ে তিনি হাজং ও মুসলমান কৃষকদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। সুসং এলাকার বাইরেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়কার ময়মনসিংহ জেলায় তিনি হলেন অবিসংবাদী কম্যুনিস্ট নেতা।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁকে প্রার্থী মনোনীত করে। তখনকার নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী তাঁকে প্রার্থী হতে হয় বর্ণহিন্দু আসন থেকে। অথচ বর্ণহিন্দুরা তো তাঁর ঘোর বিরোধী। মণিংসিংহের কোনো 'জাতি' নেই, সে ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও হাজংদের বাড়িতে পড়ে থাকে। এমন কি মুসলমানদের হাতেও ভাত খায়। নির্বাচনের সময় কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার তো হয়েছেই, গ্রামের নিভৃতে তার চেয়েও বেশি রটানো হয়েছে মণিসিংহ ও তাঁর সহযোগী হিন্দু নেতাদের 'জাত যাওয়া' সম্পর্কীয় কুৎসা। 'জাত গেলে' যে একজন মানুষের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে ছেচল্লিশ সালেও এ সংস্কার ছিল প্রচণ্ড। তাই, জাত-যাওয়ার প্রচার দিয়ে মণিসিংহ সম্পর্কে বহু হিন্দু ভোটারের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করা অনেকটাই সহজ হয়েছিল। তা ছাড়া সে-সময়কার নির্বাচনে বর্ণ হিন্দুদেরও তো সবাই ভোটার ছিল না। সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের আইন তখনো চালু হয়নি। ১৯৩৫ সালের নির্বাচন-পদ্ধতির বিধানে সে-সময়কার মাত্র সাড়ে তেরো ভাগ মানুষের ছিল ভোট দেয়ার অধিকার। ভোটার হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হতো তারাই যাদের একটা নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অথবা সরকারকে ট্যাক্স দিতো। কাজেই, গরীব কৃষক-মজুর জনসাধারণের পক্ষে ভোটার হওয়া সম্ভব ছিল না।

এ-অবস্থায় কংগ্রেসী গ্ল্যামারের সামনে কম্যুনিস্টরা যে দাঁড়াতেই পারবে না এমনটাই তো ছিল স্বাভাবিক। আমাদের রামপুর বাজারে কংগ্রেসীরা প্রচণ্ড প্রতাপে নির্বাচনী সভা করেছে, কিন্তু কম্যুনিস্টদের কোনো সভা হতে দেখিনি। সিংহেরগাঁওয়ের পবিত্র দাশ ছিলেন আমাদের আশপাশের গ্রামগুলোর মধ্যে প্রধান কম্যুনিস্ট কর্মী। তখন তিনি ছাত্র। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই তিনি আসতেন। তাঁর বাবা ও কাকা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদে পবিত্রদাকে বাবা খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর বিদ্যা, বিনয়, বুদ্ধি, সততা ও সাহসের জন্যে তাঁর প্রশংসাও করতেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতকে সমর্থন করতেন না। তবু, বাবার সঙ্গে তাঁকে অনেক সময় ধরে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। পবিত্রদা আমাদের বাড়িতে কম্যুনিস্ট পার্টির অনেক চটি বই রেখে যেতেন। সেগুলো পড়তে চেষ্টা করেছি, তেমন কিছুই বুঝিনি। একটি বই ও তাঁর লেখকের নাম অবিশ্যি আজো আমার মনে আছে। বইটি 'ভাঙনের মুখে বাংলা', লেখক—ভবানী সেন। ভবানী সেন নামটি বোধ হয় তখনই আমার চৈতন্যের সঙ্গে গাঁথা হয়ে যায় এবং সে কারণেই সম্ভবত বড়ো হয়ে তাঁর লেখা যখনই হাতে পেয়েছি তখনই গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।

১৯৪৬ সালে আমরা কম্যুনিস্টদের কথা কিছুই বুঝতে চেষ্টা করিনি। কিন্তু কংগ্রেসীরা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যা যা বলেছে, তা সবই বিশ্বাস করেছি। ইংরেজ আমাদের শত্রু, তারা আমাদের দেশটিকে দখল করে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা স্বাধীনতার জন্যে লড়ে যাচ্ছি। সেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে জাপানী আর জার্মানরাও। কাজেই জাপান ও জার্মান তো আমাদের বন্ধু। শত্রুর শত্রু যে বন্ধু হয়, এই সহজ হিসেবটা তো পাগলেও বোঝে। শুধু বোঝে না ওই জ্ঞানপাপী কম্যুনিস্টরা।...আরে, জার্মানির হিটলার হচ্ছে বাপের বেটা, তার বুদ্ধির কোনো তুলনাই হয় না। ('হিটলারী বুদ্ধি' কথাটা তখন আমাদের মুখে মুখে। যে কোনো মানুষের মধ্যে বুদ্ধির ঝিলিক দেখলেই 'হিটলারী বুদ্ধি' বলে তার তারিফ করি।)...ওই কম্যুনিস্টরা কি-না হিটলারের বিরুদ্ধে, জার্মানির বিরুদ্ধে, জাপানের বিরুদ্ধে কথা বলে। বলে কি-না হিটলার হচ্ছে মানবতার দুশমন। হিটলার-মুসোলিনি-তোজোরা ফ্যাসিবাদী। ফ্যাসিবাদ

সভ্যতাকে ধ্বংস করবে। কাজেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে, তাদেরকে আমাদের অবশ্যই সমর্থন দিতে হবে। এ যুদ্ধ হচ্ছে জনযুদ্ধ। ইংরেজরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাই এ ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজদের পক্ষে।...এভাবেই তো দেশের মানুষের সঙ্গে বেঈমানি করেছে মীর জাফরের দল কম্যুনিস্টরা।

কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে এসব কথা বিকৃত মুখভঙ্গী করে বলে যেতেন আমাদের গাঁয়ের ধীরু দাস। বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন।...'সেই কম্যুনিস্টরা এসেছে আমাদের কাছে ভোট চাইতে, ঝাঁটা মারি ওদের মুখে।'

চন্দপাড়ার ধীরু দাস, নগেন্দ্র দত্ত কিংবা চন্দনকান্দির সুরেন্দ্র চক্রবর্তী, এবং এ-রকম আরো অনেকে, গাঁয়ের কোনো গাছতলায় কিংবা পুকুর পাড়ে বসে এমন অনেক কথাই বলতেন কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। কম্যুনিস্টরা 'জনযুদ্ধ' বলে বলে ইংরেজদের দালালী করেছে, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পিঠে ছুরি মেরেছে, ব্রিটিশ আর রাশিয়ানদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে খেয়ে নিজেরা মোটাতাজা হয়েছে—এ-ধরনের অনেক কথাই তাঁরা অবিরাম বলে যেতেন। জাপান-জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজরা যখন জেরবার হচ্ছে, তখনই তো ওদের কাবু করে ফেলার মোক্ষম সুযোগ দেখা দেয়। সেটি বুঝেই তো ১৯৪২-এ মহাত্মা গান্ধী ইংরেজদের চরমপত্র দিয়েছিলেন : কুইট ইণ্ডিয়া—এই মুহূর্তে ভারত ছেড়ে চলে যাও। কিন্তু ওই ব্যাটা কম্যুনিস্টরা তখন করলো কী? ইংরেজের নির্লজ্জ দালালী শুরু করে দিলো। সমস্ত কংগ্রেসী নেতাদের ইংরেজরা জেলে পুরলো যখন, তখনই কম্যুনিস্টরা ইংরেজদের একেবারে কোলে উঠে বসলো। নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে ভারতের দিকে এগোলেন, আর কম্যুনিস্টরা দেশের মানুষদের জাপানী জুজুর ভয় দেখাতে লাগলো। এই তো কম্যুনিস্টদের চরিত্র!

এ-সময়ই ঘটলো এক দুর্ঘটনা। শোনা গেলো : ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারের সময় কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট কর্মীদের কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে মারামারি শুরু হয়ে যায়, এবং কম্যুনিস্টদের এক ভলান্টিয়ারের লাঠির আঘাতে কংগ্রেসের এক ভলান্টিয়ার মারা যায়। ওর নাম ছিল মহেন্দ্র। সে ছিল সুসংয়ের জমিদার বাড়ির এক ধোপার ছেলে।

এই ঘটনাটাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কংগ্রেসীরা এমনভাবে কাজে লাগালো যে মধ্যবিত্ত ভোটারদের মধ্যে কম্যুনিস্ট বিদ্বেষ একেবারে তুঙ্গে উঠে গেলো। প্রমাণ করা হলো : কম্যুনিস্টরা শুধু রাশিয়া আর ব্রিটেনের দালালই নয়, ওরা গুণ্ডাও। কংগ্রেসীরা মহেন্দ্রের লাশের একটা ীভৎস ছবিসহ ইশ্‌তেহার ছাপিয়ে লাখ লাখ কপি ছেড়ে দিলো। শুধু দেশে নয়, দেশের াইরেও। কম্যুনিস্টরা কিরূপ 'নৃশংসভাবে মহেন্দ্রকে হত্যা করেছিল' ইশ্‌তেহারটি ছিল তারই নোয়াট বর্ণনায় ভরপুর। মহেন্দ্র হত্যা সম্পর্কে একটি পদ্য লিখে সেটিও ইশ্‌তেহার আকারে রূপে হাটে-বাজারে বিলি করেছিল। ওই পদ্যটির দুটো ছত্র এখনো আমার মনে পড়ে 'যেমন ুর মারে, সেই মতো ধীরে ধীরে করিল তাহারে খুন। এই হলো কমিউনিস্টের গুণ'।

মহেন্দ্র হত্যার ঘটনাটিকে পুঁজি করে মণিসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার আত্মীয়রা নির্বাচনের য় যে নাটকের অবতারণা করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে মণিসিংহ তাঁর স্মৃতিকথা *জীবন যম*'-এ লিখেছেন, "জমিদার বাড়ির মেয়েরা কখনো ভোট দিতে যেতো না। তারা ধোপা তি নিম্নশ্রেণীকে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখতো। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ও দরিদ্র লোকেরা দারদের সামনে কখনো টুলে পর্যন্ত বসতে পারতো না। কিন্তু কথায় বলে গরজ বড়ো াই। আশ্চর্যের বিষয়, নির্বাচনের দিন দেখা গেলো, জমিদার বাড়ির মেয়েরা স্কুলের বারান্দায়

(ভোটকেন্দ্রে) মহেন্দ্রের মাকে একটি চেয়ারে বসিয়েছে, আর জমিদারের এক মেয়ে তাঁকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছে।...আমি এই দৃশ্য দেখে ভাবলাম—শ্রেণীস্বার্থে সব কিছুই সম্ভব। আর উচ্চবিত্তের তো বটেই, মধ্যবিত্তেরও সাধারণ চরিত্র যেমন ভঙ্গুর তেমনি বেসামাল। সুসং অঞ্চলে অবশ্য প্রকৃত মহেন্দ্রের মাকেই আনা হয়েছিল, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলের অন্যান্য কেন্দ্রেও এক একটি জাল মহেন্দ্রের 'মা'কে উপস্থিত করা হয়েছিল।"

পবিত্র দাশ তাঁর গ্রামের কয়েকজন ছাত্র-যুবককে কম্যুনিস্ট সমর্থক কর্মী বানিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিল তাঁরই খুড়তুতো ভাই গোপাল দাশ, আমাদের দুই আত্মীয় কালিদাস পাল ও অনিল পাল এবং সিংহেরগাঁওয়ের আরেক যুবক সুবোধ কর। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও এরাই কংগ্রেসী জোয়ারের মুখে আমাদের আশপাশের কয়েকটি গ্রামে কম্যুনিস্ট পার্টির গর্বিত অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল।

ইলেকশনে, স্বাভাবিকভাবেই, কম্যুনিস্ট পার্টি হেরে গেলো। কংগ্রেসী অমূল্য অধিকারী কম্যুনিস্ট মণিসিংহের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি ভোট পেয়ে জিতে গেলেন। অবিভক্ত বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টির তেরোজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, জিতেছিলেন মাত্র তিনজন—জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়।

ইলেকশনের পরও বেশ কিছুদিন আমার বালকবাহিনীকে নিয়ে কংগ্রেসী জোশ জিইয়ে রেখেছিলাম। এবং সেই কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষও। সুবোধ কর আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই চলাফেরা করতেন। তাঁকে দেখলেই আমরা এক সঙ্গে চিৎকার করে স্লোগান দিতে থাকতাম—কম্যুনিস্ট পার্টি ধ্বংস হোক। তিনি কিছুই বলতেন না। মিটি মিটি হেসে চলে যেতেন।

আমার চৈতন্যকে তখন অধিকার করে রেখেছে বড়োদের মুখ থেকে শোনা গান্ধীজীর 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের বীরত্ব-গাঁথা। ম্যালেরিয়া এবং কাব্যরোগে আক্রান্ত হয় সকল বাঙালি সন্তানই; দৈবাৎ কেউ ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেলেও পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু কোনো না কোনো সময় কাব্যরোগে ধরেনি এমন কোনো বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব—এ রকম একটি কথা বলেছিলেন *'লৌহ কপাট'* খ্যাত কথাশিল্পী জরাসন্ধ। তাঁর কথা সত্য হলে আমি তো শতকরা এক শত ভাগ খাঁটি বাঙালি। কারণ ছেলেবেলায় এই দুটো রোগেই আমি ভুগেছি। ১৯৪৬ সালে ক্লাস ফোরের ছাত্র-থাকা-কালে আমি কম্যুনিস্ট নিন্দায় ভরপুর করে 'কুইট ইন্ডিয়া' নামে একটি মস্ত বড়ো পদ্য লিখেছিলাম। এখনো তার প্রথম দু'ছত্র আমার মনে আছে।

১৯৪২-এ কংগ্রেস বলে উঠলো—'কুইট ইণ্ডিয়া'।
তার বিরুদ্ধে উত্তর হলো—'না দিব ভারত ছাড়িয়া'।

চল্লিশের দশকের 'মুসলমান কম্যুনিস্ট'

হিন্দুদের মধ্যে কংগ্রেসের ও মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের জোয়ার যখন তুঙ্গে, তখন যাঁরা এই জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হিন্দু বা মুসলমান যে-সম্প্রদায় থেকেই উঠে আসুন না কেন, তাঁদের বুকের পাটা যে খুবই শক্ত ছিল—এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। এবং এ-কথাও বলত হবে যে, বুকের পাটা অনেক বেশি শক্ত না হলে 'মুসলমান কম্যুনিস্ট' হওয়া ছিল খুবই কঠিন। তুলনায় 'হিন্দু কম্যুনিস্ট' হওয়া সহজতর। কারণ হিন্দুদের মধ্যে তখন রাজনীতির নানা বিচিত্রমুখী তরঙ্গলীলা চলছিল, এমনই একটি তরঙ্গ ছিল কম্যুনিজমের।

কংগ্রেসী জোয়ার যতো প্রবলই হোক, কম্যুনিস্টদের অস্তিত্বকে মুছে দেয়া বা অস্বীকার করা কংগ্রেসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের জোর লড়াই চালাতে হয়েছিল, এবং তার জন্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র কৌটিল্যনীতির। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে প্রধানতম এবং প্রবলতম স্রোতটি ছিল মুসলিম লীগের—অর্থাৎ পাকিস্তানের। সেই স্রোতের সামনে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল নিতান্ত দুর্বল সব প্রতিপক্ষ শক্তি। আর কম্যুনিস্টদের ঘায়েল করার মোক্ষম অস্ত্রটি তো মুসলিম লীগের হাতে ছিলই। সেটির নাম ধর্ম। হিন্দুরা 'ধর্ম' সম্পর্কে উদার, তাদের যতো সংকীর্ণতা 'জাত' নিয়ে। কোনো কিছুতেই হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু জাত যায় অতি সহজেই। চল্লিশের দশকেও, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে, 'জাতের নামে বজ্জাতি' ছিল অতি প্রবল। বিশেষ কোনো ধর্মীয় ক্রীড হিন্দুদের নেই, এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেও হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। কিন্তু জাত না মেনে কোনো হিন্দুর পক্ষে গ্রাম-সমাজে তিষ্ঠানো ছিল অসম্ভব। তাই, 'কম্যুনিস্টরা ধর্ম মানে না' এমন প্রচার হিন্দুদের মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করলেও নির্বাচনী প্রচারে কম্যুনিস্ট প্রার্থী মণি সিংহের 'জাত যাওয়া'র প্রসঙ্গটি তুলে গ্রামীণ হিন্দুদের অনেকের ভেতরে বিরূপতা জন্মানো সম্ভব হয়েছিল। তবু, বলা প্রয়োজন, জাত-ধর্মের ব্যাপারটাই সে-সময়কার হিন্দুদের রাজনীতিতে মুখ্য বিবেচনা হয়ে আসেনি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা-সংকটের জ্বলন্ত প্রশ্নগুলোর মোকাবেলা করেই সেদিন তাদের রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছিল।

অন্য দিকে, ছেচল্লিশ সনে মুসলমানদের রাজনীতি হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। মুসলমানের মধ্যে 'জাতের বালাই' নেই, অন্তত থিয়োরেটিক্যালি তো নেই-ই। তাদের আছে ধর্ম, আছে ক্রীড। ধর্ম বিষয়ে কিছুই যে জানে না, সে-ও তা মানে। 'আমল' যার যে-রকমই থাকুক, 'ঈমানে'র গুরুত্ব সবার কাছেই সমান। কম্যুনিস্টদের কোনো ঈমান নেই—এ প্রচার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল আকাশে-বাতাসে। ধর্মসম্পর্কীয় স্পর্শকাতরতাকে অতি সহজে কাজে লাগায় রাজনীতিকরা। কম্যুনিস্টদের ঘায়েল করার জন্যে মুসলিম লীগাররা তা-ই করেছিল। সভা-সমিতিতে তারা প্রচার করতো : কোনো মুসলমান কখনো কম্যুনিস্ট হতে পারে না।

তবু, সে সময়েও মুসলমান কম্যুনিস্টরা ছিলেন। তখন অবিশ্যি আমি তাঁদের দেখিনি। কিন্তু পরে তাঁদের অনেকের নিবিড় সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। কারো কারো সঙ্গে একত্র কারাবাসও করেছি। তখন জেনেছি, কী রকম উজান স্রোতে তাঁদের নৌকা বাইতে হয়েছে সারা জীবন।

অগ্রণী কম্যুনিস্ট কর্মী হান্নান মৌলবীর কথা নেত্রকোনার সবাই জানে। তবে মৌলবী সাহেবের মুখেই শুনেছি, মোহনগঞ্জ থানার জহিরউদ্দিন মুন্সী ছিলেন মুসলমান কম্যুনিস্ট হিসেবে তাঁর পূর্বসূরী। সম্ভবত, জহিরউদ্দিন মুন্সীই নেত্রকোনার প্রথম মুসলিম কম্যুনিস্ট।

হান্নান মৌলবীর কম্যুনিস্ট হওয়ার ইতিহাসটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বলা যায়, কমিউন্যালিজম দিয়ে শুরু করেই তিনি 'কম্যুনিজমে' পৌছে গিয়েছিলেন।

হান্নান মৌলবীর বাবা আব্বাস মাস্টার যখন মারা যান, তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। জমিদারের খাজনা পরিশোধের জন্যেই তাঁকে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল। বালি

গ্রামটি ছিল গৌরীপুরের জমিদারের মালিকানায়। সেই জমিদারের নেত্রকোনা কাছারির সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন একজন মহাজন। বলা হয়তো নিষ্প্রয়োজন : ওই জমিদার ও সুপারিন্টেনডেন্ট দু'জনই হিন্দু, এবং এলাকার অর্থলগ্নিকারী মহাজনদেরও সকলেই হিন্দু। মহাজনদের খাতকদেরও সকলে না হলেও অধিকাংশই আব্বাস মাস্টারের মতো মুসলমান। সেই সুপারিন্টেনডেন্ট ও আরো যে ক'জন মহাজনের কাছ থেকে আব্বাস মাস্টার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা তাঁর মৃত্যুর পরই আদালতে মামলা দায়ের করে তাঁর সম্পত্তি নিলাম করে নিতে থাকে। সুপারিন্টেনডেন্ট বাবু আব্বাস মাস্টারের সমস্ত চাষের জমি নিলামে কিনে নেন। গাঁয়ের মানুষের করুণার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো প্রয়াত আব্বাস মাস্টারের পরিবারটি।

খান বাহাদুর কুবীর উদ্দিন খান, ইনাম উদ্দিন ও আবদুস সামাদ—নেত্রকোনার এই তিন জন এ্যাডভোকেট ছিলেন আব্বাস মাস্টারের বন্ধুস্থানীয়। এঁরা সকলে কাছারিতে গিয়ে আব্বাস মাস্টারের জমি তাঁর পরিবারকে ফেরত দেয়ার জন্যে সুপারিন্টেনডেন্ট বাবুর কাছে অনুরোধ রাখেন। কিন্তু সুপারিন্টেনডেন্ট অনড়। তাঁর যুক্তি : আইনের বলে তিনি যে-জমি পেয়েছেন, সে-জমি তিনি ছাড়বেন কেন?

কিন্তু তাঁর এই আইনের যুক্তিকে বালি গ্রামের আব্বাস মাস্টারের কৃষক প্রতিবেশীরা পুরোপুরি অকেজো করে দিয়েছিল। আইনের বলে বলীয়ান হয়েও সুপারিন্টেনডেন্ট নিলাম করা জমির দখল নিতে পারলেন না। সুপারিন্টেনডেন্ট যদি হন বুনো ওল, তো বালির কৃষকরা বাঘা তেঁতুল। আব্বাস মাস্টারের নিলাম করা জমির ওপর সুপারিন্টেনডেন্টের আইনি অধিকার কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে একেবারেই মিথ্যে হয়ে গেলো।

তখন মুসলিম লীগের প্রতাপ বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। গ্রামে গ্রামে মুসলিম লীগাররা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। 'হিন্দু' জমিদার-মহাজনরা 'মুসলমান' আব্বাস মাস্টারের জমি দখল করে নিয়েছে—এ বিষয়টিও তাদের সাম্প্রদায়িক প্রচারের একটি উপাদান হয়ে গেলো। মুসলমান কৃষকদের তারা পুরো হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো। সে-উস্কানির ফল যে একেবারে ফললো না, তা-ও নয়।

১৯৪০ সালে, 'পাকিস্তান-প্রস্তাব' পাসের বছর, বালির আব্বাস মাস্টারের বড়ো ছেলে হান্নান মৌলবী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাকিস্তানি ও মুসলমানি জোশকে কাজে লাগিয়েই তিনি তাঁর পিতৃ সম্পত্তি উদ্ধার করবেন। মহরম উপলক্ষে প্রতি বছরেই তো মিছিল বের করা হয়। তাতে 'হায় হাসান হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়, জারিগানের তালে তালে বাজনা বাজে, নাচ হয়। কিন্তু এবারের মিছিলটির ধরন-ধারণ একেবারেই আলাদা। মহরম হলো এ-মিছিলের উপলক্ষ, লক্ষ্য আব্বাস মাস্টারের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার। মুসলমান কৃষকদের জঙ্গী মিছিল দিয়ে হিন্দু জমিদার-মহাজনদের অন্তরে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দেয়ার মতলব আঁটলেন তরুণ হান্নান মৌলবী। একটি ঘোড়ায় চড়ে তিনি মিছিলের আগে আগে চললেন। মিছিলে গান হচ্ছিল—'ঘোড়ার পৃষ্ঠ শূন্য দেখি, ফুলের বিছানা/হায় মদিনার খবর পেলাম না।' গানের ফাঁকে ফাঁকে হাজারো কণ্ঠের স্লোগান—'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ'।

প্রমাদ গুণলো নেত্রকোনা শহরের হিন্দুরা। গুজব রটেছিল : মুসলমানরা মিছিল করে শহর লুট করতে আসছে। বহু হিন্দু নারী-পুরুষ, বিশেষ করে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর লোকেরা, গৌরীপুরের জমিদারের কাছারিতে এসে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ভীড় করলো।

সে-সময়েই কমরেড মণি সিংহর নেতৃত্বে নেত্রকোনা শহরে কম্যুনিস্ট পার্টির একটা বৈঠক বসেছিল। জঙ্গী মিছিলের খবর পেয়েই বৈঠক স্থগিত রেখে কমরেড খুশু দত্ত রায় বেরিয়ে

এলেন। মিছিলটি তখন মগরা নদীর পাড়ে এসে পড়েছে। খেয়া পেরোলেই নেত্রকোনা শহর। খুশু দত্ত রায় মিছিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হান্নান মৌলবীর সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন ও মিছিলের উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। মৌলবী আবদুল হান্নান তাঁর স্মৃতিকথায় সে-বক্তৃতার কথাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছেন। খুশু দত্ত রায় বলেছিলেন, "অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ইমাম হোসেন কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন। মহররমের দিন শপথ নেয়ার দিন। দুর্বলের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার দিন নয়। মৌলবীর জমি নিয়ে জালেম জমিদার একটা পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আমি কথা দিচ্ছি—কম্যুনিস্ট পার্টি এ জমি উদ্ধারের সংগ্রাম করবে। কোনো ধর্মের জনসাধারণ মৌলবীর এ দুর্দশা সৃষ্টি করেনি। এভাবে মিছিল করলে দাঙ্গাকারী বলে চিহ্নিত করে জমিদার মামলা করবে। এ শোক মিছিল। এ-মিছিলের সঙ্গে আমিও থাকবো।"

বক্তৃতা শেষ করে খুশু দত্ত রায় নিজেই মিছিলকারীদের একজন হয়ে গেলেন। হান্নান মৌলবীর পাশে পাশে চলতে চলতে অনর্গল বলতে লাগলেন শ্রেণীসংগ্রামের কথা, জমিদারের শ্রেণী চরিত্র আর শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা। মিছিলটি জমিদারের কাছারির সামনে এসে দাঁড়ালো। হান্নান মৌলবী মিছিলকারীদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "ভাই সব, হিন্দু নর-নারী আমাদের শত্রু নয়। জমিদার মহাজন আমাদের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। এ মিছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে শান্তির মিছিল, ঐক্যের মিছিল।"

মুহূর্তের মধ্যে নতুন স্লোগান উঠলো—'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' সারা শহর এই স্লোগানে মুখরিত করে মিছিলটি গিয়ে থামলো মোক্তারপাড়া মাঠে। সকলে মাঠের ঘাসের ওপর বসে গেলো, আর শহরের ব্যবসায়ীরা তাদের মুড়ি-বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করলো। এসব কিছুরই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কম্যুনিস্ট নেতা খুশু দত্ত রায়।

নেত্রকোনা শহরের হিন্দুরা স্বস্তি পেলো। আর, মৌলবী আবদুল হান্নান নিজেই লিখেছেন,—"আমি একটা নতুন জন্ম পেলাম। আমি সেদিন সেই মুহূর্ত থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির একজন হয়ে গেলাম।...

"১৯৪০ সালের মহররম মাসের দশ তারিখ আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে। পারিবারিক শিক্ষার প্রভাবে এতোকাল মানুষের কাছে দাঁড়িয়েছি ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে সেবার মনোভাব নিয়ে। সমাজ-বিকাশের ধারাটি কি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব কাকে বলে, এর পরিণতিইবা কি, এ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তখন ছিল না। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমাধানের পথ খুঁজেছি। কম্যুনিস্ট পার্টি আমাকে নতুনভাবে সৃষ্টি করলো।...

"আমি সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে গেলাম। প্রায় প্রত্যেক দিনই পার্টির নেতাদের কেউ না কেউ আমাকে সঙ্গে করে কোনো না কোনো এলাকায় বেরিয়ে যেতেন। যে-সমস্ত এলাকায় কৃষক সমিতি সংগঠিত হয়েছিল, প্রথম দিকে সে-সমস্ত এলাকাগুলোতে যেতাম। আমাকে পাশে বসিয়ে রেখে আলোচনা হতো। এতে আমি দু'দিক দিয়ে লাভবান হয়েছিলাম। জনতাকে অধিকার সচেতন করে তাকে নিয়ে সমাজ বদলের সংগ্রামে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে শিক্ষা যেমন আমার হয়েছিল, আমার সমস্যাটিও যে এ-সমাজের সামগ্রিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় সে বোধও আমার ক্রমে জন্মেছিল। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনের

সঙ্গে ও আন্দোলন মিশে গেলো। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি কৃষক সমিতির অন্যতম দাবি। কৃষক সমিতির মারফৎ কম্যুনিস্ট পার্টি এ-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে কৃষক সমিতিতে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হলো।"

১৯৪৫ সালের মধ্যেই বালি গ্রামের ৩৮ জন মুসলমান কৃষক কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন। আর পুরো গ্রামের সব মানুষই হয়ে গেলো কম্যুনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির জঙ্গী কর্মী। কিন্তু ছেচল্লিশের নির্বাচনে তাদের কিছুই করবার রইলো না। নেত্রকোনার মুসলিম আসনে কোনো কম্যুনিস্ট প্রার্থী নেই। অন্য অন্য গ্রামের মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগ আর পাকিস্তানের প্রশস্তি ছাড়া অন্য কোনো কথা উচ্চারণই করা যায় না।

বর্ণ হিন্দু আসনে কম্যুনিস্ট প্রার্থী মণি সিংহের সমর্থনে কাজ করতে গিয়ে হান্নান মৌলবী আর তাঁর সাথীরা নানা ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। কংগ্রেস-সমর্থক বর্ণ হিন্দুদেরও তখন সাম্প্রদায়িকতার ভূতে ভালো করেই পেয়ে বসেছে, তারা কোনো মুসলমানের কথা শুনতেই রাজি ছিল না।

কিশোরগঞ্জের মুসলিম আসনে অবিশ্যি একজন কম্যুনিস্ট প্রার্থী ছিলেন। তিনি কমরেড ওয়ালি নেওয়াজ। অবিভক্ত বাংলার তেরোজন কম্যুনিস্ট প্রার্থীর মধ্যে মুসলমান ছিলেন তিনজন। দু'জন পশ্চিম বাংলায়—মোহাম্মদ ইসমাইল ও চতুর আলী, আর পূর্ব বাংলায় একজন—ওয়ালি নেওয়াজ। কমরেড ওয়ালি নেওয়াজকে আমি দেখিনি, তবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলাম কিশোরগঞ্জের আরেকজন কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড জমিয়ত আলীর। ছিয়াত্তর-সাতাত্তর সালে এক বছরেরও বেশি সময় আমি ময়মনসিংহ জেলে জমিয়ত ভাইয়ের সহবন্দি ছিলাম। সে সময়ে তাঁর মুখে ওয়ালি নেওয়াজের কথা অনেক শুনেছি। এবং শুনেছি ছেচল্লিশের নির্বাচনে ওয়ালি নেওয়াজের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে জমিয়ত ভাইয়ের নিজের অভিজ্ঞতার কথাও।

ওয়ালি নেওয়াজের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন হাবিব মিঞা নামে এক ব্যক্তি। তিনি না-কি ছিলেন ছোট-খাটো একজন জমিদার। ছোট হলেও শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের 'কাশীপুর' গ্রামের জমিদারটির মতোই 'দাপটে তার প্রজারা টু শব্দটি করিতে পারিত না—এমনই প্রতাপ।' সেই প্রতাপ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি জোশে। মুসলিম লিগাররা তখন ইসলামের স্ব-ঘোষিত হেফাজতকারী, যে কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে সেই হয়ে যেতো ইসলামের দুশমন। কাজেই ওয়ালি নেওয়াজ এবং তাঁর দলের সব লোক যে ইসলাম বিরোধী বলে চিহ্নিত হবেন—এ আর এমন বিচিত্র কি! কিন্তু কম্যুনিস্টদের কেবল ইসলাম-বিরোধী অপবাদ দিয়েই মুসলিম লীগ ভোটের ব্যাপারে পুরো নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। কম্যুনিস্টরা যে বর্গাচাষী কৃষকদের তেভাগার কথা বলতো, জমিদার-জোতদার-মহাজনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাতো, পাকিস্তান কায়েম করার মধ্যেই গরিবের আসল সমস্যার সমাধান নেই বলে কৃষকদের সচেতন করে তুলতে চাইতো—সে-সবের মোকাবেলা করার জন্যে মুসলিম লীগ প্রার্থী তাঁর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির বুলি একেবারে উজাড় করে দিয়েছিলেন। তিনি না-কি ওয়াদা করেছিলেন: পাকিস্তান কায়েম হয়ে গেলে নিজের জন্যে কিছুই রাখবেন না, তাঁর সব জমিজমা কৃষকদের বিলিয়ে দেবেন। (কমরেড খোকা রায় তাঁর '*সংগ্রামের তিন দশক*' গ্রন্থেও এ-বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।) 'ইসলাম বিরোধী' ওয়ালি নেওয়াজকে হারিয়ে দিয়ে হাবিব মিঞাই নির্বাচনে জিতেছিলেন, এবং ইসলামী

রাষ্ট্র পাকিস্তানও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর তিনি তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছিলেন কি-না, জমিয়ত ভাইকে তা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি।

কমরেড ওয়ালি নেওয়াজ ছিলেন নির্ভীক ও লড়াকু কর্মী। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া খুব বেশি ছিল না, মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি ইস্কুলে পড়েছিলেন। তবে পার্টি করতে এসে কম্যুনিজমের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এমন কি, তরুণ পার্টি কর্মীদের তত্ত্বীয় প্রশিক্ষণ দানের কাজও তিনি করেছেন। এ ব্যাপারে জমিয়ত ভাইয়ের কাছে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম। গল্পটি এ রকম :

কমরেড ওয়ালি নেওয়াজ একদিন পার্টির কৃষক কর্মীদের তত্ত্বীয় ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি তাদের ডায়ালেকটিকসের 'থিসিস এন্টিথিসিস সিনথেসিস' বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। নিরক্ষর কৃষকদের মাথায় এসব তত্ত্ব ঢুকবে কী করে? কিন্তু ওয়ালি নেওয়াজ নাছোড়বান্দা। তিনি তাদের বুঝিয়েই ছাড়বেন! কিছুতেই যখন তাদের বোঝাতে পারছিলেন না, তখন ভীষণ রেগে গেলেন! একজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "আরে গর্দভ, এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারছিস না। মনে কর—তোর বাপ হলো থিসিস, তোর মা এন্টিথিসিস, আর তুই হলি গিয়ে সিন্থেসিস। এবার বুঝেছিস, হতভাগা?"

সেই হতভাগা কী বুঝেছিল জানি না, তবে আমরা সেদিন জমিয়ত ভাইয়ের মুখে ওয়ালি নেওয়াজ-ব্যাখ্যাত ডায়ালেকটিকসের অভিনব দৃষ্টান্তের কথা শুনে ময়মনসিংহ জেলের তেরো নম্বর ওয়ার্ডে বসে প্রাণ খুলে হেসেছিলাম।

তবু, যতোই হাসিঠাট্টা করি না কেন, ওয়ালি নেওয়াজের মতো কম্যুনিস্টদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে খাটো করে দেখতে পারি না কিছুতেই। এঁরা অনেকেই শেষ পর্যন্ত হয়তো পুরো আদর্শনিষ্ঠ থাকতে পারেননি। তবু মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-ঝরানোর সেই দিনগুলোতে কম্যুনিজমের মানবিক মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কম্যুনালিজমের অমানবিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের অবদানকে ভুলে যাই কী করে?

'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'দের কথা

পাকিস্তানের জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 'কম্যুনিস্ট মুসলমান'রাই শুধু ক্ষত-বিক্ষত হননি, তীব্র যন্ত্রণা সইতে হয়েছে 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান' নামে পরিচিত মানুষদেরও। আমরা তো মওলানা আবুল কালাম আজাদের নামে মুহুর্মুহু 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি উচ্চারণ করেছি, কিন্তু পাকিস্তানবাদীদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন হিন্দুদের 'শো বয়'। এ-রকম 'শো বয়'দের সংখ্যা কম ছিল অবশ্যই, কিন্তু এঁরা কেউই গুরুত্বে খাটো ছিলেন না। আমাদের নেত্রকোনা অঞ্চলেও এরকম মানুষ দু'একজন ছিলেন। ছেচল্লিশে আমি এঁদের কাউকে দেখিনি, এমন কি নামও শুনিনি। অনেক পর দু'জনকে দূর থেকে দেখেছি, কথা বলার বা পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। এঁদের একজনের নাম মুকসেদ খাঁ, অন্যজন মিয়াফর। দু'জনকেই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের জন্যে পুলিশী নির্যাতন ও কারাযন্ত্রণা সইতে হয়েছে। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মুকসেদ খাঁ যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন বলে শুনেছি। এবং এ-কারণে স্বদেশী ডাকাতির প্রসঙ্গেও তাঁর নামটি এসেছে। মিয়াফর ছিলেন দরিদ্র কৃষক। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরও তিনি কংগ্রেসী আদর্শেই অটল ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ময়মনসিংহ শহরে তাঁকে দেখেছি। নেত্রকোনা থেকে তিনি এসেছিলেন প্রখ্যাত কংগ্রেসে নেতা মনোরঞ্জন ধরের পক্ষে

কাজ করতে। মনোরঞ্জন ধর সে-নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস'-এর টিকিটে।

ছেলেবেলা থেকেই আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরীর নাম শুনে আসছি। জমিদার-অধ্যুষিত গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বোকাইনগরের বাসিন্দা ছিলেন বলে তাঁর নামের সঙ্গে 'বোকাইনগরী' কথাটা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বোকাইনগরী নামটার সঙ্গে পরিচিত ছিল পল্লীর গৃহবধূরাও। অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক সভার তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৩৭ সালে। তিনি ইংরেজি জানতেন না। একমাত্র তিনিই না-কি সে-সময় ব্যবস্থাপক সভায় (এসেম্বলিতে) বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতার সময় এসেম্বলির দর্শক-গ্যালারির একটি আসনও খালি থাকতো না। যেমনি ব্যবস্থাপকসভায়, তেমনি জনসভায়। এমন লোকায়ত ভাষারীতিতে তিনি বক্তৃতা দিতেন যে, পল্লী বাংলার মানুষ তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে নিজেদের অন্তরের ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনতে পেতো। তিনি ছিলেন হক সাহেবের দল অর্থাৎ 'কৃষক প্রজা পার্টি'র লোক। কাজেই ছেচল্লিশ সনে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। সে-সময় পাকিস্তান-বিরোধী বলে চিহ্নিত হয়ে যান তিনি। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমি কিছুদিন গৌরীপুর রাজেন্দ্র কিশোর হাইস্কুলে মাস্টারী করেছি। তখন তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি, তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনে হয়েছে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যেমন তিনি বিরোধী ছিলেন, তেমনি ছিলেন কংগ্রেসীদেরও সমালোচক। আবার কৃষক-প্রজার অধিকারের কথা বললেও কম্যুনিস্টদের তিনি সুনজরে দেখতেন না।

ময়মনসিংহ শহরে মওলানা আলতাফ হোসেন ছিলেন একজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর সংযোগ ছিল অনুশীলন পার্টির সঙ্গে। পাকিস্তান-বিরোধী বলে আপন সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই তার ওপর ছিল অপরিসীম ক্রোধ। ১৯৫৭ সালে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন, বলা যেতে পারে এ পার্টির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কিন্তু ষাটের দশকে, আইয়ুব আমলে তাঁর ভূমিকার বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে যায়। ন্যাপের সদস্য হিসেবেই শুধু নয়, পাকিস্তান-বিরোধী অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে যিনি নূরুল আমিনদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতা করে আসছেন যৌবনকাল থেকে, সেই মওলানা আলতাফ হোসেনই পাকিস্তানের মৃত্যুর মাত্র বছর দু'য়েক আগে যোগ দিয়ে বসলেন নূরুল আমিনের পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি)-তে। আর তার ফলে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর যিনি শাসকদের দৃষ্টিতে ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী, তাঁকেই কি-না পাকিস্তানের মৃত্যু-ঘটিয়ে-সৃষ্ট স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানের দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হলো। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হয়েও রাষ্ট্রবিরোধী রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকলেন যেমন পাকিস্তান-পর্বে, তেমনি বাংলাদেশ-পর্বেও। ব্রিটিশ শাসকদের চোখে যিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী, পাকিস্তানী দৃষ্টিতে যিনি একান্ত অবাঞ্ছিত, স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর অভিধা হয়ে গেলো 'পাকিস্তানের দালাল'। এর জন্যে দায়ী অবিশ্যি তিনি নিজেই। তবু, এ এক নির্মম ট্রাজেডি। অপরাধের জন্যে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে অবশ্যই। কিন্তু তারপরও বলতে হবে : অপরাধটিই তাঁর জীবনের একমাত্র সত্য নয়। মওলানার শেষ জীবনের ক্ষুদ্র অধ্যায়টিকেই বড়ো করে দেখলে তাঁর প্রতি একান্ত অবিচার করা হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলোই তো কেটেছে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধিতার কারণে দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে। সেই ত্যাগ-প্রদীপ্ত ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত না হয়ে আমি পারি না।

মওলানা আলতাফ হোসেনকে আমি দেখেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, দু'একবার তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছি; কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার হয়নি।

একান্ত ঘনিষ্ঠ না হলেও অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম ময়মনসিংহের কলম আলী উকিলের। রাজা জগৎ কিশোর, মহারাজা সূর্যকান্ত ও মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর মতো প্রবল প্রতাপান্বিত ও ইংরেজ-সৃষ্ট নয়া সামন্ত প্রভুদের রাজধানী মুক্তাগাছার পার্শ্ববর্তী ঈশ্বরগ্রামে কলম আলী উকিলের জন্ম। রাজা-মহারাজা উপাধিতে ভূষিত এ-সব সামন্ত জমিদার ও তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের প্রজাপীড়ন ও অত্যাচার তিনি ছেলেবেলা থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং তখন থেকেই এই উৎপীড়ক শ্রেণীটির প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ তাঁর চৈতন্যে বাসা বাঁধে। তবে, তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো কথা হলো, তিনি উৎপীড়ককে উৎপীড়করূপেই দেখেছেন—সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখেননি। জমিদার-মহাজনদের 'হিন্দু' পরিচয়টিকে বড়ো করে দেখলে অবশ্যই তিনি মুসলিম লীগের একজন জাঁদরেল নেতা হয়ে যেতে পারতেন, এবং উঠে যেতেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রক্ষমতার মঞ্চে অথবা মঞ্চের কাছাকাছি। কিন্তু ব্যক্তিক উচ্চাভিলাষহীন এই মানুষটির এ-সব দিকে কোনো নজর ছিল না। সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ভূমিতে বাস করেও সাম্প্রদায়িকতাবাদী হওয়ার বদলে তিনি হয়ে উঠলেন জাতীয়তাবাদী। কলকাতা সিটি কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন, এবং ১৯২৯ সনে বিএল পাস করে ময়মনসিংহ শহরে ওকালতি করতে শুরু করেন। সেই থেকে ১৯৭৩ সনের পঁচিশে জানুয়ারি, অর্থাৎ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই শহরেই কাটিয়ে গেছেন। তাঁর সহকর্মী সতীর্থরা অনেকেই যেখানে বৈষয়িক বিচারে অনেক সফলতার চূড়া স্পর্শ করেছেন, সেখানে কলম আলী তো একজন অসফল মানুষই রয়ে গেলেন। কৃষক প্রজার স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে তিনি শেরে বাংলার 'কৃষক প্রজা পার্টি'তে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে অসাম্প্রদায়িক প্রজা-আন্দোলন করে পরবর্তী জীবনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবল প্রবক্তা হয়ে আখের গুছিয়ে নিয়েছেন—এমন অনেক বুদ্ধিমান নেতাকেই তো আমরা দেখেছি। কলম আলী সে রকম 'বুদ্ধিমান' হতে পারেননি। 'কৃষক প্রজা পার্টি' কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও এ পার্টির আদর্শকে তিনি ধরে রেখেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লিগারদের দৃষ্টিতে তিনি তো অন্য অন্য জাতীয়তাবাদীদের মতোই ছিলেন 'একঘরে' ও 'অচ্ছুৎ'। উনিশ শো চুয়ান্নর নির্বাচনে অবিশ্যি শেরে বাংলার অনুসারী রূপেই কলম আলী উকিল যুক্তফ্রন্টের টিকিটে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এর পর পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধাক্কা মোকাবেলা করে তিনি আর পাদপ্রদীপের সামনে থাকতে পারেননি। শেষ জীবনে তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় এক নিঃসঙ্গ ও ক্ষুব্ধ মানসিকতার পরিচয় আমি পেয়েছি। যেসব জাতীয়তাবাদী মুসলমান পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে আপস করতে পারেননি, পাকিস্তানী জামানায় তাঁদের প্রায় সকলকেই—কলম আলী উকিলের মতোই—নিঃসঙ্গতার বোঝা বইতে হয়েছে।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় কলম আলী সাহেবকে কিছুটা সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছিল। শুনেছি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি নীরবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সে-ভূমিকার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু আমার জানা নেই। স্বাধীনতার পর তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ হয়নি।

আরেকজন সৌম্যকান্তি শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধকে আমি ষাটের দশকে ময়মনসিংহ শহরে দেখেছি। তিনি মুজিবুর রহমান ফুলপুরী। ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানায় পাগলা গ্রাম ছিল তাঁর জন্মস্থান, সেই সূত্রে তাঁর নামের সঙ্গে 'ফুলপুরী' শব্দটা তিনি যুক্ত করে নিয়েছিলেন। বোকাইনগরীর মতো ফুলপুরীরও আসল নামটা প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল, ফুলপুরী নামেই তাঁকে এক ডাকে সবাই চিনতো। বোকাইনগরী যেমন সুরসিক লোকায়ত বক্তারূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, ফুলপুরী তেমনটি ছিলেন না। তিনিও সুবক্তা ছিলেন অবশ্যই, তবু তাঁর আসল খ্যাতি ছিল সাংবাদিক ও সম্পাদক রূপে। ময়মনসিংহ শহর থেকে কৃষক-প্রজা আন্দোলনের মুখপত্র '*সাপ্তাহিক চাষী*' প্রকাশ করেন তিনি ১৯৩৬ সনের ছাব্বিশে জুন। সেই থেকে ফুলপুরী সাহেব পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন আমৃত্যু—অর্থাৎ ঊনসত্তর সনের পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পরও পত্রিকাটি বেশ কয়েক বছর চালু ছিল। '*সাপ্তাহিক চাষী*'র বিশেষ ভূমিকা ছিল প্রজাস্বত্ব আইন পাসের ব্যাপারে। কৃষকদের নানা সমস্যা, জমিদার-জোতদার-মহাজনের অত্যাচার ও শোষণ-নির্যাতন, ধর্মীয় কুসংস্কার—এসব নিয়ে অনেক প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় মন্তব্য তিনি '*চাষী*'তে প্রকাশ করেছেন। নিজে কম্যুনিস্ট না হয়েও উত্তর ময়মনসিংহে কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচালিত টংকপ্রথা-বিরোধী সংগ্রামে আদিবাসী কৃষকদের বীরত্ব ও তাদের ওপর সরকারি নির্যাতনের বস্তুনিষ্ঠ খবর তাঁর পত্রিকায় প্রকাশের দরুন মুজিবুর রহমান ফুলপুরীকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। সুসং-দুর্গাপুর অঞ্চলে যখন হাজং বিদ্রোহ চলছিল, তখন মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের লেখা কৃষক ও আদিবাসী সমস্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধ তিনি সাপ্তাহিক চাষীতে প্রকাশ করেছিলেন। ফুলপুরীর 'চাষী'র পাতায় হাত পাকিয়েই ময়মনসিংহের অনেকে পাকা লেখক হয়েছিলেন।

প্রাদেশিক বা জাতীয় পর্যায়ের নেতা না হতে পারলেও মুজিবুর রহমান ফুলপুরী সে-সময়কার ময়মনসিংহ জেলায় সর্বজনমান্য সাংবাদিক ও রাজনীতিক ছিলেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতাপের যুগেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রচার করে গেছেন তিনি একান্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে।

অকৃদতার এই মানুষটি সারা জীবন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেছেন; কিন্তু কখনো লোভের বশবর্তী হননি। আপন নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

একাডেমিক পড়াশোনা তাঁর বেশি না থাকলেও বিদ্যাচর্চায় ছিলেন অনলস। ইস্কুলের ছাত্র থাকা কালেই স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইস্কুল ছেড়েছিলেন, পড়াশোনা ছাড়েননি। কংগ্রেস নেতা সূর্যসোমের সান্নিধ্য তাঁকে কংগ্রেসী আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। ১৯১৮ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বছর তিনি ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিছু কিছু কংগ্রেস নেতার সংকীর্ণ আচরণ, কৃষক-বিরোধী মনোভাব ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন তিক্ত বিরক্ত হয়েই এক সময় কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে তাকে মুসলিম লীগেও যোগ দিতে দেখি। ১৯২৯ সালে তো তিনি ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদকই নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী চেতনাদীপ্ত মানুষের পক্ষে যে মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে বেশি দিন সংযুক্ত থাকা অসম্ভব, কিছুদিনের মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাই, এরপর তাঁকে দেখি শেরেবাংলার কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেতে। এক পর্যায়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তার সংযোগ শিথিল হয়ে এলেও নিজের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী পরিচয়টি তিনি সারা জীবন বজায় রেখেছিলেন।

ময়মনসিংহ শহরে আলতাব আলী, ওয়াহেদ আলী, লাল মিয়া প্রমুখ কম্যুনিস্টদের পাশাপাশি ছিলেন মওলানা আলতাফ হোসেন, কলম আলী উকিল ও মুজিবুর রহমান ফুলপুরীর মতো জাতীয়তাবাদীরা। এঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের পার্থক্য ছিল অনেক। সেই পার্থক্য যে কখনো কখনো বিরোধেও রূপ নেয়নি, তা-ও নয়। তবু এঁদের ভেতরকার মূলগত মিলের দিকটিই ছিল প্রবল ও প্রখর। প্রথমত, সেই মিলটি এসেছিল জন্মসূত্রে। অর্থাৎ এঁরা সকলেই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। রাজনীতির অঙ্গনে এই সাম্প্রদায়িক পরিচয়টিকে মুছে দেয়ার অঙ্গীকার করেই কেউ হয়েছিলেন কম্যুনিস্ট বা সাম্যবাদী, কেউ ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী। কিন্তু সেদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের ভালোমন্দ দেখার একমাত্র দাবিদার সেজেছিলেন যাঁরা, সেই মুসলিম লীগ নেতাদের চোখে এঁরা সবাই হয়ে গিয়েছিলেন ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রবল প্রচারের ফলে, এঁরা আপন সম্প্রদায় থেকে হয়ে গিয়েছিলেন বিচ্ছিন্ন, এমন কি আপন পরিবারের সদস্যদেরও সন্দেহভাজন। 'হিন্দুদের দালাল' বলে কুৎসা রটানো হয়েছিল যে-জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্পর্কে, জাতীয়তাবাদের আলখেল্লা পরা অনেক সংকীর্ণ চিত্ত ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতার কাছ থেকেও তাঁদের কম আঘাত সইতে হয়নি। এ-রকম বিভিন্নমুখী আঘাত সহ্য করে করেও অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ক্ষীণশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন যাঁরা, তাঁদের উজ্জ্বল অবদানকে অস্বীকার করলে স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ চরম অকৃতজ্ঞতারই পরিচয় দেবে।

মুজিবুর রহমান ফুলপুরীর মতো জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্মকে ঠেকাতে পারেননি বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের কবর রচনা ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা যে ফুলপুরীদেরই উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন—সে-কথাই বা অস্বীকার করি কী করে?

নাসির সরকার : একজন অখ্যাত অসাধারণ মানুষ

বৃহত্তর ময়মনসিংহের যে 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান' নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও যাঁর স্নেহ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছিলাম তাঁর নাম নাসির উদ্দিন সরকার। বড়ো শহরে বা নগরে বাস করে, অনলবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে, কিংবা জাতীয় রাজনীতিতে নীতি-নির্ধারকের ভূমিকা অভিনয় করে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেননি। এ-কারণেই তাঁর একান্ত ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলটির বাইরে নাসির উদ্দিন সরকারের নাম কেউ জানে না। একাডেমিক লেখাপড়াতেও তিনি খুব বেশি এগুতে পারেননি, ক্লাস সেভেনে উঠেই স্কুল ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। কাজেই দেশের বিদ্বৎ মণ্ডলীর তালিকাতেও তাঁর নাম ওঠেনি। তবে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বলতে বাধ্য হবেন যে, নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বা ঘটনা পরম্পরার আনুকূল্যে খ্যাতনামা হয়ে যান যাঁরা তাঁদের কারো চেয়ে কম গুণী ছিলেন না এই অখ্যাত মানুষটি। আমি তো এ রকম আমুণ্ডপদনখ স্বদেশপ্রেমিক, প্রজ্ঞাবান, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী মানুষ খুব বেশি দেখিনি।

জামালপুরের একটি অখ্যাত গণ্ডগ্রাম কাপাসাটিয়া ছিল তাঁর জন্মস্থান, বাসস্থান ও কর্মস্থল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি প্রথম যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তিনি সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ এবং নানা পীড়ায় আক্রান্ত। কিন্তু কথাবার্তায় এমন সজীব যে, কোনো তরুণের মধ্যেও এ-রকমটি সচরাচর দেখা যায় না। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, কথা বলতে বলতে

নারকেলি হুঁকোয় টান দিচ্ছেন, হুঁকো টানতে টানতে কাসছেন। কাসির দমকে এক একবার কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কথার খেই হারিয়ে ফেলছেন না বা অসংলগ্ন কোনো কথাও বলছেন না। তাঁর বলিষ্ঠ জীবনদর্শন ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সেই মুগ্ধতার কথা একদিন জানিয়েছিলাম সত্যেন দা অর্থাৎ সত্যেন সেনকে। সত্যেনদার সাড়া জাগানো উপন্যাসগুলো তখন প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। আর *'সংবাদ'*-এর পাতায় লিখে যাচ্ছেন গ্রাম ও শহরের খ্যাত-অখ্যাত নানা গুণীজনের কাহিনী। আমার মুখে নাসির উদ্দিন সরকারের জীবনকথা শুনে একটুও কাল বিলম্ব না করে অসুস্থ ও ক্ষীণদৃষ্টি সত্যেন সেন কাপাসাটিয়া গ্রামে চলে গেলেন। অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উনসত্তর সনের কোনো একদিনের *'সংবাদ'*-এ নাসির উদ্দিন সরকারের জীবন ও কৃতির বিবরণ দিয়ে একটি চমৎকার রচনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু *'সংবাদ'*এর সেই সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া এখন খুবই দুরূহ।

নাসির সরকারের এক দৌহিত্র নজরুল ইসলাম খোকন ছিল আমার খুবই স্নেহাস্পদ—একেবারে সোদর প্রতিম। ষাটের দশকে সে ছিল 'ছাত্র ইউনিয়ন'-এর জেলা পর্যায়ের নেতা। সে-সময় তার কাজে-কর্মে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও প্রগতিশীলতার পরিচয় প্রকাশ পেতো। নানা নাসির সরকার নাতি খোকনের রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই উচ্চাশা পোষণ করতেন। নাসির সরকার আপনজনদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি চাইতেন না, চাইতেন তাদের কেউ না-কেউ তাঁর অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল রাজনীতির উত্তরাধিকার বহন করুক। কিন্তু তাঁর সে-আশা পূর্ণ হয়নি। তাঁর পুত্র মোয়াজ্জেম পিতার ধারাটিকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন অবশ্যই, তবে পিতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ও হারিয়ে দিয়ে তাঁর গৌরব বর্ধন করতে পারেননি। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালেই নাসির-পুত্র মোয়াজ্জেমের জীবনাবসান ঘটে। নাতি খোকন ছাত্রজীবন শেষ করে রাজনীতির ত্রিসীমানায়ও পা বাড়ায়নি, সে হয়ে উঠেছে আয়েশী 'ভদ্রলোক', মোটামুটি বৈষয়িক সমৃদ্ধিও অর্জন করেছে, খেয়ে দেয়ে চেহারাটি বানিয়েছে নাদুস নুদুস নাড়ু গোপাল।

যাই হোক, খোকনের সূত্র ধরেই নাসির সরকার আমারও নানা হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের দু'জনের ভেতর নানা-নাতির রসালাপ খুবই জমে উঠতো। নাসির সরকার শুধু প্রজ্ঞাবান দেশপ্রেমিকই ছিলেন না, ছিলেন অত্যন্ত রসিক ও বাক্‌পটুও।

একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে জন্ম নিয়ে ও প্রায়-সারাজীবন সেখানেই বসবাস করে, এমন বিপরীত স্রোতে চলার শক্তি ও শিক্ষা তিনি কোথায় পেলেন?

আমার এ রকম জিজ্ঞাসার জবাবে নাসির সরকার তাঁর শৈশব-স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ছেলেবেলায় তো আমি একেবারেই বখাটে হয়ে গিয়েছিলাম। বখাটে হওয়ার সকল উপাদান আমার চারপাশের পরিবেশের মধ্যেই ছিল। তবে আমার মহাসৌভাগ্য যে, এ-সময়ই একজন মহাপুরুষ আমাদের গ্রামে এসে আমাকে উদ্ধার করলেন। হ্যাঁ, মহাপুরুষই তাঁকে বলবো। তাঁর নাম অক্ষয় কুমার কাহালি।'

বরিশালের বানারিপাড়া থেকে অক্ষয় কুমার কাহালি কি করে জামালপুরের গণ্ডগ্রাম কাপাসাটিয়ায় এসে পড়েছিলেন, নাসির সরকার তা বলতে পারেননি। তিনি শুধু জানেন : কাহালি মহাশয় কাপাসাটিয়াতে এসে একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। মুসলমান কৃষক অধ্যুষিত ওই এলাকাটিতে তখন লেখাপড়ার কোনো চর্চাই ছিল না, লেখাপড়া করার আগ্রহও কারো ছিল

না। অক্ষয় কুমার কাহালি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্র জোগাড় করে তাঁর পাঠশালায় নিয়ে আসতেন। বেশ কয়েক বছর কাপাসাটিয়া গ্রামে বসবাস করে তিনি শিক্ষার যে আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আলোতে পথ চলা শুরু করেই এখানকার মানুষ আজ অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছে।

কাহালির পাঠশালায় শুধু লিখতে পড়তে আর অঙ্ক কষতেই শেখানো হতো না। গ্রাম্য বালকদের স্বদেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করাই ছিল কাহালি মহাশয়ের আসল উদ্দেশ্য। সে-উদ্দেশ্য সাধনে তিনি কতোটা সফলকাম হয়েছিলেন জানি না। তবে বালক নাসির সরকার যে কাহালির কাঙ্ক্ষিত মানুষটিই হয়ে উঠেছিলেন,—এ-ব্যাপারে সন্দেহ-পোষণের কোনো সুযোগই নেই। লাখে লাখে গুরু মিলতে পারে, কিন্তু একজন চেলা পাওয়াও কঠিন—এ প্রবাদটি তো আর মিথ্যে নয়। নাসির সরকারের মতো একজন চেলা পেলেই যে কোনো গুরুর জীবন ধন্য হতে পারে। অক্ষয় কুমার কাহালি এভাবেই ধন্য হয়েছিলেন।

কাহালির কাছ থেকে আদর্শবাদের দীক্ষা নিয়ে নাসির সরকার সে-আদর্শকে বাস্তব করে তোলার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কাহালি তাঁকে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। কাহালি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। হিন্দু হিন্দুর ধর্মীয় শিক্ষা ও আচার-আচরণ অনুসরণ করে নিজের চরিত্র গঠন করুক, মুসলমান চরিত্রবান হয়ে উঠুক ইসলামের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিধি বিধান অনুসরণ করে, এক ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও আচার আচরণকে শ্রদ্ধা করুক—এ-রকম একটি আদর্শই প্রচার করতেন বানারিপাড়ার অক্ষয় কুমার কাহালি। কায়মনোবাক্যে সেই আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিলেন কিশোর নাসির সরকার। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী চিন্তা ভাবনা সেই কৈশোরেই তাঁর মধ্যে চিরকালের জন্য শিকড় গাড়লো বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিশোর নাসির সরকার হয়ে উঠলেন একেবারে পাক্কা মুসলমান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিজে তো পড়তেনই, গাঁয়ের সব মানুষকেও নামাজি বানাবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। পাড়ার গরিব মানুষদের প্রত্যেককে একটা করে টুপি কিনে দিলেন এবং সবাইকে বাধ্য করলেন মসজিদে যেতে। প্রতিবেশীদের কেউ রমজান মাসে রোজা না রাখলে নাসির সরকার তার ওপর মহাখাপ্পা হয়ে যেতেন। আল্লাহ্ বা পরকালের ভয়ে না হলেও নাসির সরকারের ভয়েই তাঁর প্রতিবেশীরা রোজা রাখতো, কিংবা রোজা না রাখলেও তা প্রকাশ করতো না।

একদিকে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী উদার জাতীয়তাবাদী ও অন্যদিকে সম্প্রদায়গত ধর্ম প্রচারে রীতিমত স্বৈরাচারী—এ-রকম একটা জীবনপর্ব নাসির সরকার তাঁর প্রথম যৌবনে অতিবাহিত করেছিলেন। এ-পর্বটার স্থায়িত্ব অবিশ্যি দীর্ঘ হয়নি। অচিরেই তাঁর চিন্তা থেকে তিনি সকল রকম আনুষ্ঠানিক ধর্মের নির্মোক খসিয়ে ফেলে হয়ে ওঠেন এমন একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী, সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীদের চোখে যাঁর পরিচয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল 'নাস্তিক' বলে।

নাসির সরকারের সঙ্গে আলাপ করে আমার মনে হয়েছিল যে, কৈশোর-যৌবনের সেই সংক্ষিপ্ত ধার্মিক পর্বটিকে বাদ দিলে সারা জীবনই তিনি ছিলেন একান্ত দৃঢ়চিত্ত একজন বস্তুবাদী। এই বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টি তিনি বই পড়ে আয়ত্ত করেননি, জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এ-রকম জীবনদৃষ্টি দান করেছিল। তিনি বলতেন, 'ধার্মিক বলে পরিচিত এমন বহু হিন্দু-

মুসলমানকে আমি দেখেছি, যাদের ভেতর মনুষ্যত্বের লেশমাত্রও নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিক বা নামাজ-রোজা তাদের মানুষ বানাতে পারেনি। অন্যদিকে অতি সাধারণ মানুষ যারা নামাজ-রোজা বা সন্ধ্যা-পূজা কিছুই করে না, ধর্মশাস্ত্রের কোনো জ্ঞানই যাদের নেই, তাদের সততা আর নীতিজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।...আর, অক্ষয় কুমার কাহালি আমার ভেতর যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমার পরিচিত ধার্মিকদের কাউকেই সেই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে দেখিনি,—সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক।' বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। অনেক পরিচিত ধার্মিক হিন্দু ও মুসলমানের নাম বলে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে তিনি তাদের ভণ্ডামির পরিচয় তুলে ধরতেন। এরপর বলতেন, 'ধর্ম নিয়ে যাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাদের মধ্যেই বরং আমি সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িকতা দেখেছি। তাছাড়া কাহালি মহাশয় যে চাইতেন এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করুক, বাস্তবে তো এমনটি হওয়ার সম্ভাবনাই আমি দেখিনি। ধার্মিক নিজের ধর্মটাকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করে, অন্যের ধর্মকে বড়ো জোর সহ্য করে যেতে পারে কিংবা করুণা করতে পারে, শ্রদ্ধা মোটেই নয়।'

তাঁর এসব কথার প্রতিবাদ করে আমি নানা পাল্টা যুক্তি উপস্থিত করতাম। উদ্দেশ্য, তাঁকে রাগিয়ে দেয়া। রেগে গেলে তাঁর কথাবার্তা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতো, যুক্তিগুলো হয়ে উঠতো ক্ষুরধার। তাঁর সেই ক্রুদ্ধ অবস্থাটা আমার কাছে আরো বেশি উপভোগ্য মনে হতো, ক্রুদ্ধ নাসির সরকারের মুখ থেকে অনেক অপ্রিয় ও নির্জলা সত্যকথা বেরিয়ে আসতো।

তাঁর সত্য প্রকাশের ও যুক্তি প্রয়োগের পদ্ধতিটি ছিল একান্ত মৌলিক। যুক্তিবিদ্যার পুঁথিতে এ-রকম পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাঁর এক ছোট ভাই এক মশহুর পিরের মুরিদ হয়ে প্রচণ্ড রকমের ধার্মিক হয়ে উঠেছিলেন। পির ভাইদের সঙ্গে মিলে নানা রকম ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় তিনি মত্ত হয়ে থাকতেন, সংসারের দিকে প্রায় কোনো নজরই দিতেন না, পিরের সন্তুষ্টি বিধান আর উরস মোবারকের জন্য প্রচুর পয়সাকড়ি খরচ করে করে তিনি প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। অগ্রজ নাসির সরকার এ সবের জন্য তাঁকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করতেন, উগ্র ধার্মিকতার পথ থেকে তাঁকে স্বাভাবিক সংসার জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতেন। বলতেন, 'দেখ, তুই যেভাবে পিরবাদের পেছনে ছুটে টাকা-পয়সা নষ্ট করছিস, তাতে তোর দেউলে হয়ে যেতে বেশিদিন লাগবে না। তুই তো ভিক্ষে করেও পেটের ভাত জোগাতে পারবি না।'

পিরভক্ত ছোটভাই এসব কথাকে মোটেই আমল দিতেন না। পরম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলতেন, 'কি যে বলেন মিয়াভাই! এই দুনিয়ার জীবনটা ক'দিনের? আজ আছে তো কাল নেই। দেহটা মিশে যাবে মাটিতে, চিরকাল থাকবে আত্মা। সেই আত্মার উন্নতির কথা ভাবতে হবে না?'

'আত্মা!' ভীষণ রেগে যেতেন নাসির সরকার। 'ওরে গর্দভ, আত্মা আত্মা যে জপছিস, আত্মাকে দেখেছিস কখনো? আত্মা থাকে কোথায় বলতে পারিস?'

—'এটা আবার কেমন কথা হলো মিয়া ভাই? আত্মা কি দেখা যায় নাকি? আত্মা তো চোখে দেখার বস্তু নয়। তবু আত্মা যে আছে সে-ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। আত্মা আছে বলেই তো আমরা বেঁচে আছি, আত্মা যখন দেহে ছেড়ে চলে যাবে তখনই তো মরে যাবো।'

—'হুঃ আত্মা আছে বলেই বেঁচে আছিস! আত্মা তোর দেহের ভেতরেই আছে। বেশ, আত্মা থাকুক আত্মার জায়গায়।...এখন আয় তুই আমার কাছে, তোর নাকমুখ আমি জোরে চেপে ধরে রাখি, দেখি তো তুই কতক্ষণ বাঁচতে পারিস।'

ছোট ভাই জিভ কামড়ে ধরে বলেন, 'ও মিয়া ভাই, এটা কি করে হয়? নাকমুখ চেপে ধরে রাখলে বেঁচে থাকবো কি করে? বাতাস টেনে নিতে না পারলে দম বন্ধ হয়েই তো মারা যাবো।'

—'হুঃ বাতাস টেনে নিতে না পারলে মরে যাবি, এটাই যদি বুঝিস, তবে বল—বাতাসই আত্মা! তা হলে আর অতো আত্মা আত্মা করিস কেন?'

—'না, না। বাতাস আত্মা হবে কি করে? আত্মা তো...মানে...'

—'মানেটা আবার কি?' প্রচণ্ড ধমকে ওঠেন নাসির সরকার। 'মানলাম, বাতাস আত্মা নয়। এখন মনে কর, তোর নাকমুখ চেপে ধরলাম না, কেবল একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে তোর শরীরের সব রক্ত টেনে নিয়ে গেলাম। বাঁচবি তুই?'

—'না, না। রক্ত না থাকলে মানুষ বাঁচে কি করে?...

—'তা হলে বল্—রক্তই আত্মা।...জানি, তা-ও তুই বলবি না। বাতাস না হলেও মানুষ বাঁচে না, রক্ত না থাকলেও বাঁচে না—একথা বলবি, আবার বলবি বাতাসও আত্মা না, রক্তও আত্মা না। আত্মা তা হলে কি?'

নাসির সরকারের যুক্তির জবাব দিতে না পারলেও তাঁর ছোট ভাই নিশ্চয়ই আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেননি। কিন্তু নাসির সরকারের যুক্তির অভিনবত্বকে অস্বীকার করা কঠিন। কোনো যুক্তিবাদী দার্শনিক এমন ধারা যুক্তি কখনো প্রয়োগ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। ধার্মিক বা ভাববাদীরা তো নাসির সরকারের এসব যুক্তিকে একান্ত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই বলবেন না। দার্শনিক বস্তুবাদীরাও হয়তো এগুলোকে নিতান্ত স্থূল যুক্তি বলে অবজ্ঞা করবেন। কিন্তু, আমি জানি, নাসির সরকারের জীবনদৃষ্টি বা জীবনাচরণে কোনো স্থূলতা ছিল না। তাঁর বস্তুবাদ হয়তো দর্শনের নিরিখে একান্ত সরল বস্তুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও, মানতেই হবে, সরল হলেও তাঁর নিজের কাছে তা ছিল খুবই সবল। প্রবল কাণ্ডজ্ঞানই ছিল তাঁর এই বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তি। তাই, কোনো কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ সারা জীবন তিনি করেন নি। আর নিজের বিশ্বাসে তাঁর দৃঢ়তা এমন প্রচণ্ড ছিল যে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সে-বিশ্বাসে এতোটুকু চিড় ধরেনি। পরিণত বয়সে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, মুহুর্মুহু সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন আবার সামান্য সময়ের জন্য সংজ্ঞা ফিরে আসছে, তখন আত্মীয়-পরিজনরা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছে কোথায় তাঁকে কবর দেয়া হবে। তিনি প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন যে, কবরের ব্যাপার নিয়ে তাঁর কোনো মাথা ব্যথা নেই।

'মরার পর আমার লাশটা নিয়ে তোদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারিস। গলায় দড়ি লাগিয়ে জঙ্গলেও ফেলে রাখতে পারিস।'—একান্ত নির্লিপ্তির সঙ্গে এ-রকম কথা বলে পাশ ফিরে শুয়েছেন।

মৌলবী সাহেব এসে তাঁকে অন্তিম 'তওবা' করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে যেন হঠাৎ পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নিয়ে জেগে উঠলেন আত্মবিশ্বাসে অবিচল নাসির সরকার।

-'কিসের তওবা? আমি কি জীবনে কোনোদিন চুরি-জুয়াচুরি-বাটপাড়ি করেছি নাকি? তওবা করবো কেন?'

তাঁর এই জীবনভাবনার সমালোচনা অবশ্যই করা যেতে পারে, তাঁর সমালোচকের অভাবও ছিল না। শুধু সমালোচক নয়, তাঁর শত্রুর সংখ্যাও ছিল অগণ্য। এবং সেই শত্রুরা ছিল প্রবল প্রতাপশালী। শত্রুরা যে কতবার কত দিক থেকে তাঁর ওপর আঘাত হেনেছে তার বর্ণনা দেয়া কঠিন। কিন্তু কোনো আঘাতই তাঁকে এতোটুকু হেলাতে পারেনি। বাইরের শত্রুকে যেমন সাহসের সঙ্গে সার্থকভাবে মোকাবেলা করেছেন, তেমনি নিজের ভেতরকার সব দুর্বলতাকেও তিনি অনায়াসে জয় করেছেন। কোনোরূপ দোদুল্যমানতাকে জীবনে কখনো প্রশ্রয় দেননি, এমন কি মৃত্যুর মুহূর্তেও না।

গুরু অক্ষয়কুমার কাহালির কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন শিষ্য নাসির সরকার, সে শিক্ষার অন্তঃসারটুকু সমস্ত জীবন ধরে আপন সত্তায় তিনি ধারণ করেছেন। আবার, নিজস্ব জীবনদর্শনটি গড়ে নিতে গিয়ে গুরুকে তিনি অনেক দূর ছাড়িয়েও গিয়েছিলেন। গুরুর শিক্ষার ভাববাদ বর্জন করে শিষ্য হয়েছিলেন বস্তুবাদী, এবং গুরুর দেয়া স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবাদের শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে গুরুর চেয়ে অনেক বেশি কঠোর পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। শিষ্যের কাছে পরাজিত হওয়াতেই গুরুর গৌরব। নাসির সরকারের গুরু অক্ষয় কুমার কাহালি সে-রকম গৌরবই লাভ করেছিলেন।

বস্তুবাদী জীবনদর্শনের ধারক হয়েও নাসির সরকার কিন্তু কমুনিস্টদের রাজনীতিকে গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আলোচনায় পরে আসছি। এখানে তাঁর জীবনদর্শনের সম্পর্কেই দু'চার কথা মাত্র বলে নিলাম।

নাসির সরকারের রাজনীতি ও আত্মসমালোচনা

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন যে-সব জাতীয়তাবাদী বাঙালি মুসলমান, তাঁদের অনেকের মতোই জামালপুরের নাসির সরকারও কৃষক প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে নাসির সরকারের রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসী পর্বটাই ছিল প্রধান। অনেক বছর ধরে তিনি জামালপুর মহকুমা কংগ্রেসের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। সে-সময়কার জামালপুরে তাঁর সহকর্মী জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে নাসির সরকারের স্মৃতিচারণে বার বার ঘুরে ঘুরে আসতো ডাক্তার মহসীন, ডাক্তার ওয়াসিম উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন আহমদ, আবদুল হামিদ মোক্তার, তৈয়ব উদ্দিন—এ-রকম কয়েকজনের নাম। এরা সবাই ছিলেন জামালপুরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। এরা যে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদে সবাই সারাজীবন সমান দৃঢ় থাকতে পারেননি,—সে কথা স্মরণ করে নাসির সরকার প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করতেন। কিন্তু সহকর্মীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে ছিটকে পড়লেও কোনোরূপ ঝঞ্ঝাবাত্যাই নাসির সরকারকে তাঁর অবস্থান থেকে তিল পরিমাণও সরিয়ে নিতে পারেনি।

ছেচল্লিশে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তিনি নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। এটা ছিল একটা সাংঘাতিক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান জিন্দাবাদ-এর বিরুদ্ধে 'জয়হিন্দ' উচ্চারণ করে তিনি তো বলতে গেলে আপন সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত সদস্যকেই শত্রু বানিয়ে ফেললেন। সন্ধ্যায় নির্জন রাস্তায় তাঁকে একা পেয়ে শত্রুরা লাঠিসোটা নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচণ্ড

প্রহারে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ভেবে ওরা তাঁকে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে গেলো। খবর পেয়ে সেখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আবদুল গফুর সাহেব সংজ্ঞাহীন নাসির সরকারকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ময়মনসিংহে পাঠিয়ে দিলেন। ময়মনসিংহের কংগ্রেস নেতারা সূর্যকান্ত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাঁকে সারিয়ে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু লাঠির আঘাতে তার পাঁজরের তিনটি হাড় ভেঙে যাওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক শক্তি তিনি কোনো দিনই ফিরে পাননি।

এসবের পরও তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন না। তাঁর বাক্সে যে ভোট পড়েনি, ভোটের বদলে পড়েছে ছেড়া জুতোর টুকরো, কাটা চুলের গোছা, ডিমের খোসা, মাছের কাঁটা এবং আরো নানা রকম আবর্জনা রাশি—এসব কথা রসিয়ে রসিয়ে বলতে বলতে এক সময় হো হো করে হেসে উঠেছেন।

তাঁর সঙ্গে এসব নিয়ে আমার কথা হয়েছে উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময়। সে-সময় দেখেছি : গাঁয়ের বাড়িতে বসে থেকেও তিনি আন্দোলনের খুঁটিনাটি খবর রাখছেন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবার কখনো কখনো গম্ভীর হয়ে গেছেন। স্মরণ করেছেন পাকিস্তানের জন্মের সময়টির কথা। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন থেকে শুরু করে সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের সময়ের অনেক কথা বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

-'জিন্নাহর বাপের সাধ্য ছিল পাকিস্তানের জন্ম দেয়ার? কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতারাই তো জিন্নাহর হাতে পাকিস্তান তুলে দিয়েছে।'

নিষ্ঠাবান ও পোড় খাওয়া কংগ্রেসী নাসির সরকারের মুখে হঠাৎ এমন কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। তাহলে কি ভেতরে ভেতরে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন? বাইরেই কেবল কংগ্রেস অনুরাগের মুখোশ এঁটেছিলেন?

না, তাঁর বিশ্লেষণ শুনে বুঝলাম : এ-রকম ভাবনা অমূলক, এমন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির এ-ধরনের দুর্বলতা কিংবা কপটতা থাকতেই পাবে না। আসলে নাসির সরকার ছিলেন প্রবল কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। তাঁর আদর্শনিষ্ঠা ছিল অবশ্যই, কিন্তু দলপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে অপ্রিয় সত্যকথন থেকে বিরতও থাকতেন না। জিন্নাহর 'চৌদ্দ দফা' দাবি কংগ্রেসের মেনে নেয়া উচিত ছিল বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, এ দাবি মেনে নিলে মুসলিম লীগ এরকম সংহত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতেই পারতো না। বিয়াল্লিশ সাল থেকে সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনায় তিনি কংগ্রেসের একগুঁয়েমী ও সংকীর্ণ চিন্তা লক্ষ করেছেন। তাঁর চিন্তার সঙ্গে মওলানা আবুল কালাম আজাদের অনেক বক্তব্য মিলে যেতে দেখেছি। অথচ, আমি জানি, মওলানার '*ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম*' তিনি পড়েননি। নাসির সরকার তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থেকেই সিদ্ধান্তে পৌছতেন, অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না।

সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছেন তিনি পাকিস্তানের জন্মের পর অনেক 'হিন্দু' কংগ্রেস নেতার আচরণে। তাঁরা তো এদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারতে পাড়ি দিলেন, নাসির সরকারের মতো 'মুসলমান' কংগ্রেসীদের কথা কিছুই ভাবলেন না। তাঁর একজন অতি শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতার নাম উল্লেখ করে নাসির সরকার একদিন ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, "জানেন, উনি যখন ভারতে চলে যান, আমাকে উপদেশ দিলেন অন্য অন্য 'মুসলমান কংগ্রেসী'দের নিয়ে 'পাকিস্তান মুসলিম লীগে' যোগ দিতে। তাঁর যুক্তিটা ছিল এরকম :

আমাদের মতো জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সবাই মুসলিম লীগে যোগ দিলে ওই দলটি তার চরিত্র বদলাতে বাধ্য হবে। পরিণামে এটি আর সাম্প্রদায়িক থাকবে না।...এ-রকম খোঁড়া যুক্তি আমার পক্ষে মেনে নেয়া অসম্ভব। কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী অবিশ্যি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন, তবে তাঁরা মুসলিম লীগের চরিত্র বদলাতে পারেননি। বরং তাঁরা নিজেরাই বদলে গিয়ে ঘোর সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও সাম্প্রদায়িক হয়ে যান।"

মুসলিম লীগে তিনি যোগ দেননি। আওয়ামী লীগ দলটিকেও পছন্দ করে উঠতে পারেন নি। যে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের মডেল মনের ভেতর খাড়া করে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে কোনো দলেরই তিনি মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অনেক কংগ্রেসীর ভেতর সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি দেখে তিনি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছেন ঠিকই, তবু কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর নিজস্ব আদর্শের অনেকটাই প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন বলে এ দলটির সঙ্গে নিজের সমগ্র সত্তাকে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানে কংগ্রেস নামে কোনো দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সার্থকতা আছে বলেও তিনি মনে করতেন না। তাই নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত কুমার দাস, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ যেসব কংগ্রেস নেতা পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাননি, তাঁরা যে 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' নামে দলটি গড়ে তুলেছিলেন সেটির সঙ্গেও সংযুক্ত থাকার উৎসাহ তিনি হারিয়ে ফেলেন।

খুবই চিত্তসংকটে কেটেছে তাঁর পাকিস্তান-পরবর্তী প্রথম দশটি বছর। এ সময় কোনোরূপ দলীয় রাজনীতির সঙ্গেই তার কোনো সংশ্রব ছিল না। তবে, ইস্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিরকালই ছিল তাঁর সীমাহীন উৎসাহ। সেই উৎসাহ তাঁকে বহু বছর মাতিয়ে রেখেছিল। এলাকায় অনেকগুলো ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। নিজের বাড়িতেই তিনি একটি মেয়েদের ইস্কুল খুলেছিলেন, যদিও বেশিদিন সেটিকে টিকিয়ে রাখতে পারেননি।

পাকিস্তানের জন্মের দশ বছর পরে, ১৯৫৭ সালে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে তার সদস্য তিনি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণেই দলের কাজকর্মে খুব একটা সক্রিয় থাকতে পারেননি।

অসাম্প্রদায়িকতার বিষয়টির ওপর তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিতেন, সাম্প্রদায়িকতাকেই মনে করতেন আমাদের জাতীয় দুর্গতির মূল কারণ। এই সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যে মোটেই সহজসাধ্য নয় তাও তিনি জানতেন। বলতেন, 'আমাদের চারপাশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এমনভাবে ছড়ানো যে একটু অসাবধান হলেই একান্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষটিও তার অজ্ঞাতসারেই এই বিষে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অসাম্প্রদায়িক হওয়া মোটেই সোজা নয়। এর জন্য রীতিমত সাধনা করতে হয়, প্রতিনিয়ত আত্মসমালোচনা করে করে চলতে হয়।'

আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতেই নিজের দুর্বলতার দিকটাও একদিন আমার কাছে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখুন, আমাকে তো আপনারা অসাম্প্রদায়িক বলে খুব প্রশংসা টশংসা করেন। অথচ, আমি কিন্তু জানি, আমার ভেতরেও সাম্প্রদায়িকতা কিছু না কিছু আছেই।...কলকাতায় সে-বার ফুটবলে মোহনবাগান আর মোহামেডান দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই তো খেলার ফলাফল জানার কোনো সুযোগ ছিল না, সে সময় তো আর এখনকার মতো রেডিও ছিল না গ্রামে গঞ্জে। কী করে খবরটা পাই? কেন্দুয়া কালীবাড়ি ইস্টিশনে গিয়ে কলকাতায় একটা টেলিগ্রামই করে ফেললাম খেলার খবর জানার

জন্যে।...কিন্তু কেন? কয়েকদিন পর নিজের মনকেই প্রশ্নটা করলাম। আসলে আমি মনে মনে চেয়েছিলাম মুসলমানের দল মোহামেডান খেলায় জিতুক। জিততে পারবে কি-না, সে-বিষয়ে খানিকটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও ছিল।...এই যে মুসলমানদের দলকে বিজয়ী দেখার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা, এটা তো সাম্প্রদায়িক চিন্তা ছাড়া আর কিছুই না। আমার ভেতরেও এ ধরনের সাম্প্রদায়িক ভাবনা বাসা বেঁধে আছে এটা যখন আবিষ্কার করলাম, তখন নিজেকে ধিক্কার না দিয়ে পারলাম না।"

সব ব্যাপারেই তিনি আত্মসমালোচনা করতে জানতেন। একদিন তিনি বলছিলেন, তাঁর বড়ো মেয়ে রাজিয়া খাতুনের কথা। রাজিয়া খাতুনের যখন বারো/তেরো বছর মাত্র বয়স, তখন থেকেই তাকে নিয়ে তিনি কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে যেতেন, কংগ্রেসের মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের বহু হিন্দু মেয়েই সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য ছিল, কিন্তু জামালপুর মহকুমার কাপাসাটিয়ার মতো গণ্ডগ্রাম থেকে কোনো মুসলমান মেয়ে কলকাতায় গিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবে, এ-রকমটি সে যুগে, সেই সাঁইত্রিশ/আটত্রিশ সনের দিকে ছিল অসম্ভব ও অচিন্তনীয়। কিন্তু নাসির সরকার অতি সহজেই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। গ্রাম-সমাজে রীতিমত টিটি পড়ে গেলো। তবু নাসির সরকার অবিচল। মেয়েকে অবরোধের বাইরে নিয়ে এলেন, যথা সম্ভব লেখাপড়াও শেখালেন। তবে সমস্যা দেখা দিলো মেয়ের বিয়ে নিয়ে। এরকম বেপর্দা মেয়েকে বৌ করে নেবে কে?

এ সময় প্রখ্যাত কবি আবদুল কাদিরের পক্ষ থেকে তাঁর কোনো এক আত্মীয় রাজিয়া খাতুনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। সম্ভবত কলকাতায় কংগ্রেসের কোনো সভায় রাজিয়া খাতুনকে দেখে কবি তাঁকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন।

নাসির সরকার কবির গ্রামের বাড়িতে গেলেন। কবির পিতার সঙ্গে দেখা করে ও তাঁদের বাড়ির মানুষের চালচলন দেখে নাসির সরকার সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। পরে কবি আবদুল কাদির বিয়ে করেছিলেন কমরেড মুজাফফর আহমদের মেয়েকে।

চিরকুমারী রাজিয়া খাতুন সারা জীবন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর পিতার মনে একটা গ্লানি ছিল কন্যার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেননি বলে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "কবি আবদুল কাদিরের বাড়ির মানুষের চাল-চলনে আমি আধুনিকতার ছাপ দেখতে পাইনি বলে ও-বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিইনি। এটি ছিল আমার একটি অবিবেচক সিদ্ধান্ত।...আরে, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা তো এলো এই সেদিন। আমি নিজেই বা কতোখানি আধুনিক! অথচ, নিজেকে অতি বড়ো আধুনিক মনে করে কী প্রচণ্ড অহংকারই না পোষণ করতাম। এই অর্থহীন অহংকার দিয়েই আমার মেয়ের জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম।"

নাসির সরকার চুলচেরা আত্মবিশ্লেষণ করেছেন, নিজের দোষত্রুটি আবিষ্কার করে সে-সবের সরল স্বীকারোক্তি করেছেন, কিন্তু একদিনের জন্যও নৈরাশ্য বা হতাশাকে প্রশ্রয় দেন নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের ভেতর প্রচণ্ড আশাবাদটি তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন।

কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে তিনি কোনোদিনই যুক্ত হননি বটে, কিন্তু কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল অত্যন্ত গভীর। পাকিস্তান আমলে বহু আত্মগোপনকারী কম্যুনিস্ট নেতা ও

কর্মীকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। কমরেড মনি সিংহ, খোকা রায়, অজয় রায়, মন্মথ দে সহ বহু কম্যুনিস্ট নেতা আত্মগোপন অবস্থায় তাঁর বাড়িতে অবস্থান করেছেন, পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি পার্টিকে অর্থ সাহায্যও করেছেন।

কমরেড আশু দত্ত ছিলেন জামালপুরের একজন ডাকসাইটে কম্যুনিস্ট নেতা। তাঁকে ধরার জন্য পাকিস্তানের গুপ্ত পুলিশ কম চেষ্টা করেনি। নাসির সরকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, এরকম আঁচ করতে পেরে আইবি-র একজন লোক একদিন হাজির হলো তাঁর বাড়িতে। নাসির সরকারকে জিজ্ঞেস করলো, "আশু দত্ত কোথায় থাকে বলতে পারেন?"

নাসির সরকার বললেন, "আমি কি করে বলবো? আমি হচ্ছি একজন মুসলমান, আর আশু দত্ত হিন্দু। তার সঙ্গে কি আমার কোনো আত্মীয়তা আছে যে তার খোঁজ আমি রাখবো?"

—"আত্মীয় না হোক, আপনারা দুজনেই রাজনীতি করেন তো। তাই তার খবর আপনার জানা থাকার কথা।"

—"আরে, আমি তো রাজনীতি করতাম সেই কবে। আমি ছিলাম কংগ্রেসী আর আশু দত্ত হলো গিয়ে কম্যুনিস্ট। তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?"

—"না, না। আমি তো শুনেছি আশু দত্ত আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই তার খবর তো আপনি নিশ্চয়ই রাখেন।"

এইবার নাসির সরকার তাঁর চোয়াল শক্ত করে বিদ্রূপভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকান আইবি-র লোকটির দিকে। গম্ভীর হয়ে বলেন, "ও আপনি জেনে ফেলেছেন যে আশু দত্ত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?"

—"হ্যাঁ, আমি তা জানি।"

—"বেশ ভালো কথা। তাহলে এটা জানেন না যে, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর খবর জানলেও আমি আপনাকে তা বলবো না? আপনি জিজ্ঞেস করলেই আমি আমার বন্ধুর সব খোঁজ খবর আপনাকে জানিয়ে দেবো, আর আপনি তাকে এরেস্ট করে নিয়ে যাবেন—এমন বুদ্ধি আপনাকে কে জোগালো? এ রকম বুদ্ধি নিয়ে আপনি আইবি-র চাকরি করেন? আপনার মতো একটা গবেটকে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কি করে যে মাইনে দিয়ে পোষে আমি তো তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।"

মুখ চুন করে বুদ্ধি বিভাগের বুদ্ধির ঢেঁকিটি চলে গেলো।

বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়ে গেলে অশক্ত দেহ নিয়েও নাসির সরকার এর সক্রিয় সমর্থনে এগিয়ে এলেন। মুক্তিবাহিনীতে গ্রামের তরুণদের যোগদানে উদ্বুদ্ধ করা থেকে শুরু করে আরো নানাভাবে মুক্তিসংগ্রামীদের সহায়তা দিয়ে চললেন গ্রামের বাড়িতে বাস করেই। পাকিস্তানের মৃত্যু ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম নাসির সরকারের মনেপ্রাণে অমিত উৎসাহ ও আনন্দ এনে দিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনের যে আকাঙ্ক্ষা সারা জীবন ধরে লালন করে আসছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তারই বাস্তব রূপায়ণ ঘটবে বলে তাঁর প্রত্যয় জন্মেছিল।

কিন্তু উনিশ শো পঁচাত্তরের আগস্টের পর থেকে মৃত পাকিস্তানের ভূত যেভাবে বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসলো তাতে আজীবন সংগ্রামী নাসির সরকারের প্রাণে তীব্র বেদনার সঞ্চার ঘটলো। সেই বেদনা নিয়েই আটাত্তর সনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ধুতি-লুঙ্গি দ্বন্দ্বসমাস ও দ্বিজাতিতত্ত্ব

গ্রামবাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পোশাক কী ছিল?

প্রশ্নটির উত্তর-সন্ধানের আগেই বলে নিই যে, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' এবং এর বিপরীতে 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' বলতে আমি কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা বোঝাতে চাইছি না। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সাধারণভাবে যারা 'সাধারণ মানুষ' বলে পরিচিত, অর্থনৈতিক বিচারে যারা বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত, তারাই 'সংখ্যাগরিষ্ঠ'; এর বিপরীত অবস্থান যাদের তারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ।

উত্তরে যদি বলি 'ন্যাংটি', তা হলে অনেকেই হয়তো এটিকে ঠাট্টা বলে মনে করবেন। কিন্তু আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। একেবারে আক্ষরিক অর্থে যাকে ন্যাংটি বলে তা হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠের সকলের পোশাক ছিল না, তবু কোমরে যেটুকু কাপড় জড়িয়ে রেখে কোনো রকমে লজ্জা-নিবারণের ব্যবস্থা করা হতো তাকে ন্যাংটিরই একটুখানি শোভন সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। (ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে 'ন্যাংটি' শব্দটা তো 'লেঙ্গটা' বা 'লেঙ্গটি' শব্দেরই উচ্চারণভেদ মাত্র। আর 'লেঙ্গট' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃতি 'লিঙ্গপট্ট' থেকে, যার আভিধানিক অর্থ দাঁড়িয়েছে—'পুরুষের লজ্জাস্থান মাত্র আবৃত করে এমন কৌপীন বিশেষ'।)

সচেতন পরিকল্পনা-মাফিক তৈরি গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত পরিধেয় তো ছিল একান্তই শৈল্পিক, তবু সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল গান্ধীকে বলতেন 'আধা-ন্যাংটা ফকির'। সে-বিচারে গ্রামবাংলার মেহনতি কৃষকদের অনকেকেই 'সিকি ন্যাংটা'র বেশি কিছু বলা যেতো না নিশ্চয়। ছেলেরা তো আট/নয় বছর বয়স পর্যন্ত ন্যাংটিও পরতো না, ন্যাংটাই থাকতো। 'ভদ্রলোক'দের রীতিনীতি 'ছোটলোক'দের কাছে সবযুগেই অনুকরণযোগ্য বিবেচিত হয় বলে, গ্রামবাংলার 'ছোটলোক'রা যে পোশাকে-আশাকে ভদ্রলোকদেরই অনুকরণ করবে, তেমনটিই তো স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক অনুকরণ-মূলক আচরণ থেকেই সমস্ত বাঙালি জাতির জন্যে সর্বজনমান্য না হলেও বহুজনমান্য একটা পোশাক রূপ পেয়ে যায়। সংখ্যালঘু ভদ্রলোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি, ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে, যে-পোশাক পরতো তার নাম ধুতি। কালের বিবর্তনে এই ধুতিই 'ইতর-ভদ্র' সকল বাঙালির স্ট্যান্ডার্ড পোশাক হিসেবে মান্যতা পেয়ে যায়। প্রথমে এই ধুতির সঙ্গে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করার জন্যে ছিল চাদর নামক অপর একটি বস্ত্রখণ্ড, পরে তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় পাঞ্জাবি। অনেক কাল ধরে ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদরের কম্বিনেশনই 'ভদ্র' বাঙালির পরিচিতিকে ধারণ করে, এবং 'ইতর' সাধারণও এই পরিচ্ছদকেই জাতে ওঠার জন্যে মনে করে অপরিহার্য।

ধুতি বোধ হয় ন্যাংটিরই সাম্প্রসারিত রূপ, তাই এখনো ন্যাংটি হচ্ছে ধুতির একান্ত অনুষঙ্গ। ধুতিটাকে কোমরে পেঁচিয়ে এর বাঁ দিকের যে-অংশটাকে সামনে থেকে পেছনে নিয়ে গুঁজে দেয়া হয়, সেটি আসলে ন্যাংটিরই ভদ্র সংস্করণ হয়ে নাম পেয়েছে কাছা (সংস্কৃত 'কচ্ছ' শব্দের তদ্ভব রূপ)। কাছারই বিপরীত কোঁচা। অর্থাৎ ধুতির ডান দিকের যে-অংশটাকে পাট করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তারই নাম কোঁচা। এই কোঁচাটি তো শুধু পাট করা কাপড় মাত্র নয়, সমাজে এটি অহংকার ও মর্যাদার প্রতীক। সমাজে, বিশেষ করে ভূসম্পত্তি-কেন্দ্রিক সমাজে, ব্যক্তির অহংকার ও মর্যাদা নির্ধারণ হয় মূলত বংশ পরিচয় দিয়ে। এরপর বিত্ত ও বিদ্যার স্থান। এ-সবের অনেক কিছুই ঘাটতি আছে যাদের তারাও যখন অহেতুক অহংকারবশে মর্যাদা-সম্পন্ন হতে চায়, তখন আশ্রয় নেয় ওই সমাজ-স্বীকৃত প্রতীকটির। প্রতীকটি দিয়েই আসলটি না-থাকার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায়, প্রতীকের প্রদর্শনী দিয়েই

অপরকে বিভ্রান্ত করে নিজে তৃপ্ত হতে চায়। সব সময় যে সবাইকে বিভ্রান্ত করে রাখা যায় তা অবশ্যই নয়। লোকের কাছে প্রতারণটা ধরা পড়ে যায় বলেই তো ওই ধরনের কপটাচারী পোশাকধারীদের সম্পর্কে প্রবাদ তৈরি হয়েছে—'বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন'।

এ-রকম কপটাচারী যারা নয়, তারাও অবিশ্যি তথাকথিত ভদ্র সমাজ-নির্ধারিত প্রতীকগুলোকে মান্য না করে পারে না। আটপৌরে জীবনে যেমন-তেমন করে চালিয়ে দিলেও বিশেষ দিন-ক্ষণে বা বিশেষ স্থানে ওই প্রতীকাশ্রয়ী তাদের হতেই হয়। কিন্তু সঙ্গতিতে কুলোয় না বলে ওই প্রতীকটিকে তারা কখনো ধরতে পারে না। তখন তারা প্রতীকেরও প্রতীক বানিয়ে তা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়, এবং সেটাই তাদের সামাজিক প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়।

কথাগুলো খুবই এ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে গেলো। বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে নেয়া যাক।

গ্রামের একজন সাধারণ গৃহস্থ কৃষক বা স্বল্পবিত্ত মানুষের চোখেও ধুতি-চাদর-জুতা পরা 'ভদ্রলোক'রা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। কিন্তু সে নিজে ওই পোশাকটি পরতে পারে না। কেবল যে আর্থিক অসংগতির জন্যেই পারে না, তা নয়। জীবিকার জন্যে তাকে যেভাবে সব সময় জলকাদায় ধূলিমাটিতে গড়াগড়ি দিতে হয় তাতে ওই পোশাকটি পরে 'বাবু' সেজে বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। অথচ, বাবুর প্রতীক ওই পোশাকটির প্রতি তার ভারি দুর্বলতা। উৎসবের দিনে বা কুটুম বাড়িতে গেলে, এ-পোশাকটি পরে সে বাবু হওয়ার খায়েশ মেটায়। সকলে অবিশ্যি তা-ও পারে না, দারিদ্র্যই সে-ব্যাপারে বাধা। তারা অনেকেই, আমি দেখেছি, খাটো একটা ধুতি পরে, কারো কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে-আনা একটা পাঞ্জাবি বা শার্ট (তা-ও আবার হয়তো ছেঁড়া) কাঁধের ওপরে ফেলে (গায়ে দিয়ে নয়) আত্মীয় বাড়ি যায়। এটিতেই তার বাবুত্বের শখ মেটে, এবং এটিকেই আমি বলছি প্রতীকের প্রতীক সৃষ্টি। সারা রাস্তা জলে কাদায় খালি পায়েই হেঁটে যায়, জুতা জোড়া থাকে হাতে। তারপর কুটুম বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে কোনো পুকুরে বা ডোবায় পা ধুয়ে নিয়ে জুতা জোড়া পায়ে দেয় ও কুটুম বাড়িতে গিয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে এমন দৃশ্য, চল্লিশ/পঞ্চাশ বছর আগেও, অনেকেরই নিশ্চয় চোখে পড়েছে।

যাই হোক, বলছিলাম ধুতির কথা। ধুতিই হয়ে উঠেছিল হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকল বাঙালির স্বীকৃত পোশাক। কাজী নজরুল ইসলামের মতো সমন্বয়বাদী কবি যেমন ধুতি পরতেন, তেমনি পরতেন আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক-সাংবাদিকও। কোট-প্যান্ট পরা সাহেব বাঙালিও অবশ্যই ছিলেন, তবু বাঙালি মাত্রেরই ধুতির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ। তাই, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার' অতি-আধুনিক বিলাত-ফেরত নায়ক অমিত রায় বা অমিট্রেকেও অতি যত্নে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখি। 'আধুনিক' বলে যাঁরা পরিচিত হতে চাইতেন তাঁরাও, চল্লিশের দশকেও, কোট-প্যান্টের চেয়ে ধুতি-পাঞ্জাবিকেই বেশি মর্যাদা দিতেন। এরই প্রমাণ পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রকাশিত কোনো এক অজ্ঞাতনামা কবির একটি ব্যঙ্গ কবিতাতেও। তখনকার একটি রম্য পত্রিকায় 'আধুনিক' শিরোনামে এই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। একজন যুবককে 'আধুনিক' হতে হলে কী কী করতে হবে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তারই বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছিলেন,—

রোগা লিক্‌লিকে চেহারাটা হবে,
বুকের পাঁজরা সব দেখা যাবে।
দিতে হবে চুলে বিশিষ্ট ছাট,

বিলিতি সেলুনে ইংলিশ কাট।
গোঁফদাড়ি হবে অলওয়েজ সাফ্,
পায়েতে নাগরা, নিউকাট বাফ্।
গোড়ালি অবধি আদ্দি চড়াবে,
ফিন্‌ফিনে ধুতি ধূলায় ছড়াবে।

পায়ে নাগরা জুতো, পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি ও উর্ধ্বাঙ্গে আদ্দির পাঞ্জাবি—এ-রকম যুবকটির চলন-বলন ও প্রেম করার ধরনধারণ কেমন হবে, সে-সবের ফিরিস্তি দিয়ে কবি কবিতাটি শেষ করেছেন এ-ভাবে—

লিখিলাম যা যা ফলো করো ঠিক,
হাতে যদি চাও 'আ-ধু-নি-ক'।

কিন্তু চল্লিশের দশকের মাঝামাঝিতে এসেই দেখা গেলো এই আধুনিকতার ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভক্তি ঘটে গেছে। এক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ধুতি বিদায় নিয়ে এসেছে পায়জামা, পাঞ্জাবির ওপর চেপে বসেছে শেরওয়ানি। এটা অবিশ্যি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যালঘুদের বেলায়। সে-সম্প্রদায়ের গাঁও-গেরামের বাসিন্দা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের পক্ষে পায়জামা মোটেই সহজলভ্য বা সর্বদা ব্যবহার্য হয়ে ওঠেনি। তাদের পোশাক বদলটা আধুনিকতার চর্চার জন্যে নয়, পাকিস্তান-আন্দোলনের সমর্থনে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে। তারা তাই ন্যাংটি বা কাছা পরিত্যাগ করে হয়ে গেলো বিকচ্ছ—ধুতি ছেড়ে ধরলো লুঙ্গি। বাংলার সমাজ-ব্যাকরণে যুক্ত হলো একটি নতুন অধ্যায়—ধুতি-লুঙ্গি দ্বন্দ্বসমাস।

ছেচল্লিশ সনের নির্বাচনের সময়ই ব্যাপারটা স্পষ্ট রূপ ধরলো বলা চলে। আমাদের রামপুর প্রাইমারি ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সোনাফর উদ্দিন সাহেবকে ধুতি পরতেই দেখে এসেছি এতোদিন, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো ধুতি ছেড়ে তিনি লুঙ্গি ধরেছেন। এ-রকম আশপাশের সবাই। কোনো মুসলমানকে ধুতি পরতে দেখলে তাকে নিয়ে রীতিমত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু হয়ে যেতো।

মুসলিম লীগের নেতারা অবিশ্যি সভা-সমিতিতে লুঙ্গি পরে বক্তৃতা করতেন না, তাদের পোশাক ছিল পায়জামা ও শেরওয়ানিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

কংগ্রেসী মুসলমানরা ধুতি ছাড়েননি। আমাদের গাঁয়ে বা তার আশেপাশে ছেচল্লিশ সনে আমি কোনো কংগ্রেসী মুসলমানকে দেখিনি, কাজেই ধুতি পরে তাঁরা কী ধরনের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতেন তা আমার জানা ছিল না। অনেক পরে সেটি জেনেছিলাম নাসির সরকারের কাছ থেকে।

নাসির সরকারের মতো এমন গোঁয়ার গোবিন্দ আমি কমই দেখেছি। ছেচল্লিশে মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েও যিনি কংগ্রেস ছাড়েননি, তিনি যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয়ে ধুতি ছেড়ে দেবেন তাতো হতেই পারে না।

তবে নাসির সরকারদের ধুতি-পরাটা তথাকথিত আধুনিক বা 'বাবু' হওয়ার জন্যে ছিল না। তাঁরা ফরাশডাঙ্গা বা শান্তিপুরের ফিন্‌ফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরতেন না। তাঁদের পরিধেয় ছিল চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা মোটা খদ্দরের খাটো ধুতি, পাঞ্জাবি বা ফতুয়া ও গান্ধী টুপি। এই পরিধেয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁদের স্বাদেশিকতার চেতনা।

নাসির সরকার তো, এমন কি, পাকিস্তানের জন্মের পরও খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-গান্ধী টুপি পরেই চলাফেরা করতেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, ১৯৫৪ সনে একদিন ধুতি পরেই তিনি শেরপুর শহরের রাস্তায় হাঁটছিলেন। তখন একটি সরকারি অফিস ঘর থেকে তাঁরই পরিচিত একজন কেরানি তাঁকে আহ্বান করলেন, "এই যে প্রেসিডেন্ট সাহেব, আসুন আসুন।" (নাসির সরকার এক সময় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বলেই তাঁকে এই 'প্রেসিডেন্ট সাহেব' সম্বোধন।) কেরানির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি তো অফিস ঘরে গিয়ে বসলেন, কিন্তু অফিসারটির মুখ গম্ভীর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনার নাম কি?"

—"নাসির উদ্দিন সরকার।"

—"এ্যাঁ, আপনি মুসলমান! তো, আপনার লেবাস এ-রকম বিশ্রী কেন?"

নাসির সরকার তাঁর পরনের ধুতিটির এখানে-ওখানে হাত রেখে বিস্মিত হওয়ার ভাণ করে বললেন, "কেন, কী হয়েছে? আমার কি 'পক্ষী' দেখা যাচ্ছে?"

(বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে অনেকটা সুভাষিত করার চেষ্টায় শিশ্নকে 'পক্ষী' বলা হয়ে থাকে, একথা পাঠকগণ নিশ্চয়ই জানেন আশা করি।)

এ-রকম আচমকা পাল্টা প্রশ্নে অফিসারটি প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে রাগ ও দুঃখের সঙ্গে বললেন, "প্রেসিডেন্ট সাহেব, একজন মুরব্বি মানুষ হয়ে এমন অশ্লীল কথা বলেন কী করে?"

-"অশ্লীল কথা বললাম কোথায়? আমরা কাপড় পরি লজ্জা নিবারণের জন্যে। যদি সেই লজ্জা নিবারণ না হয়, শরীরের যে-সব অংশ ঢেকে রাখার কথা যদি সে-সব ঢাকা না থাকে তা হলে কাপড় পরার কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাই আপনি যখন আমার লেবাসটিকে বিশ্রী বললেন তখন আমি ভাবলাম যে আমার হয়তো লজ্জাস্থান ঢাকা পড়েনি। সে-কারণেই আপনাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করলাম।"

এ-রকম খোঁচা-দেয়া কথায় অফিসারটির রাগ আরো বেড়ে যায়। ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দেন তিনি।

কিন্তু নাসির সরকারের সঙ্গে যুক্তিতে পাল্লা দেয়া কঠিন। সাম্প্রদায়িক ভাবনায় ওই অফিসারটির মাথা ভরপুর হয়ে আছে বলেই যে তিনি ধুতিকে বিশ্রী পোশাক বলেন, অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করে নাসির সরকার তা প্রমাণ করে চললেন। এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে সুস্থ ভাবনাচিন্তা করার জন্যে অফিসারটিকে উপদেশ দিয়ে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

যতো উপদেশই দিন নাসির সরকারের মতো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা, সাম্প্রদায়িক মানস প্রতিবন্ধ থেকে উপজাত ধুতি-লুঙ্গির দ্বন্দ্বের অবসান আজো ঘটেনি।

পঁয়তাল্লিশ/ছেচল্লিশ সনের দিকে দেখেছি, পাকিস্তান-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সদ্যজাগ্রত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যেমন লুঙ্গি দিয়ে ধুতিকে প্রতিস্থাপিত করছে, হিন্দু রক্ষণশীলতা তেমনি লুঙ্গিকে প্রতিহত করতে চাইছে প্রাণপণে। অথচ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় থেকেই কাপড়ের দাম এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত কোনো 'ভদ্রলোকে'র পক্ষেই সারাক্ষণ পরে থাকার জন্যে দশহাত ধুতির সংস্থান করা সম্ভব হচ্ছিল না। তুলনায় লুঙ্গি ছিল অনেক সস্তা। কিন্তু হিন্দু 'ভদ্রলোক' কিছুতেই লুঙ্গি পরবে না। কারণ এতে হিন্দুত্বের অবমাননা হয়! লুঙ্গিতে কাছা থাকে না। আর কাছাই যদি না থাকলো, তবে তা তো উলঙ্গ থাকারই

সামিল। ওই 'ছোটলোক' মুসলমানের মতো 'ভদ্রলোক' হিন্দুরাও যদি কাছাকোঁচাহীন লুঙ্গি পরতে শুরু করে দেয়, তা হলে আর হিন্দু-ম্লেচ্ছের তফাৎ থাকে কোথায়! এই তফাৎ ঘুচে যাওয়া মানে ঘোর কলির সূচনা!

এ-রকম যুক্তি আমি, ছেচল্লিশ সনেও, গ্রামীণ হিন্দু সমাজপতিদের মুখে শুনেছি। পরে চিন্তা করে দেখেছি: দ্বিজাতিতত্ত্ব যতো ভ্রান্তই হোক, এই ভ্রান্তির সৃষ্টি কোনো এক পক্ষের হাতে হয়নি, হিন্দু ভদ্রলোক আর মুসলমান শরিফ আদমি দুইয়েরই তাতে কমবেশি অবদান আছে। ধুতি-লুঙ্গির দ্বন্দ্বসমাসে সেই দ্বৈত অবদানের উপসর্গই যুক্ত হয়েছে।

তবু কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। হিন্দুদের পরিচ্ছদ-নীতির চেয়ে শক্তিধর হয়ে এলো অভাবের অর্থনীতি। অভাবে স্বভাব নষ্টের নিয়মেই হিন্দুত্বের ব্যত্যয় ঘটিয়ে হিন্দুদের মধ্যে লুঙ্গির প্রচলন শুরু হয়ে গেলো। তবে সেখানেও মুসলমানের লুঙ্গির সঙ্গে একটা পার্থক্য রাখার চেষ্টা প্রথম প্রথম চালানো হলো। যেমন—সেলাইকরা লুঙ্গি নয়, বাজার থেকে লুঙ্গির কাপড় কিনে এনে সেলাই না-করেই সেটিকে কোমরে পেঁচিয়ে রাখা। এতে বোধ হয় মুসলমানের লুঙ্গির সঙ্গে কিছুটা হলেও স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন বজায় রইলো। আবার সেই স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্টতর করার জন্যেই হিন্দুরা পরতো একরঙা লুঙ্গি, চেক লুঙ্গিকে পরিহার করারই চেষ্টা করতো। তা ছাড়া হিন্দুরা, অন্তত ভদ্রতা-অভিমানী হিন্দুরা, জনসমক্ষে লুঙ্গি পরে বের হতো না। কেবল বেশি দাম দিয়ে কেনা ধুতিটার আয়ু কিছুটা বাড়িয়ে তোলার জন্যেই বাড়ির ভেতর লুঙ্গি পরে থাকতো।

কিন্তু ছেচল্লিশ সনে নোয়াখালির দাঙ্গার পর ওই ঘর-বাইরের লুকোচুরিও ঘুচে গেলো, পূর্ববাংলার গ্রামীণ হিন্দুরা তখন প্রাণের ভয়েই চেক লুঙ্গি পরে মুসলমান সেজে বাইরে বেরোতে লাগলো। এ-রকমটি করতে গিয়ে অনেক হাস্যকর ঘটনাও তারা ঘটালো। একদিন দেখলাম : রামপুর বাজারের পাশ দিয়ে লুঙ্গি পরা একজন অপরিচিত লোক হেঁটে যাচ্ছে, তার গলায় তুলসীর মালা। বৈষ্ণবদের বৈষ্ণবত্ব তথা হিন্দুত্বের চিহ্ন এই তুলসীর মালা। লোকটি ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরে তার নিম্নাঙ্গের হিন্দুত্ব ঘোচালেও ঊর্ধ্বাঙ্গে যে হিন্দুত্বের চিহ্ন একেবারে জ্বলজ্বল করছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই।

যতোই না কেন হিন্দুরা ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি ধরুক, ধুতি আর হিন্দু শব্দ দু'টো অনেকের কাছে আজো একার্থক হয়েই আছে। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের মুখপত্রে লেখা হলো—'ঢাকার রাস্তায় ধুতির ভীড়'। অর্থাৎ মুসলিম লীগের নেতা তথা পাকিস্তানের কর্তারা যে বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুরা এসে ঢাকায় বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিল করছে, সে-কথাটাকে প্রতীকী করার জন্যেই বলা হলো ধুতির কথা। উনিশ শো সত্তরে যখন এদেশের আকাশ-বাতাস জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখর, তখনো পাকিস্তানি ভাবাদর্শের ধারকরা কুৎসিত ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে—'জয়বাংলা জয়হিন্দ, লুঙ্গি খুইল্যা ধুতি পিন্দ'।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রায় সিকি শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও এই ধুতি-লুঙ্গি দ্বন্দ্বসমাসই পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বকে বাঁচিয়ে রাখছে ও মৃত পাকিস্তানের ভূতকে লালন-পালন করে চলছে।

ঢাক-ঢোলের বাদ্য, গোহত্যা ও দ্বিজাতিতত্ত্ব

শুধু ধুতি-লুঙ্গি নয়, আরো নানাভাবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকে সচেতনভাবে দৃশ্যমান করে তুলে দ্বিজাতিতত্ত্বকে সত্য করে তোলার চেষ্টা করা হলো।

আমি বলছি চল্লিশের দশকের শেষ পর্বের—বিশেষ করে পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ ও সাতচল্লিশের গোড়ার দিকের কথা, পাকিস্তানের জন্মের পূর্বক্ষণের কথা। ঠিক এ সময়েই যে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠেছিল, এর আগে কখনো সে-বোধ ছিল না, তেমন কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। ইতিহাস পরিক্রমা করলে তো উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই আমরা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ দেখতে পাই। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬-এ মুসলিম লীগের জন্ম, এর কয়েক বছর পর স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থার প্রবর্তন—এ-সবের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের প্রথম দশকেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্য তার বাস্তব ভিত্তি পেয়ে যায়। আর ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব সেই ভিত্তিকেই মজবুত ও পাকাপোক্ত করে তোলে।

তবে, আমি এখানে ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু তুলে আনতে চাইছি না। আমি বলছি যা 'দর্শন' করেছি অর্থাৎ চোখে দেখেছি ও সে-দেখার ভিত্তিতে স্বাতন্ত্র্যের যে-দর্শনটি উপলব্ধি করেছি—তারই কথা। মাঝে মাঝে কেবল ইতিহাসের পাতা খুলে আমার নিজের দেখাটিকে যাচাই করে নিচ্ছি মাত্র।

একই বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য বরাবরই ছিল, কিন্তু তার জন্যে হিন্দু-মুসলমানের ভাষা নিশ্চয়ই আলাদা হয়ে যায়নি। যদিও বেশ কিছুকাল আগেই 'মুসলমানি বাংলা' বলে একটা ভাষারীতি চালানোর প্রয়াস চলছিল, পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় সে-প্রয়াসটাই অতিরিক্ত জোরদার হয়ে উঠলো। পানি, গোসল, নাস্তা, গোস্ত, আন্ডা—এসব শব্দ বাঙালি মুসলমানরা বহুকাল ধরেই ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু এ-সময় এ শব্দগুলোর সচেতন প্রয়োগ চললো দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রমাণ ও মুসলিম 'জাতি'র পরিচয়-চিহ্ন হিসেবে।

এমন কি যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, সেই বাংলাদেশেও গোস্ত আর আন্ডাকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নামক একটি ধারণার বেনামিতে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করা হলো পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বকেই। দেখা গেলো : এ-প্রয়াসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন আতাউর রহমান খানের মতো রাজনীতিকও যিনি এককালে সেক্যুলার ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত ছিলেন সর্ব মহলে। স্বৈরতন্ত্রী এরশাদের নিয়োগ করা ঠুঁটো জগন্নাথ প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনিই 'গোস্ত' দিয়ে 'মাংসে'র বিরুদ্ধে জেহাদের সূচনা করেছিলেন। তাঁর এই কাণ্ড দেখে সে সময়ে অনেকেরই মনে পড়েছিল পাকিস্তানের ডিক্টেটর আইয়ুব খানের স্নেহধন্য পূর্ব পাকিস্তানি সেই ছোট লাট সাহেবটির কথা। তিনি না-কি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নিয়োগের সময় সে-পদের প্রার্থীদের প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি আজকে নাস্তা করেছেন ডিম না আন্ডা দিয়ে?'

এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রে, এবং পরবর্তী কালে স্বাধীন বাংলাদেশেও যে ডিম আন্ডা ও মাংস-গোস্তের পার্থক্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয়করণের কাজ চলে, তারই প্রবল উন্মেষ-পর্বটি চল্লিশের দশকে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। মন্দির-মসজিদ নিয়ে যদিও হিন্দু-মুসলমানি কাণ্ড শুরু হয়েছিল এর আগের দশকেই, তবু চল্লিশের দশকেই এ-কাণ্ডটি গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত ছড়িয়ে

পড়েছিল। এ-সময়কারই ঘটনা কিশোরগঞ্জ শহরে একটি মসজিদের সামনে পুলিশের গুলিবর্ষণ। বাদ্যভাণ্ড সহকারে মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের মিছিল নিয়ে যাওয়া, মুসলমানের সে-মিছিলের ওপর আক্রমণ, হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ, পুলিশের গুলিবর্ষণ ও পরিণামে বেশ কয়েকজন আদম-সন্তানের প্রাণহানি। এ ঘটনার অভিঘাতেই আমাদের গ্রামাঞ্চলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো, মানুষের মানুষ পরিচয়ের চেয়ে হিন্দু আর মুসলমান পরিচয়টিই রাতারাতি বড়ো হয়ে দেখা দিলো। মসজিদের সামনে বাদ্যভাণ্ডের কোলাহল তোলার অধিকার হিন্দুত্বের মর্যাদার সঙ্গে যেন অনপনেয় সূত্রে গ্রথিত হয়ে গেলো। অন্যদিকে, মুসলমান চাইলো রাজপথের ধারে কিংবা হিন্দু বাড়ির সামনে প্রকাশ্যে গোহত্যা করে মুসলমানত্বের গৌরবকে উচ্চে তুলে ধরতে। মসজিদের সামনে ঢাক-ঢোল বাজানোর কিংবা প্রকাশ্যে গোহত্যার কোনো ঘটনা আমাদের এলাকায় ঘটেছে বলে শুনিনি, হিন্দু-মুসলমানের কোনো সংঘর্ষও এখানে হয়নি। তবু দেশের নানা জায়গা থেকে উড়ে আসা নানা খবর আমাদের গ্রামের মানুষদের মানসিক শান্তি নষ্ট করে দিলো, হিন্দু ও মুসলমান একে অন্যের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো।

তখনো, সেই ছেচল্লিশ সনেও, নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ গ্রামকে কেন্দ্র করে হিন্দু তালুকদার-জোতদারদেরই প্রাধান্য। গাঁয়ের সাধারণ হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাদের প্রজা। গরিব প্রজাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। কৃষিজীবীদেরও অধিকাংশই ভূমিহীন। কাজেই 'বাবুকর্তা'দের জমি বর্গা নিয়েই তাদের জীবন চালাতে হয়; এবং সে কারণেই, স্বাভাবিকভাবেই, তারা সর্বদা বাবু-কর্তাদের অনুগত। তবু আনুগত্য সত্ত্বেও, শোষণ আর নিগ্রহের জাঁতাকলের পেষণ থেকে তাদের কারুরই রেহাই নেই। এ ব্যাপারে হিন্দু আর মুসলমান প্রজার একই অবস্থা, কোনো রকম পার্থক্য করা যায় না তাদের মধ্যে। অথচ, এখন কিন্তু দেখা গেলো, একটি পার্থক্য তারা নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছে, এবং সেটি করেছে গোরুকে ঘিরে। হিন্দু প্রজার কাছে যে-গোরু হলো দেবতা, সেই গোরুই মুসলমান প্রজার আহার্য; হিন্দু প্রজাকে পাপস্খলনের জন্যে খেতে হয় গোরুর মল বা গোবর, তার জন্যে গোহত্যা মহাপাপ; আর মুসলমানের পুণ্যের অংশই আল্লাহ্‌র উদ্দেশে গো-কোরবানি করা ও গোরুর গোস্ত খাওয়া। এ-সব তথ্য সবারই জানা থাকলেও এতোদিন বোধ হয় কেউই এ-সম্পর্কে সচেতন ছিল না। এবার সবাই যেন রাতারাতি এ-ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠলো। গোরু-পূজক আর গোরু-খাদক—মনে হলো, মানুষ যেন এই দু'ভাগে বিভক্ত। বাবুকর্তাদের সকল কৃষিজীবী প্রজাদের বস্তুগত অবস্থা ও অবস্থান এক হলেও এবার গোরু পূজা ও গোরু খাওয়ার ভিত্তিতেই তারা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলো, এক দল অপর দলের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। গোরু-পূজকের দল গোরু পূজার সুবাদেই বাবু কর্তাদের সঙ্গে নিজেদের মিল খুঁজে পেলো, আর গোরু খাদকরা একাত্ম হলো মিঞা সাহেবদের সঙ্গে। আমি যে-অঞ্চলের কথা বলছি, সেই নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জ তথা তখনকার পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে মুসলমান তালুকদার-জোতদাররা সংখ্যায়ও বেশি ছিল না, সম্পদেও ছিল অনেক খাটো। অর্থাৎ এখানে বাবুকর্তাদের তুলনায় মিঞা-সাহেবরা ছিলেন নিতান্তই দুর্বল। বাবুকর্তাদের প্রতাপের তাড়নায় তাঁরা বরং একটা কোণঠাসা অবস্থায়ই ছিলেন। তাই তাঁরা প্রতাপান্বিত হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন অনেক দিন ধরে। গো-পূজক প্রজাদের গোরু ভক্তি ও গো-খাদকদের গো-নিধনস্পৃহা থেকে জাত বিরোধ সেই সুযোগই নিয়ে এলো। গোখাদক প্রজারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিল বলে তাদের

পক্ষে পেয়ে মিঞা-সাহেবদের শক্তি হঠাৎ করেই অনেক গুণ বেড়ে গেলো। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু গো-পূজক প্রজার সমর্থন বাবুকর্তাদের শক্তিতে তেমন একটা কিছু সংযোজন করলো না। তবে বাবু বা সাহেবদের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি যার যে-রকমই হোক না কেন, প্রজাদের দু'দলই হলো বাবুকর্তা আর মিঞা-সাহেবদের কর্তৃত্বের যুদ্ধে উলুখাগড়া মাত্র। সাম্প্রদায়িক বিরোধের চোরাবালিতে আটকে গিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম ধরলো বিকৃত রূপ।

যদিও তখনো ব্রিটিশ শাসনই চলছে, তবু সেই প্রশাসনের মধ্যেও বাবুকর্তা আর মিঞা-সাহেবরা নিজের নিজের প্রভাব বলয় তৈরি করে নিতে পেরেছেন। সেখান থেকেই নিজের নিজের শক্তির প্রদর্শনীও দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। গোরু নিয়েও যে তাঁরা এ রকমই করেছিলেন, তারই একটি মজার ঘটনার কথা শুনেছিলাম। নেত্রকোনার বারহাট্টায় না-কি মুসলমানরা ঠিক করেছিল যে, সে-বছর কী একটা উপলক্ষে তাঁরা প্রকাশ্যে গোরু জবাই করবে কালীমন্দিরের সামনে রাস্তার ধারে। বাবুকর্তারা এটা কিছুতেই হতে দেবেন না। তাঁরা ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। জেলার উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা যাতে গোরু জবাই বন্ধ করার জন্যে বারহাট্টা থানায় নির্দেশ পাঠান, এমন ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন। ব্যবস্থা-অনুযায়ী একটি অতি সংক্ষিপ্ত তারবার্তা এলো বারহাট্টা থানায়। তাতে লেখা 'স্লটারিং প্রোহিবিটেড'। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা বা ওসি ছিলেন মুসলমান। তিনি এই সংক্ষিপ্ত বার্তাটির অর্থ করে নিলেন তাঁর নিজের মন মতো। 'স্লটারিং' বলতে যদি পশু হত্যা বোঝানো হয়ে থাকে, তা হলে তো যে কোনো পশু হত্যা এর ভেতর পড়ে। থানার পাশে কালীমন্দিরটিতে যে রোজ পাঁঠা বলি দেয়া হয়, তা-ও তো ওই স্লটারিংই। ব্যস্। দারোগা সাহেব জানিয়ে দিলেন : ওপর থেকে অর্ডার এসেছে যে সব রকম পশু হত্যা বন্ধ করতে হবে, তাই কালী বাড়িতে পাঁঠা বলি দেয়া চলবে না।

এ-রকম অনেক কৌতুককর ঘটনাই বাবুকর্তা আর মিঞা-সাহেবদের প্রবর্তনায় এখানে-ওখানে ঘটেছে।

গোরু নিয়ে গোমূর্খতা তো উনিশ শতকেই শুরু হয়েছিল। সে-শতকে হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের প্রথম প্রবক্তা ও 'আর্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীই বোধ হয় এই মূর্খতার উদ্বোধন ঘটান। ১৮৮২ সালে তিনিই জন্ম দেন 'গোহত্যা নিবারণী সভা'র। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে এ সভার সদস্যরা যখন গো রক্ষার আদর্শ প্রচার করতে থাকে তখন তাতে গো রক্ষা যে-রকমই হোক না কেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা মনুষ্যত্বের আদর্শ রক্ষা যে হয়ে পড়ে সুদূরপরাহত, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ করা চলে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে 'জাতীয়' কথাটা খুব জাঁক করে জুড়ে দেয়া হলেও বাস্তবে তাতে সাম্প্রদায়িক উপাদানেরই ছিল প্রাধান্য। তাই দেখি: ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে অনায়াসে গোহত্যা বন্ধের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার শশিশেখর রায়। এর চার বছর পর, ১৮৯১ সালে, নাগপুর অধিবেশনে তো গো-রক্ষিণী সভার সদস্যরা কংগ্রেসের প্যান্ডেলেই গো-রক্ষার জন্যে সভা করার ও চাঁদা তোলার অনুমতি পেয়ে যায়। বাঙালি হিন্দুদেরও একটি অতি উৎসাহী গোষ্ঠী গো-রক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠার হুজুগে মেতে ওঠে।

গো-রক্ষা আন্দোলনই, আমার মনে হয় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে দুই জাতিরূপে চিহ্নিত করার সবচেয়ে বেশি সুযোগ এনে দেয়, এবং মুসলিম লিগাররা সেই

সুযোগটিরই পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে পোঁতা বীজে বিশ শতকের শুরুতেই ফল ধরতে থাকে।

"উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা" বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ গো-হত্যা সম্পর্কে লিখেছেন,

"গো রক্ষিণী সভার ফরিদপুর শাখার সম্পাদক যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ গো-হত্যা বন্ধ করার জন্যে 'কসাই-এর গো-হত্যা' শিরোনামে প্রচারপত্র বিলি করে জনমত তৈরি করেন। প্রচারপত্রে হিন্দু জনসাধারণকে হাটে-বাজারে মুসলমান কসাই-এর কাছে গোরু বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়, ঐ সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের নিজ নিজ জমিদারীতে গো-হত্যা বন্ধ করার আবেদন জানানো হয়। ফরিদপুরের 'আঞ্জুমানে ইসলাম' মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ করে। ঐ আবেদনপত্রে বলা হয় যে, গো-হত্যার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের নিত্য সংঘর্ষ বাধে; বিহার ও উত্তর প্রদেশে এ নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে; পূর্ববঙ্গে পূর্বে কোনো বিবাদ ছিল না, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রচারণার ফলে হিন্দুগণ গো-হত্যা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। মুসলমানেরা এটি মেনে নিতে পারে না, ফলে শান্তি বিঘ্ন হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। জেলা-প্রশাসক যাতে ঐরূপ প্রচারণা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন, ঐ পত্রে তার আবেদন জানানো হয়েছে।

"গো-রক্ষিণী সভার পরেই জমিদারদের স্থান। অনেক জমিদার মুসলমান প্রজাদের ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানি অথবা বিবাহ উপলক্ষে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন।...হিন্দু প্রজাগণ এ ব্যাপারে জমিদারকে সমর্থন দিত।...ময়মনসিংহের অম্বারিয়া, মুক্তাগাছা ও সন্তোষের জমিদারগণ কয়েকজন গ্রামবাসীকে গো-কোরবানির জন্য জরিমানা করেছিলেন।...চাঁদপুরের কতিপয় মুসলমান ঈদ উপলক্ষে গোরু কোরবানি দিলে গোপাল চন্দ্র মজুমদার নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী নালিশ করেন; প্রকাশ্য রাস্তায় গোরু জবাই করেছে এবং বদ্ধজলে মাংস ধৌত করে জল অপবিত্র করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনা হয়। জেলা হাকিম জগদীশ চন্দ্র সেন সরজমিনে তদন্ত না করে একজনকে একমাস কারাদণ্ড, একজনকে ৫০ টাকা অপরজনকে ১৫ টাকা অর্থদণ্ড করেন।"

হিন্দুদের গোরু নিয়ে এই আদিখ্যেতা একেবারে নতুন নয়, নতুন কেবল এর সাম্প্রদায়িক াতলববাজির প্রকাশটা। কারণ, কোন সুদূর অতীতে বৈদিক যুগে হিন্দুরা পরম আহলাদে গো াংস ভক্ষণ করতো বলে কথিত হলেও অন্তত দু'হাজার বছর ধরে হিন্দুদের জন্যে গো-হত্যা ও া-মাংস ভক্ষণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এ দু'টো কাজকে হিন্দুরা এমনই মহাপাপ বলে মনে করে া, অন্য যে-কোনো কাজ বা খাদ্যের নিষেধবিধিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যে বলে, ামুক কাজ করা বা অমুক খাদ্য গ্রহণ করা গো-হত্যা বা গো-মাংস ভক্ষণের তুল্য মহাপাপ'। মন—নবমী তিথিতে লাউ খেতে নেই, এমন একটি নিষেধবিধি অতিরক্ষণশীল হিন্দুরা জো মেনে চলে। আমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করতাম, 'নবমীতে লাউ খেলে কী এমন তটা হয় বলো তো'। ঠাকুরমা দাঁতে জিভ কেটে বলতেন, 'ছি, ছি, নবমীতে লাউ খাওয়া া গো-মাংস খাওয়া তো একই কথা।' অর্থাৎ গোমাংস খাওয়া দূরের কথা, খাওয়ার চিন্তা াও কোনো হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব।

আমরা জানি: হিন্দুদের কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রীড তো নেই-ই, এমনকি সারা উপমহাদেশের ন হিন্দুর জন্যে সর্বমান্য কোনো আচারও নেই। তা হলে হিন্দুত্বের সাধারণ ভিত্তি কী, কোন

লক্ষণ দিয়ে হিন্দুকে চিহ্নিত করা যায়? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো : যে-কোনো অঞ্চলের যে-কোনো মতাদর্শের হিন্দুই জন্মান্তরে বিশ্বাস করে, এবং সকল হিন্দুর দৃষ্টিতেই গো-হত্যা ও গো-মাংস ভক্ষণ মহাপাপ।

জন্মান্তরের বিষয়টা নিতান্তই বিশ্বাসের, এর কোনো বাহ্য প্রকাশ নেই। কিন্তু গো হত্যার ব্যাপারটি তেমন নয়। এই নিষেধবিধিটি ব্যবহারিক আচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এটিকে খুবই উগ্রতা নিয়ে প্রকাশ করে মৌলবাদী হিন্দু নেতারা। আবার, গো-হত্যা আর গো-মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে যেহেতু হিন্দুদের বিপরীতে অবস্থান মুসলমানদের, তাই দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা মুসলিম লীগ নেতারা এই ইস্যুটিকে খুবই সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও পাকিস্তানের জজবা

মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও পাকিস্তানের জজবা গোপূজা ও গোহত্যা—এই দুই বিপরীত ধর্মী আচরণ হিন্দু ও মুসলমানকে দুই ভিন্ন জাতি বলে প্রতিপন্ন করার সবচেয়ে বড়ো সুযোগ সৃষ্টি করলেও এই গোমূর্খতা দূর করার চেষ্টাও কেউ কেউ করেছেন বৈকি। তবে হিন্দু মৌলবাদীদের গোহত্যা-নিবারণী আন্দোলনের কুফল সম্পর্কে হিন্দু সমাজের উদারচেতা মনীষীবৃন্দও যে যথাযথ সচেতনতা দেখাতে পারেননি, এ হচ্ছে এক বেদনাদায়ক সত্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে গোহত্যা-নিবারণ আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে সমর্থনই জানিয়েছে, তাও আমরা দেখেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হয় ১৯২৩ সালে, কেবল তারই একটি ধারায় বলা হয়েছিল : 'মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করা যাবে না। ধর্মের জন্য গোহত্যা-হতে পারবে।' এতেও গোহত্যা বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তেমন কঠোর মনোভাবের প্রকাশ ঘটেনি। কিংবা এ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যে কতো প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয় সংহতি বিরোধী, সে সম্পর্কে 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর প্রণেতারাও যে খুব সচেতন ছিলেন, তা মনে হয় না। তাছাড়া চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তো পুরো বেঙ্গল প্যাক্টেরই অপমৃত্যু ঘটে।

গোহত্যা নিয়ে যখন সমাজে একটা তোলপাড় দেখা দিয়েছিল, তখনই, সেই উনিশ শতকের শেষপাদেই, এ ব্যাপারে একটি উদারনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সে শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন। তিনি চেয়েছিলেন : গোহত্যা-নিবারণের নামে হিন্দু মূর্খতার বিপরীতে গোহত্যার পক্ষে মুসলমানী জেদ যেন উগ্র না হয়ে ওঠে, ওই তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে যেন হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে না যায়, গোরু নিয়ে ঝগড়া করে মানুষকে যেন ছোট করে না ফেলা হয়। তাই তিনি মুসলমানদের কাছে গোরু কোরবানি বন্ধ ও গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। গোমাংস ভক্ষণে ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। একথা অবশ্যই সত্য; কিন্তু গোহত্যা বন্ধ করলে বা গোমাংস ভক্ষণ না করলেও যে মুসলমানি নষ্ট হয়ে যাবে, তেমন কথাও তো ইসলামি কোনো ধর্মশাস্ত্রেই লেখা নেই নিশ্চয়। তাই, টাঙ্গাইলের '*আহমদী*' পত্রিকায় ১২৯৫ সালে 'গো নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধে গোহত্যা বন্ধের প্রস্তাব দিয়ে মীর মশাররফ হোসেন লিখলেন, "এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক—সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে-দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?"

'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা'র পর মীর সাহেব লিখেছিলেন এ-রকম আরো তিনটি প্রবন্ধ—'গোধন কি সামান্য ধন', 'গোমাংস' এবং 'গোদুগ্ধ'। এই চারটি প্রবন্ধ একত্র করে তিনি প্রকাশ করেছিলেন '*গোজীবন*' গ্রন্থটি।

কিন্তু মীর সাহেবের উদারনৈতিক প্রয়াসটি পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়ে যায়। '*আহমদী*'র সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ীর মতো হাতে গোণা দুয়েক জন মুসলমান মীর সাহেবকে সমর্থন জানালেও ধর্মান্ধ ও গোঁড়া মুসলমানরা তাঁকে 'কাফের' আখ্যা দেয়, এমনকি তাঁর স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে বলেও ফতোয়া জারি করে। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। শেষ পর্যন্ত মীর সাহেব আপোস করতে বাধ্য হন ও '*গোজীবন*' বইটি প্রত্যাহার করে নেন।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর প্রয়াসে ব্যর্থ হলেও তিনি একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে যান নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উদারনৈতিক হিন্দুদের কেউই গোরক্ষার নামে বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসননি। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলে হিন্দুরা গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু যাদের শাস্ত্রে এ বিষয়ে কোনো নিষেধ বিধি নেই, তাদের অধিকার বাধা দেয়া যে মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়, একথা কি জাতীয়তাবাদী হিন্দুনেতা ও মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা জোরের সঙ্গে বলতে পারতেন না? দুঃখ এই, তাঁরা তা বলেননি।

তবে আমার মনে আছে, তিরিশের দশকের শেষ কিংবা চল্লিশের গোড়ার দিকের কোনো এক সময়ের '*মাসিক সওগাত*' পত্রিকার একটি পুরনো সংখ্যা কি করে জানি আমার হাতে এসেছিল। এতে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের সপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন একজন হিন্দু লেখক। তাঁর নাম—মন্মথনাথ সরকার। প্রবন্ধটি আমি আমার দুয়েক জন গুরুজনকে পড়তে দিয়েছিলাম। তাঁরা তো এটি পড়ে আমার ওপরই মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। তীব্র ভর্ৎসনার সঙ্গে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি যেন এরকম গোখাদক ও কুলাঙ্গার হিন্দুনামধারী লেখকের লেখা কখনো না পড়ি।

আসলে হিন্দুদের গোহত্যা বিরোধী আন্দোলন কোনো যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, অন্ধ ধর্মীয় ভাবাবেগই এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। দেশের গো-সম্পদ রক্ষার সাধু উদ্দেশ্যই যদি গোহত্যা বিরোধী আন্দোলনকারীদের থাকতো, তবে তো তারা ধর্ম নিরপেক্ষ যুক্তি দিয়েই হিন্দু মুসলমান সকলকে নিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারতো, ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিতো না। তাই, এদের আন্দোলনের মধ্যে রক্ষণশীল মুসলিম নেতারা যে মুসলিম বিদ্বেষের গন্ধ পেয়েছিলেন, তাতে তাঁদের দোষ দেয়া যায় না। গো-রক্ষিণী সভা আইন করে গোহত্যা বন্ধ করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এরই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের প্রতিপক্ষ মোহাম্মদ নইমুদ্দীন যা যা বলেছিলেন তার সব কিছুকেই পুরোপুরি অসত্য বলে বাতিল করে দিতে পারি না। 'ভারতে গোবধ' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করতে গভর্ণমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন। সরল মনে বন্ধু ভাবে একথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায়, আইন-কানুন ও জোর জবরদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়। এরূপ কথা শুনিলে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কারণই—আর কিছু নহে।"

এ-রকম প্রতিক্রিয়া, উনিশ শতকের শেষ থেকেই, নইমুদ্দীনরা গ্রাম-গঞ্জে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা এই

প্রতিক্রিয়ার আগুনেই ক্রমাগত বাতাস দিয়ে চলছিলেন, গ্রামের অল্প শিক্ষিত মুন্সী মৌলবিদের তাঁরা নানানভাবে উস্কিয়ে দিচ্ছিলেন। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী অথচ পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক, এ-রকম আলেম বা মওলানার সংখ্যা ছিল খুবই কম। বিশেষ করে দেওবন্দে শিক্ষিত মওলানারা তো ছিলেন নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের ঘোর বিরোধী। সে কারণেই, গাঁয়ে-গঞ্জে যারা 'কাঠমোল্লা' নামে পরিচিত তাদেরই ওপর মুসলিম লিগারদের নির্ভর করতে হয়েছিল। ওরা সীমাহীন উৎসাহের সঙ্গে ধর্মীয় বিধানের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা হাজির করে সরলপ্রাণ গ্রামীণ মুসলমানদের মনে হিন্দু-বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সাফল্য অর্জন করে ফেলেছিল।

আমাদের পাশের গ্রামের একটি মুসলমান পরিবারের কেউই গোরুর মাংস খেতো না। একদিন রামপুর বাজারে একটি মুদি দোকানের আড্ডায় সেই পরিবারের একজন মধ্যবয়স্ক লোক এ কথাটা বলছিলেন। যারা গোরুর মাংস খায় তারা নানা ধরনের চর্মরোগে ভোগে, তাই গোরুর মাংস না খাওয়াই উত্তম,—এ-রকম একটি মতও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আর যায় কোথায়। আড্ডার সকলে তাঁকে একেবারে ছেকে ধরলো। মুসলমান হয়ে গোরুর মাংস যে খায় না সে তো মুসলমানই নয়—বেশ কয়েকজন সমস্বরে একথা বলে সেই গোমাংস বিরোধী লোকটির ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! একজন মোল্লা কিসিমের লোক এবার 'ওয়াজ-নসিহত' করার একটি মওকা পেয়ে যান। ওই না-লায়েক লোকটি যে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও হিন্দুদের মতো গোরু খাওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছে, এতেই বোঝা যায় ওর ওপর হিন্দুদের আছর কতো গভীরভাবে পড়েছে। হিন্দুরা এভাবেই মুসলমানের মধ্যে ঢুকে তাদের ইমান নষ্ট করে চলছে। 'মুসলমান ভাই, সব' মোল্লা সাহেব গলা উঁচু করে বলতে থাকেন, 'হিন্দুদের এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। গোরু হিন্দুর দেবতা হতে পারে, কিন্তু মুসলমানের তা হালাল খাদ্য। কোনো মুসলমান যদি গোরু খাওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে বোঝা যাবে যে সে হালালকে হারাম বলছে। এর মানে তার ইমানের গোড়া আলগা হয়ে গেছে। আমাদের ইমান নষ্ট করছে নাছারা আর মালাউনরা। এদের থেকে তফাতে থাকতে হবে। ভাই মুসলমান, ইমান নিয়ে বাঁচতে হলে মুসলমানদের নিজেদের রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সেই রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েমের জন্য আমাদের ডাক দিয়েছেন।'

গোরু খাওয়া দিয়ে শুরু হয়ে কথা চলে যায় পাকিস্তানের প্রসঙ্গে। পাকিস্তানের কথা উঠতেই আসে হিন্দুর প্রসঙ্গ। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অত্যাচারের প্রসঙ্গ। হিন্দুরা মুসলমানের ছোঁয়া খাবার তো খায়ই না, মুসলমানকে তারা মানুষ বলেই মনে করে না। সে-সবেরই নানা দৃষ্টান্ত আড্ডায় নানা জনে নানা ভাষায় ও ভঙ্গীতে তুলে ধরতে থাকে।

ছেচল্লিশের নির্বাচনের সময়কার হিন্দুদের আড্ডাগুলোতে এক ধরনের কথা শুনেছি, মুসলমানদের আড্ডায় কথাগুলো হয়েছে অন্য ধরনের। গাঁয়ের মুসলমানদের মুখেও তাদের স্বাতন্ত্র্যের কথা বেশি বেশি করে উঠে এসেছে। কংগ্রেসীরা যে স্বাধীনতা চাইছে সে স্বাধীনতা যদি তারা পেয়েই যায়, তবে এদেশের মুসলমানরা চিরকালের জন্য হয়ে যাবে তাদের গোলাম। তাই এ-স্বাধীনতা নয়, আমরা চাই মুসলমানের আজাদী, মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তান। হিন্দু আর মুসলমান এক নয়, কখনো এক ছিল না। হিন্দু আর মুসলমানেরও কখনো এক রাষ্ট্র হতে পারে না। হিন্দুর ভারত আমাদের নয়, আমাদের চাই পাকিস্তান। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি জোরেশোরে উঠে এসেছে পাকিস্তান কায়েমের লক্ষকে সামনে রেখেই—একথা ঠিক। কিন্তু পরে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি : আমাদের নেত্রকোনা অঞ্চলেও, আরো অনেক আগেই—বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই—বেশ কিছু নেতা হিন্দুদের থেকে আলাদা করে মুসলমানের স্বার্থের কথা তুলে ধরেছেন, মুসলমানের জাগরণের জন্য বইপত্র লিখেছেন, সভা-সমিতি করেছেন। এঁদেরই একজন ইব্রাহীম খাঁ।

না, ইনি টাঙ্গাইলের সেই প্রখ্যাত প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ নন। এর নামের সঙ্গে যুক্ত আছে 'মুন্সী' কথাটি—মুন্সী ইব্রাহীম খাঁ। বর্তমান নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ থানার টেঙ্গাপাড়া গ্রামের অধিবাসী। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে (১৮৪৮ সালে) তাঁর জন্ম। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময়ই তিনি মুসলিম রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নেত্রকোনা অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের প্রথম প্রচারক। মোহনগঞ্জের মতো একটি পশ্চাৎপদ জায়গায় বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র ভাটি এলাকার মানুষকে একেবারে অবাক করে দিয়েছিলেন তিনি। সেই পশ্চাৎপদ প্রযুক্তির যুগে গ্রামের মানুষের চোখে ছাপাখানটি ছিল একটি মহা বিস্ময়। তারা এর নাম দিয়েছিল 'কলঘর'। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষ আসতো এই কলঘরটি দেখতে। এই কলঘর থেকেই মুন্সী ইব্রাহিম খাঁ প্রকাশ করতেন একটি পত্রিকা—'*উদ্দেশ্য মহৎ*'। মুন্সী সাহেবের সব মহৎ উদ্দেশ্যেরই গন্তব্য ছিল মুসলমান সমাজ। মুসলমানের প্রতিপক্ষ হিসেবে তিনি দেখেছিলেন প্রতিবেশী হিন্দুদের। হিন্দুদের বিরুদ্ধে তিনি রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এই জেহাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুন্সী ইব্রাহিম খাঁ শুধু মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকেই উচ্চে তুলে ধরেননি, হিন্দু বিদ্বেষেরও উগ্র প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

আমরা জানি : ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্যাপক গণ আন্দোলন সংগঠন করেছিল। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথও সে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন, সে সময়ই তিনি রচনা করেন বঙ্গ-প্রশস্তিমূলক অসাধারণ স্বদেশী সংগীতগুলো। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরেই গড়ে ওঠে স্বদেশী আন্দোলন। সে আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যেই ছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার। সে সময় যাঁরা জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত ছিলেন, এমন অনেক বাঙালি মুসলমান নেতা, যেমন—'আব্দুর রসুল, আবুল কাসেম, আবদুস সোবহান চৌধুরী, খাজা আতিকুল্লাহ, খান বাহাদুর মুহম্মদ ইউনুস, মুজিবর রহমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী—বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ছিলেন বঙ্গভঙ্গের সমর্থক। তাঁরা বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করেছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠিত হলে তাঁরা এতে যোগ দেন, বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় সভা সমিতি করতে থাকেন। স্বদেশী আন্দোলন ছিল তাঁদের চোখে হিন্দুদের মতলব উদ্ধারের আন্দোলন। এর বিপরীতে তাঁরা সংগঠন করেন 'স্বজাতি আন্দোলন।' 'স্বজাতি' বলতে তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছিলেন। এই স্বজাতি আন্দোলনেরই অন্যতম প্রধান সংগঠক হয়ে দেখা দেন আমাদের মোহনগঞ্জের মুন্সী ইব্রাহিম খাঁ। ১৯০৭ সালে 'স্বজাতি আন্দোলনে'র সমর্থনে তিনি প্রকাশ করেন '*লাল ইস্তেহার*'। এই লাল ইস্তেহারটি ছিল উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্যে ভরপুর। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এতে লেখা হয়েছিল—

"হে মুসলমানগণ! জাগরিত হও। তহবিল সংগ্রহ কর। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন কর। পার্যমানে হিন্দুর সঙ্গে পাঠ করিও না। জাতীয় কারবার খোল, হিন্দুর দোকান হইতে কোনো বস্তু ক্রয় করিও না। শিল্প শিক্ষা কর, হিন্দুর শিল্পজাতি দ্রব্য স্পর্শ করিও না। হিন্দুকে চাকুরি দিও না। হিন্দুর বাড়িতে নিকৃষ্ট চাকুরি করিও না। হিন্দুর কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া জাতিগত ব্যবসা (গোয়ালা প্রভৃতি ব্যবসা) ছাড়িও না। তোমাদের জ্ঞান নাই, যদি জ্ঞান লাভ করিতে পার তবে একদিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাইতে পার। দেখ, বঙ্গদেশে তোমাদের সংখ্যা অর্ধেক, তোমরা কৃষক, কৃষিকাজই ধন উৎপত্তির বীজ। হিন্দু ধন কোথায় পাইল, হিন্দুর ধন বিন্দুমাত্রও নাই। হিন্দু কৌশলে তোমাদের ধন নিয়া ধনী হইয়াছে। তোমরা যদি সেই কৌশল শিক্ষা করিতে পার ও জ্ঞান লাভ করিতে পার তবে একদিনেই হিন্দু অন্নাভাবে মরিয়া যাইবে বা মুসলমান হইবে।

"মুসলমান মাত্রেই হিন্দুর বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিবেন না। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছে ও অত্যাচার করিতেছে। তাহা মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য নহে। মুসলমানগণ চিরকাল তাহাদের থাকে, ইহাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু স্বার্থপরতা, 'মুসলমানদের অজ্ঞানতা' সর্বনাশের মূল—এই দুই শত্রুই মুসলমানকে অবনত করিয়াছে।"

এ-রকম একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষযুক্ত ইস্তেহার প্রকাশের জন্য অবিশ্যি মুন্সী ইব্রাহিম খাঁকে আদালতে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল, এবং ইস্তেহারটি প্রত্যাহার করে নেয়ার শর্তে ও এক হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামিনের বিনিময়ে তিনি খালাস পেয়েছিলেন।

মুন্সী ইব্রাহিম খাঁ মারা যান ১৯৩৩ সালে। কিন্তু ছেচল্লিশ সালে আমি তাঁর নাম শুনিনি। মোহনগঞ্জ এলাকায়, অর্থাৎ মুন্সী সাহেবের বাড়ির আশে পাশে, এখনো তাঁর কথা কেউ কেউ স্মরণ করে অবশ্যই। কিছু গবেষণামূলক বই পুস্তক থেকে তাঁর সম্পর্কে নানা তথ্যও জেনে নেয়া যায়। তবু, মানতেই হবে, তাঁর মৃত্যুর বারো-তেরো বছরের মধ্যেই সাধারণ মানুষ তাঁর কথা ভুলে যায়। তা না হলে পাকিস্তান আন্দোলনের রমরমার দিনগুলোতে তাঁর নামটি অন্তত শুনতে পেতাম। অথচ, সে সময়, কিংবা এরপরও, কারো মুখে আমি মুন্সী ইব্রাহিম খাঁর কথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু গবেষণা গ্রন্থে যেদিন তাঁর *লাল ইস্তেহারটি* পড়লাম, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল যে, ছেচল্লিশ সালে আমাদের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের মুখে ওই ইস্তেহারটির বক্তব্যই শুনতে পেয়েছি। মনে হয়েছিল : মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের বোধ এ-অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মুন্সী ইব্রাহিম খাঁই সঞ্চার করে গিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে, লাল ইস্তেহার প্রকাশের সময়, সে-বোধের খুব বেশি বিস্তার হয়তো ঘটেনি। তবে পাকিস্তান আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশে, চল্লিশের দশকে, সে-বোধই লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছিল, শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশি মুসলমান সে বোধেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

বালক মনেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সংক্রমণ

রামপুর প্রাইমারি স্কুলে আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল হোসেন আলী। ক্লাস টু থেকে ফোর—১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ তিন বছর একই স্কুলে আমরা পড়াশোনা করেছি। আমাদের গভীর বন্ধুত্ব অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হামিদ, রাশিদ, হাশিম উদ্দিন—এরাও ছিল আমার বন্ধু। ওরা যে ছিল মুসলমান, আর প্রাণেশ, গোপাল বা গণেশরা ছিল হিন্দু সে-

সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম অবশ্যই। কিন্তু বন্ধুত্বের বিচারে হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য করতে আমরা শিখিনি। অন্তত ছেচল্লিশ সালের আগে তো নয়ই। ছেচল্লিশের ইলেকশনের সময় থেকেই অবস্থা পালটে যেতে থাকে।

আমার চৈতন্যে যখন কংগ্রেস, নেতাজী, গান্ধীজী, আজাদ হিন্দ ফৌজ, কুইট ইণ্ডিয়া, বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ—এ-রকম সব শব্দের উথাল পাথাল ঢেউ, হোসেন আলীর কাছে সে-সব তখন কতকগুলো অর্থহীন ধ্বনিমাত্র। এ-সবের বিপরীতে যে তার নারায়ে তকবির বা পাকিস্তান জিন্দাবাদ-এর ধ্বনি প্রতিধ্বনি প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা-ও নয়। বালক বয়সেই রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ সে পায়নি। মেহনতি কৃষকের সন্তান হিসেবে সে বরং ছিল জমি-সচেতন ও ফসল-সচেতন। কোন জমিতে কী ধরনের ফসল জন্মে, কখন কোন ফসলের জন্য কি ধরনের চাষ দিতে হয়, কোন বাজারে কোন্ ফসলের বীজ কেনাবেচা হয়—এসব খবর ছিল তার নখদর্পণে। ইস্কুলে পড়ার সময়ও সে একই সঙ্গে ছিল ছাত্র ও কৃষক। মেধাবী, মনোযোগী, পরিশ্রমী ও নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার ফলে এই দুই ভূমিকাতেই তার ছিল সমান সাফল্য।

প্রায়ই সে আমাদের বাড়িতে যেতো। আমার মা তাকে খুবই আদর করতেন, তাঁর হাতের চিড়ামুড়ি খেতে হোসেন আলীও খুবই পছন্দ করতো। ক্লাসের পাঠ্যবিষয় নিয়ে আমাদের দু'জনের মত-বিনিময়ে দু'জনই উপকৃত হতাম। বিশেষ করে, অঙ্কে তো হোসেন আলীই ছিল আমার শিক্ষক। তার সাহায্য না পেলে, সেই প্রাইমারি স্কুলেও, অঙ্ক পরীক্ষায় পাস নম্বর পাওয়া আমার পক্ষে সহজ হতো না।

হোসেন আলীর সঙ্গে ক্লাসের পড়ার বাইরের নানা বিষয় নিয়ে আমিই বেশি কথা বলতাম। আমার মুখে রাজনীতির নানা কথা শুনে সে বিস্মিত হতো খুবই, কিন্তু আগ্রহী হতো না একটুও। তবে, ক্লাস থ্রি-এ পড়ার সময়ই হোসেন আলীকে ধর্মের ব্যাপারে খুব উৎসাহী হয়ে উঠতে দেখলাম। সে সময়ই রামপুর গ্রামের মুসলমান পল্লীতে ছেলেদের কোরান শরিফ পড়াশোনার ব্যবস্থাটি চালু হয়ে যায়। সকাল বেলায় যে-মৌলবী সাহেবের কাছে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলে সে কোরান শরিফ পড়তো, আমার কাছে রোজই সে সেই মৌলবী সাহেবের গল্প করতো। সে বলতো, 'জানিস, মৌলবী সাহেব খুবই পরহেজগার লোক।' 'পরহেজগার' শব্দটি আমার কাছে একেবারেই নতুন। হোসেন আলীই আমাকে বুঝিয়ে দেয়, 'পরহেজগার বুঝলি না? মৌলবী সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, কোনোদিন নামাজ কাজা করেন না। ফরজ নামাজ তো পড়েনই, নফল নামাজও পড়েন, তাহাজ্জুদের নামাজও পড়েন। হালাল ছাড়া হারাম খান না কখনো। খুব ভালো ওয়াজ করতে পারেন তিনি। এ-রকম লোককেই বলে পরহেজগার।'

শুধু 'পরহেজগার' নয়, ওয়াক্ত, কাজা, ফরজ, নফল, তাহাজ্জুদ, হারাম, হালাল এবং এ-রকম আরো অজস্র শব্দের তাৎপর্যও আমি হোসেন আলীর কাছ থেকে শিখে নিতে থাকলাম। এসব শব্দ কেন যে আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করতো, তা সেদিনও বুঝিনি, আজো আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না। তবে এই শব্দগুলোর তাৎপর্য সন্ধান করতে করতেই ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ সেই ছোট বেলাতেই আমার মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে। কলেজে ঢোকার আগেই যে আমি প্রচুর কৌতূহল ও আনন্দের সঙ্গে ইসলাম বিষয়ক অনেক বাংলা বই পড়ে ফেলেছিলাম, সেই কৌতূহল ও আনন্দের গোড়াপত্তন বোধ হয় হোসেন আলীই আমাকে করে দিয়েছিল। তা ছাড়া, আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার মধ্যেই ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহলের বীজটি নিহিত ছিল সম্ভবত। 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' বইটি আমাদের পরিবারে

প্রায় নিত্যপাঠ্য ছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী পড়েও আমি ছেলেবেলায় খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করতাম। রামকৃষ্ণ অনেক ধরনের ধর্মসাধনা করেছিলেন, ইসলামের সাধনাও করেছিলেন। রামকৃষ্ণের সেই ইসলাম সাধনার বিবরণ পড়েও হয়তো-বা আমি ইসলাম সম্পর্কে কৌতূহলী ও শ্রদ্ধাবান হয়ে থাকতে পারি।

হোসেন আলীর মুখে আমি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনতাম। শুধু হোসেন আলী নয়, তার মতো আমার সমবয়সী ও বেশি বয়সী মানুষদের মুখেও ধর্মবিষয়ক অদ্ভুত কথা কম শুনি নি। আমাদের পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে পুরাণের যে-সব দেব-দেবীর কথা জেনেছি, ওদের কাছে শুনলাম ও-সব দেব-দেবীর সঙ্গে না-কি মুসলমানদেরও অনেক সম্পর্ক ছিল। শিবের সঙ্গে আলীর কুস্তি, চণ্ডী দেবীর সঙ্গে হাওয়ার মোলাকাত, গঙ্গা দেবী আর কোন এক মুসলমান দরবেশকে ঘিরে কি একটা ঘটনা—ওদের কাছে এ-রকম অশ্রুতপূর্ব সব গল্পগাথা শুনে লৌকিক পুরাণের এক ভিন্নতর জগৎ আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছিল। এখন বুঝি: তাদের কাছে যা শুনেছি, ওগুলো ঠিক শাস্ত্রীয় ইসলামের কথা ছিল না, প্রায় সবই ছিল 'লৌকিক ইসলাম'। ওদেরই একজনের মুখে শুনলাম : নবীজির সঙ্গে আল্লাহ্‌র নব্বই হাজার বাতচিত হয়েছিল, তার মধ্যে তিরিশ হাজার মাত্র কোরানে আছে, আর ষাট হাজার হলো বাতেনি। সেগুলো সবাই জানতে পারে না, এর জন্যে দরকার মারেফতের সাধনা। শরিয়ত আর মারেফতের এ-রকম ভেদের কথা বাউল গানের আসরেও শুনেছি। আমাদের এলাকায় বড়ো বড়ো বাউল গায়ক ছিলেন। সিংহেরগাঁওয়ের জালাল উদ্দিন খাঁ তো নামকরা বাউল। এ ছাড়া রসিদ উদ্দিন, মিরাজ আলী, মজিদ মিয়া এ-সব বাউলদের গানের পাল্লায় জাহের ও বাতেন, শরিয়ত ও মারেফত, দুনিয়া ও আখেরাতের নানা কথা উঠে আসতো। এ-সব কথার তাৎপর্য কী বুঝতাম? বুঝতাম না হয়তো। 'হয়তো' কেন, নিশ্চয়ই বুঝতাম না। তবু বাউলদের 'পাল্লা' ও 'ধরাট' শুনতাম। মনোযোগ দিয়েই শুনতাম। শুনতে শুনতে এক ধরনের আবেশ এসে যেতো। বাউলরা হিন্দুয়ানী বিষয় নিয়েও 'পাল্লা' করতেন। তাঁদের পাল্লা ও ধরাটে হিন্দুয়ানী-মুসলমানী, জাহেরি-বাতেনি, শরিয়তি-মারেফতি—সব মিলে মিশে কী জানি কী একটা হয়ে যেতো! বাউলদের পাল্লা শুনে এসে এখানে-ওখানে নানা জায়গার আড্ডায় শ্রোতারা যখন ওই সব পাল্লার বিষয় নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করতো, তখন সে-সব মন্তব্যও আমি হা করে শুনতাম। আমার সহপাঠী হোসেন আলীর ইসলাম-ব্যাখ্যার মধ্যেও এসব কথারই প্রতিধ্বনি পেতাম। হোসেন আলীর কাছেই শুনেছিলাম 'ইসমে আজমে'র কথা। 'ইসমে আজম' যে কী, হোসেন আলী তো জানতোই না, এবং সে-ই বলতো : এটি কেউই জানে না। কেউ যদি ইসমে আজম জানে তবে সে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, আগুনে ঝাঁপ দিলেও তার গা পোড়ে না, হাজারো মানুষের ভীড়ের মধ্যেও সে অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে।

হোসেন আলীর মুখে এ-ধরনের আজব আজব কথা শুনে আমি অন্য এক জগতে চলে যেতাম। সে-জগৎটি কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট বা কুইট ইন্ডিয়া-জনযুদ্ধের জগৎ থেকে অবশ্যই সম্পূর্ণ আলাদা, তবু সে-জগতের কথাও আমাকে কম আনন্দ দিতো না। প্রায়ই আমাকে ঐ জগৎটি থেকে ঘুরিয়ে আনতো বলে হোসেন আলীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু ছেচল্লিশের মাঝামাঝিতেই কেমন যেন তাল কেটে গেলো। হোসেন আলীরা নানা রকম ঠেশ-দেয়া কথা বলতে শুরু করলো। হোসেন আলীরা মানে আমারই সহপাঠী বা খেলার

সাথী হামিদ, রাশিদ, আজিজ, হাশিম—ওরা। ওদের ঠেশ দেয়া কথার লক্ষ হয়ে উঠলাম আমরা—মানে গোপাল, সুশীল, প্রাণেশ, দীনবন্ধুরা। সবাই মিলে যে 'আমরা' ছিলাম এতোদিন, এখন যেন আর তা থাকছে না, কিংবা থাকতে পারছে না। ওরা বলতে লাগলো : তোরা হিন্দুরা তো 'বুইত্যা' পূজা করিস। যারা বুইত্যা পূজা করে তারা কাফের।

'বুইত্যা' মানে মূর্তি। হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তিকেই বুইত্যা বলে যে তারা এর প্রতি অবজ্ঞার প্রকাশ ঘটাচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরে খুবই মন খারাপ হয়ে যায়। আমরা তো বুইত্যা দূরে থাক, দেবদেবীর মূর্তিকে মূর্তিও বলি না, বলি—প্রতিমা। কালীবাড়ির সামনে দিয়ে গেলেই কালীর প্রতিমাটিকে দু'হাত জোড় করে প্রণাম করি। এ নিয়ে ওদের কী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ!

—'ওই বুইত্যাটার সামনে তোরা হাত জোড় করিস কেন? নিজের হাতে মাটি দিয়ে বুইত্যাটা বানালি, আবার তারই সামনে হাত জোড় করিস! ওই বুইত্যাটার কী ক্ষমতা আছে? এটিকে যদি ভেঙে গুড়ো করে দিই, ও আমাকে কিছু করতে পারবে?'

ওদেরই একজন হয়তো পাশ থেকে ফোড়ন কাটে—'তোর ভাঙতে হবে কেন? ওরা নিজের হাতেই তো ওই বুইত্যাগুলোকে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে দেয়। দেখিস না চন্দ বাড়িতে প্রত্যেক বছর আশ্বিন মাসে অনেকগুলো বুইত্যা বানিয়ে ধুমধাম করে পূজা করে, তারপর তিন দিন পরে ওগুলোকে ওদেরই পুকুরে নিয়ে ফেলে দেয়। পুকুরের পানি শুকিয়ে গেলে ওই বুইত্যার ভিতরের খ্যাড়গুলো বেরিয়ে আসে, আর গোরু-ছাগলে সেগুলো খায়।'

—'ওদের দেবতাকে গোরু-ছাগলে চিবিয়ে খায়।' হি হি করে হাসতে হাসতে বলে আরেকজন।

—'আমাদের সঙ্গে ওদের মিলবে না কোনো কিছুতেই। ওদের দেবতার মূর্তি আছে, আমাদের খোদা নিরাকার। ওদের ভগবানের আছে ভগবতী, ঈশ্বরের ঈশ্বরী। আমাদের আল্লার কোনো আল্লীর কথা বলতে পারবে কেউ?' রীতিমত দার্শনিকের মতো মন্তব্য করে আমারই কোনো এক সহপাঠী। যার নাম হাশিম বা হামিদ বা আজিজ বা এ-রকমই কিছু।

আর আমার মতো যারা—যাদের নাম গোপাল বা প্রাণেশ বা দীনবন্ধু কিংবা এ-রকম কিছু—তারা কেবল নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা কামড়ায়। হাশিম বা হামিদ বা আজিজদের হাড়-জ্বালানো কথার কী মোক্ষম জবাব দেয়া যায়, বাড়িতে এসে গুরুজনদের তাই জিজ্ঞেস করে। বয়স্ক গুরুজনরা ধমকে ওঠেন।

—'ওদের ও-সব অসভ্য কথার আবার জবাব কী? ওই ছোটলোকের বাচ্চাদের সঙ্গে মিশবি না কখনো। ওরা খায় গোরু, বুদ্ধিও তো ওদের গোরুর মতোই হবে। আর্যশাস্ত্রের গভীর অর্থ বুঝবার মতো বুদ্ধি ওরা কোথায় পাবে?'

বড়ো হয়ে ভেবে দেখেছি: গুরুজনরা এ-ধরনের কথা বলে গুরুতর অন্যায়-আচরণেই আমাদের প্রবৃত্ত করেছেন। মানুষকে ঘৃণা করা যে অন্যায়, সে-বোধটি কি আমাদের সকল গুরুজনই হারিয়ে ফেলেছিলেন? আমাদের যারা কাফের বলে গালিগালাজ করেছে, দেবতা ও পুজো-আচ্চা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, তারা এসব করতে শিখেছে কোথায়? তাদেরই গুরুজনের কাছে তো? আর আমাদের গুরুজনরা প্রতিপক্ষকে 'ছোট লোকের বাচ্চা' বলে—এবং নিজেদের আর্য বলে জাহির করে—সন্তানদের মনে মিথ্যা অহমিকার বীজ রোপণ করে দিলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে চিরস্থায়িত্ব দানের ব্যবস্থা করলেন।

আমাদের যুবক বয়সী দাদা ও কাকা সম্পর্কীয়দের কেউ কেউ আবার সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষের গালাগালি জবাব দেবার জন্যে আমাদেরও ইতর গালাগালির অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে তুলতে চাইলেন। নীরু দা বা জীবন দা বা ললিত কাকাদের মতো যুবকরা মুসলমানদের সম্পর্কে এমন সব বদ কথা আমাদের শিখিয়ে দিতেন যে, ওগুলো শুনলে মুসলমানরা নিশ্চয়ই গায়ে বিছুটি লাগলে যে-রকম হয় সে-রকম চিড়বিড় করে উঠবে।

বিছুটিকেই নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জে বলে চুৎরা। এই চুৎরা নিয়েই একদিন আজিজ না আর কার মুখে গা-জ্বালানো কথা শুনতে হলো।

—'তোরা হিন্দুরা তো হরির পূজা করিস। তুলসী গাছ তোদের এই হরি দেবতার গাছ। এই তুলসী পাতা আমরা সারা শরীরে ঘষতে পারি, আমাদের কিছু হবে না। কিন্তু আমাদের আল্লার গাছের পাতা তোরা গায়ে লাগাতে পারবি? আল্লার গাছ কি জানিস? চুৎরা গাছ। চুৎরা পাতা গায়ে লাগলেই বুঝতে পারবি, তোদের হরি বড়ো না আমাদের আল্লা বড়ো।'

ওরা কয়েকজন আমাদের মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে ছড়া কাটতে থাকে—'হরির পাতা বড়ি বড়ি/আল্লার পাতা ঢাল্লা ঢাল্লা।'

এর পাল্টা কোনো জুৎসই ছড়া আমরা মনে করতে পারছিলাম না। অথচ এভাবে হার মানাও যায় না। এবার প্রাণেশ একেবারে মরীয়া হয়ে বলতে থাকে, 'তোদের আল্লাকে তোরা এতো চিৎকার করে ডাকিস কেন রে? আল্লা কি কালা না-কি! রোজ কানে হাত দিয়ে কানফাটা চিৎকার করে আল্লাকে ডেকে তোদের মোল্লারা কি বলে জানিস? বলে—আল্লা, মরিচ চুরি করবো না। আল্লা, বেগুন চুরি করবো না। তোরা তো চোরের জাত, তাই...'

এ-রকমভাবেই নানা কুৎসিত কথার পাল্লা চলতে থাকে। নোংরামি আর অশ্লীলতায় কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা চলে। সব সময় এ-প্রতিযোগিতা মুখের কথার মধ্যে সীমিত থাকে না, হাতাহাতিও হয়ে যায় কখনো কখনো।

কিন্তু যখন খবর আসে বিহারে কলকাতায় নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আর গালাগালি বা হাতাহাতির স্তরে আটকে নেই, ভয়াবহ মারামারি আর রক্তারক্তির পর্যায়ে উঠে গেছে, তখন আমাদের গালাগালি-হাতাহাতি বন্ধ হয়ে যায়। না, আমাদের এলাকায় ছেচল্লিশ সালে হিন্দু-মুসলমানে মারামারি বা রক্তারক্তি হয়নি। হয়েছে তার চেয়ে অনেক বড়ো ও বেশি কিছু। মানুষ নিহত হয়নি, নিহত হয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস। মানুষ মানুষ থাকেনি, হয়ে গেছে হিন্দু কিংবা মুসলমান।

মনুষ্যত্বের গোরস্তান তৈরি করেই এভাবে পাকিস্তানের জন্মলগ্নটিকে এগিয়ে আনা হয়েছে।

'কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা'

নোয়াখালির দাঙ্গার খবর যখন আমাদের গাঁয়ে এসে পৌঁছলো, তখন আমাদের সে কী উত্তেজনা! কী ভীতি আর ক্রোধ! এখানেও দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে যে কোনো সময়। হিন্দুদের কথা : নেড়েদের কী বাড়টাই না বেড়েছে।

হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের ঘৃণা যেমন প্রকাশ পায় মালাউন, কাফের, বুৎ পূজারি ইত্যাদি শব্দ দিয়ে, হিন্দুরাও তেমনি মুসলমানদের সম্পর্কে ব্যবহার করে 'নেড়ে' শব্দটি।

'তেতুঁল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি'—এ-রকম প্রবাদ পশ্চিমবঙ্গে চালু আছে বলে শুনেছি। পূর্ববঙ্গের 'নাইড়্যা' কথাটিরই অভিশ্রুতি হয়ে পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে 'নেড়ে'। ইতিহাসবিদ বলেন : এক সময় বাংলার নেড়ে বা মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধরাই ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে মুসলমানরা এই 'নেড়ে' আখ্যাটি পেয়ে যায়। কাজেই শব্দটিতে তেমন দূষণীয় বা অবজ্ঞাসূচক কিছু আছে বলে মনে করা যায় না। তবু, 'নেড়ে' শব্দটির ব্যবহার ঘৃণা ও অবজ্ঞারই দ্যোতক। আসলে কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যেই সব সময় ঘৃণাবাচকতা বা শ্রদ্ধাবাচকতা থাকে না। একটি শব্দ ঘৃণাবাচক বা শ্রদ্ধাবাচক হয়ে ওঠে শব্দটির ব্যবহারকারীর মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে। 'নেড়ে' শব্দটির বেলাতেও তা-ই হয়েছে। নেত্রকোনা অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে 'নাইড়্যা' কথাটির অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার থাকলেও, সবচেয়ে বেশি চালু ছিল 'দারি' শব্দটি। 'দারি' কি 'দাড়ি'র উচ্চারণ ভেদ? মুসলমানরা দাড়ি রাখে বলেই কি তাদের 'দারি' বলা হতো? হতেও পারে। ছেচল্লিশে নোয়াখালির দাঙ্গার পর সাধারণভাবে হিন্দুরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, ওই নেড়ে বা দারি ব্যাটাদের কিছুতেই বিশ্বাস নেই, এমন কি ওদের পুঁচকে ছোঁড়াদেরও। তাই, আমাদের প্রতি অভিভাবকদের নিষেধ বিধি জারি হয়ে গেলো : আমরা যেন মুসলমান ছোঁড়াদের সঙ্গে বেশি ঘষাঘষি না করি, ওদের সঙ্গে গলাগলি করতে না যাই। নোয়াখালিতে ওরা যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, এখানেই যে ওরা তা ঘটাবে না—এমন কথা কে বলবে? দুদিন আগে যারা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তারাই এখন সন্দেহের পাত্র হয়ে গেলো। কেবল জন্মের কারণে, অর্থাৎ তারা জাতে মুসলমান বলে। তাদের সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু আগের সেই উত্তাপ নেই। গল্প করতে করতে আগের মতো একাত্মও হয়ে যাই না। আবার মতান্তর ঘটিয়ে গালাগালিও করি না। মারামারি যাতে না বেধে বসে, সে-ব্যাপারে তো খুবই সতর্ক থাকি। সব সময়ই কেবল মনে হয় : নোয়াখালিতে যারা হিন্দু মেরেছে, আর আমার পাশে বসে আছে যে হামিদ-রশিদ-আজিজ-হোসেন আলীরা, তারা সবাই এক। ওরা যে কোনো মুহূর্তে আমার পেটে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। আবার ওদের চোখ মুখ ও কথা বলার ভঙ্গি দেখেও মনে হয় যে, ওরাও আমাদের সম্পর্কে ও-রকমই ভাবছে। ওদের অভিভাবকরাও নিশ্চয়ই আমাদের সম্পর্কেও ও-রকম ধারণাই ওদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কলকাতায় যারা মুসলমানদের মেরেছে তারাও হিন্দু, আমরাও হিন্দু। কাজেই আমরা যে কায়দা পেলে এখানেও মুসলমানদের মেরে বসবো না তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

ছেচল্লিশ সালের গোড়ায়, নির্বাচনের সময়ও, আমার সহপাঠী গ্রাম্য মুসলিম বালকদের মধ্যে কোনোরূপ রাজনীতি-সচেতনতা দেখিনি। সে-সময়ে আমি যে-রকম অতি উৎসাহী কংগ্রেস সমর্থক হয়ে উঠেছিলাম, জয় হিন্দ বন্দেমাতরম্ মহাত্মা গান্ধী কি জয় নিয়ে মেতেছিলাম, 'ভোট দিবেন কিসে? কলস মার্কা বাক্সে' বলে যখন তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিলাম—হোসেন আলীরা মোটেই সে-রকম করেনি। তারা কেউ আমার কংগ্রেস সমর্থনের বিপরীতে মুসলিম লীগ সমর্থক হয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ বা নারায়ে তকবির শ্লোগান দিয়ে মুসলিম লীগের মিছিলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেনি। আসলে নির্বাচনের সময়েও আমাদের এলাকায় মুসলিম লিগারদের মিছিল টিছিল করার খুব একটা প্রয়োজনই পড়েনি। কারণ মুসলিম লীগ প্রার্থী আহসান আলীর প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থান ছিল খুবই দুর্বল। অনায়াসেই, বলতে গেলে প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই, মুসলিম লীগের জয় হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম লীগের তথা পাকিস্তান পন্থীদের কর্মতৎপরতা শুরু হলো নির্বাচনের পর। আগস্ট মাসে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর ঘোষণা, এবং তারপরই কলকাতার দাঙ্গা বা 'দ্য গ্রেট

ক্যালকাটা কিলিং' এবং এরও পর নোয়াখালির সেই অশ্রুতপূর্ব অমানবিক ঘটনাবলি। কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদেরই বেশি সংখ্যায় প্রাণ দিতে হয়েছিল, তাদের ক্ষতির পরিমাণটাও ছিল বিপুল। তবে দাঙ্গার উস্কানিটা দিয়েছিল মুসলিম লীগই। ছেচল্লিশের আগস্ট মাস ছিল মুসলমানদের রমজান মাস। সে-সময় কলকাতার মেয়র মুহম্মদ ওসমান ছিলেন কলকাতা জেলা মুসলিম লীগেরও সেক্রেটারি। তাঁরই স্বাক্ষরিত একটি পুস্তিকায় প্রচার করা হয়েছিল—

"এই রমজান মাসে ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়,...এই রমজান মাসেই আমরা মক্কায় জয়লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেই। এই মাসেই ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ আরম্ভ করিবার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাসই ঠিক করিয়াছেন।"

কলকাতার এই জেহাদে কাফের ও পৌত্তলিকরা নিশ্চিহ্ন হয়নি অবশ্যই, তবে মুসলিম লীগ নেতারা যে পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে মানবিক মূল্যবোধকে সাময়িকভাবে হলেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছিল এ কথা ঠিক। মুসলিম লীগের সমান্তরালেই সনাতন হিন্দুত্বের নামে ছুরি-পিস্তল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিল হিন্দু মহাসভা। আর এর ফলে ছেচল্লিশের ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট—এই চার দিনে কলকাতায় যা ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়ে 'দাঙ্গার ইতিহাস' প্রণেতা শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"চারদিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কমপক্ষে ৫ হাজার (মতান্তরে ১০ হাজার) নর-নারী-বৃদ্ধ-শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত, ১৫ হাজারের মতো আহত, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ অথবা লুণ্ঠিত ও নারীর অমর্যাদার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয়দের এবং মুসলমানদেরও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তরণ করে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়। বলা বাহুল্য চারদিনের এই প্রাথমিক মারণযজ্ঞে হিন্দু ও মুসলমান এক সঙ্গে থাকতে পারে না এবং তাই দেশ বিভাগ অপরিহার্য—এই মানসিকতারও বীজ বপন হয়।"

কলকাতার পর নোয়াখালি। নোয়াখালিতে 'এক তরফা হিন্দু নিধন ও উৎপীড়ন'-এর অনেক খবর সে-সময়েই আমাদের কানে আসে গুজব আকারে। গুজবের তো অনেক হাত-পা গজায়, তাই তার ওপর নির্ভর করে সত্য নির্ণয় করা যায় না। তবে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাসকার শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বলতে পারি। তিনি 'নোয়াখালি অঞ্চলে হিন্দু বিরোধী মানসিকতার ব্যাপক প্রচারের পিছনে' বিশেষ একটি 'স্থানীয় রাজনৈতিক কারণ'-এর উল্লেখ করেছেন। সে-কারণটি হলো 'এক শ্রেণীর মুসলমান দ্বারা পিররূপে পূজিত লীগের স্থানীয় নেতা মিঞা গোলাম সারওয়ারের নব দীক্ষিতের উৎসাহে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ও সংগঠন।' শৈলেশ বাবু লিখেছেন, "এছাড়া কলকাতার দাঙ্গায় দ্বিতীয় দিন থেকে মার খাওয়া মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনীও ইতিমধ্যে ঐ এলাকায় পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়।...

"১০ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে প্রায় পনের দিন একটানা এবং তারপরও গান্ধীজী ও তার সহকর্মীরা ঐ প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল এলাকার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে সংখ্যালঘু (শতকরা মাত্র ১২ জন) হিন্দুদের মনে সাহস সঞ্চার না করা পর্যন্ত এক তরফা হিন্দু উৎপীড়ন চলতে থাকে। লীগ সরকার প্রায় এক সপ্তাহ এ খবর প্রকাশিত হতে দেননি। ব্যাপক হত্যা (সঠিক সংখ্যা ঐ অবস্থায় জানা কঠিন।) লুণ্ঠন এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনাবলিতে প্রায় ৫০ হাজার

নরনারী প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে একটি হিসেবে পাওয়া যায়। ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ঘটনাও ঘটে ঐ একতরফা আক্রমণের ফলে। কিন্তু এসব থেকেও শোচনীয় ব্যাপার হলো বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করা, বহু ব্যক্তিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং সর্বোপরি বহু নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা ও জোর করে দাঙ্গায় সদ্য বিধবা ও তরুণী-বৃদ্ধাকে এক শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ দেয়া।"

নোয়াখালির পর বিহার। এবং বিহারে নোয়াখালির বিপরীত ঘটনা। অর্থাৎ একতরফা মুসলিম নিধন ও উৎপীড়ন। ইতিহাসকারের ভাষায় 'বিহারের দাঙ্গায় এক জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করা ছাড়া মুসলমানদের ওপর আর সব রকমের অত্যাচার, এমন কি নারীর অসম্মানও করা হয়।'

এ-সবের ফলে, বা এ-সবের মধ্য দিয়ে সারা দেশে মুসলমান সমাজের নিরঙ্কুশ ও সক্রিয় সমর্থন গেয়ে পেলো মুসলিম লীগ। এবং সে-সমর্থন যে বালক-কিশোর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, তারই প্রমাণ পাওয়া গেলো আমার সহপাঠী হোসেন আলী-হামিদ-রশিদ-গফুর-মাজিজদের মধ্যে। দু'দিন আগেও যাদের ভেতর রাজনীতি সচেতনতার বাষ্পমাত্রও দেখিনি, এখন রাতারাতি তারাই সকলে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম লিগার, একেকজন 'ক্ষুদে কায়েদে আজম'। তাদের অবিভাবক শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকেই তারা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের দীক্ষা পেয়েছিল নিশ্চয়, তবু বয়স্ক অভিভাবকদের সবাই যে পাকিস্তানি জজ্‌বায় একেবারে ভেসে গিয়েছিল তা নয়। আমার বালক বন্ধুরাই বরং তাদের বয়স্ক অভিভাবকদের চেয়ে বেশি মাত্রায় মুসলিম লীগ হয়ে গেলো। এবং হওয়াই অবিশ্যি স্বাভাবিক। বেশি বয়সী মানুষের চেয়ে কম বয়সীদের উৎসাহ তো বেশিই থাকবে। আর তাই আমার সহপাঠী মুসলমান বালক-কিশোররা বিপুল উৎসাহে লেগে গেলো মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্বের দর্শন প্রচারে। তাদের মুখেই যেন এ দর্শন সুনির্দিষ্ট ভাষারূপ পেয়ে যায়। বলা যেতে পারে, তারাই হয়ে ওঠে এ দর্শনের মুখ্য প্রচারক।

চিলুমচি আর দস্তরখানা সকল জাতে চিনে না,
কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা।

এ-রকম একটা ছড়া গাঁয়ে গঞ্জে শুনেছি। হিন্দু মুসলমান যে দুই জাতি, তারই অকাট্য প্রমাণ দেয়ার জন্য বোধ হয় অজ্ঞাতনামা ছাড়াকার এই ছড়াটি রচনা করেছিলেন। মুসলমানরাই চিলুমচি আর দস্তরখানা ব্যবহার করে, হিন্দুরা তো এগুলো চেনেই না। সব মুসলমানই কি চেনে? চিলুমচি আর দস্তরখানা তো আশরাফ ও অর্থবান মুসলমানদের ব্যবহার্য কিন্তু, আতরাফ ও অর্থহীন মুসলমানদের কাছে এগুলো কোনো অর্থই বহন করে না। কাজেই সাধারণ মুসলমানের পরিচয়-চিহ্ন খোঁজার জন্যই কলাপাতার শরণ নিতে হলো। মুসলমানরা মাটির শানকিতে ভাত খায়, হিন্দুরা খায় না। হিন্দুরাও অবিশ্যি মাটির শানকিতে ভাত খেতে পারে, তবে একবার মাত্র।·একবার ভাত খেয়েই শানকিটি ফেলে দিতে হবে, দ্বিতীয়বার আর তা স্পর্শও করা যাবে না। তাদের মতে, মাটির পাত্রে একবার খাবার খেলেই তা চিরকালের জন্য উচ্ছিষ্ট বা 'সকড়ি' হয়ে যায়। মুসলমানদের সকড়ি বলে কিছুই নেই। কাজেই হিন্দু আর মুসলমানের পার্থক্য দেখাবার জন্য এই মাটির শানকির উদাহরণটি ছড়াকার উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু শানকিও তো পয়সা দিয়ে কিনে আনতে হয়, সে পয়সা জোগাড় করা তো অতিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান বা হিন্দুর পক্ষেই কঠিন। তাই সকলের কাছে একান্ত সহজলভ্য

কলাপাতার ব্যবহার গ্রাম-গঞ্জে অত্যন্ত ব্যাপক। এমন কি বড়ো লোকদের বড়ো বড়ো ভোজেও এর ব্যবহার চলে। আবিষ্কৃত হলো : এই কলাপাতার ব্যবহারেও হিন্দু ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য আছে; হিন্দুরা খায় কলাপাতার উপরের পিঠে, আর মুসলমানরা তার উল্টো পিঠে। ব্যস, এরা যে আলাদা দুই জাতি—এখানেও তার প্রমাণ পাওয়া গেলো।

এই কলাপাতার দু'পিঠের উল্লেখ করে মুসলমান বালক বন্ধুরা কতোভাবেই না আমাদের বিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলতো।—'তোরা তো কাউয়ার গু খাস। কলাপাতার উপরের পিঠটায়ই তো কাউয়ায় হাগে। আমরা খাই নিচের পিঠটায়, সেটা কতো পরিষ্কার দেখেছিস?'

ধুতি-লুঙ্গি, টিকি-দাড়ি, মালা-তসবিহ আর গোরু পূজা-গোরু খাওয়ার দ্বন্দ্বসমাস তো আছেই, এরই সঙ্গে 'কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা'র মতো একটি মহাতুচ্ছ ব্যাপারকেও উচ্চে তোলা হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে। মুসলমানের পানি আর হিন্দুর জল, মুসলমানের আণ্ডা আর হিন্দুর ডিম, মুসলমানের গোসল আর হিন্দুর স্নান—এ-সবের মধ্যে যে একেবারে আকাশ-পাতাল ব্যবধান (না, আসমান-জমিন ফারাক), এ মহাসত্যও (!) সে-সময়ই আবিষ্কৃত হয়েছিল। গোরু যেমন হিন্দুর জন্য নিষিদ্ধ খাদ্য, মুসলমানের জন্য শূকরও তেমনি হারাম। কিন্তু বাঙালি হিন্দুরাও শূকর খায় না, তাদের তো আর 'শূয়ার খোর' বলে গালি দেয়া যায় না। তাই তারও একটা বিকল্প খুঁজে বের করা হলো। হিন্দুরা কাউট্যা ও কাছিম খায়, মুসলমানরা খায় না। 'শূয়ার খোর' না হলেও হিন্দুরা কাউট্যা খোর, কাছিম খোর। কাউট্যা-কাছিম খোর তো শূয়ার খোরের মতোই জঘন্য। তা ছাড়া মুসলমানরা পশুকে 'জবাই' করে, হিন্দুরা দেয় 'বলি'। হিন্দুরা নাকি জলপাত্র রূপে ঘটি বা গাড়ু ব্যবহার করে, আর মুসলমানরা বদনা। আমি কিন্তু অনেক হিন্দু বাড়িতেও বদনা দেখেছি, আমাদেরও একটি ছিল। তবু কবে থেকে যে ঘটি বা গাড়ু হিন্দু এবং বদনা মুসলমান হয়ে গেলো আমার জানা নেই। তবে, ছেচল্লিশের বেশ আগেই যে হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে নজরুলের ব্যঙ্গ কবিতা 'প্যাক্ট'-এ—'বদনা-গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি...'

নামের আগে সকল বাঙালিই 'শ্রী' ব্যবহার করতো—এতে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদ ছিল না। মুসলমানও যে 'শ্রী' লিখতো তার ঐতিহাসিক প্রমাণ তো রয়ে গেছে ষোড়শ শতাব্দীর ইশা খাঁর বিখ্যাত কামানে, যাতে স্পষ্ট লেখা আছে 'শ্রী ইছা খাঁ' নামটি। এখনো মুসলমান বাড়িতে জমি কেনাবেচার পুরনো দলিল খুললেই দেখা যাবে : 'কস্য পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে লিখিতং শ্রী সেখ আমজাদ আলী, পিতা—শ্রী সেখ রমজান আলী, জাতি—মুসলমান, পেশা—গৃহস্থী...।'। দ্বিজাতিতত্ত্বের উন্মেষের দিনগুলোতেই মুসলমান তার পরিধান থেকে যেমন ধুতি বর্জন করেছিল, তেমনি নাম থেকে করেছিল শ্রী বর্জন।

এভাবেই নানা কিছু বর্জন ও ধারণের মধ্য দিয়ে মুসলমান নামক একটি ধর্মীয় কমিউনিটিকে নেশনে রূপ দেয়া হলো ইংরেজি নেশন শব্দটির বাংলা ভাষান্তর রূপে 'জাতি' কথাটির নতুন ব্যবহার দিয়েই—এবং এতাবৎকাল ধরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'জাতি' শব্দটির অন্য সকল ব্যঞ্জনাকে বেমালুম অস্বীকার করেই—জোরের সঙ্গে বলা হলো যে, 'মুসলমানরা একটি জাতি'। একই দেশমাতা ও ভাষামাতার স্তন্যে লালিত হয়েও, একই ক্ষেতের একই রকম ফসল খেয়েও, একই রকম জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও হিন্দু আর মুসলমান হয়ে গেলো আলাদা আলাদা দু'টি জাতি। দুই পৃথক জাতির জন্য চাই পৃথক দুটি রাষ্ট্র। দুদিন আগেও, নজরুলের ভাষায়, 'একই বৃন্তে দু'টি কুসুম' হয়ে ফুটে থাকলেও এখন তাদের বৃন্তচ্যুত না হলেই চলবে না।

ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই 'জাতি' নামে প্রতিষ্ঠা দিয়ে একটি মিথ্যার নিপুণ শিল্প সৃষ্টিতে পূর্ণ সফলতা লাভ করলো মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলটি। তার এই সফলতার পেছনে সমাজ পরিবেশের আনুকূল্যও অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতা এখানে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। হিন্দুরা রক্ষণশীলতার দুর্গ তৈরি করে তাতে কচ্ছপের মতো হাত-পা নিজের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গুটি সুটি মেরে পড়ে রয়েছে, বাইরের কাউকে এ-দুর্গে তো ঢুকতেই দেয়নি, বরং নিজের মানুষদেরও কারণে-অকারণে বাইরে ঠেলে দিয়েছে—এসব অভিযোগ মোটেই মিথ্যা নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের দুর্গ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা হিন্দুরাই যে মূলত এদেশের মুসলমান সমাজ গঠন করেছে, সঙ্গত কারণেই যে সে সমাজটি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং তা করেছেও এ-কথাও সত্য। সত্য এ-কথাও যে : জমিদার-তালুকদার-মহাজনদের মতো গ্রাম্য শোষকগোষ্ঠী চাকুরে আমলাদের সুবিধাভোগী চক্র—সবই গড়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের উপরতলা-থেকে-আসা মানুষদের নিয়েই। তবে এই মুষ্টিমেয় হিন্দুদের প্রতাপান্বিত উপস্থিতিই মুসলমান সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষদের এগিয়ে যাওয়ার পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ-সত্যকে দেখতে চাইবে না যারা তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। যারা অন্ধ নয় তারা স্বীকার করবেই যে, ইংরেজ রাজত্বে বর্ণ হিন্দুদের একটি গোষ্ঠী সকল সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধা-সুযোগ কবজা করে নিয়েছিল বলেই সুবিধাবঞ্চিত মুসলমানরা নানা বাস্তব ও কল্পিত পার্থক্যগুলোকে একত্র করে হিন্দুদের থেকে নিজেদের পৃথক বলে ভাবতে প্ররোচিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্ররোচনা এসেছিল 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির অনুসারী শাসক ইংরেজদের তরফ থেকেও। এভাবে ভেতরের বাস্তব ও বাস্তবের বিভ্রম এবং বাইরের প্ররোচনা দিয়েই মুসলিম লীগ গড়ে তুলেছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব নামক একান্ত অভিনব ও নির্জলা মিথ্যা তত্ত্বটিকে। মুসলিম লীগ এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে এ তত্ত্বটি তৈরি করেছিল যে দেশের প্রায় সকল মুসলমান এর মোহিনী মায়ায় পুরোপুরি মজে গিয়েছিল, একটা চূড়ান্ত মিথ্যাকেই একান্ত সত্য বলে ধরে নিয়েছিল। এ তত্ত্ব এমন বিভ্রম ছড়িয়েছিল যে, আমার কিশোর বন্ধুরাও হঠাৎ করে একেকজন কাঠমোল্লা হয়ে গেলো।

সম্প্রদায়ই জাতি—এই অপতত্ত্বের ধাক্কায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা তো হয়ে পড়লেন প্রায় অচ্ছুৎ। অনেক জাতীয়তাবাদীও মুসলিম লীগের খাতায় নাম লিখিয়ে ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদীতে পরিণত হলেন। আবার যে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নাম প্রচারিত হয়েছিল লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রস্তাবক রূপে, তিনিই এ-সময়ে চিহ্নিত হয়ে গেছেন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে। আর সে-সময়, পাকিস্তানের শত্রু মানে মুসলমানের শত্রু। কাজেই মুসলমান এমন শত্রুকে সহ্য করবে কেন? নেত্রকোনা শহরে মিটিং করতে এসে চরম অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলেন শেরে বাংলা। আর, কী আশ্চর্য, মুসলিম লীগ তাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করতে পারলো মুসলমান কৃষক-প্রজাদের হাত দিয়েই। অথচ, দু'দিন আগেও এই শেরে বাংলাই ছিলেন কৃষক-প্রজাদের নয়নমণি।

জাতীয়তাবাদী কিংবা কৃষকপ্রজাপন্থী মুসলমানদের চেয়ে করুণ অবস্থা হলো আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সাম্যবাদী মুসলমানদের। জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের রাহু এসে গ্রাস করলো লেনিনের দ্বিজাতিতত্ত্বের সূর্যকে। লেনিনের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যেক জাতির ভেতর দেখে দু'টি করে জাতি—শোষক ও শোষিত। আর জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে মুসলমান আর হিন্দু—এই দু'টি মাত্র জাতি—শোষক ও শোষিত। আর জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে মুসলমান আর হিন্দু—এই দু'টি মাত্র জাতি। হিন্দু মানেই শোষক, মুসলমানের মধ্যে শোষকের কোনো অস্তিত্বই নেই। হিন্দুদের

আধিপত্য-মুক্ত হয়ে মুসলমানের পাকিস্তান কায়েম হলে শোষক-শোষিত বলে কিছুই থাকবে না। এ-রকম একটি জঘন্য প্রতারণার মাদক দিয়ে গোটা দেশের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নেশাগ্রস্ত করে মুসলিম লীগ পাকিস্তান নামক একটি পিশাচের জন্মকে সম্ভব করে তুললো। সেই পিশাচের গানের ধ্রুবপদ—'কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা'।

হিন্দুর জাতপাত ও হিন্দু মহাসভার 'প্রগতিশীল' ভূমিকা

নোয়াখালির দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশেই একটা দাঙ্গা দাঙ্গা ভাবের সংক্রমণ ঘটে যায়। দাঙ্গা বাধানোর জন্যে না হলেও সম্ভাব্য দাঙ্গা প্রতিরোধের প্রস্তুতির জন্যে জোট বাঁধতে থাকে সবাই। শুধু জোট বাঁধলে তো হবে না, অস্ত্রও জোগাড় করতে হবে। তখন তো অন্তত গ্রামাঞ্চলে, এখনকার মতো বোমা-বন্দুকের ছড়াছড়ি ছিল না। দা, বটি, ছুরি, চাকু—গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার্য এসব অস্ত্রই তখন মারণাস্ত্র রূপেও ব্যবহৃত হতো। মাছমারার কোচও মানুষ মারার কাজে লাগতো কখনো কখনো। তবে সনাতনী লাঠিই ছিল সবচেয়ে বড় অস্ত্র, লাঠিয়ালই ছিল বড় যোদ্ধা। ছেচল্লিশেও দেখলাম বাঁশ কেটে প্রচুর লাঠি তৈরি হচ্ছে, দক্ষ লাঠিয়ালদের খাতির বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে আরেকটি অস্ত্র তৈরিরও ধুম পড়ে গিয়েছিল সে-সময়। সেটির নাম হলঙ্গা। সুপারি গাছ ফালা ফালা করে কেটে লম্বা লাঠি বানিয়ে সেই লাঠির আগাটা বর্শার মতো সুঁচালো করে নিলেই তৈরি হয়ে যায় হলঙ্গা।

কিন্তু লাঠিই হোক আর হলঙ্গাই হোক সেটি চালাবার জন্যে তো মানুষ লাগবে। হিন্দু 'ভদ্রলোকে'র পাড়ায় সে-মানুষ কই? ভদ্রলোক মানেই হলো পরগাছা বা পরশ্রমজীবী। পরিশ্রমজীবীদের শ্রমের ওপরই তাদের জীবন ও জীবিকার নির্ভর। লাঙ্গল বা হাতুড়ি চালিয়ে তারা যেমন উৎপাদন করতে জানে না, তেমনি দুশমনকে হঠানোর জন্যে লাঠি বা হলঙ্গা চালানোর ক্ষমতাও তাদের নেই। তারা কেবল জানে কলমের খোঁচা দিয়ে শ্রমজীবীদের শ্রমের ফল অপহরণ করতে। কাজেই ভদ্রলোকেরা জোট বাঁধলেই-বা কী, অস্ত্র জোগাড় করলেই-বা কী?

লাঠি কিংবা হলঙ্গা যারা চালাতে পারে আর্যশাস্ত্রে তাদের নাম দেয়া হয়েছে 'নগরান্তবাসী'। যারা শূদ্র যারা অন্ত্যজ, নগরে তথা 'ভদ্রলোকে'র পাড়ায় বাস করার অধিকার তাদের নেই, তারা বাস করবে নগরের উপান্তে। ভদ্রলোকেরা যাতে তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে পারে সে-জন্যেই এ-ব্যবস্থা।

অবিশ্যি ভদ্রলোকরা যখন বিপদে পড়ে তখন কিন্তু এই নগরান্ত বাসীদের কাছেই তাদের ছুটে যেতে হয়। তখন বাপু-বাছা বলে ওদের মন ভেজানোর কাজে লেগে যেতে তাদের দেমাকে একটুও বাধে না। ছেচল্লিশেও তাই ভদ্রলোকরা 'মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে দিয়ে' ছোটলোকদের দুয়ারে গিয়ে ধর্না দিলো। কিন্তু ততোদিনে ওই ছোটলোকরাও যথেষ্ট সেয়ানা হয়ে উঠেছে, নিজেদের মান-সম্মানের ব্যাপারে বেশ সজাগ হয়ে গেছে। তারা আর এখন ভদ্রলোকদের বাপু-বাছা শুনেই গলে যাবার পাত্র হয়ে নেই। তারা এখন প্রাপ্য মর্যাদা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে চায়।

এখানে হিন্দু সমাজের ভদ্রলোকের তৈরি সামাজিক স্তর বিন্যাসটি সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেয়া দরকার বলে মনে করি। কারণ, এখন আর সেই বিন্যাসটি কোথাও অবিকৃতভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাকিস্তানের জন্ম ও মৃত্যুর অভিঘাতে এ দেশের হিন্দুসমাজে অনেক রূপান্তর

ঘটে গেছে। কাজেই এখনকার হিন্দুদের দেখে সাতচল্লিশ সালের আগেকার হিন্দু সমাজ সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন।

সকলেই হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের বিন্যাসের কথা জানেন। ব্রাহ্মণ সবার উপরে, শূদ্র সবার নিচে। শূদ্রদেরও নিচে আছে অন্ত্যজরা। শূদ্ররা অন্য তিন বর্ণের অস্পৃশ্য, আর অন্ত্যজরা শূদ্রদেরও অস্পৃশ্য।

কিন্তু চার বর্ণ আর অন্ত্যজের বিন্যাসও বহু আগেই কেতাবী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, অন্তত বাংলায় তো বটেই। বাংলায় চার বর্ণ নেই, এখানকার স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মীয় আচারের বিধানে আছে মাত্র দু'টি বর্ণ—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই শূদ্র। তবে বাংলার ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের মধ্যেও বিভাজন তৈরি করে নিয়েছে। বলা হয় : বাংলার হিন্দুদের আছে ছত্রিশ জাত। ছত্রিশ জাত হচ্ছে একটা কথার কথা মাত্র। আসলে হিন্দুদের জাতের সংখ্যা যে কতো তার সঠিক সংখ্যা বোধ হয় কারো জানা নেই।

তবে ব্রাহ্মণরা বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্রদের প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছে—সৎ শূদ্র আর অসৎ শূদ্র। কায়স্থ আর বৈদ্যরা পড়ে সৎ শূদ্রের দলে। (অবিশ্যি কায়স্থরা এক সময় 'শূদ্র' বলে অভিহিত হতে অস্বীকার করে এবং ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করে বসে। বৈদ্যরা তো ব্রাহ্মণদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজেদেরকে ব্রাহ্মণদের সমপর্যায়ের বলে ঘোষণা দেয়। তবে সে হচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয়)। সৎ শূদ্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের ব্যবহার কিছুটা মর্যাদাপূর্ণ, ব্রাহ্মণরা এদের হাতে জল খায়, এদের বাড়ির পূজা পার্বণে পৌরোহিত্য করে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা। এই সৎ শূদ্রদের দলে আরো আছে 'নবশাক' বা 'নবশায়ক'রা। সদ্গোপ (গোয়ালা), মালাকার, তেলী, তাঁতী, মোদক (ময়রা), বারুই (পানচাষী), কুমার, কামার, নাপিত—এই নয়টি বৃত্তিবাচক জাতকেই বলে নবশাক বা নবশায়ক।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাক ছাড়া অন্য সব জাতই জল-অনাচরণীয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও সৎ শূদ্রদের দৃষ্টিতে অন্যসব জাতের লোকই অস্পৃশ্য, তাদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত নিষিদ্ধ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা তাদের বাড়িতে পূজা পার্বণে পৌরোহিত্য করেন না, করলে পতিত বলে গণ্য হন। এই জল অনাচরণীয় 'ছোটজাতে'র লোকেরাই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারাই সামাজিক শ্রমের উৎপাদক, তারাই শ্রমজীবী। এই জল-অনাচরণীয় 'ছোটজাতে'র লোকেরা আবার অনেক জাতে বিভক্ত। যেমন—নমশূদ্র, ধোপা, ভুঁই মালী, কৈবর্ত, পাটনী, সূত্রধর ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের বাড়িতে পূজা-পার্বণে পৌরোহিত্য করেন অনভিজাত ও পতিত 'বর্ণ ব্রাহ্মণ'রা। আর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বা বর্ণ ব্রাহ্মণ কেউই যাদের পৌরোহিত্য করেন না, সবাই যাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে, অথচ 'হিন্দু' নামেই যাদের পরিচয় সেই হাড়ি ডোম মেথর ধাঙ্গড়রা হচ্ছে অন্ত্যজ।

হ্যাঁ, এখানে ব্রাহ্মণদের অভ্যন্তরীণ বিভাজনটির কথাও বলে নেয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আছে অনেক স্তরভেদ, তাদের নিজেদের ভেতরেই আছে অভিজাত-অনভিজাতের ব্যবধান। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও বর্ণ ব্রাহ্মণ—প্রথমত এরকম মোটা দু'ভাগে বাঙালি ব্রাহ্মণ সমাজ বিভক্ত। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদেরও অন্তত তিনটি উপ-বিভাগ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক। ব্রাহ্মণগোষ্ঠিতে এরাই অভিজাত। অভিজাতদের আভিজাত্যেরও আবার রকমফের আছে। কেউ কুলীন, কেউ অ-কুলীন। কুলীনদেরও কেউ 'নৈকষ্যকুলীন' বা খাঁটি কুলীন, কারো বা কুলীনত্বে ভেজাল মিশে গিয়ে হয়ে পড়েছে 'ভঙ্গ কুলীন'।

আর বর্ণ ব্রাহ্মণরা শুধু অনভিজাতই নয়, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা তাদের হাতের জলও স্পর্শ করে না। এমনকি অব্রাহ্মণ সৎ শূদ্রদের কাছেও বর্ণ ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্য। এই বর্ণ ব্রাহ্মণদেরও আবার অনেক বিভাগ। জল-অনাচরণীয় যেসব 'ছোট জাতে'র ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড তারা পরিচালনা করে, সেসব জাতের নামেই এদের পরিচয়। যেমন—ধোপার ব্রাহ্মণ, নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ, কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক হয়েও হিন্দু সমাজের প্রায় উপান্তে এদের অবস্থান। তথাকথিত উঁচু জাতের লোকেরা সুযোগ পেলেই বৃত্তিজীবী নানা জাতের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরোহিত বর্ণ ব্রাহ্মণদের নিয়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না। এমনকি, খুবই দুঃখজনক, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো দিক্‌পাল সাহিত্যিকও 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' নামক উন্নতমানের স্যাটোয়ার গ্রন্থটিতে 'কৈবর্তের ব্রাহ্মণ'দের ওপর অহেতুক কটাক্ষ বর্ষণ করে নিতান্ত নীচতার পরিচয় দিয়েছেন।

খুবই মোটা দাগে আমি হিন্দুদের জাতপাতের কিছু পরিচয় তুলে ধরলাম। কিন্তু এ-পরিচয় খুবই সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত। হিন্দু সমাজের জাতপাতের ব্যবস্থাটা এতো জটিল যে, এ-সমাজের বাইরের কোনো লোক এটির স্বরূপ বুঝতে চাইলে অল্পতেই তার মাথা ধরে যাবে। হিন্দু সমাজের ভেতরের মানুষদেরও সবাই যে এর খুঁটিনাটি ব্যাপারটা সহজে বুঝে উঠতে পারে, তা-ও নয়।

সমাজটির পরতে পরতে আছে ঘৃণা,, পারস্পরিক ঘৃণা। আর এই ঘৃণার দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রকাশ ঘটে খাওয়া আর ছোঁয়ার মধ্যে। খাওয়া আর ছোঁয়াতেই হিন্দুর জাত যায়। 'যায়' না বলে অবিশ্যি 'যেতো' বলাটাই সঠিক। এখন আর হিন্দুর জাত যায় না। কেউ ইচ্ছে করলেই কারো জাত মারতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মের কিছুদিন আগেও অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন ভাতের হাঁড়ি আর হুঁকোর জলের মধ্যেই ছিল হিন্দুর জাতের আশ্রয়। নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি' কবিতাটি তো আর খুব বেশিদিন আগের লেখা নয়।

শুধু বড় জাতের লোকেরাই যে জাতের নাম বজ্জাতি করে তা নয়। এ বজ্জাতি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ছোট জাতের মধ্যেও। ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্র চক্রবর্তী বা কায়স্থ নগেন্দ্র দত্তের কাছে মহিম নমশূদ্র বা শরৎ ধোপা একই রকম অস্পৃশ্য। অর্থাৎ নমশূদ্র কিংবা ধোপা উভয়কেই ব্রাহ্মণ কায়স্থরা একই রকম ঘৃণা করে। কিন্তু শরৎ ধোপা মনে করে যে সে মহিম নমশূদ্রের চেয়ে বড়। মহিমের হাতে জল খেলে তার জাত যাবে। এরকমই জাতের মহিমা!

কিন্তু এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরিতে যাদের বসবাস, এক কুঠুরির বাসিন্দারা অন্য কুঠুরির মানুষদের থেকে যেখানে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকতে চায়, এমন কি একই কুঠুরির ভেতরও ছোট ছোট বেড়া তুলে দেয়, সেই সব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়ে একটি অভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় বা সমাজ কী করে তৈরি হয়?

প্রশ্নটির উত্তর নিশ্চয়ই আছে, তবে এক কথায় কোনো উত্তর নেই। এককথায় কেন, বহু কথায়ও সে উত্তর আমি এখানে দিতে চেষ্টা করবো না। ছেচল্লিশ সালে, আমার মাত্র এগারো বছর বয়সে, আমি উপলব্ধি করেছি : অন্তত সে-সময়ে নোয়াখালির দাঙ্গাই মুসলমানদের বিপরীতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মতো 'ভদ্রলোক' থেকে ধোপা-নমশূদ্রের মতো 'ছোট লোক' কিংবা হাড়ি-ডোমের মতো অন্ত্যজ পর্যন্ত সকলকে 'হিন্দু' নামক একটি বোধে একত্র করে দিয়েছিল।

কংগ্রেসীরা যদিও দেশের সকল মানুষকে এক জাতি বলেই প্রচার করতো, তবু মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবল প্রতিষ্ঠার মুখে কংগ্রেসীদের একজাতিতত্ত্ব নিতান্ত একটা তাত্ত্বিক

ধারণা মাত্র হয়ে গেলো। আর এ সময়েই মুসলিম লীগের পাশাপাশি হিন্দু মহাসভারও প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

নামেই প্রকাশ, মুসলিম লীগের মতো হিন্দু মহাসভাও একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। মুসলিম লীগের জন্ম ১৯০৬ সালে। কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৯০৯ সালে, আত্মপ্রকাশ করে হিন্দু মহাসভা। তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে হিন্দু মহাসভা কোনোদিনই তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। ঘোর সাম্প্রদায়িক হিন্দুটিও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল কংগ্রেসের সমর্থক। কারণ কংগ্রেসের একজাতিতত্ত্ব তো অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুর কোনো ক্ষতি করে না। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুটিও বরং কংগ্রেসী একজাতিতত্ত্বকে তার স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করে। তাই সে কংগ্রেসকে ভোট দেয়, কংগ্রেসী শ্লোগানে গলা মেলায়। কিন্তু মুসলিম লীগের নানা সাম্প্রদায়িক দাবির বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভা যখন হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে ধরে, তখন অনেক কংগ্রেসী হিন্দুকেও দেখেছি হিন্দু মহাসভার সমর্থক ব'নে যেতে। অর্থাৎ হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা না পেলেও অসুস্থ রাজনীতির আবহাওয়ায় সামাজিক প্রতিপত্তিতে একেবারে পিছনে পড়ে থাকে না।

ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় এদের প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কর্মসূচির প্রত্যক্ষ ফলই ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গায় মুসলিম হুমকি মোকাবেলার জন্যেই প্রয়োজন হিন্দু ঐক্য—হিন্দু মহাসভা তার এই বক্তব্যটিকে জনপ্রিয় (আসলে হিন্দুপ্রিয়) করার জন্যে এ সময় মাঠে নামে। হিন্দু ঐক্যের ব্যবস্থা করতে হলে তো হিন্দুত্বের সংস্কার করতে হবে। আর হিন্দুত্বের সংস্কারের জন্যে অস্পৃশ্যতা দূর করাটাই হচ্ছে প্রথম করণীয়। শূদ্র কিংবা অন্ত্যজদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে, তাদের হাতে জল খেলে তোমাদের জাত যাবে, তাদের ছায়া মাড়ালে তোমাদের স্নান করে পবিত্র হতে হবে, দেবতার মন্দিরেও তাদের ঢুকতে দেবে না, আবার ঠ্যালায় পড়লে তাদেরই বাপু-বাছা বলে ডেকে আনবে, তাদের হাতে লাঠি-হলঙ্গা তুলে দিয়ে বলবে 'মুসলমানদের মারের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। কারণ আমরাও হিন্দু তোমরাও হিন্দু, হিন্দুর বিপদে হিন্দুকেই তো পাশে দাঁড়াতে হবে'—এ রকমটি আর এখন চলছে না। হিন্দু মহাসভার নেতারা এ কথাটাই নানাস্থানে সভা করে হিন্দুদের বোঝাতে থাকে। আমাদের গ্রামেও এরকম কয়েকটি সভা হয়েছিল।

এ-সব সভা আমাকে খুবই উদ্দীপ্ত করেছিল। শাস্ত্রের নামে এতোদিন ধরে যা বলা হয়েছে, সেসবের মধ্যে যে রয়ে গেছে প্রচুর ফাঁক ও ফাঁকি—এ কথাটাই হিন্দু মহাসভার বক্তৃতা শুনে আমি বুঝে নিয়েছিলাম। হিন্দুর শাস্ত্র যে মানুষে মানুষে কতো ব্যবধান তৈরি করে রেখেছে, সেই শাস্ত্রের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে না এলে যে সত্যিকারের মানুষই হওয়া যাবে না, হিন্দু মহাসভার 'অস্পৃশ্যতা বর্জনে'র আহবান আমাকে তাই জানিয়ে দিয়েছিল। এদিক দিয়ে, আমি বলবো, চরম প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন হিন্দু মহাসভা তার অজ্ঞাতসারেই হয়তো-বা একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে ফেলেছিল। উনিশ শতক থেকে হিন্দু মনীষীরা সমাজ-সংস্কারের যেসব ভাবনা প্রচার করেছেন ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের অনুশীলন করেছেন, সেগুলো শহর-নগরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম-গঞ্জের বিপুল সংখ্যক সাধারণ হিন্দুর মধ্যে তেমন কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি। ছেচল্লিশ সনে হিন্দু মহাসভা আর যা-ই করুক আর না করুক, হিন্দু ঐক্যের ধুয়া তুলে হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড় পাপ অস্পৃশ্যতা দূর করার

একটা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজী যদিও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে লড়ে এসেছেন, বিহারের ভূমিকম্পকে পর্যন্ত বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতার পাপের পরিণাম বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তবু তিনি এই পাপ দূর করার জন্যে তেমন কিছুই করতে পারেননি। এক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগটিকে অনেক সফলই বলতে হবে। তারা গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্যে সর্বজনীন পূজার অনুষ্ঠান করলো। সর্বজনীন পূজা মানে ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে সকল হিন্দু একত্র হয়ে একই মন্দিরে পূজা করবে, সব জাতের মানুষ সেই মন্দিরে প্রবেশ করবে, শূদ্র প্রসাদ বিতরণ করবে এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাও সেই প্রসাদ গ্রহণ করবে। এভাবে সকল জাতের মানুষের একত্র মিলন ও পানভোজনের ব্যবস্থা করে গ্রামীণ হিন্দু সমাজে একটা ঐক্যবোধ আনার চেষ্টা করলো হিন্দুমহাসভা।

হিন্দু সমাজের ছ্যুৎমার্গ ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের 'অকূল অতল কালাপানি'

হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা দূর করার ক্ষেত্রে চল্লিশের দশকে হিন্দু মহাসভা যে ভূমিকা পালন করেছিল তাকে আমি বলছি 'প্রগতিশীল'। এবং হিন্দু মহাসভার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কে পুরো সচেতন থেকেই এ কথা বলছি। আসলে কোনো ব্যক্তিমানুষ বা কোনো গোষ্ঠী কিংবা কোনো সংগঠন সব সময় স্বেচ্ছায় বা সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতিশীল অবস্থানে থাকতে পারে না। পরিপার্শ্বের ইচ্ছানিরপেক্ষ বাস্তবতাই অনেক সময় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দিয়েও এমন অনেক কাজ করিয়ে নেয় যা পরিণামে প্রগতিশীল বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। আবার এর উল্টোটাও হয়। অর্থাৎ প্রগতিশীলদের অনেক কার্যকলাপও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সাহায্য করে।

যাই হোক, আমি এখানে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব কথা নিয়ে অধিক বাগ্‌বিস্তার করতে চাই না। ছেচল্লিশ সালে হিন্দু মহাসভার অস্পৃশ্যতা বর্জনের কর্মসূচি যে গ্রামাঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে কথাটাই কেবল স্মরণ করছি। একেবারে এই প্রথম যে গ্রামবাংলার হিন্দুরা প্রচলিত শাস্ত্রীয় সংস্কার বা কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের সংস্পর্শে এলো, তা অবশ্যই নয়। গ্রামীণ সমাজেও নানা লৌকিক ধর্মান্দোলন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র বিধানকে এর আগেও নানা সময়ে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং এ সবের ফলে সেই নিম্নতরঙ্গ সমাজেও তরঙ্গ উঠেছে, সে তরঙ্গ কখনো কখনো কূল ছাপিয়েও গিয়েছে। এ রকম কূল প্লাবিত করা সামাজিক আলোড়ন-আন্দোলনের স্মৃতি আমিও কিছু কিছু বহন করে চলছি। পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন প্রসঙ্গে যে সব স্মৃতির রোমন্থনও আমাকে করতে হবে বৈকি। তবে ছেচল্লিশে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলনটা যেমন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনটি এর আগে কখনো হয়নি।

আনুষ্ঠানিকভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্যে সে সময় গ্রামে গ্রামে যে সব সর্বজনীন কালীপূজা কিংবা মঙ্গলচণ্ডী পূজা হচ্ছিল, সেগুলোর খবর খুবই ঘটা করে ছাপা হতো অর্ধসাপ্তাহিক *আনন্দবাজার* পত্রিকায়। পত্রিকায় ওই সব খবর পড়ে কবিরাজ জগদীশ চন্দ্র নাগের 'কুলনন্দআয়ুর্বেদ ভবন'-এ গ্রামীণ পাঠকদের মধ্যে তর্কবিতর্কের ঝড় উঠতো। অস্পৃশ্যতা বর্জনের পক্ষ সমর্থন করে যদি একজনে এক কথা বলতো তো এর বিরুদ্ধে পাঁচ জনে বলতো পাঁচ দ্বিগুণে দশ কথা। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার হুমকির মুখেও গ্রামীণ

হিন্দুরা জাতপাতের গণ্ডি ভাঙতে রাজি হচ্ছিল না। সেই ১৯৪৬ সালেও অস্পৃশ্যতার পক্ষে প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখে এমন যুক্তি শুনেছি যাকে যুক্তি বলে মেনে নেয়া একালের যে কোনো অর্বাচীন ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব।

আসলে সে সময়েও হিন্দুত্ব আর অস্পৃশ্যতা ছিল সমার্থক। আচার-সর্বস্ব হিন্দুত্বের প্রধানতম আচারই ছিল খাওয়া আর ছোঁয়া সম্পর্কীয়। কোন জাতের লোকের ছোঁয়া জল খাওয়া যাবে না, কোন জাতের ছোঁয়া জল খাওয়া যাবে কিন্তু ভাত খাওয়া যাবে না, কোন জাতের লোকের ছায়া মাড়ালেও স্নান করে পবিত্র হতে হবে—এ সবই ছিল হিন্দু সমাজের মূল বিবেচ্য বিধিবিধান। এ সব বিধিবিধান শুধু কঠোরই ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে ছিল অমানবিকও। উনিশ শতকে রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকল মনীষী এই সব অমানবিক বিধিবিধানের ওপরই আঘাত হেনেছিলেন এবং তাতে নাগরিক হিন্দুসমাজে একটি রেনেসাঁসের মতো ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু সে রেনেসাঁসটা যে ছিল খুবই খণ্ডিত, তারই প্রমাণ বহন করে আসছিল চল্লিশের দশক পর্যন্ত গ্রামবাংলার সমাজ। গ্রাম বাংলার হিন্দুরা তখনো বাস করতো জাতপাতের পাচিলঘেরা অচলায়তনের ভেতর। ঠিক এ সময়েই যখন হিন্দু মহাসভা সব জাতের হিন্দুকে এক সঙ্গে পানভোজন করার আহবান জানালো, শুধু আহবান নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে সে আহবানের বাস্তব রূপ দিতেও লেগে গেলো—তখন বর্ণ হিন্দুদের অনেকের পক্ষেই তা মেনে নেয়া খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের ভাষায় এটি হলো 'ম্লেচ্ছাচার'। সনাতনী হিন্দু দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য আচার-পরায়ণ হিন্দু ছাড়া আর সবাই ম্লেচ্ছ। যারা জাতপাত মানে না, পান ভোজনে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার করে না, তারা সবাই ম্লেচ্ছ। খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমানরা এ কারণেই ম্লেচ্ছ। আর এখন কিনা জাতপাতের সব দেয়াল ভেঙে দিয়ে হিন্দুকেও ম্লেচ্ছ বানিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কলি, ঘোর কলি! হ্যাঁ, শাস্ত্রেই তো আছে : কলির শেষে ঘোর অধর্মে যখন পৃথিবী ছেয়ে যাবে তখন ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোনো ভেদ থাকবে না, ম্লেচ্ছাচারের পাপের ভারে পৃথিবীতে প্রলয় নেমে আসবে! বোঝা যাচ্ছে, প্রলয় খুব বেশি দূরে নেই আর!

ছেচল্লিশের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও এ রকম কথা আমি আমাদের গাঁয়ের প্রবীণ হিন্দুদের মুখে শুনেছি। দেশের বিভিন্ন স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে (অর্থাৎ কালী পূজা মঙ্গলচণ্ডী পূজা কিংবা এ রকম অন্য কোনো পূজার অনুষ্ঠান করে) অস্পৃশ্যতা বর্জনের খবর *আনন্দবাজারে* পড়তে পড়তে তারা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। উত্তেজনার বশে কতো অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কথাই-না তারা বলে যেতেন।

তাদের কথার প্রতিবাদ করতো গ্রামের হিন্দু যুবকরা। ওই ছ্যুৎমার্গের ব্যাপারটা যে নিতান্তই কুসংস্কার এবং এই কুসংস্কারই যে হিন্দুর সর্বনাশের মূল কারণ, কুসংস্কার আর হিংসাই যে হিন্দুকে হাজারো ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে, আর তারই ফলে যে নোয়াখালিতে হিন্দুরা মুসলমানের হাতে পড়ে পড়ে মার খেয়েছে—এ সব কথাই প্রবীণ হিন্দুদের মুখের ওপর তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলতেন আমার জ্ঞাতিভাই হীরেন্দ্র দা। নির্বাচনের সময় হীরেন্দ্র দা ছিলেন কট্টর কংগ্রেসপন্থী। আর এখন দেখলাম তিনি হিন্দু মহাসভার প্রবল অনুরাগী। 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই'—এ রকম কথা এখন আর তার মুখে শোনা যায় না। তার বদলে 'জাতপাতের ভেদ দূর করে সব হিন্দুকে এক হয়ে মুসলমানদের রুখতে হবে'—এ ধরনের কথাই তিনি পাগলের মতো দিনরাত বলে যাচ্ছেন। আর মহাউৎসাহে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে সর্বজনীন মঙ্গলচণ্ডী পূজার ব্যবস্থা করে অস্পৃশ্যতা বর্জনের অনুষ্ঠান করছেন।

কিন্তু অস্পৃশ্যতা বর্জনের হৈ হৈ প্রচার যতোটা হয়েছে, আসল কাজ ততোটা হয়নি। কারণ স্মরণাতীত কালের সংস্কার রাতারাতি বর্জন করা যায় না, অন্তত সবাই তো তা পারেই না। তাই অস্পৃশ্যতা বর্জন নিয়েও দেখা গেলো অনেক লুকোচুরির খেলা, অনেক কপটতা, অনেক আত্মপ্রতারণা।

রামপুরের কালীবাড়িতে যেদিন ঘটা করে সর্বজনীন মঙ্গলচণ্ডী পূজা করা হচ্ছিল, সেদিন সকাল থেকেই আমার ঠাকুরমা আমাকে বাড়িতে আটকে রাখতে চাইছিলেন। কারণ, এই পূজার ব্যাপারে আমার উৎসাহের আতিশয্য দেখে তিনি খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অতি আদরের নাতিটি কালীবাড়িতে গিয়ে নমশূদ্র আর ধোপাদের হাতের জল খেয়ে জাত খোয়াবে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু আমি তখন প্রচণ্ড বিদ্রোহী। ঠাকুরমার সব বাধা ঠেলে পূজার দিনে কালীবাড়িতে উপস্থিত হয়ে মহা ফূর্তি করলাম, পূজা শেষে লোকনাথ নমদাসের পরিবেশন করা প্রসাদ খেলাম মহা আনন্দে এবং সারা গ্রাম জুড়ে আমার এই বীরত্বের কাহিনী প্রচার করতে লাগলাম উচ্চকণ্ঠে। ঠাকুরমা যেন মরমে মরে গেলেন। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন, 'দেখ, পূজার প্রসাদ খেয়ে যখন এসেছিসই, তখন করবার তো আর কিছুই নেই। যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু এখন সকলের কাছে এ কথা বলে বেড়াচ্ছিস কেন? জাত খোয়ানোর কথা কি মানুষকে জানাতে হয় কখনো?...সোনা ভাই আমার, কাউকে ওই প্রসাদ খাওয়ার কথাটা বলিস না, কেউ জিজ্ঞেস করলে সোজা অস্বীকার করবি।'

আমার প্রতি ঠাকুরমার এ রকম উপদেশের পেছনের যুক্তিটাও গ্রাম সমাজ থেকেই নেয়া। একটি প্রবাদ আছে—'খাইলে জাত যায় না, কইলে জাত যায়'। অর্থাৎ জল অনাচরণীয় জাতের কোনো মানুষের হাতের ছোঁয়া খাবার কেউ খেয়ে ফেললেই যে তার জাত চলে যাবে, তা নয়। সেই খাদক নিজে যদি তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দেয়, তাহলেই তার জাত যাবে; গোপন করে রাখতে পারে যদি, তবে তার জাত খোয়া যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। হিন্দুর জাত বিচারের মধ্যে এমন একটা 'ভাবের ঘরে চুরি'র ব্যাপার সব সময়ই ছিল।

সেই ভাবের ঘরে চুরি করতে দ্বিধা করলেন না অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলনের অনেক নেতাও। হিন্দু মহাসভা মার্কা হিন্দু ঐক্যের বক্তৃতা তারা দিয়েছেন, সর্বজনীন পূজা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনে উৎসাহও দেখিয়েছেন, কিন্তু পূজা শেষে প্রসাদ গ্রহণের সময় অনেকেই সটকে পড়েছেন। কেউ বৈষয়িক কাজের অজুহাত দেখিয়েছেন, কেউ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কথা বলে লেপের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন। কোনো কোনো জায়গায় সর্বজনীন পূজায় পুরোহিত সংকটও দেখা দিয়েছে। মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে কোনো গরিব ব্রাহ্মণ হয়তো পৌরোহিত্য করতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু নমশূদ্রের তোলা ফুল দিয়ে পূজা করতে অস্বীকার করেছেন। কোনো পুরোহিত শর্ত দিয়েছেন যে, যতোক্ষণ তিনি পূজা করবেন ততোক্ষণ কোনো অসৎ শূদ্র মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না, পূজা শেষ করে তিনি চলে গেলে ওরা মন্দিরে ঢুকুক তাতে তিনি আপত্তি করবেন না।

তবু এ সবের পরও, হিন্দু মহাসভার এই উদ্যোগ গ্রামের হিন্দুদের জাতপাত সম্পর্কীয় চিন্তায় যে একটা র‍্যাডিকেল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, সে কথা অস্বীকার করা যাবে না। এ কারণেই এ সময়কার হিন্দু মহাসভার ভূমিকাকে প্রগতিশীল বলে মনে হয়েছে আমার।

কিন্তু এ প্রগতিশীলতা তো হিন্দুত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে যায়নি, যেতে পারে না। হিন্দু মহাসভার পক্ষে সে গণ্ডি অতিক্রম করা অসম্ভবই ছিল। মুসলমানদের যে হিন্দুরা অস্পৃশ্য করে

রেখেছে যুগ যুগ ধরে, সে অস্পৃশ্যতা বর্জনের কার্যকর উদ্যোগ কেউই গ্রহণ করলো না। সর্বজনীন পূজায় হিন্দু মহাসভা যে ঐক্যের প্রদর্শনী করলো তা বরং মুসলমানদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জই তুলে ধরলো। সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

মুসলমানদের অস্পৃশ্য করে রেখে যে হিন্দু মুসলমানের জাতীয় ঐক্য বা এক জাতিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এই সহজ কথাটি কোনো রাজনৈতিক নেতাই তেমন করে বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি। কিংবা বুঝলেও বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেননি।

এর সঠিক গুরুত্ব যিনি বুঝেছিলেন তিনি রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি কবি। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। মুসলিম স্বাতন্ত্র্য উগ্র হয়ে ওঠার অনেক আগেই, ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন—

'হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।...আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের ওপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।'

জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছারিতে মুসলমান প্রজার প্রতি যে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হতো, কবি রবীন্দ্রনাথ তা সহ্য করতে পারেননি। এ রকম একটি ঘটনার বিদ্যুতে তিনি দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সিন্ধু দর্শনে করতে পেরেছিলেন। তাই, একাধিক লেখায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে সেই ঘটনাটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের এক যুগ আগেই তিনি লিখেছিলেন—

"আমি যখন আমার জমিদারী সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তার বৈঠকখানার এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম এ কেন তখন জবাব পেলেম—যে সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা। এক তক্তপোশে বসাতেও হবে, অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের একদিন ডেকে বলেছি, আমরা ভাই, তোমাকে আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপরপক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, 'আমরা পৃথক।' আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জাজিম তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোট নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।"

পাকিস্তানের জন্মব্যাখ্যার তিন তত্ত্ব

কংগ্রেস কিংবা হিন্দু মহাসভা কেউই পাকিস্তানের জন্মকে ঠেকাতে পারলো না। সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগস্ট এই অদ্ভুত রাষ্ট্রটি ভূমিষ্ঠ হলো।

অদ্ভুত হোক আর বদ্‌ভূত হোক, জন্ম যে হলো পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের—এইটিই হচ্ছে বাস্তব। বাস্তবকে অস্বীকার করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর বাস্তবে যা ঘটে, বাস্তবের মধ্যেই তার কার্য-কারণ সম্পর্কটি বিদ্যমান থাকে। সমাজ-বাস্তবের অভ্যন্তরেই পাকিস্তানের জন্মেরও কার্যকারণটি নিহিত ছিল নিশ্চয়। সাতচল্লিশের আগস্টের অনেক আগেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েই গিয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। অন্তত ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকেই এ ব্যাপারে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকেনি।

পাকিস্তানের জন্ম কেন সম্ভব হলো, তা নিয়ে রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মধ্যে যেসব মতবাদ চালু আছে তার মধ্যে, বলতে পারি, তিনটিই প্রধান। অন্য কোনো মত থাকলেও, আমার মনে হয়, সেগুলো এ-তিনেরই কোনো-না-কোনোটির রকমফের মাত্র।

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে আমার যে-বয়স, সে-বয়সে এসব মতবাদ আমার পক্ষে স্পষ্টভাবে বোঝার কথা নয়, বুঝিওনি। কিন্তু সে-সময়েই আমাদের রামপুর পোস্ট অফিসে সংবাদপত্র সামনে নিয়ে বড়োরা যে-সব তর্ক-বিতর্ক করতেন, একটু দূরে বসে থেকে সে-সবই আমি অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। পঁয়তাল্লিশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির কিছু আগে ও পরে আমাদের গাঁয়ে নগেন্দ্র দত্তর বৈঠকখানায় কিংবা জগদীশ কবিরাজের কুলনন্দ আয়ুর্বেদ ভবনে সংবাদপত্র পাঠের আসরে আমি সক্রিয় বা অক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। এখন, ছেচল্লিশের শেষ ও সাতচল্লিশের গোড়ায়, আমাদের পোস্ট অফিসের আসরটিতেও যোগদানের সুযোগ পেয়ে গেলাম। এ আসরটি ছিল অনেক বড়ো ও সমৃদ্ধ। আশপাশের গ্রাম থেকে গ্রামীণ এলিটরা এসে এখানে জড়ো হতেন। বেখেরহাটি হাই স্কুলের শিক্ষকরা আসতেন, দলপা গ্রাম থেকে আসতেন যুদ্ধ ফেরত আজিজুর রহমান ফকির। আমাদের রামপুর প্রাইমারি স্কুলের হেড্‌মাস্টার ও দলপা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সোনাফর উদ্দিন ছিলেন এ-আসরের মধ্যমণি। আর সংবাদপত্রের মূল পাঠক ছিলেন রামপুরের কামিনী কুমার চক্রবর্তী। তাঁকে ঘিরেই পোস্ট অফিসের পাশের কামরাটিতে সকলে গোল হয়ে বসে যেতেন। একেকটা সংবাদ পাঠের পরই শ্রোতাদের নানা জনে নানা মন্তব্য করতেন বা টিপ্পনি কাটতেন। সে-সব মন্তব্য বা টিপ্পনি কখনো কখনো আসরে অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তাপেরও সঞ্চার করে ফেলতো। সে-উত্তাপ দূর করার জন্য অনেক সময়েই এগিয়ে আসতে হতো গয়ানাথ সরকার মহাশয়কে। সরকার মহাশয়ের বাড়িতেই ছিল রামপুরের ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসটির অবস্থান। তাই, গৃহকর্তা হিসেবে আসরের শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হতো। আর যোগান দিতে হতো পান-তামাকের। সে-আসরে এলাকায় বিদগ্ধ ব্যক্তি-বলে-পরিচিত এবং গাঁয়ের প্রতাপশালী তালুকদার মহেন্দ্র চৌধুরীও কোনো কোনো দিন উপস্থিত হতেন। কখনো কখনো তুখোড় কমিউনিস্ট কর্মী ও ছাত্রনেতা পবিত্র দাশও তাঁর চেলাদের নিয়ে এখানে আসতেন। সোনাফর মাস্টার, মহেন্দ্র চৌধুরী আর পবিত্র দাশ—এই তিন জন তিন ভিন্ন অবস্থান থেকে আসরে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। প্রথম জন মুসলিম লীগের, দ্বিতীয় জন কংগ্রেসের ও তৃতীয় জন কমিউনিস্ট পার্টির মতের প্রতিধ্বনি করতেন। তিন জনের মধ্যে প্রথম জন প্রায় রোজই

উপস্থিত থাকতেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের উপস্থিতি অনিয়মিত হলেও তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় অনেককেই সে-আসরে পাওয়া যেতো। এঁদের সকলের মন্তব্য-বক্তব্য ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম সম্পর্কীয় তিনটি মতবাদই বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতো।

প্রথম মতটি পাকিস্তানের জন্মদাতা মুসলিম লীগ গোষ্ঠীর। তাদের মতে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের মুসলমানরা হচ্ছে একটি জাতি। পাকিস্তানের জনক-বলে-কথিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ব্রিটিশ সাংবাদিক বিভার্লি নিকলসের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই মুসলিম জাতিত্বের কথাটিই খুব জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—পাকিস্তানের অন্তঃসার বা মৌলনীতি ('ভাইটাল প্রিন্সিপল্') নিহিত আছে পাঁচটি ইংরেজি শব্দে গ্রথিত একটি বাক্যের মধ্যে। সে-বাক্যটি হচ্ছে—দি মুসলিমস্ আর অ্যা নেশন। মুসলমানরা কী করে একটি জাতি হলো তা-ও জিন্নাহ সাহেব তাঁর নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন। শুধু ধর্মেই নয়, আচারে-ব্যবহারে চিন্তায়-চেতনায় কৃষ্টিতে-সংস্কৃতিতে ব্যক্তির নামে ও নামকরণের রীতিতে—সকল দিক দিয়েই মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির বিচারে একটি স্বতন্ত্র জাতির জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের। তাই, মুসলমানদেরও একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের এক রাষ্ট্রের কাঠামোয় একত্র বাস করা অসম্ভব। হিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণা করে, তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করে, এমন কি তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। কাজেই চাই পাকিস্তান। পাকিস্তানই উপমহাদেশের মুসলমানদের তাহজিব তমদ্দুনকে রক্ষা করবে, পাকিস্তানেই মুসলমানরা হিন্দুদের আধিপত্য-মুক্ত হয়ে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। জিন্নাহ্ বললেন: লোকে বলে, ইংরেজরা 'ভাগ কর ও শাসন কর' (ডিভাইড এন্ড রুল) নীতির অনুসরণ করে। আমরা ইংরেজদের বলি, তোমরা ভাগ করে দিয়ে চলে যাও (ডিভাইড এন্ড কুইট)। হিন্দুরা দেশ ভাগ করতে দিতে রাজি নয় বলেই মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করলো, দেশ জুড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলো, ইংরেজ ও হিন্দু উভয়েই পাকিস্তানের বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হলো, পরিশেষে পাকিস্তানের জন্ম হলো।

পাকিস্তানের জন্ম সম্পর্কে মুসলিম লীগের এই মতবাদে কংগ্রেস বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসের মতে ভারতবর্ষ এক ও অবিভাজ্য। ভারতবাসীরা সব মিলে এক জাতি। এক ভারতমাতার সন্তান। এই সন্তানদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। ওদের ভাগ করে শাসন করার নীতিই ভারতমাতার দুই সন্তান হিন্দু আর মুসলমানকে পরস্পরের শত্রু বানিয়েছে। ইংরেজ শাসকদের এজেন্ট রূপেই মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি তুলেছে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়েছে, কৃত্রিমভাবে দ্বিজাতিতত্ত্ব নামক একটি ডাহা মিথ্যা মতবাদের বিস্তার ঘটিয়েছে। ইংরেজের কূট কৌশল আর ভেদনীতিই কৃত্রিমভাবে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে।

মার্কসবাদী তথা বামপন্থীদের দৃষ্টি অন্যরকম। পাকিস্তানের জন্মের মূলে তাঁরা দেখেন অর্থনৈতিক কারণ। পবিত্রদা খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সমাজের শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে যেতেন রামপুর পোস্ট অফিসে পত্রিকা-পাঠের আসরে। তিনি আমাদের গ্রাম এলাকার তালুকদার-মহাজন ও কৃষক-খাতকদের দৃষ্টান্তও হাজির করতেন। এদেরই একদল মূলত হিন্দু সম্প্রদায় ও অন্যদল মূলত মুসলমান সম্প্রদায় থেকে এসেছে বলে মুসলিম লিগাররা মূলত হিন্দু সম্প্রদায় ও অন্যদল মূলত মুসলমান সম্প্রদায় থেকে এসেছে। আসলে এ হচ্ছে শ্রেণী এই দু'দলের স্বার্থ-সংঘাতকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে পেরেছে। আসলে এ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামেরই বিকৃত রূপ। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ দুয়ে মিলেই এই বিকৃত রূপের সৃষ্টি

করেছে। এই দু'গোষ্ঠীই শোষক, দু'য়ের হাতেই কৃষক-খাতকের মতো মেহনতি মানুষেরা শোষিত। কংগ্রেস একজাতির কথা বলে আর মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলে নিজের নিজের শোষণকেই পোক্ত করতে চায়, ওই শোষিত মানুষগুলোকে ধোকা দিতে চায়। মুসলিম লীগ ইসলামের নাম করে অতি সহজে মুসলমান কৃষক-খাতককে ধোকা দিতে সক্ষম হয়েছে বলেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে।

পবিত্রদার এ-রকম বক্তব্য তাঁর কিশোর চেলারা ছাড়া আর কাউকেই খুশি করতে পারতো না। কংগ্রেস-সমর্থক ও মুসলিম লীগ-সমর্থক বয়স্ক ব্যক্তিরা এই কলেজ-পড়ুয়া ছোঁড়ার কথায় খুবই বিরক্ত হতেন। তবে প্রবীণ সোনাফর মাস্টার বা মহেন্দ্র চৌধুরী কিংবা এমন কাউকেই পবিত্রদার সঙ্গে সামনা সামনি কথা কাটাকাটি করতে দেখিনি। পবিত্রদাও, নিজের মতে দৃঢ় ও আপোসহীন হয়েও, কখনো প্রবীণদের সঙ্গে অবিনয় ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিতেন না। প্রবীণরাও, তাঁর মতকে না মানলেও, এই তীক্ষ্ণধী ও নিষ্ঠাবান কর্মী যুবককে সমীহ না-করে পারতেন না।

তবে, পবিত্রদার অসাক্ষাতে, প্রবীণ কংগ্রেসী ও মুসলিম লিগারদের সকলেই তাঁর কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতেন। তাঁদের কথায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধিতা, দেশীয় ঐতিহ্য-বিরোধিতা, রাশিয়ার দালালি এবং এ-রকম সব পুরনো অভিযোগেরই কেবল পুনরাবৃত্তি থাকতো—কমিউনিস্টদের যুক্তি খণ্ডন করার মতো কোনো সবল যুক্তি থাকতো না।

পবিত্রদা যে-সব শক্ত শক্ত কথা বলতেন তার অনেক কিছুই বুঝতাম না। তবু অন্যের চেয়ে তাঁর কথাগুলোই আমার বেশি ভালো লাগতো। অথচ, মাত্র কিছুদিন আগেই কংগ্রেসের পক্ষে প্রবল উৎসাহে যে-সব শ্লোগান দিয়েছি, সেগুলোও ভুলতে পারছিলাম না। পবিত্রদার কথার সমর্থন করা মানে কমিউনিস্টদের সমর্থন করা। তা কী করে হয়? আমার বাবা থেকে শুরু করে গুরুজনদের প্রায় সকলেই কংগ্রেসী মতবাদের সমর্থক, তাঁদের কাছ থেকেই তো আমি কংগ্রেসী শ্লোগানগুলো শিখেছি, এখন সেগুলোকে ছেড়ে দিই কী করে?

আবার, মুসলিম লীগের সমর্থনে সোনাফর মাস্টার সাহেব যে-সব কথা বলতেন, সে-গুলোরও কিছু কিছু সত্য বলে মনে হতো। হিন্দুরা মুসলমানদের যেভাবে দূরে সরিয়ে রাখতো তাতে তো এই দু'টি গোষ্ঠীর মানুষকে এক ভাবা খুবই কঠিন ছিল।

অর্থাৎ সোনাফর মাস্টার, মহেন্দ্র চৌধুরী বা পবিত্র দাশ, যখন যাঁর কথা শুনেছি তখন তাঁর কথাই আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কথায় যে-সব যুক্তি হাজির করতেন, সে-সবের কোনোটাকেই অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার ছিল না। শুধু সেই বালক বয়সে কেন, পরিণত বয়সেও যখন পাকিস্তানের জন্ম সম্পর্কে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করতে বসেছি, তখন কাউকেই যেমন পুরোপুরি বাতিল করে দিতে পারিনি, তেমনি কারো প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনও জানাতে পারিনি। অনেক বিশ্বাস ও অনেক সন্দেহের নাগরদোলায় আমি দুলেছি। রাজনীতির বাঘা বাঘা তাত্ত্বিকদের রচনা পাঠ করেও আমার এ-রকম দোলাচল দূর হয়নি।

জীবনের এক পর্যায়ে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হলাম। এ-মতবাদের বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে যখন কমিউনিস্ট শিবিরে ধস নেমেছে, যখন এক কালের অনেক জাঁদরেল কমিউনিস্ট নেতাও এ-মতবাদকে অসত্য বলে পরিত্যাগ করে 'প্রাক্তন কমিউনিস্ট' হয়ে গেছেন, এমন কি কেউ কেউ

কমিউনিজমের ঘোর শত্রু বনে গেছেন, তখনো আমার চিত্তলোকে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আস্থার আসনটি অবিচল রয়ে গেছে। মার্কসীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌সকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে এমন কোনো মতবাদের উদ্ভব এতাবৎকালে হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে বলে আমার বিশ্বাস নেই। ডায়ালেক্‌টিক্‌সকে অস্বীকার করে কোনো বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যকে উদঘাটন করা যায় বলে আমি ধারণা করতে পারি না। পাকিস্তানের জন্মের তাৎপর্য-সন্ধানের জন্যও, তাই, ডায়ালেক্‌টিক্‌সের শরণ নেয়া অপরিহার্য।

কিন্তু আমার আশেপাশে যাঁরা মার্কসবাদী নামে পরিচিত, তাঁরা অনেকেই মুখে ডায়ালেক্‌টিক্‌সের কথা বলেন অবশ্যই, তবু তাঁদের চিন্তার পদ্ধতিতে ডায়ালেক্‌টিক্‌সের প্রয়োগ ঘটে বলে আমার অনেক সময়েই মনে হয় না। দ্বান্দ্বিকতার নাম করে তাঁরা যান্ত্রিকতারই কারবার করেন, সরলীকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটিকেই চূড়ান্ত ও অমোঘ সত্য বলে প্রচার করেন। তাঁরা অর্থনীতিকেই সর্বসাধ্যসার বলে ধরে নন। মার্কসবাদকে তাঁরা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে (ইকনমিক ডিটারমিনিজম) পরিণত করে ফেলেন। অথচ মার্কসবাদ কোনো মতেই অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ নয়, 'অর্থনীতিই সমাজের একমাত্র নিয়ামক শক্তি'—এমন কথা মার্কস এঙ্গেল্‌স্ বা লেনিন কেউই বলেননি। তবু মার্কস-এঙ্গেল্‌সের জীবৎ কালেই মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে অনেকে সমাজ বিশ্লেষণে অর্থনীতি ছাড়া আর সব কিছুর দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে রাখেন। এঁদের সম্পর্কেই এঙ্গেলস লিখেছিলেন—'তরুণরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকটার প্রতি যে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে, তার জন্য আংশিকভাবে মার্কস ও আমিই দায়ী।' অর্থনীতি তথা উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ব্যাপারটিকে বিবেচনায় নিতে অমার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা মোটেই রাজি ছিলেন না বলেই মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ এদিকটার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা ছাড়া এঙ্গেল্‌স্ এ-ও জানিয়েছিলেন যে, অর্থনীতির সঙ্গে 'পারস্পরিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাদানগুলোকে তাদের যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার মতো সময়' তিনি বা মার্কস কেউই পাননি।

তাঁদের উত্তরসূরি মার্কসবাদীরা বোধ হয় সেই সময় করে নেয়ার কোনো গরজই বোধ করেননি। যদি করতেন, তবে পাকিস্তানের জন্ম সম্পর্কেও তাঁরা এ-রকম যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদী তত্ত্ব হাজির করে তৃপ্ত হতে পারতেন না। আবার, এক পর্যায়ে যে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা 'সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের' স্বীকৃতি হিসেবে পাকিস্তানের সমর্থন করে বসেছিলেন, তা-ও তাঁদের বোধের পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দেয়নি।

হ্যাঁ, পবিত্রদা যে শ্রেণীদৃষ্টির কথা বলতেন, যে-কোনো সামাজিক ঘটনার মতো পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের বিশ্লেষণেও অন্যদের সে-দৃষ্টি থাকার কথা নয়, তাই তাদের বিশ্লেষণও অবশ্যই ভ্রান্ত হবে। কিন্তু তাদের বক্তব্যেও যে সত্যের অনেক উপাদান ছিল, সে কথাও ঠিক। আসল কথা হলো: সকলেই ছিল খণ্ডিত, কারুরই সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল না।

সেই সামগ্রিক দৃষ্টিটিই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে। পাকিস্তান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যদিও কিছুই লেখেননি, পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের এক বছর পরই যদিও তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে, তবু রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে আমার নিজের দেখাকে মিলিয়ে আমি নিঃসংশয় হতে পেরেছি: রবীন্দ্রনাথই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আসল রূপটি ধরতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সহায়তা নিলেই মার্কসবাদীরাও পাকিস্তানের জন্মের প্রকৃত তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাকিস্তানের জন্মদাতাই পাকিস্তানের মৃত্যুবীজ রোপণ করলেন

পাকিস্তানের জন্মের মাস চারেক আগে আমি আমার জন্মগ্রাম চন্দপাড়া ছেড়ে মুক্তাগাছার পারুলতলায় মামার বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণটি আমি মামাবাড়িতে থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পারুলতলা আর হাতিল—মামার বাড়িতে ও মাসির বাড়িতে কাটাই। মামার বাড়িতে অবস্থান করেই আমি 'পাকিস্তানের জন্মলগ্নে ভদ্র হিন্দুর মানস সংকটে'র কী রূপ উপলব্ধি করেছিলাম, 'ব্রাত্যজনের' জন্যে পাকিস্তানের কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এবং পল্লী কবি ইউনুস আলীর কবিতা পড়ে আমার কৈশোরিক চৈতন্যে কী রকম সুবাতাস বয়ে গিয়েছিল—সেসব কথা আমি গৌরচন্দ্রিকা সমাপ্ত করার পরপরই বলে নিয়েছি। এরপরই বলেছি, 'বাংলার লোকজীবনে পাকিস্তানের দুষ্ট হাওয়া'র কথা, বর্ণনা দিয়েছি 'গান্ধী হত্যার অভিনব প্রতিক্রিয়া'র। তারপরই স্মৃতির পাখায় ভর দিয়ে চলে গিয়েছি পাকিস্তানের জন্মের আগের দিনগুলোতে। সে-সময়কার কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, মুসলিম লীগ, জাতীয়তাবাদী মুসলমান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দুর জাতপাত ইত্যাদি নানা ঘাট-আঘাটার পাশ দিয়ে চলতে চলতে আবার চলে এলাম পাকিস্তানের শৈশব কালের তটে। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শনের জন্যে বারবারই আমাকে পাকিস্তানের জন্মের আগের দিনগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে হবে। এবং আমার প্রত্যক্ষদর্শন সব কিছুর নাগাল পাবে না বলেই বয়োজ্যেষ্ঠ জনের শরণ নিতে হবে, অন্যের স্মৃতির এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে হবে, বহু বিষয়েই শ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হবে। আর এ কথা তো জানাই আছে যে, শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবলম্বন করেই যে কোনো দর্শন সম্পূর্ণতা পায়।

আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবা আমাকে মামাবাড়ি থেকে নিয়ে এলেন নেত্রকোনায়। ভর্তি করে দিলেন নেত্রকোনা শহরের চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে ক্লাস সিক্স-এ। থাকার জায়গা হলো শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পুখুরিয়া, আমার পিসিমার (বাবার জ্যাঠতুতো বোনের) বাড়িতে। ছেচল্লিশে সেকালের প্রাইমারি স্কুলের শেষ ক্লাসের (ক্লাস ফোর) পরীক্ষা পাস করে এক বছর আমি কোনো স্কুলে পড়িনি। সাতচল্লিশে মামার বাড়িতে ক্লাস ফাইভের পাঠ্য বিষয়গুলো পড়ে নিয়েছিলাম গৃহশিক্ষক যতীন চক্রবর্তীর কাছে।

নেত্রকোনা একটি নিতান্ত মফস্বল শহর হলেও শহর তো বটেই। এই প্রথম আমার শহুরে জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয়। আর গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের সঙ্গে শহরের চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের তো তুলনাই চলে না। প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা নলিনীরঞ্জন সরকার, যিনি ছিলেন নেত্রকোনারই কেন্দুয়া থানার সাজিউড়া গ্রামের মানুষ, তারই পিতা চন্দ্রনাথ সরকারের নামাঙ্কিত ছিল এই হাইস্কুল। এই ইস্কুলটির সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। এখানকার শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের প্রতি বক্র দৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ সরকারের এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারেরও এর ওপর সুনজর থাকার কথা নয়। নেত্রকোনা শহরে তখন চারটি হাইস্কুল, একটি মেয়েদের ও তিনটি ছেলেদের। আঞ্জুমান হাইস্কুলটি হলো মূলত মুসলমান ছাত্রদের স্কুল, ছাত্রদের শতকরা আটানব্বই জনই মুসলমান। দত্ত হাইস্কুল (যেটি উনিশ শতকের প্রখ্যাত সিভিলিয়ান ও লেখক রমেশ চন্দ্র দত্তের নামে প্রতিষ্ঠিত) ও চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে তো, সেই আটচল্লিশ সালেও, শতকরা পাঁচজনও মুসলমান ছাত্র ছিল কিনা সন্দেহ। শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র আরবীর মৌলবী সাহেব ছাড়া আর সবাই হিন্দু। এ থেকে বোঝা যায় : রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের জন্মের আগেই এ দেশের সমাজে, অন্তত

মধ্যবিত্ত সমাজে, হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের ভ্রূণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকে যে মধ্যবিত্ত সমাজটি আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল সেটি ছিল মূলত হিন্দু সমাজ। স্কুল কলেজ সভা সমিতি—এরকম যা কিছু তখন গড়ে উঠেছিল তারও সবই ছিল, তাই, হিন্দু। সে শতকের শেষ দিক থেকেই যখন একটু একটু করে মুসলমান মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটতে লাগলো এবং সে মধ্যবিত্তরা যখন আধুনিক শিক্ষার এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করলো, তখন সে আধুনিকতার ভেতর তারা প্রবলভাবে হিন্দু ও হিন্দুত্বেরই উপস্থিতি দেখতে পেলো। এই হিন্দু ও হিন্দুত্বের ধাক্কায় তারা তাদের আধুনিকতাকেও মুসলমান বানিয়ে নিলো, মুসলমানত্বের দুর্গ তৈরি করে তাতেই স্বচ্ছন্দ আশ্রয় খুঁজলো। অর্থাৎ ইংরেজ আমলে এ দেশে যে 'আধুনিকতা'টি এসেছিল, এখানকার জল-হাওয়ার ছোঁয়া লেগে সেটি আর খাঁটি আধুনিক হয়ে থাকতে পারলো না, হয়ে গেলো—'হিন্দু আধুনিকতা' ও 'মুসলিম আধুনিকতা'। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত মুসলমানের মনেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের বোধটি দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। সেই বোধেরই এক ধরনের প্রকাশ দেখা গেলো মুসলমানদের আঞ্জুমানগুলোর মধ্যে। পাকিস্তান সম্পর্কীয় রাষ্ট্রিক ধারণাটি জন্ম নেয়ার অনেক আগেই একেকটি আঞ্জুমান হয়ে উঠলো একেকটি সামাজিক পাকিস্তান। নেত্রকোনার আঞ্জুমান হাইস্কুলটিও এরকম একটি 'পাকিস্তান' রূপেই দত্ত হাই ও চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের 'হিন্দুস্থান' থেকে মুসলমান শিক্ষার্থীদের আলাদা করে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ শতকের মধ্যপর্বে।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রিকভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও, আটচল্লিশ সালেও, চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের সামাজিক 'হিন্দুস্থান'টি প্রায় অটুটই রয়ে গেলো। চন্দ্রনাথে প্রতি বছর ঘটা করে সরস্বতী পূজা উদযাপিত হতো। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হতো 'শিক্ষা সপ্তাহ'। সেই শিক্ষা সপ্তাহ এখনকার সরকারি উদ্যোগে পালিত শিক্ষা সপ্তাহের মতো যান্ত্রিক ব্যাপার ছিল না মোটেই। চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের শিক্ষা সপ্তাহটিতে একদিকে ছিল আনন্দময় শিক্ষার প্রাচুর্য, অন্যদিকে ছিল প্রাণাবেগের চাঞ্চল্য। আবৃত্তি, গান, গল্পবলা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা—এ সব বিষয়ের প্রতিযোগিতায় সপ্তাহের প্রতিটি দিনই থাকতো জমজমাট। সেই সঙ্গে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সপ্তাহের শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানটির আগে স্কুলের বার্ষিক সভা—এ্যানিভার্সারি মিটিং। এ্যানিভার্সারি মিটিং কথাটাই যে কী করে ইউনিভার্সিটি মিটিং-এ পরিণত হয়ে গিয়েছিল তা আজো আমার কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। বাবাই আমাকে শুদ্ধ শব্দটি ও এর অর্থ বলে দিয়েছিলেন। এই এ্যানিভার্সারি মিটিংয়ে স্কুলের রেক্টার (তখন নেত্রকোনার অনেক হাইস্কুলেরই প্রধান শিক্ষককে বলা হতো 'রেক্টার') সুখরঞ্জন রায় প্রতি বছর যে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করতেন সেগুলো হয়ে উঠতো শিক্ষা ও সমাজনীতির ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ। এই সুখরঞ্জন রায় যে ছিলেন অনেক বড়ো মাপের মানুষ, সে কথা তখন জানতে পারিনি। পরে জেনেছি: সুখরঞ্জন রায় এক সময় ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। তিনি কবি ছিলেন, তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথেরও প্রশংসা লাভ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের তিনিই ছিলেন প্রথম মূল্যায়নকারী বা সমালোচক। তাঁর সমালোচনা-প্রবন্ধগুলো বিশের দশকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সত্তরের দশকে সেগুলো সংগ্রহ করে তাঁর পুত্র কলকাতা থেকে 'রবীন্দ্র কথাকাব্যের মূল সূত্র' নামে একটি বই প্রকাশ করার পরই কেবল সাহিত্যিক ও সমালোচক মহল সুখরঞ্জন রায়ের অসাধারণ অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন।

এহেন সুখরঞ্জন রায় যে কেন কলকাতা বা শান্তিনিকেতনের বুধমণ্ডলীর সংস্পর্শ ছেড়ে নেত্রকোনার মতো মফস্বল শহরে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নিলেন ও স্কুল মাস্টারি করে কাটিয়ে দিলেন শেষ জীবনের প্রায় সবক'টি বছর, কেন তিনি স্কুলের চৌহদ্দির বাইরের আর সব সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, কী এক প্রচণ্ড অভিমান বুকে পুষে রেখেছিলেন আমৃত্যু—সে-সব রহস্য কেউই উদঘাটন করতে পারেনি।

আমার সৌভাগ্য, আমি এই অসাধারণ গুণী মানুষটির কাছে সাহিত্যের পাঠ নিতে পেরেছিলাম। আমাদের ক্লাস সিক্স-এ তিনি ইংরেজি গল্প পড়াতেন। এখনকার হেড মাস্টার বা প্রিন্সিপালরা মোটেই শিক্ষক নন, প্রশাসক মাত্র। সে সময় কিন্তু তাঁরা প্রথমে ছিলেন শিক্ষক, পরে প্রশাসক। সুখরঞ্জন রায় ক্লাস ফোর থেকে টেন পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসেই পড়াতেন। স্কুলের সব ছাত্রই তাঁকে তাদের শিক্ষক হিসেবে পেতো।

চমৎকার নাটিকা রচনা করে তিনি ইস্কুলের ছাত্রদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে সেই নাটিকাগুলোরই ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ।

খুবই সুন্দর একটি অ্যাকাডেমিক পরিবেশ ছিল চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে। কিন্তু আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাসে এই স্কুলে ভর্তি হয়ে সুন্দরের ওপর দিয়ে কুৎসিতের দুষ্ট হাওয়া বয়ে যেতে দেখলাম। সেই হাওয়াটি পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িকতার। না, নগণ্য সংখ্যক মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পাকিস্তানী বা সাম্প্রদায়িক হাওয়া ছড়াতে পারেনি। হিন্দু ছাত্ররাই মুসলমানের অনুপস্থিতিতে প্রাণ খুলে সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলে যেতো। এ-সব কথাবার্তা অবিশ্যি তাদের বাড়িতে শোনা অভিভাবকদের কথাবার্তারই প্রতিধ্বনি। এবং সেই সঙ্গে যন্ত্রণারও অভিব্যক্তি। পাকিস্তান যে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কিশোরদের মনেও কী রকম নিরাপত্তাহীনতার যন্ত্রণা সঞ্চার করে দিয়েছিল তারই প্রকাশ ঘটতো তাদের ক্ষুব্ধ আলাপনে। মুসলমানের পাকিস্তানে কোনো মতেই থাকা যাবে না, আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে হিন্দুস্থানে, অমুকরা অমুক দিন হিন্দুস্থানে রওয়ানা হয়ে যাবে, অমুকের বাবা হিন্দুস্থানে বাড়ি কিনতে গিয়েছেন—এ রকম কথারই বলাবলি চলতো সারাক্ষণ। সেই সঙ্গে পাকিস্তান ও মুসলমান সম্পর্কে নানা খিস্তি খেউড় আর জিন্নাহর নাম নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও। তবে পাকিস্তান বা জিন্নাহ সম্পর্কে কোনোরূপ কটু মন্তব্য যে প্রকাশ্যে করা যায় না, এ জ্ঞান যে কোনো বালক কিশোরেরও ছিল। পাকিস্তান হলো মুসলমানের রাষ্ট্র আর জিন্নাহ সেই পাকিস্তানের পিতা। পাকিস্তানি কোনো মুসলমান বালকও যে পিতৃনিন্দা সহ্য করবে না, এতো জানা কথাই। পাকিস্তান, মুসলমান ও জিন্নাহ তখন প্রায় একার্থবোধক। তাই হিন্দু বালকরা এদের নিয়ে কথা বলতো খুবই সন্তর্পণে, কোনো মুসলমান বালক বা বয়স্ক মানুষের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তারা কথা বন্ধ করে দিতো বা কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেলতো।

কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন অন্যরকম অভাবিতপূর্ব হাওয়া বয়ে গেলো।

বাঘা শিক্ষক উমেশ বাবু ইংরেজির ক্লাস নিচ্ছেন। হঠাৎ ক্লাস নাইন টেনের একদল ছাত্র 'মে উই কাম ইন স্যার' বলে স্যারের 'ইয়েস' বলার অপেক্ষা না করেই হুড়মুড় করে ক্লাসে ঢুকে পড়লো। ক্লাস নাইনের একজন নেতাগোছের ছাত্র বক্তৃতার ঢঙে বলতে লাগলো, "ভাইসব, ঢাকার রাস্তায় পুলিশ ছাত্রমিছিলে হামলা করেছে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে, বহু ছাত্র জখম হয়েছে। ছাত্রদের কোনোই অপরাধ ছিল না। তারা শুধু বলেছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। আমরা বাঙালি, বাংলাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে। কিন্তু পশ্চিমারা তা মানে না, তারা আমাদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়। আমরা এ-অন্যায় কিছুতেই সহ্য করবো না।... তোমরা

সকলে বেরিয়ে এসো, আমরা পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল করবো। বলো— 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'পুলিশের জুলুম বন্ধ করো'..."

গগনবিদারী স্লোগান দিতে দিতে স্যারকে ক্লাসে রেখেই আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আঞ্জুমান ও দত্ত হাইস্কুলের ছাত্ররাও বেরিয়ে এসেছে। বিশাল ছাত্র মিছিল নেত্রকোনা শহরের রাস্তা কাঁপিয়ে তুললো। থানার সামনে এসে 'পুলিশের জুলুম বন্ধ করো' স্লোগানটিতে যেন আরো বেশি জোর লাগলো। পুলিশরা ভাবলেশহীন চোখে থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মিছিল শেষে সভা। তখন নেত্রকোনায় কলেজ ছিল না। ইস্কুলের ক্লাস নাইন টেনের ছাত্ররাই নেতা। আঞ্জুমান, দত্ত হাই ও চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের সব নেতাই বক্তৃতা দিলেন। সকলের বক্তৃতাতেই আগুন ঝরলো। কিছু খবরও বেরিয়ে এলো তাদের বক্তৃতা থেকে। জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় এসে বলেছেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ছাত্ররা তার মুখের ওপর প্রতিবাদ করেছে।...জিন্নাহকে আমরা 'কায়েদে আজম' বলি, 'জাতির পিতা' বলি। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা কোনো মতেই জাতির পিতার উপযুক্ত নয়। বাঙালি জাতির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তিনি জাতির পিতা থাকতে পারেন না, কায়েদ আজম থাকতে পারেন না।...জিন্নাহই হোন আর যেই হোন, বাংলা ভাষার কোনো বিরুদ্ধচারীকে বাঙালি ক্ষমা করবে না। বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াবে। বাংলা অবশ্যই রাষ্ট্র ভাষা হবে। আবার যদি ছাত্রমিছিলে হামলা চলে তবে সারা দেশে আগুন জ্বলবে।

জিন্নাহর বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্যে কেউ মৃদুকণ্ঠে ও মোলায়েম ভাষাতেও কোনো কথা বলতে পারে, এটা তো এক ঘন্টা আগেও আমি ভাবতে পারিনি। জিন্নাহর বিরুদ্ধে কথা বলা আর পাকিস্তানের বিরোধিতা করা তো একই কথা! জিন্নাহর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তো এতোদিন চুপি চুপি কথা বলেছে হিন্দু ছাত্ররা, তাদের অভিভাবকরা। আর আজ মুসলমান ছাত্ররাও প্রকাশ্যে জিন্নাহর সমালোচনা করছে। তাদের অভিভাবকরাও সে সমালোচনায় গলা মেলাচ্ছেন। সভায় মিছিলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'য়ের সঙ্গে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানও দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু 'আমরা পাকিস্তানি' এ কথার চেয়ে বেশি করে বলা হচ্ছে 'আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা'। সেদিনের সেই মিছিল আর সভা আমার মনে কী এক ভালো লাগার অনুভূতি যে সঞ্চার করে দিয়েছিল সেটি আমি কাউকে বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না। এক বছর আগে গাবতলি বাজারে পল্লী কবি ইউনুস আলীর কবিতা শুনে যে অনুভূতি জেগেছিল, এক বছর পরে সেই অনুভূতিটাই যেন আবার নতুন করে ফিরে পেলাম। না, এ দেশটি শুধু মুসলমানের নয়, এদেশটি আমারও, আমি বাঙালি, বাংলা আমার মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আহ্, কী যে আনন্দ!

আটচল্লিশে আমি নিতান্তই অল্পবয়সী এক কিশোর ছাত্র। তবু যে সে-সময়ে মিছিলে ও সভায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে গলা মেলাতে পেরেছিলাম তার জন্যে আজও আমি প্রবল গর্ব অনুভব করি। এখন মনে হয় : যে জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের জন্মদাতা, সেই জন্মদাতাই আটচল্লিশের মার্চে 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে এ রাষ্ট্রটির মৃত্যুবীজও আপন হাতে রোপণ করে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের ঢাকায় এসে।

পাকিস্তানের জনকের মৃত্যু ও তারপর

ঢাকায় এসে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের উপলক্ষে পাকিস্তানের মৃত্যুবীজ রোপণ করে করাচিতে ফিরে গিয়ে ছ'মাসের মাথাতেই মৃত্যুবরণ করলেন পাকিস্তানের জাতির পিতা।

খবরটা নেত্রকোনায় এসে পৌঁছেছিল সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর পরদিন, অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। আমরা দলবেঁধে স্কুলে যাচ্ছিলাম। আমি একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। আমার পনেরো/বিশ হাত দূরে ছিল বিমান, প্রাণেশ ও দেবব্রত। একজন দাড়িওয়ালা লোককে ওদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো প্রাণেশ, "শুনেছিস, জিন্নাহ্ মরে গেছে!" আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের সামিল হলাম। ওরা এক সঙ্গে কল্‌কল্ করে উঠলো 'জিন্নাহ্ মরেছে! জিন্নাহ্ মরেছে!' দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি মৃদুস্বরে অথচ তিরস্কারের ভঙ্গিতে এ-রকম উল্লাস প্রকাশ করতে কিশোর ছাত্রদের বারণ করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে সংযত হয়ে গেলাম। বিষয়টির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য উপলব্ধি করতে আমাদের একটুও দেরি হলো না। সারা রাস্তায় আমরা আর একটিও কথা বলিনি।

স্কুলে গিয়েও দেখলাম সবাই গম্ভীর। ছাত্র ও শিক্ষকদের কেউই কোনো কথা বলছেন না। একটু পরেই স্কুলের বারান্দায় খুবই সংক্ষিপ্ত একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হলো। রেক্টার সুধরঞ্জন রায় ছোট্ট একটি বক্তৃতায় সদ্য প্রয়াত জিন্নাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তাঁর বক্তৃতার একটি শব্দ ব্যবহার আমার কাছে খুব চমৎকার লাগলো। 'কর্ণধার'। শব্দটির অর্থ জানতাম—'নৌকার মাঝি'। কিন্তু জিন্নাহকে যখন স্যার 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধার' বলে উল্লেখ করলেন, তখন সেই বয়সে আমার কাছে এটি একান্তই অভিনব বলে মনে হয়েছিল। 'পাকিস্তান' হচ্ছে একটি নৌকা, আর জিন্নাহ ছিলেন তার মাঝি, এখন সেই মাঝিটি মারা গেলেন, নৌকাটি মাঝ গাঙে—এ-রকম একটি দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠেছিল।

কর্ণধারের মৃত্যুতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তরণীর যাত্রীদের মধ্যে প্রবল শোকাবেগ দেখা দিয়েছিল। শোকাবেগের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আবেগও নতুন করে জেগে উঠেছিল। কিংবা বলা যায়, সুপরিকল্পিতভাবে তা জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। বলা হচ্ছিল: জিন্নাহর মৃত্যুতে শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তান অসহায় হয়ে গেছে মনে করে হিন্দুস্থান এ-রাষ্ট্রটির ক্ষতি করার জন্যে এই মুহূর্তেই উঠে পড়ে লেগে যাবে। আর হিন্দুস্থানের বর্ণচোরা এজেন্ট যে বিধর্মীরা, তারা তো পাকিস্তানের শহর-গ্রামের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। এদের সম্পর্কে সকল মুসলমানকেই সজাগ থাকতে হবে, নিজেদের ভেতরকার কলহ-বিবাদ দূর করে ফেলতে হবে। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা পাকিস্তান পেয়েছি, আল্লাহ্‌র রহমতেই সেই পাকিস্তান টিকেও থাকবে। আমাদের জাতির পিতা কায়েদে আজম তো বলেই গিয়েছেন 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যে এসেছে'। কায়েদে আজমের কথা মিথ্যা হতে পারে না। তার ওয়ারিস আমরা রক্ষা করবোই।

আনুষ্ঠানিক স্মরণ সভায় কিংবা চায়ের দোকানের আড্ডায় সর্বত্রই এ-ধরনের কথা শোনা যেতো।

হিন্দুরা এ-সময়ে কথাবার্তায় আগের চেয়ে আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠলো। কারণ, জিন্নাহর পাকিস্তানে দেশপ্রেমের মনোপলি দাবি করতো যারা তারা সময়ে-অসময়ে প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে হিন্দুদের দেশপ্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ করে বসতো। সাধারণ হিন্দুরা এর কোনো প্রতিবাদ করতো না। তারা বরং কচ্ছপের মতোই নিজের ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে নিলো।

যদিও দেশপ্রেমের অনির্বাণ অগ্নিশিখা বুকের গভীরে তারা জ্বালিয়ে রেখেছিল, তবু সে-অগ্নিশিখাকে সঙ্গে নিয়েই দেশত্যাগের প্রস্তুতি নিতে লাগলো, দেশপ্রেমের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাবার কোনো গরজই বোধ করলো না। এর একটা বড়ো কারণ এই যে, দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে ভালোবাসা কোনো হিন্দু কিংবা যে-কোনো অমুসলমানের পক্ষেই ছিল অসম্ভব। মুসলমানের রাষ্ট্র বলে যা ঘোষিত, মুসলমানের তাহজিব তমদ্দুন রক্ষার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে জন্ম যে-রাষ্ট্রের, সে-রাষ্ট্রকে কোনো অমুসলমান নিজের বলে ভাববে কোন্ যুক্তিতে? অমুসলমান এ-রাষ্ট্রে বাস করতে পারে মুসলমানের করুণার ওপর নির্ভর করে,—নিজের অধিকারের বলে নয়। সংখ্যালঘু অমুসলমানরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু মুসলমানের 'পবিত্র আমানত'—নেতারা তো এমন কথা প্রকাশ্যেই বলতেন। এবং এ-রকম বলে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন ভেবে আত্মপ্রসাদে স্ফীত হতেন। কিন্তু এর দ্বারা তাঁরা যে একটি জনগোষ্ঠীকে মর্মান্তিক অপমান করছেন তা বুঝতেও চেষ্টা করতেন না। পবিত্র আর অপবিত্র যাই হোক না কেন, কারো 'আমানত' হওয়া যে সম্মানের পরিচায়ক নয়,—এ-কথা বোঝার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন নিশ্চয়ই পড়ে না। যে রাষ্ট্রের জন্মের ফলে নিজের জন্মভূমিতে অন্যের আমানত হয়ে যেতে হয় একটি গোটা সম্প্রদায়কে, সেই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো সেই অধিকারহরণকারী রাষ্ট্রটিকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতে থাকবে—এ-রকম আশা করাই বাতুলতা মাত্র। হিন্দুরা তো, সে কারণে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এসেছে। প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান তাদের যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে এ-রাষ্ট্রটির প্রতি তাদের বিরূপতা ক্রমাগত বেড়েই গিয়েছে। তাই, পাকিস্তানের হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগকে আমি সত্য বলেই বিশ্বাস করি। তবে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা মোটেই সকর্মক ছিল না। তবু, একান্ত অকর্মক হলেও পাকিস্তানে এদের অবস্থানকে কেউ রাষ্ট্রবিরোধী বলে চিহ্নিত করলেও করতে পারেন। কিন্তু যারা তাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, তারা হয় মতলববাজ, নয় আহাম্মক। যে-কোনো সম্প্রদায়ের যে-কোনো মানুষই দেশপ্রেমিক বা দেশবিদ্রোহী হতে পারে। এ-দেশেও সে-রকমই হয়েছে। অথচ, এ-বিবেচনাকে আড়াল করে একটি গোটা সম্প্রদায়কে যারা দেশপ্রেমহীনতার অপবাদ দেয়, তারা কিছুতেই স্বদেশের কল্যাণকামী হতে পারে না। তারাই তো আসল দেশদ্রোহী। রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর দেশদ্রোহিতা সব সময় সমার্থক নয়। অন্তত পাকিস্তান নামক একটি অমানবিক ও কৃত্রিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদ্রোহী না হয়ে দেশপ্রেমিক হওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না।

দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। এই রাষ্ট্রটি একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হোক—এমনটিই তাঁরা কামনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর ময়মনসিংহের মনোরঞ্জন ধরের নাম বারবারই মনে পড়ে। জিন্নাহ্ সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন দিন আগেই (১১ আগস্ট, ১৯৪৭) ধর্মকে নিতান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে সমান নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তার কথা বলেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বা মনোরঞ্জন ধরের মতো প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যে আস্থা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সেই আস্থা থেকেই তাঁরা চেয়েছিলেন যে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটুক, এখানে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা হোক, মধ্যযুগীয় থিয়োক্রেটিক রাষ্ট্রের বদলে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাটি

সেক্যুলার ও আধুনিক হয়ে উঠুক। কিন্তু তাঁদের সদিচ্ছা ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত হলো। পাকিস্তানের জন্মের পর এ-রাষ্ট্রটির জনক-বলে-কথিত জিন্নাহ সাহেব মাত্র এক বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই এক বছরের মধ্যেই অনেক রকম স্ববিরোধিতার পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তিনি এবং তাঁর সরকার সৎ নাগরিকদের সত্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের কানাকড়িও মূল্য দেননি। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যে দেশকে ভালোবাসার কথা বলাও যেন পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখি, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের মুখের ভাষা বাংলাভাষার মর্যাদা দানের কথা বলায় ধীরেন দত্ত পান 'পাকিস্তানের দুশমন' আখ্যা। পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যদের হয় উর্দুতে নয় ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে হবে—এমন একটি বিধান ছিল। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ধীরেন দত্ত এর সঙ্গে বাংলাকেও সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করে একটি সংশোধনী আনেন। সংশোধনীটির বিরোধিতা করে পরিষদের নেতা লিয়াকত আলী খান বলেছিলেন, "পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। তাই পাকিস্তানের ভাষা মুসলিম রাষ্ট্রের ভাষাই হওয়া উচিত। প্রথমে সংশোধন-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলে আমি মনে করেছিলাম। প্রস্তাবে বাংলাকে পরিষদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয় পাকিস্তানের মানুষদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা, একটা সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।"

বাংলার অধিবাসী খাজা নাজিমুদ্দিন সহ পাকিস্তান গণ-পরিষদের অনেক সদস্যই ধীরেন দত্তের একান্ত সঙ্গত ও দেশপ্রেম মূলক প্রস্তাবটি সম্পর্কে অনেক ইতরতা-দুষ্ট সাম্প্রদায়িক ইঙ্গিত করেন। এরপর জিন্নাহ সাহেবও ঢাকায় এসে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার দাবিদারদের সম্পর্কে এ-রকম ইঙ্গিতই করেছিলেন। তাঁর ভাষায় (তৎকালীন '*আজাদ*' পত্রিকার বয়ান অনুসারে) "অতীতে যাহারা মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে, তাহারাই আজ হঠাৎ আপনাদের 'ন্যায়সঙ্গত' অধিকারের ত্রাণকর্তা হইয়া উঠিয়াছে এবং ভাষার প্রশ্ন লইয়া গবর্নমেন্টকে অমান্য করার জন্যে উস্কানি দিতেছে। অথচ এই পাকিস্তানই হইতেছে আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মূল ভিত্তি।...এসব পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি।"

জিন্নাহর বক্তব্যে সেকালের পূর্ববাংলায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল যদিও, তবু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, সাময়িকভাবে হলেও, সে-অসন্তোষ থিতিয়ে যায়। তাঁর শোকসভাগুলোতে বরং বিপরীত ধরনের আবেগেরই প্রবল প্রকাশ ঘটে।

ময়মনসিংহের বিপিন পার্কে অনুষ্ঠিত এ-রকম একটি শোকসভারই কৌতুককর বিবরণ শুনেছিলাম প্রবীণ আইনজীবী ও বিশিষ্ট বিদ্বান সুরেন ভৌমিকের মুখে। ময়মনসিংহ বারেরই একজন 'হিন্দু উকিল' সে-সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। ওই ভদ্রলোকের যে-কোনো বক্তৃতায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য থাকতো। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেই তিনি বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। বাংলায় বক্তৃতা দিতে গেলেও তিনি অনেক ইংরেজি ইডিয়মের এমন অনুবাদ করতেন যা শ্রোতাদের মধ্যে বেশ হাস্যরসের সঞ্চার ঘটাতো। কিন্তু জিন্নাহর শোকসভায় বক্তৃতা তার জন্যে হাস্যরসের বদলে করুণ পরিণতি নিয়ে এলো। গীতার একটি শ্লোক দিয়ে বক্তৃতা শুরু করে জিন্নাহ সম্পর্কে দুয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য উচ্চারণের পরই তিনি বলতে

লাগলেন, 'জিন্নাহ ছিলেন' একজন... জিন্নাহ ছিলেন একজন...। বোঝা যাচ্ছিল: জুৎসই বাংলা শব্দটি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। শব্দ হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন 'জিন্নাহ ছিলেন একজন দৈত্য'। আর যায় কোথায়! শ্রোতাদের কে একজন চিৎকার করে উঠলো 'কী, জিন্নাহকে দৈত্য বললো? এতো বড়ো অপমান। ব্যাটার সাহস তো কম নয়। ধর ব্যাটা মালাউনকে।'

মরহুম 'জাতির পিতা'র অপমানে বহু শ্রোতাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বক্তাকে ধাওয়া করলো। তখন জেলা জজ না আর কে একজন কোন রকমে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেন, এবং এভাবেই 'জনতার ক্রোধ' থেকে সেদিন তিনি রক্ষা পান।

উনিশ শো পঁয়ষট্টি সালের দিকে সুরেন বাবু ওই ঘটনাটি রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে বলছিলেন, "আসলে ইংরেজি 'জায়েন্ট' শব্দটারই বাংলা করে ওই উকিল বক্তা জিন্নাহকে 'দৈত্য' আখ্যা দিয়ে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। এতে সম্মানের বদলে অপমান করা হয়েছে ভেবেই সে-সভার জিন্নাহ ভক্ত শ্রোতারা উত্তেজিত হয়ে উঠে বক্তাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল।"

আমার মনে পড়লো: ব্রিটিশ সাংবাদিক বিভার্লি নিকলসের 'ভার্ডিক্ট অন ইন্ডিয়া' বইয়ের একটি অধ্যায়েরই শিরোনামই ছিল 'ডায়ালোগ উইথ এ্যা জায়েন্ট'। জিন্নাহকেই সেখানে নিকল্‌স্ সাহেব বিমুগ্ধ চিত্তে 'জায়েন্ট' আখ্যা দিয়েছিলেন। অথচ সেই জায়েন্টকেই বাংলায় 'দৈত্য' বলে ময়মনসিংহের এক 'হিন্দু উকিল'-এর ঘটলো মারাত্মক বিপত্তি।

তবে ওই উকিল বাবুর জন্যে যতো বিপত্তিকরই হোক না কেন, পাকিস্তানের জনকের মৃত্যু-পরবর্তী বছর খানেক, কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি সময়, রাষ্ট্রটি ছিল বিপদমুক্ত। পর্দার অন্তরালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চললেও সাধারণ জনতা ছিল প্রায় প্রশান্ত। 'জাতির পিতা'র বিয়োগজনিত শোকাবেগকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েই পাক শাসকরা গণ-অসন্তোষকে বেশ কিছু দিনের জন্যে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পেরেছিল।

হিন্দুদের দেশত্যাগ ও মানসিক যন্ত্রণা

নেত্রকোনার চন্দ্রনাথ হাইস্কুলটি আমার খুবই ভালো লেগে গিয়েছিলো। এ-স্কুলের 'ডিসিপ্লিন' যেমন কড়া, গানে-গল্পে-অভিনয়ে-খেলাধুলায় এখানকার প্রতিটি দিন ছিল তেমনি মিঠে। খবর নিয়ে জেনেছি: এ-রকম মিঠেকড়া পরিবেশ আশপাশের কোনো স্কুলেই ছিল না। চন্দ্রনাথ স্কুলে কোনো ছাত্র ইচ্ছেমতো ক্লাস কামাই করতে পারতো না। একদিন ক্লাসে না গেলেই এক আনা (এখনকার ছয় পয়সা) জরিমানা। উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত করলে অবিশ্যি জরিমানা থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তবে সে-দরখাস্তের এক পাশে অভিভাবককে 'বিবরণ সত্য' লিখে দস্তখত দিতে হতো। কোনো ছাত্র অভিভাবকের দস্তখত নকল করে ধরা পড়ে গেলে তার জন্য ছিল কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। তবে, সাধারণত কোনো ছাত্রই বিনা কারণে ক্লাস কামাই করতে চাইতো না। অনেক ছাত্র বরং সারা বছরের প্রতিটি ক্লাসে হাজির থাকতে চেষ্টা করতো, কারণ এ-রকম উপস্থিতির জন্য বছর শেষে পাওয়া যেতো লোভনীয় পুরস্কার। চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের মতো এতো বেশি পুরস্কারের ব্যবস্থা বোধ হয় আর কোনো স্কুলেই ছিল না। খেলাধুলা, গান আবৃত্তি, বক্তৃতা, অভিনয়, গল্পবলা ইত্যাদি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য যেমন পুরস্কার মিলতো,

তেমনি পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্যও ছিল অনেকগুলো পুরস্কার। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারী পর্যন্ত সবাই পুরস্কার পেতো। প্রত্যেক বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রের জন্যও ছিল পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ। এর পরও ছিল ক্লাসে ভালো হাজিরা আর শুড কন্ডাক্ট বা সদাচরণের জন্য পুরস্কার। এতো সব পুরস্কার যে-স্কুলে হাতছানি দিয়ে ডাকে, সে-স্কুলে ক্লাস কামাই করবে কোন বোকা ছাত্র?

তাছাড়া স্কুলের ক্লাসগুলো এমনিতেই ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। রুটিনে অঙ্ক, বাংলা, ইংরেজি বা এ-রকম অন্যান্য বিষয়ের মতো খেলাধুলা ও গল্প বলার জন্যও 'পিরিয়ড' (ঘণ্টা) নির্দিষ্ট করা থাকতো। আমাদের ক্লাস সিক্স-এ মঙ্গলবারে পঞ্চম ও বুধবারে ষষ্ঠ—এই দুটো পিরিয়ড ছিল খেলাধুলার। এর শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্র সরকার। দৌড় ঝাঁপের নানা রকম খেলা তিনি শেখাতেন। গল্প বলার ক্লাস হতো বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় পিরিয়ডে। আমাদের 'ক্লাস টিচার' রামশঙ্কর সরকারই ওই গল্পের ক্লাসটি নিতেন। (এখানে বলে নিই, যিনি যে-ক্লাশে প্রথম পিরিয়ডে পড়াতেন, তাঁকেই সে-ক্লাসের 'ক্লাস টিচার' বলা হতো। তিনি রোল কল করতেন, ক্লাসের ছাত্রদের ছুটি মঞ্জুর করতেন, অনুপস্থিতি বা অসদাচরণের জন্য তাদের জরিমানা করতেন বা অন্য কোনো শাস্তি দিতেন। অর্থাৎ প্রতিটি ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বহন করতে হতো সেই ক্লাসের ক্লাস টিচারকে। চন্দ্রনাথ ইস্কুলে 'ক্লাস টিচার'-এর ভূমিকা অন্য অনেক স্কুলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।) রামশঙ্কর বাবু ছিলেন সায়েন্স গ্রাজুয়েট। সায়েন্সের শিক্ষা যে তাঁকে রসকষহীন করে ফেলেনি, তাঁর কাছে পাঠ নিতে গিয়ে আমরা সবাই তা অনুভব করতাম। সাহিত্য ও সঙ্গীতরসেও তাঁর চিত্ত ছিল ভরপুর। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরিবেশনের জন্য ছাত্রদের সঙ্গীতে তালিম দেয়ার দায়িত্ব তাঁর ওপরই পড়তো। আমাদের তিনি পড়াতেন অঙ্ক ও ভূগোল। অঙ্কের প্রতি আমর প্রচণ্ড বিরূপতা সত্ত্বেও কী করে যে আমি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ আকর্ষণ করে ফেলেছিলাম জানি না। সম্ভবত গল্প বলার ক্লাসে আমার 'পারফরমেন্স' তাঁর ভালো লেগে গিয়েছিল। তবে যে-কারণেই হোক, তার স্নেহের ছায়া আজও আমাকে ঘিরে রেখেছে, এবং এই বুড়ো বয়সেও আমি তাঁর সান্নিধ্যে তেরো বছরের সেই কিশোরটি হয়ে যাই।

রাম শঙ্কর বাবু ছাড়া, এই নব্বইয়ের দশকে, চন্দ্রনাথ স্কুলে আমার শিক্ষকদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র হরেন্দ্র পাল মহাশয়ই জীবিত আছেন। তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। ব্যাকরণের মতো নিতান্ত শুষ্ক বিষয়ের ভেতরেও যে বয়ে চলেছে রসের অন্তহীন প্রস্রবণ, তার সন্ধান আমি প্রথম হরেন্দ্র বাবুর কাছেই পাই। বাংলা ভাষার খুঁটিনাটি দিকের প্রতি তিনিই আমাকে মনোযোগী করে তোলেন। তাঁর পাঠদান-রীতিটি ছিল অত্যন্ত চমৎকার।

আর উমেশচন্দ্র ভদ্র মহাশয় তো ইংরেজি পড়ানোর বেলায় একটি অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একটি পাঠের (লেসন) জন্য তিনি দু'দিন সময় নিতেন। প্রথম দিন পাঠটির ভেতরকার সব বিষয় প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতেন। প্রতিটি ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ ও ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দিতেন, সেই সঙ্গে করতেন ব্যাকরণগত আলোচনা। পরের দিন হতো পূর্ব দিনের পাঠের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটি হয়ে উঠতো প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাপূর্ণ। প্রতিযোগিতায় জিতে পুরস্কার পাওয়া যেতো হাতে হাতে। পুরস্কারটি আর কিছু নয়—পেছন থেকে সামনে ও বাঁ থেকে ডানে চলে আসা। ক্লাসের সামনের সারির বেঞ্চটির একেবারে ডান দিকের আসনটিতে বসতো ক্লাসের ফার্স্ট বয়। এর পর ক্রমান্বয়ে সেকেণ্ড থেকে ফিলথ্ বয়।

তারপরের বেঞ্চগুলোতে অন্য সবাই নিজেদের ইচ্ছেমতো। এ-রকমই ছিল উমেশ বাবুর ক্লাসের সমস্ত ছাত্রদের আসন-বিন্যাস। ইংরেজি পাঠের পরীক্ষায় উমেশ বাবু ক্লাসের সমস্ত ছাত্রদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে মারতেন। উত্তরদানে সমর্থ ছাত্ররা হাত তুলতো। ডান দিকের আসনে বসা ছাত্র যদি উত্তর দিতে না পারতো, তবে তাকে বাঁয়ে চলে যেতে হতো, সঠিক উত্তরদাতা বাঁয়ের ছাত্র চলে আসতো ডানে, পেছনের ছাত্র সামনে। প্রতিযোগিতায় হারজিতের উত্তেজনায় উমেশ বাবুর ক্লাসটি টানটান হয়ে থাকতো।

পুখুরিয়া গ্রাম থেকে দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে আমাকে ক্লাস করতে হতো। তাই সামনের দিকের বেঞ্চে বসার সুযোগ আমার হতো না, বসতে হতো পেছনে। একদিন উমেশ বাবু পাঠ দিচ্ছিলেন PAPER (কাগজ) সম্পর্কে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 'বল তো, পিইপিপিইআর-PEPPER অর্থ কী?' ক্লাসের চৌষট্টি জন ছাত্রের সবাই চুপ। কারো হাত উঠলো না। একেবারে শেষ বেঞ্চে ছিলাম আমি সামনের বেঞ্চের কাউকে হাত ওঠাতে না দেখে আমি আস্তে আস্তে ডান হাতটা উঁচু করে তুলে ধরলাম। স্যার আমার পাশে চলে এলেন। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি Pepper-এর অর্থ জান?' আমি বললাম, 'জানি স্যার,—মরিচ।' সঙ্গে সঙ্গে স্যার আমার হাত ধরে সামনে নিয়ে এসে প্রথম বেঞ্চের প্রথম আসনটি থেকে ফার্স্ট বয় সুকুমারকে সরিয়ে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে খুব খুশি হলেন। অনেক উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। আর ফার্স্ট বয় সুকুমারকে বললেন, 'দেখো, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে। শুরু থেকেই হুঁশিয়ার না হলে ফার্স্ট বয়ের আসনটি তোমাকে হারাতে হবে।' সারা ক্লাসের ছাত্রদের নজর পড়ে গেলো আমার ওপর।

আমি গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে ক্লাস ফোরের পরীক্ষা পাস করে, এবং ক্লাস ফাইভে কোনো স্কুলে না পড়েই, শহরের চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে ক্লাস সিক্স-এ ভর্তি হয়েছিলাম। আমার মতো নতুন ছাত্রকে স্কুলের পুরনো ছাত্ররা মোটেই পাত্তা দিতে চাইতো না। আমিও এক ধরনের হীনমন্যতা নিয়ে শহুরে ছাত্রদের থেকে দূরে দূরেই থাকতাম। উমেশ বাবুই সেদিন আমার হীনমন্যতা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে ক্লাসে আর আমাকে পেছনের সারিতে বসতে হয়নি, কিংবা কেউ আমাকে হারিয়ে দিয়ে আসনচ্যুত করতে পারেনি। রোজ রোজ ঠিক ঠিক মতো পড়া শিখে এসে নিজের আসনটি বজায় রাখার জেদ আমার ভেতর চেপে বসেছিল উমেশ বাবুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই।

ভীম নাথ (এই নামটি নিয়ে আমরা খুবই কৌতুক করতাম) পড়াতেন ইতিহাস। দারুণ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তিনি ইতিহাসের গল্প বলে যেতেন। প্রাক্ মুঘল যুগের দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন যে রাজবংশগুলো তাদের নামগুলো মনে রাখার জন্য তিনি আমাদের একটি ইংরেজি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন—Slaves kindly treated serve long. এই বাক্যের পাঁচটি শব্দের প্রত্যেকটি প্রথম অক্ষর মনে করলেই পাঁচটি রাজবংশের পর্যায়ক্রমিক নামগুলো মনে পড়ে যাবে—স্লেভ্স্ (অর্থাৎ দাস রাজবংশ), খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ, লোদি। মুঘল বাদশাহদের নামগুলোর জন্য শিখিয়েছিলেন একটি বাংলা বাক্য—'বাবার হইল আবার জ্বর, সারিল ঔষধে'। প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী নামগুলো—বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, সাজাহান, ঔরঙ্গজীব।

রামশঙ্কর সরকার, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, উমেশচন্দ্র ভদ্র, ভীম নাথ—এ-রকম সব শিক্ষকের চমৎকার পাঠদান পদ্ধতি আমার পাঠ্যপুস্তক-বিরূপতা অনেক পরিমাণে দূর করে দিয়েছিল।

মেধার ঘাটতি সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে মনোযোগী ছাত্র হয়ে উঠছিলাম। চন্দ্রনাথ হাইস্কুলেই ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়বো, মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করে ক্লাসের সেরা ছাত্রটি হয়ে উঠবো, ম্যাট্রিক পরীক্ষাতেও খুব ভালো রেজাল্ট করবো—এ-রকম সংকল্পও আমার ভেতর দানা বেঁধে উঠছিল।

কিন্তু আটচল্লিশের অক্টোবর-নবেম্বর মাসেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে পড়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, পুখুরিয়া গ্রামে যে-পিসিমার বাড়িতে আমি থাকতাম, সেই পিসিমার ছেলেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁরা ভারতের কুচবিহারে গিয়ে জায়গা জমির ব্যবস্থা করে এসেছেন। তাঁরা চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আমি আশ্রয়চ্যুত হয়ে যাবো। আশপাশে আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই। স্কুলের হোস্টেলে যে উঠবো তাও সম্ভব নয়। হোস্টেলের খরচ জোগানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার বাবার নেই।

শুধু চন্দ্রনাথ স্কুলের কথাই-বা বলি কেন, আদৌ কোনো স্কুলে পড়াই আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা তাতেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন যখন দেশত্যাগ করছে, তখন আমরাই-বা দেশে থাকবো কী করে? পাড়া-প্রতিবেশীদের সকলে দেশত্যাগের উদ্যোগ নেবার জন্য বাবাকে প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করছে। দেশান্তরে যাবার ইচ্ছে বাবার একদম নেই, কিন্তু নানা জনের নানা কথায় দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এমন কি আমার মা আর ঠাকুরমাও বাবার এ দুর্বলতা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের মতে ছেলেমেয়ে তিনটিকে (অর্থাৎ আমি এবং আমার ছোট ভাই ও বোনকে) বাঁচাতে হলে, বংশের ধারা রক্ষা করতে হলে, এখনই আমাদের হিন্দুস্থানে চলে যাওয়া উচিত। বিশেষ করে মেয়ে বড়ো হলে এদেশে তার ইজ্জত রক্ষা তো কিছুতেই হবে না। তা যদি হয়ও, তার বিয়ের পাত্র পাওয়া যাবে কোথায়? কোনো ভদ্র হিন্দু তো পাকিস্তানে থাকবেই না। আর ছেলেরাই-বা এখানে থেকে কী করবে? তাদের কি ভবিষ্যৎ আছে কোনো? হিন্দুর ছেলে কি পাকিস্তানে কোনো চাকরি পাবে?

বাবা এ-সব যুক্তি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর বাস্তব বোধ তাঁকে অন্য রকম যুক্তিরও জোগান দিতো। ছেলের চাকরি বা মেয়ের বিয়ের ভাবনা তো পরে, আগে তো ওদের বেঁচে থাকার কথা ভাবতে হবে। হিন্দুস্থানে গিয়ে প্রাণে বাঁচার ব্যবস্থাই কি করা যাবে? যারা নগদ টাকা-পয়সা নিয়ে যেতে পারবে, তারা না হয় বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার জন্য একটা কিছু করে নেবে। কিন্তু আমাদের মতো সঙ্গতিহীন লোকেরা তো সেখানে পেটের ভাত বা মাথা গোঁজার ঠাঁই—কোনোটাই জোগাড় করতে পারবে না। আর কোনো রকম যদি তার ব্যবস্থা হয়েও যায়, তবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর মতো অর্থের সংস্থান কী করে হবে? লেখাপড়া শিখলে পরে তো চাকরি। লেখাপড়া না শেখাতে পারলে ওরা তো মুটে মজুরি করেও পেটের ভাত জোগাতে পারবে না।

মা-ঠাকুরমা তখন যুক্তির বদলে দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তা ওখানে গেলে যা হবার হবে। এতো লোক দেশ ছেড়ে সেখানে যাচ্ছে, তাদের যদি কোনো ব্যবস্থা হয় তো আমাদের কেন হবে না? জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। হিন্দুর দেশে গেলে ভগবান হিন্দুকে কি না খাইয়ে মেরে ফেলবেন? আর ভগবানের যদি ও-রকম ইচ্ছে থেকেই থাকে, তবে আমরা সেটা খণ্ডাবো কী করে? কিন্তু তাই বলে কি পাকিস্তানে জাতিধর্ম খুইয়ে বেঁচে থাকতে হবে?

এ-সব যুক্তি, পাল্টা যুক্তি আর দৈবের দোহাই চলতেই থাকে। আমরা দেশত্যাগ করি না বটে, কিন্তু তা না করে কিংবা করার উদ্যোগ না নিয়ে যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ করিনি,—

এমন কথা আমার বাবাকে সময়ে-অসময়ে শুনিয়ে যেতেন শুভানুধ্যায়ী হিন্দু প্রতিবেশীরা। অনেক হিন্দু যেমন দেশ ছেড়ে চলে যায়, অনেকেই বাধ্য হয়ে হলেও দেশেই থেকে যায়। কেউ কেউ হিন্দুস্থানে চলে গিয়েও আবার দেশে ফিরে আসে। কেউ আসে অর্থবিত্ত হারিয়ে, কেউ আসে বউ ছেলেমেয়ে বা অন্য পরিজন হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে। এ-রকম অনেকেই বাবার কাছে এসে বলে, 'ডাক্তার বাবু, দেশ ছেড়ে না গিয়ে ভালোই করেছেন। কী যে কষ্ট ওদেশে তা বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। রিফিউজি ক্যাম্পে যা খাবার দেয় তাকে খাবার না বলে অখাদ্য বলাই ভালো। এ-রকম অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে লাগলো কলেরা। কতো লোক মারা গেলো।' অনেকেই সেই কলেরায় নিজের প্রিয় পরিজনের মৃত্যুর কথা বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। কেউ পরদেশে গিয়ে সর্বস্বান্ত হবার বিবরণ দিয়ে শপথ করে বলে, 'মরে গেলেও আর দেশ ছেড়ে যাবো না। দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো। কপালে যা লেখা আছে তাই হবে।'

এদের দৃষ্টান্ত থেকে আমার বাবা দেশত্যাগ না-করার পক্ষে নতুন যুক্তি আহরণ করে মনে শক্তি সঞ্চার করার চেষ্টা করেন।

তবে দেশ ছাড়ি আর না-ই ছাড়ি, আমাকে যে চন্দ্রনাথ হাইস্কুল ছাড়তেই হবে—এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। মনটা এতো খারাপ হয়ে গেলো যে, সেই কিশোর বয়সেই জীবনটাকে মনে হলো অর্থহীন। পাকিস্তানের জন্যই আমাকে এমন অর্থহীনতার বোধে আক্রান্ত করলো। আমার মতো এ-রকম অনেককেই।

পঞ্চাশ সালের দাঙ্গা

মাত্র এক বছর পড়েছিলাম নেত্রকোনার চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে। কিন্তু সে-বছরের (অর্থাৎ উনিশ শো আটচল্লিশ সালের) প্রায় প্রত্যেকটি দিন ছিল আমার কাছে 'সোনা ঝরা দিন'। প্রত্যেকটি দিন ছিল রোমাঞ্চের, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের, নতুন নতুন আনন্দের, এবং বেদনারও। বেদনার মধ্যেও জড়িত মিশ্রিত হয়ে থাকতো আনন্দ। নিত্য নতুন আনন্দ আহরণ করতাম চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে আমার মাস্টার মশাইদের চমৎকার পাঠদান থেকে। 'জ্ঞানই শক্তি' এমন কথা বহুকাল ধরেই জ্ঞানীগুণীরা বলে আসছেন। কিন্তু জ্ঞান যে আনন্দ—কেউ না বললেও তা সে-বয়সেই বুঝে ফেলেছিলাম। আমার কাছে সেদিন মাস্টার মশাইদের দেয়া জ্ঞান হয়ে উঠেছিল অফুরান আনন্দের উৎস।

এ ছাড়া আমাকে এ-আনন্দের অন্যতর উৎসের সন্ধান দিয়েছিলেন হরেন্দ্র দা। পুখুরিয়া গ্রামের হরেন্দ্রচন্দ্র দাস। একজন সুদর্শন যুবক। পেশায় কালেক্টরেটের কেরানি। নেশা বই পড়ার। সঙ্গী ছাড়া নেশা জমে না, নেশাখোররা তাই সঙ্গী খুঁজে নেয়। সমবয়সী না পেলে অসমবয়সী সঙ্গী গ্রহণেও নেশাখোরদের বোধ হয় আপত্তি থাকে না। এভাবেই আমিও, তেরো বছর বয়সী এক কিশোর, তিরিশ বছর বয়সী যুবকের বই পড়ার সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গী হওয়া মানে একসঙ্গে বসে বই পড়া নয়। পড়তেন তিনিই। আমি কেবল তাঁর পাশে বসে থাকতাম। যেসব মোটা মোটা বই তিনি পড়তেন, সে-সবই আমার পক্ষে ছিল একান্ত দুষ্পাঠ্য ও দুষ্পাচ্য। যেমন—রজনী পাম দত্তের 'ইন্ডিয়া টুডে'। এই বিরাট আকৃতির বইটির অনেকগুলো অধ্যায় তিনি আমার সামনে বসেই পড়েছিলেন। ইংরেজিতে একেক পৃষ্ঠা পড়েন, আর আমার কাছে তার ব্যাখ্যা দেন। ভারতীয় রাজনীতির মার্কসীয় ভাষ্যের সঙ্গে এভাবেই হরেন্দ্র দা আমাকে পরিচিত করে তুলতে চেষ্টা করেন। সে-সব কঠিন কঠিন কথা হজম করা

আমার পক্ষে শক্ত ছিল অবশ্যই; তবু হরেন্দ্র দার পরিবেশনার গুণে সেগুলো একান্তই উপাদেয় হয়ে উঠতো। হরেন্দ্র দা নিজে যে মার্কসবাদী ছিলেন, তা নয়। ভারতীয় মার্কসবাদীদের অনেক কঠোর সমালোচনাও তাঁর মুখে শুনেছি। পরবর্তী সময়ে হরেন্দ্র দা-কে তো বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী হতেও দেখেছি। তবে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে প্রচণ্ড কৌতূহলই বোধ হয় এক সময় তাঁকে মার্কসবাদ ও মার্কসবাদীদের সম্পর্কেও কৌতূহলী করে তুলেছিল। সেই কৌতূহলটিই তিনি আমার মধ্যে সঞ্চার করে দিতে চেয়েছিলেন যখন আমি মাত্র ক্লাস সিক্সের ছাত্র। রুশ দেশের অনেক কথা তিনি গল্পের মতো করে আমার কাছে বলতেন। তাঁর মুখেই প্রথম মাক্সিম গোর্কির নাম শুনি। একদিন পুখুরিয়া থেকে নেত্রকোনার পথে হাঁটতে হাঁটতে গোর্কির 'মা' উপন্যাসের কাহিনীটি অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে তিনি বলে যাচ্ছিলেন। 'মা' উপন্যাসটির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় অনেক পরে, কিন্তু তেরো বছর বয়সে হরেন্দ্রদার মুখে শোনা 'মা'-এর গল্পটি এখনো আমার মনে গেঁথে আছে।

এখন নেত্রকোনা ছেড়ে চলে গেলে চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের মাস্টার মশাইদের দেয়া শিক্ষা থেকে তো বঞ্চিত হবোই, বঞ্চিত হবো হরেন্দ্রদার প্রীতিকর সান্নিধ্য থেকেও।

এ-রকম বঞ্চনার ব্যথা নিয়ে শেষ পর্যন্ত নেত্রকোনা ছাড়তেই হলো। ভর্তি হলাম বেখৈরহাটি হাইস্কুলে। আমাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল পশ্চিমে। শহরের ঐতিহ্যবাহী ইস্কুল থেকে একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের নতুন স্কুলে। যে স্কুল, বলতে গেলে, ভালোভাবে গড়েই ওঠেনি এখনো। স্কুলের ঘরগুলোর চেহারা তো কুঁড়েঘরের মতোই। লাইব্রেরি বলতে একটা ভাঙা আলমারি। আগে এটি ছিল 'মাইনর স্কুল'—অর্থাৎ ক্লাস সিক্স পর্যন্ত এখানে পড়ানো হতো। এখন রাতারাতি একে হাইস্কুল বানিয়ে ফেলা হলেও হাইস্কুল হওয়ার মতো কোনো উপাদান-উপকরণই এর নেই। স্কুলের জন্য গ্রাজুয়েট শিক্ষক পাওয়া দুরূহ। আজ একজন মাস্টার আসেন তো এক সপ্তাহ বা এক মাস পরই বিদায় নেন। ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষিত হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন ও যাচ্ছেন। মাস্টারির চেয়ে ভালো চাকুরি শিক্ষিত মুসলমানের জন্য তখন দুর্লভ নয়। কাজেই তাঁরা কেন গাঁয়ের ইস্কুলে মাস্টারি করতে আসবেন?

পাকিস্তানের জন্মের পরপরই এখানে-ওখানে নতুন নতুন ইস্কুল-কলেজ খোলার ধুম পড়ে যায়। নতুন রাষ্ট্রে অনেক শিক্ষিত কর্মচারীর প্রয়োজন। হিন্দু কর্মচারীদের প্রায় সবাই 'অপশন' দিয়ে ভারতে চলে গেছেন, তার বদলে ভারত-থেকে-আসা মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। রাষ্ট্রের চাহিদার তুলনায় শিক্ষিত জনশক্তির সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। তাই চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য আনার প্রয়োজন পড়ে যায়, নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তাগিদ দেখা দেয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য যে শিক্ষক, তারই তো একান্ত অভাব। এ-কারণেই সাতচল্লিশ সালের পর অন্তত এক দশক কাল গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর ছিল অত্যন্ত করুণ অবস্থা।

তিন মাইল পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করি বটে, কিন্তু সাত পিরিয়ডের মধ্যে অনেক দিনই তিন পিরিয়ডের বেশি ক্লাস হয় না। 'ডিসিপ্লিন' বলতে প্রায় কিছুই নেই। চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে পড়ার সময় ভালো ছাত্র হওয়ার যে-উৎসাহ আমার ভেতর সঞ্চারিত হয়েছিল, সে-উৎসাহ একেবারেই উবে গেলো। রহমান সাহেবের বিজ্ঞান ও বারি সাহেবের ইংরেজির ক্লাস দুটো ভালোই লাগতো। এই দু'জন কৃতী শিক্ষকই ছিলেন আভার গ্রাজুয়েট। খুবই অল্প দিনের জন্য এসেছিলেন আবদুল হামিদ নামক একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক। তাঁর পাঠদান-রীতিও বেশ আকর্ষণীয়ই ছিল। তবু চন্দ্রনাথ স্কুলের সঙ্গে তুলনা করে বেখৈরহাটি স্কুলটিকে ভালোবাসা খুব

কঠিন হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে। এক বছর আগে পাঠ্য বইয়ের প্রতি যে-অনুরাগটি জন্মাতে শুরু করেছিল, সেটি বেড়ে ওঠার কোনো অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে আস্তে আস্তে মরে গেলো। আবার আমি পাঠ্যবই-বিরূপ হয়ে গেলাম। (সে-বিরূপতা আর ইহজন্মে ঘুচলো না।) অক্ষরজ্ঞান-দানের সঙ্গে সঙ্গে বাপ-ঠাকুর্দা আমাকে যে নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই নেশাটিই বরং এখন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরলো। অর্থাৎ পাঠ্য বইয়ের বদলে 'অপাঠ্য' বই-ই বেশি করে আমার মনোযোগ কেড়ে নিতে লাগলো। 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির'-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, ক্ষিরোদ প্রসাদ প্রমুখ ঔপন্যাসিক কবি-নাট্যকারদের গ্রন্থাবলি থেকে শুরু করে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী ইত্যাদি মাসিক পত্রের পুরনো সংখ্যা—এ-সবই হয়ে উঠলো আমার দিনরাতের সাথী। পরিপার্শ্বের বিরূপতার হাত থেকে এগুলোই আমাকে সেদিন রক্ষা করেছিল। তবে, স্কুলের একটি পাঠ্যবিষয় অবিশ্যি সে-সময় আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সেটি সংস্কৃত ভাষা। বেখৈরহাটি হাইস্কুলের শিক্ষক ধীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্যের চমৎকার পাঠদান-কুশলতাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় আমাকে বিশেষ উৎসাহী করে তোলে। যদিও এরপর খুব ভালোভাবে সংস্কৃতচর্চার সুযোগ আর কোনো দিনই পাইনি, তবু মাত্র একবছর ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে যেটুকু সংস্কৃত পড়েছিলাম সেটুকুই আমার অকিঞ্চিৎকর সারস্বতচর্চাকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে।

যা হোক, এক নিরানন্দ পরিবেশে ঢিমে তেতলা লয়ে উনিশ শো উনপঞ্চাশ সালটা তো কেটে গেলো কোনো রকমে। ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠলাম। এইটে উঠেই, উনিশ শো পঞ্চাশের প্রায় শুরুতেই, আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। হেতু: পঞ্চাশের সেই ভয়াবহ দাঙ্গা।

না, আমার এলাকায় উনিশ শো পঞ্চাশেও দাঙ্গা হয়নি। তবু ছেচল্লিশে যেমন দাঙ্গা না হলেও একটা দাঙ্গা দাঙ্গা ভাব বিরাজ করছিল সারাদেশ জুড়ে; এবারও তেমনটিই দেখা দিল। ছেচল্লিশের চেয়ে বরং এবারের পরিস্থিতি ভিন্নতর ও গুরুতর। ছেচল্লিশে তো কেবল দাঙ্গা হয়েছিল নোয়াখালিতে, আর এবার সারা দেশেরই এখানে-ওখানে। তা ছাড়া ছেচল্লিশে নোয়াখালির দাঙ্গার পর সারা দেশেই সংখ্যালঘুরাও দাঙ্গা মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর এবার? মোকাবেলার কোনো প্রস্তুতি নয়, প্রতিকার বা প্রতিরোধের কোনো চিন্তাও নয়। প্রস্তুতি কেবল এক বিষয়ের। দেশত্যাগের। চিন্তা কেবল দেশত্যাগ-জনিত অনিশ্চয়তার।

বিভিন্ন এলাকা থেকে রক্ত হিম করা সব খবর আসছিল। সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল ভৈরবের দাঙ্গা। মেঘনা নদীর ভৈরব সেতুর ওপর ট্রেন থামিয়ে গুণ্ডারা নাকি যাত্রীদের বলেছিল, 'সব হিন্দুরা দাঁড়াও একদিকে, মুসলমানরা অন্যদিকে।' তারপর একেকটি হিন্দুকে ছুরি মেরে ট্রেন থেকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলছিল। মুসলমানের সারিতে দাঁড়িয়েছিল যারা তারা মুসলমান কিনা তার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিল কলেমা জিজ্ঞেস করে। কলেমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যেও যাদের মুসলমানত্ব সম্পর্কে ওরা সন্দেহমুক্ত হতে পারছিল না, লুঙ্গি খুলে তাদের মুসলমানত্বের 'ফাইনাল' পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এতো সব পরীক্ষার পরও কিন্তু অনেক মুসলমান তাদের মুসলমানত্ব প্রমাণ করতে পারেনি, তাই প্রাণেও বাঁচেনি। আবার অনেক হিন্দুও দিব্যি মুসলমানত্বের ছাড়পত্র পেয়ে সশরীরে বেঁচে গিয়েছে।

এ-সব অমৃতমধুর খবরের সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো সুযোগ ছিল না। তবু সত্য আর অসত্য যা-ই হোক, এগুলোই সেই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের দিনগুলোতে আমাদের জন্য ছিল হাস্যরসের উপাদান।

সে-সময় আমাদের পোস্ট অফিসে 'অর্ধসাপ্তাহিক *আনন্দবাজার*' ও 'দৈনিক *আজাদ*' এই দুটো পত্রিকাই আসতো। দুটো পত্রিকাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নির্যাতনের খবর ছাপা হতো। কিন্তু *আনন্দবাজারে* যা লেখা হতো *আজাদে* থাকতো তার বিপরীত কথা। *আনন্দবাজার* খুললেই চোখে পড়ে পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতনের লোমহর্ষক খবর, আর *আজাদ* পড়লে মনে হবে ভারতের মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আর মোটেই দেরি নেই। *আনন্দবাজার* বলতো: সেক্যুলার ভারতে মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করে, আর মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের হিন্দুদের জীবন দুর্বিষহ। *আজাদ* বলতো: মুসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা পবিত্র আমানত, হিন্দুস্থানে মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন সত্ত্বেও পাকিস্তানের মুসলমানরা এখানকার হিন্দুদের জানমালের হেফাজত করে যাচ্ছে।

রামপুর পোস্ট অফিসে, অর্থাৎ গয়ানাথ সরকারের বাড়িতে, পঞ্চাশ সালেও আগের মতোই পত্রিকা পাঠের আসর বসতো। এ-আসরের পাঠকদের এখন দু'টি দল। আনন্দবাজারপন্থীরা হিন্দু, আজাদপন্থীরা মুসলমান। *আনন্দবাজারে* যা লেখা হয় হিন্দুদের কাছে তার প্রতিটি শব্দই অকাট্য সত্য। মুসলমান পাঠকদের দৃষ্টিতে সব সত্যের একমাত্র ধারক হচ্ছে *আজাদ*। *আনন্দবাজার* আর *আজাদ* দুয়েরই খবরের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতো, দুয়েরই খবর পরিবেশনায় ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাড়াবাড়ি আছে বলে মনে করতো—এমন পাঠকও অবিশ্যি ছিল দু'একজন। তবে জাতে তারা হিন্দু বা মুসলমান যা-ই হোক, সকলের কাছেই তারা ধিকৃত। তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল পাকিস্তানের সব চেয়ে সেরা ও মোক্ষম গালিটি—কম্যুনিস্ট।

'নিজ বাসভূমে পরবাসী' ও বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্য

উনিশ শো পঞ্চাশ সালের দাঙ্গায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলেই এ-উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে যারা বাগ্‌বিস্তার করতো তারা ছিল কতো ভ্রান্ত। না, ভ্রান্ত বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। কেউ কেউ ভ্রান্তিতে আক্রান্ত হলেও দেশবিভাগের মূল হোতারা ভ্রান্ত ছিল না, ছিল মতলববাজ। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মতলব সাধনের জন্যই ধর্মের নামে একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারত রাষ্ট্রের স্থপতিরা অবিশ্যি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থারই প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা পদে পদেই বাধা পেয়েছে। প্রতিবেশী পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী প্রতিনিয়ত যে ধর্মীয় জিগির উচ্চারণ করেছে তাতে ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তিরই সুবিধা হয়েছে। ওরা বলতে পেরেছে: 'ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ' করে মুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান বানিয়েছে, তাই এখন ভারতকেও অবশ্যই হিন্দুরাষ্ট্র হতে হবে। মুসলমানরা ভারতে থাকতে চাইলে তাদের থাকতে হবে ভারতীয় হয়ে। 'ভারতীয়' বলতে ওরা যা বুঝিয়েছে তা আসলে 'হিন্দু' ছাড়া আর কিছুই না। ভারতীয় হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এ-ধরনের প্রচার প্রোপাগাণ্ডায় ভারত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক চরিত্রের পরিবর্তন না হলেও সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছে নিশ্চয়ই। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের হিন্দুদের যন্ত্রণায় তো কেবলই নতুন নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটেছে। ভারতে মুসলিম-নিগ্রহের নানা বাস্তব ও কল্পিত

কাহিনীর অবিরাম প্রচারের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা দেশের মুসলমানদের উত্তেজিত ও হিন্দুদের ভীত করে রাখতে চেয়েছে।

এ-সব থেকে বোঝা যায় : সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অপর সম্প্রদায়ের মানুষদের তো নির্যাতন করেই, তারা আপন সম্প্রদায়েরও কোনো কল্যাণে আসে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো বরং ওদের ভূমিকা স্ব-সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষদের জন্যই সমূহ বিপদ ডেকে নিয়ে আসে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ যখন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিভক্ত হলো তখন ভারতীয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আচরণ পাকিস্তানি হিন্দুদেরই জীবন বিপন্ন করেছে, পাকিস্তানি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভারতীয় মুসলিমদেরই দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভিন দেশের স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য তাদের অশ্রুপাত তো কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছু নয়। যদি তা না হতো তবে ভারত ও পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নিজ নিজ দেশের ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্যাতন করার বদলে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতো। এতে দুদেশেই তাদের আপন আপন সম্প্রদায়ের মানুষরা শান্তিতে থাকতে পারতো, কাউকেই কোনো দেশেই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সইতে হতো না।

কিন্তু বাস্তবে তো তেমনটি হয়নি। কারণ, কোনো দেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই অপর দেশে তাদের স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষের ভালোমন্দের কথা ভাবে না। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা ওরা মুখে বলে বটে, কিন্তু আসলে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিও ওদের কোনো প্রীতি নেই। সাম্প্রদায়িকতার মানে হতে পারে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, আপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি মোটেই নয়। তাই, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের বদলে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ বরং দু'রাষ্ট্রেরই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' বানিয়ে ফেললো চিরকালের জন্য। দু'রাষ্ট্রেই তারা হলো বলির পাঁঠা। দু'রাষ্ট্রেই তারা দেশপ্রেমহীনতা ও বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্যের দায়ে অভিযুক্ত। ভারতে যদি দাঙ্গা লাগে তো সেখানকার শাসকশ্রেণীর লোকেরা এটিকে বলে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া। আর পাকিস্তানে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা সহজে তো এখানকার শাসকরা স্বীকারই করে না, যদি-বা করে তবে ভারতীয় শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণেই তারাও এটিকে ভারতে মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গার 'স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া' বলে আখ্যায়িত করে। অবিশ্যি কে যে কার পদাঙ্ক অনুসরণকারী বলা শক্ত, দুদেশের শাসকরাই বোধ হয় এ ব্যাপারে পরস্পরের গুরু ও শিষ্য—একের ভেতর দুই। আসলে উভয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী নিজেদের নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে নাগরিকদের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে দেয়ার জন্য নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ-অবস্থাটা লক্ষ করেই ভারতের বিশিষ্ট অভিনেতা ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী প্রয়াত উৎপল দত্ত একবার বলেছিলেন : ভারতে মুসলিম নিধন ও পাকিস্তানে হিন্দু নিধন দু'দেশের বুর্জোয়াদের অলিখিত চুক্তির বলেই সংঘটিত হয়। কথাটাকে যে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, তার প্রমাণ আমরা বহুবারই পেয়েছি। যখনই পাকিস্তানের রেডিও কিংবা পত্রপত্রিকায় খবর এসেছে যে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেছে—অর্থাৎ হিন্দুরা মুসলমানদের ধরে ধরে মারছে—তখনই আমাদের—মানে পাকিস্তানি হিন্দুদের—জিভের জল শুকিয়ে গেছে। ভেবে নিয়েছি, এই তো 'স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া' শুরু হয়ে গেলো বলে। হিন্দুস্থানে যারা মুসলমানদের মেরেছে তারা হিন্দু, আমরাও হিন্দু। কাজেই হিন্দুর অপরাধের শাস্তি

আমাদের পেতেই হবে। এবং পেতে হয়েছেও। পঞ্চাশের পর এখানে-ওখানে ছোট খাটো দাঙ্গা তো হয়েছেই, বড়ো ধরনের দাঙ্গা হয়েছে বাষট্টি আর চৌষট্টিতে।

এখানে বলে নেয়া দরকার : বাংলাভাষায় 'দাঙ্গা হাঙ্গামা' বলতে যা বোঝায়, পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর চরিত্র কখনো সেরকম ছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত হয়, সব পক্ষের লোকই কম বেশি আহত ও নিহত হয়, কোনো এক পক্ষই পড়ে পড়ে মার খায় না। পাকিস্তানে এ-রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোনো দিনই হয়নি। এখানে এক সম্প্রদায়ের মানুষ কেবলই মার খেয়েছে, উল্টো মার দেয়ার চিন্তাও করেনি, এমন কি আত্মরক্ষার চেষ্টাও খুব কমই করেছে।

অবিশ্যি এক ধরনের ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে উনিশ শো চৌষট্টি সালের দাঙ্গায়। পূর্ব বাংলার সচেতন মানুষ সে-দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমীর হোসেন চৌধুরীর মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি অকুতোভয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন। সার্থকভাবে সে-দাঙ্গাকে মোকাবেলা করে নবজাগ্রত বাঙালিরা পাক শাসকদের মতলববাজিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন শক্তির উন্মোচন ঘটিয়েছে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ পরে আসবে। আমি আপাতত উনিশ শো পঞ্চাশের কথাই স্মরণ করছি।

পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, হিন্দুস্থানের সাম্প্রদায়িকতাবাদী কিংবা দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের সকল অপকর্মের দায় পাকিস্তানি হিন্দুদের বহন করতে হবে। সব সময় তাদের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত এ-রকম প্রশ্নের খড়্গ: হিন্দুস্থানে হিন্দুরা মুসলমানের মসজিদ ভেঙেছে, তাই পাকিস্তানের হিন্দুদের মন্দির অক্ষত থাকবে কেন? পাকিস্তানে হিন্দুদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে : হিন্দুস্থানে মুসলমান নারী নির্যাতিতা হচ্ছে, মুসলমানদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে, তারা চাকরি পায় না, নিরাপদে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে না। এ-সব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরই পাকিস্তানি হিন্দুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় প্রশ্নবাণ : তা হলে পাকিস্তানের হিন্দু নারীর ওপর কেন নির্যাতন হবে না, হিন্দুদের সম্পত্তি কেন লুণ্ঠিত হবে না, তাদের জীবন কেন নিরাপদ থাকবে, তারা কেন এদেশের চাকরিতে দখল নেবে ও নিরাপদে ব্যবসা বাণিজ্য করবে? প্রশ্নগুলো যাঁরা উত্থাপন করেন তাঁরাই আবার বরাভয়ও প্রদান করেন। না, না, এ-রকম কিছুই এদেশে হবে না, হিন্দুস্থানে মুসলমানদের ওপর যতো অত্যাচারই হোক, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা এখানে নিরাপদই থাকবে, তারা যে 'পবিত্র আমানত'। কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দুদের তো দেশপ্রেমিক হতে হবে, মনে প্রাণে তাদের পাকিস্তানি হতে হবে। অথচ আফসোস, হিন্দুরা পাকিস্তানকে নিজেদের দেশ বলেই মনে করে না, হিন্দুস্থানে বৃষ্টি হলে ওরা এখানে ছাতা ধরে, এখানে ভাত খেয়ে হিন্দুস্থানে গিয়ে কুলকুচা করে, এখানকার টাকা হিন্দুস্থানে পাচার করে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেয়। ওরা যেহেতু এ-রকম দেশপ্রেমবর্জিত, সেহেতু...।

অর্থাৎ ভারতের হিন্দুমহাসভা কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-পন্থীরা ও-দেশের মুসলমানদের সম্পর্কে যে-ভাষা প্রয়োগ করে, এদেশের হিন্দুদের সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসকদল মুসলিম লীগ আর তাদের চেলাচামুণ্ডাদের ভাষাও অবিকল সে-রকমই। উভয় দেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদী মতলববাজরা নিজ নিজ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সব সময়ই দেশপ্রেমহীনতার অপবাদ দেয়। অথচ, একবারও ভাবতে চায় না যে : পাকিস্তানের মুসলমানদের হিন্দু নির্যাতনের জন্য যদি দণ্ড ভোগ করতে হয় ভারতের মুসলমানদের, এবং তারপর তাদের উপদেশ দেয়া হয় মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে যাওয়ার এবং সে-ভারতীয়ত্ব

স্বরূপত হয় হিন্দুত্বের সঙ্গে অভিন্ন—তা হলে কোনো মুসলমানই ভারতীয় হয়ে থাকতে পারে না। ঠিক একই রকম অবস্থায় একজন হিন্দু কী করে হয় দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি?

তবু, ভারতে হিন্দু মহাসভাপন্থীরা যা-ই বলুক, আর যে-রকম উগ্র সাম্প্রদায়িক আচরণই করুক, সে-দেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধান তো ধর্মনিরপেক্ষ। এই ধর্মনিরপেক্ষতা নিতান্ত কাগুজেও যদি হয়ে থাকে তাহলেও সে-দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য তা একটি বড়ো ধরনের রক্ষাকবচ ও মানসিক শক্তির উৎস। ধর্মীয় রাষ্ট্র-বলে-ঘোষিত পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য তো সে-রকম একটি কাগুজে রক্ষাকবচও নেই। দেশকে ভালোবাসার শক্তিটা তারা পাবে কোথায়?

তবু, আমরা তো জানি: ধর্মনিরপেক্ষতার মতো একটি সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ও শক্তির উৎস থাকা সত্ত্বেও ভারতের অনেক মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়ে বাস্তুহারা হতে হয়, পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিতে হয়। এদের মধ্যে উত্তর প্রদেশ আর বিহারের মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য। পাকিস্তানে এসে এদের সবারই পরিচিতি হয় 'বিহারি' নামে। শুধু যে হিন্দুসাম্প্রদায়িকতার নির্যাতনের শিকার হয়েই এই বিহারিদের দেশত্যাগী হতে হয়, তা নয়। পাকিস্তানের অপদর্শনের দ্বারাও তারা প্রতারিত হয়েছে। জিন্নাহ্ সাহেবের মুসলিম লীগ যে-পাকিস্তান কায়েমের জন্য আন্দোলন করেছে, বিহারি মুসলমানদের তাতে কোনো স্বার্থই ছিল না। কারণ, সঙ্গত কারণেই বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশ যে কখনো পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না—সে-কথা তো সবাই জানতো। তারপরও ওই বিহারিদের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর জোশে প্ররোচিত করা হয়েছে, তাদের হাত দিয়ে অনেক সাম্প্রদায়িক অপকর্ম করানো হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতরাষ্ট্রে তাই, স্বাভাবিকভাবেই, এরা অনেকেই বাধ্য হয়েছে স্বদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে পাড়ি জমাতে। পাকিস্তানে, বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব বাংলায়, এসে তারা অন্য ধরনের প্ররোচনা ও প্রতারণার শিকার হয়েছে। এখানকার বাঙালিদের থেকে তারা স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট, তারাই আসল রাজার জাত,—নানাভাবে তাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে এ-রকম নানা বিভ্রম। সে-বিভ্রমে আক্রান্ত হওয়ার ফলেই, ওই বিহারিদের একটি গোষ্ঠীই, পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিয়েছে প্রধান ভূমিকা। এক পর্যায়ে যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িয়ে পূর্ববাংলায় বাঙালি-বিহারি দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছিল, তা-ও ওই পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি। সেই ষড়যন্ত্রই তাদের জন্য করুণতর পরিণতি নিয়ে এলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর। পাকিস্তানি সামরিক চক্র বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো, বিহারিদের দিকে ফিরেও তাকালো না, তাদেরকে নিক্ষিপ্ত করে গেলো মানবেতর জীবনের আঁস্তাকুড়ে। অথচ বিহারিদের অধিকাংশই হলো নিরপরাধ ও সৎ শ্রমজীবী মানুষ, পাকিস্তানি অপদর্শন সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার হয়েই তারা আজ শিকড়হীন ও ভবিষ্যৎহীন।

আমাদের এলাকায় কোনো বিহারি ছিল না। তবু দাঙ্গার খবর পেলেই সবাইকে বিহারি-আতঙ্কে পেয়ে বসতো। কে একজন হয়তো বললো, অমুক বাজারে সে সেদিন দু'জন বিহারিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে এসেছে। অমনি সারা গাঁয়ে রায়টের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যে যেভাবে পারে পলায়নের পথ বা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে লেগে যায়।

রায়ট হোক বা না হোক, রায়টের ভয়ে যাদের সারাক্ষণ এ-রকম তটস্থ হয়ে থাকতে হয়, মানসিক ভারসাম্য তাদের বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। হিন্দুস্থানের হিন্দুদের দ্বারা সে-দেশের মুসলমান-নির্যাতনের 'স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া'র শিকার হয় যখন পাকিস্তানের

হিন্দুরা, তখন তারা হিন্দুস্থানমুখী না হয়ে কী করে? পাকিস্তানের হিন্দুরা, তাই, পরিণামে হিন্দুস্থানমুখীই হয়ে যায়। হিন্দুস্থানের হিন্দুর অপকর্মের দায় যদি প্রতিনিয়ত পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপরই বর্তে, অন্তত সবসময় ওই খোঁটাই তাদের শুনতে হয়, তবে পাকিস্তানের বদলে হিন্দুস্থানের ভালোমন্দের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর কীই-বা তারা করতে পারে? এ-রকম অবস্থায় বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অভিযোগ নীরবে হজম করা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে কি তাদের?

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এ-রকম বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্য আরো অনিবার্য করে তোলে পঞ্চাশ সালেরই একটি বিশেষ ঘটনা। সেটি নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি। দাঙ্গার ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যখন দুদেশের শাসকদেরই অতিমাত্রায় বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে ফেলে, তখন তারা শান্তির খোঁজে বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেরই ফল নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান স্বাক্ষরিত ওই চুক্তিতে আসলে কী ছিল তা কেউই খুটিয়ে দেখতে চায়নি। তবে সে-চুক্তির একটি 'ভুতুড়ে ভাষ্য' সর্বত্র মুখে মুখে প্রচারিত ও গৃহীত হয়ে গিয়েছিল, এবং সত্যমিথ্যা যাচাই না করে তা বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে গিয়েছিল। সে ভাষ্যটি অনেকটা এ-রকম: এ-চুক্তি স্বাক্ষরের পর যদি পাকিস্তানের কোনো হিন্দুর ওপর নির্যাতন চলে, তবে ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের ওপর তার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করবে। পাকিস্তান সরকার তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবে। ভারতে কোনো মুসলিম-বিরোধী ঘটনা ঘটলে পাকিস্তানেরও অধিকার থাকবে ভারত সরকারকে চুক্তিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করার।

ভারতের কথা জানি না, তবে পাকিস্তানের অনেক হিন্দুকে তো নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির এ-রকম ভাষ্যের মধ্যেই বাঁচার অবলম্বন খুঁজতে দেখেছি। যে-কোনো রকম সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটলেই গ্রামগঞ্জের অনেক হিন্দুকে বলতে শুনেছি: ঠিক আছে, খবর দিয়ে দাও ইন্ডিয়ান হাই কমিশনারকে, তাহলে বুঝবে ব্যাটারা কতো ধানে কতো চাল!

নিজ বাসভূমে পরবাসীদের পক্ষে নানা রকম বিভ্রমে পড়ে এ-রকম বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্যের আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চাওয়াকে অস্বাভাবিকই-বা বলি কী করে?

পঞ্চাশের দাঙ্গার পরে

উনিশ শো পঞ্চাশ সালের দাঙ্গা এবং তারপরই নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি, এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি স্থায়ী চরিত্র নির্ধারণ করে দিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব ও ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান লোক বিনিময় করা হয়েছিল। এতে সমস্যার এক ধরনের সমাধান হয়তো হয়েছিল। যদি পাঞ্জাবের মতো সারা পাকিস্তানের হিন্দুদের ভারতে এবং ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তানে হিজরত করার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হতো, তা হলেই কি উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো? যেতো না নিশ্চয়ই, তবে সে-ব্যবস্থাটি যে অন্তত ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতো,—এ-কথা মানতেই হবে। জিন্নাহ সাহেবরা অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের 'তাহজিব-তমদ্দুন' রক্ষার জন্য পাকিস্তানের জন্ম দিলেন। খুবই ভালো কথা! কিন্তু খণ্ডিত ভারত রাষ্ট্রে যে-মুসলমানদের তাঁরা রেখে এলেন, তাদের কথা কী ভাবলেন? ওই বিপুল সংখ্যক মুসলমানের কি তাহজিব-তমদ্দুন

রক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই? তাহজিব-তমদ্দুন তো পরের কথা, মুসলমানদের জন্য আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর ভারতে অবস্থানরত মুসলমানদের জীবন-জীবিকাই যে হুমকির মুখে পড়তে পারে, সে-চিন্তাই কি তাঁরা করেছিলেন?

ভারতের শাসকরা যদিও নিজেদের দেশকে ভারতই বলতো, পাকিস্তানের প্রচার-মাধ্যমে কিন্তু সবসময়ই ওই দেশটিকে বলা হতো 'হিন্দুস্থান'। এর উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রবক্তারা তাদের দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শনের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই চাইতো যে, পাকিস্তান যেমন মুসলিম রাষ্ট্র তেমনি ভারতও হোক হিন্দুস্থান বা হিন্দুরাষ্ট্র।

ভারতের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীরা এ-রকমটি যে চাইতেন না, তা ঠিক। তাঁরা হয়তো মনে প্রাণেই একটি সেক্যুলার ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে-বিধর্মী হিন্দুরা রয়ে গেলো মুসলিম ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানে, তারা যে সেখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নির্যাতনের শিকার হবে স্বাভাবিকভাবেই—সে-বিষয়ে কি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রের প্রবক্তারা আদৌ সচেতন ছিলেন? পাকিস্তানে বসবাসরত হিন্দুদের ওপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ছুতো ধরেই যে হিন্দু মৌলবাদীরা ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুশীলনকে ব্যর্থ করে দেবে,—এ-কথাও কি তাঁরা জানতেন না?

এ-প্রশ্ন উঠতো না। ওঠে এ-কারণে যে, পাকিস্তান সৃষ্টির দায় বা কৃতিত্ব তো কেবল জিন্নাহ সাহেবদের ওপরই বর্তায় না। কারণ শেষ পর্যন্ত নেহেরু মহাশয়দের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই তো পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে। জিন্নাহ-নেহেরুদের আপোসরফার ফলই পাকিস্তানের অভ্যুদয় বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের জয়লাভ। এ-রকম একটি নীতিবর্জিত আপোস যখন তাঁরা করলেনই, তখন তারা দু'রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের বিনিময় করে সে-আপোসরফাকে সম্পূর্ণতা দিলেন না কেন? তবে কি দু'রাষ্ট্রের নেতারাই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পণবন্দি করে রাখতে চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন কি এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য আরেক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের ঢাল হিসেবে খাড়া করে রাখতে? আর লোক-বিনিময়ের নীতি যদি তাঁদের নাই থাকবে তো পূর্ব পাঞ্জাব-পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোকবিনিময়কে অনুমোদন করলেন কেন?

এ-সব প্রশ্নের জবাব পাকিস্তান বা ভারতের রাষ্ট্রবিধায়করা সেদিনও দেননি, আজো দেন না। দেয়া প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু দু'দেশেরই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে এ প্রশ্নগুলো সব সময় কাঁটার মতো বেঁধে।

সিন্ধু এলাকায় কিছু সংখ্যক হিন্দু থেকে গেলেও পাঞ্জাবের লোক বিনিময়ের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান প্রায় হিন্দুশূন্যই হয়ে যায়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে-যাওয়া হিন্দুরা সংখ্যায় লঘু হলেও তাদের গুরুত্বকে খাটো করে দেখতে পারে না কেউই। সেই গুরুত্বই সমস্যাকে গুরুতর করে তোলে। আর সে-কারণেই পাকিস্তানের দুই অংশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দু'রকম হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিষয়টি আমার প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে পড়ে না, তাই সে নিয়ে কিছু বলছি না। বলছি কেবল পাকিস্তানের পূর্ব অংশের কথাই।

এখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, কিন্তু এই সংখ্যালঘুদের সংখ্যাটা একেবারে লঘু নয়। পঞ্চাশ সালে হয়তো দেড় কোটি বা তার কাছাকাছি হিন্দু এদেশে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত আয়তনের এমন বহু দেশ আছে যে-দেশের সমগ্র জনসংখ্যাই এখানকার সংখ্যালঘুদের চেয়ে অনেক অনেক কম।

এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যে কেবল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক কারণেই স্বাভাবিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, জ্ঞানপাপী ছাড়া কে সে কথা অস্বীকার করবে?

যে-এলাকা নিয়ে পাকিস্তানের পূর্ব অংশ গঠিত হয়েছিল সে-এলাকায় হিন্দুরা আগে থেকেই সংখ্যায় লঘু, কিন্তু প্রতিপত্তিতে ছিল গুরু। আমার গাঁয়ের দশ-বিশ মাইলের মধ্যেই তো আমি দেখেছি বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোর প্রায় সবই হিন্দু-অধ্যুষিত। আশুজিয়া, নওপাড়া, কাটিহালি, বাড়রি—সবগুলো গ্রামই ব্রাহ্মণ-প্রধান। ওই ব্রাহ্মণদের প্রায় সবাই তালুকদার—কেউ ছোট, কেউ বড়ো। কিন্তু মর্যাদায় তাঁরা কেউই খাটো নন। হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে হিন্দুদের কাছেই শুধু তাঁরা মান্য নন, আশপাশের গ্রামের অধিকাংশ মুসলমানেরই তাঁরা মনিব। সেই মুসলমানদের প্রায় সবাই মেহনতি কৃষক, কৃষকরূপে ওই ব্রাহ্মণ জোতদার তালুকদারের অনুগ্রহের প্রত্যাশী। জোতদার-তালুকদারদের ওপরের স্তরে যাদের অবস্থান, তখনকার পূর্ব ময়মনসিংহে সেই জমিদারদের বাড়ি ছিল মূলত গৌরীপুর, কালীপুর, কৃষ্ণপুর, গোলকপুর ও রামগোপালপুরে। এই গ্রামগুলোর অবস্থান প্রায় পাশাপাশি, রামগোপালপুর কিছুটা দূরে। গৌরীপুরকে অবিশ্যি গ্রাম বলা যাবে না, রেলস্টেশনের পাশে এটি একটি ছোট্ট শহর। অনেক আগে থেকেই এখানে পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) আছে।

গৌরীপুর থেকে মাইল বিশেক দূরে আঠারোবাড়ির জমিদাররা ছিলেন জাতে কায়স্থ। এছাড়া পূর্ব ময়মনসিংহের প্রধান প্রধান জমিদারদের প্রায় সবাই ব্রাহ্মণ। ময়মনসিংহের অন্য অঞ্চলে কেবল শেরপুরের জমিদাররা ছিলেন বৈদ্য। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য হিন্দুসমাজের এই তথাকথিত উঁচু জাতের লোক ছাড়া অন্য জাতের মধ্যে জমিদার-তালুকদারের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

কিশোরগঞ্জের হয়বৎনগর, বৌলাই বা জঙ্গলবাড়ির মুসলমান জমিদাররা ঐতিহ্যবাহী হলেও আয়ের বিচারে তাঁরা ছিলেন হিন্দু জমিদারদের অনেক পেছনে। সেকালের ময়মনসিংহে কেবল টাঙ্গাইলেই বেশি আয়ের মুসলমান জমিদার ছিলেন।

কোনো কোনো জমিদার-সন্তান হাইকোর্টের ব্যারিস্টারি কিংবা কোনো উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত থাকলেও, সাধারণভাবে জমিদাররা ছিলেন জমির খাজনাভোগী মাত্র—অন্য কোনো উপজীবিকা তাদের ছিল না। তবে খুব ছোট জমিদার কিংবা তালুকদারদের অনেকেরই ছিল সুদে টাকা খাটানোর মহাজনী কারবার। অর্থাৎ একই সঙ্গে তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রতিভূ। এই শোষণই এঁদের সচ্ছলতার উৎস। এই সচ্ছলতাই আবার এঁদের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে, বাঙালি এলিট গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছে মূলত ওই তালুকদার-জোতদার কাম মহাজনদের ভেতর থেকেই। এঁরাই উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-মাস্টার হয়েছেন, কেরানি-পেস্কার-তহসিলদার হয়েছেন, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মতো উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরেও হয়েছেন এঁরাই। এবং বলা হয়তো নিষ্প্রয়োজনই, তবু আগেও বলেছি এবং এখনো বলছি, এঁদের সংখ্যাগুরু অংশই এসেছেন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দু সমাজ থেকে। সংখ্যালঘুদের প্রতিপত্তির গুরুত্বটা এ থেকেই বোঝা যায়।

শুধু জমিদার-তালুকদার-জোতদার-মহাজনের মতো শোষক কিংবা উকিল থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত এলিট হওয়ার মধ্যেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের গুরুত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীরও উদ্ভব ঘটেছে মূলত হিন্দু সম্প্রদায় থেকেই। গ্রামীণ কুটির শিল্পের সিংহভাগ তো ছিল এদেরই হাতে। কামার, কুমার, কাঁসারি, কাঠমিস্ত্রি, স্বর্ণকার, গোয়ালা, মোদক, তেলী,

তাঁতী—এ-রকম বৃত্তিজীবীরা তো হিন্দুসম্প্রদায়ের একেকটা জাতই তৈরি করে নিয়েছিল। পানচাষ ছিল হিন্দু বারুইদের জীবিকা। ধোপা, নাপিত, জেলে, পাটনি, মালী—এগুলোও হিন্দুদেরই বৃত্তিজীবী জাত। সাহা, কুণ্ডু, বণিক, বসাকরা দখল করে রেখেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের এলাকা।

ইসলামে কোনো জাতপাতের বিধান না থাকলেও মাছধরা বা ঘানি ঘুরিয়ে সরষের তেল বের করা কিংবা তাঁতে কাপড় বোনা এবং এ-রকম আরো কিছু কিছু পেশা অবলম্বন করে এখানকার মুসরমানদের মধ্যেও কয়েকটি বৃত্তিজীবী জাত গড়ে উঠেছিল বটে। তবু মানতেই হবে : সংখ্যালঘু হিন্দুরাই বৃত্তিজীবীদের মধ্যে পূর্ববাংলায় ছিল সংখ্যাগুরু, এদের ছাড়া দেশের পুরো অর্থনীতিটাই অচল। বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বপাকিস্তানের কর্তৃত্বশীল মুসলমানরাও বেশ সচেতন ছিলেন। তাই উপরের স্তরের সকল হিন্দুরের দেশত্যাগটা তাঁদের পছন্দসই হলেও, তাঁরা চাইতেন না যে বৃত্তিজীবী হিন্দুরা বিপুলসংখ্যায় দেশ ছেড়ে চলে যাক। পঞ্চাশ সালের দাঙ্গা ও নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির পর কিছুদিন পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র একটা ভড়ং দেখাতো। নানা জায়গায় সভাটভা করে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতো। একান্ন সালের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাসে এ-রকমই একটি সভা হয়েছিল আমাদের গ্রামের দু'মাইল দক্ষিণে বসুর বাজারে। সে-সভায় একজন মৌলবি সাহেবের বক্তৃতা শুনছিলাম। সুরেলা কণ্ঠে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে তিনি বলছিলেন, 'ভাইসব, এদেশ থেকে সব হিন্দুরা চলে গেলে আমরা সুখে থাকতে পারবো না। যদি কামাররা চলে যায় তবে আমরা দা-কুড়াল কোথায় পাবো, যদি কুমাররা চলে যায় তবে আমরা হাঁড়ি-পাতিল কোথায় পাবো, যদি কাঠমিস্ত্রিরা চলে যায় তবে আমরা লাঙ্গল-জোয়াল কোথায় পাবো, যদি...।'

মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্ব ছিল কৃষিতে। যদিও আমার হাতে কোনো নির্ভরযোগ্য সংখ্যাতত্ত্ব নেই, তবু সঙ্গতভাবেই অনুমান করতে পারি যে, এদেশের কৃষিজীবীদের শতকরা আশি জনেরও বেশি মুসলমান। এবং এদের মধ্যেও প্রধান অংশটি অতি সামান্য পরিমাণ জমির মালিকের কিংবা একেবারে ভূমিহীন কৃষকের। এরাই ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর বা কামলা। এ-ধরনের জীবিকার জন্য এরা, স্বাভাবিক ভাবেই, হিন্দু জোতদার-তালুকদার-মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর গ্রামের নবসৃষ্ট মুসলিম এলিটদের একটা গোষ্ঠী মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের এমন প্রকাশ ঘটাতে চাইলো যাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া শক্ত। হিন্দুদের খাওয়া-দাওয়ায় ছোঁয়াছুয়ির বিধি নিষেধের কথা সবাই জানে। সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মে তো এ-সব থাকার কথা নয়। কিন্তু এখন বলা হলো : হিন্দু বাড়িতে কোনো মুসলমান যদি ভাত খায় তবে সে অবশ্যই গুনাহ্‌গার হবে। একদিন রামপুর বাজারে, দেখলাম একজন মৌলবি সাহেব ওয়াজ করছেন : হিন্দু মেয়েরা হাতে শাঁখা পরে; ওরা যখন নদী বা পুকুর থেকে কলসীতে পানি ভরে নেয় তখন ওই পানিতে ওদের হাতের শাঁখা ডুবে যায়। শাঁখা-ধোয়া পানি খাওয়া হারাম। তাই মুসলমান, এ-কথা সব সময় মনে রাখবেন।

মুসলমান জোতদার বা বড়ো কৃষক বা এলিটরা এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে পারেন। কিন্তু মুসলমান কামলা বা ক্ষেতমজুরের পক্ষে তা মনে রাখা তো রীতিমত আত্মঘাতী ব্যাপার। বাবুর বাড়িতে যে কামলা দেয় সে তো তার খাবারটা ওখানেই খেয়ে আসে। তাতে যে সাশ্রয়টা হতো, নয়া ফতোয়া তা থেকে তাকে বঞ্চিত করলো। তাই আমাদের গ্রামের দস্তর

আলী, যে সারা বছর কামিনী চক্রবর্তীর বাড়িতে কাজ করে তিন বেলা খাবার পেতো এবং মাইনেও পেতো, তার অবস্থা হলো কাহিল। চক্রবর্তী বাড়িতে ভাত খায় বলে সে সবসময় তার জাত ভাইদের ধমক খায়। কামিনী বাবুর ছেলে গোপাল সে-সময় ময়মনসিংহ শহরের মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুলে পড়তো। রমজানের ছুটির পর সে বাড়ি থেকে ময়মনসিংহে ফিরে যাচ্ছিল। দত্তর আলী তার পেছনে পেছনে চলছিল বইখাতা আর বিছানাপত্রের মোট বয়ে নিয়ে। মদনপুরে যেতেই কয়েকজন লোক তাকে আটকালো।

'এই ব্যাটা, আজও হিন্দুদের মোট বয়ে নিয়ে যাস, লজ্জা করে না তোর?...মোট নামা মাথা থেকে।'

ধমক খেয়ে দত্তর আলী মাথার মোট ফেলে দিয়ে রাস্তায় ধপ্ করে বসে পড়লো। অনেক লোক জমে গেলো। আরো অনেকক্ষণ ধরে ধমক ধামক চললো। ধমকটা শুধু দত্তর আলীকে নয়, গোপালকেও।

সেদিন সকলকে অনেক বলে কয়ে জনতার হাত থেকে গোপাল রক্ষা পেয়েছিল এবং দত্তর আলীও আবার মোট তুলে নিয়ে নেত্রকোনা রেলস্টেশন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছিল বটে। কিন্তু এরপর আর গোপাল কোনোদিন দত্তর আলীকে দিয়ে মোট বইয়ে নিতে সাহস পায়নি।

দত্তর আলীদের তাতে কী লাভ হয়েছিল?

না, একেবারে যারা নিঃস্ব তাদের কারো তেমন কোনো লাভ হয়নি, তবে একটু যাদের ভালো অবস্থা আগে থেকেই ছিল তাদের অনেকেরই লাভ হয়েছিল বৈকি। তারা বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের জমি-জিরাতে জলের দামে কিংবা বিনা দামে দখল নিতে পেরেছিল। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর গ্রামের এ-রকম অনেকেরই অবস্থা ফিরে গিয়েছিল। ছনের ঘর থেকে টিনের ঘরে, টিনের ঘর থেকে দালানে অনেকেরই স্থানান্তর ঘটেছিল। এবং কামিনী বাবুদের বদলে এ-রকম নতুন সচ্ছল কোনে মিঞা বাড়িতে দত্তর আলীদের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছিল। তারা গুনাহ্‌র ভাত খাওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিল।

কাজেই, উনিশ শো আটচল্লিশ সালে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মদাতা নিজেই এ রাষ্ট্রটির যে মৃত্যুবীজ রোপণ করেছিলেন, সে-বীজটির চারা সে-সময়ই খুব বেশি বেড়ে উঠতে পারেনি। তার জন্য আরো কিছু সময় লেগেছিল।

'মানুষ খুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে?'

ক্লাস এইটে ওঠার পর মাত্র কয়েকদিনই বেখেরহাটি হাইস্কুলে বাতায়াত করেছিলাম। তারপর ফেব্রুয়ারিতেই সেই পঞ্চাশ সালের দাঙ্গা। আমাদেরও স্কুলে যাওয়া বন্ধ। আমাদের মানে সংস্কৃত নামওয়ালা অর্থাৎ হিন্দু ছাত্রদের। আমি ছাড়া এদের প্রায় সবাই স্কুলও ছাড়লো, দেশও ছাড়লো। সুরেন্দ্র-দেবেন্দ্র দুই যমজ ভাই আমার সঙ্গে পড়তো। তারা বোধ হয় মার্চ মাসেই ভারতের কুচবিহারে পাড়ি জমালো। সুরেন্দ্র আর কোনো দিন দেশে ফিরে আসেনি। বহুদিন পর দেবেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দাড়িগোঁফওয়ালা গেরুয়াপরা এক সন্ন্যাসী হঠাৎ একদিন আমার ময়মনসিংহের আস্তানায় এসে জিজ্ঞেস করে, 'কি হে যতীন, কেমন আছ?...চিনতে পারছো না তো?...তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রর কথা মনে আছে?'

কোন্ দেবেন্দ্র, কোন্ দেবেন্দ্র? স্মৃতির পাতা হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ সন্ধান পেয়ে গেলাম। সেই নিরীহ ছেলেটি তো! যমজ ভাই হলেও দেবেন্দ্র সুরেন্দ্রর একেবারে বিপরীত। সুরেন্দ্র স্মার্ট, দেবেন্দ্র গোবেচারা। সুরেন্দ্র সবার সঙ্গে হৈ চৈ করে, মুখচোরা দেবেন্দ্র ক্লাসে এক কোণে একা একা বসে থাকে। সেই দেবেন্দ্র আমার সামনে। সে এখন 'সন্ন্যাসী বেশে ফিরে দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য'। নামও আর তার দেবেন্দ্র নেই। প্রথমে 'স্বামী', তারপর কী একটা গালভরা শব্দ এবং সে-শব্দটির শেষে 'আনন্দ'। এবং সবশেষে 'ব্রহ্মচারী'। উনিশ শো উনপঞ্চাশ সালের বেখৈরহাটি হাইস্কুলের ক্লাস সেভেনের সেই মুখচোরা ছাত্রটি তার পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করে আজ-স্বামী 'অমুক' আনন্দ ব্রহ্মচারী। জীবনে কোনো নারীর স্বামী হয়নি, কিন্তু নামের আগে 'স্বামী' টা খুব শক্ত করে বসিয়ে নিয়েছে, এবং নামটি শুনেই বোঝা যায় সে সে খুব আনন্দেই আছে। আমাদের মতো ক্ষুদ্র ও নিরানন্দ সংসারে তার বিচরণ নয়, সে এখন ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মে বিচরণকারী।

তার মুখেই সুরেন্দ্রর কথা শুনলাম। পুত্র-কন্যা নিয়ে সুরেন্দ্র কুচবিহারেই থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে মোটামুটি অর্থবান। দেবেন্দ্রর মতো অর্থকে অনর্থ জ্ঞান করে সুরেন্দ্র পরমার্থের সন্ধানে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েনি।

স্কুল ছাড়ার প্রায় চল্লিশ বছর পরে, স্বাধীন বাংলাদেশে, সুরেন্দ্র-দেবেন্দ্রর খবর এভাবে পেয়ে গিয়েছিলাম। এরা ছাড়া বেখৈরহাটি হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে আর যে-সব হিন্দু ছাত্র আমার সহপাঠী ছিল তারা যে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার কিছুই জানি না। বাংলাদেশে বোধ হয় এখন আর একজনও নেই। কোথায় আছে বীরেন্দ্র? কুমুদ? সুশীল? মোহন? কানু?

মনে পড়ে বিধান কৃষ্ণ দাসের কথা। বাংলা থেকে সংস্কৃত অনুবাদের কায়দা শেখাতে গিয়ে আমাদের ক্লাসে একদিন পণ্ডিত মশাই বলছিলেন, 'সংস্কৃত শব্দের জন্য বাঙালিকে শেখনো হাতড়ে ফিরতে হয় না। কারণ বাংলা ভাষাতেই প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দটি পাওয়া যায়। আমরা বলি—হাতী, সাপ, বাঘ, কাজ, বাজ, চামড়া। কিন্তু শুদ্ধ বাংলায়—হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র, কার্য, বজ্র, চর্ম। এগুলোই সংস্কৃত। অর্থাৎ শুদ্ধ বাংলা শব্দটাই সংস্কৃত।'

পণ্ডিত মশাই খাঁটি বাংলা শব্দকে অশুদ্ধ বিবেচনা করতেন কিনা জানি না। তবে সেদিন তিনি সংস্কৃতের কথা বলতে গিয়ে বারবার 'শুদ্ধ' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন।

হঠাৎ বিধানকৃষ্ণ একেবারে লাফ দিয়ে উঠলো। 'ইউরেকা'র ভঙ্গিতে হাত তালি দিয়ে বলে ফেললো, 'বাঃ কী মজা! সংস্কৃত শিখে ফেলেছি। শুদ্ধ বাংলা শব্দটাই সংস্কৃত। সব শুদ্ধ বাংলা শব্দই তো জানি। কাজেই সংস্কৃত ভাষা তো খুবই সোজা।'

তার কথা শুনে আমরা সবাই হেসে ফেলেছিলাম। পণ্ডিত মশাইও। কিন্তু এরপর তিনি যখন সংস্কৃত শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও লিঙ্গনির্ণয়ের জটিলতার কথা বেশ গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন তখন বিধানের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেলো। আমাদের মুখও শুকিয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। তবু বিধানের 'সংস্কৃত শিখে ফেলেছি' কথার সূত্র ধরে ওকে আমরা বেশ ক'দিন খুব ক্ষেপালাম। ও যতো ক্ষেপতো, আমরা ততো মজা পেতাম।

সেই বিধানের কথা ভেবে আমি প্রায়ই স্মৃতিতাড়িত হয়ে যাই। তার স্মৃতির অনুষঙ্গেই সেদিনের অনেক কথা মনে এসে ভীড় করে।

বেখৈরহাটি হাইস্কুলে আমার একজন 'পাতানো বন্ধু' ছিল। বন্ধু পাতানোর ব্যাপারটা বোধ হয় এ-যুগের শহুরে ছেলেদের আমি বোঝাতে পারবো না। গ্রামের ছেলেরাও বুঝবে কিনা জানি

না। আজকাল 'পাতানো খেলা' বলে একটা কথা শুনি। এই পাতানো খেলা যে মোটেই প্রকৃত খেলা নয়, খেলার ভড়ং মাত্র—এতো সবাই জানে। তাই পাতানো বন্ধুত্বও যে এ-রকম একটা কপট ব্যাপারই হবে—এ-ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু, না। বন্ধু পাতানোর ব্যাপারটা মোটেই ভড়ং বা কপট কিছু ছিল না। বন্ধুত্বকে একটা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জীবন্ত ও পাকাপোক্ত করে তোলার নামই ছিল বন্ধুপাতানো। ছেলেদের মতো মেয়েরাও এ-ভাবেই সই পাততো। এই বন্ধু বা সই পাতানোতে কোনো সাম্প্রদায়িক বিবেচনা ঠাঁই পেতো না। অনেক রক্ষণশীল হিন্দু আর মুসলমান পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও অনায়াসেই পরস্পরের বন্ধু বা সই হয়ে যেতো। পরস্পরের বন্ধুত্ব বা সখিত্বকে চিরকাল অটুট রাখার শপথ গ্রহণ, পরিজনদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও নানা আমোদ-আহ্লাদ—এ-সবই ছিল বন্ধু পাতানো বা সই পাতানোর অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এটি লোকায়ত বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান।

এ-ধরনের অনুষ্ঠান করেই আমি আর আমার সহপাঠী নীরেন্দ্র কিশোর কর পরস্পরের বন্ধু হয়েছিলাম। আমার সেই বন্ধুও দেশত্যাগী হলো। বেশ কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর দুয়ার থেকে তার চিঠি আসতো। আমিও লিখতাম। তারপর আস্তে আস্তে পত্র যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

শুধু বন্ধু-বান্ধবদের কথাই-বা বলি কেন, রক্তের সম্পর্কে বাঁধা যে-সব আত্মীয়-স্বজন দেশ ছেড়ে চলে যায় তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ ক্রমে শিথিল হয়ে আসে। আমার দুই মামাই মারা গেছেন, মাসিমাদেরও কেউ বেঁচে নেই। তাঁদের ছেলেমেয়েদের কেউ আসামে, কেউ কুচবিহারে, কেউ পূর্ণিয়ায়, কেউ বেনারসে। কিন্তু কে কেমন আছে, কী করছে, তার কোন খোঁজই রাখি না। আমার যে জ্ঞাতিভাইরা পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুচবিহারে চলে গিয়েছিল, দেশে তো আমরা তাদের সঙ্গে একই বাড়িতে প্রায় একান্নভুক্ত হয়েই ছিলাম। তাদেরও কোনো খবর জানি না বহুদিন ধরে। আমার ছেলেমেয়েদের তো তাদের সম্পর্কে কোনো ধারণা পর্যন্ত নেই।

এ-সবই পাকিস্তানের অবদান। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়েও সে-অবদানের অপচ্ছায়া দূর হয়নি, বিস্তৃততর হয়েছে বরং।

পঞ্চাশ সালে দাঙ্গা যখন চলছিল এখানে-ওখানে, সে-সময়ই একদিন বেখৈরহাটি বাজারে নোয়াখালিবাসী এক গ্রাম্য কবি কবিতার বই বিক্রি করছিলেন। ক্রেতা আকর্ষণ করছিলেন টিনের চোঙে মুখ লাগিয়ে সুর সহযোগে তাঁর বইয়ের কবিতা আবৃত্তি করে। আট পৃষ্ঠার কবিতার বইটির দাম মাত্র দু'আনা। মানুষ হামলে পড়ে বইটি কিনছিল। সে-বইয়ের কবিতার প্রতিটি পংক্তি হিন্দুস্থানের মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গার কাল্পনিক ও উত্তেজক বিবরণে ঠাসা। সারা কবিতা জুড়ে সাম্প্রায়িক বিদ্বেষের আগুন। কবি সে-আগুন ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতার শ্রোতা ও ক্রেতাদের চোখেমুখেও। না, সব শ্রোতা ও ক্রেতার চোখেমুখে নয়। কেবল আরবি নামধারীদের। তারা অনেকেই কবির ভাবে ভাবিত হয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সংস্কৃতনামধারী মানুষগুলোর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ভীতি আর আতঙ্কে।

আমাদের গাঁয়ের গয়ানাথ চক্রবর্তী ও শচীন্দ্র দে হাটে হাটে ঘুরে ক্রিমির ওষুধ, দাদের মলম ও হজমি দাওয়াই বিক্রি করতেন। তাঁরাও সেদিন বেখৈরহাটি বাজার থেকে ওই কবিতার

বইটি কিনে এনেছিলেন। গ্রামে তাঁদের প্রতিবেশীরা (অবশ্যই হিন্দু প্রতিবেশীরা) যখন বইয়ের কবিতা পড়লো বা শুনলো তখন তাদের চোখে মুখেও আতঙ্কের ছাপ পড়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, সাতচল্লিশ সালে, মুক্তাগাছার গাবতলি বাজারে পল্লীকবি ইউনুস আলীর 'পাকিস্তানের কবিতা' শুনে আমার কিশোর মন আনন্দের আবেশে টইটুম্বুর হয়ে পড়েছিল। অথচ তারই বিপরীত অনুভূতির সঞ্চার করলো মাত্র তিন বছর পরে, পঞ্চাশ সালে, নোয়াখালির গ্রাম্য কবির কবিতা। ইউনুস আলী আবহমান বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র কী মানোরম ভঙ্গিতেই-না তুলে ধরেছিলেন। ইউনুস আলী চেয়েছিলেন: পাকিস্তানে 'হিন্দু-মুসলিম মিলে মিশে থাকতে যেন পাই'। আর নোয়াখালির কবি নেত্রকোনার বেখৈরহাটি বাজারে এসে যে-কবিতা পরিবেশন করলেন তার ধ্রুবপদ ছিল—চিলুমচি আর দস্তরখানা সকল জাতে চিনে না। কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা।

ইউনুস আলী আনন্দে আপ্লুত হয়েছিলেন ফজর আলী আর ঠাকুরদাসের (অর্থাৎ মুসলমান আর হিন্দুর) 'এক উঠাইন্যা বাড়ি' দেখে। এবং কামনা করেছিলেন: দেশের সকল ফজর আলী আর ঠাকুরদাসরাই যেন এ-রকম এক উঠাইন্যা বাড়িতে (অর্থাৎ অভিন্ন উঠানে বা প্রাঙ্গণে বাড়ি তুলে) পরম সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে। আর নোয়াখালির ওই গ্রাম্য কবির প্রত্যয়: হিন্দু আর মুসলমানে কখনো ঐক্য ছিল না, কখনো ঐক্য হতে পারে না। চিলুমচি আর দস্তরখানা যে-জাতের লোকেরা চেনে না, সেই হিন্দুদের থেকে আলাদা হয়ে থাকার মধ্যেই আছে মুসলমানের মঙ্গল। সে-রকম আলাদা থাকার জন্যই তো মুসলমানরা পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছে।

এক কবির কবিতা দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রীতি প্রেমের পুণ্য বাঁধনে মেলাতে চায়, আরেক কবির কবিতার প্রতিটি ছত্র দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষের দেয়াল তুলে দেয়। অথচ, দু'জনই তাঁরা লোকায়ত পল্লী বাংলার কবি। তবু কেন দুয়ের মধ্যে এমন বৈপরীত্য?

এ-প্রশ্নের জবাব লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির অ্যাকাডেমিক গবেষকরা দিলেও দিতে পারেন। তবে অ্যাকাডেমিক যান্ত্রিকতার মধ্যে প্রশ্নটির সঠিক জবাব পাওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

সারা জীবন ধরে আমি প্রশ্নটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। এবং তার ফলে সঠিক, সন্তোষজনক, সর্বজনগ্রাহ্য ও নিঃসংশয় জবাব পেয়ে গেছি—এমন কথা অবশ্যই বলবো না। সবিনয়ে শুধু বলবো: বহুমাত্রিক লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির এমন অনেক মাত্রা আমার অনুভবে ধরা পড়েছে, অ্যাকাডেমিক ফোকলোরচর্চাকারীরা যেগুলোকে খুব একটা বিবেচনার মধ্যে আনেন নি। বাংলার লোকসমাজে সাম্প্রদায়িকতার ঘাতপ্রতিঘাত সে-সমাজের কবিশিল্পীদের কাকে কীভাবে নাড়া দিয়েছে, সে-সবের মর্মগ্রাহী বিচার-বিশ্লেষণ প্রায় হয়ই নি বলতে গেলে। যদি হতো তাহলে আমাদের সমাজ-মানসের পরিচয়টি যেমন আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠতো, তেমনি পাকিস্তানের জন্মমৃত্যুর প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোর সীমাবদ্ধতাও অনেক পরিমাণে দূর হয়ে যেতো। শুধু তাই নয়। পাকিস্তান মরে গিয়ে কীভাবে বাঙালির ঘাড়ে ভূত হয়ে চেপে বসতে পারে তারও নিদান সন্ধান হতো।

পল্লী বাংলার যে-সব কবিকে ভদ্রভাষায় 'লোককবি' বলা হয়ে থাকে তাঁদের অনেকের মধ্যেই আমি সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক ভাবনার দোলাচল লক্ষ করেছি। এ-ও লক্ষ করেছি

যে, ধূর্ত মোড়ল মাতব্বর বা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকদের খপ্পরে পড়ে পল্লীর অনেক সরল প্রাণ কবিশিল্পী প্রায়শই নিজেরা বিভ্রান্ত হন ও অন্যকে বিভ্রান্ত করেন। তাঁরা তাঁদের গান-কবিতা পালা বা লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে লোকসমাজে সেই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেন। বিভিন্ন সামাজিক আলোড়ন-আন্দোলনে লোককবি বা শিল্পীরাও আন্দোলিত হন। জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলন তাঁদের উদ্দীপ্ত করেছে, কম্যুনিস্টদের জমিদার-মহাজন বিরোধী কৃষক আন্দোলনকেও তাঁরা তাঁদের সৃষ্টি দিয়ে বেগবান করে তুলেছেন। আবার অন্যদিকে পাকিস্তান-আন্দোলনের নেতারাও সাম্প্রদায়িক ভাবনা বিস্তারে তাঁদেরকে কাজে লাগিয়েছেন।

লোককবিদের ভেতর বস্তুবাদ ও ভাববাদের দ্বন্দ্বও দেখেছি। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার দ্বন্দ্ব কম দেখিনি। তবে প্রকৃত প্রতিভাবান লোককবি যে এ-সবের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতেও সব দুর্বলতা ও সংকীর্ণতাকে জয় করে মানুষের প্রতি বিশ্বাসকেই শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারেন তার পরিচয় আমি নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের লোককবিদের মধ্যে পেয়েছি। বিপ্লবী কৃষক কবি নিবারণ পণ্ডিতকে আমি দেখিনি, তবে তাঁর কবিতা তথা গান অনেক পড়েছি ও শুনেছি। প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা তাঁর সৃষ্টিকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। পাকিস্তান আমলেও অখিল ঠাকুরের গান শুনেছি। তাঁর গান হিন্দু মুসলমানকে এক সঙ্গে মিলিয়েছে, 'কোরআন-পুরাণের ঝগড়া' ভুলিয়ে দিয়েছে। সব চেয়ে কাছে থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমি পেয়েছি পূর্ব ময়মনসিংহের প্রখ্যাত কবি জালাল উদ্দীন খাঁকে। জালাল খাঁর বাড়ি আমাদের পাশের পল্লী সিংহের গাঁও-এ। উনিশ শো পঞ্চাশ সাল থেকেই আমি তাঁর স্নেহ-সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি। তাঁর কাছ থেকে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ও প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী সংস্কৃতির যে-রকম অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছি, সে-রকমটি কোনো সংস্কৃতি-তাত্ত্বিকের বই পড়ে পাইনি। পঞ্চাশ সালে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে অ্যাকাডেমিক শিক্ষা থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু জালাল খাঁর কাছে পাওয়া লোকায়ত সংস্কৃতির জীবন্ত শিক্ষা আমার মনের দারিদ্র্য দূর করে দিয়েছে। পঞ্চাশ সাল থেকেই আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও গুরু হয়ে যান জালাল খাঁর পুত্র খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। হাকিম নামের মানুষগুলো আমাদের নেত্রকোনার প্রাকৃত উচ্চারণে হয়ে যায় হেকিম। এ-ভাবেই জালাল-এর পুত্র হাকিম হয়েছিলেন আমার হেকিম ভাই। হেকম ভাইও কবি ছিলেন। বাউল পিতা জালাল খাঁর উত্তরাধিকার নিয়েই পুত্র খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম হয়েছিলেন আধুনিক কবি। পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শনে তিনিই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড়ো সহযোগী। তাই, জালাল খাঁর মতোই হেকিম ভাইয়ের কথাও আমাকে বারবার স্মরণ করতে হবে।

এখন শুধু বলে রাখি: নোয়াখালির গ্রাম্য কবির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষান্ধ কবিতা আমাকে বিচলিত ও সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। পঞ্চাশ সালেই জালাল খাঁর গানের সুর আর কলি আমার পরানের গহন গভীরে জায়গা করে নিয়েছে—**বিচার করলে নাই রে বিভেদ কে হিন্দু কে মুসলমান। রক্তমাংসে একই বটে, সবার ঘটে একই প্রাণ।**

আমি গান গাইতে জানি না, তাই জালাল খাঁর গানের পংক্তি আমি মন্ত্রের মতো আবৃত্তি করি—**মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে? মানুষ ভজ কোরআন খোঁজ, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।**

'বৃথায় তিলক ফোঁটা, পাঁচ ওয়াক্ত মাথা কোটা'

'আশুজিয়া স্কুল সাদা, ছাত্রগুলি গাধা, বেঞ্চিগুলি সরু, মাস্টারগুলি গোরু।' রামপুর প্রাইমারি স্কুলে যখন পড়ি তখন আশুজিয়া হাইস্কুলের ছাত্রদের দেখলেই আমরা সমবেত কণ্ঠে এ রকম ছড়া কাটতাম। রামপুর থেকে আড়াই মাইল পূর্বে আশুজিয়া গ্রাম। সে-গ্রামেরই স্কুলটির নাম 'জয়নাথ চক্রবর্তী ইন্‌স্টিটিউশন' সাধারণ্যে তারই পরিচিতি 'আশুজিয়া স্কুল' নামে। আশপাশের গ্রামের কিছু ছাত্র রামপুর ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়েই আশুজিয়া যেতো। এরাই হতো আমাদের ছড়ার আক্রমণের শিকার। হাইস্কুলের ছাত্ররা আমাদের চেয়ে বয়সে বড়ো বলেই হয়তো বুদ্ধিতেও আমাদের চাইতে পাকা ছিল। তাই তারা আমাদের পাল্টা আক্রমণ করতো না। স্মিত হাসি দিয়ে কিছুটা বরং প্রশ্রয়ই দিতো। হাসতে হাসতেই কখনো কখনো তাদের কেউ আমাদের তাড়া করলে আমরা ভোঁ দৌড় মারতাম, দৌড়ে আমাদের সঙ্গে কুলিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দৌড়াতে দৌড়াতেই তাদের স্কুলের নিন্দার পাশাপাশি আমাদের স্কুলের গৌরব ঘোষণা করতাম-*রামপুর ইস্কুল কালো, ছাত্রগুলি ভালো, বেঞ্চিগুলি তিন ফুট, মাস্টারগুলি ভেরি গুড।*

যে আশুজিয়া হাইস্কুলের প্রতি প্রবল নিন্দা বর্ষণ করতাম, আমাকে কিনা সেই স্কুলেরই ছাত্র হতে হলো উনিশ শো একান্ন সালে। সে-সময়ে স্কুলের পাঠ্যসূচীতে, এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষায়, কোনো একটি ক্লাসিকাল ভাষা (যেমন-আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত বা পালি) ছিল অবশ্য পাঠ্য। ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় দেশত্যাগ করার পর বেখৈরহাটি হাইস্কুলে আর কোনো সংস্কৃত শিক্ষক না থাকায় সে-ইস্কুলে পড়া আর আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পঞ্চাশ সালে সারা বছর ক্লাস কামাই করে, একান্ন সালের গোড়ায় বেখৈরহাটি হাইস্কুল ছেড়ে আশুজিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। ক্লাস এইটের পড়া না-পড়েই নাইনের ছাত্র। নেত্রকোনা শহরের চন্দ্রনাথ হাইস্কুল ছাড়ার পর থেকেই ভালো ছাত্র হওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টা চিরতরে পরিত্যাগ করেছিলাম। পরিত্যাগ না-করলেই-বা কী হতো! ভালো ছাত্র হওয়ার কোনো সুযোগই আর আমার জন্য আসে নি। কেবল ভালো স্কুলই যে পাইনি, তা নয়। স্কুলের বই-খাতার জোগানও পাইনি ঠিকমতো। আমাদের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা কোনো দিনই ছিল না, দারিদ্র্য ছিল নিত্য সাথী। বাবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আয় দিয়েই সংসারের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হতো। নন্দীগ্রাম ও দলপা এই দুটি গ্রাম ছিল বাবার চিকিৎসা ব্যবসার মূল এলাকা। হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রাম দু'টো থেকে ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ফলে সে-ব্যবসায়ে দারুণ মন্দা দেখা দেয়, আমাদের সংসারের সচ্ছলতায় আরো বেশি করে টান পড়ে, এবং স্কুল-জীবনেই আমাকে রোজগারের ধান্ধায় জড়িয়ে পড়তে হয়। তবে, সে-সব কথা এখন থাক। শুধু বলি: পাকিস্তানি যন্ত্রণাই আমার স্কুল-জীবনের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছিল, পাঠ্যবইয়ে মনোযোগ দেয়ার আবহ ও আগ্রহ থেকেও বঞ্চিত করেছিল। তবু প্রচুর 'অপাঠ্য' বই পড়ার বদৌলতে ভাষার ওপর মোটামুটি দখল এসে যাওয়াতই বোধ হয়, স্কুলের প্রথাগত শিক্ষায় মনোযোগী না হয়েও, পরীক্ষা-বৈতরণী পার হয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

আশুজিয়া হাইস্কুলের আমার তিন বছরের ছাত্রজীবন। একান্ন সালে ক্লাস নাইনে, বায়ান্ন সালে টেনে। সে-হিসেবে তেপ্পান্ন সালের মার্চেই আমার ম্যাট্রিক দেয়ার কথা। কিন্তু বায়ান্ন সালের মার্চ থেকেই এমন দুরারোগ্য পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হই, যার দরুন আবার এক বছরের জন্য ঘটে আমার স্কুল-জীবনের বিরতি এরপর তেপ্পান্ন সালে আবার ক্লাস টেনের ছাত্র হয়ে চুয়ান্ন সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই।

আগুজিয়ায় এই তিন বছরের স্কুল-জীবনে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি। না, বৈষয়িক কোনো পাওয়া নয়। তবে যা পেয়েছি তাতে আমার চেতনার পরিপুষ্টি যে ঘটেছে, সে-কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবো না। পাকিস্তানের জন্মব্যাখ্যার যে তিন তত্ত্ব কংগ্রেসী, মুসলিম লীগার ও বামপন্থীদের মুখে শুনেছি, সেগুলোর অসম্পূর্ণতা আমার কাছে ধরা পড়ে ওই সময়েই।

বাড়ি থেকে আড়াই মাইল হেঁটে স্কুলে গিয়েছি। যেতে হতো সিংহের গাঁওয়ের জালাল উদ্দীন খাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। তাতে এই বাউল কবি জালাল খাঁ আর তাঁর পুত্র আধুনিক কবি খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের (হেকিম ভাই) স্নেহ সান্নিধ্য পাওয়া আমার জন্য খুব সহজ হয়েছে। স্কুল থেকে ফেরার পথে একেক দিন বিকেলে তাঁদের 'গোলঘর'-এর আড্ডায় বসে গেছি। গোলাকৃতির এই ঘরটিই ছিল সংস্কৃতি ও রাজনীতিরও কর্মকেন্দ্র। এটিই ছিল হেকিম ভাই-প্রতিষ্ঠিত 'আবেহায়াৎ সাহিত্য মজলিস'-এর অফিস। এখানেই জালাল খাঁ ও তার শাগরেদদের জমজমাট আসর বসতো। গোলঘরটিতে মঞ্চ তৈরি করেই বছরে অন্তত একবার হতো নাট্যাভিনয়। শাহজাহান, সিরাজউদ্দৌলা, পলাশীর পরে, টিপু সুলতান, দেবলা দেবী, পথের শেষে, মায়ের দাবি—এ-সব নাটকের মহড়া ও অভিনয় হতো এই গোলঘরেই। হেকিম ভাই-ই ছিলেন নাটকের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। আমাকেও তিনি অভিনেতা বানিয়ে ছেড়েছিলেন।

গোলঘরের আড্ডায় সিংহের গাঁও ও তার আশপাশের গাঁয়ের অনেককেই পাওয়া যেতো। এ-আড্ডায় আলোচনা হতো না এমন কোনো বিষয় বোধ হয় জগৎ সংসারে নেই। শরিয়ত-মারফতের ভেদ নিয়ে শুরু হওয়া কতাবার্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক পর্যন্ত গড়াতো। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ-বিরোধ, আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, পাটের দর ও গ্রামীণ অর্থনীতি, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার, মামলা-মোকাদ্দমা ও গ্রাম্য টাউট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশান ও ভিলেজ পলিটিক্স—এ-রকম বিচিত্রবিধ বিষয় সে-আড্ডায় অনায়াসে উঠে আসতো। শুধু বিষয়ে নয়, বিষয়ের পরিবেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও থাকতো বহুমুখী বৈচিত্র্য। অজপাড়া গাঁয়ে স্বল্পশিক্ষিত কতকগুলো মানুষের সেই আড্ডায় যে-রকম মুক্তবুদ্ধি ও পারস্পরিক সহিষ্ণুতার প্রকাশ দেখেছি, সে-রকমটি শহরে উচ্চশিক্ষিত মানুষদের আসরে কখনো দেখিনি।

তবে, সিংহের গাঁওয়ে খাঁ বাড়ির গোলঘরের আড্ডাটি ছিল মূলত মুসলমানদের। মুসলমানের আড্ডা বলেই তাতে পাকিস্তানের শাসক ও শাসন-রীতির সমালোচনা থাকলেও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি সম্পর্কে আড্ডার সকলের ছিল একটা আবেগঘন মনোভঙ্গি। সে-মনোভঙ্গি থেকেই তাদের কণ্ঠ থেকে ক্ষোভ ঝরে পড়তো সিংহের গাঁওয়ের একমাইল পূর্বদিককার ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত আগুজিয়া গ্রামটির হিন্দু সমাজপতি ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। কারণ এদের প্রতিপত্তির পেষণেই তো তারা এতোদিন পিষ্ট হয়েছে. 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এ এরাই তো ছিল তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী।

অন্যদিকে আগুজিয়া গ্রামটিতে এখানে-ওখানে হিন্দুদের যে-সব ছোটখাটো আড্ডা বসতো সেগুলোর চরিত্র ছিল খাঁ বাড়ির আড্ডার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুদের কাছে, স্বভাবতই, পাকিস্তান হচ্ছে যন্ত্রণার উৎস। তাই আগুজিয়ার মতো গ্রামের প্রতাপ-প্রতিপত্তিহারা হিন্দুরা যে তাদের ঐক্য আড্ডাগুলোতে ফিসফিস্ করে পাকিস্তানের মুণ্ডুপাত করবে—তেমনটিই তো স্বাভাবিক।

তাই বলে আশুজিয়া গ্রামের সকল ব্রাহ্মণই অত্যাচারী তালুকদার-ভূস্বামী বা শোষক মহাজন ছিলেন না। গরিব, হৃদয়বান্ ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণও ছিলেন অনেক। এ-রকমই একজন আশুজিয়া হাইস্কুলে আমার শিক্ষক জয়চন্দ্র রায়। তিনি আমার বাবারও শিক্ষক ছিলেন। আমাকে তাই আদর করে 'নাতিছাত্র' বলে ডাকতেন। আশুজিয়া হাইস্কুলের প্রায় গোড়া পত্তনের সময় থেকেই তিনি এখানে মাস্টারী করে এসেছেন। স্কুলটিকে কী ভালোই-না বাসতেন তিনি। বলতে গেলে একেবারে সন্তানের মতো। গ্রামের স্কুল ঘর। নড়বড়ে খুঁটি, ভাঙ্গা বেড়া। একটু জোরে ঝড়ো বাতাস বয়ে গেলেই ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। জয়চন্দ্র বাবুর নিজের ঘরও এ-রকম পলকাই ছিল।। তবু নিজের ঘরের নিরাপত্তার কথা যতো না ভাবতেন, তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকতেন স্কুল ঘরটির জন্য। ঝড়ের শেষে রাতেই তিনি হারিকেন নিয়ে স্কুল ঘরে চলে যেতেন। ঘরের বেড়া আল্‌গা হয়ে গেলে কিংবা চাল উড়ে গেলে আশপাশের লোক ডেকে রাতেই তা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়ে নিতেন।

সন্ধ্যা-পূজাসহ সব রকম শাস্ত্রীর নিয়ম নিষ্ঠায় জয়চন্দ্র রায় ছিলেন একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি দরদে তাঁর অবস্থান ছিল সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদের অনেক অনেক উর্ধ্বে। বিশেষ করে কোনো শিক্ষক যে ছাত্রকে সত্যিসত্যিই পুত্রতুল্য বিবেচনা করতে পারেন, তার প্রমাণ জয়চন্দ্রবাবুকে দেখেই প্রথম পেয়েছিলাম। আশুজিয়ার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার যে-অভিযোগ ছিল, জয়চন্দ্র বাবু ছিলেন তা থেকে সর্বাংশে মুক্ত। সুবিধা-বঞ্চিত ও দরিদ্র অব্রাহ্মণ এবং মুসলমান ছাত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অতিরিক্ত পরিমাণে সক্রিয়। তাঁর সে-সক্রিতয়তার প্রমাণ দেয়ার মতো বহুছাত্র এই শতাব্দী শেষেও জীবিত আছে।

আশুজিয়া ইস্কুলে তখন, পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকে—অন্যান্য গ্রাম্য ইস্কুলের মতোই—শিক্ষক সংকট খুবই প্রকট। আজ একজন শিক্ষক আসেন তো দু'দিন পরই চলে যান। একা জয়চন্দ্র বাবুকেই সব সামাল দিতে হয়। পারেনও তিনি। ইংরেজি, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত—সব বিষয়েই তাঁর ছিল সমান দখল ... তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। গল্প বলে বলে ইতিহাসকে তিনি আমাদের সামনে একেবারে জীবন্ত করে তুলতেন। এ-ব্যাপারে সিলেবাসের গণ্ডি তিনি বড়ো একটা মেনে চলতেন না। শুষ্ক আচারসর্বস্ব ধর্ম-ধ্বজীদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল রীতিমত র‍্যাডিকেল। সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি' থেকে নানক-কবির শ্রীচৈতন্যের প্রথাবিরোধী ধর্মচিন্তা পর্যন্ত সবই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। মীরাবাঈয়ের একটি হিন্দি ভজন তিনি প্রায়ই ক্লাসে আবৃত্তি করতেন। যেটির ভাবার্থ হলো, মীরা বলছেন, 'দুধ পানে জীবনধারণ করলেই যদি ঈশ্বরকে পাওয়া যেতো, তা হলে তো বাছুর গুলিরই ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটতো। পাথরের মূর্তি পূজা করলে যদি ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে তো আমি পাহাড়কে পূজা করতে রাজি আছি। ছোট্ট একটা তুলসীগাছকে পূজা করলে যদি ঈশ্বর পাওয়া যায় তো আমি একটা আস্ত জঙ্গলকে পূজা করতে পারি।' এ-সব নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে মীরা বাঈয়ের সব শেষে বক্তব্য : প্রেম ছাড়া কখনো ঈশ্বর লাভ ঘটে না। ('বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলালা')।

প্রেমের কথা বলেই জয়চন্দ্র বাবু বলতেন: এই প্রেম হচ্ছে মানবপ্রেম। মুখে যারা হরদম ঈশ্বরের নাম নেয়, অথচ মানুষকে ভালোবাসে না, তারাই হচ্ছে আসল পাপী। ঈশ্বরের নাম করেই ওরা মানুষকে ঠকায়।

এই ধর্ম-ধ্বজী ঠকদের সম্পর্কে খুব মজার একটা গল্প বলতেন তিনি। ঠিক গল্প নয়, তাঁর নিজের দেখা একটি সত্য ঘটনার বর্ণনা।

আগুজিয়া গ্রামেরই পাশে বসুর বাজারে ছিল এক মহাজন। মালাতিলকধারী মহা সাধু। তিলকের ছাপ দিয়েই কপালে লিখে রাখতো রাধাকৃষ্ণের নাম। মুখে সব সময় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'। এ-রকম সাধু পুরুষকে কে না ভক্তি করে? তাকে চোরবাটপাড় বলে সন্দেহ করা তো অসম্ভব। কিন্তু আগুজিয়ারই একজন লোকের একদিন সন্দেহ হলো যে, ওই সাধু মহাজন ওজনে কম দেয়। ওই মহাজনের নিজের হাতে-মেপে-দেয়া ডাল অন্য দোকানে নিয়ে ওজন করে তার সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হলো। এ-লোকটি ছিল আবার খুবই রসিক। সাধু মহাজনের কাছে গিয়ে খুবই আস্তে বিনয় নম্র মধুর স্বরে সে ডাক দেয়, 'কাকা, কাকা গো।'

সস্নেহে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে মহাজন বলে, 'কী রে বাবা, কী বলছিস?'

-'বলছিলাম কি, চট্‌পট্ আপনার কপালের ওই ছাপটা মুছে ফেলুন তো।'

-'কপালের ছাপ মুছে ফেলবো? কী বলছিস তুই?'

-'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আপনার কপালে একটা লাথি দেবো।'

-'এ্যাঁ...'।

-'এ্যাঁ করলে চলবে না। কপালের ছাপটা তোমাকে মুছতেই হবে।' এবার আর বিনয় বা সম্মান নয়। চিৎকার করে সে বলতে থাকে, 'হারামজাদা, ভণ্ড, শয়তান। ধার্মিকের ভড়ং দেখাস্ আর ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাদের ঠকাস। আবার কপালে লিখে রেখেছিস্ ভগবানের নাম। মুছে ফেল্ শিগ্‌গির। ভগবানের নামের ওপর লাথিটা দিই কী করে? মুছে ফেল শিগ্‌গির ওই নাম।...'

গল্পটা শেষ করেই জয়চন্দ্র বাবু কবিতার একটি লাইন আবৃত্তি করতেন—'বৃথায় তিলক ফোঁটা, পাঁচ ওয়াক্ত মাথা কোটা, ভণ্ডামি ধূর্তামি ওটা নিশ্চয় নিশ্চয়।'

এটি কার কবিতা, এর আগের বা পরের লাইনগুলি কী—এ-সব কিছুই জয়চন্দ্র বাবু আমাদের বলেননি।

তবে, আমার মনে হতো, 'মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে?'—জালাল খাঁর এ-ধরনের বিদ্রোহী পংক্তিমালার সঙ্গে জয়চন্দ্র বাবু কথিত কবিতা ও গল্পের একটা সাযুজ্য আছে। ধর্ম নিয়ে পাকিস্তানি ভণ্ডামির সঙ্গে জালাল খাঁ কিংবা জয়চন্দ্র রায়দের কেউই তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না।

সামন্ততন্ত্রের অচলায়তন ও তার পাঁচিলের ফাঁকফোকর

আমি যখন আগুজিয়া হাই স্কুলের ছাত্র, সেই পঞ্চাশের দশকের শুরুতে, আগুজিয়া গ্রামের তখন পড়তি দশা। সে-গ্রামের ব্রাহ্মণ তালুকদার-জোতদাররা তখন বিষহীন ঢোঁড়া। তবে ঢোঁড়া সাপও নাকি নিজেকে জাতসাপের বংশধর বলে ভাবে, আর সে-কারণেই জাতসাপের চেয়েও সে ফোঁস করে বেশি, বিষ না থাকলেও তার আছে কুলোপানা চক্কর।

আমি সেই কুলোপানা চক্কর দেখেছি, ফোঁসফোঁসানিও শুনেছি। এবং এ-সব দেখে শুনে ওদের আগের অবস্থা ও অবস্থানটি আঁচ করতে চেষ্টা করেছি। এ থেকে পাকিস্তানের জন্মব্যাখ্যার একটি সূত্রও পেয়ে গেছি।

আশুজিয়া হাইস্কুলের শিক্ষকরাই শুধু নন, সে-গ্রামের অন্য সব বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরাও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সে-স্নেহের অন্যতম কারণ আমার প্রয়াত পিতামহের পরিচয়। আমার প্রয়াত পিতামহের (ঠাকুর্দা) কথা নানা সূত্রে প্রায়ই তাঁরা উল্লেখ করতেন। রামদয়াল সরকারের নাতি বলেই আমাকে বিশেষ খাতির যত্নও করতেন।

তবে আমার ঠাকুরদার যে-পরিচয়টির সুবাদে আমাকে তাঁরা খাতির যত্ন করতেন, সে-পরিচয়টির জন্যে আমি মোটেই গৌরববোধ করতে পারি না।

আমার ঠাকুর্দা মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে, তিনি ছিলেন তাঁর পিতার মৃত্যু-উত্তর জাতক। তাঁর বড়ো আরো দু'ভাই ছিলেন। তাঁদের একজন, রামচরণ, শৈশবেই মারা যান। জ্যেষ্ঠ রামসুন্দরের মধ্য যৌবনে অকাল মৃত্যু ঘটলে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের দায়িত্ব এসে পড়ে কনিষ্ঠ রামদয়াল অর্থাৎ আমার ঠাকুর্দা বা পিতামহের ওপর। অনেক কষ্টে, নানা জীবিকার আশ্রয় নিয়ে, একটি বৃহৎ সংসার তাঁকে চালাতে হয়। এর মধ্যে এক সময় যে তিনি গ্রামে পাঠশালা বানিয়ে তাঁর গুরু মহাশয় হয়ে বসেছিলেন, বাবার কাছে সে-তথ্যটি জানতে পেরে আমার খুব ভালো লেগেছিলো। কিন্তু কিছুকাল পরে আমার ঠাকুর্দা সেই গুরু মহাশয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে আশুজিয়া গ্রামে এক তালুকদারের সেরেস্তার কর্মচারী হয়েছিলেন, এ-তথ্যটি আমাকে মোটেই পুলকিত করেনি। কারণ ইতিমধ্যেই গ্রামীণ তালুকদার-মহাজনদের সম্পর্কে আমার মনে ভীষণ বিরূপতা জন্মে গিয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যদিও ওরা তালুকদারী-মহাজনীর স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল, তবু সে-সময়েও, ওদের আচার-আচরণের লক্ষ করেছি: ওরা তাদের আশপাশের মানুষকে মানুষ মনে করে না, সব সময় একটা উচ্চম্মন্যতার বোধে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পাশের গাঁয়ের যে-ছেলেটি লেখাপড়া শিখে মোক্তার বা ডাক্তার বা মাস্টার হয়েছে, তারই বাপ হয়তো ছিল আশুজিয়া গ্রামের কোনো-না-কোনো তালুকদার বাড়ির পেয়াদা কিংবা বর্গাচাষী। তা না হলেও অন্তত তাদের রায়ত তো বটেই। আশপাশের গ্রামে দু'এক ঘর শরিফ মুসলমান কিংবা কায়স্থ ভদ্রলোকের বাস ছিল অবশ্যই। তবে এ-সব গাঁয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ আধিবাসীই ছিল চাষী, এবং চাষীদের অনেকেই আশুজিয়ার তালুকদারদের রায়ত। রায়তচাষীর ছেলেরা দু'পাতা ইংরেজি-বাংলা পড়ে বিদ্বান হয়ে যাবে, আর তালুকদার বাড়িতে এসে ফরাসে কিংবা চেয়ারে বসবে,—যে-কোনো তালুকদার-নন্দনের কাছে এ-অবস্থাটি ছিল অসহনীয়। সেই অসহনীয় অবস্থাটিকে কিছুটা সহনীয় করার চেষ্টাতেই হয়তো প্রতিনিয়ত ওরা সদ্যবিগত দিনগুলোর সুখস্মৃতির জাবর কাটতো।

উনিশ শো ছেচল্লিশ সালেও কোনো চাষী প্রজা বা রায়ত জুতো পায়ে কিংবা ছাতা মাথায় তালুকদার বাড়ির আশপাশ দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো না। কেউ গেলে তাকে জুতোপেটা বা ছাতাপেটা করা হতো। তালুকদাররা 'ভদ্রলোক'। জুতো পায়ে ছাতা মাথায় 'বাবু' হয়ে থাকার অধিকার একমাত্র তাদেরই। তাদের সেই নিরঙ্কুশ অধিকারের ক্ষেত্রটিতে 'ছোটলোক' রা অনধিকার প্রবেশ করবে, সেটি ভদ্রলোকেরা সহ্য করবে কেন?

ভদ্রলোকদের বৈঠকখানার আসন-বিন্যাসে সেই অধিকার-অনধিকারের সীমানাচিহ্ন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতো। ফরাসে বসতেন বাড়ির কর্তা তাঁর সমগোত্রীয় ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে। বাইরে থেকে অন্য কোনো ভদ্রলোক এলে বসতেন চেয়ারে। টুল, জলচৌকি, 'আলিসা' (এক

ধরনের লম্বা কাষ্ঠাসন) ইত্যাদি আসন নির্দিষ্ট থাকতো নিম্ন থেকে নিম্নতর বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্যে। আপন আপন স্তরের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের সীমা লঙ্ঘন করে উচ্চতর আসনে কেউ বসতে চাইলে তার শাস্তি ছিল অবধারিত।

আসনের পর তামাক খাওয়ার হুঁকো। ফরাসে থাকতো লম্বা নল লাগনো ফরসি হুঁকো। ফরাসে বসার অধিকারী যারা, না বললেও চলে, ফরসি হুঁকোতেও তাদেরই অধিকার। অন্য অন্য আসনের মানুষদের জন্যে থাকতো আলাদা হুঁকো। এ-সব আলাদা হুঁকোর মধ্যে চিহ্নিত থাকতো হিন্দুর জাতপাতের বিধিবিধান। ব্রাহ্মণের হুঁকোতে শূদ্রের মুখ লাগানো তো অসম্ভবই ছিল, শূদ্রদেরও জাতভেদে হুঁকোভেদ হতো। কায়স্থের হুঁকো তো একেবারেই পৃথক।

তামাক নিশ্চয়ই দেশজ বস্তু নয়, আর্য ঋষিরা তামাকের সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত ছিলেন না। নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ আমেরিকা থেকে এটি স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ইউরোপে নিয়ে আসেন এবং ইউরোপীয়দের কাছ থেকে আসে ভারতবর্ষে। মোগল সম্রাটদের মাধ্যমেই এ-দেশে হুঁকোয় তামাক খাওয়ার প্রচল ঘটে বলে ঐতিহাসিক সূত্রে আভাস পাওয়া যায়। রাজদরবার থেকে হুঁকো ও তামাক ক্রমে গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ও গেরস্তের দাওয়ায় নেমে আসে, চাষার সঙ্গে মাঠেও চলে যায়। দামি ফরসি হুঁকো বা আলবোলা সুলভ নারকেলী হুঁকোয় পরিণত হয়ে এদেশে এক ধরনের সর্বজনীনতা পেয়ে যায়।

এহেন তামাক ও হুঁকো ব্যবহারের নানা নিয়মকানুন ও এ-সম্পর্কীয় জাতপাতের বিধিবিধান হিন্দুর প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত থাকার কথা নয়। তামাক ও হুঁকো কোনোটাই 'দেবভাষা' সংস্কৃতের শব্দ নয়। প্রথমটি স্পেনীয় ও দ্বিতীয়টি আরবি ভাষা থেকে উপজাত। হুঁকোর প্রতিশব্দ 'আলবোলা'ও এসেছে ফার্সি থেকে। অর্থাৎ তামাক ও হুঁকো দুই-ই জাতে ম্লেচ্ছ। ম্লেচ্ছস্পর্শ বর্জন করাই তো ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বাভাবিক হতো! অথচ এই ম্লেচ্ছ তামাক কী করে ব্রাহ্মণের নিকট পরম আদরণীয় হয়ে উঠলো এবং তামাক সেবন তথা হুঁকো ব্যবহারের ব্যাপারটি জাতপাতের বিধানের অন্তর্গত হয়ে গেলো, সে-রহস্য ভেদ করা কঠিন। উনিশ শতকের কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে এটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের বালক পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্বখ্যাত হন) তাঁর বাবার বৈঠক খানায় নানা জাতের মানুষদের—বিশেষ করে মুসলমানদের—হুঁকোয় জোরে টান দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন 'জাত না মানলে কী হয়'। হিন্দুর ধর্ম যে বেদ-বেদান্তের পুঁথি-পুস্তক ছেড়ে ভাতের হাঁড়ি আর হুঁকোর জলে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সে-কথাতো তীব্র বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বহুবার তিনি বলেছেন। কিন্তু রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকল সংস্কারক, চিন্তক ও মনীষীর প্রয়াস নাগরিক হিন্দুসমাজের চিন্তায় ও আচরণে অনেক র‍্যাডিকেল পরিবর্তন নিয়ে এলেও গ্রাম বাংলার সমাজ-কাঠামোটি প্রায় অনড়ই থেকে গেছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের যে-কোনো একজন সাধারণ ছাত্রও জানে : ধনতন্ত্রী-উপনিবেশবাদী ব্রিটিশরা এদেশে ধনতন্ত্রের সুস্থ বিকাশ ঘটানোর বদলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'র মাধ্যমে নতুন ধরনের এক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই প্রবর্তন করেছে এবং সে-ব্যবস্থাই গ্রামসমাজের কাঠামোটিতে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে দেয়নি, অনভিজাত সাধারণ মানুষকে নানাভাবে দাবিয়ে রেখেছে। আশুজিয়ার মতো গ্রামগুলো ছিল আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-জাত নতুন সামন্ততন্ত্রেরই কেন্দ্র। সামন্ততন্ত্র সব সময়ই ধর্মকে তার নিজের মতো করে কাজে লাগায়। ধর্মের পুরনো বিধি-বিধানগুলোকে নতুন সামন্ততন্ত্রও, তাই, মানুষকে নিপীড়িত করার উপযোগী করে গড়েপিটে নেয়। পুরনো সামন্ততন্ত্র রাজাকে ঈশ্বরের

প্রতিভূ রূপে মান্য করার জন্যে ধর্মীয় অনুজ্ঞা তৈরি করে রেখেছিল। ব্রিটিশ আমলের নয়া সামন্ততন্ত্র সেই অনুজ্ঞারই আরো বিস্তার ঘটায়, একেক জন গ্রামীণ ভূস্বামীকেও দেবতা বানিয়ে তোলে। আর সে-ভূস্বামী যদি ব্রাহ্মণ হন তবে তো আর কথাই নেই। ব্রাহ্মণরা তো এমনিতেই শূদ্রের দেবতা, তার ওপর ভূস্বামী হলে তাঁর দেবত্ব দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ওই দেবত্বের জোরেই ব্রাহ্মণ ভূস্বামী প্রজা-শাসনের জন্যে জারি করেন এমন সব অনুশাসন, যেগুলো ধর্মীয় বিধানের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে ওঠে। অন্তত শূদ্র প্রজাদের কাছে তো বটেই। ফরাস থেকে টুল-জলচৌকি পর্যন্ত নানা স্তরের আসন-বিন্যাস, কিংবা তামাক ও হুঁকোর জাতভেদ, এ-রকম সব কিছুই শূদ্র প্রজার কাছে শাস্ত্রবিধানের মতোই মান্যতা পেয়ে যায়। ভূস্বামীর নাবালক সন্তানটিও অতিবৃদ্ধ প্রজার নিকট একান্ত সম্মানীয়, তাই তার সঙ্গে সেই প্রজাকে 'আপনি আজ্ঞে' করে কথা বলতে হবে। আর সেই নাবালক তার বাপের বয়সী প্রজাকেও যে 'তুই তোকারি' করবে, তাই হবে একান্ত স্বাভাবিক ও ন্যায্য।

ব্রিটিশ-সৃষ্ট নয়া সামন্ততন্ত্র আশুজিয়ার মতো এ-রকম অনেক গ্রামকে কেন্দ্র করেই একেকটি অচলায়তন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোনো অচলায়তনই চিরকালের জন্যে নিশ্ছিদ্র অচলায়তন হয়ে থাকে না, এর শক্ত পাঁচিলের এখানে-ওখানে অনেক ছোট বড়ো ফাঁক-ফোকর সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সেগুলো সৃষ্টি করে অচলায়তনের ভেতরের মানুষেরাই। কেউ কেউ তা সজ্ঞানেই করে, আর কেউ করে ফেলে নিজের অজান্তে। আশুজিয়া, নওপাড়া, বাড়রি, কাটিহালি—বর্তমান নেত্রকোনো জেলার এ-রকম অনেক গ্রাম যেমন ছিল সামন্ততন্ত্রের অচলায়তন, তেমনি এগুলোর ভেতর দিয়েই বয়ে গেছে আধুনিকতার মুক্তধারার সচল প্রবাহ। গাঁয়ে যাঁরা সারা বছর থাকতেন তাঁরা যতোই তালুকদারী মেজাজ দেখান না কেন, ওই তালুকদারদেরই ছেলে ভাই-পোরা বাইরে গিয়ে লেখাপড়া শিখে অন্যরকম মেজাজের অধিকারী হয়ে গেছেন। এঁদের অনেকে উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক বা সরকারি-বেসরকারি চাকুরে হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরপ্রবাসী হয়েছেন। কিন্তু এঁরা কেউই একান্ত অনিকেত হয়ে পড়েননি, গ্রামের মাটিতে তাঁদের শিকড় রয়েই গেছে। ছুটিছাটায় গাঁয়ে ফিরে এসে এঁদের অনেকেই সাধারণ রায়ত প্রজাদের সঙ্গে এ-রকম ভদ্র ও সহৃদয় আচরণ করেছেন যা ছিল তাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যা দেখে রায়ত-প্রজারা বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া রায়ত-প্রজার ছেলেপুলেদের শিক্ষিত ও আত্মসচেতন হয়ে ওঠার ব্যবস্থাও ওই উন্নাসিক তালুকদারদের ছেলে ভাই-পোদের হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে। তাঁরাই গাঁয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, পাবলিক লাইব্রেরি গড়েছেন। তাঁদেরই কেউ কেউ শহর ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে এসে স্কুলের মাস্টার হয়েছেন। এবং জয়চন্দ্র রায়ের মতো আদর্শবাদী ও হৃদয়বান মানুষরা শুধু মাস্টার হননি, মাস্টারিকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন। আশুজিয়া গ্রাম থেকে প্রথম গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন প্রসন্ন চক্রবর্তী। শুনেছি, গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট বলে—বিশ শতকের প্রায় শুরুর দিকে—সদ্যপ্রতিষ্ঠিত আশুজিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রসন্ন বাবুকে ঘটা করে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। তিনি ওকালতিও পাস করেছিলেন। কিন্তু ওকালতি না করে আশুজিয়া হাইস্কুলের মাস্টারিতেই জীবন কাটিয়ে দেন। জয়চন্দ্র বাবু, প্রসন্ন বাবু এবং আরো কয়েকজন দরদী শিক্ষকের হাতে শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই তো আশুজিয়ার আশপাশের গাঁয়ের রায়ত-কৃষকদের ছেলেপুলে।

শুধু ইস্কুল বা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা নয়, স্বদেশী আন্দোলনের বীজও গ্রাম এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আশুজিয়া-নওপাড়া-বাড়রির মতো তালুকদার-অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামের

শিক্ষিত উদ্যমী তরুণরাই। উনিশ শো বিশ-একুশ সালের ব্রিটিশ-বিরোধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল থেকে ছাত্রদের বের করেও নিয়ে এসেছিলেন এঁরাই। আবার এঁদেরই কেউ কেউ বোমা-বন্দুক মেরে ইংরেজ-তাড়ানোর বিপ্লবী আন্দোলনেও শরিক হয়েছিলেন। আরো পরে তো দু'একজন কম্যুনিস্টও বেরিয়ে এসেছিলেন এঁদের ভেতর থেকেই। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের দুর্গের ভেতরেই সামন্তবিরোধী চেতনা আস্তে আস্তে পাখা মেলেছিল।

তালুকদারদের শহর-প্রবাসী শিক্ষিত সন্তানদের হাত ধরেই নগর-সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদনও গাঁয়ে চলে এসেছিল। আশ্বিন মাসে পূজোর ছুটিতে সব প্রবাসীরা ঘরে ফিরতো, সারা গাঁ গম্‌গম্‌ করতো। খোলা মঞ্চে যাত্রা দেখে অভ্যস্ত গাঁয়ের মানুষরা পর্দাঘেরা 'থিয়েটারে' অন্য রকম স্বাদ পেতো। জারি-সারি-বাউল-ভাটিয়ালির সুরের ধারায় সাঁতার কাটে যারা, তালুকদার বাড়ির ছেলেদের গলায় তারা শুনতে পায় স্বদেশী গান ও আধুনিক গান। এ-সব গানের কথা ও সুর তাদের এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়।

মোট কথা, সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকফোকর গলিয়ে আধুনিকতার যে আলো এসে পড়ে, সে আলোতেই পাড়া গাঁয়ের সাধারণ মানুষ নিজের অবস্থা ও অবস্থানটিকে দেখে নেয়ার সুযোগ কিছুটা হলেও পেয়ে যায়।

পাকিস্তানের আসমানে তুই হেলাল যদি সে হবি

প্রসন্ন চক্রবর্তী-জয়চন্দ্র রায়দেরই ছাত্র ছিলেন সিংহের গাঁওয়ের বাউল কবি জালাল খাঁর পুত্র খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। আশুজিয়া হাইস্কুল থেকেই উনিশ শো চল্লিশে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। মুসলিম স্বাতন্ত্র্য আর পাকিস্তান-আন্দোলনের আবহের মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। কবির পুত্র কবি। বাপের সঙ্গে এটুকুই তাঁর প্রধান মিল। কবি বলেই অত্যন্ত সংবেদনশীল। অতিসংবেদনশীলতার জন্যেই বিরূপ পরিপার্শ্বের মধ্যে সারা জীবন স্বস্তি খুঁজে পাননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হতে হয়েছিল।

উনিশ শো পঞ্চাশ সালে তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয়, তখন তিনি অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ এক যুবক। মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তানকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলতে হবে—এই প্রত্যয় তাঁর চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে। মুসলমানের 'তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্য' সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। প্রচুর কবিতা লেখেন। ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মোফাখখারুল ইসলামদের কাব্যাদর্শই তখন তাঁর অন্বিষ্ট। যেখানে একটি প্রচলিত বাংলা শব্দই লাগসই হতে পারে, সেখানেও অপ্রচলিত আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে তাঁর আগ্রহ। একটি মাসিক পত্রে—সম্ভবত '*মাহেনও*'-এ—পড়েছিলাম তাঁর কবিতা 'হাম্‌দ'। 'হাম্‌দ' কথাটার অর্থই তখন আমি জানতাম না। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর অজস্র কবিতা ছাপা হলেও কোনো কাব্যসংকলন তিনি প্রকাশ করে যেতে পারেননি। তাঁর একমাত্র প্রকাশিত বই—'*নীল কপোত*'। এটি গানের বই। এ-বইয়ের গানগুলো রচনার পটভূমি তিনি অনেক পরে আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোনো এক পল্লীবালার প্রতি প্রেম থেকেই তাঁর এই গানগুলো জন্ম নিয়েছিল। '*নীল কপোত*'-এ ছাপা হয়েছিল বায়ান্নটি গান। বায়ান্নের মধ্যে সাতচিল্লশটিই প্রেমগীতি হলেও এই প্রেমসংগীতের বইয়ের শুরু হয়েছে কিন্তু পাঁচটি পাকিস্তানি গান দিয়ে। এবং সে-গানগুলো দুর্বোধ্য আরবি-ফার্সি শব্দে আকীর্ণ। ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

নীল কপোতের প্রথম গানটিই হলো :

পাকিস্তানের গুল্‌বাগে আজি বুল্‌বুলি দিল ডাক।
জমানে-সিয়ার বোরকা-নেকাব আজ খুলে দূরে
রাখ্‌॥
ঐ দেখ্‌ তোর কাফেলা চলেছে, তুই শুধু পড়ে
পিছে
গাফ্‌লাতি-ভরা নও জোয়ানীর দান তোর সব
মিছে,
হেলাল খচিত নিশান রাঙাতে তোর সব লহু
যাক্‌॥
পাকিস্তানের সঙ্গমে আজ জাহান নোয়ায় শির
নও রৌশনে খসে পড়ে ঐ আঁধারের জিঞ্জির
ফিরে চল্‌, ফিরে চল্‌,
ওরে বেদিশা পথের যাত্রী রাহী দল
সেরাতুল-মুস্তাকিমে ফিলে চল্‌...
দূর মঞ্জিলে দোলিয়ে উঠুক জীবনের ফলাফল
পাক কোরআনে অমলিন শিখা বুকে তোর
জ্বালা থাক্‌॥

নীল কপোতের কবি-গীতিকার খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমকে একদিন কথায় কথায় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, হেকিম ভাই, প্রেমগীতির সংকলনে ওই পাকিস্তানি গানগুলো জুড়ে দিলেন কেন? এতে কি সংকলনটির চরিত্র ভ্রষ্ট হয়ে যায়নি?'

আমার প্রশ্ন শুনে হেকিম ভাই হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন। হাসি থামলে বইয়ের টাইটেল পেজটি আমার সামনে মেলে ধরলেন।

'বইয়ের প্রকাশকালটি লক্ষ করো। ১৩৫৪ সাল। অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ১৯৪৭ সাল। অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্মের বছর। গানগুলো তো এর আগে কয়েক বছর ধরে লেখা। সে-সময়ে আমরা যে কী পরিমাণে পাকিস্তানি জোশে আক্রান্ত ছিলাম তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তখন আমাদের সকল প্রেমই পাকিস্তান-প্রেমের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমাদের নারীপ্রেমও সার্থক হয়ে উঠতে পারে কেবল মাত্র পাকিস্তান কায়েম হলেই—এই ছিল আমাদের ঈমান। কবি বা গীতিকার হিসেবেও আমি তো তখন এই ঈমানের ওপরই ভর করে ছিলাম। নীলকপোতের দুই নম্বর গানটিতেই দেখো নিজের কবিসত্তার প্রতি আমার আহবান-

পাকিস্তানের আসমানে তুই
হেলাল যদি সে হবি
খুলে দে রে তোর রুদ্ধ দুয়ার
হে চির উদাসী কবি।

পাকিস্তানের আসমানে হেলাল হওয়ার চেয়ে বড়ো কোনো বাসনা আমাদের তখন ছিল না।'

হ্যাঁ, হেকিম ভাই ঠিকই বলেছিলেন। চল্লিশের দশকে যে-সব বাঙালি মুসলিম সন্তান তারুণ্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলে পাকিস্তানের

আকাশে হেলাল হয়েই উঠতে চেয়েছিলেন। সে-সময়কার মুসলিম তরুণদের কেউই যে জাতীয়তাবাদী কিংবা কম্যুনিস্ট হননি, তা নয়। তবে তাঁদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। সিংহের গাঁওয়েরই পবিত্র দাস ছিলেন হেকিম ভাইয়ের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু পবিত্র দাস কম্যুনিস্ট হলেও হেকিম ভাইয়ের চিত্তে তখন কম্যুনিজমের আদর্শ মোটেই সাড়া জাগাতে পারেনি। বালি গ্রামের লড়াকু কম্যুনিস্ট কর্মী হান্নান মৌলবির সঙ্গেও তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল। হান্নান মৌলবিও তাঁকে কম্যুনিজমের অনুরাগী করে তুলতে পারেননি। মুসলমানের জন্যে পৃথক আবাস ভূমি চাই, সকল মুসলমানের খাঁটি মুসলমান হয়ে ওঠা চাই, মুসলমানী তাহজিব-তমদ্দুনের প্রতিষ্ঠা চাই—এ-রকম চিন্তাই হয়ে উঠেছিল তাঁর তখনকার সকল কর্মের চালিকা শক্তি। পবিত্র দাস কিংবা হান্নান মৌলবি যখন তাঁকে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলতেন, তাঁর সামনে ভবিষ্যতের শ্রমিকরাজ-কৃষকরাজের লোভনীয় চিত্র তুলে ধরতেন, সোভিয়েতের আকাশে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে যে লাল পতাকা তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন, তখন খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম নির্যাতিত মুসলমান সমাজের দুরবস্থার দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন, খোলাফায়ে রাশেদিনের সাম্যতন্ত্রের কথা স্মরণ করতেন, পাকিস্তান কায়েম হলেই যে সকল জুলুমের অবসান হবে—দৃঢ়ভাবে তেমন প্রত্যয় ব্যক্ত করতেন।

সেই প্রত্যয় থেকেই তিনি পাকিস্তান-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। স্বরচিত গান আর কবিতায় সেই প্রত্যয়েরই ভাষারূপ দিয়ে চলছিলেন। সিংহের গাঁও ও তার আশপাশের গ্রামের মুসলিম তরুণদের নিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চার একটি ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন—'আবেহায়াৎ সাহিত্য মজ্লিস'। '*নীল কপোত*'-এ তাঁর পরবর্তী বইয়ের বিজ্ঞাপন ছেপেছিলেন—"এই লেখকের 'শম্‌শাদ' অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ—শীঘ্রই বের হবে।" (অবিশ্যি 'শম্‌শাদ' বা তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থই আর বের হয়নি)। 'ময়মনসিংহ'কে তিনি সেকালের *আজাদ, মোহাম্মদী* ও অন্যান্য পাকিস্তানবাদী পত্রিকার অনুসরণে লিখতেন—'মোমেনশাহী'। আবেহায়াৎ, মজ্লিস, শম্‌শাদ, মোমেনশাহী—এ-সব শব্দ প্রয়োগের মধ্যে ছিল মুসলিম স্বাতন্ত্র্য-চেতনারই স্পষ্ট প্রকাশ।

হেকিম ভাইয়ের এই স্বাতন্ত্র্য-চেতনাটি জন্ম নিয়েছিল মূলত আশুজিয়ার ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের সঙ্গে তাঁর বাবা জালাল উদ্দিন খাঁর প্রেস্টিজের লড়াই থেকে। সে-লড়াইয়ে, স্বাভাবিকভাবেই, তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন একেবারে কিশোর বয়সে।

জালাল খাঁর পৈতৃক বাড়ি সিংহের গাঁওয়ে ছিল না। তিনি এখানে এসেছিলেন ঘরজামাই হয়ে নেত্রকোনারই অন্য একটি গ্রাম আসদহাটি থেকে। সিংহের গাঁওয়ের হাসমত আলী তালুকদার ছিলেন তাঁর শ্বশুর। হাসমত আলীর প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং নামের শেষে 'তালুকদার' পদবী থাকলেও আশুজিয়ার ব্রাহ্মণ ভূস্বামীরা তাঁকে নিজেদের সমান স্ট্যাটাস দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা বলাই শিমুল গ্রামের সৈয়দ পরিবার ছাড়া এলাকার আর কোনো মুসলমান পরিবারের আভিজাত্য স্বীকার করতেন না। অব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যেও নগুয়া, রামপুর, চন্দনকান্দি ও মঙ্গলসিদ্ধি গ্রামের কয়েকটি কায়স্থ তালুকদার পরিবারকে মাত্র তাঁদের সঙ্গে ফরাসে বসার অধিকার মঞ্জুর করতেন। এঁদের বাইরে আর কাউকে নয়।

হাসমত আলী তালুকদারের জামাই এবং পৈতৃকসূত্রে ও শ্বশুরসূত্রে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক—জালাল খাঁ এ-অবস্থাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। আশুজিয়ার ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের মতো তাঁরও ছিল নীল রক্তের গর্ব। তিনিও তো ব্রাহ্মণের বংশধর। তাঁর সপ্তম পূর্ব পুরুষ ছিলেন শচীন্দ্র শর্মা। আশুজিয়ার পাঁচ মাইল উত্তরের মনাংগ্রামের অধিবাসী এই বিশিষ্ট

ব্রাহ্মণ সৈয়দ খোয়াজ নামে একজন সুফি সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ্য বিধানে জাতিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। এবং বাধ্য হয়েছিলেন মুসলমান হতে। ব্রাহ্মণ শচীন্দ্র শর্মারই মুসলমানি নাম হয়েছিল সুলতান উদ্দিন খাঁ। সেই সুলতান উদ্দিন খাঁর বংশধর কিন্তু নীলরক্তের গর্বটাকেই জীবনের সর্বসাধ্যসার করে তোলেননি। জালাল খাঁ বরং সব রকম জাত ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করেছেন, বলেছেন, 'ধর্ম হতে এই জগতে দলাদলিই কেবল সার'। ধর্মের দলাদলি আর জাতের গৌরব—দুয়ের প্রতিই ছিল তাঁর সীমাহীন বিরূপতা। সে-বিরূপতা থেকেই তিনি বাউল হয়েছেন, বাউল হয়ে গান রচনা করেছেন—

জাতিধর্ম বলে কারে—
জাতে জাতে যার তার মতে, গেছে ধর্ম বিভাগ
করে।
যে বলুক যেমন আমায়, ধর্ম হবে কার্যতায়
নিরাকার চৈতন্য প্রভু, ভেদ নাহি জাত
বিচারে॥
সৃষ্টিকর্তা সবার একজন, সমান দৃষ্টি করে—
একভিন্ন দ্বিতীয় নাহি, নহেরে গণ্ডীর ভিতরে॥

তাছাড়া কেবল ব্রাহ্মণ শচীন্দ্র শর্মার বংশধর বলেই গর্ব করার কোনো প্রয়োজন জালাল খাঁর ছিল না। কারণ তাঁর নিজস্ব অর্জনও তো ছিল যথেষ্ট।

আঠারো শো চুরানব্বইয়ে তার জন্ম। ছেলেবেলায় কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়েছেন, স্কুলেও পড়েছেন ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত। ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পরিচিত হয়েছেন মরমী ধর্মতত্ত্ব আর হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনার সঙ্গে। নিজের রচিত গানে গানে ছড়িয়ে দিয়েছেন উদার মানবপ্রেমের বাণী। অসংখ্য তাঁর শিষ্য ও গুণগ্রাহী। দেশ-বিদেশের লোকসাহিত্য-গবেষক ও ফোকলোর-বিশেষজ্ঞরা তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেছেন, তাঁর রচনার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু বাউল গান রচনাতেই নয়, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জালাল খাঁ পিছিয়ে ছিলেন না। উনিশ শো বিশ/একুশ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিরও অংশভাক্ হয়েছিলেন তিনি।

এহেন স্বনামধন্য গুণী, সম্পদ্‌শালী ও ব্রাহ্মণ্য গৌরবের অংশীদার জালাল খাঁ যে নিজেকে আশুজিয়ার ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের সঙ্গে ফরাসে বসার অযোগ্য বিবেচনা করবেন না, তেমনটিই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আশুজিয়ার লেদুবাবুর বাড়িতে যেদিন তাঁর সেই স্বাভাবিক অধিকারটিই অস্বীকৃত হলো, ফরাস থেকে উঠে আসতে বাধ্য হলেন, সেদিন সে-অপমানের ব্যথা জালাল খাঁর চেয়ে তাঁর পুত্র খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের বুকেই বেশি করে লেগেছিল। পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু করে কয়েক বছরের মধ্যেই আমি হেকিম ভাইয়ের একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি। তাঁর জন্ম উনিশ শো উনিশে, আর আমার উনিশ শো ছত্রিশে। অর্থাৎ খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম আমার সতেরো বছরের অগ্রজ। তাঁর কাছে যে আমি অনুজের স্নেহ পেয়েছিলাম, সেটি অবশ্যই অস্বাভাবিক ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিলাম তাঁর শিষ্যও। কিন্তু যেটি একান্ত স্বাভাবিক ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিলাম তাঁর শিষ্যও। কিন্তু যেটি একান্ত চমকপ্রদ সেটি হচ্ছে আমার পক্ষে তাঁর বন্ধু হয়ে যাওয়া। অথচ, আমাদের মধ্যে সেই চমকপ্রদ ব্যাপারটিই ঘটেছিল। প্রথম পরিচয়ের অল্পদিন পরেই আমি তাঁর বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। অন্তত উনিশ শো চুয়ান্ন সাল থেকে যে আমার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর একজনও ছিল না, সে-কথা

আমি হলফ করে বলতে পারি। একই সঙ্গে আমি ছিলাম তাঁর স্নেহাস্পদ অনুজ, জিজ্ঞাসু শিষ্য ও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আমার এই শ্রদ্ধেয় অগ্রজ, ধীমান্ গুরু ও দরদী বন্ধুর ভাবনাচিন্তা এবং কর্মপ্রয়াসের ভেতর পাকিস্তানের জন্মকে আমি অনেক গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। আবার এক সময় পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটানোর কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তাঁকে যুক্ত হতে দেখেছি। মৃত পাকিস্তান যখন স্বাধীন বাংলাদেশের ঘাড়ে ভূত হয়ে চেপে বসে তখন তিনি হয়ে পড়েছিলেন শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত।

তবে সে-সব কথা আপাতত উহ্য রেখে হেকিম ভাইয়ের উনিশ শো পঞ্চাশ/একান্ন সালের ভূমিকাটিকেই শুধু স্মরণ করছি। সাতচল্লিশের অনেক আগেই যিনি পাকিস্তানের বন্দনা গান রচনা করেছিলেন, একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একে অর্থবহ করে তোলবার জন্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন। সে-সময়ে তাঁর চোখে গভীর আশাবাদের ঝিলিক দেখেছি। সেই আশাবাদ নিয়েই অজপাড়া গাঁয়েও তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। যে আশুজিয়া হাইস্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন, সেই স্কুলটিকে পুনর্গঠনের জন্যে তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সে-সময়ে তাঁর পিতা জালাল উদ্দিন খাঁ আশুজিয়া হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাস্তবে কিন্তু অত্যন্ত সৃজনশীলভাবে সেক্রেটারির কাজ করে যাচ্ছিলেন পুত্র খান মোহম্মদ আবদুল হাকিমই।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড আশাবাদী হলেও হেকিম ভাই কিন্তু পঞ্চাশ সালেই (হয়তো-বা তারও আগে থেকেই) পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নেতাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। পাকিস্তান যে-রকম আদর্শ রাষ্ট্র হবে বলে তাঁরা স্বপ্ন দেখতেন, সে-স্বপ্ন যে এ-সব নেতাদের হাতে কিছুতেই বাস্তব হয়ে উঠবে না, এ-রকম সিদ্ধান্তে সে-সময়েই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবু আশা করতেন যে নিবেদিত প্রাণ তরুণদের নিয়ে পাকিস্তানে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগকে ফিরিয়ে আনা যাবে। সে-আশাতেই যোগ দিয়েছিলেন তমদ্দুন মজলিসে, এবং সিংহের গাঁওয়েও মজলিসের শাখা গড়ে তুলেছিলেন।

তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তি ঘটতে অবিশ্যি আরো কিছুটা সময় লেগেছিল।

আপনি, তুমি, তুই ও ভাববাচ্য

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যখন শূদ্র ও মুসলমান রায়ত-প্রজার ছেলেপুলেদের অনেকেই লেখাপড়া শিখে ফেললো, কেউ কেউ নানা 'ভদ্র' জীবিকাও জোগাড় করে নিলো, তখন ওদের সঙ্গে আভিজাত্যগর্বী তালুকদাররা কেমন ব্যবহার করতো? তখনো কি তালুকদার বাড়ির পুঁচকে ছেলেটিও রায়ত-প্রজার বাড়ির শিক্ষিত যুবকটিকে 'তুই তোকারি' করে কথা বলতো?

এ-প্রশ্নের সহজ উত্তর দেয়া খুবই কঠিন। তালুকদারদের জন্যেও প্রশ্নটি ছিলো ভীষণ নাজুক। একজন ডাক্তার বা মাস্টার বা ছোট চাকুরেকেও—এমন কি যে-ছাত্র স্কুলের উঁচু ক্লাসে বা কলেজে পড়ছে তাকেও—নিশ্চয়ই 'তুই' বলে সম্বোধন করা যায় না। যে ছেলে শিক্ষিত হয়ে গাঁয়ের বাইরে মানমর্যাদা পাচ্ছে তার বাপকেই-বা 'তুই তোকারি' করা যায় কী করে? এবং সে-বাপ একেবারে গোমূর্খ ও তালুকদারের বর্গাচাষী হলেও? অথচ, গাঁয়ের মানুষের কাছে যে-

ভূস্বামীটি রাজারই প্রতিভূ, তাঁর বা তাঁর পরিবারের যে-কারো পক্ষে একজন প্রজা বা প্রজার ছেলেকে 'আপনি' বলা তো অসম্ভবই, 'তুমি' বলাটাও রীতিমত আত্ম-অবমাননাকর! বাংলা সর্বনাম 'আপনি, তুমি, তুই' নিয়ে গ্রামীণ ভূস্বামীরা একসময়ে বড়ো বিব্রতকর অবস্থার মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলো। পুরনো ভাবনা ও অভ্যাস ছাড়া যেমন কঠিন, নতুন বাস্তবকে মেনে নিয়ে ভাবনায় ও অভ্যাসে পরিবর্তন আনাও তাদের জন্যে হয়ে পড়েছিলো তেমনি মর্মান্তিক।

পুরনো অভ্যাসের অনুবর্তন করতে গিয়ে কখনো কখনো তাদের বেশ রামধাক্কা খেতে হয়েছে, এবং সে-ধাক্কার টাল সামলাতে গিয়ে এখানে-ওখানে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে অনেক বাড়তি যন্ত্রণাও সইতে হয়েছে। রায়ত-প্রজা কিংবা অনভিজাত কোনো মানুষের শিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানী পুত্রকে অভ্যাস মতো 'তুই' সম্বোধন করে কোনো কোনো তালুকদারের যে ল্যাজে গোবরে অবস্থা হয়েছে, এ-রকম গল্প অনেক শুনেছি। আমার হেকিম ভাইকে (অর্থাৎ বাউল কবি জালাল খাঁর পুত্র খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম) নিয়েও এমন একটি ঘটনার কথা শুনেছি। সেটি আমাকে বলেছে হেকিম ভাইয়ের ছেলে গোলাম ফারুক। সে শুনেছে তার বাবার মুখেই।

হেকিম ভাই একদিন বিকেলে তাঁদের বাড়ির পিছনে 'ভুইগ্যা'র পুলের ওপর তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বসে গল্পগুজব করছিলেন। এ-সময়েই আশুজিয়ার পরাক্রান্ত তালুকদার জগদীশ চক্রবর্তী সাইকেলে চড়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাইকেল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন 'কিরে হেকিম, তোর বাবা বাড়িতে আছে?' হেকিম ভাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'তোর দরকার থাকলে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখ'।

জগদীশ চক্রবর্তীর মুখের ওপর কেউ এ-রকম উদ্ধত বাক্য উচ্চারণ করতে পারে, তা ছিলো সকলের কল্পনারও বাইরে। অথচ এ-রকম অকল্পনীয় ঘটনাটিই ঘটলো। বিষয়টি জালাল খাঁর কানে গেলে তিনি অবশ্যই তাঁর দুর্বিনীত পুত্রকে যথারীতি তিরস্কার করেছিলেন, পুত্রের আচরণের জন্যে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন। তবে যুবক আবদুল হাকিম নিশ্চয়ই সেদিন মুসলমান রায়ত-প্রজাদের কাছে 'বাপের বেটা' বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। আর তালুকদার গোত্রের লোকেরা ক্ষোভে অপমানে আক্রোশে কেবলই ফুঁসেছে। বুঝে নিয়েছে : যুগ বদলে যাচ্ছে।

সত্যি সত্যিই যুগ বদলে যাচ্ছিল সেই উনিশ শো তেতাল্লিশ সালেই। সেটি মহা মন্বন্তরের বছর। হিন্দু পুরাণের মতে মন্বন্তরই তো আনে যুগান্তর।

খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম তখন তেইশ/চব্বিশ বছরের পূর্ণ যুবক। তিন বছর আগে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজের ছাত্র হয়েছেন, এবং সে-বছরই লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পাস হয়ে গেছে। সেই পাকিস্তান প্রস্তাব নিয়ে তখন তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ। সে-উৎসাহই সঞ্চার করে দেয়ার চেষ্টা করছেন আশপাশের সকলের মধ্যে। আশুজিয়ার তালুকদারদের শিক্ষিত ছেলেদের অধিকাংশই কংগ্রেসী। কংগ্রেসীরা ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মশগুল। হিন্দু তালুকদারদের ছেলেদের পক্ষে কংগ্রেসী হয়ে ইংরেজ-তাড়ানোর স্বপ্ন দেখাটা ছিলো একান্তই স্বাভাবিক। কারণ, তারা জানতো : ইংরেজ তাড়ালেই তাদের সামনে আর কোনো মনিব থাকবে না, তারা নিজেরাই হবে সার্বভৌম মনিব। কিন্তু জালাল খাঁর ছেলে আবদুল হাকিমের বিবেচনা তো ছিলো অন্য রকম। ইংরেজ চলে গেলেও মনিব হয়ে থাকবে লেদু বাবু আর জগদীশ বাবুর ছেলেরা। তখন বরং তাদের সেই মনিবত্ব আবদুল হাকিমদের ওপর নিরঙ্কুশ হয়ে চেপে বসবে। ওই মনিবদেরই হুকুমবরদারি

করতে হবে জিন্দেগিভর। কাজেই, আশুজিয়ার তালুকদারদের ছেলেরা ইংরেজ শাসনমুক্ত অখণ্ড ভারতবর্ষে যে নবযুগের স্বপ্ন দেখে, সেটি সিংহের গাঁওয়ের জালাল খাঁর ছেলের জন্যে মোটেই সুখ স্বপ্ন নয়। ইংরেজরা এদেশের মানুষকে শাসন, শোষণ ও উৎপীড়ন করছে—শিক্ষিত তরুণ এবং সংবেদনশীল কবি খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম এ-ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন না নিশ্চয়ই। তবু ইংরেজের শাসন-শোষণ-উৎপীড়ন তাঁর কাছে ছিলো পরোক্ষ, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি আশুজিয়ার তালুকদারদের শাসন-শোষণ উৎপীড়নমূলক আচরণ। তবে ওদের সে-আচরণ হেকিম ভাইদের ওপর যে পুরোপুরি প্রত্যক্ষ ছিলো না, সে-কথাও ঠিক। হেকিম ভাই তো আর রায়ত-পরিবারের ছেলে ছিলেন না, কিংবা তাঁর বাবা ছিলেন না তালুকদারদের বর্গাচাষী। তাই তাঁদের ওপর প্রত্যক্ষ উৎপীড়নের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মানসিক উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পায়নি হেকিম ভাইদের খাঁ-পরিবারও। তালুকদারদের অহেতুক অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য হেকিম ভাইকে মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত করেছে। তা ছাড়া হেকিম ভাই তো ছিলেন এমন কবিপ্রাণের অধিকারী একজন মানুষ, অনেক পরোক্ষ উৎপীড়নও যাঁর প্রাণে প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছে। তাঁর প্রতিবেশী রায়তপ্রজাদের প্রতি ভূস্বামীদের যে-সব অমানবিক আচরণ তিনি দেখেছেন, সে-সবও তাঁকে উত্তেজিত করে তুলেছে। ওই সব প্রতিবেশী রায়ত-প্রজাদের 'মুসলমান' পরিচয়টি তাদের সঙ্গে তাঁকে একাত্মবোধে সংযুক্ত করেছে, মুসলমানী স্বাতন্ত্র্য-চেতনা তাঁকে আশুজিয়ার হিন্দু তালুকদারদের থেকে পৃথক করে নিয়েছে, তালুকদারদের ছেলেদের 'স্বাধীন' ভারতের বিপরীতে তাঁকে 'আজাদ' পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছে, পাকিস্তান কায়েমের মধ্যেই তিনি সকল সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। এই মনোভঙ্গি থেকেই তিনি এ-সময় গান লিখেছেন-

চাই আজাদী মেরে পাকিস্তান।
দ্বীনের লাগি মুসলিম তুমি
জান দেওরে কোরবান॥
জাগিলো তুফান, এলোরে দুর্দিন
জুলুমবাজির উদ্যত সঙ্গীন
এক হওরে আজি
জোম্‌লা মুছলমান॥
রক্ষিতে জান্‌-মাল ইজ্জত হুরমত
অধরে তুলে নাও জেহাদী সরবত,
হবে গাজী নয় তো পাবে
শহিদী ফরমান॥

নিজে অবশ্যই জেহাদের ময়দানে গিয়ে গাজী অথবা শহিদ হওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না, তবে 'জুলুমবাজির উদ্যত সঙ্গীন' তিনি জগদীশ চক্রবর্তীর মতো তালুকদারদের হাতেই দেখতে পেয়েছিলেন। ওদের 'তুই তোকারি'র জবাব তুই তোকারি করে দিতে পারাটা তাঁর কাছে, তাই জেহাদের মতোই ছিলো। সে-জেহাদে যে তিনি গাজী হয়েছিলেন, এ-কথা মানতেই হবে। আর সেই জেহাদী জোশে যে তাঁর আশপাশের মুসলামন রায়ত-প্রজারাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলো, সে-কথাও না-মানার উপায় নেই।

এ-রকম জেহাদী জোশের সামনে প্রতিপক্ষ তালুকদাররাও রণকৌশল পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিলো। তাদের প্রত্যক্ষ রায়ত-প্রজা কিংবা অনভিজাত মুসলমান ও শূদ্রের শিক্ষাভিমানী

লেদের তারা 'তুই' বলা নিরাপদ মনে করছিলো না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তাদের 'আপনি' 'তুমি' বলতেও রাজি ছিলো না। তাই, নিরাপত্তার জন্যে আপনি, তুমি বা তুই—মধ্যম রুষের এই তিন সর্বনামের একটিরও ধারে কাছে না গিয়ে তারা আশ্রয় নিলো ভাববাচ্যের র্গে। জানি না, ব্যাকরণ বই খুলে ভাববাচ্যের অধ্যায়টা তারা খুব ভালো করে পড়ে নিয়েছিলো কনা! তবে এটুকু জানি যে, ব্যাকরণ পড়ুক আর নাই পড়ুক, ভাববাচ্যের প্রয়োগে তারা একান্ত নিপুণ হয়ে উঠেছিলো। 'আজকাল কী করা হয়?' 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?' 'কোথায় যাওয়া হবে?' 'এখানে থেকে গেলে হয় না?'—এ-রকম বাক্য প্রয়োগ করে 'আপনি তুমি তুই'-এর ঘটিলতা তারা কৌশলে এড়িয়ে গেলো।

কিন্তু তাতে কী হবে? যাদের এড়িয়ে যাবার জন্যে এ-কৌশল, তাদের দৃষ্টি কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া গেলো না। তারা বরং এই কৌশল পরিবর্তনের মধ্যে অভিজাত্যগর্বী ভূস্বামীদের পরাজয় ও নিজেদের বিজয়ই প্রত্যক্ষ করলো, এক ধরনের কৌতুক ও হাস্যরসের উপাদান পেলো এবং বিজয়ীর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলো।

তবু এ-কথাও সত্য : তালুকদাররা আপন মান বাঁচাবার প্রয়োজনে যাদের প্রতি ভাববাচ্য প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলো, তাদের অধিকাংশই কিন্তু বিত্তহীন পরিবারের সন্তান নয়। এদের প্রায় সবাই এসেছে সচ্ছল কৃষক পরিবার থেকে। আর এদের ভেতর শূদ্রদের চেয়ে মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশি। কৃষি জমির মালিকানাই তাদের সচ্ছলতার উৎস। এক সময় পাটের দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় তাদের সচ্ছলতায় নতুন মাত্রার যোগ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় আত্মচেতনা ও আত্মসম্মান বোধ। এবং সেই সঙ্গে মুসলামানত্বের বোধও। মুসলমানত্বের বোধ থেকেই পাকিস্তানের স্বপ্ন। গাঁয়ের এই সচ্ছল মুসলমানদের চোখে পাকিস্তানের স্বপ্ন সঞ্চার করে দিয়েছিলেন খান মোহম্মদ আবদুল হাকিমের মতো স্বাপ্নিকরাই। প্রত্যেক গাঁয়েই দু-একজন করে এ-রকম স্বাপ্নিকের দেখা মিলতে লাগলো।

শুধু সচ্ছল মুসলমানরাই নয়, পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো গাঁয়ের ভিটেমাটিহীন মুসলমান চাষী ও ক্ষেতমজুররাও। সিংহের গাঁয়ের খাঁ-বাড়ির আশেপাশে তো এমন বিস্তর মুসলমানের বাস। আশুজিয়ার তালুকদারদেরই তারা মনিব বলে জেনে ও মেনে এসেছে এতোকাল। চিরকাল তারা থেকেছে মনিবের 'ডাকের আগে খাড়া'। মনিব-বাড়ি থেকে যখনই কোনো কাজের ফরমাস এসেছে, তখনই তারা নিজের কাজ ঠেলে রেখে মনিবের হুকুম তামিল করেছে। এর অন্যথা করা যেতে পারে এমনটি তারা ভাবেও নি কোনোদিন। অথচ এখন তারা শুধু তা ভাবলো না, কাজেও করলো। জালাল খাঁর ছেলে আবদুল হাকিমই তাদের তেমন ভাবনা ভাবালেন ও তেমন কাজ করালেন। অবাক্ হয়ে তারা দেখলো : আবদুল হাকিমের পরামর্শে মনিবের হুকুম তামিল না-করলে মনিবরা তাদের কিছুই করে না বা করতে পারে না। এ-রকম দেখে শুনে আস্তে আস্তে তারা আশুজিয়ার তালুকদার বাড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে আনুগত্যের দৃষ্টি দিলো সিংহের গাঁয়ের খাঁ বাড়ির দিকে। নিজেদের মুসলমান পরিচয় সম্পর্কে যেন হঠাৎ করে তারা সচেতন হয়ে উঠলো। স্বপ্নের ঘোরেই যেন চিৎকার করে বলতে লাগলো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'—কথাটার অর্থ বুঝুক আর না-ই বুঝুক।

গ্রামবাংলায় শূদ্র প্রজার জীবনমান ও মান-অপমান

আশুজিয়ার মতো নওপাড়াও ছিল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের একটি গ্রাম। আশুজিয়ার চেয়ে নওপাড়া আয়তনে অনেক বড়ো। আসলে পৃথক পৃথক নামের নয়টি পাড়ার সমষ্টিই এই নওপাড়া গ্রামটি।

এই নওপাড়াতেও আমি ছেলেবেলায় অনেকবার গিয়েছি। আশুজিয়ার মতো একই দৃশ্য দেখেছি ও একই রকম কথা শুনেছি। বুঝেছি, বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সামন্ততন্ত্রের যে অচলায়তনগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোর প্রকৃতি একই রকম। আবার এ-ও জেনেছি: সব অচলায়তনের পাঁচিলেই থাকে ছিদ্র, সেই ছিদ্রগুলো আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে, অচলায়তনের বাসিন্দাদেরই কেউ কেউ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এগুলোকে বড়ো করে তোলে এবং বাইরেরও অনেকে এসে হাত লাগিয়ে এক সময় গোটা পাঁচিলটাকেই ভেঙে ফেলে।

দৈত্যপুরীর প্রহলাদের মতোই নওপাড়া থেকে বেরিয়ে আসেন মহাদেব সান্যাল। সিংহের গাঁওয়ের খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের মতোই নওপাড়ার মহাদেব সান্যালও আমার সতেরো বছরের অগ্রজ এবং অগ্রজ হয়েও বন্ধু। আমার এই অগ্রজপ্রতিম বন্ধু একান্ত শুভানুধ্যায়ী মানুষটির কাছ থেকেও গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের ভেতর মহলের অনেক খবর শুনতে পেয়েছি।

কৃষ্ণসুন্দর সান্যালের পুত্র মহাদেব সান্যাল নওপাড়া হাই স্কুলে যখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র তখনই যুক্ত হয়ে পড়েন ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে। নওপাড়ারই সুধাংশু রায় স্থানীয় অনুশীলন সমিতির নেতা। তাঁরই তত্ত্বাবধানে গাঁয়ে গড়ে ওঠে যুবসংগঠন এবং যুবসংগঠনের পরিচালনায় ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার। ব্যায়াম করে সুস্থ সুঠাম দেহ গঠন আর বই পড়ে মনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তোলাই ছিল অনুশীলন সমিতি-পরিচালিত ব্যায়ামাগার ও পাঠাগারের লক্ষ। চূড়ান্ত লক্ষ ইংরেজ বিতাড়ন।

অনুশীলন সমিতির শিক্ষায় ইংরেজ-বিতাড়নের চিন্তা মাথায় নিয়েই মহাদেব সান্যাল বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। উনিশ শো ছত্রিশ সালে ম্যাট্রিক পাস করে গেলেন কলকাতায়। কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারি করলেন, ছাপাখানার কাজ শিখলেন, ইনসিওরেন্স কোম্পানির চাকরি নিলেন, এবং এ-সবের মাঝেই কম্যুনিস্ট নেতাদের সংস্পর্শে এসে এক সময় আগেকার চিন্তাভাবনার খোল-নলচে বদলে ফেলে কম্যুনিস্ট হয়ে গেলেন। নওপাড়া গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত প্রথম কম্যুনিস্ট।

এরপর গাঁয়ে ফিরে এসে যে-চোখ দিয়ে গাঁয়ের মানুষদের জীবন এবং নিজের গুরুজনদের আচার আচরণ দেখলেন সে চোখ কম্যুনিস্টের। আগে যা দেখতেন না এখন কম্যুনিস্টের চোখ দিয়ে তা দেখতে পান। আগে যে-রকম দেখতেন এখন সে-রকম দেখেন না।

তাঁর মামার বাড়িও ছিল নওপাড়া গ্রামেই। এবং, স্বভাবতই, মামারাও ছিলেন সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে অতি সচেতন। হিন্দুত্ব রক্ষণের লক্ষ নিয়েই মহাদেব বাবুর বড় মামা সতীশ চন্দ্র রায় হয়েছিলেন কট্টর হিন্দু মহাসভাপন্থী। শুধু পন্থী নয়, রীতিমত নেতা। নেত্রকোনা মহকুমা হিন্দুমহাসভার সভাপতি। অন্য মামারাও ভূস্বামিত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে কম যান না। মামাদের সঙ্গে ভাগ্নে মহাদেব সান্যালের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলে কোদালকে কোদাল বলতে মহাদেব বাবু কোনোদিনই ইতস্তত করেন না। বিশেষ করে কম্যুনিস্ট হয়ে ভূস্বামীদের শোষণ নিপীড়ন ও বর্ণহিন্দুদের সংকীর্ণতার নিন্দায় তো তিনি

রীতিমত উচ্চকণ্ঠ। তাঁর মুখেই শুনেছি তাঁর মেজোমামা বঙ্কিম রায়ের কথা। বঙ্কিম রায়কে একদিন এক কায়স্থ প্রজা জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করেছিল। মুখে অবিশ্যি বলেছিল, 'প্রণাম কর্তা'। এতে ব্রাহ্মণ বঙ্কিম রায় তো ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন, হয়ে উঠলেন ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত। তাঁর প্রশ্ন : এতো স্পর্ধা ওই শূদ্রটা পায় কোথায়? শূদ্র ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে—এই চিরকালের বিধান। আর এ-ব্যাটা কিনা সোজা খাড়া হয়ে থেকে হাত জোড় করে নমস্কার জানায়; আরে, এ-রকম নমস্কার বিনিময় তো হয় সমানে সমানে,—ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে কিংবা শূদ্রে শূদ্রে। বর্ণশ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ তাকে প্রণামের বদলে যদি নমস্কার জানায় শূদ্র ব্যাটা, তবে তো একে ইয়ারকি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই ইয়ারকির জন্য বেয়াদব শূদ্রটি শুধু মাপ চেয়ে রেহাই পায়নি, জুতাপেটা হয়ে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের স্মৃতির বিধানে কায়স্থরা শূদ্র হলেও সৎ শূদ্র। কাজেই কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণের আচরণ এতো কঠিন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের বিধানের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রীয় অর্থশাস্ত্রের বিধান যুক্ত হয়ে অবস্থাটাকে আরো জটিল করে তুলেছিল। কায়স্থ হলেই যে সবাই সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তাতো হতে পারে না। যে-সব কায়স্থ কায়িক শ্রমে নিয়োজিত, বিত্তহীন ও সহায়সম্বলহীন, যারা বেঁচে থাকার জন্য ব্রাহ্মণ বৈদ্য কিংবা অন্য কোনো কায়স্থ ভূস্বামীর দয়ার ওপর নির্ভরশীল, যারা ওই ভূস্বামীদের নানকার প্রজা, তারা স্মৃতির বিধানে সৎশূদ্র হলেও সামাজিক বিচারে বংশানুক্রমিকভাবেই হেয়। এমন কি ওরা লেখাপড়া শিখে 'ভদ্র' জীবিকা অবলম্বন করলেও ভূস্বামী 'ভদ্রলোক' শ্রেণী তাদের ভদ্রলোকত্ব স্বীকারে রাজি হতো না। কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত ভূস্বামীরাও গতরখাটা ও তালুকদারদের করুণা-নির্ভর কায়স্থ প্রজাদের প্রতি তো বটেই, তাদের শিক্ষিত সন্তানদের প্রতিও যে অমানবিক আচরণ করতো, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বিলাত প্রবাসী প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

নীরদবাবু কিশোরগঞ্জের বনগ্রামের কায়স্থ ভূস্বামী চৌধুরী পরিবারের সন্তান। কৈশোরের স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন,—

"১৯১৩ সনে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া স্কুলে পড়ি, গ্রীষ্মের ছুটিতে বনগ্রামে আসিয়াছি, অন্য দুই-একজন আত্মীয়ও আসিয়াছেন, তাঁহারা কাজ করেন। তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য পাশের গ্রাম হইতে তাঁহাদের এক পুরাতন সহপাঠী আসিলেন। তাঁহার নাম সতীশ দে, বনগ্রামের হাইস্কুলে তিনি তখন শিক্ষকতা করিতেন। তিনি কলিকাতায় এক মেসে তাঁহাদের সঙ্গে অন্য সহপাঠী বা সহকর্মীর মতই থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাকে আমাদের বড় আটচালার বৈঠকখানায় অন্য ভদ্রলোকের মত ফরাসেই বসানো হইল।। বাড়ির অন্য বালকেরা আমার মত ও আমার দাদার মত কলিকাতার অনাচারে বংশের গৌরব বিস্মৃত হয় নাই, তাহারা গিয়া গৃহিণীদের খবর দিল যে, সতীশ দে ফরাসে বসিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে যখন আমি ভিতরে গেলাম তখন দেখি গৃহিণীরা সিংহীর মত গর্জন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তর্জন করিয়া বলিলেন, 'তোরা সতীশ দে কে ফরাসে বসিয়েছিস!' আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাতে কি হয়েছে।' ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর আসিল, 'কি হয়েছে? আমাদের ভাণ্ডারীর নাতি এসে আমাদের ফরাসে বসবে?' সত্যই সতীশ বাবুর ঠাকুরদাদা আমাদের ভাণ্ডারী ছিল, কিন্তু তাঁহার পিতা ভৃত্যের কাজ ছাড়িয়া পাশের গ্রামে মুদি হইয়া পয়সা করিয়াছিল, সতীশ বাবু নিজে বি-এ পাশ। আমি শেষ প্রশ্ন করিলাম, 'তা হল কোথায় বসানো উচিত ছিল?' জ্যাঠাইমা বলিলেন, 'কেন? মেঝের ওপর পিঁড়িতে।' আমি নিরুত্তর হইয়া গেলাম।

বলাই বাহুল্য বংশমর্যাদা এইভাবে পুরুষানুক্রমে বজায় রাখিবার জন্য আমরা সামাজিক আচরণে আদর্শস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতাম।" (শারদীয় '*দেশ*' ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ১১৭)

সতীশ দে জাতে কায়স্থ শিক্ষায় গ্রাজুয়েট এবং পেশায় শিক্ষক হলেও তাঁর পিতামহ তালুকদারদের ভাণ্ডারী বা ভৃত্য ছিলেন বলে বনগ্রামের কায়স্থ ভূস্বামী পরিবারের গৃহিণীরা পর্যন্ত এই শিক্ষিত মানুষটিকে ভদ্রলোকের মর্যাদা দিতে যদি নারাজ থাকেন, তবে নওপাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীরা কী করে তাঁদেরই অনুগ্রহে পালিত ও ভৃত্যস্থানীয় শূদ্র কায়স্থটির স্পর্ধাকে হজম করতে পারেন?

স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে যারা সৎশূদ্র বলে পরিগণিত তাদেরই যেখানে এ-অবস্থা, সেখানে অচ্ছুৎ অসৎ শূদ্রদের অবস্থান তো সহজেই অনুমান করা যায়। ধোপা, মালি, জেলে, পাটনি—গ্রামসমাজে এ-সব বৃত্তিজীবী শূদ্রদের অবস্থা আসলেই ছিল একান্ত শোচনীয়। এরা বৃত্তিজীবী ছিল বটে, কিন্তু বৃত্তিতে স্বাধীন ছিল না। ঘর বেঁধে থাকার জন্য ভূস্বামীরা এদেরকে এক টুকরো জমি দিতো, সামান্য ফসলি জমিও বরাদ্দ করতো। কিন্তু বাড়ির ভিটে বা ফসলের ক্ষেত কোনোটার ওপরই তাদের মালিকানা থাকতো না। এরা হতো জমির মালিক তথা জোতদার-তালুকদারদের চাকরান বা নানকার প্রজা। মালিক-বাড়ি থেকে যখনই ডাক আসতো তখনই তাদের সে-ডাকে সাড়া দিয়ে হুকুম তামিল করতে হতো। এর অন্যথা হবার কোনো উপায় ছিল না। মালিক তার মর্জি মাফিক যে-কোনো সময়ে যে-কোনো চাকরান বা নানকার প্রজাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতো। ধোপা তার মনিব বাড়ির সকলের কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেবে, মালি মনিবের বাড়িঘর সাফ সুতরা করে রাখবে, জেলেকে তলব করলেই মনিবের বাড়ির জন্যে মাছের জোগান দিতে হবে, কাজে সামান্য শৈথিল্য বা ত্রুটি দেখা দিলে তাদেরকে শুধু গালাগালিই শুনতে হবে না, শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হবে।

নওপাড়ার হরিবল ধোপা ছিল মহাদেব সান্যালের মামাদের নানকার প্রজা। অন্য সব ধোপা-মালি-জেলের মতো হরিবলও নিতান্তই দরিদ্র, নিজের সম্বল বা সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই, নিজের জীবন ও জীবিকার জন্য কর্তাবাবুদের দয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। রায় কর্তাদের (অর্থাৎ মহাদেব বাবুর মামাদের) বাড়ির সকলের কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেয়ার বিনিময়ে সামান্য ফসলি জমি হরিবল ভোগ করতো। একদিন সেই রায়কর্তাদের একজন—সারদা কান্ত রায়—শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে এসে দেখেন তার ভাগিনীর পরনের কাপড়টি ময়লা। ভাগিনীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানলেন যে কী এক অসুবিধার দরুন হরিবল ধোপা ক'দিন ধরে আসতে পারছে না, তাই—। কী, ধোপার ব্যাটার এতো আস্পর্ধা! তার অসুবিধার জন্যে সারদাকান্ত রায়ের ভাগিনীকে ময়লা কাপড়-পরে থাকতে হবে! দেখাচ্ছি মজা! সারদা বাবু গৃহভৃত্যকে হুকুম দিলেন, 'এক্ষুনি হরিবলের ক্ষেতের সব পাট কেটে নিয়ে আয়!' সঙ্গে সঙ্গে কর্তার হুকুম তামিল হয়ে গেলো।

যথারীতি হরিবল এসে কর্তাদের হাতে পায়ে ধরে, জীবনে আর এ-রকম অপরাধ করবে না বলে নাক খত দিয়ে, এবং তারপরও পিঠে দু'চার ঘা খেয়ে সে-যাত্রায় কোনো রকমে বেঁচে গেলো।

কিন্তু এ-রকম বাঁচাকে কি বাঁচা বলে? ব্রিটিশ-সৃষ্ট নয়া সামন্ততন্ত্রের অধীনে গ্রাম বাংলার অগণিত রায়ত ও নানকার চাকরান শূদ্রপ্রজা কি সত্যি সত্যিই বেঁচে ছিল? আর বেঁচে যদি না-ই থাকে তো বাঁচার জন্য কোন্ পথের সন্ধান তারা করেছিল?

চল্লিশের দশকে এবং তারও কিছু আগে থেকে—মুসলমান রায়ত প্রজাদের দেখি নিজেদের মুসলমানত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে। এই সচেতনতাই আস্তে আস্তে তাদের কণ্ঠে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের জিগির তুলে দেয়। তখনকার দেশীয় শোষকগোষ্ঠীর বড়ো তরফ আর ছোট তরফের দ্বন্দ্ব থেকেই যে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল—বামপন্থী তাত্ত্বিকদের এই অনুমিতিকে অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। এবং এই দ্বন্দ্বকে উসকে দিতে বিদেশী বিভাষী বিজাতি শাসকরা যে একটা বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাদের ভাগ করে শাসন করার কূটনীতিই যে এই দু'তরফ অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের ভেতরকার সংঘাতকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে—কংগ্রেসীদের এ বক্তব্যও মিথ্যা নয়।

তবু, এরপরও, কথা থাকে। মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের হাতে নির্জিত, শোষিত ও অপমানিত হয়েছে অপরিমেয় মানুষ। সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিচারে মুসলমানরা যদিও সংখ্যায় বেশি; তবু সুবিধাবঞ্চিত ও নিগৃহীত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শূদ্রদের সংখ্যা তো নগণ্য ছিল না। এক্ষেত্রে মুসলমান শূদ্র নির্বিশেষে সুবিধাবঞ্চিত নিপীড়িত সকলকে মুখে একই স্লোগান নিয়ে এক কাতারে এসে দাঁড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু তেমনটি হয়নি কেন? কেন বামপন্থীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে হিন্দু-মুসলমান রায়ত প্রজারা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাতারবন্দি হলো না? কেন ধোপা হরিবল, মালি রামদাস আর পাটনি শম্ভুচরণ মুসলমান রায়ত চাষা মফিজ শেখ, কইট্যার বাপ কিংবা আবদুল আলির সঙ্গে শোষিতের ঐক্যে একাত্ম হয়ে একই রাজনীতির মঞ্চে মিলিত হলো না? কেন দেশের ধনী-দরিদ্র শোষক-শোষিত মুসলমানদের প্রায় সকলে একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জান দেয়া ও জান নেয়ার সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠলো? এক্ষেত্রে ব্রিটিশের ভেদনীতিই বা এমন সফল ও সার্থক হলো কেন?

এই সব 'কেন'র নির্মোহ উত্তর খুঁজে না নিয়ে পাকিস্তানের জন্মব্যাখ্যার কোনো সঠিক তত্ত্বই কেউ নির্মাণ করতে পারবে না।

'নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ'

আমাদের গাঁয়ে ও তার আশপাশের সবগুলো গাঁয়ে যে সব মানুষদের ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যাদের সঙ্গে সব সময় ওঠাবসা করেছি, তাদের শতকরা আশি ভাগই অসচ্ছল, অনক্ষর, খেটেখাওয়া মানুষ। তাদের সবারই সারা বছর ধরেই, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এদের কারো নাম মফিজ শেখ, আকাইল্যা, পাইন্যার বাপ আর কারো-বা নেউলা, অপর্ত, রইস্যা, ফটিক। আদম শুমারির সময় এদের কারো নামের পাশে লেখা হয় মুসলমান, কারো পাশে হিন্দু। নাম শুনেই অবিশ্য কে হিন্দু কে মুসলমান সব সময় বোঝা যায় না। যার নাম রইস্যা সে মুসলমানও হতে পারে হিন্দুও হতে পারে। যদি কখনো কোনো কারণে তার নাম লেখার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবেই হয়তো ধরা পড়বে যে ওর আসল নাম হয় রসিক, নয় তো রসিদ। রসিক হলে সে হিন্দু আর রসিদ হলে মুসলমান। এ কথাও অবিশ্যি সব সময় খাটে না। রসিক নামের মানুষেরও মুসলমান হতে কোনো বাধা নেই। ফটিক বা আকইল্যা বা নেউলা রসিক নামের মানুষেরও মুসলমান হতে কোনো বাধা নেই। ফটিক বা আকইল্যা বা নেউলা নাম শুনেই-বা কে বলে দিতে পারবে সে হিন্দু না মুসলমান? আর মুসলমান হলেই-বা কী, হিন্দু হলেই-বা কী! যে সংস্কৃত মন্ত্র দিয়ে হিন্দুর হিন্দুত্ব দেবতার মন্দিরে ও আরবি সুরা দিয়ে মুসলমানের মুসলমানত্ব আল্লার মসজিদে গ্রাহ্য হয়, সেই মন্ত্র বা সুরা কোনোটার সঙ্গেই তার

প্রত্যক্ষ পরিচয় বা সম্পর্ক নেই। পূজা কিংবা রোজার প্রতি তার সম্ভ্রমের অন্ত নেই, পুরাণ কিংবা কোরানের প্রতিও তার গভীর ভক্তি। কিন্তু পুরাণ কিংবা কোরান দুয়েরই অক্ষর তার অচেনা। এর জন্য তাকে পুরুত কিংবা মোল্লার মুখেই ঝাল খেতে হয়, যদিও এ রকম ঝাল খেতে সে সব সময় রাজি হয় না, কায়দা পেলেই ওদের ওপর নানাভাবে ঝাল ঝাড়ে। তার ছড়ায় প্রবাদে গল্পে গাথায় এরকম ঝাল ঝাড়ার বহুৎ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

জন্মের অধিকারেই বামুন হয় হিন্দুর পুরুত, শূদ্র তাকে দেবতা বলেই মানতে বাধ্য। শূদ্র তো আর বেদ পড়তে পারে না, তাই বামুনের কথাই শূদ্রের কাছে বেদবাক্য। তবু সেই বামুনকেও সে ছেড়ে কথা কয় না। গাঁয়ের শূদ্রদেরই ছড়া কাটতে শুনেছি—'কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ।' অর্থাৎ বামুনরা যে প্রচার করে বামুনের গায়ে শূদ্র যদি হাত তোলে তবে সে পাপে তার নরকবাস অনিবার্য, সে কথারই ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ এই ছড়াটি। সত্যযুগের বামুনের ব্রহ্মশক্তি থাকলেও থাকতে পারে, সে যুগের বামুনের গায়ে হাত তোলা হয়তো মহাপাপই ছিল। কিন্তু কলি যুগের বামুনের সেই ব্রহ্মতেজ মোটেই নেই, সে এখন ঢোঁড়া সাপের মতোই শুধু ফোঁস ফোঁস করে। একে না মারাই তো বরং মহাপাপ।

বামুনকে শূদ্ররা 'ঠাকুর' বলে। ঠাকুর মানে দেবতা। কিন্তু কলিযুগের ঠাকুরদেবতাদের চরিত্র যে ফুলের মতো পবিত্র নয় তা জানে বলেই ঘৃণা ও বিদ্রূপের সঙ্গে গাঁয়ের মানুষ ছড়া কাটে—'ঠাকুর ঠুকুর এগারো, জাইত্যা ধরো পাগারো। যদি ঠাকুর লড়ে, ঘাড় ভাইঙ্গা মরে।' 'পাগার' মানে ডোবা। ডোবার জলে বামুন ঠাকুরকে ঠেসে ধরতে হবে এবং তারপরও যদি সে নড়াচড়া করতে চায় তবে ঘাড় ভেঙে মৃত্যু অনিবার্য।

বামুনরা তাদের সুবিধা ও মতলব মতো শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হাজির করে। দেখেছি, এ বিষয়েও গ্রাম্য প্রাকৃতজন একান্ত সচেতন। নেত্রকোনার কবিয়ালরা কবিগানের আসরে এমন একটা মজাদার গল্প পরিবেশন করেন যাতে প্রমাণ পাওয়া যা যে, যাজক বামুন যদি হয় বুনো ওল তবে যজমান শূদ্র হচ্ছে বাঘা তেঁতুল।

হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের একটি উপকরণ হচ্ছে কুশ। উত্তর ভারতে কুশ নামে যে তৃণটি জন্মে বাংলায় তারই বিকল্প রূপে যা ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে 'কাশ' বা 'কাইশ্যা'। (শরৎকালে যাতে ফোটে 'কাশফুল')। এক বামুন ঠাকুর গিয়েছেন যজমান বাড়িতে শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য করতে। যজমান বললো, 'কর্তা মশায়, দয়া করে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এখনো কাইশ্যা আনা হয়নি তাই।' কর্তা মশায়ের ছিল ভীষণ তাড়া। তাঁকে এক্ষুনি আবার আরেক বাড়িতে পুরুতগিরি করতে ছুটতে হবে। তাই যজমানের কথা শেষ না করতে দিয়েই বললেন, 'কাইশ্যা লাগবে না, কিছু খ্যাড় (খড়) নিয়ে এসো।' কাইশ্যার কাজ খ্যাড় দিয়ে হয় কী করে?'

কর্তা বলেন, 'হয়, হয়। বিপ্রস্য বচনং মূলং খ্যাড়ং কাইশ্যা। মানে হলো গিয়ে ব্রাহ্মণ যদি বলে দেন তো খ্যাড়ই কাইশ্যা হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের কথাই তো শাস্ত্র। নিয়ে এসো এক গাছা খ্যাড়।'

খ্যাড় দিয়েই শ্রাদ্ধের কাজ সারা হলো। এবার বামুন ঠাকুরকে দক্ষিণা দেয়ার পালা। যজমান একটি থলে ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। থলেটা বেশ ভারি মনে হচ্ছে। ঠাকুর মশাই ভীষণ খুশি। কিন্তু থলের মুখ খুলেই তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন.

'কী, আমার সঙ্গে তুই ঠাট্টা করিস? পয়সার বদলে থলের ভেতর পুরে দিয়েছিস কতকগুলো ঝিক।'

নেত্রকোনা এলাকায় মাটির হাঁড়ি পাতিল ভাঙা খোলাম কুচিকে বলে ঝিক। ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের খেলনা পয়সা বানায় এই ঝিক দিয়ে।

ঝিকের থলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠাকুর মশাই চিৎকার করতে লাগলেন, 'আমি কি তোর ঠাট্টার পাত্র? তুই ব্যাটা নির্বংশ হবি, তোর হাতে কুষ্ঠ হবে, তুই...।'

যজমান শান্ত কণ্ঠে বললো, 'চটবেন না কর্তা। আপনি যেমন খ্যাড় দিয়ে কাইশ্যার কাজ সেরেছেন, আমিও তেমনি পয়সার বদলে ঝিক দিয়েছি। ব্রাহ্মণের কথায় যদি খ্যাড়ই কাইশ্যা হয়ে যেতে পারে তো যজমানের কথায় ঝিক কেন পয়সা হবে না? মনে রাখবেন যজমানস্য বচনং মূলং ঝিকং পয়সা। আমি এই ঝিকই আপনাকে দক্ষিণা দিলাম।'

সুযোগ পেলেই গাঁয়ের মানুষ বামুন ঠাকুরদের এই 'ঝিকংপয়সা'র গল্পটি শুনিয়ে দেয়।

বামুন ঠাকুরদের মতো মোল্লাদের নিয়েও গ্রামের প্রাকৃতজনদের একই রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে দেখেছি। 'কাঠমোল্লা' কথাটার মধ্যেই তো রয়ে গেছে ঘৃণা ও অবজ্ঞা। 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'—এই প্রবাদ মোল্লাদের সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতার কথাই জানিয়ে দেয়। কিন্তু তাই বলে প্রকৃত আলেমকে সম্মান জানাতে প্রাকৃতজনও ভুল করে না।

বামুন ঠাকুরের মতোন যে মোল্লারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে তাদের প্রতি ঘৃণা জানিয়ে গাঁয়ের মানুষ ছড়া বানিয়েছে—

সাত বাড়ির ভাত খাইয়া/মোল্লা মরে পেট লইয়া।

চালো (চালে) উইঠ্যা দেখে/আর নি কেউ ডাকে।

শুধু মোল্লা নয়, ভণ্ড পিরেরা যে নানা অসামাজিক কাজকর্ম করে তার প্রতিও ঘৃণা জানিয়ে গ্রামের গায়েন গানের আসরে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলে—

এই না পিরে দেশটা নষ্ট, নষ্ট মাইয়া লোক।

ভেল্কি মাইর‍্যা দেখায় এরা সারা ভেস্তের সুখ।

শোন শোন ভাই সকল, শোন দিয়া মন।

ঠগ মৌলবী পিরের কথা না মাইন্য কখন॥

ভণ্ড পির মোল্লা আর গুরু পুরোহিতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা ঘৃণা জানায় যারা, তারাই আবার পীরের দরগা কিংবা বাবা ঠাকুরের থানে যায় মানত আদায় করতে। সংসারে জীবিত মানুষের কাছে যখন নানাভাবে কেবল প্রতারিতই হতে থাকে, তখন তারা মৃত পির বা সন্তের কাছে যায় আশ্রয় ও আশ্বাসের আশায়। সেখানেও অবিশ্যি পিরের জীবিত খাদেম বা সন্তের সেবায়েৎদের নানা রকম প্রতারণার শিকার তারা হয়, তবু মৃত পির বা সন্তের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাদের দরগা বা থানে বারবার টেনে নিয়ে যায়। নিঃসন্তানের সন্তান লাভের কামনাই হোক কিংবা সন্তানবতীর সন্তানের কল্যাণ কামনাই হোক, কিংবা হোক কঠিন রোগের হাত থেকে মুক্তি বা মামলায় জয়লাভের কামনা,—সব কিছুর জন্য মৃতের কাছে ধরনা দেওয়াটাই জীবিতের শরণ নেয়ার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয় তাদের কাছে। আর এ ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানের কোনো পার্থক্য নেই। নেত্রকোনার মদনপুরে শাহ সুলতানের দরগায় রোজ যারা শিরনি দিয়ে যায় তাদের কে হিন্দু কে মুসলমান এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করে না, নিজেরাও হিন্দু কি মুসলমান তা মনে রাখে না। আমাদের গ্রাম থেকে নেত্রকোনা যেতে হয় মদনপুরের শাহ

সুলতানের দরগার সামনে দিয়ে। নেত্রকোনার দিকে যাত্রা করলেই ঠাকুরমা আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন যে এক আনার বাতাসা কিনে শাহ সুলতানের দরগায় শিরনি দিয়ে যেতে যেন ভুলে না যাই।

শরীরে 'ম্যাজ' বা আঁচিল দেখা দিলে আমাদের এলাকার মানুষ কেন্দুয়ার লস্করপুরে শিববাড়িতে গোল মরিচ মানৎ করতো। শিব ঠাকুরকে গোল মরিচ দিলে নাকি শরীরের আঁচিল মিলিয়ে যায়। এ বিশ্বাসেও হিন্দু আর মুসলমানের কোনো ভেদ ছিল না। চন্দপাড়ার কালী বাড়িতে প্রতি বছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন পুজো হতো তখন গাঁয়ের অনেক মানুষ দেবীকে উৎসর্গ করার জন্য পাঁঠা (ছাগ) নিয়ে আসতো, সে মানুষদের মধ্যে সুবল দাসদের মতোন আকালু শেখরাও থাকতো। এ সব ব্যাপারে অর্থাৎ পিরের দরগায় শিরনি দিতে কিংবা শিব বাড়িতে গোল মরিচ ও কালী বাড়িতে ছাগ উৎসর্গ করতে—পুরুত বা মোল্লার নিষেধ বিধিকে থোড়াই পরোয়া করতো তারা। পিরের শিরনি তো হতো ঘরে ঘরে। সারা বাংলার সত্যপির ছাড়াও আমাদের এলাকায় শিরনি দেয়া হতো হাজির পির, ঠুনকা পির, আৎখা পির, কানুপির এবং এ রকম আরো অনেক পিরের নামে। আমার ঠাকুর মাকেও এ সব শিরনি দিতে দেখেছি।

সংস্কৃত মন্ত্র বা আরবি সুরা জানুক আর নাই জানুক গাঁয়ের মানুষ জানতো তার দৈনন্দিন বালা মুসিবত দূর করার মন্ত্র। সবাই সব মন্ত্র জানতো না নিশ্চয়, তবে বিভিন্ন বিষয়ের মন্ত্র জানা নানা বিশেষজ্ঞ গুণিন গাঁয়ে ছিল অনেক। যেমন সাপের বিষ নামানোর ওঝা, বোরো ক্ষেতের ওপর থেকে শিলাবৃষ্টি দূর করে দেয়ার হিরালি, ভূত ছাড়ানোর কবিরাজ। গাঁয়ের শতকরা আশি বা পঁচাশি জন কিংবা তারও বেশি মানুষের কাছে এই সব ওঝা, হিরালি, কবিরাজের মান্যতা পুরুত বা মোল্লার চেয়ে অনেক বেশি। রোগ ব্যারামেও ডাক্তারের চেয়ে এই সব ওঝা গুণি ও কবিরাজদের ওপর তাদের অনেক বেশি ভরসা ও নির্ভরতা। আর এদের ওপর নির্ভর না করে বা ভরসা না রেখেই বা কী করবে, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সুযোগ বা ক্ষমতাই তাদের কতোটুকু? লৌকিক জগতের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলেই তো তারা অলৌকিকের শরণ নেয়।

এভাবেই সুখে দুঃখে আশায় নিরাশায়, বিশ্বাসে অন্ধতায়, সংস্কারে কুসংস্কারে গাঁয়ের সব প্রাকৃতজনকে এক সাথে জড়াজড়ি করে থাকতে দেখেছি। আকালু শেখ আর সুবল দাসদের মধ্যে যে হাতাহাতি হয়নি কখনো, তা নয়। তবে হাতাহাতির চেয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতেই তারা বেশি অভ্যস্ত ছিল। দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যায় তারা যে আসর জমাতো তাতে একই ধরনের বন্দনায় গলা মিলিয়ে গাইতো—

পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুস্বর।
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর॥
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত।
যেখানে রাইখ্যাছে আলী মাল্লামের পাথর॥
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান।
উদ্দিশে জানায় গো সেলাম মমিন মুসলমান।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর।
যে দরিয়ায় বাণিজ্য করছে চান্দ সদাগর॥

পুবের ভানুশ্বর আর আলীর মাল্লামের পাথর, মক্কা হেন স্থান আর ক্ষীর নদী সাগরকে একই সঙ্গে বন্দনা করার ব্যাপারটি পুরুত বা মোল্লা কেউ অনুমোদন করলো কিনা তা নিয়ে কোনোই মাথা ব্যাথা নেই সুরুজ আলী বয়াতী কিংবা পীতাম্বর গায়েনের। তাদের একজন যে মুসলমান এবং আরেকজন হিন্দু, সে কথা তারা জানে ও মানে। কিন্তু হিন্দুর পুঁথিতে কিংবা মুসলমানের কিতাবে কী আছে তার খোঁজ খবর না নিয়েই তারা বিশ্বাস করে যে হিন্দু আর মুসলমান একই বংশের লোক। আদমের দুই পুত্র হাবিল আর কাবিল। হাবিলের ছেলেরা হয়েছে মুসলমান, আর কাবিলের ছেলেরা হিন্দু। সৃষ্টিকর্তাই তাদের দু'জনকে দু'রকম আচারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একজনের মুর্দাকে যে গোরস্থানে নিয়ে কবর দিতে হয় আর অন্যজনকে পোড়াতে হয় শ্মশানে নিয়ে, একজনের জন্য যে শুয়োর খাওয়া হারাম আর অন্য জনের গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ—তাও ওই একই ব্যবস্থা থেকে পাওয়া। কাজেই এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করার কিছুই নেই। 'নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ। জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

কিন্তু এই একই মায়ের পুতেরা কেন এক সময় মাতৃপরিচয় অস্বীকার করে বসলো, কীভাবে তারা দুই জাতি হয়ে গেলো, একের বিরুদ্ধে অন্যে ছুরি আর বাঁশ নিয়ে তাড়া করলো কোন প্রেরণায় নেশার ঘোরে—এ সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে পাকিস্তানের জন্মরহস্য। তবে সে রহস্য বড়োই জটিল, এবং তা ভেদ করা খুবই কঠিন বৈকি।

অনক্ষর কৃষকের ভাবলোক

নেউলা কিংবা মফিজ শেখ, আকাইল্যা কিংবা রইস্যা, ফটিক কিংবা পাইন্যার বাপ—এরা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, এদের কেউই হিন্দুর বা মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রের ভাষা যেমন জানে না তেমনি নিজের মাতৃভাষার অক্ষরও চেনে না। ধর্মশাস্ত্রের ভাষা না জানার ক্ষতি তারা পুষিয়ে নেয় মুখে মুখে মাতৃভাষায় নিজেদের ধর্মশাস্ত্র রচনা করে নিয়ে। সেই ধর্ম হিন্দুও না মুসলমানও না। আবার হিন্দুরও অনেক কিছু সেই ধর্মে আছে, মুসলমানের ভাগও তাতে প্রচুর। হিন্দুর আর মুসলমানের ধর্ম সেখানে জড়াজড়ি করে থাকে। বিশুদ্ধ হিন্দুয়ানি আর বিশুদ্ধ মুসলমানি নিয়ে যারা পর্ব করে তাদের দৃষ্টিতে ওই মূর্খগুলোর কোনো ধর্মই নেই।

কিন্তু ধর্ম বলতে আসলে যা বোঝায়, দার্শনিক পণ্ডিতরাও গভীরভাবে ধর্মের যে ব্যাখ্যা দেন, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের সম্প্রদায়গত বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ঊর্ধ্বে যে-ধর্মের অবস্থান, সেই ধর্মকে কিন্তু সেই মূর্খগুলোই তাদের সমগ্র সত্তায় ধারণ করে। পরকালে তারা বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু ধর্ম তাদের ইহলোককে নিয়েই। ইহলোকের ভালোমন্দ আর ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনাই তাদের ধর্মের অন্তঃসার। ব্রত, শিরনি, মানত, পিরের দরগা, বাবার থান—সবই ইহলৌকিক কল্যাণ বা প্রাপ্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। সংস্কার বা সংস্কারগুলোও তাই। সংস্কার বা কুসংস্কার না বলে বরং বলা উচিত, এগুলোই তাদের মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ থেকে আলাদা করে কোনো ধর্মের কথা তারা ভাবতে পারে না। ধর্ম ও নৈতিকতা তাদের কাছে এক ও অভিন্ন। তাদের দৃষ্টিতে নৈতিকতা কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়, এর মূর্ত রূপকেই তারা সব সময় চোখের সামনে রাখে।

কারো বাড়িতে আগুন লাগালে পাপ হয়—এটি হচ্ছে তাদের বিশ্বাস বা সংস্কার। কিন্তু এই পাপের ফলভোগ করবে কোথায়? পরলোকে কি? হ্যাঁ, পরলোকের কথা তাদের ভাবনায় আবছা

আবছা আছে ঠিকই, তবু পাপের ফল যে ইহলোকেই ভোগ করতে হবে, এটিই তাদের বিশ্বাসের মূল অংশ। গাঁয়ের এক বুড়োকে মরার আগে সারা শরীরের জ্বালা নিয়ে ছটফট করতে দেখেছি। আমার ঠাকুরমা বললেন, 'এ-রকম হবে না কেন! ও যে আগুন দিয়ে অমুকের বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছিলো, সেকথা তো আমরা ভুলিনি। তখনই বলেছিলাম—ও জ্বলে পুড়ে মরবে। এখন তাই সত্যি হচ্ছে। পাপ তো বাপকেও ছাড়ে না।'

রোগ-ব্যারামসহ ইহজাগতিক সব দুঃখকষ্ট যে পাপেরই ফল, এ-সংস্কারও তাদের প্রবল। কুষ্ঠের মতো রোগ যে পাপীদের দেহেই আশ্রয় নেয়, এ ব্যাপারে গ্রামীণ লোকসমাজের অনেকের মধ্যেই আমি নিঃসংশয় বিশ্বাস দেখেছি।

পরলোকের শাস্তির কথাও ওরা ভাবে অবশ্যই। যেমন, খেয়ার মাঝিকে তার পারানির কড়ি শোধ না করলে পরলোকের খেয়া পার হতে গিয়ে বড়োই মুশকিলে পড়তে হবে—এমন ধারণা তাদের আছে। তবু, কাল্পনিক পরলোকের চেয়ে বাস্তব ইহলোকেই যে এ-পাপের শাস্তি পেতে হবে জলে ডুবে মরে, কিংবা না মরলেও ভীষণ কষ্টভোগ করে, এ-রকম বিশ্বাসই হচ্ছে তাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অমুক কাজ করতে নেই বা অমুকটা খেতে নেই। কেন? কারণ, অমুকটা করলে বা অমুকটা খেলে সন্তানের ক্ষতি হয়। কিংবা তার চেয়েও বড়ো শাস্তি : বংশলোপ হয়।

এই বংশলোপের ভাবনাটাই প্রাকৃত বাঙালির লোকধর্মের পাপপুণ্য ভাবনার সিংহভাগ দখল করে আছে। নিঃসন্তান বা আঁটকুড়ের মুখ দেখাও কুসিদ্ধি। বাঙালির লোকগাথায় এমন কতো আঁটকুড়ে রাজার কথা যে আছে ভোরবেলায় যে-রাজার মুখ দেখতে রাজি নয় কোনো প্রজা, এমনকি রাজার বাড়ি ঝাঁট দেয় যে মালি সেও। আঁটকুড়ে রাজা সন্তান-কামনায় কাঙালের মতো গিয়ে ধর্ণা দেয় সন্ন্যাসীর কাছে, সন্ন্যাসীর দেয়া ওষুধ খেয়ে রাণী হয় গর্ভবতী, রক্ষা পায় বংশধারা।

বংশরক্ষার জন্যে বা প্রকৃতিপুঞ্জের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে, প্রাকৃত জনের এ-রকমই আকুতি। এখানে ঐশ্বর্যবান রাজা আর দরিদ্র প্রজার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পরলোকে অনন্ত জীবনের বিমূর্ত কল্পনা প্রাকৃতজনকে যতোটা না অনুপ্রাণিত করে, তারচেয়ে সে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয় ইহলোকে সুখী সচ্ছল বংশধারার মধ্যে বেঁচে থাকার কামনায়। তাই তো দেখি : আশি বছর বয়সী বুড়ো মানুষটি, এ জীবনে যার চাওয়া পাওয়ার আর কিছুই নেই, সেও বাড়ির সামনে তালগাছের চারা লাগাচ্ছে। তালগাছ সম্পর্কে তো বলা হয়, যে-লোকটি গাছ লাগালো তার ছেলে সে-গাছের তাল খাওয়ার আশা করলেও করতে পারে, আসলে তাল খায় তার নাতি। তা হলে বোঝা গেলো মৃত্যুপথযাত্রী যে-বৃদ্ধটি পরম যত্নে তাল গাছের চারা লাগাচ্ছে, ইহকালে সে তার ফল যেমন আশা করছে না তেমনি পরলোকে ফল পাবার আশাতেও তার এই গাছ লাগানো নয়। সে চায় নাতিপুতিরা তার কাজের বা পুণ্যের ফল ভোগ করুক। সে পুণ্যকর্ম করে তার নাতিপুতিদের সুখের জন্যে, পাপ থেকেও বিরত থাকতে চায় ওদেরই মুখ চেয়ে। অনন্তকাল ধরে সে বেঁচে থাকতে চায় ও পৃথিবীটাকে ভোগ করতে চায় তার নাতিপুতির বংশপ্রবাহের ভেতর দিয়ে।

আদিম মানুষের মতোই সে বিশ্বাস করে যে, প্রকৃতির সব কিছুরই প্রাণ আছে, গাছ পাথর আকাশ সূর্য চাঁদ ঝড় বৃষ্টি সবই প্রাণবান্। শুধু প্রাণবান্ নয়, মানুষের মতোই এ-সবও

হৃদয়বান, মানুষের মতোই এদের বিশ্বাস ও সংস্কার। তাই তার নড়বড়ে খড়ো ঘরটিকে বৈশাখী ঝড় যখন উড়িয়ে নিতে চায়, তখন সে ঝড়ের উদ্দেশে মন্ত্র পড়ে—

কচুপাতার ছানি ভেরনের ঠনি
ছুঁইছ্ না, ছুঁইছ্ না।
এই ঘরে তো ভাইগ্না বৌ
ছুঁইছ্ না, ছুঁইছ্ না।

অর্থাৎ যে-ঘরের ছাউনি দেয়া হয়েছে কচু পাতা দিয়ে আর খুঁটি একান্ত পলকা ভেরনা কাঠের, সে-ঘরকে যদি স্পর্শ করে ঝড়ের মতো প্রতাপান্বিত বীর তবে তো তার বীরত্বই কলঙ্কিত হবে। ভাগ্নে বৌ আছে যে-ঘরে, মামা শ্বশুর হয়ে ঝড় তো সে-ঘরকে কিছুতেই ছুঁতে পারে না। ভাগ্নে বৌকে ছোঁয়া তো দূরের কথা, তার মুখ দেখাও গ্রামীণ লোকশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঝড়ও সে-শাস্ত্র মেনে চলবে নিশ্চয়।

স্বর্গের দেবতাকেও সে মানে। সেই দেবতার স্তুতিও যে করে না, তাও নয়। তবে স্তুতি দিয়ে খুশি করার চেয়ে মন্ত্র দিয়ে দেবতাকে জয় করার দিকেই তার বেশি নজর। মন্ত্রের শক্তিতে তার বিশ্বাস এমনই নিশ্ছিদ্র যে, কামনা পূরণের যে কোনো মন্ত্র আবৃত্তি করে একান্ত স্পর্ধার সঙ্গে সে বলে—'আমার মন্ত্র যদি লড়ে চড়ে/ঈশ্বর মহাদেবের জটা কাইট্যা ভূমিত পড়ে।' অর্থাৎ কামনা পূরণের জন্যে সে ঈশ্বর বা মহাদেবের কাছে কোনো কাকুতি মিনতি করে না, প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র পড়ে শুধু। কারণ, সে জানে, তার মন্ত্র যদি ব্যর্থ হয়ে যায় ('লড়ে চড়ে') তবে তার নিজের কিছু ক্ষতি হবে না, ঈশ্বর মহাদেবেরই জটা কেটে মাটিতে পড়ে যাবে! তাই মহাদেব নিজের প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্যে নিজের গরজেই মন্ত্রকে সার্থক করে তুলবেন, এর জন্যে মন্ত্রকর্তাকে মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া আর কিছুই করতে হবে না।

মহাদেব তো হিন্দুর দেবতা, অথচ হিন্দু ওঝার মতো মুসলমান ফকিরও তার নাম দিয়ে মন্ত্র পড়ে। আবার হিন্দু ওঝা মা কালীর মতো মা ফাতেমারও দোহাই দেয়। রক্তমাংসের মানুষ মুসলমান আলীর সঙ্গে হিন্দু পুরাণের কাল্পনিক দেবতা শিব বা মহাদেবের মোলাকাত ঘটিয়ে দিতেও ইতস্তত করে না বাংলার লৌকিক পুরাণ। ছেলেবেলায় লোকপুরাণের এ-রকম অনেক অনেক গল্প শুনেছি, শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়েছি। এ-সব গল্প যে হিন্দু ও মুসলমানি পুরাণের মিলনই ঘটিয়েছে কেবল, তা অবিশ্যি নয়। পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপের আভাসও এগুলোতে কম ফুটে ওঠেনি। তবু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভেতরও গাঁয়ের কৃষক মেনে নিয়েছে যে, হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরের জ্ঞাতি, আদমের পুত্র হাবিল আর কাবিলের বংশধর, আচারের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি দিয়েই তারা একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে।

হিন্দু শিবের লিঙ্গ পূজা করে। পণ্ডিতরা এর নানা দার্শনিক ও নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য খুঁজে খুঁজে হয়রান হন। নেত্রকোনার অনক্ষর কৃষকদের কল্পনায় কিন্তু লিঙ্গপূজার কার্যকারণটি খুবই সহজ। তাদের লৌকিক পুরাণ বলছে : শিবের সঙ্গে আলী একবার কুস্তি লড়েছিলেন। কুস্তিতে পরাজিত হয়ে শিব বন্দি হলেন আলীর হাতে। বন্দি শিবকে নিয়ে আলী যাত্রা করলেন মক্কার দিকে। ভক্তরা কাঁদতে কাঁদতে শিবকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তো আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এখন আমরা পুজো করবো কাকে?' নিরুপায় শিব আর কী করেন! তিনি তার লিঙ্গটি ভক্তদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এখন থেকে আমার এই লিঙ্গটিকেই তোরা পূজা করিস।'

গাঁয়ের লোকসাধারণ হিন্দু-মুসলমানের আচার-বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য মেনেছে, স্বাতন্ত্র্যকে বিরোধের উপাদান বলে মনে করেনি, পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠান পালনে সহায়তা দেয়াটাকেই বরং তারা ধর্ম বলে বিশ্বাস করেছে। কখনো কখনো পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠানের সুবিধাজনক উপাদানগুলো নিয়ে তারা লৌকিক ধর্মের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বানিয়ে নিয়েছে, কখনো বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই একে অন্যের দান গ্রহণ করেছে। এভাবেই মুসলমানের পির হিন্দুর দেবতা হয়েছেন, হিন্দুর দেবতাও মুসলমানের পিরের পোশাক ধারণ করেছেন। মুসলমানের শিরনি অনুষ্ঠান হিন্দু বাড়িতে ব্রতের রূপ ধরেছে, ব্রতকেও মুসলমানরা শিরনিতে পরিণত করেছে। বনদুর্গা যে কখন বনবিবি হয়ে গিয়েছেন তা টেরই পাওয়া যায়নি। সত্যপিরের সত্যনারায়ণ হওয়ার বৃত্তান্ত তো সারা বাংলার মানুষই জানে।

হিন্দু গোরস্থানকে ও মুসলমান শ্মশানকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছে, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর খাদ্য সম্পর্কীয় নিষেধবিধি ও আচার-আচরণগুলোকে সম্মান দেখিয়েছে। এমনকি হিন্দু যে মুসলমানের ছোঁয়া কোনো কিছু খায় না, এটিতেও লোকসমাজের মুসলমানরা কোনো ঘৃণা-বিদ্বেষের সন্ধান পায়নি। হিন্দু যে এঁটো বা উচ্ছিষ্ট নিয়ে বাছ-বিচার করে আর মুসলমান যে করে না, এটিকে উভয় গোষ্ঠীর লোকেরাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। এ-সব আচারভেদ সম্পর্কে নেত্রকোনার গাঁয়ের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মুখেই শুনেছি, 'এই রকমই আমরা পাইয়া আইছি।' 'পাইয়া আইছি' কথাটা দিয়ে তারা যা বোঝাতে চায় তা হচ্ছে : জন্মের আগে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন আচারগুলো ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, এগুলো তাদের মেনে চলতেই হবে। এগুলোর ভেতর যে ঘৃণা-বিদ্বেষের কোনো বীজ থাকতে পারে, এ-রকমটি তারা একসময় ভাবতেই পারতো না।

অথচ, পরে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেলো। আচারের বৈচিত্র্য হয়ে গেলো বিদ্বেষের হাতিয়ার। নিজের গোষ্ঠীর কদাচারকেও পরম পবিত্র ও সুন্দর বলে ভাবতে শুরু করলো, অন্যের সদাচারের মধ্যেও আবিষ্কার করলো গলদ ও অপবিত্রতা। একজন যাকে পবিত্র স্থান বলে মনে করে, অন্যজন সেটিকে অপবিত্র করাটাকেই পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করলো। মন্দিরে গোরুর হাড় নিক্ষেপ করা মুসলমানের জন্যে আর মসজিদে কচ্ছপের খোলা রেখে আসা হিন্দুর জন্যে যেনো পুণ্যকর্ম হয়ে উঠলো। উভয় সম্প্রদায়ের বালকদের মনেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সংক্রমণ ঘটলো, সমন্বয়ীভাবের ছড়া-প্রবাদগুলোর বদলে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাবিদ্বেষমূলক ছড়া-প্রবাদের ব্যাপক ব্যবহার চলতে লাগলো। 'নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ'-এর চেয়ে 'কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা' অনেক বড়ো সত্য হয়ে দেখা দিলো।

গ্রামের একজন মুসলমান তার ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে শুভাকাঙ্ক্ষী হিন্দুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান পাচক বামুন দিয়ে তাদের জন্যে আলাদা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে। হিন্দুও মুসলমানদের আপ্যায়িত করেন যথাযথভাবে মুসলমানি কায়দায় বাবুর্চির তৈরি খাবার পরিবেশন করে। দলপা গ্রামের গম্ভীর মিঞা, দুর্গাপুরের সুধীর দে এবং এ-রকম আরো অনেকের বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি এ-ধরনের ব্যবস্থাই দেখেছি। কখনো, ছোটোখাটো পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে, হিন্দু গৃহস্থ মুসলমান প্রতিবেশীর বাড়িতে ও মুসলমান গৃহস্থ হিন্দু বাড়িতে চাল-ডাল-মাছ-তরকারির 'সিধা' পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপারেও পরস্পরের সংস্কারের প্রতি সম্মান দেখিয়েই গ্রামীণ হিন্দু ও মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন যাপন করেছে।

আমার শৈশব-কৈশোরে গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরকম পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল আচরণ যেমন দেখেছি, নিতান্ত অল্পদিনের ব্যবধানে তার বিপরীতটি দেখার দুর্ভাগ্যও আমার হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো আনুষ্ঠানিকতার খোলসটি থেকে গেলেও ভেতরের সেই বিশ্বাস ও আন্তরিকতার শাঁসটি উবে গেছে। পুরো চল্লিশের দশক এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ার কয়েকটি বছর বাংলাদেশ এমনই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে যে, এ-রকম ক্রান্তি ইতিহাসে সম্ভবত খুব বেশি আসেনি। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের জিগির, পাকিস্তানের অস্বাভাবিক জন্ম, জন্মের পর তা নিয়ে নানান আদেখলাপনা এবং এ-সবের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি—এ-রকম অনেক কিছুর ধাক্কায় অনেক উল্টোপাল্টা ব্যাপার ঘটে গেলো খুবই অল্প সময়ের মধ্যে।

এ-সব নিয়ে হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই আমার কথা হতো। আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'এ-রকম হয়ে গেলো কেন? লোকসমাজের লৌকিক মূল্যবোধগুলো মোল্লা-পুরুতদের বিভেদপন্থী ধর্মের হাতে মার খেয়ে গেলো কেন? গাঁয়ের মানুষগুলো এরকম কট্টর হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে গেল কী করে? কে তাদের এমন হিন্দু বা মুসলমান বানালো?'

হেকিম ভাইয়ের নিজের মনেও এ-সব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো। আমি যে-সময় তাকে এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, সে-সময় তার মধ্যে পাকিস্তানি জোশ আর একটুও অবশিষ্ট নেই। তমদ্দুন মজলিসের প্রভাবও তিনি ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনার কল্পনাও তিনি আর এখন করেন না। সেটি পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের কথা। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি সম্পর্কে তিনি তখন মোহমুক্ত। পাকিস্তান-আন্দোলনের সময়কার তার নিজের ভূমিকাকেই তিনি তখন নানাভাবে সমালোচনা করেন। শুধু সমালোচনা নয়, নিজের অতীতকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করে ফেলেন।

হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন, 'আমার তো লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান করার কথা ছিলো না। আমিও তো ব্রাহ্মণ বংশের মানুষ। অথচ আমিই কিনা আশুজিয়ার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলাম পাকিস্তান কায়েমের জন্যে। এ-রকমটি তো নাও হতে পারতো।'

কথাগুলো বলেই তিনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। আলোচনাটাকে ইতিহাসের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সিংহের গাঁওয়ের খাঁ বাড়ির সেই গোল ঘরটিতে বসে এ-রকম ইতিহাস আলোচনা আমরা প্রায়ই করতাম। এদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলো কী করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘু হিন্দুদের চেয়ে পেছনে পড়ে রইলো কেন, হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘু হিন্দুদের চেয়ে পেছনে পড়ে রইলো কেন, হিন্দু-মুসলমানের লৌকিক ধর্মাচরণের প্রতি পুরোহিত মোল্লাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কী রকম ছিলো—এ-রকম বহু প্রশ্ন আমাদের আলোচনায় উঠে আসতো।

সেদিন হেকিম ভাই তার ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করেছিলেন। মনাং গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ শচীন্দ্র শর্মা যে সেই আঠারো শতকে 'বুড়াপির' নামে পরিচিত সুফি সাধক সৈয়দ খোয়াজের কাছে গিয়েছিলেন, তা কি আধ্যাত্মিক পিপাসা মেটানোর জন্যে? ধর্মজিজ্ঞাসার জবাব খোয়াজের কাছে গিয়েছিলেন, তা কি আধ্যাত্মিক পিপাসা মেটানোর জন্যে? ধর্মজিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে? বুড়াপিরের কাছে মূল্যবান আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধান পেয়েই কি ব্রাহ্মণ শচীন্দ্র শর্মা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ করে সানন্দে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন? মোটেই নয়। আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে পিরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি যাজক ব্রাহ্মণ শচীন্দ্র শর্মার। আধ্যাত্মিক নয়, একান্ত আধিভৌতিক কারণেই তিনি পিরের শরণ নিয়েছিলেন। সেই আধিভৌতিক কারণটি হচ্ছে দুরারোগ্য ব্যাধি।

এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শচীন্দ্র শর্মা জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। সে-সময়েই তার কানে এলো : পাশের গ্রাম তেঁতুলিয়ায় যে বুড়াপির আছেন আস্তানা গেড়ে তিনি নানা বনজ ওষুধ আর পানিপড়া দিয়ে অনেকের অনেক কঠিন রোগ সারিয়ে তোলেন। যথারীতি শচীন্দ্র শর্মাও সেই পিরের কাছে গেলেন, তার ওষুধ ও পানিপড়া খেলেন, তার নির্দেশিত কিছু নিয়ম ও নিষেধবিধি মেনে চললেন এবং আস্তে আস্তে রোগমুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু রোগমুক্ত হলেও ওই যে পিরের হাতের পানিপড়া খেলেন, সে-অপরাধ থেকে তিনি মুক্ত হবেন কী করে? ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের বিচারে সে-অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তিনি একঘরে হলেন, একঘরে হয়ে সমাজচ্যুত হলেন। অর্থাৎ তার জাত গেলো।

হিন্দুর তো এভাবেই জাত যায়। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে, 'হিন্দুর জাত যেন কচুপাতার পানি। একটু টোকা লাগলেই পড়ে যায়।'

হ্যাঁ, কথাটা খুবই সত্য। এখনকার দিনে না হলেও এক সময় তো এটি ছিলো একেবারে শতকরা একশ' ভাগ সত্য। নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন করলে তো কথাই নেই, খাদ্যের ঘ্রাণেও হয় অর্ধভোজন এবং সেই অর্ধভোজনেও যে অনেক হিন্দুর জাত চলে গেছে, ইতিহাস ও জনশ্রুতিতে তারও অনেক নজির মেলে। 'পীরালি ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত এক গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ নাকি জাতিচ্যুত হয়েছিলেন মুসলমানের রান্নার গন্ধ নাকে যাওয়ার ফলে। নাকে গন্ধ গেলেই যদি জাত যায়, তবে ব্রাহ্মণ শচীন্দ্র শর্মা মুসলমান পিরের হাতের পানি খেয়ে জাত যাওয়া মানেই হিন্দু সমাজের বাইরে চলে যাওয়া। তখন মুসলমান সমাজে আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্য কোনো পথই খোলা থাকে না, শচীন্দ্র শর্মারও ছিলো না। শচীন্দ্র শর্মা সৈয়দ খোয়াজ বা বুড়াপীরের মুরিদ হয়ে মুসলমান হলেন, নাম নিলেন—সুলতান উদ্দিন খাঁ।

সৈয়দ খোয়াজের মতো সুফি তরিকার অনুসারী পির-দরবেশরা ঠিক আনুষ্ঠানিক অর্থে ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। এরা যেখানে আস্তানা গেড়ে বসতেন সেখানে প্রচুর অনুগ্রহপ্রার্থীর ভিড় জমতো। সেই অনুগ্রহ প্রার্থীদের মধ্যে নানা জাত, ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষ থাকতেন, পির-দরবেশগণ সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। পারলৌকিক মুক্তির আশায় কেউ হয়তো পিরদের শরণ নিলেও নিতে পারেন, তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। অধিকাংশ মানুষই পিরদের কাছে যেতো নানা ইহলৌকিক কামনা পূরণের আশায়। পিরদের কেরামত বা অলৌকিক ক্ষমতার ওপর লোকসাধারণের বিশ্বাস একেবারে নিশ্ছিদ্র। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের চেয়ে লোকসমাজ বেশি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে মিস্টিকপন্থী পির-দরবেশদের ওপর। হিন্দু পুরোহিতের সামনে এই মুসলমান দরবেশরা রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দিয়েছিলেন। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরোহিতেরা তাদের হৃদয়হীন আচারের অস্ত্রটিকেই আরো ধারালো করে তুলেছিলেন। তার ফলে ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার, খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধ বা যৌন সম্পর্কের শুচিতার সামান্য লংঘন হলেই—অর্থাৎ পান থেকে চুন খসলেই—কোনো হিন্দু সন্তানের আর রক্ষা থাকতো না। ব্রাহ্মণ্য বিধান তাকে সমাজের বাইরে ঠেলে দিতো। সমাজচ্যুতরা বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতো মুসলমান সমাজে, যেমনটি নিয়েছিলেন আমার হেকিম ভাই বা খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের নবম পূর্বপুরুষ শচীন্দ্র শর্মা।

হেকিম ভাই তাঁর ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষের গল্প শেষ করে কৌতুকের সঙ্গে চোখ নাচাতে নাচাতে বলতেন, 'দেখো, হিন্দুর জাত যদি কচুপাতার পানি না হতো, তবে শচীন্দ্র শর্মাকে মুসলমান হতে হতো না, তার বংশধর আমিও তোমাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই থাকতাম। মূর্খ [illegible] পাকিস্তান করি?'

আমিও হেসে হেসেই বলতাম, 'ব্রাহ্মণ না থাকার জন্যে তো আপনার দুঃখ করার কিছুই নেই। কারণ শর্মা থেকে খাঁ হয়েছেন। খাঁ তো ব্রাহ্মণই। মুসলমান ব্রাহ্মণ।'

হো হো করে হেসে উঠতেন হেকিম ভাই।

হিন্দুর জাতের সূত্র ধরে জাত ও জাতি নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক কথা হতো। মুসলমানের কোনো জাতপাতের ব্যাপার নেই—তত্ত্বগতভাবে কথাটা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বাস্তব সত্য এতো সরল নয়।

সেই অসরল বিষয়টি নিয়েই হেকিম ভাই আর আমি দিনের পর দিন আলোচনায় বসেছি, তর্কে-বিতর্কে মেতে উঠেছি। আমাদের এলাকার বিভিন্ন গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করেছি, অনেক ভূয়োদর্শী লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা বইপত্রও পড়েছি।

এ সবের ফলে আমাদের উভয়েরই অনেক প্রশ্নের উত্তর বা উত্তরের সূত্র খুঁজে পেয়েছি, দ্বিজাতিতত্ত্বসহ পাকিস্তানের জন্মরহস্য সম্পর্কেও ভাবনার অনেক খোরাক পেয়েছি।

জাতে মুসলমান থেকে মুসলমান জাতি

খাঁ বাড়ির ছেলে হেকিম ভাইকে যে আমি ঠাট্টা করে বলতাম 'মুসলমান ব্রাহ্মণ' হেকিম ভাই আমার সে ঠাট্টাটা প্রসন্ন মনেই উপভোগ করতেন। তবে নিজে তিনি ব্রাহ্মণত্বের অভিমান পোষণ করতেন না। আর সে কারণেই নিজেকে নিয়েও দেদার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারতেন। কিন্তু যাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান হয়েছিলেন, এমন অনেককে দেখেছি, তারা নিজেদেরকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। অন্যরাও যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে, তাও নয়। অনেক নবদীক্ষিত মুসলমানকেই তো নামের শেষে ব্যানার্জি বা ভট্টাচার্যের মতো ব্রাহ্মণ পদবীগুলো ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ রকম পদবীধারীরা যখন ধর্মসভায় ওয়াজ করেন তখন সে সভায় শ্রোতা-দর্শকদের ঢল নামে।

নেত্রকোনার বারহাট্টা থানায় আমগোয়াইল একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সে গ্রামের 'ঠাকুর' পদবীধারী মুসলমানরাও বেশ প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত। এদের পদবী ঠাকুর কেন, এ নিয়ে একটি জনশ্রুতি নেত্রেকোনা অঞ্চলে বহুশ্রুত। অনেকের মুখেই এটি আমি শুনেছি, হেকিম ভাইও প্রায়ই বলতেন।

আমগোয়াইলের ঠাকুররা আসলেই 'ঠাকুর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জনশ্রুতি বলে : এ গ্রামে এক সময় ছিলো বারো ঘর ব্রাহ্মণ, আর একঘর মাত্র মুসলমান। ব্রাহ্মণরা ভাবলেন, একঘর মুসলমানকে পর করে না রেখে ঘরে তুলে নিলে কেমন হয়? এদের কি হিন্দু বানিয়ে নেয়া যায় না? এই ভাবনা থেকেই তারা ব্রাহ্মণ্য ছ্যুৎমার্গের কড়াকড়ি অনেকটা কমিয়ে এনে ওই মুসলমান পরিবারটির সঙ্গে হৃদ্য ব্যবহার করতে ও তাদের পাশে বসিয়ে পানভোজন করতে লাগলেন। আর যায় কোথায়! ভিন গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা এ খবর জানতে পেরে আমগোয়াইলের বারো ঘর ব্রাহ্মণকেই একসঙ্গে সমাজচ্যুত করে ফেললেন। ব্রাহ্মণ সমাজে তথা হিন্দু সমাজে ফিরে আসার কোনো পথ আর তাদের রইলো না। ওই বারো ঘর ব্রাহ্মণের সবারই ব্রাহ্মণত্ব ও হিন্দুত্ব খারিজ হয়ে গেলো, মুসলমান সংস্পর্শের দায়ে তারা মুসলমান হয়ে গেলেন। বারো ঘর হিন্দু মিলেও একঘর মুসলমানকে হিন্দু বানাতে পারলো না, উল্টো একঘর মুসলমানই কিনা বারো ঘর হিন্দুকে মুসলমান বানিয়ে ফেললো! 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ

যে দেখিয়েছিলেন, হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে হাজারো দরোজা খোলা থাকলেও ভেতরে ঢোকার জন্যে নেই একটি ছিদ্রও—আমগোয়াইলের ঠাকুরদের কাহিনীটি যেন তারই প্রমাণ।

তবু মজা হচ্ছে এই, আমগোয়াইলের ঠাকুররা মুসলমান হয়েও ঠাকুরই রয়ে গেলেন। বংশানুক্রমে তারা নামের সঙ্গে ঠাকুর পদবীটি গেঁথে রেখে হলেন অমুক হোসেন বা অমুক উদ্দিন ঠাকুর। এই ঠাকুর পদবীটি নিয়ে তাদের নিজেদেরও যেমন গৌরবের অন্ত নেই, তেমনি অন্যরাও তাদের সে গৌরবটুকু স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা করে না। মুসলমানদের মধ্যে জাতভেদের কোনো শাস্ত্রীয় বা তত্ত্বগত স্বীকৃতি না থাকলেও গ্রামীণ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দৃষ্টিতেই আমগোয়াইলের ঠাকুররা উঁচু জাতের মুসলমান। ওদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারাটা অনেক মুসলমানের জন্যেই জাতে ওঠার সিঁড়ি বিশেষ।

আমগোয়াইলের ঠাকুরদের মতো এ-রকম স্পষ্ট ব্রাহ্মণ্য উত্তরাধিকার যাদের ছিলো না তাদেরও অনেকের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্যের বংশধর হওয়ার অভিমান ছিলো। বিশেষ করে আমাদের এলাকার খাঁ পদবীধারী সকল মুসলমানকেই মনে করা হতো হিন্দুবংশ সম্ভূত। খাঁ বা খান একটি তুর্কি শব্দ। অথচ এখানকার মুসলমান সমাজে এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলো। এমন কি হিন্দু ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজেও এই খাঁ পদবীটির প্রচলন ছিলো এবং সকলেই এই পদবীধারীদের আভিজাত্য স্বীকার করে নিতো। গৌরীপুরের কাছাকাছি কোনো একটি গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোককে চিনতাম, তার নাম ছিলো মন্মথ খাঁ।

মুসলমান সমাজেও অবিশ্যি সব খাঁ-এর সমান মর্যাদা স্বীকার করা হতো না। কোনো কোনো খাঁ গোষ্ঠী সম্পর্কে তো একান্ত অবজ্ঞার সঙ্গেই বলা হতো : আরে, অমুক গাঁয়ের খাঁয়েরা আবার ভদ্রলোক হলো কবে থেকে! ওরা তো চাঁড়াইল্যা খাঁ।

অর্থাৎ চাঁড়াল (চণ্ডাল) থেকে মুসলমান হয়ে খাঁ পদবী ব্যবহার করলেও কেউ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ থেকে মুসলমান হওয়া খাঁ-এর সমান হতে পারে না।

সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা হলো সেই মুসলমানদের যারা তাদের পূর্বপুরুষদের বহিরাগত বলে এ দেশের মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছেন। সৈয়দরা তো সম্মানিত হবেনই। কারণ তাঁরা যে আরব দেশ থেকেই এসেছেন, শুধু তাই নয়। তারা যে আওলাদে রসুল। 'পাঠান' পদবীধারীরা তো পদবীটা দিয়েই তাদের বৈদেশিকত্ব প্রমাণ করতে পারেন, আর এ-রকম বৈদেশিকত্ব দিয়েই তারা স্থানীয় বাঙালিদের চোখে আশরাফ হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান আমলে নাকি এখানকার এক পাঠান উপাধিধারী নেতা করাচিতে গিয়ে একান্ত গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমি বাঙ্গাল নই, সীমান্তের পাঠান।' এছাড়া মীর, খাজা, শাহ, ফকির, খন্দকার, আকন্দ, মিলকি—এ-রকম পদবীধারী মুসলমান যে একান্তভাবে আশরাফ, সে কথা সবাই মেনে নেয়। কারণ তারা যে পশ্চিমের কোনো না কোনো অঞ্চল থেকে হিজরত করে এই বাংলা মুলুকে এসে ঘর বেঁধেছেন তার দলিলী প্রমাণ তাঁদের হাতে আছে। এঁরা অনেকেই পশ্চিমী উৎসের জোরেই, স্থানীয় মুসলমানের ধর্মীয় নেতা ও সমাজনেতার আসন দখল করে বসেন।

হেকিম ভাই এঁদের এই নেতৃত্বের অধিকার সম্পর্কে নানা প্রশ্নের অবতারণা করতেন। তাছাড়া এদের অনেকের বংশগৌরবের দলিলের খাঁটিত্ব সম্পর্কেই যে সন্দেহ আছে, তাও

বলতেন। ভাটি এলাকার কোনো এক খাজা পরিবার সম্পর্কে একটা কৌতুকজনক গল্পও তার মুখে শুনেছি।

ওই পরিবারটি আসলে ছিলো সাধারণ কৃষিজীবী। তেজারতি কারবার করে এক সময় তাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়ে যায়। কিন্তু এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা খুব একটা বাড়ে না। গ্রাম সমাজে সামাজিক মর্যাদার জন্যে চাই বংশগৌরব। তারা তাই নতুন করে বংশগৌরবের সন্ধান করতে থাকে। এক সময় দেখা গেলো যে, ওই পরিবারের সবাই নামের আগে লিখছেন 'খাজা'। আগে তো এরা খাজা টাজা কিছু ছিলেন না, এখন হঠাৎ করে খাজা হয়ে গেলেন কী করে? গাঁয়ের লোকের কৌতূহলের জবাবে ওই পরিবারের প্রধান জানালেন : তাদের একটি পুরনো ঘরের মেঝে খুঁড়তে গিয়ে একটি চোঙ্গা পাওয়া গেছে, সেই চোঙ্গার ভেতর ছিলো একতাড়া পুরনো কাগজ। সেই কাগজের লেখা পড়ে জানা যায় যে, তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন 'খাজা'। এভাবেই তারা তাদের বংশের হারানো পদবীটি ফিরে পেয়েছেন।

গাঁয়ের লোক কিন্তু এতো সহজে কথাটি বিশ্বাস করতে পারলো না। তারা বিদ্রূপ করে ওদের নাম দিলো 'চোঙ্গার খাজা'।

হেকিম ভাই বলতেন, এ রকম 'চোঙ্গার খাজা' যে কতো আছে কে জানে?

বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসের গবেষকগণও লক্ষ করেছেন : সাধারণ অনভিজাত মুসলমানরা যখন কোনো রকমে সম্পদশালী হয়ে উঠেছেন, তখন তারা অনেকেই নামের সঙ্গে ওজনদার পদবী যুক্ত করে নিয়েছেন এবং এভাবেই 'আতরাফ' পরিচয় মুছে ফেলে 'আশরাফ' হওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

এরকম প্রয়াসের দৃষ্টান্ত হিসেবে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ তাঁর গবেষণা 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা'য় দুটো প্রবাদের উল্লেখ করেছেন। প্রবাদ দুটো হচ্ছে ঃ

(১) আগে ছিলো উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দিন,
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।

(২) গত বছর আমি একজন 'জোলা' ছিলাম, এ বছর আমি একজন 'শেখ', আগামী বছর ভালো দর পেলে আমি একজন 'সৈয়দ' হবো।

গ্রন্থের পাদটীকায় ডক্টর আহমদ দ্বিতীয় প্রবাদটির একটি ফারসী রূপের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

পেশ আই ইন কাসাব বুঁদে
বাদাজান গুশতে শৈখ
খালা চুঁ আরজান শাওয়াদ
ইস সাল সৈয়দ মেশাওয়েঁ।

এর অর্থ—প্রথম বছর আমরা কসাই ছিলাম, পরের বছর শেখ, বর্তমান বছরে যদি ভালো দাম পাই তবে আমরা সৈয়দ হবো।

ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও এরকম উঁচু জাতের গৌরব ও জাতে ওঠার নানা কায়দা-কানুনের প্রচলন এদেশের মুসলমানদের মধ্যে একেবারে কম ছিলো না। হিন্দু সমাজের মতো জাতের নামে বজ্জাতির নানা উপাদানও মুসলমান সমাজের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। এমনকি, তথাকথিত শরিফ মুসলমানরা অন্য মুসলমানদের প্রতি আচরণে ছুৎমার্গেরও পরিচয় দিতো। উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান-সম্পাদিত

পত্রপত্রিকাগুলোতে এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী '*আল এসলাম*' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, তেরোশো ছাব্বিশ সাল) লিখেছিলেন—'শরিফ-রজিল বা আশরাফ-আতরাফের পার্থক্য বঙ্গদেশীয় মুসলমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল।...পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের অংশ বিশেষে শরাফতের দাবীদাওয়াটা খুব বেশি। তত্রত্য তথাকথিত শরিফগণ অশরিফগণকে কুকুর, শৃগাল হইতেও অধম বলিয়া জ্ঞান করে।...উত্তরবঙ্গে 'বাদিয়া' 'নিকারী' ও আসামে 'মাটিয়া' উপাধিবিশিষ্ট মোসলমানগণ একসঙ্গে অন্য মোসলমানের সহিত আহার করা দূরে থাকুক, এক মসজিদে, এক ঈদগাহে বা মাঠে নামাজ পড়িতেও পারে না। সালাম আদান-প্রদানের অধিকারীও নহে।...মধ্যবঙ্গে নদীয়া, ২৪ পরগণা অঞ্চলে কোন নীচ জাতীয় হিন্দু মোসলমান হইলে তাহাকে সমাজে নেওয়া হয় না, জুমা জামাতে শরিক করা হয় না।'

এতোখানি মর্মান্তিক অবস্থা অবশ্যি আমাদের এলাকায় আমি দেখিনি। কখনো এ-রকম ছিলো বলেও কারো কাছে শুনিনি। আমি তো বরং আমার শৈশবে, পাকিস্তানি ভাবনার জোয়ারের মুখেও, আশরাফদের চেয়ে তথাকথিত আতরাফ মুসলমানদের প্রতাপই বেশি দেখেছি। পাকিস্তানের জন্মের পরও এই আতরাফ মুসলমানরা তাদের লৌকিক ভাবনার জগতটি একেবারে পরিত্যাগ করেনি। সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় টানটান হয়ে উঠে এরা পাকিস্তানি জোশ দেখিয়েছে বটে, কিন্তু কখনো প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েনি। তবে পাকিস্তানি জোশ যে তাদের সকলকে মুসলমানত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলো—এ কথা ঠিক। মুসলমানদের ভেতর যতোই আশরাফ-আতরাফের ভেদ থাকুক, সে ভেদকে কোনো মতেই হিন্দুদের জাতভেদের সঙ্গে এক করে দেখা চলে না। হিন্দুদের মতো মুসলমানের জাত কচুপাতার পানি নয়। কোনো কিছুতেই মুসলমানের জাত যায় না। যে সব হিন্দুর জাত চলে যায় তারাই বরং মুসলমান হয়ে একটা নতুন জাতের ঠিকানা পায়। হিন্দুরা তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষকে দেখে নানা জাতে ভাগ করে—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কৈবর্ত, ধোপা, নাপিত, তেলী, কামার, নমশূদ্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যখন এ সব যে কোনো জাতের যে কোনো লোক মুসলমান হয়ে যায় তখন তাদের অন্য কোনো জাত-পরিচয় আর থাকে না, তার তখন একটিই জাত—মুসলমান। কলু, নিকারি, কারিগর, আবদাল—এরকম বংশানুক্রমিক পেশাভিত্তিক কিছু কিছু জাত মুসলমান সমাজে তৈরি হয়ে গেলেও, এর কোনোটিই হিন্দুদের জাতের মতো চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে না। পেশা পরিবর্তন করে, ধন সম্পদের অধিকারী হয়ে, লেখাপড়া শিখে, উঁচুঘরে বিয়েশাদি করে এবং এ-রকম আরো নানা উপায়ে মুসলমানরা জাতের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক প্যাটার্নের গ্রাম সমাজে বংশগৌরবের গুরুত্ব অনেক বেশি যদিও, তবু নিজের অর্জন দিয়ে বংশগৌরবের ঘাটতি দূর করে নেয়াটা মুসলমানের জন্যে মোটেই কঠিন কিছু নয়। তাছাড়া মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে উঁচু নিচু বা আশরাফ-আতরাফের টানাপোড়েন যতোই থাক, হিন্দুদের দৃষ্টিতে সব মুসলমানই এক জাত। এ জাত অস্পৃশ্য, অচ্ছ্যুৎ। সব হিন্দুর কাছে অস্পৃশ্য যে ডোম কিংবা বাগদি জাত, সে জাতের কাছেও মুসলমান জাত অস্পৃশ্য।

এই 'জাত' শব্দটা দিয়ে অবশ্যই গোষ্ঠী বা কাস্ট বা কমিউনিটি বোঝায়, 'জাতি' বা 'নেশন' নয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে তাদের নিজেদের মধ্যে নানা জাত সৃষ্টি করে রাখতে পেরেছে, স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ীই এ সব জাত নিজের নিজের অধিকারের সীমানা

মেনে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমান তো ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বা তার স্মৃতিশাস্ত্রের অধীন নয়। হিন্দুরা মুসলমানকে যে অর্থেই একটি 'জাত' বলুক, মুসলমান সে অর্থকে মেনে নিতে পারে না, মেনে নেয়ওনি। ধর্মীয় নেতাদের কাছে সে 'কওম'-এর কথা শুনেছে। চল্লিশের দশকের মুসলমানকে সেই কওমের ভাবনাই ভাবানো হয়েছে।

তবে হিন্দুরা সব মুসলমানকে একটি 'জাত' শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করায় মুসলমানদের ক্ষতি কিছু হয়নি, এতে তাদের কওমী ঐক্য গড়ে তুলতে সুবিধাই হয়েছে বরং। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিয়ে সংগ্রামের এক পর্যায়ে নিজেদেরকে তারা কমিউনিটির বদলে নেশন বলে ঘোষণা করলো—জাত থেকে হয়ে গেলো জাতি। আরবি 'কওম' ইংরেজি 'নেশন'-এর সংজ্ঞাকে বিকৃত করে হলো বাংলা 'জাতি'। মুসলমান জাতি। দি মুসলিমস্ আর অ্যা নেশন—জিন্নাহ্‌র ভাষায় পাকিস্তানের 'ভাইটাল প্রিন্সিপল্'।

এ ধরনের জাতিতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের নিয়মনীতির বিবেচনায় অবশ্যই ভ্রান্ত—একেবারেই ভ্রান্ত। তবু এই ভ্রান্ত তত্ত্বই যে একটা পুরো জনগোষ্ঠীকে মাতিয়ে তুলতে পারলো একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তার হেতুটি যে সমাজ বাস্তবের মাটিতেই লুকিয়ে ছিলো—সে কথা অস্বীকার করাও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না নিশ্চয়ই।

'আকবর বাদশার সঙ্গে সলিমুদ্দিন চাষীর কোনো ভেদ নেই'

তালুকদাররা যাদের তুই, তুমি বা আপনি না-বলে ভাববাচ্যে কথা বলতো, চল্লিশের দশকে তাদেরই একটি প্রভাবশালী অংশ 'দি মুসলিমস্ আর অ্যা নেশন'-এর বীজমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলো। খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম হয়েছিলেন সেই দীক্ষিতদেরই একজন।

তার সহযোগী বা সহমর্মী স্বগ্রাম সিংহের গাঁওয়ে বোধ হয় কেউই ছিলো না। কেবল কিছু অনুগামী তিনি সৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলেন মাত্র। কারণ এ-গ্রামের মুসলমান কৃষকের ছেলেরা তখনো স্কুল-কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি। পাশের গ্রাম কচন্দরার লাল মিঞা স্কুলে হেকিম ভাইয়ের সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি ডাক্তারী পাস করেছিলেন। হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে আলাপে প্রসঙ্গক্রমে মাঝেমধ্যে তাঁর কথা উঠতো। এছাড়া পাকিস্তান-ভাবনায় তার আর যে-সব সহযোগীর কথা তিনি বলতেন, তাদের কাউকে আমি দেখিনি। তাদের কারো নামও আমার মনে নেই। তাঁরা ছিলেন তাঁর কলেজের সহপাঠী অথবা আত্মীয়। সহপাঠী বা আত্মীয় নন, এমনকি সাক্ষাৎ পরিচয়ও ছিলো না যাদের সঙ্গে, এ-রকম অনেকের কথাও তিনি বলতেন। শহুরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। খুব সহজে তাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। অনেকের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ও অনেককে গুঁতো দিয়ে টিকে যেতে বা সটকে পড়তে হতো তাদের। এ রকম অনেকের জীবন সংগ্রামের নানা উত্তেজনাকর কাহিনী হেকিমভাই আমাকে শুনিয়েছিলেন। উকিল মোক্তার বা ডাক্তারের মতো স্বাধীন পেশাতেও যেমনি, তেমনি সরকারি বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিলো এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই অসম। প্রতিপক্ষ অনেক বেশি প্রবল। আরবি নামধারী মানুষগুলোর সেই প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলো সংস্কৃত নামধারীরা। জন্মসূত্রে সংস্কৃত নামধারী হয়েও যিনি শেষ পর্যন্ত আরবি নাম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন—শচীন্দ্র শর্মা থেকে হয়েছিলেন সুলতান উদ্দিন খাঁ—তারই অধস্তন নবম পুরুষ খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম তার যৌবনে সকল আরবি নামধারীর সঙ্গে যে গভীর একাত্ম ও

সংস্কৃত নামধারীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তার কারণটি খুঁজে পাওয়া যাবে চল্লিশের দশকের সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই। গ্রামে তিনি আরবি নামধারীদের প্রতি সংস্কৃত নামধারী তালুকদার জোতদারদের অবজ্ঞা-অবহেলার জঘন্য রূপ দেখেছেন, শহরেও দেখেছেন তারই রকমফের। খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের মতো স্কুল-কলেজপড়া যুবকদের চোখের সামনে থেকে তখন গ্রামীণ লোকজীবনের সনাতনী ছবিটি সাময়িকভাবে হলেও মুছে গেছে। গ্রামের হিন্দু বা মুসলমান যে উভয়ের আচারভেদ ও খাদ্যাখাদ্যভেদকে মেনে নিয়েই পরস্পরকে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে এবং এতে আছে বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্যের একটা বোধ—নতুন প্রজন্মের সাক্ষর মুসলমানরা এ কথা আর মানতে রাজি নয়। মুসলমানের ছোঁয়া লাগলেই যে হিন্দুর জাত যায়—এ বিধানের মধ্যে তারা হিন্দুর জাতের দম্ভই প্রত্যক্ষ করলো। এ দম্ভের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াতে গিয়ে তারা নিজেদের জন্যেও দম্ভের কিছু বাস্তব আর প্রচুর কল্পিত উপাদান জড়ো করতে লাগলো এবং এ সব উপাদান ব্যবহার করে নিজেরাও দাম্ভিক হয়ে উঠলো। মুসলমানের এক কল্পিত অতীতকেই একান্ত বাস্তব ভেবে নিয়ে নিজের চারপাশে একটা আত্মসম্মোহনের জাল তৈরি করে নিলো।

'এই বাংলাদেশটা, তামাম হিন্দুস্তানটা কাদের ছিলো জানো?...সেই যে আকবর বাদশা, তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা ছিলেন। আর ওই যে নবাব আলীবর্দী তিনি ছিলেন সুবে বাংলার হর্তাকর্তা, মালিক। তাদেরই বংশধর আমরা, এই দেশ তো আমাদের।...কিন্তু ঐ শুয়োরখোর ইংরেজ৷ কেড়ে নিলো আমাদের বাদশাহি তখ্‌ত্। বাদশার জাত আমরা ভিখিরির জাত। পোয়াবারো, ওই মালাউনদের, জমিজিরাত সবই লুটেপুটে খাচ্ছে ঐ ব্যাটারা।'—শহীদুল্লা কায়সারের '*সংশপ্তক*' উপন্যাসের ফেলু মিঞার এ উক্তিটিই নানাভাবে নানা ভাষায় চল্লিশের দশকের অনেক মুসলমানের মুখে শোনা গেলো। এবং উঁচু তলার মুসলমানরা এ বক্তব্যটিকেই নিচুতলার মুসলমানদের মধ্যে চারিয়ে দিলো। নিচুতলার মুসলমানদের মাথায় যখন ঢুকিয়ে দেয়া গেলো যে, তারা 'বাদশার জাত', তখনই উঁচুতলার বা উঁচুতলার কাছাকাছি মুসলমানদের শক্তি বেড়ে গেলো কয়েকগুণ। সব মুসলমানই বাদশার জাত, সব মুসলমানই এক। মুসলমানে মুসলমানে কোনো ভেদ নেই, কোনো বিবাদ নেই, কোনো শত্রুতা নেই। মুসলমানদের কাছ থেকে বাদশাহি কেড়ে নিয়েছে নাছারা ইংরেজরা। বিদেশি নাছারাদের সঙ্গে মিলে গেছে এদেশের মালাউন হিন্দুরা। এই নাছারা আর মালাউনরা মিলে বাদশার জাত মুসলমানকে বানিয়েছে ভিখিরির জাত। এখন আবার নাছারাদের হাত থেকে বাদশাহি নিয়ে আসার জোগাড় করছে মালাউনরা। কাজেই ভাই মুসলমান, সবাই এক হও। ওই বাদশাহি ফিরিয়ে আনতে হবে। বাদশাহি ফিরিয়ে আনার জন্যে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'।

এদেশের সব মুসলমানই যদি হয় বাদশাহর জাত—অর্থাৎ আকবর বাদশা আর নবাব আলীবর্দীর গোত্রের মানুষ—তা হলে যারা হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হয়েছে তাদের পরিচয়টা কী হবে? অনেকেই তো বলেছেন : বর্ণহিন্দুদের নির্যাতন-নিপীড়ন কিংবা বর্ণাশ্রমের অমানবিক কঠোরতা সইতে না পেরেই এদেশের নিম্নবর্ণ ও দরিদ্র হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয় এবং এভাবেই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হয়ে যায় মুসলমান। তাই যদি হয়, তাহলে এ কথাও তো মানতে হয় যে, নিপীড়িত-নির্যাতিত ও দরিদ্র মানুষরাই এদেশের মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ ভিখিরি অবস্থাতেই অমুসলমান

থেকে মুসলমান হয়েছে বিপুল অধিকাংশ মানুষ। মুসলমান হওয়ার পরও তাদের অবস্থার খুব একটা হেরফের হয়নি। ভিখিরিরা ভিখিরিই থেকে গেছে। এখন এরা সবাই নিজেদেরকে বাদশার জাত ভাবতে পারলো কী করে?

হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে এ-সব প্রশ্ন নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে। তখন তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে তার চল্লিশের দশকের ভাবনাগুলোর পুনর্বিচার করে চলেছেন। সাতান্ন সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সে দলে যোগ দিয়েছেন। কাজেই আমার প্রশ্নগুলো নিয়ে সে-সময়ে তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে খোলাখুলি মত প্রকাশ করতেন। কখনো কখনো নিজের অতীত নিয়েই ব্যঙ্গ করতেন।

হেকিম ভাই তার যৌবনের স্মৃতিচারণ করে বলতেন, 'সে-সময়ে আমরা এ-দেশের ইতিহাসে কেবল মুসলমানের গৌরবগাথা খুঁজতাম। আমাদের পাঠ্য ইতিহাসে তো রাজা আর রাজবংশের বিবরণ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। হিন্দু রাজার সঙ্গে মুসলমান বাদশার যুদ্ধে বাদশাই যে জিতবেন, আমাদের বিবেচনায় এ ছিলো অবধারিত। যে-সব ক্ষেত্রে ইতিহাস বইয়ে বাদশার পরাজয়ের কথা দেখতাম, সে-সব ক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিয়েছি যে কথাগুলো ঠিক নয়। হিন্দু লেখকরা মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যেই এ রকম কথা বানিয়ে লিখেছে।'

হেকিম ভাইয়ের সহপাঠিদের মধ্যে দু'চারজন মাত্র ছিলো মুসলমান, আর সবাই হিন্দু। ইতিহাস নিয়েই ওই হিন্দু সহপাঠিদের সঙ্গে তর্কটা বেশি হতো। সে তর্কে হিন্দু সহপাঠীরা যে শুধু সংখ্যার জোরেই জিতে যেতো, তা নয়। তাদের পক্ষে তথ্যের সম্ভারও ছিলো অনেক বেশি। আর সে সব তথ্যের জোগান আসতো যে সব বই থেকে সে-সবের কোনোটারই লেখক ছিলো না কোনো মুসলমান। হিন্দু সহপাঠিরা কখনো আকার-ইঙ্গিতে কখনো বা স্পষ্ট ভাষাতেই মুসলমানদের 'চাষাভূষা' বলে বিদ্রূপ করতো। মুসলমানের কোনো কালচার নেই, কেবল আছে এগ্রিকালচার—এরকম কথা বলাকেও ওরা উচ্চাঙ্গের রসিকতা বলে মনে করতো। আর এ-রকম রসিকতা যাদের উদ্দেশে করা হচ্ছে তাদের জন্যে যে তা কতোখানি মর্মচ্ছেদী হতে পারে, সে-সম্পর্কে সামান্য বোধও ওই রসিকদের ছিলো না।

হেকিম ভাইয়ের অন্য অন্য মুসলমান সহপাঠিরা হয়তো স্থূল রসিকতার জবাব স্থূলতর ভাষাভঙ্গিতেই দিতো। কিন্তু আবহমান বাংলার লোকঐতিহ্য-সংস্কৃতির ধারক, উদার চেতনা সম্পন্ন ও অত্যন্ত উঁচু মানের বাউল কবি জালাল উদ্দিন খাঁর পুত্র খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের রুচি ছিলো অনেক উন্নত। ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল কবি, ছেলেবেলা থেকেই বিস্তৃত ছিলো তাঁর পড়াশোনার পরিধি, তাঁর মননশীলতা ছিলো অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা। সেই মননশীলতার ওপর ভর করেই তিনি তাঁর হিন্দু সহপাঠিদের ঠেস দেয়া কথার অন্যতর জবাব সন্ধান করতে লাগলেন।

'মুসলমানের কোনো কালচার নেই'—এ অপবাদের জবাবই তিনি দিতে চেয়েছিলেন তার বাড়িতে 'আবেহায়াৎ সাহিত্য মজ্জিল' প্রতিষ্ঠা করে। আশুজিয়ার হিন্দু তরুণদের মতোই তিনি নাটক অভিনয় নিয়ে মাতলেন এবং সিংহের গাঁও ও আশপাশের গ্রামের মুসলমান যুবক-কিশোরদের অভিনয়-শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। নিজের কবিতাকে মুসলিম তমদ্দুনের বাহন করে তুললেন। বাড়িতে ঘন ঘন গানের আসর বসাতে লাগলেন। সে-আসরে তার বাবার বাউল ও মারফতি গানের পাশাপাশি আধুনিক নাগরিক সঙ্গীতেরও চর্চা চললো।

নিজেও ইসলামী গানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গান রচনায় মন দিলেন। তার 'নীল কপোত'-এর প্রেমগীতিগুলো আধুনিক গানেরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

হেকিম ভাই সুযোগ-পেলেই তার চল্লিশের দশকের দিনগুলোর স্মৃতির ঝাঁপি আমার সামনে খুলে ধরতেন। আর আমি তার মধ্যেই দ্বিজাতিতত্ত্বের নির্মাণ প্রক্রিয়াটি অবলোকন করতাম। পাকিস্তানের জন্মের দিনটি ওই প্রক্রিয়াতেই কীভাবে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে এসেছিলো তাও দেখতে পেতাম।

উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় সাঁইত্রিশ সাল থেকে বাংলার নির্বাচিত সরকার ছিলো মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। আর এর ফলে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত মুসলমানের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রটি যেমন অনেক মসৃণ হয়ে গিয়েছিলো তেমনি মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও তাদের জন্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের জোগান এসেছিলো। শিক্ষায় ও সম্পদে প্রতিপক্ষ হিন্দুরা অনেক প্রবল হলেও চল্লিশের দশকে বাংলার রাজনৈতিক শক্তিটি এসে গিয়েছিলো উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্তের অনুকূলে। সেই অনুকূল রাজনৈতিক শক্তির বলেই প্রবল প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করাও তাদের পক্ষে অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে এসেছিলো। এ-ধরনের একটি অনুকূল পরিবেশকে যে কিছুতেই নষ্ট হতে দেয়া উচিত নয়, এ-রকম একটি বোধ সকল মুসলমান মধ্যবিত্তের মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিলো। ঔপনিবেশিক শাসনের আওতার ভেতরে থেকেই কেউ কেউ শাসক হওয়ার স্বাদ পেয়ে যান। সে স্বাদ থেকে যারাই তাদের বঞ্চিত করতে চায় তারাই হয় তাদের দুশমন। বিদেশি শাসক চলে গেলেও অখণ্ড ভারতের শাসন ক্ষমতায় যে তাদের অধিষ্ঠান হবে না এবং সে জন্যেই যে চাই একটি আলাদা রাষ্ট্র, চল্লিশের দশকের নব্যশিক্ষিত মুসলমান এ বিষয়ে ছিলো নিঃসংশয়। এ নিঃসংশয় বোধ থেকেই তারা হয়ে ওঠে দ্বিজাতিতত্ত্বের সোচ্চার প্রচারক। শহরে-বন্দরে গাঁয়ে-গঞ্জে তারা প্রচার করে : মুসলমান জাতি কেবল এই ইংরেজ রাজত্বেই ইংরেজ আর তার সহযোগী হিন্দুর শাসন-শোষণে হতদরিদ্র হয়েছে। অতীতে কখনো এমনটি ছিলো না, ভবিষ্যতেও এ-রকম থাকবে না। পাকিস্তান কায়েম হলে এই 'বাদশার জাত' আবার হবে বাদশা 'ফিরে পাবে অতীতের সব শান শওকত'। মুসলিম লীগের নেতারা বিভিন্ন জনসভায় পাকিস্তানের এ-রকম ছবিই তুলে ধরতেন। যেমন, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্ জানিয়েছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলমানরা কী পাবে তার ফিরিস্তি দিতে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন চট্টগ্রামের এক জনসভায় বলেছিলেন, 'পাকিস্তান হাসিল হলে, আপনার ছেলে মুন্সেফ হবে, তার ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হবে, উনার ছেলে ডেপুটি হবে, দারোগা হবে।'

এ-রকম কথা শুনতে শুনতে শোষিত-বঞ্চিত মুসলমান চাষী সলিমুদ্দিনও ভবিষ্যতের পাকিস্তানের মধ্যেই দেখতে পেলো এক সব পেয়েছির দেশ, 'কিনু গোয়ালার গলি'র হরিপদ কেরানির মতোই সে ভাবতে লাগলো—'আকবর বাদশার সঙ্গে সলিমুদ্দিন চাষীর কোনো ভেদ নেই।'

কোনো কোনো মুসলিম লীগ নেতার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে এ্যাপ্রোচটি ছিলো এ-রকম : ব্রিটিশরা মুসলমানের কাছ থেকেই এ-দেশের তখ্ত্ কেড়ে নিয়েছিলো, তাই এখন সেই তখ্ত্ মুসলমানকেই ফেরত দিয়ে ওরা নিজের দেশে ফিরে যাক।

আর এরই বিপরীতে, পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্র জোয়ারের মুখে, স্বমূর্তি ধারণ করে দীর্ঘকালের কায়েমি স্বার্থভোগী হিন্দু জমিদার-তালুকদার-জোতদার-মহাজনরা। আবুল মনসুর আহমদ তার উপন্যাস *'জীবন ক্ষুধা'য়* এদেরই মুখপাত্র রূপে হাজির করেছেন সুরেন মিত্র নামক

একটি কাল্পনিক চরিত্রকে। ময়মনসিংহের উপভাষায় সুরেন মিত্র বলে, 'পাকিস্তান চায় মুসলমানরা কোন অধিকারে? এ দেশ কার? আর্যরার। মুসলমানরা তো বিদেশি। তারাও তো ইংরেজের মতো জোর কৈরা আমরার মাতৃভূমি দখল করছিলো। তারা এ দেশে থাকতে চায়, হিন্দুরার লগে মিইশা থাকুক। না থাকতে চায়, চইলা যাউক তারার আরব দেশে। আরেকটা ব্যাপার দেখ। দেশের স্বাধীনতার লাগি আন্দোলন করলাম, জেল খাটলাম, ফাঁসিতে ঝুললাম আমরা হিন্দুরা। আর ইংরেজরা চইলা যাইতেছে দেইখা এখন মুসলমানরা কয়, আমরা অংশ চাই, দেশ বাঁটোয়ারা করুম। আরে আমার শরিক রে।'

কথাগুলো একটি উপন্যাসের কাল্পনিক,চরিত্রের মুখের কাল্পনিক সংলাপ হলেও সুরেন মিত্র চরিত্রটি উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি নয়। আমি নিজেই এ-রকম অনেক অনেক সুরেন মিত্রকে দেখেছি, ওদের মুখে হুবহু এ-রকম উক্তিই শুনেছি। শহীদুল্লাহ্ কায়সারের ফেলু মিঞার মতো আবুল মনসুরের সুরেন মিত্রও বাস্তব—একান্ত বাস্তব। এদেশের গাঁয়ে ও শহরে বাস্তবের ফেলু মিঞা ও সুরেন মিত্ররাই অনেক অনেক কল্পনার ফানুস উড়িয়ে অনেক অনেক মানুষের মনে রঙ লাগিয়েছে। একদল মেতেছে পাকিস্তানের সবুজ রঙের নেশায়, আরেক দল হাঁটু গেড়ে বসেছে অখণ্ড ভারতমাতার তিনরঙা মূর্তির সামনে। জোতদার ফেলু মিঞা-কালুমিঞাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্গাদার সলিমুদ্দিন-কলিমুদ্দিনরাও নিজেদের ভেবেছে 'বাদশার জাত'। সুরেন মিত্রদের মতো বর্ণহিন্দুদের কাছে যারা অস্পৃশ্য অনার্য, সেই সুবল নমদাস বা শরৎ ধোপারাও স্ফীত হয়ে উঠেছে আর্যগৌরবে।

এমনই মাহাত্ম্য দ্বিজাতিতত্ত্বের। এ দ্বিজাতিতত্ত্ব শোষিত-নিপীড়িত মানুষগুলোকে শ্রেণীস্বার্থ ভুলিয়ে দেয়, তাদেরকে মিলিট্যান্ট মুসলমান কিংবা হিন্দু বানিয়ে তোলে। আর শোষকদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী শোষিতদেরই সহায়তায় গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার মওকা পেয়ে যায়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে পাপের ছিদ্র ও শনির প্রবেশ

উনিশশো সাতান্ন-আটান্নর দিকে হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনায় আমার ধারণা জন্মেছিলো যে, চল্লিশের দশকের একেবারে গোড়া থেকেই এ দেশের গ্রাম এলাকার মুসলমানের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভাবনা আস্তে আস্তে ছড়াতে থাকে। এরপর ছেচল্লিশ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলমানদের জন্যে নির্ধারিত আসনে মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, সে বছরেই আগস্ট মাসে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ঘোষণা এবং তারই অনিবার্য পরিণতিতে কলকাতা-বিহার-নোয়াখালির হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—এই কয়েকটি ঘটনার প্রভাব এমন সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে যে, তখন আর হিন্দু-মুসলমানকে এক ভাবার কোনো সুযোগই যেনো অবশিষ্ট থাকে না। তখন আরবি নামধারী মানুষরা একদিকে, অন্যদিকে সংস্কৃত নামধারীরা। অর্থাৎ মুসলমান আর হিন্দু যেনো দু'টি সমান্তরাল রেল লাইন। পাশাপাশি আছে কিন্তু মেশামেশি হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। আবার সমান্তরাল রেল লাইনের উপমাকেও বেশি দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া চলে না। কারণ রেলের দু'টি লাইন তো পরস্পরের পরিপূরক, দুটোতে না মিললেও রেলগাড়িটিকে তারাই মেলায়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কিন্তু এমনটি হওয়ারও কোনোই উপায় নেই। তারা মিলবেও না, মেলাবেও না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের থাকতে হবে। ধুতি-লুঙ্গির দ্বন্দ্বের কোনো মীমাংসা নেই। জল আর পানি দুটো আলাদা জিনিস, স্নান আর গোসল সম্পূর্ণ পৃথক দুটো কর্ম! মাংস আর গোশত, ডিম আর আণ্ডা কখনো এক হতে পারে না!

দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা অনেক লেখকই সমান্তরাল রেললাইনের উপমা দিয়ে এদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন। কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র প্রধান সংগঠকরূপে আবুল মনসুর আহমদই বোধহয় সর্বপ্রথম এই উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন। এরপর থেকেই এটি বহুদিন ধরে ক্রমাগত ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

উনিশশো ছেচল্লিশের অনেক কথাই তো আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সে সময়ে ধুতি-লুঙ্গি দ্বন্দ্বসমাস এমন স্পষ্ট রূপ ধরেছে যে, 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'—জাতীয় কথাগুলো নিছক পরিহারের মতো শোনায়। অথচ সে সময়েই নজরুলের এ গানটি গাঁয়ে-গঞ্জে প্রচুর প্রচার পেয়েছে। সে-সময়েই আমাদের গ্রাম এলাকার অনেক সচ্ছল মানুষের বাড়িতে কলের গানের প্রবেশ ঘটে গেছে। গ্রামোফোনকেই গাঁয়ের মানুষ বলতো কলের গান। কলের গানই আব্বাস উদ্দিন আর শচীন দেব বর্মণকে সকল গাঁয়ের মানুষের আপন জন করে তুলেছে। কলের গান শুনেই গাঁয়ের যুবক-কিশোররা নিজেদের কণ্ঠে তুলে নিয়েছে 'ওই মালতীলতা দোলে'। এ গানটিকে সবাই বলতো আধুনিক গান। এটি যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, সে-কথা আমি জেনেছি অনেক বছর পরে। কলের গানই গাঁয়ের মানুষকে রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুল ইসলামের গান আর আধুনিক গানের সঙ্গে পরিচয়ের নিবিড়তা এনে দিয়েছে। পল্লীর বাউল-মারফতি-ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়ার মতো এ-সব গানও তো দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলে না। পল্লীর গানের মতো এ-সব গানও বাঙালির সেক্যুলার ঐতিহ্যেরই ধারক। তবু কী আশ্চর্য, চল্লিশের দশকে কলের গানের মারফত গাঁয়ের ঘরে ঘরে সেক্যুলার বাঙালি সংস্কৃতির বাণী ও সুরের ব্যাপক প্রচার ঘটলেও, এ-সময়েই কিনা গেঁয়ো আর শহুরে নির্বিশেষে প্রায় সকল বাঙালিই হয়ে গেলো কমবেশি কম্যুনাল। কম্যুনিটিই তার কাছে হয়ে গেলো নেশন, কম্যুনালিজমকেই সে গ্রহণ করলো ন্যাশনালিজমের বেনামিতে।

কলের গানেই আমরা প্রথম শুনি শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের রেকর্ড। সেই নাটক শুনে আমাদর সে কী উত্তেজনা! পথে ঘাটে মাঠে আমরা সিরাজউদ্দৌলা, মোহনলাল, গোলাম হোসেন, লুৎফা আর আলেয়ার সংলাপ আওড়াই। এ সময়ের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের বইটিও গাঁয়ের মানুষের হাতে এসে যায়। এ পাড়া ও পাড়ায় স্টেজ বেঁধে শুরু হয়ে যায় 'সিরাজউদ্দৌলা'র অভিনয়। কিন্তু 'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, বাংলা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গুলবাগ'—সিরাজের এই সংলাপ শুনে যতোই হাততালি দিই, বাস্তবে কি এ-কথা আমরা বিশ্বাস করেছি? করিনি যে, তার প্রমাণ তো আমরা আমাদের সব কাজেকর্মেই রেখেছি। হেকিম ভাইয়ের পরিচালনাতেও তার বাড়ির গোলঘরে বেশ কয়েকবার 'সিরাজউদ্দৌলা'র মঞ্চায়ন হয়েছে, তিনি নিজেই সিরাজের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেছেন। অথচ, অন্তত চল্লিশের দশকে, বাংলাকে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গুলবাগ বলে মনে করতেন না। কিন্তু তার রক্তে ছিলো হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতিরই ঐতিহ্য। যে বাউল পিতার সৃষ্টি সম্ভারের প্রতি ছিলো তার অসীম শ্রদ্ধা, সেই জালাল উদ্দিন খাঁর 'জাতে জাতে যার তার মতে, গেছে ধর্ম বিভাগ করে' কিংবা 'বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে হিন্দু কে মুসলমান'—এসব বাণীতেও তো পুত্র খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম আস্থা হারাতে পারেন না। তবে আস্থা না হারালেও সে-আস্থার সূর্যকে যে সে-সময়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাহু এসে গ্রাস করেছিলো, সে-কথাও একান্ত সত্য। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, সাম্প্রদায়িক

সমস্যার চরম অবনতি দেখে, অনেক উদার অসাম্প্রদায়িক মানুষও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগকেই শেষ সমাধান বলে ধরে নিয়েছিলেন। গরু কোরবানি আর মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড-কারখানা অনেক দিন ধরে চলতে থাকায় এমনিতেই শান্তিপ্রিয় মানুষরা ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস একেবারে ধসে পড়লো। এভাবে একত্রে থেকে খেয়োখেয়ি করার চেয়ে হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে যাওয়াই যে ভালো, সে-কথাই বলেছিলেন সুফী জুলফিকার হায়দার নামক এক কবি—

'বহুদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমান এ দুই মহাজাতে
একে অন্যের প্রতি দিনের পর দিন, বহু নির্মম
আঘাতে আঘাতে
ভেঙেই গেছে যখন হৃদয়ে হৃদ্যতার মন্দির মসজিদ
তবে কেন আর মিথ্যা ছলনা অথবা কাস্তেয় শান
দেয়া'।

এভাবেই, চল্লিশের দশকেই, দ্বিজাতিতত্ত্ব পৌঁছে গেলো চূড়ান্ত পরিণতিতে।

তাই বলে এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণাটি চল্লিশের দশকে জন্ম নিয়ে সে দশকেই গায়ে গতরে বেড়ে ওঠে এবং হঠাৎ করে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, দ্বিজাতিতত্ত্বের চূড়ান্ত পরিণতি চল্লিশের দশকেই ঘটেছিলো বটে, কিন্তু ধারণা রূপে এর বয়স নিতান্ত কম নয়। উনিশ শতকেই এর জন্ম হয়েছে, আর এর জন্মদাতা স্যার সৈয়দ আহমদ—দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে এমন কথাও তো বলেছেন অনেকে।

তবে যে যাই বলুন, দ্বিজাতিতত্ত্বই হোক আর একজাতিতত্ত্বই হোক, 'জাতি' বস্তুটার জন্ম এদেশে হয়ইনি। 'জাতি' বলতে আমি ইংরেজি 'নেশন'-এর কথা বলছি। 'নেশন'-এর তর্জমা আমরা 'জাতি' শব্দটি দিয়ে করেছি বটে, কিন্তু এ-কথাও না মেনে উপায় নেই যে, জাতি আর নেশন মোটেই এক নয়। আমাদের কাছে জাতি মানে ছিলো জাত। আর এই 'জাত' হতে পারে 'কাস্ট'-এর প্রতিশব্দ। যখন 'নেশন'-এর তর্জমা 'জাতি' দিয়ে করলাম, তখনো আমাদের মগজের কোষে কোষে কাজ করেছে 'কাস্ট'-এরই ধারণা। কারণ 'নেশন' তো আমাদের দেশে কোনোদিনই ছিলো না। এর জন্য ষোড়শ শতকের ইউরোপে। আমাদের দেশে নেশন কিংবা নেশনের ধারণা গড়ে ওঠার মতো কোনো পরিবেশ ষোড়শ শতকে তো ছিলোই না, এমনকি উনিশ শতকেও তেমন পরিবেশ পুরোপুরি সৃষ্টি হতে পারেনি। রোমান চার্চ-বিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলন আর ধনতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে নেশনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ভেতর ইউরোপে নেশন ও নেশন স্টেটগুলো গড়ে ওঠে। ব্রিটিশরা আমাদের দেশে অনেক কিছুর মতো এই নেশনের ধারণাটিও নিয়ে এলো, কিন্তু এদেশে সত্যিকার নেশন গড়তে দিলো না। অনেক জাতপাত, কাস্ট, ট্রাইব, কম্যুনিটি আর রেসের এই উপমহাদেশে নেশনের জন্ম হওয়া তো এমনিতেই শক্ত, তার ওপর বিদেশি শাসকরা এ-সবের ভেদ-বিভেদকে আরো দুস্তর ও দুরতিক্রম্য করে তোলে। এরই নাম 'ভেদনীতি' বা 'ভাগ করে শাসন করা'র নীতি। শাসকশ্রেণী প্রতি দেশে প্রতি যুগেই এ নীতির প্রয়োগ করেছে। প্রাচীন রোমের শাসকরা করেছে, প্রাচীন ভারতের শাসকরা করেছে, এ যুগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও করেছে। ব্রিটিশদের ভেদনীতিই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রূণটিকে লালন করেছে এবং এদেশে প্রকৃত নেশন গড়ে ওঠার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে।

মুসলিম লীগ কিন্তু কোনোদিনই এ-কথাটি স্বীকার করেনি। হেকিম ভাইও, পঞ্চাশের দশকের শেষেও, ব্রিটিশের ভেদনীতির ফলেই দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম হয়েছে বলে স্বীকার করতেন না। অথচ সে-সময়ে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছেন।

এ নিয়ে হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে আমি অনেক তর্ক করেছি, কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভবের পেছনে কার্যকর ছিলো ব্রিটিশের যে ভেদনীতি তার সুস্পষ্ট দলিলী প্রমাণ হাজির করতে পারিনি। এ-রকম দলিলী প্রমাণসমৃদ্ধ বই-পুস্তকের সন্ধান পেয়েছি অনেক পরে, আশি ও নব্বইয়ের দশকে। রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্র, হরবংশ মুখিয়া, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এ-রকম আরো কিছু প্রগতিচেতন ইতিহাসবিদের নানা লেখায় ব্রিটিশের ভেদনীতির স্বরূপটি খুবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখেছি।

আঠারোশো সাতান্নর সিপাহী বিদ্রোহে (যা পরবর্তীকালে 'ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম'রূপে চিহ্নিত) মুসলমানদের একটি বড়ো ভূমিকা ছিলো বলে ওদের আচ্ছা করে শিক্ষা দেবার জন্যে ইংরেজদের কেউ কেউ দিল্লীর জুম্মা মসজিদকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু লর্ড ক্যানিং এ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলেন, 'আমরা যদি মুসলমানদের মসজিদ ও ব্রাহ্মণদের মন্দির ভেঙে ফেলি বা কলুষিত করি তাহলে ঠিক সেই কাজ করা হবে যাতে পরস্পরবিরোধী উভয় সম্প্রদায় আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে... ... আমাদের যেহেতু মুষ্টিমেয় (অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক) ইংরেজদের দ্বারা পনেরো কোটি মানুষের ওপর শাসন চালাতে হবে তাই আমরা এমনভাবে সেই শাসনকার্য চালাবো যাতে তারা পৃথক (ধর্ম ও জাতীয় ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই তারা এভাবে পৃথক) থেকে যায় এবং আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের মনে যেনো সর্বোচ্চ ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমভাব জাগ্রত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে তারা যেনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে না পারে।'

এরও আগে, আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালেই, লর্ড এলেনবরো বলেছিলেন, 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের কাজে লাগাতে হবে।' আর আঠারোশো আটান্ন সালে লর্ড এলফিনস্টোন এদেশে 'ভাগ করে শাসন করা'র প্রাচীন রোমান নীতি গ্রহণ করার জন্যে স্পষ্ট সুপারিশ করেছিলেন। সে-সময়কার ভারত সচিব চার্লস উড বড়লাটকে লিখেছিলেন, "ভারতের 'জাতিগুলি'র অন্তর্দ্বন্দ্বই ভারতের ব্রিটিশদের শক্তি জোগাবে। তাই 'এক বিভেদকারী শক্তিকে' জিইয়ে রাখতে হবে, কারণ সমগ্র ভারত আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে আর কতোদিন আমরা টিকে থাকতে পারবো?' আরো পরে, আঠারোশো সাতাশি সালে, আরেক ভারত সচিব লর্ড ক্রসও সে সময়কার বড়লাটকে বলেছিলেন যে, 'এই ধর্মীয় মনোভাবের বিভাগ আমাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক।'

এই সুবিধাজনক অবস্থাটিকে ব্রিটিশ শাসকরা আগাগোড়াই কাজে লাগিয়েছে। তারা মুসলমানদের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জুগিয়েছে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে, উনিশশো চল্লিশের পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে গান্ধীজীর বিপরীতে মুসলিম 'মহাত্মা'রূপে দাঁড় করাতে চেয়েছে। ব্রিটিশ প্রধামন্ত্রী চার্চিল যে জিন্নাহর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করে তাকে নানা পরামর্শ দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনকে চাঙ্গা করে রেখেছেন, সে-সব তথ্য তো এখন আর গোপন নেই।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে চার্চিল 'ভারতের ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ' বলে মনে করতেন। সেই স্তম্ভটি যাতে ভেঙে না পড়ে সে-সম্পর্কেই সচেতন ও সতর্ক করে দিয়ে তিনি বড়লাট লিনলিথগোকে উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের তেসরা অক্টোবরে লিখেছিলেন, 'আমার দৃষ্টিতে ভারত ইউরোপের মতোই বিভাগ ও বৈপরীত্যে ভরা। ব্রিটিশের কাজ হলো এই বিপুল জনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং দুইভাবে আমাদের সুবিধা ও তাদের মোক্ষলাভের জন্যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।...এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে আমি বরং দেখতে চাইবো উত্তরের মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যাতে কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবণতাকে ঠেকানো যায়।...যে ঐক্যবদ্ধ ভারত আমাদের দরোজা দেখিয়ে দেবে, তার সম্ভাবনা আমাকে মোটেই আকর্ষণ করে না। আমরা হয়তো তাকে আটকাতে পারবো না; কিন্তু তা বলে আমরা তাকে বাস্তবায়িত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো—এটা আমার পক্ষে চরম পীড়াদায়ক। অবশ্যই আমার আদর্শ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আমি দেখতে চাই যে, বিট্রিশ সাম্রাজ্য আরো কয়েক প্রজন্মের জন্যে তার শক্তি ও জৌলুস নিয়ে বেঁচে থাকবে। ব্রিটিশ প্রতিভার সর্বোত্তম প্রয়োগের মাধ্যমে কেবল এই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।'

ব্রিটিশরা তাদের 'প্রতিভার সর্বোত্তম প্রয়োগ' ঘটিয়েই যে এদেশে সত্যিকার 'নেশন' গড়ে উঠতে দেয়নি, তাদের ভেদনীতিই যে হিন্দু ও মুসলমান কম্যুনিটি দুটোকে মেকি নেশনের রূপ দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো একটি ভুয়া তত্ত্বের সৃষ্টি করেছে এবং এই তথাকথিত একটি জাতির নাম করে যে পাকিস্তান নামক একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে—এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনো সুযোগই নেই। কিন্তু ব্রিটিশের ভেদনীতিকে সর্বশক্তিমান মনে করা—কিংবা যতো দোষ নন্দঘোষের মতো হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ-বিসংবাদের সব দায় ব্রিটিশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে ধোয়া তুলসী পাতা প্রমাণের চেষ্টা করা—চূড়ান্ত আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই আহাম্মকিকেই ধিক্কার দিয়েছিলেন তার 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটিতে। উনিশশো সাত সালে '*প্রবাসী*' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি যখন তিনি প্রথম প্রকাশ করেন, তখনো তত্ত্বরূপে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রসার ঘটেনি। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি এমন কথা কেউ বলেনি। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের বক্তব্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রূণের সন্ধান পাওয়া গেলেও এটি তখনো সুস্পষ্ট অবয়ব লাভ করেনি। অথচ তখনই ক্রান্তদর্শী কবি হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের আসল রূপটি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখে ফেলেছিলেন। প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছিলেন—

"আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড় নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

"মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।

"হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে; এ-পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা ভোগ না করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।...

"... আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

"আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।"

ইতিহাসের ভ্রান্তিবিলাস, নব্যহিন্দুত্ব ও দ্বিজাতিতত্ত্ব

হেকিম ভাই কিংবা আমি কেউই একষট্টি সালের আগে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলমান নিয়ে লেখাগুলোর সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। একষট্টিতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন নিয়ে যখন বিতর্ক শুরু হলো, তখনই অনেকে তাদের লেখায় রবীন্দ্রসৃষ্টির ওদিকটির পরিচয় তুলে ধরতে লাগলেন। আমরাও রবীন্দ্র রচনাবলী খুলে পড়তে লাগলাম—'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'দেশহিত', 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলো পড়ে একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। উপলব্ধি করলাম : পাকিস্তানের জন্মের অনেক আগেই পাকিস্তানের জন্মরহস্য যার চেতনার আলোকে স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে উঠেছিলো তিনি কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। তার কোনো কোনো লেখা পড়ে তো মনে হয় যে, তিনিই যেনো মুসলমান সমাজের দরদী মুখপাত্র, মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে তিনি হিন্দু সমাজকে ধিক্কার জানাচ্ছেন, নিপীড়িত মুসলমানদের মূক মুখে ভাষা জুগিয়ে দিচ্ছেন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথকেই কিনা মৌলানা আকরম খাঁর *'আজাদ'* পত্রিকা ও পাকিস্তানপন্থী মুসলমানদের একটি দল মুসলমানবিরোধী বলে অভিযুক্ত করছে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজনকারীদের পাকিস্তানের দুশমন বলে চিহ্নিত করেছে।

হেকিম ভাই তার কৈশোরের কথা স্মরণ করে বলতেন, 'গাঁয়ের ছেলে হিসেবে সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ পড়ার খুব বেশি সুযোগ আমরা পাইনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গল্পের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় থাকলেও তার প্রবন্ধ পড়েছি খুব কম। তবে আমাদের ছেলেবেলায় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর *'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'* ছিলো সহজলভ্য। আশুজিয়া ইস্কুলে আমার সহপাঠি ব্রাহ্মণ ছেলেরা বঙ্কিমচন্দ্রের বই থেকেই মুসলমানদের নানা কুৎসা আর নিন্দার কথা সংগ্রহ করতো আর সে-সবের উল্লেখ করেই আমাদের খোঁচাতো। বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়ে আমিও তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পেয়ে বঙ্কিম-বিদ্বেষী না হয়ে পারিনি। শুধু বঙ্কিম নয়। সে-সময়ে আশুজিয়ার ছেলেরা যতো ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়তো সেগুলো সবই ছিলো মুসলমান-বিদ্বেষে ঠাসা। এ-সব বই আমাকে খুবই উত্তেজিত করে তুলেছিলো।'

খুবই স্বাভাবিক। খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের মতো একজন সংবেদনশীল মুসলমান কিশোর মুসলমান-বিদ্বেষে ভরা বই পড়ে অনুত্তেজিত থাকেন কী করে? তাছাড়া সে-সময়ে 'বঙ্কিমচন্দ্রের দাঁতভাঙা জবাব' বলে বিজ্ঞাপিত মুসলমানের লেখা অনেক বইও বাজারে চালু হয়ে গিয়েছিলো। স্বভাবতই সেগুলো ছিলো উগ্র হিন্দু বিদ্বেষের আধার। হেকিম ভাইদের মনমানস গঠনে সে সব বইয়ের অবদানও কম ছিলো না।

আমি নিজে ছেলেবেলা থেকেই বঙ্কিম-অনুরাগী। পরিণত বয়সে সে অনুরাগ বেড়েছে বৈ কমেনি। কিন্তু বঙ্কিমের মতো অমিত প্রতিভাধর মনীষীও যে তাঁর সৃষ্টিতে এমন কিছু উপাদান রেখে গিয়েছেন যা পরবর্তীকালে দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো একটি জঘন্য পিশাচকে শক্তি জুগিয়েছে—সে কথাও তো অস্বীকার করতে পারি না।

শুধু বঙ্কিম কেন, উনিশ শতকের আরো অনেক প্রতিভাধরও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজতলা তৈরিতে নানাভাবে সহায়তা করে গেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তরা যে জাতিতত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তারই একেবারে ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলো মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব। তখনকার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা 'জাতি' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন খুবই শিথিলভাবে। অর্থাৎ এ-শব্দটির কোনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থ তাদের কাছে ছিলো না। 'জাতি' বলতে তারা কখনো বুঝিয়েছেন 'কাস্ট', কখনো 'রেস', কখনো বা 'কম্যুনিটি'। আবার ইংরেজি 'নেশন' অর্থে তারা 'জাতি' শব্দটির ব্যবহার যখন করেছেন তখনো সেই জাতির সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা না নিয়েই তা করেছেন। এবং 'জাতি' অর্থেই 'হিন্দু' শব্দটির নির্বিচার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। হিন্দুর আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই—আরো স্পষ্ট করে বললে, উঠতি হিন্দু মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই—বলেছেন জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'হিন্দুমেলা'ই তাদের কাছে হয়েছে জাতীয় মেলা। আর এভাবেই তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজটি রোপণ করে ফেলেছেন, হিন্দু জাতির বিপরীতে মুসলমান জাতির ধারণার গোড়াপত্তন করে দিয়েছেন। এ কাজে রাজনারায়ণ বসু বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা নবগোপাল মিত্রের মতো মনীষীদেরও অনেকেই কিছু না কিছু অবদান রেখেছেন।

ইংরেজরা এদেশে যে-ধরনের ইতিহাস বই চালু করেছিলো তা থেকে প্রকৃত ইতিহাস চেতনা জন্মাতো না, বিকৃত ইতিহাসবোধেই বরং পাঠকের মনমেজাজ আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। সে ইতিহাসে সত্য বিকৃতি যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো সত্য গোপনের ধূর্ত প্রয়াসও। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসকে তারা চিহ্নিত করেছে 'মুসলিম যুগ' নামে। আর তাদের ইতিহাস বইয়ে এই মুসলিম যুগ হয়ে উঠেছে কুশাসন, স্বৈরশাসন, সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন ও ধর্মান্ধতার যুগ। মুসলিম যুগে মুসলমানরা হিন্দুদের কারণে-অকারণে হত্যা করেছে, হিন্দু মেয়েদের বলাৎকার করেছে, হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছে, জোর করে তাদের মুসলমান বানিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ হেন অপকর্ম নেই যা মুসলমানরা করেনি! কিন্তু এই মুসলমানরা কারা? সব মুসলমানই কি সব হিন্দুর ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, আর সব হিন্দুই কি সে-সব সুবোধ বালকের মতো মুখ বুঁজে সয়ে গেছে? মোগলদের সঙ্গে রাজপুত বা মারাঠাদের যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে সে কি মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর যুদ্ধ, না রাজা-রাজড়াদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব? সব রাজপুতই কি সব মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? প্রতাপ সিংহের মতো মোগল বিরোধী রাজপুত যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন না কি মানসিংহ বা যশোবন্ত সিংহের মতো মোগল-অনুগত রাজপুত সেনাপতিও? মারাঠা শিবাজী হিন্দু হলেও তার দলে কি ছিলেন

না অনেক দুর্ধর্ষ মুসলমান সেনানায়কও? গোঁড়া সুন্নি মুসলমান সম্রাট আওরঙ্গজেব কি শুধু কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরই ধ্বংস করেছিলেন? তিনি কি গোলকুণ্ডার জামে মসজিদকেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেননি? যতোই গোঁড়া ধার্মিক ও সাম্প্রদায়িক হোন সম্রাট আওরঙ্গজেব, তার মন্দির-মসজিদ ভাঙার পেছনে ধর্মচেতনার বদলে সাম্রাজ্যিক তথা বৈষয়িক চেতনাই কি কার্যকর ছিলো না? গোঁড়া মুসলমান বাদশাহ আওরঙ্গজেবই যে এলাহাবাদের সোমেশ্বরনাথ মহাদেব, কাশীর জঙ্গমবাড়ি শিব, উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর, চিত্রকুটের বালাজী, গৌহাটির উমানন্দ কিংবা মহারাষ্ট্রের দত্তাত্রেয় গুরুমন্দিরের মতো বহু হিন্দু মন্দিরের জন্যে জায়গির দিয়েছিলেন—সে কথা কি মিথ্যা?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান কিংবা প্রকৃত সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করেননি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ইংরেজ গ্রন্থকাররা। কারণ, নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো : ভারতের মুসলিম শাসনকে কালো রঙে চিত্রিত করে হিন্দুদেরকে মুসলিম-বিদ্বেষী করে তোলা। কারণ, তারা ধারণা করেছিলেন : হিন্দুদের মনে মুসলিম বিদ্বেষ শিকড় গেড়ে বসলেই ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তাদের আনুগত্য বেড়ে যাবে, ব্রিটিশ শাসনের ন্যায্যতা প্রমাণিত হবে।

এঁরা যে বিকৃত ও অসত্য ইতিহাস রচনা করেছিলেন তার পেছনকার তিনটি মতলব চিহ্নিত করেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বিপানচন্দ্র। সেগুলো হচ্ছে :

'প্রথমত, তারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতীয় জনগণকে চিরকাল নিষ্ঠুর প্রজাপীড়নকারী শাসনকর্তা ও অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারীরা শাসন করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন যদি স্বৈরতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছাচারী হয় তাতে অন্যায় কিছু নেই। বরং তা প্রজাহিতৈষী ন্যায়পরায়ণ এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তদুপরি মুসলিমরাও ব্রিটিশদের মতোই বিদেশি ছিলো। সুতরাং ব্রিটিশরা ভারতে বিদেশি শাসনের সূচনা করেনি বরং একটি বর্বর ও অমানুষিক বিদেশি শাসনের পরিবর্তে একটি মানবিক ও সুসভ্য বিদেশি শাসন এনেছে।

দ্বিতীয়ত, তারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, হিন্দুরা অত্যন্ত নৃশংস ও ভয়াবহভাবে মুসলমানদের দ্বারা শোষিত পদদলিত ও অত্যাচারিত হয়েছিলো। ইংরেজরা কার্যত তাদের 'মুক্ত' করেছিলো। যেহেতু হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনে অনেক সুখে আছে, তাই তাদের ব্রিটিশদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত এবং ব্রিটিশদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা উচিত।

তৃতীয়ত, তারা দৃঢ়ভাবে দাবি করতে চেয়েছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা চিরকাল বিভক্ত ছিলো এবং পরস্পরের রক্তের জন্যে উন্মুখ ছিলো। তাই একটি তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ পক্ষ না থাকলে তারা পরস্পর শান্তিতে বাস করতে পারতো না।'

ভাগ করে শাসন করার সনাতনী নীতি কার্যকর করার লক্ষেই যে ইংরেজরা ভারত ইতিহাসের পাঠ্য বই রচনা করেছে—এ-কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও তো রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করে বলতে হয় যে, এর জন্যে আমরা 'ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন?' ইংরেজ যে আমাদের ইতিহাস বিকৃত করতে পেরেছে, সেই বিকৃত ইতিহাস আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে এবং সেই বিশ্বাসের তালে তালে আমাদের সকলকে নাচাতে পেরেছে—এ সবের জন্যে তো ইংরেজকে বুদ্ধিমান জাত বলে বাহবা দিতে হয়। আর ধিক্কার জানাতে হয় আমাদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকে। সেই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের দিকপাল লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে ধুরন্ধর রাজনীতিক পর্যন্ত অনেকেই।

ইংরেজের পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যার পাঠ গ্রহণের সুযোগ যারা প্রথম পেয়েছিলেন তারা ছিলেন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ। ধর্মীয় বিচারে সে সম্প্রদায়টির নাম হিন্দু, সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ (যারা মূলত বর্ণহিন্দু ও 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত) অর্থনীতির দিক থেকে হয়ে উঠে ইংরেজের আনা বিদ্যারও অধিকারী হয়েছিলেন। রাজধানী কলকাতা থেকে শুরু করে মফস্বলের নানা পৌরকেন্দ্র ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম পর্যন্ত ঘটেছিলো তাদের বিস্তার। সমস্যা নেত্রকোনা এলাকার আশুজিয়া, নওপাড়া, বাড়রি, কাটিহালির মতো গ্রামগুলোতেও গড়ে ছিলো রাজত্ব। হ্যাঁ, 'রাজত্ব' শব্দটাই ব্যবহার করতে হয়। রায়ত-প্রজার মালিকানা মানে হচ্ছে রাজত্বই। প্রজারা রাজা বলতে মধ্যস্বত্বভোগী ছোট বড়ো জমিদার-তালুকদারদেরই বুঝতো। এই রাজারা আর তাদের ছেলেপুলেরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেক খ্যাত-অখ্যাত লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ে হিন্দুগৌরবের উত্তাপে নিজেদের উত্তপ্ত করে নিতো। সে সঙ্গে করতো মুসলিম বিদ্বেষের বিষোদগার। ইংরেজদের লেখা ইতিহাসের পাঠ্য বইগুলো ছিলো ইতিহাসের নামে তথ্যবিকৃতির কঙ্কাল মাত্র। হিন্দু ঔপন্যাসিক ও কাহিনীকাররা সেই কঙ্কালের ওপর প্রলেপ মেদ-মাংস-মজ্জা আর লাবণ্যের সঞ্চার ঘটালেন যে, তা হয়ে উঠলো একান্তভাবে মোহময় ও মনমোহিনী। এই মোহময়ী মনমোহিনী কাহিনীগুলোই হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর ইতিহাসের এক মারাত্মক ভ্রান্তিবিলাস ছড়িয়ে দিলো, আসল ইতিহাস-চেতনা গেলো যোজন যোজন দূরে। এই ভ্রান্তিবিলাস থেকেই জন্ম নিলো এক নব্যহিন্দুত্ব। নব্যহিন্দু ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করতে চাইলো অবশ্যই, কিন্তু হিন্দু ছাড়া দেশের আর কারো কথা ভাববার অবকাশ তার হলো না। তার কাছে হিন্দুই হয়ে উঠলো দেশ, হিন্দুই জাতি। দেশকে মা বলে বন্দনা করে অবশ্যই সে একটি মহৎ কাজ করলো, কিন্তু সেই মাকেও সে তৈরি করে নিলো হিন্দু দেবী দুর্গার আদলে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী...'। দুর্গা বা কালীর নাম করে—এবং গীতা স্পর্শ করে—সে ইংরেজ তাড়ানোর শপথ নিলো। একবারও ভাবলো না যে, যারা দুর্গা-কালী বা গীতায় বিশ্বাস করে না, দেশটা তাদেরও।

কিন্তু চিরদিন তো আর এক রকম যায় না। যে ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের দুর্গা-কালী বা গীতার ওপর বিশ্বাস নেই, সেই মুসলমানদের মধ্যে থেকেও একটি গোষ্ঠী বিত্তের অধিকারী তথা মধ্যবিত্ত হয়ে উঠে এলো। তারাও লেখাপড়া শিখলো।

বঙ্কিমচন্দ্রের '*দুর্গেশনন্দিনী*' বা '*রাজসিংহ*' আর রমেশচন্দ্রের '*রাজপুত জীবনসন্ধ্যা*' বা '*মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*' তারাও পড়লো। এ সব পড়ে তারা নিশ্চয়ই হিন্দুর মতো খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠতে পারলো না। বরং হলো এর উল্টোটা। হিন্দু বিদ্বেষের উপাদান তারা এ সব থেকেই সংগ্রহ করলো। তাদের নিজেদের লেখকদের হাতেও তৈরি হলো '*চাঁদতারা*' বা *হাসন-গঙ্গা-বাহমনি* কিংবা '*রায়নন্দিনী*'র মতো উপন্যাস। এ-সব উপন্যাসের শিল্পগুণ কতোখানি তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন মুসলমান পাঠকেরা বোধ করলো না। কারণ, সে সময়ে বাঁশির চেয়ে বাঁশের প্রয়োজনই তাদের বেশি ছিলো। নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন বা ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উপন্যাসকে তারা বাঁশের মতোই হাতে তুলে নিলো। এবং তারাও হিন্দুদের মতোই ইতিহাসের আরেক ভ্রান্তিবিলাসের পাঁকে মজে গেলো। সে ভ্রান্তিবিলাস সৃষ্টিতেও শাসক ইংরেজরা কম সাহায্য করলো না। আঠারোশো সত্তর সালে ইংরেজ সিভিলিয়ান হান্টার সাহেব ভারতীয় মুসলমানদের এক আধা কাল্পনিক ইতিহাস তৈরি

করে তাদের জন্যে নানা ধরনের অসত্য ও অর্ধসত্য গর্বের জোগান দিলেন। 'দেড় শো বছর আগে কোনো মুসলমানের পক্ষে গরিব হওয়া ছিলো অসম্ভব'—এ রকম কথা বলে হান্টার সাহেব হতদরিদ্র মুসলমানদেরও এক কল্পিত মুসলিম গৌরবের যুগের বাসিন্দা বানিয়ে ফেললেন। সেই কল্পিত যুগটিকে ফিরিয়ে আনাই নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠলো। মুসলিম গৌরব ফিরিয়ে আনার পথের বাধা তো হিন্দুরাই। হিন্দুর গৌরবে মুসলমানের গৌরব করার কিছু নেই। হিন্দু যেমন এক সময় নেশন অর্থেই 'হিন্দু' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলো, মুসলমানও যদি এখন মুসলমানকেই নেশন বলে সাব্যস্ত করে তবে তাকে দোষী বলতে পারবে কে?

হিন্দুরা যখন মারাঠা শিবাজীকে নিয়ে আদিখ্যেতা শুরু করলো, তখনই মুসলমানদের কাছে মোগল আরওরঙ্গজেব অনেক বড়ো হয়ে উঠলো। শিবাজীকে আদর্শ বানিয়ে যে জাতীয়তাবাদ হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রচার করে মুসলমান একান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে জাতীয়তাবাদের শরিক হতে পারে না। তাই আস্তে আস্তে হিন্দু মুসলমানের চলার পথ আর এক থাকে না। 'নেশন'-এর অর্থবিভ্রাট ঘটে, প্রকৃত নেশন আর সৃষ্টি হয় না।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটি অবিশ্যি ক্লান্তিহীনভাবে দেশের মানুষের একজাতিত্বের কথা বলে গেছে। হিন্দু আর মুসলমান কোনোমতেই আলাদা জাতি নয়, ব্রিটিশই তার ভেদনীতির প্রয়োগ করে দুটি সম্প্রদায়ের ভেতর বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করেছে, সকলে মিলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে পারলেই এই সাম্প্রদায়িক বিরোধেরও অবসান ঘটে যাবে—এমন কথা কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রচার করে এসেছে। কথাগুলো অর্ধসত্য। হিন্দু আর মুসলমান আলাদা জাতি না হলেও ঐতিহাসিক কারণেই যে এই দুয়ের মধ্যে রয়ে গেছে অনেক প্রভেদ ও পার্থক্য এবং এই দুয়ের অসম বিকাশের ফলেই যে এই প্রভেদ ও পার্থক্যগুলো পরিণত হয়েছে বিবাদ ও বিভেদে—এ সত্যকে কংগ্রেস নানাভাবেই চাপা দিয়ে রাখতে চাইতো। আর মুসলিম লীগ এই কুৎসিত সত্যটাকেই নানা মোহিনী মিথ্যার আবরণে জড়িয়ে একটি জঘন্য ও মারাত্মক অসত্য অপতত্ত্বের জন্ম দিলো। এই অপতত্ত্বটির নামই দ্বিজাতিতত্ত্ব।

পাকিস্তানের শত্রুরাই পাকিস্তানের জন্মবীজ রোপণকারী!

উনিশশো সাতচল্লিশের ফেব্রুয়ারি-মার্চে, পাকিস্তানের জন্মের কয়েক মাস আগেই, পবিত্রদার মুখে পাকিস্তানের জন্মের বামপন্থী ব্যাখ্যা শুনেছিলাম রামপুর পোস্ট অফিসে পত্রিকা পাঠের আসরে। পবিত্রদার সব কথাই যে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, তা অবশ্যই নয়। তবে তার কথাগুলো যে অন্যরকম, সেটা বুঝেছিলাম। সোনাফর মাস্টার সাহেব মুসলিম লীগের বক্তব্য উচ্চকণ্ঠে বলতেন, আর মহেন্দ্র চৌধুরী কংগ্রেসী মতবাদের ব্যাখ্যা করতেন। আসরে উপস্থিত মুসলমানরা মাস্টার সাহেবের আর হিন্দুরা চৌধুরী মহাশয়ের কথায় সায় দিতো। পবিত্রদার মতের প্রতি সমর্থন ছিলো না প্রায় কারুরই।

পবিত্র দাস ছিলেন খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের সহপাঠি। দু'জনের মধ্যে হৃদ্যতাও ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু হেকিম ভাই আর পবিত্রদার মতের মিল হয়নি। কেন?

হেকিম ভাইয়ের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কথার ফাঁকে ফাঁকে এ-প্রশ্নের জবাব পেয়েছি।

কমরেড মুজফফর আহমদের মতো মানুষ—যিনি হয়েছিলেন ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি—বাঙালি মুসলমান সমাজ থেকেই উঠে এসেছিলেন। তার সহযোগীদের মধ্যেও মুসলমান ছিলেন বেশ কয়েকজন। আমাদের নেত্রকোনার জহিরউদ্দিন মুন্সী ও হান্নান মৌলবী কিংবা কিশোরগঞ্জের ওয়ালি নেওয়াজ ও জমিয়ত আলীও তিরিশের দশকের শেষ ও চল্লিশের দশকের গোড়াতেই কম্যুনিস্ট হয়েছিলেন। নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের বেশ কয়েকটি গ্রামের মুসলমান কৃষকরাও কম্যুনিস্ট পার্টির জঙ্গী কর্মি হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু মুসলমানদের কম্যুনিস্ট হওয়ার ওগুলো বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তই।

হেকিম ভাই বলতেন, 'পবিত্র মাঝে মধ্যে কলকাতা যেতো। সেখানকার কম্যুনিস্ট ছাত্রদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলো। নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ শহরের কম্যুনিস্ট নেতাদের কথাও সে বলতো। তবে নেত্রকোনার হান্নান মৌলবী ছাড়া আর কোনো কম্যুনিস্ট নেতাকে আমি দেখিনি। কম্যুনিজম সম্পর্কে লেখা কিছু কিছু চটি বই পবিত্র আমাকে পড়তে দিতো। আমি পড়তাম বটে, কিন্তু কোনো আকর্ষণ বোধ করতাম না। পবিত্রর কথাগুলোও আমার কাছে কেমন যেনো ধোঁয়াটে লাগতো। ওর প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের মধ্যে আমি আমার সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পেতাম না। আশুজিয়ার তালুকদারদের ছেলেরা আমার প্রতি যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারতো, মুসলমানের কোনো কালচার নেই বলে ওরা আমাকে যে-সব ঠেস দেয়া কথা বলতো, আমি সে-সবেরই জবাব খুঁজতাম। পবিত্র আমাকে সে-সব ব্যাপারে মোটেই সাহায্য করতে পারতো না। আমার বাড়ির আশেপাশে আশুজিয়ার তালুকদারদের যে-সব মুসলমান রায়ত ছিলো, আমি ভাবতাম তাদের নিয়ে। পবিত্র বলতো, প্রলেতারিয়েত বিপ্লব ছাড়া এদের সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আমার কাছে তার এ কথা একান্তই অবাস্তব মনে হতো। আসলে আমার মানসিক সমস্যা ও সংকটগুলোর প্রকৃতিই সে বুঝতে পারতো না। পাকিস্তান কায়েম হলেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করতাম। পবিত্র পাকিস্তান সম্পর্কে একেকদিন একেক রকম কথা বলতো। আমি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতাম না।'

হেকিম ভাইয়ের কথাগুলোর তাৎপর্য আমি অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। তাতে শুধু হেকিম ভাই নয়, তখনকার বাংলার শিক্ষিত তরুণ মুসলমানের ভাবনার সাধারণ পরিচয়ই আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হয়ে যারা রাজনৈতিক দলের কর্মি বা সমর্থক হয় তারা মূলত সমাজের সচেতন অংশেরই মানুষ। সেই সচেতন অংশটি অবশ্যই মোটামুটি সচ্ছল মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সচ্ছল মানুষরাই লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়। লেখাপড়া জানা মানুষই প্রথমে রাজনৈতিক ভাবনায় ভাবিত হয়। তারাই পরে অন্যদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে টেনে নিয়ে আসে। তাদের প্রেরণাতেই নিরক্ষর অসচ্ছল মানুষও তখন রাজনীতিতে যুক্ত হয়।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এভাবে রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠার মতো অবস্থানে ছিলেন সচ্ছল কৃষকরা। বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে এদের ছেলেপুলেরাই লেখাপড়া শিখে একটি শিক্ষিত মুসলমান গোষ্ঠী গড়ে তোলে, এরাই রাজনীতির আসর জাঁকিয়ে বসে। নবাব সলিমুল্লার মতো উচ্চবিত্ত অভিজাতদের হাতে মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন হলেও এর মূল শক্তি ছিলো সম্পন্ন মুসলমান কৃষক ও ছোট বড় জোতদাররাই। সাধারণ কৃষক-প্রজারা রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হয় আরো পরে। মুসলমান

কৃষক প্রজারা যখন বেশি সংখ্যায় রাজনীতিতে এসে যায় তখন সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ দলের বদলে একটি নতুন শক্তি একান্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সেই শক্তিটিরই রাজনৈতিক সংগঠনের নাম 'কৃষক প্রজা পার্টি'। কৃষক প্রজা পার্টি মূলত মুসলমানের সংগঠন হলেও মুসলিম লীগের মতো এটি সাম্প্রদায়িক দল ছিলো না। আবার কম্যুনিস্ট পার্টির মতো সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীও ছিলো না। এ দলটি শুরুতে কংগ্রেসের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করেই চলতে চেয়েছিলো। কিন্তু কংগ্রেস দলের হিন্দু জমিদার-মহাজন ও অভিজাত নেতারা কৃষক-প্রজার অধিকার মেনে নিতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। জমিদার-মহাজনদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তারা কৃষি-সংস্কারের কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দেননি, আইনসভাতে বসেও তারা কৃষক-প্রজার বদলে জমিদার-মহাজনের স্বার্থই রক্ষা করেছেন। এভাবেই তারা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক-প্রজাদের কংগ্রেসের প্রতি বিমুখ করে তোলেন ও তাদেরকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দেন। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করেই অতুলচন্দ্র গুপ্ত তার '*জমির মালিক*' বইয়ে লিখেছিলেন—'মহাত্মার প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার চাষী, যাদের অধিকাংশ মুসলমান, কংগ্রেসের ডাকে প্রবল সাড়া দিয়েছিলো, কংগ্রেসকে মনে করেছিলো নিজের জিনিস। তেমন ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি। এই অভূতপূর্ব অবস্থার সুযোগেও বাংলার কংগ্রেস নেতারা বাংলার রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও আন্দোলনকে ধর্মভেদের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার কোনো চেষ্টাই করেননি। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের চিন্তা তাদের বুদ্ধিকে অন্ধ ও কর্মকে পঙ্গু করেছিলো। বাংলার চাষীর অনায়াসলভ্য নেতৃত্ব বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিলো। ১৯২৮ সালের আইন সংশোধনের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ হলো বাংলার আইনসভার কংগ্রেসী সভ্যদের কাছে চাষীর স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়।'

তবু, উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে সাইত্রিশ সালে যে নির্বাচন হলো তাতেও অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ দল জিততে পারলো না, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলো অসাম্প্রদায়িক দল কৃষক প্রজা পার্টি। একশো উনিশটি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেলো মাত্র চল্লিশটি। বাংলার এই মুসলিম লীগও, তখনো পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয়নি। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচন প্রথার সমর্থক হলেও এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি ছিলো এ-প্রথার বিরুদ্ধে। উনিশশো বত্রিশ সালের তেসরা এপ্রিল নির্বাচন সম্পর্কীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ বলেছিলো, '...সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা যে উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছিলো তার পরিপূর্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ...হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ, যারা আজ সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের কারণে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তারা যুক্তনির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্বার্থে একত্র না হলে জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন অসম্ভব। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাংলার জনসাধারণের জন্যে শক্তি অথবা সমৃদ্ধি—কোনো কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারেনি এবং সেই কারণে জনগণ আজ স্বার্থপর ব্যক্তিদের দ্বারা তাদের স্বার্থ সাধনের জন্যে শোষিত হচ্ছে।'

এর পরের বছরের চব্বিশে নভেম্বরও বাংলার মুসলিম লীগ এ-রকম প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিলো। তারপর পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতেই সাঁইত্রিশ সালে যে নির্বাচন হলো তাতেও বাংলার মুসলমান একটি অসাম্প্রদায়িক দলকেই জিতিয়ে দিলো। অর্থাৎ বাংলার মুসলমান কৃষকরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েও (এবং স্বাতন্ত্র্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ থেকেও) সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তখনো, সেই সাঁইত্রিশ সালেও, মুসলমানরা জোরেশারে বলেনি যে, তারা একটি জাতি। তারা কেবল সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের

পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্যে কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে চেয়েছিলো, জমিদারি-মহাজনি নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিলো, ছেলেপুলের লেখাপড়া শেখার সুযোগ চেয়েছিলো, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলায় তাদের নব্যশিক্ষিত ছেলেদের চাকরির ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা চেয়েছিলো। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেরেবাংলা ফজলুল হক বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে কংগ্রেসেরই সহায়তা চেয়েছিলেন, মুসলিম লীগের নয়। অথচ কংগ্রেস হক সাহেবকে সমর্থন দিতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করতে বাধ্য হলেন। এভাবেই কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক শেরেবাংলা ও তার দলকে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের দিকে ঠেলে দিলো, বাংলায় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করলো। এমনকি, কংগ্রেসের এ-রকম অর্বাচীনতার জন্যেই, মুসলিম লীগের ধুরন্ধর নেতা জিন্নাহ সাহেব হক সাহেবকে দিয়েই উনিশশো চল্লিশে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করাতে সক্ষম হলেন।

কংগ্রেসী নেতারা কেন কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনে রাজি হলেন না, সে সম্পর্কে দু'জন লেখকের অভিমত আমি উল্লেখ করতে চাই। একজন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

শৈলেশ বাবু লিখেছেন, 'অবিভক্ত বঙ্গে হক সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন বা এমনকি মন্ত্রী মণ্ডলের বাইরে থেকেও তার মতো কৃষকদরদী নেতার মন্ত্রিসভাকে সমর্থন সম্ভব না হবার অন্যতম কারণ ছিলো ঐ প্রদেশে কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী ভদ্রলোকদের চরিত্রধর্ম। কারণ হক সাহেবের কৃষক-প্রজা পার্টি ভাগাচাষীদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের ঋণের বোঝা কমানোর জন্যে ঋণসালিশী বোর্ড ইত্যাদি গঠন করার যে কর্মসূচি নিয়েছিলো তা স্বভাবত বহু কংগ্রেস নেতার স্বার্থের পরিপন্থী ছিলো। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই মধ্যস্বত্বভোগী চরিত্রধর্ম অন্য অনেক প্রদেশেই ছিলো।' *[জিন্না/পাকিস্তান নতুন ভাবনা]* (১৪০০ সাল) পৃষ্ঠা ১০০।

নীরদ বাবু দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় শিল্পপতি বিড়লার প্রভাবেই মহাত্মা গান্ধী বাংলার কংগ্রেসকে হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির প্রতি সমর্থন দানে বাধা দিয়েছিলেন এবং এভাবে এখানে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। 'বিড়লা কেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের বিরোধী' হলেন, সে সম্পর্কে নীরদ বাবুর অভিমত—'বহুকাল হইতে কলিকাতায় তো বটেই, এমনকি সমস্ত বাংলাদেশ ও আসামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যাপারে মারওয়াড়িদের প্রাধান্য। ইংরেজদের প্রাধান্য ইহার উপরে হইলেও এত বিস্তৃত ছিল না। বিড়লার নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল, বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইলে তাহারা মারওয়াড়ির প্রাধান্য বিনষ্ট করিবে। সুতরাং মারওয়াড়িদের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বজায় রাখিতে হইবে। [শারদীয় '*দেশ*', ১৪০১ সাল, পৃষ্ঠা ১৫০]

শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নীরদ চৌধুরী এই দুয়ের একজনও কম্যুনিস্ট নন। অথচ তাদের অভিমত কিন্তু পাকিস্তানের জন্মব্যাখ্যার কম্যুনিস্ট তত্ত্বকেই সমর্থন করে। পাকিস্তানের জন্মের আগেই পবিত্রদার মুখে প্রায় এ-রকম ব্যাখ্যাই আমি শুনেছিলাম।

কংগ্রেস দলের কাজেকর্মে নানাভাবে সম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটে গেলেও নীতিগতভাবে তারা অবশ্যই ছিলো অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী। কিন্তু হিন্দু মহাসভা তো আর তা ছিলো না। এ দলের নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর উনিশশো আটত্রিশের ডিসেম্বরে হিন্দু

মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিলেন যে, 'উই দি হিন্দুজ আর অ্যা নেশন বাই আওয়ার সেল্‌ভ্‌স'। জিন্নাহ সাহেব সাভারকরের কথা যেনো লুফে নিলেন। দু'বছর পর উনিশশো চল্লিশে, মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, 'ভারতীয় মুসলমানরা শুধু একটা সম্প্রদায় মাত্র নয়, তারাও একটা জাতি (নেশন) এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস।'

সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা এভাবে মুসলমানকে কেবল একটা 'নেশন'ই বানালো না, মুসলমানদের হাতে 'পাকিস্তান'ও তুলে দিলো। উনিশশো চল্লিশের তেইশ মার্চ মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাবে' পাকিস্তানের নামগন্ধও ছিলো না। অথচ এ প্রস্তাবটিই কী করে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় তার বর্ণনা দিয়ে মুসলিম লীগ নেতা খালিকুজ্জামান জানিয়েছেন যে, 'পরের দিন (অর্থাৎ চব্বিশে মার্চ) সকালে হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে বড়ো বড়ো অক্ষরে প্রকাশিত হলো 'পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত', যদিও ওই নাম দুটি বক্তৃতার কোনোটিতেই উচ্চারিত হয়নি বা প্রস্তাবেও উল্লিখিত হয়নি। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ মুসলিম জনসাধারণের সামনে এক সুসংবদ্ধ ধুয়ো উপস্থিত করলো এবং অবিলম্বে তা তাদের সামনে একটি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি খাড়া করলো। লাহোর প্রস্তাব মুসলমানদের কাছে পৌছে দিতে এবং তার যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে মুসলমান নেতাদের অনেক সময় লাগতো। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ লাহোর প্রস্তাবের নাম 'পাকিস্তান প্রস্তাব' দিয়ে মুসলিম জনসাধারণের কাছে এর তাৎপর্য বোঝানোর জন্যে নেতাদের যে বহু বছরের পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়তো তার হাত থেকে তাদের রেহাই দিলো।'

জিন্নাহর এককালের একান্ত সচিব পীরজাদা জানিয়েছেন যে, স্বয়ং জিন্নাহ সাহেব হিন্দুদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান শব্দ আমরা চালু করিনি, হিন্দুরাই এই শব্দটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। লাহোর প্রস্তাবের তীব্রভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে হিন্দুরা পাকিস্তান প্রস্তাব রূপে এর উল্লেখ করেন। তার ফলেই এই শব্দের প্রচলন হয়।'

কোনো হিন্দুই সাম্প্রদায়িক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থক হতে পারে না। যে কোনো হিন্দু, একান্ত স্বাভাবিক কারণেই, পাকিস্তানের শত্রু। সে হিন্দু উদার অসাম্প্রদায়িকই হোক, অথবা হোক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বা কট্টর মৌলবাদী। কিন্তু সবকিছু দেখে শুনে আমার তো অনেক সময় বলতে ইচ্ছে হয় যে, পাকিস্তানের শত্রুরাই পাকিস্তানের জন্মবীজ রোপণ করে দিয়েছিলো।

কম্যুনিস্টরাও তো পাকিস্তানের শত্রু হতে বাধ্য। পাকিস্তানের মতো একটি ধর্মভিত্তিক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র কিছুতেই কম্যুনিস্টদের অনুমোদন পেতে পারে না। ধর্মের ভিত্তিতে যে কোনো নেশন বা জাতি হয় না এবং এ-রকম তথাকথিত নেশনের জন্যে কোনো নেশন স্টেটও হতে পারে না, সে কথা কম্যুনিস্টদের চেয়ে বেশি ভালো করে আর কে জানে? নেশন ও নেশন স্টেট সম্পর্কে অন্য সবার ধারণা যতো অস্পষ্টই থাকুক, কম্যুনিস্টদের কাছে এর রূপ একেবারে স্ফটিক স্বচ্ছ। তাদের মতে, নেশন হচ্ছে ঐতিহাসিক বিকাশ ধারার ভেতর দিয়ে উদ্ভূত এমন একটি জনসমাজ যার ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক এবং সংস্কৃতিগত সমাজ-জীবনের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত মানসিক গড়নও এক। এ-বিচারে হিন্দু বা মুসলমানের মতো ধর্মীয় কম্যুনিটিগুলো কোনো মতেই নেশন নয়। 'নেশন'-এর ভাষান্তর যদি করা হয় 'জাতি', তাহলে বলতে হবে যে, ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস, এটি একটি বহুজাতিক

উপমহাদেশ। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এখানে জাতিসত্তাগুলোর স্বাভাবিক বিকাশ হতে পারেনি, বিদেশি শাসকরাই তা হতে দেয়নি। বিদেশি আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়েই কেবল বিভিন্ন জাতিগুলো তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। স্বাধীন জাতিরূপেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে : তারা আলাদা আলাদা জাতিরাষ্ট্র গঠন করবে, না স্বেচ্ছায় সবাই একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রে বাস করবে, অথবা বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রগুলোর কনফেডারেশনে সম্মিলিত হয়ে থাকবে। কিন্তু সে-রকমটি না হয়ে মুসলমানের মতো একটি ধর্মীয় কম্যুনিটি যদি কৃত্রিমভাবে নিজেকে জাতি বলে ঘোষণা দেয় ও একটি জাতিরাষ্ট্র তৈরি করে বসে, তবে কম্যুনিস্টরা হবে সে-রাষ্ট্রের স্বাভাবিক শত্রু। বাস্তবে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে তারা তাই হয়েছিলো। অথচ মজার কথা হলো, ব্রিটিশ ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি পাকিস্তান আন্দোলনের এক পর্যায়ে 'জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দোহাই দিয়ে' মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করে বসেছিলো। ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারীর মতো ধীমান কম্যুনিস্টও '*পাকিস্তান এন্ড ন্যাশনাল ইউনিটি* নামক একটি পুস্তিকায় পাকিস্তান দাবির পক্ষে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন। তখনকার কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচন্দ্র যোশী যুক্তি দিয়েছিলেন : উনিশশো উনত্রিশ সালে কংগ্রেস যেমন তার লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো, এর এগারো বছর পরে চল্লিশ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে গৃহীত 'লাহোর প্রস্তাব'ও এরকমই 'একটি স্বাধীনতার প্রস্তাব' এবং স্বরাজের মতোই 'পাকিস্তানও মুসলিমদের জন্মগত অধিকার'।

পাকিস্তান দাবির সপক্ষে কম্যুনিস্ট পার্টির এই অদ্ভুত ভূমিকাটি বোধহয় সে-সময়কার সকল কম্যুনিস্টের কাছেও স্পষ্ট হয়নি। সে জন্যেই সম্ভবত আমাদের এলাকার ছাত্র কম্যুনিস্ট পবিত্র দাস তার বন্ধু খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমকে 'পাকিস্তান সম্পর্কে একেক দিন একেক রকম কথা' বলতেন, আর আবদুল হাকিম 'তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে' উঠতেন না।

যাই হোক, হিন্দু আর কম্যুনিস্টদেরকে পাকিস্তান কিন্তু তার জন্মলগ্ন থেকেই জাতশত্রু বলে জেনেছে এবং তাদের সঙ্গে সে রকমই আচরণ করেছে। অথচ ইতিহাসের নানা সাক্ষ্য প্রমাণ কি এ রকমই ইঙ্গিত দেয় না যে, পাকিস্তানের এই শত্রুরাই পাকিস্তানের জন্মবীজ রোপণ করতে নানাভাবে সহায়তা করেছিলো? আর কুশলী ও কৌশলী জিন্নাহ তার পাকা ফসলটি অবলীলায় ঘরে তুলে নিয়েছিলেন?

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ও গ্রামবাংলার মানুষ

পবিত্রদা অর্থাৎ পবিত্র দাস—উনিশশো পঞ্চাশে আশুজিয়া হাইস্কুলে মাস্টারি নিয়েছিলেন। আর আমি বেখেরহাটি স্কুল ছেড়ে আশুজিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হই একান্ন সালে, ক্লাস নাইনে। কিন্তু এর কয়েকদিন পরই পবিত্রদা কলকাতায় গেলেন কী একটা কাজে, সেখানে গিয়েই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন এবং সে রোগেই অকালে প্রাণ হারালেন।

পবিত্রদার অকাল মৃত্যুতে তাঁর সকল পরিচিত জন হাহাকার করে উঠলো। হেকিম ভাই খুবই ভেঙে পড়লেন। তার এই বন্ধুটিকে তিনিই আশুজিয়া হাইস্কুলের মাস্টার হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। পবিত্র দাস মাস্টার হওয়াতে এলাকার সকল মানুষই খুশি হয়েছিলো। পবিত্রদার কম্যুনিস্ট মতবাদকে অপছন্দ করতেন অনেকেই, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বকে পছন্দ করতেন সকলেই। এই তরুণটি যে অত্যন্ত মেধাবী, উদ্যমী, সৎ ও সব দিক দিয়েই তুখোড়—এ কথা সবাই মানতেন। এ-রকম একজন তুখোড় যুবককে মাস্টার হিসেবে পাওয়া গেছে যখন, তখন

এ-স্কুলে ছেলেদের পাঠিয়ে তাদের পড়াশোনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে, আশুজিয়া স্কুল তার আগেকার গৌরব ফিরে পাবে—গাঁয়ের লোকদের মুখে এই রকম আশাবাদী কথাবার্তা শোনা গিয়েছিলো। কিন্তু এই তরতাজা মানুষটির আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ তাদের আশার বাতিটিকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো।

সে সময়কার গ্রামাঞ্চলের অন্যসব স্কুলের মতোই আশুজিয়া হাইস্কুলেরও ছিলো নিতান্ত করুণ দশা। এ স্কুলের শিক্ষক বলতে একমাত্র জয়চন্দ্র রায়। দু'তিন জন ম্যাট্রিক পাস শিক্ষক নিচের ক্লাসগুলোতে পড়ান। আর ক্লাস নাইন টেনের প্রায় সব সাবজেক্টই বলতে গেলে একা জয়চন্দ্র বাবুকেই পড়াতে হয়। একজন প্রবীন মৌলবী সাহেব আরবি পড়াতেন, সংস্কৃত পড়াতেন পণ্ডিত কৃষ্ণধন গোস্বামী। সংস্কৃতের পণ্ডিতকেই নিতে হতো বাংলা ব্যাকরণের ক্লাসও। হেডমাস্টার ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ছাড়া আর কোনো গ্রাজুয়েট শিক্ষক ছিলেন না। জয়চন্দ্র রায় নিজেও আন্ডার গ্রাজুয়েট। আশপাশের গাঁয়ের যে কোনো যুবক ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বা বিএ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এলেই জয়চন্দ্র বাবু তাকে ধরে নিয়ে এসে স্কুলে মাস্টারির কাজে লাগিয়ে দিতেন। এভাবেই আমরা কিছুদিনের জন্যে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম বলাইশিমুল গ্রামের আইএ পাস তরুণ ফজলুল হক সাহেবকে। এরপর তিনি বিএ পড়তে ময়মনসিংহ চলে গেলে আমাদের অঙ্কের ক্লাসে কোনোদিন যেতেন হেডমাস্টার ক্ষিতীশ বাবু, কোনোদিন জয়চন্দ্র বাবু। ক্ষিতীশ বাবু প্রায়শই অসুস্থ থাকতেন। তার পক্ষে নিয়মিত ক্লাস নেয়া মোটেই সম্ভব হতো না। বিএ পরীক্ষা দিয়ে এসে কচন্দরা গ্রামের ফজর আলী সাহেবও আমাদের কয়েকদিন ইংরেজি পড়িয়েছিলেন। তারপর তিনিও চলে যান। এরকম আরো কয়েকজন শিক্ষক এসেছেন ও চলে গেছেন। এতো দ্রুত তাদের আগমণ-নির্গমণ ঘটেছে যে, এই শিক্ষকদের কারো নাম বা চেহারাই আমার স্মৃতিপটে গেঁথে যেতে পারেনি। আমাদের স্কুলটিতে তখন পড়াশোনার হাল যে কেমন ছিলো তা শিক্ষকদের এ-রকম আগমণ-নির্গমণ থেকেই বোঝা যায়।

একান্ন সালের শেষের দিকে স্কুলে এসে যোগ দিলেন একজন প্রবীণ গ্রাজুয়েট শিক্ষক কুমুদ ভট্টাচার্য। তিনিও ফজলুল হক, ফজর আলী বা অন্যান্য স্বল্পকালীন শিক্ষকদের মতোই জয়চন্দ্র রায় তথা আশুজিয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। তবে শিক্ষক রূপে আশুজিয়া হাইস্কুলে তার অবস্থান এতো স্বল্পকালীন হয়নি। বছর পাঁচেক তিনি এই স্কুলে ছিলেন। তিনি আসার পর থেকেই স্কুলটিতে অ্যাকাডেমিক পরিবেশ অনেক পরিমাণে ফিরে এসেছিলো, জয়চন্দ্র বাবুর খাটুনিরও অনেকখানি লাঘব হয়েছিলো। আশুজিয়ার মতোই আরেক ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম কাটিহালির বাসিন্দা এই কুমুদ ভট্টাচার্য ছিলেন একজন বিদগ্ধ শিক্ষক। ছাত্রদের মনে সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করতে তিনি সব সময়ই চেষ্টা করতেন, পাঠ্যবিষয়ের সূত্র ধরেই পাঠ্যসূচি বহির্ভূত নানা বিষয়ের এলাকায় তাদের নিয়ে যেতেন। পাঠ্য বইয়ের বক্তব্যও তার আলোচনায় অন্যরকম মাত্রা পেয়ে যেতো। আমাদের ইংরেজি বইয়ে একটি প্রবন্ধ ছিলো—'ডায়ালোগ উইথ অ্যা জায়েন্ট'। এটি বিভার্লি নিকলসের 'ভার্ডিক্ট অন ইন্ডিয়া' বইয়ের একটি নির্বাচিত অংশ। ব্রিটিশ সাংবাদিক নিকলস সাহেব ছিলেন জিন্নাহ সাহেবের একান্ত অনুরাগী, জিন্নাহর ব্যক্তিত্বের ছটায় মুগ্ধ। কুমুদ বাবু আমাদের ক্লাসে নিকলস সাহেবের অনুসরণেই জিন্নাহর ব্যক্তিত্বটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বক্তব্যের ফাঁক ও ফাঁকিগুলোও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সেই

রমরমার দিনে, ক্লাসের ছাত্রদের সামনে, পাকিস্তানী ভাবাদর্শের বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরতেও তিনি ইতস্তত করতেন না। আবার ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তার অনুরাগের বিষয়টিও তার পাঠদানের মধ্যে ধরা পড়তো। আমীর আলীর '*দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*' আর '*হিস্ট্রি অব দ্য সারাসেনস*'-এর অনেক কথা তিনি নানা প্রসঙ্গে ক্লাসের পাঠ্যবই পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে উল্লেখ করতেন। মুসলমান ছাত্ররাও ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যেতো। কোনো কোনো দিন ইংরেজি '*অমৃতবাজার পত্রিকা*' হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকেই তিনি হাঁক ছাড়তেন—ট্রান্সলেট ইন টু বেঙ্গলি। এরপর গড়গড় করে পত্রিকার প্রতিবেদনের কিছু অংশ পড়ে যেতেন, আমরা তা শুনে শুনে খাতায় লিখে নিতাম। আমাদের অনুবাদের ভুল-ত্রুটি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে মূল প্রতিবেদনটিও তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। সেই সূত্রেই এসে যেতো রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ।

আসলে কুমুদ বাবু আমাদের চোখ-কান খুলে দিতে চাইতেন, আমাদের ভেতর স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে চাইতেন, পাঠ্যসূচির গণ্ডি ভেঙে আমাদের ভাবনার জগতকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিতে চাইতেন।

যদিও আমি একান্তভাবে পাঠ্যপুস্তক-বিরূপ ও নিতান্ত সাধারণ মানের ছাত্র, তবু আমার জীবনে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকেরই অনেক ধরনের প্রভাব পড়েছে; কিন্তু কোনো শিক্ষকের প্রভাবই সম্ভবত কুমুদবাবুর চেয়ে গভীরতর হয়নি। ক্লাসের বাইরেও তার স্নেহসান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। সেই সান্নিধ্যই আমার মনোজগতকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। অনেক বিষয়েই অনেক নতুন নতুন ভাবনার উপকরণ আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি।

উনিশশো বায়ান্ন সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (সম্ভবত তেইশ তারিখে) একদিন কিন্তু আমাদের এই একান্ত শ্রদ্ধেয় কুমুদ বাবুর ক্লাস থেকেই আমরা একযোগে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের ভালোমন্দ কিছু বলেননি, বাধাও দেননি। বিষণ্ন মুখে তিনিও আস্তে আস্তে ক্লাস ছেড়ে চলে এসেছিলেন। এভাবেই বোধহয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কুমুদ ভট্টাচার্যও মাতৃভাষার জন্যে প্রাণোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি নীরবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন।

একুশ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার রাজপথ রক্তাক্ত হওয়ার খবরটি গাঁয়ে এসে পৌঁছা মাত্র আমাদের মধ্যে দেখা দিলো ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য। আমাদের সেই ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যে উপযুক্ত ভাষা জোগালেন খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখে স্লোগান উঠলো—'ছাত্রহত্যার বিচার চাই', 'নূরুল আমিনের রক্ত চাই'।

আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম নেত্রকোনা শহরের চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সের ছাত্র। সে সময় ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্রদের নেতা মেনে অন্য সবার সঙ্গে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম, নেতাদের দেয়া স্লোগানে কণ্ঠ মিলিয়েছিলাম। কিন্তু এবার, উনিশশো বায়ান্ন সালে, গাঁয়ের স্কুলে ক্লাস টেনের ছাত্র আমি। আমাকেই হয়ে যেতে হলো 'নেতাদের' একজন। আমাদের ক্লাসেরই খালেক, সাত্তার, মনফর এবং ক্লাস নাইনের আরো ক'জন ছাত্র মিলে আমরা সব ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের বের করে নিয়ে এলাম। মুখে টিনের চোঙা লাগিয়ে স্লোগান দিতে দিতে চলে গেলাম আমাদের স্কুল থেকে মাইলখানেক দূরে বসুর বাজারে। বাজারে ঢোকার রাস্তাটিতেই আমাদের মিছিল দাঁড়িয়ে গেলো।

সেদিন ছিলো হাটবার। সবেমাত্র হাটুরেরা আসতে শুরু করেছে। চোঙায় মুখ লাগিয়েই উঁচু গলায় আমরা তাদের কাছে ঢাকার ছাত্রহত্যার বর্ণনা দিয়ে চললাম। বর্ণনার মধ্যে অবশ্যই বেশ কিছু কল্পনার মিশেল ছিলো, অতিরঞ্জন ছিলো। আর ছিলো প্রচণ্ড আন্তরিক আবেগ। আমাদের সেই আবেগের তোড়ে হাটের মানুষদের অনেককেই ভেসে যেতে দেখলাম। অনেকেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণার বাচনিক প্রকাশ ঘটালেন অনেকে। আমাদের আবেদনে সেদিন সেই হাটে হরতাল পালিত হলো। কেউ কোনো কিছু কেনাবেচা করলেন না। আমাদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিয়ে তারাও বাজার-পরিক্রমা করলেন, স্লোগানে স্লোগানে ছাত্রহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকাশ ঘটালেন।

এরপরের কয়েকদিন ধরে আশপাশের অন্যান্য বাজারগুলোতেও আমরা এমনিভাবে হরতাল পালন করিয়েছিলাম। গাঁয়ের কোনো কোনো মানুষ শব্দটির সঙ্গে হয়তো আগে থেকেই পরিচিত ছিলো, নানা উপলক্ষে শহরে হরতাল হওয়ার কথা তারা শুনেছে। কিন্তু বসুরবাজার কিংবা রামপুর, বীরগঞ্জ, বেখেরহাটির মতো গ্রাম্য বাজারে নিজেরাই হরতাল করে বসলো বোধহয় এই প্রথম। প্রত্যেকটি হাটে হরতালের সময় গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে শোক, ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিবাদের প্লাবন বয়ে গিয়েছিলো।

'আমরার পোলাপানরারে শহরে পাঠাই ল্যাহাপড়া শিহনের লাইগ্যা। আর গুলি চালাইয়া তারারে মাইর‍্যা ফালায় যারা হ্যারা .... ।'

এই 'হ্যারা' (তারা) সম্পর্কে যে বিশেষণগুলো প্রয়োগ করেছিলো সেদিনকার সেই ক্ষুব্ধ গ্রামীণ মানুষেরা, সেগুলোকে কলমবন্দি করার সাহস আমার নেই। কারণ আমি তো তথাকথিত ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বিচারে তো এসব শব্দ অশ্লীল, অশালীন, অনুচ্চার্য, অলেখ্য। তবে ভদ্রলোকদের তৈরি বাংলা অভিধানে যেসব শব্দ ঠাঁই পায় না, সেসব শব্দ ছাড়া যে গণশত্রুদের যথার্থ পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়—সে কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।

হেকিম ভাই তখন তমদ্দুন মজলিস করেন। তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র সাপ্তাহিক '*সৈনিক*'-এর তিনি গ্রাহক ও লেখক। প্রায় নিয়মিত তিনি এ পত্রিকায় আমাদের এলাকার রিপোর্ট পাঠান। তার বাড়ির গোলঘরে বসেই আমি '*সৈনিক*' পড়ি। সৈনিকেই একুশের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পড়ে রাগে-দুঃখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একুশে ফেব্রুয়ারির পরে আমরা যে নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানার কয়েকটি অজ পাড়াগাঁয়ে ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম তার মূল প্রেরণাটি পেয়েছিলাম '*সৈনিক*' থেকেই। আর '*সৈনিক*'-এর গ্রাহক ও লেখক খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম হয়েছিলেন আমাদের জীবন্ত প্রেরণাদাতা। হেকিম ভাইয়ের একটা নতুন উদ্যমী ও সংগঠনকুশলী রূপ তখন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ক'দিন ধরে চরকির মতো তিনি এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে ঘুরলেন। গাঁয়ের মানুষদের ছোট ছোট বৈঠকে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার তাৎপর্য তুলে ধরলেন। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে যে আমাদের পশ্চিমাদের গোলাম হয়ে যেতে হবে—সে কথাই সকলকে বোঝাতে চাইলেন। মোল্লা-মৌলবী কিসিমের কিছু কিছু লোক যখন হেকিম ভাইয়ের কথার প্রতিবাদ জানালো, উর্দু আর ইসলামকে এক ও অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করলো, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে হিন্দু ও হিন্দুস্থানের চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করতে চাইলো, তখন হেকিম ভাই রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। ইটাউতা গ্রামের একজন ছাত্র (যতদূর মনে পড়ে তার নাম মঞ্জুর) এসে একটি মাদ্রাসার খবর জানালো। সে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা

নাকি রাষ্ট্রভাষা উর্দুর সপক্ষে মিছিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুনে মহা উত্তেজিত হয়ে হেকিম ভাই বললেন, 'এই কাঠমোল্লাদের মাথা ফাটিয়ে দিতে হবে। তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও।' কারো মাথা ফাটানোর অবিশ্যি প্রয়োজন পড়েনি, কারণ কেউই শেষ পর্যন্ত উর্দুর পক্ষে মিছিল বের করার মতো সাহস পায়নি।

হেকিম ভাইয়ের এক সম্বন্ধী, অবশ্যই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক, আবদুল আউয়াল বায়ান্ন সালে আশুজিয়া হাইস্কুলে ক্লাস টেনে আমাদের সহপাঠি হয়েছিলেন। এর বেশ কয়েক বছর আগে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েই তিনি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর কী মনে করে বলতে গেলে প্রায় প্রবীণ বয়সে, আবার তিনি ছাত্রের খাতায় নাম লেখালেন। এই প্রবীণ সহপাঠিটিকে আমরা খুবই সমীহ করে চলতাম। একুশে ফেব্রুয়ারির পরে কোনো একদিন (তারিখটা মনে করতে পারছি না) আমাদের স্কুল সংলগ্ন ইউনিয়ন বোর্ড অফিস প্রাঙ্গণে খুব ঘটা করে একটি ছাত্রসভার আয়োজন করেছিলাম। সে সভার সভাপতি বানিয়েছিলাম আউয়াল ভাইকে। আমিই হয়েছিলাম 'প্রধান বক্তা'! ছয় বছর আগে, ছেচল্লিশ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ও পরে, আমাদের পাড়ার বালক শ্রোতাদের সামনে অনেক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছি! সেই থেকেই আমি বক্তা! কিন্তু সত্যিকারের কোনো সভায় বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালাম এই প্রথম। একুশের শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অনর্গল অনেক কথা বলে ফেলেছিলাম। বক্তৃতা শুরু করেছিলাম 'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'—নিধু বাবুর সেই বিখ্যাত পংক্তিটির উদ্ধৃতি দিয়ে। শ্রোতাদের কাছে কেমন লেগেছিলো জানি না, তবে সেই 'মেইডেন স্পীচ' দিয়ে আমি নিজেই যে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—সে কথা মনে করে আজো শিহরিত হয়ে উঠি!

পাকিস্তানের জন্মদাতা বলে কথিত জিন্নাহ সাহেব নিজেই যদি আটচল্লিশ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের মৃত্যুবীজ রোপণ করে থাকেন, তবে এ কথাও বলতে হবে যে, সেই মৃত্যুবীজকে ফলবান মহীরুহে পরিণত করেছিলেন তারই উত্তরসুরিরা বায়ান্নতে বাংলাভাষাপ্রেমিক ছাত্রদের বুকের রক্ত ঝরিয়ে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিরই অনিবার্য পরিণতি একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ বা ষোলই ডিসেম্বর—এমন কথাও আমরা হরহামেশা বলি বটে। কিন্তু একুশের ঘটনার পরপরই গ্রামবাংলায় তার কী-ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, অজ পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত কীভাবে ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটেছিলো, বিভিন্ন স্থানের গ্রামীণ এলিটদের প্রণোদনায় সাধারণ কৃষকরা পর্যন্ত সে আন্দোলনের সঙ্গে কেমন করে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলো—সে সবের খুব বেশি খোঁজখবর আমাদের জানা নেই, জানার আগ্রহ বা উদ্যোগও তেমন নেই। ঢাকার বাইরের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা বড়জোর সেকালের জেলা সদর পর্যন্ত গিয়েই থেমে যাই। কোনো কোনো মহকুমা বা থানা সদরের নাম উল্লেখের চেয়ে বেশি কিছু করা প্রয়োজন মনে করি না।

আমাদের এ-রকম আচরণ কি সঙ্গত? এভাবেই কি আমরা ইতিহাসকে খণ্ডিত করে ফেলি না? খণ্ডিত ইতিহাসের সঙ্গে বিকৃত ইতিহাসের কি খুব বেশি পার্থক্য আছে?

বায়ান্ন-পরবর্তী রাজনীতিতে নতুন হাওয়া

বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি-মার্চে হেকিম ভাইয়ের সহযোগী রূপে ভাষা আন্দোলনে আমিও বেশ সক্রিয় হয়ে পড়েছিলাম। আমার সক্রিয়তা অবিশ্যি তেমন জোরালো কিছু নয়। হেকিম ভাইয়ের

পাশাপাশি থাকা, '*সৈনিক*' পত্রিকা পড়া, বাংলাভাষার পক্ষে কিছু তর্ক-বিতর্ক করা, অনানুষ্ঠানিক গ্রাম বৈঠকগুলোতে বক্তৃতা দেয়া বা বক্তৃতার ঢঙে কিছু কথা বলা। এই পর্যন্তই। গ্রাম এলাকায় এরচেয়ে বেশি কিছু করার সুযোগও অবশ্যই ছিলো না। তাছাড়া, আমি তো আর হেকিম ভাইয়ের তমদ্দুন মজলিসের সদস্য বা কর্মি ছিলাম না। হেকিম ভাইও কোনোদিন আমাকে তমদ্দুন মজলিসে যোগ দিতে বলেননি। অমুসলমানদের পক্ষে তমদ্দুন মজলিসের সদস্য হতে কোনো বাধা ছিলো কিনা জানি না। বাধা না থাকলেও এবং হেকিম ভাই বললেও, আমি কিছুতেই 'তমদ্দুনী' হতে পারতাম না। '*সৈনিক*'-এর রিপোর্টগুলো পড়ে ভাষা আন্দোলনের খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু এই সৈনিকের পাতাতেই তমদ্দুন মজলিসের ভাবাদর্শের যে পরিচয় পেতাম তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এটি হচ্ছে একটি ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী সংগঠন। এ সংগঠনের একজন হওয়া তো তাই জন্মগত কারণেই আমার পক্ষে ছিলো অসম্ভব। তার ওপর কৈশোরেই আমার ভেতর শেকড় গেড়ে বসেছিলো সেক্যুলার ভাবনাচিন্তা। তমদ্দুন মজলিস 'সুস্থ ও সুন্দর' তমদ্দুন গড়ে তোলার জন্যে 'কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা' দূর করার কথা বলতো। কিন্তু এই শব্দগুলোর তাৎপর্য তমদ্দুনীদের কাছে খুব স্পষ্ট ছিলো বলে মনে হয় না। কিংবা এই শব্দগুলোর ওপর তারা এমন অর্থ আরোপ করেছিলেন যা হয়ে গিয়েছিলো এগুলোর আসল অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। 'যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে' নিয়ে যাওয়াকে তার উদ্দেশ্য বলে তমদ্দুন মজলিস ঘোষণা করেছিলো। তমদ্দুনীদের এই 'যুক্তিবাদের' পেছনে যুক্তি কতোখানি ছিলো বলা মুশকিল। আবার 'ধর্ম' বলতে তারা আসলে ইসলামকেই বুঝতেন এবং ইসলামেরও যে খুব একটা সাহসী র‍্যাডিকেল ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন—তাও নয়। দ্বিজাতিতত্ত্বকেও তারা প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত ও পোক্ত করাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। মূলত তমদ্দুন মজলিস একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনই ছিলো। মার্কসবাদ তথা কম্যুনিজমের প্রতি তার ছিলো বিজাতীয় বিদ্বেষ। মার্কসবাদ ও বস্তুবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তমদ্দুন মজলিস চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলো। 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' দূর করার কথা বললেও স্বরূপত এ সংগঠনটি ছিলো প্রতিক্রিয়াশীলই।

তবু, এসব সত্ত্বেও, বাংলা ভাষার পক্ষে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা ছিলো একান্তভাবেই প্রগতিশীল। সে সময়কার পূর্ব পাকিস্তানে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিলো অঙ্গুলিমেয়। এদের কোনোটাই বাংলা ভাষার জন্যে আন্দোলনকারীদের পক্ষ সমর্থন করেনি। বায়ান্নর একুশ ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিবাদে '*আজাদ*' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন যে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন সেটি ছিলো তার একান্ত ব্যক্তিগত বিবেকী সিদ্ধান্ত, এর সঙ্গে পত্রিকার নীতিমালার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। রাজধানী থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র 'সৈনিক'ই কেবল ভাষা আন্দোলনের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলো এবং মফস্বলবাসী আমরাও এই পত্রিকাটির কল্যাণেই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে পেরেছিলাম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পুরো কৃতিত্ব অবশ্যই তমদ্দুন মজলিসের ছিলো না। তবু মজলিসের কৃতিত্বকে অস্বীকার করা বা তার ভূমিকাকে খাটো করে দেখাও হবে নিতান্ত অনুচিত আচরণ।

আবার অন্যদিকে, তমদ্দুন মজলিস তথা ইসলামপন্থীদের কেউ কেউ খেদের সঙ্গে বলেন যে, সেক্যুলারপন্থী ও মার্কসপন্থীরা ভাষা আন্দোলনের কৃতিত্বকে ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে

হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে। ঠিক এই ভাষাটিই সবাই প্রয়োগ করেন না, তবে তাদের কথার ভাবার্থ এ রকমই দাঁড়ায়। অন্তত একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই, আশি ও নব্বইয়ের দশকেও, এদের মুখপত্রগুলোতে এরা ইনিয়ে বিনিয়ে এমন কথাই বলে থাকেন। এ রকম কথা বলে তারা বাঙালির ভাষা সংগ্রামের পুরো ইতিহাসটাকেই খণ্ডিত ও বিকৃত করে তুলতে চান। তারা যে এদেশের অসাম্প্রদায়িক পণ্ডিতবর্গ, সেক্যুলার রাজনীতিকবৃন্দ ও প্রগতি-চেতন ছাত্রসমাজের অবদানকে হাইজ্যাক করে নিতে পারলেন না, তাদের ক্ষোভটা বোধহয় সে কারণেই। পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাষাচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুক্তবুদ্ধির সাধক কাজী মোতাহার হোসেন, গবেষক ও শিক্ষাবিদ মুহম্মদ এনামুল হক, বহুভাষাবিদ ও রস সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ সুধী রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কলম ধরেছিলেন তা ইসলামিক বা ধর্মীয় বিবেচনা থেকে নয়। ভাষাতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নিয়মনীতিই ছিলো তাদের বিবেচ্য। বায়ান্নর অনেক আগেই হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত *'চতুরঙ্গ'* সাহিত্যপত্রে বেরিয়েছিলো সৈয়দ মুজতবা আলীর দীর্ঘ রচনা 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। সে সময়েই, বই আকারে প্রকাশের আগেই, এ রচনাটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। হেকিম ভাইয়ের সংগ্রহেই *চতুরঙ্গের* সেই সংখ্যাটি আমি পেয়েছিলাম। সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো লেখক-বুদ্ধিজীবীরা যেমন, তেমনি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকরাও রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলার যৌক্তিকতার কথা জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। আর জিন্নাহর মুখের ওপর 'না, না' ধ্বনি তুলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন যে সচেতন ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাদেরও কোনো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিবেচনা ছিলো না। আসলে ভাষা ব্যাপারটাই ধর্মনিরপেক্ষ, কোনো ভাষাই কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এবং ভাষা শ্রেণী-নিরপেক্ষও। শোষক-শোষিত নির্বিশেষে একটি জনগোষ্ঠীর সকল শ্রেণীর মানুষই একটি ভাষার ছত্রচ্ছায়ায় এসে সম্মিলিত হয়ে থাকে। আর এভাবে একটি সাধারণ ভাষাই হয় একটি জনগোষ্ঠীর জাতিতে পরিণত হওয়ার মূল উপাদান। বাংলা ভাষার আশ্রয়ে যে জনগোষ্ঠীটি একটি বিশাল ভূখণ্ডে শত শত বছরে তিল তিল করে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো ও অজস্র বৈচিত্র্যেভরা অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো, সেই জনগোষ্ঠীটিই ধর্ম সম্প্রদায় ও শ্রেণী নির্বিশেষে একটি জাতি—বাঙালি জাতি। ধর্মভিত্তিক ভুয়া দ্বিজাতিতত্ত্ব ভাষাভিত্তিক এই আসল জাতি পরিচয়কে অস্বীকার করে পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রটির জন্ম দিয়েছিলো। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের হোতারা যখন বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত হানলো, তখন সেই আঘাতটি গিয়ে পড়লো সেই ভুয়া জাতিতত্ত্বটির ওপরই। সেই আঘাতেই দ্বিজাতিতত্ত্বের কৃত্রিম পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম জাতীয় চেতনা। এই আসল জাতীয় চেতনাই একদিন কৃত্রিম চেতনাজাত কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটিয়ে জন্ম দিলো বাংলাদেশ নামক স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের। অর্থাৎ বাঙালির ভাষার ওপর আঘাতই পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্মের প্রক্রিয়াটির সূচনা করে দিয়েছিলো। এবং এই প্রক্রিয়ায় যে কেবল সচেতন জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার মানুষদেরই অবদান ছিলো, তা নয়। ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ইসলামপন্থীদের অনেকে—ব্যক্তিগতভাবে বা সাংগঠনিকভাবে—বাঙালির মাতৃভাষার সপক্ষে ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। বাঙালির ভাষার শত্রুদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বশীল শক্তির বিরুদ্ধে) দাঁড়ানো তো আসলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই দাঁড়ানো। অনেকে অসচেতনভাবেও এমনটি করেছিলেন। তমদ্দুন মজলিসের মতো পাকিস্তানপ্রেমী

ইসলামপন্থী সংগঠনটিও তাই করেছিলো। এর ধ্যান-ধারণা যতো অস্বচ্ছ, অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীলই হোক, নিজের অজান্তে বা অনিচ্ছায় হলেও ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকাটি ছিলো একান্ত স্পষ্ট, বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অনেক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীও ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে কখনো কখনো কোনো না কোনোভাবে প্রগতিশীল ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করে থাকে। কিন্তু তাই বলে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র মুছে যায় না। প্রগতির পক্ষে যতোটুকু অবদান তারা রাখে সেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রগতিশীল শক্তির ভাণ্ডারে গিয়েই জমা হয়। এ নিয়ে যে যতো আফসোস ও আহাজারিই করুক, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়ম তাতে পাল্টে যাবে না। গোলাম আযমও ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বলে তার অনুসারীরা গৌরব প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই গোলাম আযমকেই নাকি বলতে শোনা গেছে যে, বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন করে তাঁরা ভুল করেছিলেন। এ রকম বোধে উপনীত হওয়াই গোলাম আযমদের জন্যে স্বাভাবিক। কারণ ভাষা-আন্দোলনের মতো একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের ফসল তো কোনোমতেই ওদের মতো প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘরে গিয়ে উঠতে পারে না, সে ফসলে নিরঙ্কুশ অধিকার জন্মে প্রগতিকামী মানুষের ও বঞ্চিত জনগণের। বাঙালির ভাষা আন্দোলনের পরিণতিই তো স্বাধীনতা আন্দোলন, সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম ও এ অঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যু এবং এ রকম কোনো পরিণতিই গোলাম আযমের মতো প্রতিক্রিয়াশীল মানুষদের বা তাদের নানা গণবিরোধী সংগঠনের কাম্য ছিলো না, কাম্য হতে পারে না।

হেকিম ভাই তমদ্দুন মজলিসের প্রেরণায় ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তো নিজেকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেনই, মজলিসের আরেকটি দাবিরও ছিলেন তিনি সোচ্চার প্রচারক। সেটি হচ্ছে : বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ। তার বন্ধু পবিত্র দাসের সঙ্গে তিনি কম্যুনিজম নিয়ে তর্ক করতেন। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে যে কম্যুনিজমের কোনো প্রয়োজন হবে না, তমদ্দুন মজলিসের ম্যানিফেস্টো দিয়েই তিনি তা প্রমাণ করতে চাইতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই প্রতিষ্ঠিত হবে ধনতন্ত্রেরও বিকল্প, কম্যুনিজমেরও বিকল্প। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের সময়ের একটি ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে তমদ্দুন মজলিস মত প্রকাশ করেছিলো যে, জনগণের স্বার্থে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ না দিয়েই তাদের জমি অধিগ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত এবং এটিই ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান।

কিন্তু কম্যুনিস্ট-বিরোধী তমদ্দুন মজলিসের এ রকম ইসলাম-সম্মত দাবি ও বক্তব্যও সে-সময়কার পাকিস্তানের দৃষ্টিতে হয়ে গেলো ইসলাম-বিরোধী ও কম্যুনিস্টপন্থী। পূর্ববাংলার অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী আটচল্লিশ সালের বিশ আগস্ট রাজশাহীতে এক জনসভায় বলেছিলেন যে, ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে একান্ত অন্যায় ও মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ। এ রকম হস্তক্ষেপ হবে অরাজকতা সৃষ্টিকারী। এ রকম অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় যারা তারাই কম্যুনিজমের অনুসারী। কম্যুনিজমের সঙ্গে ইসলামের কোনোরূপ সমঝোতা হতে পারে না, কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে পাকিস্তানের সকলকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

পাকিস্তানের জন্মের আগে কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনকারীদের ভেতর এমন উগ্র কম্যুনিজম-বিরোধিতা দেখা যায়নি। তখনকার কম্যুনিস্ট পার্টি পাকিস্তান আন্দোলনকে

'সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জাতীয় আন্দোলন' রূপে চিত্রিত করায় তরুণ মুসলমানদের অনেকে বরং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। প্রস্তাবিত পাকিস্তানই হবে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার উর্বর ক্ষেত্র—অনেকে এ-রকমও ভাবতেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন পাকিস্তান কায়েম হয়ে গেল তখন কায়েমী স্বার্থবাদীরাই এ রাষ্ট্রের সবকিছুতে অধিকার বিস্তার করে বসলো। কম্যুনিজম কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যারা ইসলামকে মিলিয়ে দেখতে চাইতো বা 'ইসলামিক সমাজতন্ত্রে'র কথা বলতো, পাকিস্তানের শাসকদের দৃষ্টিতে তারাও হয়ে গেল ইসলাম-বিরোধী ও পাকিস্তান-বিরোধী। ইসলামের বৈপ্লবিক অন্তঃসার বলে এতোকাল যা কথিত হয়ে আসছিলো, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পাকিস্তানের গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীরা 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকেই' ইসলামের মূল মর্মরূপে উপস্থাপন করলো। বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায় তারা বোঝাতে চাইলো: এক আল্লাহর অস্তিত্ব, হযরত মুহম্মদের রেসালাত, কোরানের বিধানের অভ্রান্ততা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারে না ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র ও অলংঘনীয় ইসলামী বিধান বলে মেনে না নিলে।

এ-রকম তত্ত্বীয় ধূম্রজালের মধ্যে পড়ে বায়ান্ন সালেই হেকিম ভাইকে খুব বিব্রত, ক্ষুব্ধ ও ব্যতিব্যস্ত হতে দেখলাম। তখন তার কম্যুনিস্ট বন্ধু প্রয়াত পবিত্র দাসের কথা মাঝেমধ্যেই স্মরণ করতেন 'পবিত্রটা যদি এখন বেঁচে থাকতো!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এমন কথাও বলতেন।

বায়ান্নর মে মাস থেকে পরবর্তী সাত/আট মাস হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার বড়ো একটা দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মে মাসেই আমি গুরুতর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। প্রথম মাস দুই চললো প্রচণ্ড ডিসপেপসিয়া, কোনো খাবারই হজম হয় না। এরপর শুরু হলো অসহ্য বুক জ্বালা। সারাক্ষণ বুক জ্বালা। কিছু খাবার খেলে অল্প সময়ের জন্যে জ্বালার উপশম হলেও একটু পর আবার পূর্ববৎ। হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসায় দীর্ঘদিনেও কোনো ফল পাওয়া গেলো না। এরপর কুলনন্দ আয়ুর্বেদ ভবনের কবিরাজ জগদীশ নাগ আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন। তিনি অনেক দামি বটিকা ও অরিষ্ট আমাকে সেবন করালেন। কিন্তু ফল না পেয়ে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েই বসেছিলেন, তখন তারই কম্পাউন্ডার হেমেন্দ্র নাগ বই দেখে একটি পাঁচনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। হেমেন্দ্রদার পরামর্শটি কবিরাজ মহাশয় মেনে নিলেন। তারই নির্দেশে 'চন্দনাদি পাঁচন' খেলাম। এবং কী আশ্চর্য, দু'সপ্তাহেই আমার পীড়ার উপশম হয়ে গেলো। যদিও পেটের পীড়া আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে আছে, তবুও বায়ান্ন সালে এর প্রচণ্ড দাপট থেকে কবিরাজী চন্দনাদি পাঁচনই আমাকে রক্ষা করেছিলো। কিন্তু নষ্ট হলো একটি বছর। তেপ্পান্ন সালের ফেব্রুয়ারিতে আশুজিয়া হাইস্কুলে ক্লাস টেনের বেঞ্চিতে আবার গিয়ে বসলাম।

তেপ্পান্ন সালের গোড়া থেকেই রাজনীতিতে অন্যরকম হাওয়া বইতে শুরু হয়েছিলো। নেত্রকোনো শহরের মোক্তারপাড়া মাঠে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হলো। বিশ/পঁচিশ মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে হাজার হাজার লোক সভায় উপস্থিত হয়েছিলো। আমিও গিয়েছিলাম। সেই সভাতেই বক্তৃতা শুনলাম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হাশিম উদ্দিন ও শেখ মুজিবুর রহমানের। এই প্রথম এই নেতাদের আমি দেখলাম। ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী পূর্ব থেকে পরিচিত নাম। কিন্তু হাশিম উদ্দিন ও মুজিবুর সম্পূর্ণ নতুন। হাশিম উদ্দিন সাহেব ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের সন্তান।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মুন্সেফের চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। জনসভার শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলো। শ্রোতাদের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই তরুণের বক্তৃতায় যেনো আগুন ঝরে। লোকের মুখে মুখে কেবল তারই কথা।

আগের মতোই যথারীতি প্রায় রোজই হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত, আলাপ ও তর্কবিতর্ক চলতে লাগলো। দেখলাম : তার রাজনীতি ভাবনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, তমদ্দুন মজলিসের প্রতি আগের সেই আকর্ষণ আর নেই।

তেপ্পান্ন সালের গণমানুষের ভাবনা

বায়ান্নর মে থেকে তেপ্পান্নর জানুয়ারি—এই কয় মাস অসুস্থতার দরুন প্রায় গৃহবন্দি হয়েই ছিলাম। নিয়মিত পত্রিকা পড়া হয়নি, দেশের কোনো খোঁজখবরও রাখা হয়নি। কিন্তু আট/ নয় মাস পরে, তেপ্পান্নর ফেব্রুয়ারিতেই, লক্ষ করলাম মানুষের কথাবার্তার ধরনধারণ যেনো বদলে যাচ্ছে। একান্ন সালেও যাদের মুখে হরহামেশা 'শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তানের লালন-পালনের' কথা শোনা যেতো, সরকারের মৃদু সমালোচনার মধ্যেও যারা পাকিস্তানের দুশমনদের চক্রান্ত দেখতো, তাদের কণ্ঠই এখন কঠোর ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলটির জন্ম যদিও ঘটেছে বছর চারেক আগেই, তবু আমাদের গ্রামাঞ্চলে তখন এ দলের কোনো প্রকাশ্য অনুসারীর দেখা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ তেপ্পান্ন সালের গোড়াতেই অবস্থা অন্যরকম।

আমাদের রামপুর বাজারটির অবস্থান হচ্ছে চার সড়কের মাথায়। উত্তরে দক্ষিণে প্রলম্বিত কেন্দুয়া-নেত্রকোনা সড়ক ও পূর্ব-পশ্চিমে তেলিগাতি ময়মনসিংহ সড়কের সম্মিলন-স্থলটিতেই রামপুর বাজার। মানুষ দীর্ঘ পথও অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম যে দিক থেকেই যে কোনো পথিকই আসুক, তাকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও রামপুর বাজারে মথুর নন্দী কিংবা যোগেন্দ্র ঘোষের মুদি দোকানের সামনে বসে বিশ্রাম নিতে হয়। স্থানীয় লোকদেরও অনেকেরই অলস সময় যাপনের স্থান এ মুদি দোকান দু'টি। অর্থাৎ এখানে আড্ডা জমে থাকে সারাদিন। 'সুন্দরী বিড়ি'তে সুখটান দিতে দিতে আর পান চিবোতে চিবোতে কতো কথাই না বলে যায় আড্ডাধারীরা। নেত্রকোনা বা ময়মনসিংহ থেকে কোনো লোক এলেই তার কাছে সবাই শহরের খবর জানতে চায়। শহরের খবরে রাজনীতির কথাই থাকে বেশি।

দুপুরে বসে খবরের কাগজ সামনে নিয়ে পোস্ট অফিসের সেই ঐতিহ্যবাহী আড্ডা। রামপুর বাজারের মুদি দোকানের আড্ডা আর পোস্ট অফিসের আড্ডায় পাওয়া খবরগুলো একত্র হয়ে তৈরি হয় যে তথ্যপ্রবাহ তাই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দেয় আশপাশের গ্রামগুলোতে। তখনো ট্রানজিস্টারের প্রচলন হয়নি, টেলিভিশন তো কল্পনার বিষয়। খবরের কাগজের প্রচারও গ্রামাঞ্চলে, সে সময়েও, একান্ত সীমিত। তাই আড্ডা থেকে প্রাপ্ত খবরই এক মুখ থেকে আরেক মুখে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতো। শুধু খবর নয়, খবরের ভাষ্যও। ভাষ্যই বরং বেশি। এবং সে ভাষ্যে থাকতো কল্পনার অবাধ বিস্তার, ইচ্ছাপূরণের বিচিত্র উপাদান। এভাবেই

তেপ্পান্নর গোড়াতেই দেখলাম, লোকের মুখে মুখে চালু হয়ে গেছে যে, এদেশে এখন দুটো লীগ—একটি আওয়ামী লীগ, আরেকটি পকেট লীগ। কথাটা পঞ্চাশ সাল থেকেই শোনা যাচ্ছিলো, কিন্তু তখন তার এমন ব্যাপক প্রচার ঘটেনি। কেউ কেউ ফিসফিস করে আড়ালে আবডালে বলতো, শিশুরাষ্ট্রের গার্জেনদের ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পেতো না। বায়ান্নর সেই রক্তাক্ত একুশে মানুষের সব ভয় ও আড়াল ঘুচিয়ে দিলো। একুশে মানুষকে যেমন ক্ষুব্ধ করেছিলো, তেমনি করে তুলেছিলো সাহসী ও বেপরোয়া। লোকে প্রকাশ্যেই বলতে লাগলো : যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান এনেছে সে এখন কতিপয়ের পকেটে বন্দি, নিজের স্বার্থ ছাড়া এরা আর কিচ্ছু বোঝে না, সারাটা দেশকে লুটেপুটে খাচ্ছে এরা, এদেরকে গদিছাড়া করতে না পারলে দেশের আর কোনো ভবিষ্যত নেই। 'কায়েদে আজম' নেই, 'কায়েদে মিল্লাত' নেই, মুসলিম লীগ আর পাকিস্তান চলে গেছে কতকগুলো বাটপারের দখলে। এই বাটপারদের হাত থেকে দেশটাকে উদ্ধার করতে হলে পকেট লীগের বদলে নতুন লীগ চাই। সেই নতুন লীগেরই নাম আওয়ামী লীগ। আসল নাম যদিও আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং তা থেকে 'মুসলিম' শব্দটি খসেছে অনেক পরে, তবু গোড়া থেকেই মানুষের মুখে মুখে সংগঠনটির নাম আওয়ামী লীগই হয়ে গিয়েছিলো। এই আওয়ামী লীগই, অনেক লোকের বিবেচনায়, পকেট লীগ বা মুসলিম লীগের বিকল্প হয়ে উঠেছিলো। 'শিশু রাষ্ট্র' পাকিস্তানে বিরোধী দল বলতে ছিলো দুটো—কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট। কংগ্রেসের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিলো পূর্ববঙ্গ আইনসভা আর 'পাকিস্তান গণপরিষদে'র অভ্যন্তরে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্তকুমার দাস, রাজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ধর এবং এরকম আরো কয়েকজন কংগ্রেসীর নাম পাওয়া যেতো খবরের কাগজের পাতায়। এরা সরকারের নানা গণবিরোধী কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে গণপরিষদ ও আইনসভায় বক্তৃতা দিতেন। আর সরকারি দলের নেতারা এদেরকে চিহ্নিত করতেন ভারতের দালাল তথা পাকিস্তানের দুশমন রূপে। মূলত হিন্দু অধ্যুষিত 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' নামক এ সংগঠনটির পক্ষে কার্যকর বিরোধী দল রূপে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া কোনো মতেই সম্ভব ছিলো না। আর কম্যুনিষ্ট? ওরা তো খোদাদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী! পাকিস্তানের মতো পবিত্র ইসলামী রাষ্ট্রে ওদের ঠাঁই হয় কী করে? পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল নেতা আর পাতিনেতা সর্বক্ষণই কম্যুনিস্টদের মুণ্ডুপাত করে চলেছেন। দেশের জনগণকে সবসময় তারা কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন, আশেপাশে ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র তারা কম্যুনিস্টের ভূত দেখছেন। আঠারোশো আটচল্লিশ সালে মার্কস-এঙ্গেলস তাদের রচিত 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে বলেছিলেন—'ইউরোপ ভূত দেখছে, কম্যুনিজমের ভূত।' তারই একশো বছর পরে, উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকে, কম্যুনিজমের সবগুলো ভূত যেন পাকিস্তানে এসে জড়ো হয়ে গিয়েছিলো। তাই পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা দিনরাত বিরামহীনভাবে সেই ভূত তাড়ানোর মন্ত্র জপ করে যাচ্ছিলেন!

সকল রকম জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেও কম্যুনিস্টরাই যে পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্যে এখানে ওখানে নানা সংগঠন গড়ে তুলছেন, কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তদের জন্যে সংগ্রাম করে চলছেন, কোথাও কোথাও সে সংগ্রাম রক্তক্ষয়ী রূপ ধারণ করছে—সে সব খবর জনগণের কাছে খুব কমই পৌঁছতে পেরেছিলো। পৌঁছলেও তার রূপ হয়ে গিয়েছিলো একান্ত বিকৃত। আমাদেরই নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুর আর কলমাকান্দা.

জামালপুরের শেরপুর-নালিতাবাড়ি এবং সুনামগঞ্জের কিছু এলাকা জুড়ে যে কম্যুনিস্ট নেতা মনি সিংহের নেতৃত্বে হাজং কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ টংক আন্দোলন চলছিলো, তারও সঠিক খবরটি আমাদের কাছে পৌছায়নি। লোকমুখে কেবল শুনেছি যে, কলমাকান্দা ও সুসং দুর্গাপুরের গারো-হাজংরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তারা 'আদিস্থান' কায়েম করতে চায়। এই আদিস্থানের যুদ্ধটি চালাচ্ছে পাকিস্তানের জানী দুশমন কম্যুনিস্টরা। মনি সিংহ হচ্ছে তাদের নেতা। অথচ কথাগুলো ছিলো ডাহা মিথ্যা। মনি সিংহের আন্দোলনের সঙ্গে গারোদের 'আদিস্থানে'র কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এমনকি মনি সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনে কোনো গারোই যোগ দেয়নি। এ এন্দোলনে হাজংরা ছিলো কুশীলব। আদিস্থানের মতো কোনো পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ তাদের ছিলো না। তারা শুধু টংক নামক একটি জঘন্য সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিলো। হাজংদের মতোই সাঁওতাল কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের খবরও আমরা জানতে পারিনি। কৃষকনেত্রী ইলা মিত্রের ওপর সেই বর্বর নির্যাতন, রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে সাতজন কৃষক ও বামপন্থী নেতার নির্মমভাবে নিহত হওয়া, দেশের বিভিন্ন জেলখানায় কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী বন্দিদের প্রতি অমানবিক আচরণ—এ সব কোনো খবরই সাধারণ মানুষ পায়নি। রামপুর পোস্ট অফিসে পত্রিকা পাঠের আসরে এ সব প্রসঙ্গে কোনো কথা কোনো দিনই শুনিনি। কম্যুনিস্টদের অভ্যন্তরীণ সব খবরাখবর—আটচল্লিশে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস, সে কংগ্রেসের ভেতর থেকেই পাকিস্তানের পৃথক কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম, রণদিভে থিসিস, বামবিচ্যুতি ও সংগ্রামের হঠকারী লাইন, বামবিচ্যুতির সংশোধন—কোনো কিছুর সম্পর্কেই আমাদের তেমন অবহিতি ছিলো না। কম্যুনিস্ট ও বামপন্থীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগেই যে নানা দমন-পীড়নের মধ্যেও যুবলীগের মতো সংগঠন গড়ে উঠেছিলো—মফস্বলের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, রাজনীতি-সচেতন মানুষ ও পত্রপত্রিকার নিয়মিত পাঠকদের কাছেও সে খবর খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বামপন্থী চেতনাশ্রয়ী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কেবল 'গণতন্ত্রী দল'টির কথা সে সময় শুনেছি বলে আবছা আবছা মনে পড়ে। এর অনেক পরে কলেজে পড়তে যখন শহরে গিয়েছি, তখনই কেবল পাকিস্তানের প্রাথমিক দিনগুলোতে সকল প্রতিকূলতার মুখেও কম্যুনিস্টরা এদেশে কীভাবে গণসংগ্রামের ভিত গড়ে তুলেছিলো তার কিছু কিছু খবর জানতে পেরেছি।

তেপ্পান্ন সালে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখেছি তা অবশ্যই কম্যুনিস্টদের প্রত্যক্ষ প্রেরণাজাত নয়। তবে এ-ও লক্ষ করেছি যে, কম্যুনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে তখন আর মানুষকে আগের মতো তাতানো যাচ্ছে না। সকলের মুখে মুখে আওয়ামী লীগের কথা। আওয়ামী লীগের ভেতরেও কম্যুনিস্টরা ঢুকে গেছে, আওয়ামী লীগের নামে কম্যুনিস্টরাই আমাদের সকলের সাধের স্বাধীন পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে—সরকারি লীগপন্থীদের এ ধরনের কথার জবাব খুবই কড়া ভাষায় দিতে এখন আর অনেকেই পিছপা হয় না। আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে যে, অদৃশ্য কম্যুনিস্ট ভূতের বিরুদ্ধে গদা ঘুরিয়ে পাকিস্তানের লীগ শাসকরা কম্যুনিস্টদের অপকারের বদলে উপকারই করেছেন। কারণ যারাই জনগণের যে কোনো ন্যায্য অধিকার বা প্রাপ্য আদায়ের জন্যে দাবি তুলেছে তাদেরই বলা হয়েছে কম্যুনিস্ট। শাসক শ্রেণীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছে তারাই হয়ে গেছে কম্যুনিস্ট। শাসক দলের এ রকম প্রচারের ফল দাঁড়ালো এই: যারা

কম্যুনিজম বা কম্যুনিস্টের মাথামুণ্ডু কিছুই জানতো না বা বুঝতো না তাদেরও মনে হতে লাগলো যে, কম্যুনিজম বিষয়টা খারাপ কিছু নয়, কম্যুনিস্টরাও খারাপ মানুষ নয়।

তেপ্পান্ন সালে শুরুতেই দেখলাম: বাহাগুন্দ গ্রামের আবদুস শাহিদ আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রচারে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। শাহিদ ছিলো বেখৈরহাটি হাইস্কুলে আমার সহপাঠি। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়েই দেখেছি যে, শাহিদ রাজনীতির ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী। সেই রাজনীতি পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের। শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তান ও তার দুশমনদের সম্পর্কে মুসলিম লীগ নেতাদের কথাগুলোই সে তোতা পাখির মতো আওড়াতো। হিন্দুরা পাকিস্তানের দুশমন—এই মহাসত্যটি সে সময়ে অসময়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতো। হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তানের বীর সৈন্যরা কীভাবে চোখের পলকে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী দখল করে নেবে তার নিখুঁত বর্ণনা সে করে যেতো পাক-ভারতের মানচিত্র সামনে রেখে।

সেই শাহিদের মুখেই এখন শুনলাম যে, বদমাশ মুসলিম লিগাররা পাকিস্তানের সর্বনাশ করে চলেছে, এদের হাত থেকে যে করেই হোক দেশটাকে রক্ষা করতে হবে। সব সময় একটা কৃত্রিম ভারত-বিরোধিতার ভাব এরা জিইয়ে রাখতে চায়। উদ্দেশ্য: আসল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে নিজেদের গদিকে নিরাপদ রাখা। মুসলমানদের মনে হিন্দু বিদ্বেষকেও এরা স্থায়ী করে রাখতে চায় একই উদ্দেশ্যে। কাজেই, গদি থেকে এদের টেনে নামাতেই হবে।

শাহিদের মুখে এমন ধরনের কথা শুনে, মাত্র চার/পাঁচ বছরের ব্যবধানে তার এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে, আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। শাহিদই আশপাশের গ্রামের যুবকদের নিয়ে এখানে আওয়ামী লীগের সংগঠন দাঁড় করিয়ে ফেললো। নেত্রকোনা মহকুমার আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে এসে সে বেখৈরহাটি বাজারে, রামপুর বাজারে ও তার পাশের গ্রামগুলোতে ছোট ছোট সভার অনুষ্ঠান করতে লাগলো। সে সব সভায় বক্তারা মুসলিম লীগ সরকারের সকল দুর্নীতি ও কুকীর্তির খতিয়ান তুলে ধরলেন। পাকিস্তানের জন্মের প্রায় পর থেকেই যে দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে, নূরুল আমিন সরকারই যে আমাদের ষোল টাকা সের দরে লবণ কিনতে বাধ্য করেছে, আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে, মাতৃভাষার অধিকার দাবি করার অপরাধে (?) বন্দুকের গুলিতে ছাত্রদের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছে—এ সবই ছিলো বক্তাদের প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ বক্তৃতার বিষয়বস্তু। বক্তৃতার প্রধান অংশ জুড়ে থাকতো পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন ও অন্যান্য মন্ত্রীদের দুর্নীতি ও লুটপাটের কথা। মুসলিম লীগ-বিরোধী বক্তাদের কথাগুলো সবচেয়ে বর্ণময় হয়ে উঠতো মন্ত্রীদের দুর্নীতির বর্ণনায়। নূরুল আমিন একটি শ্বেতপাথরের বাড়ি বানিয়েছে। বাড়ি তো নয়, সম্রাটের প্রাসাদ! সেই প্রাসাদের বর্ণনা শুনতে শুনতে রূপকথা শুনে অভ্যস্ত গ্রামীণ শ্রোতাদের চোখ চকচক করে উঠতো। তখনই বক্তারা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠতেন, 'নূরুল আমিনরা এই রাজপ্রাসাদ এই আমিরি বালাখানা বানিয়েছে আমার-আপনারই গায়ের রক্তজল করা ট্যাক্সের পয়সা চুরি করে। আমাদের প্রত্যেকটি পাই-পয়সার হিসেবে তাদের দিতে হবে। আমরা তাদের এই প্রাসাদের একটি একটি করে পাথর খসিয়ে আনবো। জনতার আদালতে তাদের বিচার হবে। ... ভাইসব, কিছুদিন পরই দেশে ইলেকশন হবে, ভোট হবে। ওরাও আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসবে। তখন আপনারা...।'

ভোটের বক্তৃতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের চোখমুখের রঙ অন্যরকম হয়ে যায়। ভোটের অস্ত্র দিয়েই তারা কীভাবে নূরুল আমিনদের ছারখার করে দেবে, সেই কল্পনায় তারা উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ প্রাকৃত বুলি উচ্চারণ করে নূরুল আমিন আর তার মন্ত্রী মিনিস্টারসহ সকল মুসলিম লিগারের নামে খিস্তি করতে থাকে। 'ষোল ট্যাহা সেরের লবণ খাওয়াইয়া তারা আবার ভোট চাইতে আইবো কোন লাজে? .... আমরার পোলাপানরে যারা গুলি কইর‍্যা মারছে, ভোট দেওনের বদলে তারার কপালে ঝাঁটা মারবাম।...'

ইলেকশানের সময় যতো এগিয়ে আসতে থাকে উত্তেজনা ততো বাড়তে থাকে। আট বছর আগে, ছেচল্লিশ সালে, ভোট হয়েছিলো। সেই ভোটের ফলেই জন্ম নিয়েছিলো পাকিস্তান। শাসকদের অনেক টালবাহানার শেষে, পাকিস্তানের জন্মের সাত বছর পরে, চুয়ান্ন সালে, আবার ভোট হতে যাচ্ছে। ছেচল্লিশের ভোটারদের মুখের জিগির ছিলো—পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ। সেবারের জিন্দাবাদটা ছিলো অজাত পাকিস্তানের জন্যে, পাকিস্তানের ধাত্রী শক্তি মুসলিম লীগের জন্যে। আর এবারের ভোটাররা বাস্তবের পাকিস্তানের জন্যে জিন্দাবাদ দেবে বটে, কিন্তু মুসলিম লীগের জিন্দাবাদ দেবে কয়জন?

ভোট দেবেন কিসে? নৌকা মার্কা বাক্সে

চুয়ান্ন সালের শুরুতে, তখনকার পূর্ববঙ্গ আইন সভার (লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি) নির্বাচনের দিন যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, ভাড়াটিয়া লোক ছাড়া 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' বলার মতো লোকের সংখ্যা একেবারেই কমে এসেছে। মুসলিম লীগের পয়সা খেয়ে যারা বাজারে বাজারে গিয়ে লীগের হারিকেন মার্কায় ভোট দেবার জন্য ক্যানভাস করেছে, তাদেরও অনেককেই দেখা গেছে নিজের পাড়া-পড়শির কাছে যুক্তফ্রন্টের নৌকায় ভোট দেয়ার জন্য আবেদন জানাতে। প্রথম কাজটি করেছে পয়সার খাতিরে, দ্বিতীয়টি মনের তাগিদে। এ ব্যাপারটিতে গাঁয়ের মানুষদের অভিনব রসবোধের পরিচয়ও ধরা পড়েছে। দেখা গেছে: ভোটের দিনেও গাঁয়ের অনেক ভোটার আগে গেছে মুসলিম লীগের ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে বেশ মৌজ করে মুসলিম লিগারদের পান—সিগারেট খেয়েছে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেছে যে, কী ব্যাপার, তোমাকে তো যুক্তফ্রন্টের সমর্থক বলে জানতাম, তবে তুমি মুসলিম লীগের ক্যাম্প থেকে পান-সিগারেট খাচ্ছ কেন? তাহলে একগাল হেসে সেই ভোটারটি জবাব দিয়েছে, 'মুসলিম লীগের কিছু ক্ষতি করে গেলাম'।

'মুসলিম লীগের ক্ষতি করা'—বাংলাভাষায় এই কথাগুলো একটি নতুন ইডিয়ম বা বাগধারা হিসেবে চালু হয়ে গিয়েছিলো সেই চুয়ান্নর নির্বাচনের সময় থেকেই। এভাবেই নানা সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনা ভাষায় নানা বাগধারার জন্ম দেয়। কোনো কোনোটি ভাষার ভেতর চিরস্থায়ী শিকড় গেড়ে বসে, কোনোটির আয়ু হয় স্বল্পস্থায়ী। চুয়ান্নর নির্বাচনের সময়কার এই বাগধারাটি স্বল্পায়ুই হয়েছিলো। এখন আর কারো মুখে এটি শুনতে পাই না। আমার সমবয়সীদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ এটি ব্যবহার করে ফেললেও অন্যদের কাছে এর তাৎপর্য ধরা পড়ে না। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে এর ভাবানুষঙ্গটি হারিয়ে গেছে। তবু আমার মনে আছে, চুয়ান্ন সনের পরেও অনেককাল ধরে আমরা নিজেদের মধ্যে এই ইডিয়মটি ব্যবহার করে পুলক অনুভব করেছি।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

তবে চুয়ান্ন সনে এদেশের মানুষ মুসলিম লীগের কিছু ক্ষতি নয় শুধু, একেবারে ভরাডুবি ঘটিয়ে ছেড়েছিলো। পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টেরই হয়েছিলো জয়জয়কার। দু'শো সাঁইত্রিশটি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিলো দু'শো সাতাশটি।

ভোটের বছর খানেক আগে থেকে আমাদের এলাকার মানুষ মেতেছিলো আওয়ামী লীগের নামে। ভোটের আগে আগে পরিচিতি পেয়ে গেলো 'যুক্তফ্রন্ট' নামটা। কারণ, আওয়ামী লীগ তখন জোটবদ্ধ হয়েছে মুসলিম লীগ-বিরোধী আরো কয়েকটি দলের সঙ্গে। কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী পার্টি, খিলাফতে রাব্বানী আর আওয়ামী লীগ মিলেই হলো যুক্তফ্রন্ট। তবে, শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের চেতনাতেই আওয়ামী লীগ বা যুক্তফ্রন্ট কোনো নামই তেমন কোনো তাৎপর্যবহ ছিলো না, তারা চিনেছিলো 'নৌকা'। তখনো পৃথক নির্বাচন প্রথা বহাল ছিলো। আমাদের নির্বাচনী এলাকায় (কেন্দুয়া থানায়) আইন সভার মুসলিম আসনের জন্য প্রার্থী ছিলেন তিনজন—মুসলিম লীগের আহছান আলী মোক্তার, আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা যুক্তফ্রন্টের ইনসান ভূইয়া উকিল, আর নির্দলীয় শমসের আলী। মুসলিম লীগের হারিকেন, যুক্তফ্রন্টের নৌকা আর নির্দলীয়ের ছাতা ছিলো নির্বাচনী প্রতীক। ভোটের দিন যতোই এগিয়ে আসে, মানুষ (অন্তত গাঁয়ের মানুষ) ততোই দল বা প্রার্থীর কথা ভুলে যেতে থাকে। প্রতীকটাই তখন তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। না, 'প্রতীক'-এর মতো একটি গম্ভীর তৎসম শব্দও নয়। বাঙালি প্রাকৃতজন এর জন্য বৈদেশিক উৎসজাত একটি শব্দ ব্যবহার করতেই একান্ত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সেটি হচ্ছে 'মার্কা'। 'ভোট দেবেন কিসে? অমুক মার্কা বাক্সে।' উনিশ শো চুয়ান্ন সন পর্যন্ত এই ছিলো বাঙালির নির্বাচন যুদ্ধের প্রধান রণধ্বনি। সত্তর সাল থেকে প্রার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক মার্কা দেয়া বাক্সের বদলে একই ব্যালট পেপারে সকল প্রার্থীর প্রতীক মুদ্রিত হতে থাকে, প্রত্যেক ভোটার তার নির্বাচিত প্রার্থীর প্রতীকে সিল মেরে একই বাক্সে তা ফেলে দিয়ে আসে। তখন থেকেই 'অমুক মার্কা বাক্সে' কথাটা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। তবে 'প্রতীক' বা 'মার্কা' যে শব্দই ব্যবহার করুক, আসলে প্রাকৃতজন এই প্রতীককে ঘিরেই তার চিন্তা ও কল্পনার জাল বিস্তার করে। কখনো কখনো নির্বাচনের কোনো কোনো প্রতীক গণমনে দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার বা কুসংস্কারেরও জন্ম দিয়ে ফেলে, এবং গণমনের এই সংস্কারটিকে ধূর্ত রাজনীতিকরা নানাভাবে তাদের নিজেদের কাজে লাগায়; জনগণকে প্রয়োজন মতো বিভ্রান্ত, উত্তেজিত বা মোহগ্রস্ত করে। চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সমর্থকদের তৈরি একটি ছড়া বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। 'ছাতা মাথে হারিকেন হাতে, ভোট দিবেন ভাই নৌকাতে।' আরেকটি ছড়া—'হারিকেনে তেল নাই, মুসলিম লীগের ভোট নাই।' যুক্তফ্রন্টের সমর্থকরা গায়ের মানুষজনের কাছে নৌকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতো নানান কায়দায়। খাল-বিল-নদীনালা পরিবেষ্টিত বাংলার মানুষের যে নৌকা ছাড়া গতি নেই, আমাদের মুর্শিদি গানেও যে আছে 'মুর্শিদ পার করো আমারে'-র আকুতি, নৌকা দিয়ে নদী পারাপারের ভাবানুষঙ্গেই যে লৌকিক ধর্মানুসারী গণমানুষ পরলোক যাত্রার কথাও ভাবে—গণমনস্তত্ত্বের এইসব উপাদানকেই নিপুণ কৌশলে ব্যবহার করা হয়েছিলো নৌকামার্কা বাক্সে ভোট আকর্ষণের জন্যে।

আবার অন্যদিকে, মুসলিম লিগাররা মানুষের মনকে নৌকার প্রতি বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ করে তোলার চেষ্টায় একেবারে মরীয়া হয়ে লেগে গিয়েছিলো। তারা বারবার ভাঙা নৌকার কথা বলে বলে মানুষকে ভয় দেখাতে লাগলো 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না'—

গানের এই কলিটির জুৎসই ব্যবহারের চেষ্টা চালালো। আমাদের এলাকার জনপ্রিয় বাউল গায়ক মজিদ মিঞাকে দিয়ে নৌকা বিরোধী গান রচনা করালো 'ম্যাড়া মান্দার শিমুল কাঠে, বিচিত্র এক নৌকা বটে'—এ-রকম ধূয়াযুক্ত একটি লম্বাগান গেয়ে মজিদ মিয়া বাজারে বাজারে নৌকা-বিরোধী তথা যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী প্রচারণা চালালেন। ম্যাড়া, মান্দার আর শিমুল হলো খুবই পচা কাঠ। এ-সকল কাঠেরই তৈরি যুক্তফ্রন্টের নৌকা। এ-নৌকার মাঝিমাল্লা হচ্ছেন মৌলানা ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী। নৌকা ফুটো হয়ে গেছে, পানিতে ভরে গেছে, এর ডুবুডুবু অবস্থা। এ-নৌকায় যে-ই চড়বে, সে-ই ডুবে মরবে। মজিদ মিঞার পুরো গানটায় ছিলো এ-রকমের সব কথাবার্তা।

অথচ মজিদ মিঞা চল্লিশের দশক থেকেই জনপ্রিয় হয়েছিলেদন তাঁর গণ-অধিকার সম্পন্ন গানগুলোর জন্যে, তার যেমন ছিলো অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠ, তেমনি তাঁর গানের কথাগুলোতেও এক সময়ে গণমানুষের আশা ও আবেগ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো। দেহতত্ত্ব, মারফতি আর মুর্শিদি গানের গতানুগতিক ধারার ভেতরেই সমাজ-চেতনার প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করে দিয়ে তিনি একদিন গ্রামীণ জনগণের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন, নিবারণ পণ্ডিত আর অখিল ঠাকুরের মতো বিপ্লবী গণসংগীতকারদের পাশে তিনিও সম্মানজনক ঠাঁই পেয়েছিলেন, পঁয়তাল্লিশ সালের সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে তাঁর গান দিয়ে তিনি বঞ্চিত কৃষকদেরকে অধিকার-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর আজ উনিশ শো চুয়ান্ন সালে, সেই মজিদ মিঞা হয়ে গেলেন গণ অধিকার-অপহরণকারী মুসলিম লীগ চক্রের ভাড়াটে গায়ক। হাটেবাজারে গিয়ে গান গেয়ে লোক জড়ো করেন তারপর মুসলিম লীগ নেতাদের শিখিয়ে দেয়া বস্তাপচা কথাগুলো গেলাতে চেষ্টা করেন। বলেন: নৌকায় ভোট দিলে দেশটা হিন্দুদের দখলে চলে যাবে, যে সব হিন্দু জমিদার তালুকদার মহাজন হিন্দুস্থানে চলে গেছে তারা আবার এদেশে ফিরে আসবে, মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে তারা কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করবে, জুতা পায়ে বা ছাতা মাথায় তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে মুসলমানদের হাঁটতে দেবে না, পাকিস্তান হওয়ার পর গাঁয়ের মুসলমানরা যে জমি জিরাতের মালিক হয়েছে সবই ওই হিন্দুরা কেড়ে নেবে।

মজিদ মিঞার এ-সব কথা অধিকাংশ শ্রোতাই বিশ্বাস করেনি, করলে তারা এতো বিপুল সংখ্যায় নৌকা মার্কা বাক্সে ভোট দিতো না। কিন্তু আমি ভাবতাম: মজিদ মিঞার এমন পরিণতি কী করে হলো? একজন গণকবি রাতারাতি গণবিরোধী হয়ে যান কী করে?

মজিদ মিঞাকে আমি সরাসরি কোনোদিন এ প্রশ্ন করিনি। করলে তিনি অবশ্যই বিব্রত হতেন। তবে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার বুঝে নিয়েছি যে অনেক প্রতিভাবান লোককবিই যে প্রক্রিয়ায় এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে বিক্রিত হয়ে যান ও নিজের সৃষ্টিকে বিকৃত করে ফেলেন, মজিদ মিঞাও সেই প্রক্রিয়াটির অধীন হয়ে গেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বশীল মানুষদের অনুগ্রহে তিনি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন, পাকিস্তান রেডিওর সংগীতশিল্পী হয়েছেন, দু'টি পয়সার মুখ দেখেছেন। সেই অনুগ্রহের বলয় থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে ছিলো কঠিন।

কঠিন তো হয় অনেকের পক্ষেই। ক্ষমতাবানের অনুগ্রহের বলয় ভেঙে বেরিয়ে আসার পথে প্রধান বাধা দু'টো। লোভ আর ভয়। অনুগ্রহকে গ্রহণ করার মধ্যে প্রাপ্তির লোভ যেমন থাকে, তেমনি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে থাকে নিগ্রহের ভয়। ক'জন মানুষ পারে লোভ আর

ভয়কে জয় করতে? পারে না বলেই লোককবি তথা গ্রামীণ এলিট মজিদ মিঞার মতো শহর নগরের অনেক বাঘা বুদ্ধিজীবীও এস্টাব্লিশমেন্টের সেবাদাস হয়ে যায়।

সে যাই হোক, চুয়ান্ন সালে পূর্ববঙ্গের মুসলিম ভোটাররা মজিদ মিঞা কিংবা মুসলিম লীগের কথায় বিশ্বাস করেনি, হিন্দু জুজুর ভয়ে ভীত হয়নি, এবং মুসলিম লীগকে ভোট দেয়নি। তার মানে কিন্তু এ নয় যে সে-সময়েই দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটে গিয়েছিলো। যুক্তফ্রন্ট যে একুশ দফা প্রণয়ন করেছিলো তার কোনো একটি দফাতেও অসাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো কথা ছিল না। বরং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার লালন ও পোষণেরই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিলো। নীতিটি ছিলো—'কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।'

অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনুসারী যারা নয়, যুক্তফ্রন্টের মূলনীতিতে তাদের জন্য কিছুই বলা হয়নি। না বলা কথা থেকে বড়ো জোর এ-রকম সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নামে যুক্তফ্রন্টও মুসলিম লীগের মতোই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে 'পবিত্র আমানত' রূপে গ্রহণ করার পক্ষে। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে বড়ো দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকেও তখনো 'মুসলিম' শব্দটাকে বাদ দেয়া হয়নি। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, অনেক প্রগতিশীল কর্মসূচী সত্ত্বেও তখনো এ-দলটি ছিলো সাম্প্রদায়িকই। তা ছাড়া যুক্তফ্রন্টে ছিলো মৌলানা আতহার আলীর 'নেজামে ইসলাম।' এ দলের ঘোষিত লক্ষই তো ছিলো পাকিস্তানে ইসলামি হুকুমাত কায়েম করা। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সভাগুলোতে এমন একটি গান শুনতাম, যে গানের ধ্রুবপদ ছিলো—'আল্লা তুমি কায়েম করো নেজামে ইসলাম/ হায় হায় নেজামে ইসলাম'।

এসব কারণেই 'ইসলাম বিপন্নের' ধুয়া তুলে বা কম্যুনিস্ট ও হিন্দু জুজুর ভয় দেখিয়ে মুসলিম লিগাররা চুয়ান্নর নির্বাচনে ভোটারদের ভজাতে পারিনি। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার সব দফা নিয়ে গাঁয়ের কৃষক জনতার মাথাব্যথা ছিলো না। তারা পাটের ন্যায্য দাম পাবে, খাজনা ট্যাক্স কমে যাবে, সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের জুলুম থাকবে না, এখানে সেখানে ঘুষ দিতে হবে না, লবণের দাম শস্তা হবে, শস্তায় কাপড় কেনা যাবে, ছেলে-মেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়া শেখাতে পারবে, লেখাপড়া শেখানোর জন্য ছেলেদের শহরে পাঠালে সেখানে গুলি খেয়ে মরতে হবে না—নৌকা মার্কা বাক্সে ভোট দেয়ার পক্ষে এ-সবই ছিলো তাদের বিবেচনা। শিক্ষিত প্রগতি-চেতন মানুষদের দৃষ্টিতে অবিশ্যি একুশ দফার আরো গভীরতর তাৎপর্য ধরা পড়েছিলো। যদিও একুশ দফায় অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত হওয়ার বদলে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির কথাই বলা হয়েছে, তবু তাঁরা এতে গণতন্ত্রের চর্চা, বাংলাভাষার অধিকার আর পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা এ-ও বুঝে নিয়েছিলেন যে, বাংলা ভাষার অধিকার আর পূর্ববঙ্গে স্বায়ত্তশাসন মানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। মানে আখেরে পাকিস্তানের মৃত্যুঘণ্টা বেজে যাওয়া। যাঁরা সুদূর প্রসারী চিন্তা করতে পারেন তাঁরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নীতি হিসেবে একুশ দফার শীর্ষে যতো বড়ো করেই ধর্মের কথা লেখা থাকুক না কেন, একুশ দফার বিজয় মানে আস্তে আস্তে সেক্যুলারিজমের পথ খুলে যাওয়া, পাকিস্তানের মৃত্যুর বীজতলা তৈরি হওয়া। তাই নিরক্ষর কৃষক-মজুরের সঙ্গে সাক্ষর মধ্যবিত্ত সমান জোরের সঙ্গেই স্লোগান তুলেছিলো– 'ভোট দেবেন কিসে? নৌকা মার্কা বাক্সে।'

গাঁয়ের কৃষকদের এই নৌকা মার্কা বাক্সের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিলো। সেটি হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা রূপে হক সাহেবের অবস্থান। শেরে বাংলা ফজলুল হক ছেচল্লিশের নির্বাচনে পাকিস্তানি জোয়ারের মুখে মুসলিম লীগের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। কৃষকরা সে সময়ে তাঁকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, নেত্রকোনায় এসে তিনি লাঞ্ছিতও হয়েছিলেন। অথচ এর আগে তিনিই তো ছিলেন বাংলার কৃষকের নয়নমণি। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছিলো অনেক গল্পগাথা আর কিংবদন্তী। সাতচল্লিশের পরে বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর অবস্থান একান্ত গুরুত্বহীন হয়ে গেলেও, সে সময়েও, তাঁর কথা নিয়ে কিছু কিছু সত্যমিথ্যা গল্প এখানে ওখানে শোনা গেছে। এরকমই একটি গল্প—

ভোজনরসিক শেরে বাংলা নাকি একদিন বাজারে খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না বলে খুব দুঃখ করছিলেন। তখন তাঁর একজন ভক্ত বললেন, "হুজুর, আপনার বাসায় তো অনেক জায়গা আছে, কাজের লোকজনও আছে। আপনি অনায়াসে গোরু পোষার ব্যবস্থা করতে পারেন। তা হলে আর বাজারের দুধের ওপর নির্ভর করতে হবে না।'

শেরে বাংলা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'গরু। গরু কোথায় পাবো। দেশের সব গরুইতো পাকিস্তান হওয়ার পর মন্ত্রী হয়ে গেছে?'

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সম্পর্ক এ রকম ব্যঙ্গপ্রবণ শেরে বাংলা যখন তাঁর কৃষক- শ্রমিক পার্টি নিয়ে যুক্তফ্রন্টে এসে যোগ দিলেন, তখন বাংলার কৃষক তাঁর প্রতি পুরনো দিনের সেই আবেগ ও আকর্ষণ নতুন করে অনুভব করলো। তখন শেরে বাংলা যেখানেই সভা করতে যেতেন সেখানেই জনসমুদ্রের সৃষ্টি হতো। তিনি যখন নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার কথা বলছেন, তখন বাংলার কোন্ কৃষক সে-কথা অমান্য করবে?

সম্প্রদায়-ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনে মুসলিম লীগ বা যুক্তফ্রন্টের কোনো প্রার্থীকেই ভোট দেয়ার অধিকার হিন্দুদের ছিলো না। হারিকেন মার্কা বা নৌকা মার্কা কোনো বাক্সই তাদের নয়। তবু যুক্তফ্রন্টের সভাগুলোতে হিন্দুরা দলে দলে যোগ দিতো। হিন্দুদের সমস্যা বা সংকট সম্পর্কে এ-সব সভায় যদিও টু শব্দটিও উচ্চারণ করা হতো না, তবু হিন্দুরা যুক্তফ্রন্টকে তাদের একান্ত আপন বলে ভাবতে লাগলো। সভার শেষে যখন স্লোগান উঠতো 'ভোট দেবেন কিসে? নৌকা মার্কা বাক্সে' তখন অন্য সবার সঙ্গে আমার বন্ধু সুশীল, গোপাল, দীনবন্ধু, ক্ষিতীশ, প্রাণেশরাও প্রবল উৎসাহে গলা মিলাতো।

সাদা আর সবুজ নিশান, বংশদণ্ড ও পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস

পাকিস্তান আমলের পূর্ববঙ্গের দুই মাতালের গল্প শুনেছিলাম। একজন 'হিন্দু' মাতাল, অপরজন 'মুসলমান'।

কিছু পরিমাণ লাল পানি পেটে যাওয়ার পরই 'মুসলমান' মাতাল একেবারে দিল দরিয়া। সে তখন প্রাণ খুলে গাইছে, 'চাঁদতারা সাদা আর সবুজ নিশান/ আমাদের কওমি নিশান'। গান গাইছে আর গানের ফাঁকে ফাঁকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে হাঁক ছাড়ছে।

কিন্তু 'হিন্দু' মাতাল কিছুতেই তার মুসলমান ইয়ারের সঙ্গে গলা মেলাতে পারছে না। এক পর্যায়ে হঠাৎ সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'তোদের জন্য পাকিস্তান হয়েছে। তোরা চাঁদতারা কওমি নিশান পেয়েছিস। কিন্তু আমরা? আমি হিন্দু। আমি কি পেয়েছি? পাকিস্তান তোদের, নিশান তোদের। আমার তো কিছুই নেই।"

বলতে বলতে তার কান্নার বেগ আরো বেড়ে যায়।

তার ইয়ার তাকে সান্ত্বনা দেয়। 'আহা-হা। এতো দুঃখ করছিস কেন? তোর জন্যেও তো পাকিস্তানের নিশানে ভাগ আছে। দেখছিস না ওই সাদা অংশটা? নিশানের একেবারে পয়লাই তো সাদা। এই সাদাটাই তো তোরা—হিন্দুরা।'

এবার কান্না থামিয়ে হিন্দু মাতাল চিৎকার করে বলে, 'হুঃ এই সাদাটাই আমরা, হিন্দুরা। ওটা তো রেখেছিস বাঁশ দেয়ার জন্যে। ওই সাদাটার ভেতর দিয়েই তো আমাদের বাঁশ দেয়া হয়। ওই বাঁশের আগাতেই তো পাকিস্তানের নিশান ওড়ে।'

মাতালের কথাকে অবশ্যই বিবেচনায় নেয়ার কথা ছিলো না। কিন্তু ওই বিজ্ঞ মাতালটির অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা না-করার কোনো উপায় নেই।

আসলে পাকিস্তান যে যথার্থই একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র, সে কথাটি এ রাষ্ট্রের নীতি ও শাসকদের আচরণের মধ্যে দিয়ে সব সময় স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো। পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, এখানে ইসলামি হুকুমাত কায়েম হবে, মুসলমানের তাহজিব-তমদ্দুন রক্ষা করাই হচ্ছে এ রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব। এ-সব কথারই বিরামহীন পুনরাবৃত্তি চলতো শাসকগোষ্ঠীর কণ্ঠে ও প্রচারমাধ্যমে। সে সঙ্গে 'পবিত্র আমানত' অমুসলমানদের জন্য কিছু করুণাও বর্ষিত হতো বৈকি! ওরা সংখ্যালঘু, কাজেই রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার লঘু অংশ তারা অবশ্যই পাবে। চাকরি বাকরিতে একটা কোটা নিশ্চয়ই থাকবে তাদের জন্য। তাই বলে তারা সংখ্যাগুরুর সমান ভাগ সমান মর্যাদা পাবে? অসম্ভব। কওমি নিশানে যে-রকম সাদা একটা অংশ রাখা হয়েছে, সে রকমই হবে তাদের অংশীদারিত্ব।

এ-রকম ঘোষিত নীতির অন্তরালে অঘোষিত ছিলো সংখ্যালঘুদের বংশদণ্ড প্রদানের যে পাকিস্তানি নীতিটি, 'হিন্দু' মাতালের কথায় সেটিরই খোলাখুলি প্রকাশ ঘটেছিলো। মাতালেরা বোধ হয় মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

তবে মদের মাতালরা যা-ই বলুক, দেশপ্রেমের মাতালরা এ-অবস্থাটি মেনে নিতে পারেননি। 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক দলটিতে যে সব যথার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন তাঁদের অনেকেই দেশ মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে যাদের জন্মস্থান পড়ে গিয়েছিলো পাকিস্তানের এলাকায়, তারা পাকিস্তানে অবস্থান করেই দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়ার সংকল্প ঘোষণা করলেন, মায়ের অঙ্গচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণায় নিরসনের পথ খুঁজলেন। এ-রকমই একজন দেশপ্রেমিক কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত—তার সে সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, 'সংকল্প করিলাম, আমি বাক্যে ও কর্মে নিজেকে পাকিস্তানি মনে করিয়া, পাকিস্তানের সর্বপ্রকার উন্নয়নের চেষ্টা করিব, আর যদি জনগণের সেবা করিতে পারি, তাহাই হইবে আমার জীবনের বিশ্বমানবের সেবা। যদিও ভারত বিভাগ আমরা চাই নাই।'

ভারত বিভাগ তাঁরা না-চাইলেও ভারত বিভক্ত হয়ে বাস্তবে যে দেশটির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সে-দেশটি তো তাদেরও। সে-দেশেরই জল হাওয়ায় তারা মানুষ হয়েছেন, সে-দেশেরই প্রতি তাদের আবেগঘন ভালোবাসা। এই ভালোবাসার টানেই তাঁরা শত লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মুখেও দেশ ছেড়ে চলে যাননি, নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কল্যাণ ও স্থিতিশীলতা কামনা করেছেন মনে প্রাণে। 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' নাম ধারণ করে তাঁরা কেন্দ্রে (অর্থাৎ গণপরিষদে) ও পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভায় বিরোধী দলের আসনে বসলেন। পরিষদীয় বিরোধী দল রূপে

কংগ্রেস ছাড়া সে সময়কার পাকিস্তানে আর কেউ ছিলো না। কাজেই, বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে কংগ্রেসীরাই দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা গণপরিষদে ও প্রাদেশিক আইন সভায় তুলে ধরতে লাগলেন। তাঁদের সকল প্রস্তাব ও পরামর্শই ছিলো অত্যন্ত গঠনমূলক, তাঁদের লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তানকে একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র রূপে গড়ে তোলা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকদল মুসলিম লীগ ছিলো মধ্যযুগীয় চিন্তাচেতনার ধারক, সব ধরনের প্রগতিশীলতার শত্রু। তাই স্বাভাবিক ভাবেই, তারা সব সময়ই বিরোধী দলভুক্ত কংগ্রেসীদের দেশপ্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ করতো, হিন্দুস্থানের দালাল আখ্যা দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে নানা অবমাননাকর বক্তব্য রাখতো। তবু, সব অপবাদ আর অবমাননা সয়ে, যথার্থ দেশপ্রেমিকের ভূমিকা পালনে তাঁরা অটল থেকেছিলেন। একদা ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁদের বিরুদ্ধে যখন-তখন ভারতের দালালির অভিযোগ আনা মুসলিম লিগারদের জন্য অনেক সহজ হয়েছিলো। কিন্তু তাঁরা প্রতিবেশী ভারতের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতি যেমন প্রকাশ্য সমর্থন জানাতেন, তেমনি সে-দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির দুরাচার ও মিথ্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এ-বিষয়ে বিশিষ্ট বামপন্থী তাত্ত্বিক ও গবেষক বদরুদ্দীন উমর অত্যন্ত মূল্যবান সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,—

"কংগ্রেস সদস্যেরা পূর্ববাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রচারণার জোর প্রতিবাদ করেন। সেটা ছিলো ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়।

"কলকাতার পত্রিকাগুলোতে পূর্ববাংলার পরিস্থিতির ওপর মিথ্যা সংবাদ প্রচার করার ফলে এখানে 'দৈনিক আজাদ' ও 'মর্নিং নিউজ'-এর মতো পত্রিকা সেই মিথ্যা সংবাদকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে। পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা বসন্তকুমার দাস তখন তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা পূর্ববঙ্গে হাঙ্গামা বাধার অন্যতম কারণ।' তিনি আরও বলেন যে, 'পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্য দাঙ্গা বাধার অন্যতম কারণ।'

"কিন্তু সংবাদপত্র ছাড়াও বেতারের মতো পুরোপুরি সরকার-নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে চরম মিথ্যা এবং তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সংবাদ সে-সময় প্রচারিত হয়। এ-প্রচারণার একটি উদাহরণ ছিলো কুমিল্লায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি অপসারণকে কেন্দ্র করে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র অপপ্রচার। এই অপপ্রচার চালাতে গিয়ে বলা হয় যে, চারশো মুসলমান হল আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা দুশো হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর লুটপাট ও ধ্বংস করে। এই মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করে কুমিল্লার দুই বিখ্যাত উকিল কংগ্রেস নেতা ও গণপরিষদের সদস্য কামিনী কুমার দত্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৫০ সালের পশ্চিম ও পূর্ববাংলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সারা বাংলাদেশ অর্থাৎ উভয় বাংলা জুড়ে একই সময়ে এতো বড়ো দাঙ্গা ইতিপূর্বে অথবা ১৯৫০ এর পর আর সংঘটিত হয়নি।" (ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'স্মারকগ্রন্থ', ঢাকা- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ১৩৩)

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ পূর্ববঙ্গের সকল কংগ্রেস নেতাই সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে স্বচ্ছ ও বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধেই তাঁদের ছিলো তীব্র ঘৃণা। স্বদেশভূমি পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ যেমন অনায়াসে ত্যাগ করেছেন, তেমনি ত্যাগ করেছেন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদও।

এ-বিষয়টি একান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের মধ্যে।

তখনকার প্রচলিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অমুসলমানদের জন্য নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধাজনক ছিলো। কারণ, তখন জনসংখ্যার হিসেব অনুসারে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের তিন শো নয়টি আসনের মধ্যে অমুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিলো বাহাত্তরটি। (বর্ণ হিন্দু-৩১, তফসিলী হিন্দু-৩৭, খ্রিষ্টান-১, বৌদ্ধ-২ সর্বমোট-৭২)। অর্থাৎ এই বাহাত্তরটি আসনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অমুসলমানদের ছিলো নিরঙ্কুশ অধিকার, এগুলোতে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে না। তাই, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতেই হবে যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতাদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাই ছিলো লাভজনক। অথচ, নিজেদের জন্য একান্ত লাভজনক এই ব্যবস্থাটিকে বাতিল করার জন্যই তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মতো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলগুলো এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাই বহাল রাখতে চেয়েছিলো। তারা যুক্ত নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে গিয়েছিলো। তারা বলতো: মুসলমানরা ব্রিটিশ ভারতে পৃথক নির্বাচনের অধিকার আদায় করতে পেরেছিলো বলেই তাদের পক্ষে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম করা সম্ভব হয়েছিলো। হিন্দু কংগ্রেসীরা বরাবরই পাকিস্তানের দুশমন। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই তারা পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থাটিকে বাতিল করতে চাইছে। এদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

শুধু কট্টর ইসলামপন্থীরাই নয়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মতো পাশ্চাত্য পন্থী নেতাও প্রথমে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষে ছিলেন। পরে অবিশ্যি তিনি তাঁর মত বদল করে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির অনুকূলে জোরালো যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি এমনও বলেছিলেন যে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পাকিস্তানকে বিভক্ত করে ফেলবে। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা পৃথক নির্বাচনের অধিকার প্রয়োগেই ভারত বিভক্ত করে আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম করতে পেরেছিল। পাকিস্তানেও যদি হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা বহাল থাকে, তবে তারাও পাকিস্তানের ভেতরেই আলাদা হিন্দুস্থানের দাবি ওঠাতে পারে। অতএব, পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

পাকিস্তান কংগ্রেসের নেতারা কিন্তু এ-রকম কোনো কূট যুক্তিজালের আশ্রয় নেননি। গোড়া থেকেই তাঁরা সব রকম সাম্প্রদায়িক মতলববাজি থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন, ব্যক্তিগত সুবিধা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠেই বলিষ্ঠভাবে পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বদলে জাতীয় স্বার্থই ছিলো তাদের একমাত্র অন্বিষ্ট। পৃথক নির্বাচন প্রথাকে তাঁরা প্রকৃত জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিলেন। মুসলমান অমুসলমানের রাজনৈতিক বিভাগ ও বিভেদ যেমন তাঁরা সমর্থন করতেন না, তেমনি অমুসলমানদের জন্য বর্ণ হিন্দু, তফসিলি হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধের রাজনৈতিক বিভাজনও তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো একান্ত অবাঞ্ছিত। তাঁরা চেয়েছিলেন: দেশের রাজনীতি থেকে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু কথা দুটো মুছে যাক, ধর্ম হোক মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপার, রাষ্ট্র হোক ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাদের চাওয়াকে পাকিস্তান রাষ্ট্রে পাওয়ায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তাই উনিশ শো চুয়ান্নতেও পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির অধীনেই নির্বাচনে যোগ দিতে হয়েছিলো তাদের।

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নীতি ও আদর্শগত ব্যাপারে কোনো বিরোধ ছিলো বলে মনে হয় না। তবে রণকৌশলের ব্যাপারে কিছু মতভেদ সে- সময়ে দেখা দিয়েছিলো। মনোরঞ্জন ধর, নেলি সেনগুপ্তা, বসন্তকুমার দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে। অন্যদিকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাস লাহিড়ি, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) এবং এ-রকম আরো কয়েকজন নেতা দল হিসেবে কংগ্রেসের বিলুপ্তি চেয়েছিলেন। তাঁদের মতে : পাকিস্তানের কংগ্রেস যেহেতু বাস্তবে হিন্দুদের একটি সংগঠনে পর্যবসিত হয়ে গেছে, তাই এটিকে দিয়ে বৃহত্তর জাতীয় লক্ষ্য সাধন করা যাবে না। এই যুক্তিতেই তাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তখনো এদেশে কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনো সেক্যুলার পার্টির অস্তিত্ব ছিলোই না বলতে গেলে। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে যেমন 'মুসলিম' বাদ পড়েনি, শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি তেমনি নামে সাম্প্রদায়িক না হলেও সুস্পষ্ট সেক্যুলার আদর্শ ধারণ করতে পারেনি। 'গণতন্ত্রী দল' নামক রাজনৈতিক দলটিরও তেমন কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি ছিলো না। তাই কংগ্রেস থেকে-বেরিয়ে-আসা হিন্দু নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে যুক্ত করার মতো কোনো অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন খুঁজে পেলেন না। নিজেরাও এ-রকম কোনো সংগঠন গড়ে তুলতে পারলেন না। তা ছাড়া তখনকার পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির কারণেই, কংগ্রেসের মতোই, তাঁদেরও কেবলমাত্র অমুসলমান আসনেই নির্বাচন প্রার্থী হতে হলো। 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' নামে যে নির্বাচনী জোটের ঘোষণা তারা দিয়েছিলেন সেটি ছিলো নিতান্তই নাম সর্বস্ব ও কাগুজে-কার্যকর অস্তিত্বহীন। তবু সে জোটের নামেই আমাদের এলাকায় (নেত্রকোনার দশটি ও কিশোরগঞ্জের আটটি থানা) নির্বাচন-প্রার্থী হলেন 'মহারাজ' নামে পরিচিত বিপ্লবী নেতা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

চুয়ান্ন সনের এপ্রিলে ছিলো আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। সাধারণ নির্বাচন মার্চে। এ-সময়ে আমার নাকমুখ গুঁজে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার কথা। অথচ, তখনই আমি নির্বাচনের প্রচার কাজে মেতে উঠলাম ত্রৈলোক্য মাহারাজের পক্ষে। পরীক্ষার পড়া আপাতত শিকেয় উঠলো।

চুয়ান্নর নির্বাচন ও হিন্দু সমাজ

আমাদের নির্বাচনী এলাকায় বর্ণহিন্দু আসনে, চুয়ান্নর নির্বাচনে, প্রার্থী ছিলেন ছয়জন। কংগ্রেসের দুর্গেশ পত্তনবিশ, কম্যুনিস্ট পার্টির নগেন সরকার, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টের ত্রৈলোক্য মহারাজ, আর নির্দলীয় নরেশ গুপ্ত, প্যারী মোহন তালুকদার ও লক্ষ্মণ দাস। কংগ্রেসের গরুর গাড়ি, কম্যুনিস্ট পার্টির ধানের আঁটি আর সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টের সাইকেল ছিলো নির্বাচনী প্রতীক। নির্দলীয় প্রার্থীদের কার কী প্রতীক ছিলো, আজ আর মনে নেই।

এই ছয়জন প্রার্থীর মাত্র একজনকেই আমি তখন নিজের চোখে দেখেছি। তিনি ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী,—ত্রৈলোক্য মহারাজ নামেই যার সমধিক পরিচিতি। ত্রৈলোক্য মহারাজ রামপুর বাজারে এসে সভা করেছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন আরেকজন নেতা জ্ঞান মজুমদার। এদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের আগুজিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট

নিশিবাবু—নিশিকান্ত ভট্টাচার্য। আমার প্রিয় শিক্ষক কুমুদ ভট্টাচার্য ও জয়চন্দ্র রায়, আর আমার পিতৃবন্ধু কামিনী কুমার চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্র চক্রবর্তীসহ আমাদের গাঁয়ের ও আশপাশের সকল গাঁয়ে আমার যাঁরা গুরুজন স্থানীয়, তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ত্রৈলোক্য মহারাজের সমর্থক। মহারাজকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে সেদিন আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। চেহারায় তাঁর তেমন কোনো আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। অথচ, এই ছোটখাটো মানুষটিই কিনা ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের ত্রাস, তিরিশ বছর তারা এঁকে জেলে আটকে রেখেছিলো। কোনো জেল-জুলুমই যে-মানুষটিকে নতি স্বীকার করাতে পারেনি, সেই মানুষটিই এসেছেন আজ আমাদের কাছে ভোট চাইতে। এঁকে তো আমরা কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারি না। নিশিবাবু আর কুমুদ বাবুই আমাকে ত্রৈলোক্য মহারাজের পক্ষে প্রচার কাজ চালাতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সহপাঠি বন্ধু অনঙ্গমোহন সরকারকে নিয়ে আমি সোৎসাহে সে কাজে লেগে গেলাম। এরপর সিংহের গ্রামের গোপাল দাস ও সে-গ্রামেরই কর বাড়ির আরেকজন যুবক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবে, প্রচার কাজে আমার আর অনঙ্গর উৎসাহই ছিলো সবচেয়ে বেশি। টিনের চোঙায় মুখ লাগিয়ে হাটে হাটে গিয়ে বক্তৃতা দিতাম। আমাদের আশপাশের গ্রামগুলোর বর্ণহিন্দুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেও প্রচার কাজ চালিয়েছি। প্রচারে ত্রৈলোক্য মহারাজের বিপ্লবী জীবনের কাহিনীর বর্ণনা যতো না করেছি, তারচেয়ে বেশি করেছি কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের নিন্দাবাদ। এ সব নিন্দাবাদের ভাষা নিশিবাবু ও কুমুদবাবুই আমাদের মুখে জুগিয়ে দিয়েছেন।

কংগ্রেস প্রার্থী দুর্গেশ পত্রনবিশের পক্ষেও খুব জোর প্রচার কাজ চলেছিলো। তিনি অবিশ্যি সশরীরে আমাদের এখানে উপস্থিত হননি। তবে তার পক্ষে রামপুর বাজারে একদিন সভা করতে এসেছিলেন নেত্রকোনা মহকুমার তৎকালীন কংগ্রেস নেতা নকুলচন্দ্র সিংহ। তাঁর সঙ্গে ছিলো বেশ কয়েকজন যুবক কর্মি। নকুল বাবু এ-অঞ্চলে পুরোনো কংগ্রেস সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় কারো কাছ থেকেই তেমন সাড়া পাননি। আমাদের আশপাশের গ্রামগুলোতে ছেচল্লিশের নির্বাচনে যারা কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন, সে-সব প্রবীণের সবাইকেই এবার ত্রৈলোক্য মহারাজকে সমর্থন জানাতে দেখলাম। 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' সম্পর্কে অত্যন্ত তীব্র বিরূপতা প্রকাশ করেছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য। পাকিস্তানে কংগ্রেস নামে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখার যে কোনো অর্থ থাকতে পারে না, কুমুদ বাবু এ-ব্যাপারে সেদিন অনেক তীক্ষ্ণ যুক্তির অবতারণা করেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গেশ পত্রনবিশের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এর অনেক পরে—উনষাট সালের দিকে। আমি তখন নেত্রকোনা শহরে তাঁর প্রতিবেশী। প্রতিবেশী থেকে ক্রমে তাঁর একান্ত স্নেহভাজন। তার সঙ্গে আলাপচারিতায় বুঝতে পেরেছি যে, তিনিও আসলে পাকিস্তানে কংগ্রেস নামে কোনো দল রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে চুয়ান্নতে তার কংগ্রেস প্রার্থী রূপে নির্বাচনে দাঁড়াবার ব্যক্তিক পটভূমিটি তিনি আমার কাছে নানা কথা প্রসঙ্গে অনেকবারই বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক জীবন সম্পর্কেও অনেক কথা জানতে পেরেছি।

বাড়রি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান দুর্গেশ পত্রনবিশ ছাত্রজীবন থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সাঁইত্রিশ সালে তিনি নেত্রকোনা চন্দ্রনাথ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। সে বছরই সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ছাত্র ফেডারেশনের

রাজনীতির সূত্রেই তিনি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের (রিভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি–আরএসপি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। একটি অকম্যুনিস্ট সমাজতন্ত্রী ধারা এ উপ-মহাদেশের রাজনীতিতে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই চলে আসছিলো। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সেই ধারারই সৃষ্টি। সেই ধারাতেই আরএসপিরও জন্ম। সমাজতন্ত্রী রাজনীতির এ-ধারাটি মার্কসবাদের অনুগত হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনের নেতৃত্ব সম্পর্কে ছিলো সমালোচনামুখর, এবং কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বিরোধী। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে সে-যুদ্ধে ব্রিটিশের সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে, তখন কম্যুনিস্টদের সঙ্গে এ ধারার সমাজতন্ত্রীদের ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। সে সময়েই, বিয়াল্লিশ সালে, তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মুখে কলকাতায় দুর্গেশ পত্রনবিশ গ্রেফতার হন। পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত জেলে আটক থাকেন, জেল থেকে পরীক্ষা দিয়েই এমএ পাস করেন এবং সে সময়েই গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন লাগে রোগমুক্ত হতে। এর পর কলকাতা থেকে নেত্রকোনায় ফিরে আসেন পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, এবং তখন থেকেই নেত্রকোনা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তেপ্পান্ন সালে তার যোগাযোগ ঘটে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মনোরঞ্জন ধরের সঙ্গে। পাকিস্তানে কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সার্থকতা সম্পর্কে মনোরঞ্জন বাবুর সঙ্গে তাঁর অনেক বাদানুবাদ হয়। তবে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে যারা 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠন করলেন তাদের কার্যধারাকেও তিনি মেনে নিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত, বলা যেতে পারে, মনোরঞ্জন ধরের প্রণোদনাতেই চুয়ান্ন সালে দুর্গেশ পত্রনবিশ কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে গেলেন।

কংগ্রেস প্রার্থী দুর্গেশ পত্রনবিশের মতো কম্যুনিস্ট প্রার্থী নগেন সরকারও নিজে আমাদের গ্রামে বা তার আশপাশে কোথাও এসে সভা করতে পারেননি। আঠারোটি থানা নিয়ে গঠিত বিরাট নির্বাচনী এলাকার সব জায়গায় যাওয়া কোনো প্রার্থীর পক্ষেই তখন সম্ভব ছিলো না। কারণ সে সময়ে নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে পথঘাট ছিলো দুর্গম, যান চলাচলের অযোগ্য। তবু, দুর্গেশ পত্রনবিশ ও ত্রৈলোক্য মহারাজের তুলনায় বেশ দেরিতে নির্বাচনী প্রচারে নেমেও, অতি অল্প সময়েই কমরেড নগেন সরকারের পক্ষে প্রচার জমজমাট হয়ে উঠলো। কী করে এমনটি সম্ভব হলো, অনেক পরে তার হেতুটি বুঝতে পেরেছিলাম।

কম্যুনিস্ট পার্টি যদিও—চুয়ান্নর নির্বাচনের সময়েও—আনুষ্ঠানিকভাবে বেআইনি ঘোষিত হয়নি, তবু দমন-পীড়নের তীব্রতার মুখে কম্যুনিস্টরা প্রকাশ্য কাজকর্ম চালানোর সুযোগ খুব কমই পেয়েছে। তাদের পক্ষে, তাই, গোপন তৎপরতার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিলো না। তবে স্বীকার করতেই হবে, আধা গোপন ও আধা প্রকাশ্য নানা তৎপরতার মধ্যদিয়ে পূর্ববঙ্গের কম্যুনিস্টরা তাদের সাংগঠনিক কাজ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গেই চালিয়ে গিয়েছিলো। মুসলিম লীগ-বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলোর মধ্যে মোটামুটি একটি প্রভাব বলয়ের সৃষ্টিও তারা করতে পেরেছিলো। তাই দেখলাম : আমাদের এলাকার বেশ কিছু মুসলিম যুবক কমরেড নগেন সরকারের নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছে। আমার বন্ধু আওয়ামী লীগ কর্মি আবদুস শাহিদ হলো এ প্রচারক দলের মধ্যমণি। শাহিদ এরপর কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এলাকার অনেক তরুণকে সে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত বা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন করে তোলে। বেখেরহাটি হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মৌলবী আবদুল গনি সাহেবের পুত্র পারিবারিক প্রভাবের কারণেই ছিলো গোঁড়া মুসলমান। অথচ এক সময় দেখা গেলো এই মতিনকেও আবুস শাহিদ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ভিড়িয়ে ফেলেছে। কম্যুনিস্ট পার্টির বেআইনি

আমলে, বিশেষ করে আইয়ুবী সামরিক শাসনের সময়ে, মতিন অনেক ঝুঁকি নিয়ে আত্মগোপনকারী কম্যুনিস্ট নেতাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে ও নানাভাবে তাদের কাজের সহায়তা করেছে।

আসলে, আমাদের এলাকায় কম্যুনিস্টদের গোপন ও প্রকাশ্য সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার হয়েছিলো বর্ণহিন্দু আসনে কম্যুনিস্ট প্রার্থী নগেন সরকারের নির্বাচনী প্রচারের মধ্যে দিয়েই। এ নির্বাচনকে উপলক্ষ করেই মুসলিম যুবকদেরর অনেককে কম্যুনিস্ট পার্টি তার সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছিলো। পরে এদেরই কেউ কেউ পার্টির সদস্যপদও লাভ করে।

অর্থাৎ কম্যুনিস্টরা সংগঠন গোছানো ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ হিসেবেই নির্বাচনে যোগ দিয়েছিলো, জেতাটা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না।

নির্বাচনে অবিশ্যি কম্যুনিস্ট নগেন সরকার জিততেও পারেননি। সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন ত্রৈলোক্য মহারাজ। ভোট প্রাপ্তির দিক দিয়ে নগেন সরকারের ছিলো দ্বিতীয় স্থান। তবে সারা প্রদেশে অমুসলমানদের চারটি আসনে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুসলিম আসনে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে নিজ নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। কম্যুনিস্ট পরিচয় অপ্রকাশ্য রেখে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন অঙ্গ দলগুলোর মধ্য থেকে ঠিক কতো জন কম্যুনিস্ট নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন তার সঠিক সংখ্যাটি বলা কঠিন। তবে সে সংখ্যাটি যে একেবারে অনুল্লেখ্য ছিলো না—এ-কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে। মোট কথা, চুয়ান্নর নির্বাচনকে কম্যুনিস্টরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের দিক থেকে অনেক পরিমাণেই কাজে লাগাতে পেরেছিলো।

কমরেড নগেন সরকারের পক্ষে যারা প্রচার কাজে নেমেছিলেন—কিংবা যারা তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন—রাজনৈতিক আদর্শই তাঁদের মুখ্য বিবেচনার বিষয় ছিলো। কিন্তু অমুসলমান আসনের অন্য প্রার্থীদের বেলায় ঠিক তেমনটি ছিলো না।

আমার নিজের কথাই বলি। তখন একুশ বছরের নিচে কেউ ভোটার হতে পারতো না। কাজেই আমিও ভোটার ছিলাম না। তবে ভোটের ক্যানভাসার হতে কোনো বাধা ছিলো না।

আমার প্রকৃত বয়স তখন আঠারো। কবিকিশোর সুকান্তর ভাষায়—

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তুলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারোর স্পর্ধা নিয়েই আমি ভোটের ক্যানভাসার সেজেছিলাম। গুরুজনদের মুখে ত্রৈলোক্য মহারাজের অতীত জীবনের বর্ণময় কাহিনী শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। নিশি বাবু ও কুমুদ বাবুর কাছে উৎসাহ পেয়ে টিনের চোঙা হাতে নিয়ে মহারাজের জন্যে ভোট প্রার্থী হয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলাম। এর পেছনে আমার নিজস্ব রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা খুব কমই কার্যকর ছিলো।

কিন্তু প্রচারে নেমে যখন হিন্দু ভোটারদের মতিগতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে লক্ষ করলাম, তখন অনেক কিছুই নতুন করে ভাবতে বাধ্য হলাম। পরে দিনে দিনে সে ভাবনাই আরো পরিণতির দিকে গিয়েছে।

তবে হ্যাঁ, পাকিস্তানে কংগ্রেস নামক দলটির নিরর্থকতা সম্পর্কে নিশিবাবু ও কুমুদবাবু যে-সব যুক্তি দিয়েছিলেন সেগুলো আমার মনে ধরেছিলো। 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁদের স্বদেশপ্রেম ছিলো নিশ্চয়ই প্রশ্নাতীত। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উত্তরাধিকার দাবি করে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে এদের স্বদেশপ্রেমকে বিশ্বাস্য করে তোলা ছিলো অসম্ভব। এমনকি প্রাক-পাকিস্তান যুগে যাঁরা 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের কাছেও না। 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'রাই বরং, একান্ত সঙ্গত কারণেই, কংগ্রেসের ওপর সবচেয়ে বেশি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। এখানকার হিন্দু কংগ্রেসীদের বৃহৎ অংশটি যখন দেশ বিভাগ স্বীকার করে নিয়ে ভারতে পাড়ি জমালেন, তখন পাকিস্তানে পড়ে থাকা 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'দের একেবারে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন। ওরা ডুবলো কি পাড়ে উঠলো, তাকিয়েও দেখলেন না। এ-ব্যাপারে অন্নদাশংকর রায়ের পর্যবেক্ষণ :

'... এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে খান আবদুল গফফার খানকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেয়া হলো। তাঁর চেয়ে বড়ো কংগ্রেসী মুসলিম কে? তাঁর মতো ত্যাগের তুলনাই ক'জন ভারতীয়ের?'

পাকিস্তানের জন্মসময়ে অন্নদাশংকর রায় ছিলেন ময়মনসিংহের জেলা জজ। সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"ময়মনসিংহের হিন্দুরা সভা করেন তাঁদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে। সেই সভায় যোগ দিতে আসেন কিরণশংকর রায়। আমি তাঁকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করি। তিনি আসেন বেশ রাত করে। সভার কাজ যেন শেষ হতে চায় না। লোকের জিজ্ঞাসার যেন অন্ত নেই। কথাবার্তা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যায়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নামে তিনি জ্বলে ওঠেন। বলেন, 'ওরা আমাদের অ্যাসেটস নন, ওরা আমাদের লায়াবিলিটি। ওদের জন্যই, আমাদের এতো দাম দিতে হয়েছে।'

"হতভাগ্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান! দুই পক্ষই তাদের সন্দেহ করে। তবু ভালো যে তারা প্রাণে বেঁচে গেছেন। গৃহযুদ্ধ হলে হিন্দুরা ওদের কোপাতো মুসলমান বলে, আর মুসলমানরা কাটতো হিন্দুঘেঁষা বলে।" (*যুক্তবঙ্গের স্মৃতি*– কোলকাতা-১৩৯৯, পৃষ্ঠা-১০৮)।

গৃহযুদ্ধ না হলেও পাকিস্তানে যাঁরা ছিলেন প্রকৃতই সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী, তাঁরা কেন কংগ্রেসের লক্কর ঝক্কর 'গরুর গাড়ি'তে চড়ে বসবেন?

এ বিষয়টি বরং ত্রৈলোক্য মহারাজরাই ভালো বুঝেছিলেন। তাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারলেন না, কেবল লাঞ্ছনাই সয়ে গেলেন। কম্যুনিস্ট প্রার্থী নগেন সরকারের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার কাজে প্রগতিশীল মুসলিম তরুণরা যেমন যোগ দিয়েছিলেন, তেমন কাউকেই ত্রৈলোক্য মহারাজের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো না। 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' করে মহারাজরা ভোটের রাজনীতিতে যাদের ওপর নির্ভর করলেন সেই হিন্দুরা—বিশেষ করে বর্ণহিন্দুদের একটি বড়ো অংশ—মানসিকভাবে হয়ে পড়েছিলো নিতান্ত অনিকেত। মধ্যস্বত্বভোগী 'ভদ্রলোক'দের জমিদারি তালুকদারি ছিলো পূর্ববঙ্গের গ্রামে, কিন্তু তাদের ছেলেপুলেদের অনেকেই চাকরি-বাকরি ও লেখাপড়ার সূত্রে বাস করতো কলকাতায় বা ভারতের অন্যত্র। জমিদারি উচ্ছেদ আইনে তাদের মধ্যস্বত্ব চলে যাওয়ায় পূর্ববঙ্গে আর তাদের শেকড় প্রায় রইলোই না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বদেশ-ভাবনায় রূপান্তর ঘটে গেলো। পাকিস্তানের

রাজনীতির ভালোমন্দ নিয়ে ধীরেন দত্ত-প্রভাস লাহিড়ী-ত্রৈলোক্য মহারাজদের খাঁটি দেশপ্রেমিক সুলভ চিন্তা তাদের ছিলো না। 'এদেশের রাজনীতিতে আমাদের কী স্বার্থ'—এ-রকমই নিস্পৃহ তাদের দৃষ্টি। চুয়ান্নর ভোটেও তারা অংশ নিয়েছিলো বটে, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিলো একান্তই অরাজনৈতিক বা অপ-রাজনৈতিক।

বর্ণহিন্দুরা স্বভাবতই একটু নাক উঁচু প্রকৃতির। ভদ্রলোকত্বের অভিমান তাদের প্রচণ্ড। আবার, বর্ণহিন্দু নামে যারা ভোটার তালিকাভুক্ত তারাও সকলে একই বর্গের মানুষ নয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরা যেমন বর্ণহিন্দু, তেমনি নবশাখ গোষ্ঠীর লোকেরা কিংবা সাহা-মাহিষ্য-নাথেরাও ভোটার তালিকায় বর্ণহিন্দু বলে স্বীকৃত। অথচ সাহা, মাহিষ্য বা নাথ জাতের মানুষগুলোকে 'ভদ্রলোক' বলে স্বীকার করতে অন্য জাতের মানুষরা রাজি নয়। ভোটের বেলাতেও এদের জাতের বিভেদ ও বিবাদই প্রধান বিবেচনা হয়ে উঠতে আমি চুয়ান্নর নির্বাচনেও দেখেছি। এ নির্বাচনে একজন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় প্রার্থী—খালিয়াজুড়ির প্যারী মোহন তালুকদার—মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদের প্রায় একচেটিয়া ভোট পেলেন নিজে মাহিষ্য বলেই। একজন ধনবান সাহা মহাজন কংগ্রেসের নমিনেশনে নির্বাচন প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে নমিনেশন না পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী দুর্গেশ পত্রনবিশের ঘোর শত্রু হয়ে গেলেন। তিনি সাহাদের কাছে প্রচার করলেন যে, ত্রৈলোক্য মহারাজ সাহা সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, কাজেই সাহাদের সব ভোট মহারাজকেই দেয়া উচিত। আসলে এটি ছিলো মিথ্যা প্রচার। ত্রৈলোক্য মহারাজ ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দেখলাম: রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ দুর্গেশ পত্রনবিশের বিরুদ্ধে ও ত্রৈলোক্য মহারাজের পক্ষে প্রচার করছে নিতান্ত জাতের কথা তুলেই।

এই তো গেলো 'ভদ্রলোক' বর্ণহিন্দুদের চিন্তাচেতনা ও আচার আচরণের কথা। আর 'ছোটলোক' তফসিলি হিন্দুরা? তারাও তাদের জন্যে নির্ধারিত আসনে নিজ নিজ জাতের প্রার্থীর খোঁজ করতে লাগলো। কৈবর্ত জাতের ভোটার ভোট দিলো কৈবর্ত প্রার্থীকে, ধোপা ধোপাকে, নমশূদ্র নমশূদ্রকে। রাজনীতির কোনো বালাই সেখানে ছিলো না। তবে নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জে ধোপা ও নমশূদ্ররা সংখ্যায় অনেক বেশি লঘু হওয়াতেই বোধহয় তফসিলি হিন্দুর আসনে কৈবর্ত জাতের প্রফুল্ল কুমার সরকার জিতে গেলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বেও রাজনীতিতে জাতপাতের এমন নোংরা খেলা দেখে আঠারো বছর বয়সী আমার মন বিক্ষোভে ভরে গেলো। কমরেড নগেন সরকারের সমর্থকদের মধ্যেই কেবল অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক সুস্থতা দেখতে পেয়েছিলাম। তাই, চুয়ান্নর নির্বাচনের পর থেকেই কম্যুনিস্ট রাজনীতি সম্পর্কে আমার মধ্যে ইতিবাচক ভাবনা জন্ম নিতে থাকে।

রাজনীতিকদের দেউলিয়াপনা ও বাঙালির স্বার্থহানি

চুয়ান্নর মার্চে হলো নির্বাচন, এপ্রিলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা দিলাম। অঙ্কে মাত্র তেত্রিশ নম্বরের উত্তর দিতে পেরেছিলাম। যদি একটা অঙ্কও ভুল হয়ে গিয়ে থাকে, তবে পরীক্ষায় ফেল মারবো। অঙ্কে যদি পাস করেই ফেলি, আমার ম্যাট্রিক পাস নিশ্চিত।

পাস-ফেল সম্পর্কে এ-রকম নিশ্চিত-অনিশ্চিতের দোলায় দুলতে দুলতেই পরীক্ষার কয়েকদিন পরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে কিশোরগঞ্জ শহরে, পরে কিশোরগঞ্জের

একটি গ্রামে এবং সেখান থেকে ঢাকা জেলার কালিগঞ্জ এলাকায়—মাস দেড়েক ঘুরে বেড়ালাম। ঘুরতে ঘুরতেই রাজনীতির নানান খবর পেতে লাগলাম। শেরেবাংলা পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (*আজাদ* পত্রিকার ভাষায় 'উজিরে আলা') হয়েছেন। কয়েক দিন পরই তিনি কলকাতা গেলেন। কলকাতায় তাকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হলো। সংবর্ধনার উত্তরে নাকি তিনি এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যাতে বোঝা যায় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বেই তার বিশ্বাস নেই। তার মতে, পাকিস্তানের দু'টি অংশের মধ্যে শুধু ভৌগোলিক দূরত্বই বিস্তর নয়, দুয়ের সব কিছুই আলাদা। এই কৃত্রিম রাষ্ট্র থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চান, তিনি পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চান।

এ সব কথার উল্লেখ করে '*নিউইয়র্ক টাইমস*' পত্রিকায় যে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিলো সেটি পাঠিয়েছিলেন ওই পত্রিকার করাচীতে নিযুক্ত সংবাদদাতা ক্যালাহান। শেরেবাংলা নিজে এই রিপোর্টের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এটিকে তিনি 'মিথ্যার বেসাতি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, তিনি পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবিই শুধু করেছেন, স্বাধীনতার কথা বলেননি।

কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন সাংবাদিক ক্যালাহানের কথাকেই অমোঘ সত্য বলে গ্রহণ করলেন, শেরেবাংলার প্রতিবাদকে মোটেই আমল দিলেন না। এর কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর উস্কানিতেই পূর্ববঙ্গে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমে চন্দ্রঘোনার কাগজের মিলে, পরে আদমজীতে। দাঙ্গা বাধানোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো পূর্ববঙ্গে শেরেবাংলার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে একান্ত দুর্বল ও অযোগ্য প্রমাণ করা। ক্যালাহানের রিপোর্ট তাদের মতলব উদ্ধারের সুযোগকে আরো প্রসারিত করে দিলো। শেরেবাংলার সরকার পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ-সরকার কম্যুনিস্ট ও হিন্দুস্থানের দালালদের আশ্রয় দিয়েছে—এ-সব কথাই তারা মাঠে ময়দানে প্রচার করতে লাগলো। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষকালের মধ্যেই, চুয়ান্নর তিরিশ মে, তা বাতিল করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ফরমান জারি করলো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বেতার ভাষণ দিলেন। ভাষণে শেরেবাংলাকে 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যহীন' বলে চিহ্নিত করা হলো।

জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শেরবাংলা হলেন গৃহবন্দি, জেলে পোরা হলো শেখ মুজিবসহ তিরিশজন আইনসভা সদস্য ও দেড়শো রাজনৈতিক নেতা-কর্মিকে। পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ পাকিস্তানের পূর্ব অংশের, গণমানুষের রায়কে এভাবে নস্যাৎ করে দিয়ে পাকিস্তান তার স্বৈরতন্ত্রী চেহারাটাকে বিশ্বের সামনে একেবারে উলঙ্গ করে তুলে ধরলো। এবং সকলের অজান্তে এ-অঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যুবীজটি পুষ্ট হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে গেলো।

এরই মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, আর স্বাক্ষর করা হয়েছে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি। এ চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই এর তীব্র বিরোধিতা করে মওলানা ভাসানী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন পত্রিকায় তা পড়েছি। একদিন শাহিদের সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম সে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে সই করে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার যে দেশটিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দিয়েছে—সেটিই তার ক্ষোভ ও উত্তেজনার হেতু। ক্ষোভ তার যুক্তফ্রন্টের অনেক নেতার ওপরও। বিশেষ করে শেরেবাংলা ফজলুল হক সম্পর্কে তো সে রীতিমতো কটূক্তি করে চললো। অথচ, মাত্র এক বছর আগে

একদিন এই শাহিদই আমার সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শেরেবাংলার উচ্ছ্বসিত গুণগান করেছিলো। তাঁর মেধা, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর রসবোধ, বাংলার কৃষকের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ—এ-সবেরই অনেক অনেক দৃষ্টান্ত শাহিদ সেদিন আমার কাছে তুলে ধরেছিলো। আর আজ ফজলুল হকের বিশ্লেষণ হিসেবে যে শব্দগুলো সে প্রয়োগ করলো সেগুলো হচ্ছে: দাম্ভিক, সুবিধাবাদী, মতলববাজ, ডিগবাজি-বিশারদ।

শেরেবাংলা সম্পর্কে শাহিদের এ-রকম দুই বিপরীত মেরুতে বিচরণে আমি অবাক হইনি। কারণ শেরেবাংলার রাজনৈতিক চরিত্রের অসঙ্গতি আর বৈপরীত্যের কথা তো সবারই জানা। নন্দিত হওয়ার মতো অনেক রাজনৈতিক ও মানবিক আচরণ যেমন তিনি করেছেন, নিন্দিত হওয়ার মতো কাজও তিনি কম করেননি। নিন্দা আর নান্দী—সবদিক দিয়েই তিনি কিংবদন্তীর মহানায়ক।

তবে শাহিদের অভিযোগ যে কেবল শেরেবাংলার বিরুদ্ধেই ছিলো, তা নয়। তার কথায় বোঝা যাচ্ছিলো যে, চলতি রাজনীতির গোটা প্রক্রিয়াটির প্রতিই সে বীতশ্রদ্ধ। এই 'বুর্জোয়া রাজনীতি'র খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার এমন কথাই সে বলে যাচ্ছিলো।

আসলে, চুয়ান্নর নির্বাচনের পরে, রাজনীতিকরা জনগণের প্রত্যাশাকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। একুশ দফার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার, উপদলীয় কোন্দল আর একে অপরকে ল্যাং মারার কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা তাদের আত্মসম্মানও বিসর্জন দিয়ে বসেছিলেন, নিজের হাতেই তারা আপন আপন ভাবমূর্তিকে ভেঙে দিচ্ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বাঘা বাঘা রাজনীতিকরাও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাতন্ত্রের প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে গেলেন। যে শেরেবাংলাকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিলো, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ও বৈধভাবে গঠিত তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেছিলো, তাঁকে গৃহবন্দি করে রেখেছিলো, তাদেরই অনুগ্রহভাজন হওয়ার জন্যে সেই শেরেবাংলাই কি-না রীতিমতো আদিখ্যেতা শুরু করে দিলেন। তাদেরই প্রসাদভোজী হয়ে তিনি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন, পূর্ববঙ্গের গবর্নর হলেন, আবার তাদেরই রোষদৃষ্টিতে পড়ে পদচ্যুতও হলেন। পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যেদিন পূর্ববঙ্গ সফরে এলেন, সেদিন বিমান বন্দরে তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়ার জন্যে ন্যক্কারজনক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলেন যুক্তফ্রন্টের দুই শরিক দল কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি) ও আওয়ামী লীগের দুই নেতা—শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ও আতাউর রহমান খান। উদ্দেশ্য: গোলাম মোহাম্মদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া।

পরবর্তীকালে যারা পঞ্চাশের দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন—যেমন আবুল মনসুর আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ, মুনতাসীর মামুন—তাঁরা কেউই পূর্ববঙ্গের এই দুই নেতার মাল্যদান-প্রতিযোগিতার নিন্দা না জানিয়ে পারেন নি। তাঁরা সবাই এ-ঘটনার মধ্যে নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা ও জাতীয় আত্মঅবমাননাই প্রত্যক্ষ করেছেন। কমরুদ্দীন আহমদের মতে 'এটা শুধু নেতৃত্বের পক্ষেই অবমাননাকর ছিলো না, সারা বাংলার আত্মসম্মানে আঘাত করেছিলেন নেতারা, শুধু মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্যে।' আবুল মনসুর আহমদ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, 'হক সাহেবকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশদ্রোহী

ঘোষণা করার এবং তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই আশা হইয়াছিলো যে, প্রধানমন্ত্রিত্ব তাদের হাতেই আসিবে। মন্ত্রিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদই সর্বময় কর্তা, এটা ছিলো জানা কথা। অতএব যুক্তফ্রন্টের পক্ষ হইতে যিনি গভর্নর জেনারেলের গলায় মালা দিবেন, কার্যত যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবেই তিনি মন্ত্রিসভা গঠনে আহূত হইবেন। এই ধারণায় নেতাদের পাইয়া বসিল।' এ বিষয়ে মুনতাসীর মামুনের বিশ্লেষণী মন্তব্য—'পূর্ববঙ্গের দুইজন প্রধান রাজনৈতিক কারক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের বিপরীতে সিভিল সমাজের অবমাননা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।'

এ- রকম আত্মঅবমাননা করেও পূর্ববঙ্গের নেতাদের কেউই হালে পানি পেলেন না। তারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের খেলার পুতুল হয়ে গেলেন, তাদেরই ইঙ্গিতে তারা রাজনীতির মঞ্চে উঠে ভালুক-নাচ নাচতে লাগলেন। যুক্তফ্রন্টের দুই প্রধান শরিক দল আওয়ামী লীগ ও কেএসপিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র বেশ মজার খেলা শুরু করলো। আজ আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী বানায় তো কাল বানায় কেএসপির আবু হোসেন সরকারকে। একবার তো আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পদচ্যুত হলেন, বিংশ শতাব্দীতে আরব্য রজনীর আবু হোসেনের কাল্পনিক কাহিনীর রাস্তব রূপায়ণ ঘটলো। মানুষ বেশ মজা করে 'একদিনের বাদশা আবু হোসেন'-এর গল্পটি নতুনভাবে বলতে লাগলো।

শুধু ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান বা আবু হোসেন সরকাররাই নন, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মতো ধুরন্ধর নেতাকেও পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র নাকে রসি লাগিয়ে ঘুরালো। সামান্য লোভের বশে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ওদের ফাঁদে পা দিলেন এবং বারবার হেনস্থা হলেন। একবার তিনি *তাঁর এক সময়কার প্রাইভেট সেক্রেটারি বশুড়ার* মোহাম্মদ আলীর অধীনে আইনমন্ত্রী হলেন এবং কিছুদিন পরেই অপসৃতও হলেন। আবার পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্র (যারাই ছিলো পাকিস্তানের আসল শাসক) তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দিয়েও নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিয়েছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচি ও সিন্ধি জাতির অধিকারকে পর্যুদস্ত করে পাঞ্জাবি আমলা শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যেই সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে এক ইউনিট সমর্থন করিয়ে নিলো, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পদদলিত করে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের আসনে সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করে নিলো। আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে দিয়েই তারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া তৈরি করালো। সে সংবিধানে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের কোনো স্বীকৃতিই রইলো না, অথচ পরে এক সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবই নির্লজ্জের মতো বলে বসলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তান শতকরা আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে।' বাঙালির জাতীয় স্বার্থকে এভাবেই তিনি গুঁড়িয়ে দিলেন। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ছিলো যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত আদর্শ। অথচ, যুক্তফ্রন্টের বড়ো শরিক আওয়ামী লীগের নেতা সোহরাওয়ার্দী হলেন পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির উৎসাহী সমর্থক। জোটনিরপেক্ষতাকে তিনি 'জিরো প্লাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো' বলে ব্যঙ্গ করলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে, পাকিস্তানকে মার্কিন পক্ষপুটে ঢুকিয়ে দেয়ার তিনিই হলেন প্রধান স্থপতি।

এই সব দেখেশুনে আমার বন্ধু আবদুস শাহিদ একেবারে ক্ষেপে গেলো। পঞ্চান্ন সাল থেকেই সে বলতে লাগলো যে, আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট নেতাদের কথা বাদ দিলে একমাত্র

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাড়া এ দেশের আর কোনো রাজনৈতিক নেতার ওপরই আস্থা রাখা চলে না। ভাসানীই হচ্ছেন প্রকৃত জনদরদী নেতা। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। তাঁর নেতৃত্বেই এ দেশের মজলুম জনমানুষের মুক্তি আসবে। অন্যসব নেতাই হচ্ছে মতলববাজ, ধোঁকাবাজ।

বাহাগুন্দ গ্রামের আবদুস শাহিদ হয়ে উঠলো মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অন্ধ ভক্ত।

কিন্তু হায়, তখন তো শাহিদও জানতো না আমিও জানতাম না যে, এই শাহিদকেই একদিন মওলানার নেতৃত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি মোহমুক্ত হতে হবে, নানা সভায় ও বৈঠকে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের দালালীর অভিযোগ উচ্চারণ করতে হবে।

তবে সে সব অবিশ্যি অনেক পরের, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। পঞ্চান্ন সাল থেকে অন্তত দশ বছর আমাদের এলাকায় আবদুস শাহিদ প্রকাশ্যে ভাসানীপন্থী ও আড়ালে কম্যুনিস্ট রাজনীতির প্রসারে অসাধারণ অবদান রেখেছে। ভাসানীকে ছাড়লেও সে কম্যুনিস্ট রাজনীতি অবিশ্যি ছাড়েনি অনেকদিন। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সক্রিয় সংযোগ ছিলো সত্তরের দশকের শেষ ভাগেও।

পাকিস্তান ইসলামী জমহুরিয়াত ও সদরে রিয়াসত

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেলো যে, অঙ্কে আমি তেত্রিশ নম্বরই পেয়ে গেছি। অর্থাৎ আমি এখন ম্যাট্রিক পাস।

কিন্তু 'কিম্অতঃপরম্'? অর্থাৎ এর পর কী করবো?

ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হতে হবে—সোজা হিসেব তো এই। কিন্তু আমার জীবনে সোজা হিসেব সোজাভাবে মেলে না কখনো। অনেক কাটাকুটি অনেক পাতা নষ্ট হওয়ার পরে মেলে। জালাল খাঁর গানের ভাষায়—'সোজা রাস্তা হয় যে বাঁকা।' জীবনভোর আমাকে পা টিপে টিপে থেমে থেমে রাস্তায় চলতে হয়েছে।

ম্যাট্রিকের আগেও একাধিকবার আমার অ্যাকাডেমিক পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। পঞ্চাশের রায়টের দরুন ক্লাস এইটে উঠে আমাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছিলো—সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু ওই একটি বছর কী করেছি সে কথা বলিনি। এখন বলি।

আগেই বলেছি, আমার বাবা ছিলেন একজন গোঁড়া হোমিওপ্যাথ। হোমিও শাস্ত্রের বই-পত্রিকার বিপুল সংগ্রহ ছিলো তাঁর, নিষ্ঠাবান ছাত্রের মতো প্রায় সারা জীবন এ সব তিনি পড়েছেন। হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা হানিম্যানের '*অর্গানন*'কে ভিত্তি করেই তিনি গড়ে নিয়েছিলেন তাঁর জীবনদর্শন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রতিও তার বিশ্বাস ছিলো, আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে অনেক সময়েই তিনি জগদীশ কবিরাজকে দিয়ে চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি ছিলেন ভয়ানক বিরূপ। এলোপ্যাথি ওষুধগুলো তাঁর বিবেচনায় বিষ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু গ্রামের রোগীরা সে কথা বুঝতে যাবে কেন? তারা হচ্ছে প্রাগমাটিক। তাদের মতে এলোপ্যাথি চিকিৎসা হলো ফৌজদারি আদালতের মতো, আর হোমিওপ্যাথির তুলনা দেওয়ানি মোকদ্দমার সঙ্গে। চুরি-ডাকাতি-খুনের মোকদ্দমার ফৌজদারি বিচারে আসামীর জেল-জরিমানা যা হোক একটা কিছু ঝটপট হয়ে যায়। কিন্তু জমিজমার

স্বত্বের দেওয়ানি মামলা চলে ঢিমে তেতলা লয়ে, নিষ্পত্তি হতে লাগে বহুদিন কিংবা বহু বছর। এলোপ্যাথিও ফৌজদারি বিচারের মতো ঝটপট রোগ সারিয়ে দেয়, আর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফল পাওয়া যায় দেওয়ানি বিচারের মতোই অনেক সময়ের ব্যবধানে। তবে, গাঁয়ের লোকের বিবেচনায়, এলোপ্যাথি যে-রোগীকে সারাতে পারে না—দীর্ঘদিনের পুরোনো রোগে যে ভুগছে—তাকে হোমিওপ্যাথের কাছে যেতেই হবে। 'যার নাই অন্য গতি, সেই করে হোমিওপ্যাথি'—গ্রামে এই প্রবাদটি বেশ চালু ছিলো। রোগী ও চিকিৎসক—উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতো প্রবাদটির বক্তব্য। অর্থাৎ যে রোগী কোনো চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় না, সেই শেষে হোমিওপ্যাথির শরণ নেয়; আর যে লোক রোজগারের কোনো পথই খুঁজে পায় না, সেই হয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।

আসলে সত্যিকারের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ গ্রামবাসীর খুব কমই ছিলো। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেও কোনো মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট আমাদের সারা নেত্রকোনা মহকুমাতেই ছিলেন না। দু' একজন এলএমএফ ডাক্তার থাকলেও তাদের ফি জোগানোর সাধ্য শতকরা নব্বই জন গ্রামবাসীরই ছিলো না। আর কোনো রকমে ডাক্তারের ফি-এর টাকা জোগাড় করলেও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দামি ওষুধ কিনে খাওয়া ছিলো অসম্ভব। হাটে হাটে ঘুরে যারা কুইনিন, এ্যাসপ্রো, সোডামিন্ট বা সেন্টোনাইন ট্যাবলেট বিক্রি করতো তারাই ছিলো গ্রামের লোকের ডাক্তার। রোগ-বালাইয়ে ওঝা-ফকিরের পানিপড়া আর তাবিজ-কবচই ছিলো তাদের মূল ভরসা।

এ-রকম পরিস্থিতিতে আমার বাবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসায় চলতো মূলত দুটো গ্রামকে কেন্দ্র করে—দলপা ও নন্দী গ্রাম। এই গ্রাম দুটোর হিন্দু অধিবাসীরা ছিলো মোটামুটি সচ্ছল ও লেখাপড়া জানা। তারাই বাবাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতো, তাঁর প্রতি ছিলো তাদের গভীর আস্থা। বাবা যা পয়সাকড়ি পেতেন তার তিন ভাগের দু'ভাগই আসতো এই দুটো গ্রাম থেকে। কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গায় দু'গাঁয়েরই হিন্দুরা ব্যাপক সংখ্যায় দেশ ছেড়ে চলে যায়, দলপায় তো প্রায় একঘর হিন্দুও আর অবশিষ্ট থাকে না। যারা দেশত্যাগ করতে পারেনি, কিংবা একবার দেশত্যাগী হয়েও পরে ফিরে এসেছে, তারাও গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমার বাবার রোজগারের মূল উৎসটাই বলতে গেলে বন্ধ হয়ে যায়। অভাব-অনটনের আবর্তে পড়ে খাবি খেতে থাকে আমাদের পরিবারটি।

পঞ্চাশ সালের দাঙ্গার শুরুতেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেও দেশ যখন ছাড়তে পারলাম না, কিংবা অনেকের মতো শহরবাসীও হতে পারলাম না, তখন গ্রামে থেকেই অভাব-অনটনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হলো আমাকে। সেই চৌদ্দ বছর বয়সে আমি দোকানদারি করতে শুরু করে দিলাম। প্রথমে ডালের ব্যবসা। এরপর কিছুদিন করলাম ম্যাচ-বিড়ি ও বিস্কুটের দোকানদারি। রামপুর বাজারে চৌরাস্তার মোড়ে চাটাই পেতে বসেই আমার দোকানদারি চলতো। ব্যবসায়ে আমার নিষ্ঠা যে খুব প্রবল ছিলো, তা নয়। নিতান্তই দায়ে ঠেকে এ কাজ করা। দোকানে বসে বইপত্র পড়ার দিকেই বরং ছিলো আমার বেশি মনোযোগ। তবু সেই দুর্দিনে বাবার সংসারের চাকায় কিছুটা হলেও যে তেল জোগাতে পেরেছিলাম, সেটা ভেবে আমি আজও আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

ম্যাট্রিক পাস করার পরও এক বছর রোজগারের ধান্ধায় ঘুরলাম। এবার আর দোকানদারি নয়, চাকরির অনুসন্ধান। গ্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি, সাব-রেজিস্টারি অফিসের কেরানি এবং এ-

রকম আরো কিছু চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি ও চেষ্টা-তদবির করে ব্যর্থতাই সার হলো। তবে ছাত্র পড়িয়ে সামান্য কিছু পয়সা জোগাড় করে পরের বছর, পঞ্চান্ন সালে, নেত্রকোনা কলেজে ভর্তি হয়ে পড়লাম। শাহিদ এর আগের বছরেই ম্যাট্রিক পাস করে আইএ ক্লাসে কিছুদিন পড়েছিলো কিন্তু রাজনীতির প্রবল নেশায় অচিরেই সে কলেজ ছাড়লো এবং তার বইগুলো আমাকে দান করে দিলো।

কলেজে ভর্তি হয়েও নিরুপদ্রব স্বস্তিতে আমি লেখাপড়া করতে পারিনি। অর্থাভাবই তার মূল কারণ। কলেজে অবিশ্যি আমি হাফ ফ্রি পেয়েছিলাম এবং শাহিদের কল্যাণে পাঠ্যবইও আমাকে কিনতে হয়নি। তবু খাওয়াসহ অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্যে ট্যুইশনি করা ছাড়া উপায় ছিলো না, আর ভালো ট্যুইশনি পাওয়া ছিলো খুবই কঠিন। তবে আমার বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে, সহপাঠি মিরাজের সহায়তা না পেলে নেত্রকোনা শহরে টিকে থাকাই আমার পক্ষে কঠিন হতো।

নেত্রকোনা কলেজে তখন কেবল ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস খোলা হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা একান্ত সীমিত। ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার মিলিয়ে দেড়শোর বেশি নয়। আটজন অধ্যাপক কিন্তু সব মিলিয়ে যেনো একটি ছোট্ট সুখী পরিবার।

কলেজের ছাত্র সংসদে আমি সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হই। সংসদের পক্ষ থেকে সারা বছর অনেক বিতর্ক সভা ও সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ছাত্ররা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতো। অধ্যাপকবৃন্দ এ-সবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করতেন। এবং আমাদের সঙ্গেই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। অধ্যাপকদের আমরা যথাযথ শ্রদ্ধা করছি, কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত দূরত্বের সৃষ্টি হয়নি। অধ্যাপকদের প্রায় সবাই ছিলেন তরুণ। আনুষ্ঠানিক বিতর্কের বাইরেও তাঁদের সঙ্গে আমরা নানা বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করতাম। রাজনীতি নিয়েও উত্তপ্ত আলোচনা হতো। সে আলোচনায় আমরা নানাভাবে উপকৃত হয়েছি।

চল্লিশের দশক থেকেই নেত্রকোনা ছিলো বামপন্থী রাজনীতির ঘাঁটি। কলেজেও বামপন্থী ছাত্রদেরই প্রতাপ। আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়তেন আবু তাহের, ফুলে হোসেন, আবদুল কুদ্দুস এবং এরকম আরো কয়েকজন তুখোড় ছাত্রনেতা। তখনো নেত্রকোনায় বামপন্থী ছাত্রসংগঠন 'ছাত্র ইউনিয়ন' গড়ে ওঠেনি, প্রগতিশীল সব ছাত্রই তখন ছাত্রলীগে। আমিও ছাত্রলীগে ভিড়ে গেলাম, হয়ে গেলাম নেত্রকোনা মহকুমা ছাত্রলীগের অন্যতম সহসভাপতি। সে-সময়েই পরিচয় হলো কাজী আবদুল বারির সঙ্গে। তিনি তখন ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের নেতা। সাংগঠনিক সফরে নেত্রকোনা গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হলো : দেশি-বিদেশি রাজনীতির সবকিছুই যেনো তার নখদর্পণে। আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যে কাজী বারির যোগ আছে সে-কথাও আমার কানে কে যেনো ফিসফিস করে বলে গেলো।

কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য কাজকর্ম নিষিদ্ধ থাকলেও পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সালে নেত্রকোনার কম্যুনিস্টরা ছাত্র রাজনীতিতে ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছিলো অত্যন্ত সক্রিয়। নেত্রকোনার সত্যকিরণ আদিত্য তখন বামপন্থী যুব সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের প্রাদেশিক পর্যায়ের নেতা। থাকেন নেত্রকোনাতেই। তাকে কেন্দ্র করে নেত্রকোনা শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তখন জমজমাট। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সত্যদার সৃজনশীল হাতের

ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়েই নেত্রকোনার ছাত্র-যুবকরা প্রগতিশীল ও বামপন্থী চিন্তা চেতনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ছাপ্পান্ন সালের মার্চে গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হলো। আনুষ্ঠানিকভাবেই পাকিস্তান হয়ে গেলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র। (*আজাদ* পত্রিকায় লেখা হলো 'ইসলামী জমহুরিয়াত')। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা 'সদরে রিয়াসত'কে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, অমুসলমানের জন্যে এ পদটি নিষিদ্ধ—এ-কথা সংবিধানেই স্পষ্ট ভাষায় লিখে দেয়া হলো। এমনিতেই পাকিস্তানের কোনো অমুসলমান অধিবাসী রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কথা চিন্তাও করতো না নিশ্চয়। তবু, সাংবিধানিকভাবে এ-রকম ঘোষণা দিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হলো যে, এ রাষ্ট্রে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

নেত্রকোনার দত্ত হাইস্কুলের শিক্ষক হরিশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন। শুনেছিলাম যে, বেআইনি ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ আছে। তাঁর বাসায় প্রগতিশীল ছাত্র যুবকদের সব সময় আনাগোনা। রাজনীতি-অর্থনীতির নানা বিষয় নিয়ে তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করেন ও অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলেন। সেদিন কিন্তু এই একান্ত শান্ত মানুষটিকে ভীষণ উত্তেজিত হতে দেখলাম। অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে তিনি বলছেন, 'দেখো, আজকে তো আমাকে ভাবতে হচ্ছে যে, আমি একজন হিন্দু। আমার জন্মের জন্যেই আমি অপরাধী। এ দেশের যে কোনো একজন মুসলমানের চেয়ে আমি নিকৃষ্ট, কারণ আমি মুসলমান নই। আর সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ সে মুসলমান।.....এটি কি কোনো সভ্য রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশন হতে পারে? আমরা কি একটা সভ্য রাষ্ট্রের অধিবাসী?

ছাপ্পান্নতে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ঘোষিত হওয়ার পর হিন্দুদের মধ্যে আবার নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিলো। একেবারে খুব ব্যাপক দেশত্যাগ শুরু হলো না ঠিকই, তবে যারা হয়তো একটু গোছগাছ করে নিয়ে দু'চার বছর পর দেশ ছাড়তো, তারা এখনই তল্পিতল্পা গুটোতে শুরু করে দিলো।

একদিন বারহাট্টা রোডে 'নবীন ফার্মেসি'তে বসে হরিশঙ্কর বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। এ সময়ে এজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সেখানে এলেন। হরিশঙ্কর বাবুকে দেখেই তিনি বলতে লাগলেন, 'এই যে মাস্টার মশাই, শুনলাম আপনি নাকি ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছেন? দু'দিন পর পর কী যে হুজুগ আপনারা তোলেন! এই দেশে কে আপনাদের কী ক্ষতিটা করলো? নিজের দেশ ছেড়ে কেন যে আপনারা চলে যান!... ...

যতোদূর জানি, হরিশঙ্কর বাবু ইন্ডিয়া যাবার কথা মোটেই ভাবেননি। অথচ, দেখলাম, ওই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কথা শেষ না হতেই তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, যাবোই তো। আপনারা যে সুখে রেখেছেন তাতে দেশ না ছেড়ে কি করি!'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে কী যেন বলতে চাইলেন।

হরিশঙ্কর বাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনার ছেলে আর আমার ছেলে একই ক্লাসে পড়ে। পরীক্ষায় 'তোমার জীবনের লক্ষ্য' সম্বন্ধে রচনা লিখতে দেয়া হলো। আপনার ছেলে হয়তো লিখলো যে, তার জীবনের লক্ষ্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া—অর্থাৎ পাকিস্তান ইসলামী জমহুরিয়াতের সদরে রিয়াসত হওয়া। এর জন্যে সে ঠিকই নম্বর পাবে। কিন্তু আমার ছেলে তো এ লক্ষ্যের কথা লিখতেই পারবে না। লিখলে নম্বর পাওয়া তো দূরের কথা, রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামীও হতে পারে কিংবা এই নাবালকে ছেলের বাপ হিসেবে

আমাকেও আসামী করা হতে পারে। কাজেই, এ-রকম ঘটনা ঘটার আগেই তো আমার ছেলেকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বুদ্ধিমান ছিলেন। তাই আর কথা বাড়ালেন না।

দুর্ভিক্ষের দুঃসহ যাতনা ও জঙ্গী দৌরাত্ম্য

আমাদের দেশটি তো দুর্ভিক্ষেরই দেশ। প্রতি বছরই এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফসল ওঠার আগের দেড়/দুই মাস তো বাংলার সব গ্রামের প্রান্তিক কৃষকরা আধপেটা খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়। বাংলা ব্যাকরণে দুর্ভিক্ষকে বলা হয়েছে অব্যয়ীভাব সমাস, তার ব্যাসবাক্য হলো 'ভিক্ষার অভাব'। সত্যি সত্যিই আশ্বিন-কার্তিক মাসে এ দেশের গাঁও গেরামে অনিবার্যভাবেই ভিক্ষার অভাব দেখা দেয়। না খেয়ে মারাও যায় অনেক মানুষ। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর খবর এ দেশের কোনো সরকার বাহাদুরই স্বীকার করেন না। অনেক বাহাদুরী করে প্রেসনোট ছাড়েন :

'অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, এ লোকগুলো পেটের পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কুচক্রী মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রচার করিয়া জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সরকারের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত রহিয়াছে, দেশে দুর্ভিক্ষের কোনো আশংকাই নাই।'

প্রত্যেক সরকারই খাদ্য নিয়ে রাজনীতি না করবার জন্যে সরকার-বিরোধী রাজনীতিকরদের হুঁশিয়ার করে দেন।

অথচ, সংবাদপত্রের পরিভাষায় যাকে বলে 'নীরব দুর্ভিক্ষ', তার কবলে পড়ে ছোট কৃষকরা প্রতিবছরই কিছু কিছু ফসলের জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং এভাবেই আস্তে আস্তে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। অনেকে ভিটেমাটি হারিয়ে শহরের বস্তিতে এসে ঠাঁই নেয়। এদেশে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় এই নীরব দুর্ভিক্ষের ভূমিকাটিই হচ্ছে প্রধান।

দুর্ভিক্ষ যে-বছরে নীরব থাকে না, অনাহারী মানুষের মিছিল গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে আসতে থাকে, খাদ্যশস্যের দাম শহরের মধ্যবিত্তদেরও ক্রয়ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, সে-বছরে সরকার বাহাদুরও আর দুর্ভিক্ষকে অস্বীকার করার বাহাদুরী দেখাতে পারেন না। সরকারি উদ্যোগে তখন খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলে, খাদদ্রব্যের অবাধ চলাচলের ওপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করা হয়, এখানে ওখানে রেশনের দোকান খোলা হয়, জনসাধারণকে রেশন কার্ড হাতে নিয়ে দোকানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। সরকারি এসব ব্যবস্থার ফলে দুর্ভিক্ষ-তাড়িত মানুষ যে একটুও উপকৃত হয় না, তা নয়। তবে বেশি উপকৃত হয় এসব ব্যবস্থার ব্যবস্থাপকরা। দুর্ভিক্ষের কল্যাণে লাইসেন্স-পারমিটবাজি, চোরাকারবারি, ঘুষখোরির রমরমা বাজারে মধ্যবিত্তেরই একাংশের পোয়াবারো ও ভুঁড়িবৃদ্ধি ঘটে।

এরকম দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আমি আশৈশব পরিচিত। মাত্র সাত বছর বয়সে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ যন্ত্রণাভোগী আমি, সেই যন্ত্রণার স্মৃতি আজো আমার করোটিতে দুঃস্বপ্নের মতো অবস্থান করছে।

পাকিস্তানের জন্মলাভের পরবর্তী বছরগুলোতেও কমবেশি দুর্ভিক্ষ হয়েছেই, কিন্তু এ-সম্পর্কে কেউ কোনো কথা বলতে গেলেই 'শিশুরাষ্ট্রে'র দোহাই পেড়ে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু চুয়ান্নর পরে অবস্থাটি আর সে রকম রইলো না। ভোটে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটাতে পেরে মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, সত্য বলার সাহসও জন্ম

নেয়। আর ছাপ্পান্ন সালে তো আসলেই এমন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে, তাকে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে শহরে মধ্যবিত্তরা যখন খাদ্যাভাবের মুখোমুখি হয়, বাজারে চাল আটা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে পড়ে, তখনই দুর্ভিক্ষের সরকারি স্বীকৃতি মেলে। সরকার তখন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার প্রায় সবই মুখর শহুরে মধ্যবিত্তের মুখ বন্ধ করার লক্ষে। দুর্ভিক্ষের আসল শিকার যারা, সকলের অন্ন জুগিয়েও নিজেরা যারা অন্নহীন, গাঁয়ের সেই কৃষক ক্ষেতমজুরদের যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর দিকে সরকারি প্রয়াস খুব কমই চোখে পড়ে। ছাপ্পান্ন সালের দুর্ভিক্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নেত্রকোনার মতো মহকুমা শহরেও ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়েছিলো। শহরবাসীরা রেশনকার্ড দেখিয়ে কিংবা মহকুমা খাদ্য-নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে পারমিট জোগাড় করে সেই দোকান থেকে ধান-চাল- গম-আটা সংগ্রহ করতে পারতো। কিন্তু দূরের গণ্ডগ্রাম তো দূরের কথা, শহরের আশপাশের গ্রামগুলোর অভাবী মানুষরাও এ-সুযোগ পেতো না। গ্রামেও অবিশ্যি রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো, তবে তা একেবারেই নাম-কা-ওয়াস্তে। এতে গ্রামের মাতব্বর স্থানীয় লোকজন ও রেশন ডিলাররা বাড়তি কিছু সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই পেয়েছে, সাধারণ মানুষদের কপালে ছিটেফোঁটার বেশি কিছু জোটেনি। তাই দেখা গেলো : গ্রামের অভাব-তাড়িত মানুষরা শহরে এসে ভিড় করেছে খয়রাতি সাহায্যের আশায়; কিন্তু খয়রাতি দূরে থাক, শহরের মানুষের মতো হ্রাসকৃত মূল্যে চাল-আটা পাওয়ার ভাগ্যও তাদের হলো না। এ নিয়ে তাদের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটতে দেখলাম এক পল্লী কবির কবিতায়। নেত্রকোনার এই কবি লিখলেন—'শহরের সব বড়ো ব্যাটা, পায় গো তারা চাউল-আটা, আমরার ভাগ্যে মিলে না। তারাও যেমন, আমরাও তেমন, তারা কি তা বোঝে না?'

সাময়িক নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রচিত পল্লীকবিদের এ-রকম কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় সাতচল্লিশ সাল থেকে। সেই যে গাবতলী বাজারে পল্লীকবি ইউনুস আলীর 'পাকিস্তানের কবিতা' শুনে ও পড়ে সারা মনপ্রাণ এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে ভরে গিয়েছিল, তখন থেকেই এ-রকম সব কবিতা সংগ্রহ করা আমার হবি হয়ে ওঠে। একাত্তরের মার্চ পর্যন্ত এ ধরনের বহুসংখ্যক কবিতা আমি সংগ্রহ করেছিলাম। ইচ্ছা ছিলো : এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এমন একটি বই লিখবো যাতে বাংলার লোকমানসের নানামুখী বৈশিষ্ট্য ও তার বিবর্তন ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার সে ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেলো। একাত্তরে আমার সব বইপত্র ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ওই কবিতাগুলোও লুট হয়ে যায়। তা না হলে পল্লীর গণকবিদের ওসব কবিতার দর্পণে আমার পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন আরো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারতো।

ছাপ্পান্ন সালের এই দুর্ভিক্ষের সময়ে, জুলাই মাসে, নেত্রকোনা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা পাস করে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছি। বাবা আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কলেজের পাশেই সাতপাই পাড়ায় জিতেন্দ্র বিশ্বাসের বাসায়। দলপা গ্রামের জিতেন্দ্র বিশ্বাস ভারতে যেতে পারেননি, পরিবার-পরিজন নিয়ে নেত্রকোনা শহরে এসে উঠেছিলেন। নেত্রকোনাতেই কী এক অসুখে পড়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় তার একমাত্র পুত্রটি মারা গেলো। পঞ্চান্ন সালের আট আগস্ট, যেদিন আমি কলেজে ভর্তি হই, সেদিনই বাবা আমাকে জিতেন্দ্র বিশ্বাসের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন। জিতেন্দ্র বিশ্বাস আমাদের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছেন, কাজেই তাঁকে আমি চিনতাম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে আমি এর আগে

কোনোদিন দেখিনি। প্রথম দর্শনেই এই পুত্রশোকাতুরা জননী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সেদিন থেকেই বিশ্বাস-দম্পতির পুত্র-প্রতিম হয়ে তাঁদের বাসায় ঠাঁই নিলাম।

কিন্তু বিশ্বাস-দম্পতি স্নেহ-সম্পদে ধনী হলেও অর্থ-সম্পদে ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। মোক্তারের মুহুরিগিরি করে জিতেন্দ্র বিশ্বাস যা পেতেন তা দিয়ে তার একটি কন্যা ও আমাকে সহ চারজনের অন্নসংস্থান করা খুবই কঠিন হতো। মোক্তারের মুহুরি মানে বাঁধা মাইনের কোনো চাকুরি নয়—এক ধরনের উঞ্ছবৃত্তি মাত্র। এক মোক্তারকে তিনি মক্কেল জোগাড় করে দিতেন। সেই মক্কেলের কাছ থেকে পাওয়া মোক্তার বাবুর ফি-এরই সামান্য অংশ ছিলো তাঁর মুহুরির অর্থাৎ বিশ্বাস মশাইয়ের প্রাপ্য। যেদিন মক্কেল জোটাতে পারতেন সেদিনই ছিলো তাঁর প্রাপ্তিযোগ, যেদিন জুটতো না সেদিন খালি হাত। অর্থাৎ বিশ্বাস পরিবারের ছিলো দিন এনে দিন খাওয়ার অবস্থা। আমি অবিশ্যি আমার খাই-খরচা বাবদ কিছু টাকা মাসের প্রথমেই তাঁদের হাতে তুলে দিতাম এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় ও একান্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁরা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হতো না। আমার দেয়া টাকা পাঁচ/ছয় দিনেই খরচ হয়ে যেতো। এরপর যেদিন বিশ্বাস মশাই কিছু টাকা পেতেন সেদিন দু'বেলাই খাবার জুটতো। কিন্তু এমন অনেকদিন গিয়েছে তিনি এক পয়সাও রোজগার করতে পারেননি। সেই দিনগুলোতে না খাওয়া বা আধপেটা খাওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকতো না। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে দু'চার টাকা ধার করে কোনোদিন আমিও চাল-ডাল কিনে নিয়ে গিয়েছি, কোনোদিন বিশ্বাস মশাই নিজেও ধারের জন্যে কারো কাছে হাত পেতেছেন। আজও মনে পড়ে : ছাপ্পান্নর জুলাইয়ে সেই প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের সময়ে একবার দু'দিন ঘুরে আমি বিশ সের ধানের একটি পারমিট জোগাড় করেছিলাম। তারপর দোকান থেকে সেই ধান কিনে কলে ভাঙিয়ে চাল নিয়ে গেলে রাতে আমাদের খাওয়া হয়েছিলো। এর আগের দেড়দিন মুড়ির মোয়া আর জল ছাড়া আর কিছুই খেতে পাইনি।

সে-সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা, পূর্ববঙ্গের গভর্নর আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। না, তখন আর 'পূর্ববঙ্গ' নেই। ছাপ্পান্ন সালের সংবিধানের বিধানে 'পূর্ব পাকিস্তান'। যুক্তফ্রন্টও ভেঙে গেছে। তার দুই প্রধান শরিক কেএসপি আর আওয়ামী লীগ তখন পরস্পর বিবদমান। কেএসপি সরকারে, আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে। কেএসপির আবু হোসেন মন্ত্রিসভা প্রদেশের খাদ্যসংকট তথা দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় পুরোপুরিই ব্যর্থ হলো এবং শেষ পর্যন্ত এ কাজের দায়িত্ব তুলে দিলো সামরিক বাহিনীর হাতে। সামরিক বাহিনী নিয়োগের তীব্র সমালোচনা করলো আওয়ামী লীগ, ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে শুরু করলো আন্দোলন। ছাপ্পান্ন সালের ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগ যে ভুখা মিছিল বের করলো তাতে পুলিশের গুলিবর্ষণে মারা গেলো কয়েকজন। এতে স্বাভাবিকভাবেই আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা জনধিকৃত হলো, আওয়ামী লীগ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মির্জা তখন সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিলেন আওয়ামী লীগের দিকে। পূর্ব পাকিস্তানে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা বাতিল হলো, আতাউর রহমান খানের মুখ্যমন্ত্রিত্বে ক্ষমতায় এলো আওয়ামী লীগ। আবু হোসেন সরকার তার মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে যখন খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিলেন তখন আওয়ামী লীগ এর নিন্দা করেছিলো। কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এলো—অর্থাৎ আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী

হলেন—তখন আওয়ামী লীগ নিজেই সেনাবাহিনী নিয়োগ করলো। এবারের উদ্দেশ্য : সীমান্তে চোরাচালান দমন। এই চোরাচালান দমনের নামে সেনাবাহিনী যে তাণ্ডব চালালো, রাজনীতিকদের যেভাবে হেনস্থা করে চললো, জনসাধারণের (বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের) ওপর যে রকম উৎপীড়ন ঘটালো, তাতে মনে হলো : দেশটার আসল কর্তা সামরিক বাহিনীই, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ তথা রাজনীতিকরা নিতান্তই ঢাকের বাঁয়া। এর দু'বছর আগে, চুয়ান্ন সালের অক্টোবরে, পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যখন গণপরিষদ বাতিল করে দিয়ে 'মেধা মন্ত্রিসভা' গঠন করেছিলেন এবং সে-মন্ত্রিসভায় সেনাধ্যক্ষ আইয়ুব খানকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও আরেক কুচক্রী জঙ্গী নায়ক ইস্কান্দর মির্জাকে বানিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তখন থেকেই পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যায়। ছাপ্পান্নয় কেএসপি ও সাতান্নয় আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণের আরো সুযোগ করে দিয়েছিলো। এ-সবের মধ্যদিয়েই যেন আটান্ন সালে সেনাবাহিনীর পুরো ক্ষমতা দখলের রিহার্সাল সম্পন্ন হচ্ছিলো এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছিলো।

মনে পড়ে ছাপ্পান্ন সালের একদিনের একটি ঘটনা। ঘটনাটি সামান্যই। কিন্তু সেই সামান্যের মধ্যেই অসামান্যের ইঙ্গিত ছিলো, পরবর্তী দুঃসময়ের ও দুঃশাসনের পূর্বাভাস ছিলো।

খাদ্য সরবরাহ তদারকের নামে মিলিটারির জিপ তখন সারা নেত্রকোনা শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। নেত্রকোনার মতো গ্রাম্য শহরে সে-সময়ে কোনো যন্ত্রযানের চলাফেরা প্রায় ছিলোই না বলতে গেলে। সাইকেল রিকশা চলতো, তারও সংখ্যা ছিলো নগণ্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শহরের রাস্তার ওপরই অবাধে দৌড়াদৌড়ি করতো, এমনকি গোল্লাছুট খেলতো। এতে পথচারিদের চলাচলে কখনো কখনো কিছুটা বিঘ্ন ঘটলেও তা খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যে ছিলো না। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ করে যখন ছোট্ট শহরের নিস্তরঙ্গ রাস্তায় মিলিটারির জিপ এসে প্রবল তরঙ্গ তুললো, তখন পথক্রীড়ায় অভ্যস্ত শিশুদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাদের অভিভাবককুল শঙ্কাকুল হয়ে উঠলেন বৈকি। কিন্তু শিশু ভোলানাথদের তো আর সহজে খেলা ভুলিয়ে দেয়া যায় না! তাই, রাস্তায় তাদের দৌড়ঝাঁপ বন্ধ করাও খুব কঠিন হলো।

সেদিন তেরিবাজারে কবিরাজী ওষুধের দোকান 'আয়ুর্বেদ কুটির'-এর প্রবীণ কবিরাজ ও দার্শনিক পণ্ডিত শৈলেশ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে গল্পগুজব করছি। তর্কতীর্থ মহাশয়ের কাছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের—বিশেষ করে ন্যায়শাস্ত্রের—নানা প্রসঙ্গ শুনে আমি খুবই উপকৃত হতাম। সেদিনও সে-প্রসঙ্গেরই আলোচনা চলছিলো। হঠাৎ বিকট শব্দ করে একটি জিপ আয়ুর্বেদ কুটিরের সামনে এসে থামলো এবং তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মোছওয়ালা জঙ্গবাহাদুর। বেরিয়েই একটি পলায়নপর বালককে ধরে সমানে চড়-থাপ্পড় মারতে লাগলো। আর এর পরই দোকানে উঠে এসে মারমুখী হয়ে তর্জনগর্জন শুরু করলো। আধা উর্দু আধা বাংলায় সে ঝড়ের বেগে যা বললো তার মূলমর্ম হচ্ছে: রাস্তায় ছেলেগুলো যে দৌড়াদৌড়ি করে এর জন্যে দোষী হচ্ছো তোমরা। তোমরাই ওদের আস্কারা দাও। আর কোনোদিন যদি কোনো ছেলেকে রাস্তায় দৌড়াতে দেখি, তবে রাস্তার ধারের দোকানে যাকে পাবো তাকেই পেটাবো।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তর্কতীর্থ মহাশয়ের চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করে উঠেছিলো।

তর্কতীর্থ মহাশয়ের বয়স এখন (উনিশ শো পঁচানব্বই সালে) নব্বইয়ের কাছাকাছি। সেদিনের ঘটনাটি আজও তার মনে আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি এটি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না।

ছাপ্পান্ন সালে মিলিটারিরা আইনত একটি সিভিল সরকারের অধীনে ছিলো বলেই হয়তো 'যাকে সামনে পাবো তাকেই পেটাবো' কথাটা মুখে বললেও সর্বত্র কাজে সেটি করেনি। কিছুটা চক্ষুলজ্জা বোধহয় তখনো ছিলো। কিন্তু এর দু'বছর পরে, আটান্ন সালে, পাক মিলিটারিরা সিভিল কর্তৃত্বকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিরঙ্কুশ হয়ে গিয়েছিলো বলেই হয়তে মুখে না-বলেও কাজে তা-ই করেছিলো। চক্ষুলজ্জা তখন লজ্জায় বিদায় নিয়েছিলো।

প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতি

ছাপান্ন সাল শেষ হওয়ার আগেই—অক্টোবরে কি নভেম্বরে, ঠিক মনে করতে পারছি না—ছাত্রলীগের ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলন। ময়মনসিংহ সদর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল—পাঁচটি মহকুমা নিয়ে বিশাল ময়মনসিংহ জেলা। সব মহকুমা থেকেই সম্মেলনের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা ময়মনসিংহ শহরে এসে জড়ো হয়েছিলো। এদের মধ্যে আমাদের নেত্রকোনার প্রতিনিধি দলটিই ছিলো সবচেয়ে বড়ো। টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ আর জামালপুর থেকে যারা এসেছিলো তাদের সকলের সম্মিলিত সংখ্যাও বোধ হয় নেত্রকোনার সমান হয়নি।

সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আমাদের সেদিনকার নেত্রকোনা-ময়মনসিংহের বিনা টিকিটের ট্রেনযাত্রার সুমধুর স্মৃতিটি আজও আমার মনে গেঁথে আছে।

নেত্রকোনা শহরের ইস্কুল-কলেজের ছাত্ররা তো ছিলোই আমাদের দলে; তার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলো মোহনগঞ্জ আর বারহাট্টা ইস্কুলের বহুসংখ্যক প্রাণচঞ্চল কিশোর ছাত্র। প্রাণচাঞ্চল্যে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো আহসাব উদ্দিন। বারহাট্টা ইস্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্র, বয়সে অবিশ্যি আমার সমানই, কিছুটা বড়ো হওয়াও অসম্ভব নয়। তাকে বলা যেতে পারে একজন স্বভাব কবি। পূর্ব ময়মনসিংহের কবিয়াল রামু-রামগতি-রাম কানাইয়ের ক্ষুদে উত্তরসুরি।

ট্রেনের কামরায় মুখে মুখে ছড়া আর গান বানিয়ে পরিবেশন করতে লাগলো আহসাব উদ্দিন। একেকটা স্টেশনে ট্রেন থামে, আর মানুষ ভিড় করে দাঁড়ায় আমাদের কামরাটিকে ঘিরে। হাস্যরসের ভিয়েন-দেয়া গানে আহসাব উদ্দিন বিবৃত করে যায় আমাদের দলের উদ্দেশ্য, ছাত্র-ঐক্যের আবশ্যকতা, দেশের মানুষের অবস্থা, আর রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। অবাক বিস্ময়ে মানুষ তার গান শোনে।

ট্রেনের টিকেট চেকার বেচারা আমাদের কামরায় ওঠে বটে, কিন্তু টিকেট চাইতে তার সাহসে কুলোয় না। সে-ও আহসাব উদ্দিনের গান শুনে চলে যায়।

'ছাত্রলীগ-জিন্দাবাদ', 'ছাত্র ঐক্য-জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা ময়মনসিংহ টাউন হলের সম্মেলন স্থলে এসে উপস্থিত হলাম।

সম্মেলনে আমাদের কী ভূমিকা হবে সে বিষয়ে আগেই নেত্রকোনায় গিয়ে আমাদের সবক দিয়ে এসেছিলেন ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের নেতা কাজী আবদুল বারি। প্রাঞ্জল বক্তৃতায়

তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর ছাত্র সমাজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। তখনো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম হয়নি, কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ, গণতন্ত্রী দল প্রায় নিষ্ক্রিয়। তবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে ইতিমধ্যেই 'মুসলিম' শব্দ বাদ পড়েছে, হয়ে গেছে 'আওয়ামী লীগ'। এই আওয়ামী লীগই তখন সারা প্রদেশব্যাপী সংগঠিত একমাত্র প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল। আর ছাত্র সংগঠনের মধ্যে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ'। ছাত্রলীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য যথেষ্ট প্রগতিশীল।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নও গঠিত হয়েছে দু'বছর আগে, চুয়ান্ন সালে। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে তার তখনো তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি গড়ে ওঠেনি। কাজী আবদুল বারি আমাদের বুঝিয়েছিলেন, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মসূচি প্রায় অভিন্ন; তাই এ দুটো আলাদা সংগঠন রাখা নিতান্তই অযৌক্তিক, দুই সংগঠন মিলে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রলীগের ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলনে আমরা যাতে দুই সংগঠনকে একত্রীভূত করার জন্যে জোর স্লোগান তুলি, সে বিষয়ে কাজী বারিই আমাদের উৎসাহিত করে তুলেছিলেন।

সম্মেলন উপলক্ষে একটা আলোচনা সভারও ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আলোচ্য বিষয় ছিলো—পূর্ববাংলার সংস্কৃতি। গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ও আতাউল হক—আনন্দমোহন কলেজের এই দু'জন অধ্যাপক আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। আমিও বক্তব্য রেখেছিলাম। গুছিয়ে বলতে পারিনি, আর বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা আমার ছিলো তাও বলা চলে না। তবু, অনেকেরই প্রশংসা পেয়ে গেলাম। সে প্রশংসাতেই বোধ হয় সংস্কৃতি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পড়াশোনার দিকে আমার আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে যায়।

সেবারের জেলা সম্মেলনে পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুল আওয়াল এসেছিলেন। এসেছিলেন নির্মল সেন। তিনিও তখন ছাত্রলীগের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা। জেলা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের বিশেষ আমন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আনোয়ারুল আজিমও সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের মূল অধিবেশনে নেতাদের বক্তৃতার সময় আমরা খুব জোর স্লোগান তুললাম–ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ,' 'ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন—এক হও'। কাজী আবদুল বারি ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের সংযুক্তির পক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়ে বক্তৃতা করলেন। নানা ধ্বনি তুলে আমরা তাঁর বক্তব্যের সমর্থন জানালাম। ঐক্যের দাবিতে সম্মেলন জমজমাট হয়ে উঠলো।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেলো: ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশই ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। আমাদের ঐক্যের স্লোগানের প্রচণ্ডতার সামনে তাঁদের বিব্রত অবস্থাটাও বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো। আওয়াল সাহেব ছিলেন যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তিনি ময়মনসিংহের কর্মিদের প্রবণতাটা সহজেই আঁচ করে নিতে পারলেন। তাই, তাঁর বক্তৃতায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সম্পর্কে আবেগময়ী সূচনা দিয়ে সম্মেলনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নিলেন। কিন্তু, পরক্ষণেই 'কিন্তু' দিয়ে আরম্ভ করে এমন কিছু বাক্য প্রয়োগ করে চললেন যার মধ্যে 'তবে, অথচ, বটে, কাজেই' ইত্যাদি অব্যয় পদগুলোর পৌনঃপুনিক ব্যবহারে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, তাঁর বক্তব্যের সহজ অর্থটা দাঁড়ালো: ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের সংযুক্তির প্রস্তাবটা খুব উত্তম, কিন্তু প্রস্তাব কার্যকর করা অসম্ভব।

তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে একটা যুক্তিকে তিনি একরূপ অলংঘনীয়তার পোশাক পরিয়ে হাজির করতে চাইলেন। সেটি হলো : ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠানটি অগ্রজ ও ঐতিহ্যবাহী, ছাত্র

ইউনিয়নও বেশ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। এখন ছাত্রলীগের পক্ষে নাম বদলিয়ে অন্য কোনো নামে প্রতিষ্ঠান করা অসম্ভব। তবে, ছাত্র ইউনিয়ন যদি তাদের সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করে, আর এর সদস্যরা ছাত্রলীগে যোগদান করে, তাহলে একটা মীমাংসা হতে পারে বটে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষেই বা তা কী করে সম্ভব?

অতএব....

আওয়াল সাহেবের এ-রকম ওস্তাদী প্যাঁচের সামনে প্রথমে আমরা কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও, কিছুক্ষণের মধ্যে কায়দাটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো আমাদের কাছে। আমরা আরো তীব্রতার সঙ্গে স্লোগান তুললাম—'যে কোনো মূল্যে-ঐক্য চাই, ঐক্য চাই, ঐক্য চাই', 'নামের ফ্যাকড়া চলবে না, চলবে না।'।

আওয়াল সাহেব এতোটা আশঙ্কা করেননি। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো। মামুলি দু'চারটা কথা বলে তিনি বসে পড়লেন। পরদিন সকালের অধিবেশনে এলেন মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ভাসানী সাহেব সভামঞ্চে উপস্থিত হলে স্বাগত সম্ভাষণমূলক স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের স্লোগানগুলোও পুনরাবৃত্তি করলাম আমরা। তিনিও তাঁর ভাষণে ঐক্যের ওপর খুব জোর দিলেন। দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে খুব প্রবল হয়ে উঠছে, সমস্ত প্রগতিশীলদের দৃঢ় ঐক্য ছাড়া যে তাদের রোখা যাবে না, আর সে ঐক্য-প্রয়াসে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে ছাত্রদেরই—এসব কথা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে আমাদের উৎসাহ খুব বাড়িয়ে দিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ একটা সভায় মিলিত হয়ে ঐক্যের অন্তরায়গুলো দূর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করুক। ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। প্রয়োজনবোধ করলে ছাত্ররা জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও তাদের সভায় ডাকতে পারে। সভা শেষ হলো। আমরা বিজয়ীর ভাব নিয়ে নেত্রকোনায় ফিরে গেলাম।

কিন্তু, হায়, সবই ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। কিছুদিনের মধ্যে বোঝা গেলো যে, ঐক্যের বিজয় হয়নি। এক সর্বব্যাপী অনৈক্য তছনছ করে দিয়েছে প্রগতিশীলদের সব সুকৃতিকে। প্রগতির যে ধারার সূচনা হয়েছিলো 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর 'আওয়ামী লীগ' হওয়ার মধ্য দিয়ে, সে ধারাই চরায় এসে ঠেকে গেলো সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের প্রতি সমর্থনে। ভাসানী-সোহারাওয়ার্দির বিরোধের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠলো জোটবদ্ধতা-জোটনিরপেক্ষতার লড়াই। সে-লড়াইয়ে ছাত্রলীগ হয়ে উঠলো সোহরাওয়ার্দির আদর্শের পয়লা কাতারের সৈনিক। অন্যদিকে, ছাত্র ইউনিয়নের তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সে-সংগঠনটিকে পরিচিত করে তুললো 'কম্যুনিস্ট' বলে। আর সে-যুগের 'কম্যুনিস্ট' বা 'রাশিয়ার চর'-এর মতো গালির জবাবে ছাত্র ইউনিয়ন তার প্রতিপক্ষকে আখ্যা দিলো 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল'। গালাগালির তোড়ে গলাগলির সব সম্ভাবনা একেবারে ভেসে গেলো।

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো আওয়ামী লীগের কাগমারি সম্মেলনকে উপলক্ষ করে। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আর জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ও তাঁর সমর্থকরা যখন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করলেন তখনই আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। এ দলের অন্তর্ভুক্ত প্রগতিশীলরা মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দি-বিরোধী ভূমিকা নেয়, তারা পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে ও পূর্ববঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রাখতে থাকে। মৌলানা ভাসানী কাগমারিতে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ডাকলেন সাতান্ন সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই অধিবেশনেই

তিনি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন ও পূর্ববাংলার একান্ত ন্যায্য দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মেনে না নিয়ে যে এ অঞ্চলের মানুষ একদিন পশ্চিম পাকিস্তানকে 'ওয়া আলাইকুম-আসসালাম' জানাবে সে-কথাও ব্যঞ্জনাগর্ভ অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন। অবিশ্যি এরও এক বছর আগেই, ছাপ্পান্ন সালের পনেরোই জানুয়ারিতে, ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে মৌলানা ভাসানী যে বক্তব্য রাখেন—ষোলই জানুয়ারি দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর প্রতিবেদন অনুসারে তা হচ্ছে :

'পূর্বপাকিস্তানের ন্যায্য দাবি মানিয়া লউন। অন্যথায় জাগ্রত সমাজের মনে যদি অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা বদ্ধমূল হয়, এবং আমাদের মৃত্যুর পর যুবসমাজ নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত সংশ্রব বর্জনের দাবি উত্থাপন করিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না।' (সাঈদ-উর-রহমান *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* ১৯১৩ পৃষ্ঠা ৪৬-এ উদ্ধৃত)।

সন্দেহ নেই, মৌলানার বক্তব্য ছিলো খুবই দূরদর্শী। এ অঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যুর পদধ্বনি তিনি ছাপ্পান্ন সালের গোড়াতেই শুনতে পেয়েছিলেন।

কাগমারিতে বিশেষ কাউন্সিল ডাকার উদ্দেশ্য ছিলো আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা। কিন্তু কোনো মীমাংসাই হলো না। কাউন্সিল অধিবেশন বিতর্কমূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। অথচ, অধিবেশনের পরে আওয়ামী লীগে সোহরাওয়ার্দি সাহেবেরই প্রভাব প্রবল হতে থাকে। পাশ্চাত্যপন্থী পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন-বিরোধী অবস্থান নিয়েই বরং তিনি আওয়ামী লীগে তাঁর নেতৃত্বকে দৃঢ় করে তোলেন। পরিণামে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বামপন্থী ও প্রগতিশীলরা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন। পশ্চিম পাকিস্তানের 'পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি হলো একটি নতুন দল—ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা 'ন্যাপ'। এটি কাগমারি সম্মেলনের মাত্র পাঁচ মাস পরের ঘটনা। সাতান্ন সালের জুলাই মাসের পঁচিশ ও ছাব্বিশ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে এই নতুন দলটি আত্মপ্রকাশ করে।

সাতান্নর ফেব্রুয়ারিতেই ছিলো আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। তাই, প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাগমারি সম্মেলনে যেতে পারিনি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিলো না, তবে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলকে উপলক্ষ করে যে সাংস্কৃতিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তাতে যোগ দেয়ার লোভ ছিলো প্রচণ্ড। কিন্তু সে-লোভ সংবরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। তাই, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হলো পত্রিকায় সম্মেলনের প্রতিবেদন পাঠ করে ও যাঁরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মুখের কথা শুনে।

সে-সময়ে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সংবাদপত্র ছিলো *দৈনিক ইত্তেফাক*। কিন্তু সেই ইত্তেফাকই যখন *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজের* সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্পর্কে নানা ধরনের কুৎসা প্রচার করতে লাগলো, তখন খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। সম্মেলনে গান্ধী, লেনিন ও রবীন্দ্রনাথের নামে তোরণ নির্মাণ করার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা রুশ-ভারতের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিলো। ভারত থেকে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের আগমণ তাদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিলো। তবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী, প্রগতি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহকদের 'গেলো গেলো' চিৎকার দেশের প্রগতি-চেতন ও সংস্কৃতিমান মানুষদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। মৌলানা আকরাম

খানের '*আজাদ*' ও সোহরাওয়ার্দি-সমর্থক *ইত্তেফাক*-এর বিষোদগার বরং কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় করে তুলেছিলো। গণতান্ত্রিক শিবিরের বাঘা বাঘা রাজনীতিকদের অনেকেই প্রতিক্রিয়াশীলতার ফাঁদে পা দিলেও সংস্কৃতিসেবীদের বৃহদংশই সকল প্রতিকূলতার মুখেও প্রগতির পতাকাকে সমুন্নত রেখেছে। এ-অঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যুবীজকে লালন করার ক্ষেত্রে কয়েকটি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের বিশেষ অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে। সেগুলো হচ্ছে—আটচল্লিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর ও উনপঞ্চাশের পয়লা জানুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন', একান্নর মার্চে চট্টগ্রামে ও বায়ান্নর আগস্টে কুমিল্লায় 'পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন', চুয়ান্নর এপ্রিলে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' আর সাতান্নর ফেব্রুয়ারিতে 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন।'

প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানপন্থীরা এগুলোর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। উপলব্ধি করে পাকিস্তানের মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলো। প্রতিক্রিয়াশীলদের ভয় রাজনীতিকে নয়, সংস্কৃতিকে। *আজাদ*, *মর্নিং নিউজ* আর *ইত্তেফাকের* পাতায় তাদের সেই ভয়েরই প্রকাশ ঘটেছিলো।

কাছে থেকে দেখা নীলকণ্ঠ কম্যুনিস্টগণ

সাতান্ন সালে আইএ পাস করলাম। কিন্তু বিএ ক্লাস তো নেত্রকোনা কলেজে নেই। কাজেই আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনে আবার অনিশ্চয়তা।

তবু, সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই দুঃসাহসে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। থাকা-খাওয়ার কোনো সংস্থান না করেই ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম।

নেত্রকোনা থেকেই ময়মনসিংহে এসে আনন্দমোহনে ভর্তি হয়েছিলো আমার সহপাঠি বন্ধু নৃপেন সরকারও। সেও ছিলো প্রায় আমারই মতো হতদরিদ্র। বাড়ি থেকে মাসে মাসে টাকা এনে কলেজে পড়ার মতো সংগতি তারও ছিলো না। কিন্তু ময়মনসিংহে খুব ভালো একটি লজিং পেয়ে যাওয়ায় তার বেশ সুবিধা হয়ে গিয়েছিলো। সেই নৃপেনই আমাকে বললো যে, লজিং পেতে হলে মহাদেব সান্যালের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই এবং সে-ই আমাকে মহাদেব সান্যালের কাছে নিয়ে গেলো। প্রথম পরিচয়েই বুঝতে পারলাম যে, মহাদেব সান্যাল হচ্ছেন দেবাদিদের মহাদেবের মতোই পতিত-পাবন।

আমরা যারা নেত্রকোনা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ডিগ্রিক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম, আমাদের প্রায় সবারই অলিখিত গার্জেন হয়ে গেলেন মহাদেব বাবু। আমাদের লজিং করে দেয়া, ট্যুইশনি জোগাড় করে দেয়া, এমনকি রোগ হলে যাতে আমরা বিনা পয়সায় ডাক্তারের সাহায্য পেতে পারি তারও ব্যবস্থা করে দেয়া—এরকম অনেক কিছুরই দায়িত্ব মহাদেব বাবু নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় আমারও থাকা-খাওয়ার একটা অপ্রত্যাশিত রকমের ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেলো। দু'তিনটি ছেলেমেয়েকে পড়ানোর বিনিময়ে আহার ও আশ্রয় মিললো শহরের ডেঙ্গু বেপারি রোডের উপেন্দ্র পালের বাসায়। পাল মহাশয় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ডাইলপট্টিতে তাঁর গুড়ের দোকান। আর্থিক অবস্থা তার সচ্ছল না হলেও দরাজ দিল বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন একেবারে মাতৃরূপা। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ছিলো একান্তই অকৃত্রিম।

আমি যে আমার মায়ের কাছ থেকে দূরে আছি—তেমনটি তিনি আমাকে ভাবতেই দেননি। প্রবাসেও যে এমন বাড়ির মতো পরিবেশ পেয়ে গেলাম তার সবটাই মহাদেব বাবুর অবদান।

শুধু আমি নই, আমার মতো এ রকম আরো অনেককেই তিনি চিরঋণী করে রেখেছেন। কিন্তু যিনি আমাদের সবার উপকারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি কি পরোপকার করার মতো অঢেল সম্পদে সম্পন্ন ছিলেন?

মোটেই না। নেত্রকোনার নওপাড়া গ্রামের সান্যাল পরিবারের সন্তান মহাদেব সান্যাল পরিবার-বিচ্ছিন্ন ও সম্পদ-বঞ্চিত হয়ে পড়েছিলেন কম্যুনিস্ট রাজনীতি করতে গিয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় পরপরই কমরেড মনিসিংহের নেতৃত্বে হাজং কৃষকদের টংক আন্দোলনে যোগ দেয়ার অপরাধে মহাদেব সান্যাল সহ যে-সব কম্যুনিস্ট গ্রেফতার হয়েছিলেন, মুসলিম লীগের শাসন যতোদিন ছিলো ততোদিন তারা কেউই কারা প্রাচীরের বাইরে আসতে পারেননি। চুয়ান্নর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলো, তবু ওই দেশপ্রেমিক রাজবন্দিদের সহজে মুক্তি ঘটলো না। ছাত্রসমাজের প্রবল দাবির মুখে অনেক দেরিতে একে একে এঁরা মুক্ত হলেন। মুক্ত হলেন মহাদেব বাবুও। কিন্তু মুক্তির পর কোনো আবাসও নেই, নেই আহারেরও সংস্থান। তবে, মাথা গোঁজার ঠাঁই একটা মিললো। সেটি কমরেড শৈলেন রায়ের বাসা। বিপত্নীক শৈলেন রায় নিজে কম্যুনিস্ট বলেই তার বাসাটা হয়ে গিয়েছিলো কম্যুনিস্টদের মেসবাড়ির মতো। ময়মনসিংহ টেলিগ্রাফ অফিসের পাশের ওই বাসাটিতেই এসে উঠলেন সদ্য জেলফেরত কমরেড মহাদেব সান্যাস ও কমরেড অজয় রায়। শৈলেন রায়ের ভাই রতু রায়ও কিছুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখানেই উঠেছেন। শুধু এরাই নন, তখনকার বিশাল ময়মনসিংহ জেলার সব এলাকার কমরেডরাই এ-বাসাতে সাময়িক আশ্রয় নিতেন।

কিন্তু মহাদেব সান্যালের মাথা গোঁজার ঠাঁই যদি বা মিললো, আহারের জোগাড় করা হলো খুবই কঠিন। একমাত্র ভরসা ট্যুইশানি। তাও বেশি পয়সার ট্যুইশানি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কোন যুগে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন, অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার পাট তো সেখানেই খতম। ক্লাস নাইন টেনের ছাত্র পড়াতে না পারলে, বিশেষ করে অঙ্ক না জানলে, ট্যুইশানি করে ভালো পয়সা পাওয়া সম্ভব নয়। মহাদেব বাবুকে তাই নিচের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হলো, আর সে কারণেই অনেকগুলো ট্যুইশানি নিতে হলো। এতোগুলো টুইশানি করার পর সময় বা এনার্জি কোনোটাই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। অথচ মহাদেব বাবুর এনার্জি অফুরন্ত। আর সময়ও তিনি বের করে নিতে জানেন। অবিশ্যি এনার্জি আর সময়—দুটোই নিজের জন্যে খুব কমই ব্যবহার করতেন তিনি, সবই পরার্থে উৎসর্গীকৃত, আমাদের জন্যেই তার সকল ভাবনা ও দুর্ভাবনা নিবেদিত।

এ অবস্থাতেও কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ ঘটে গেলো মহাদেব সান্যালের জীবনে।

হরি চক্রবর্তী নামে এক চাটগাঁইয়া ব্রাহ্মণ ময়মনসিংহেরই এক জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি করতেন। জমিদারি উঠে যাওয়ার পর তিনি তীব্র জীবিকা সংকটে পড়লেন, এর সঙ্গে এসে যুক্ত হলো বয়স্কা কন্যাকে পাত্রস্থ করার সমস্যা। যেনতেন প্রকারে যে কোনো পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করে সে-সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন তিনি। কমরেড শৈলেন রায়ের পরিচিত ছিলেন এই ভদ্রলোক। শৈলেন বাবু হরি চক্রবর্তীকে কন্যা দায় থেকে উদ্ধার করার জন্যে মহাদেব বাবুকে বর হবার প্রস্তাব দিলেন। মহাদেব বাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজি। তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই।

বিয়ের ব্যবস্থাও অভিনব। হরি চক্রবর্তী থাকতেন ব্রাহ্মপল্লীতে 'হৃদয় নিবাস' নামের একটি মস্ত বড়ো বাড়িতে। বাড়িটি জমিদারদের। জমিদারি উঠে গেলেও এবং হরি চক্রবর্তীর চাকরি না থাকলেও, তিনি তখনো সেই বাড়িটিতে থাকার সুযোগ পাচ্ছিলেন। বিয়ে হবে ওই বাড়িতেই।

একদিন মহাদেব বাবু আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার বিয়ের তারিখটির কথা তো শুনেছেনই। ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় খাওয়া-দাওয়া করে আমাদের বাসায় (মানে কমরেড শৈলেন রায়ের বাসায়) চলে আসবেন। সেখান থেকে ব্রাহ্মপল্লীর হৃদয় নিবাসে রওয়ানা হয়ে যাবো। ওখানেই বিয়ে হবে।'

বললাম, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু, আপনার বিয়েতে নেমন্তন্ন, আর আমরা নিজের নিজের বাসা থেকে খাওয়া-দাওয়া করে যাবো?'

'এর মানে'—অতি পরিষ্কার। আমার হবু শ্বশুর ভদ্রলোকের অবস্থা তো জানেনই। একপাল বরযাত্রীকে খাওয়ানোর সঙ্গতি তাঁর নেই। তবে, হৃদয়-নিবাস বাড়িটাতে তো বেশ বড়ো বড়ো ঘর আছে, বসতে দিতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমরা বলে দিয়েছি—বরযাত্রী যাবে একশো জনেরও বেশি, তাদের জন্যে কেবল স্রেফ এক কাপ করে চায়ের ব্যবস্থা করলেই চলবে।'

শুধু চা নয়। মহাদেব বাবুর শ্বশুর বরযাত্রীদের জন্যে প্রতি কাপ চায়ের সঙ্গে একটি করে দুধের নাড়ুও পরিবেশন করেছিলেন।

বর বেশে মহাদেব সান্যাল পিঁড়িতে বসলেন। পুরোহিত মন্ত্র আবৃত্তি করছেন, বর কিন্তু একবোরে মৌন। বিয়ের সব শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান আর স্ত্রী-আচারই পালিত হলো, কেবল বরের মুখ থেকে কোনো মন্ত্রই বেরুলো না। তবু শান্তি চক্রবর্তী নামক কুমারীটি শ্রী মহাদেব সান্যালের ধর্মপত্নী রূপে পরিণত হলেন শ্রীমতি শান্তি সান্যালে।

বিয়ের আসরে প্রচুর হৈ হুল্লোড় করে অনেক রাতে আমরা যার যার আস্তানায় ফিরে এলাম।

শৈলেন রায়ের বাসার মতোই সে-সময়ে ময়মনসিংহে কম্যুনিস্টদের আরেকটি আড্ডাখানা ছিলো 'নয়াজামানা পুঁথিঘর'। এই বইয়ের দোকানটিকে তো অনেকে কম্যুনিস্ট পার্টির অঘোষিত অফিস বলেই মনে করতেন। বাস্তবেও অবিশ্যি এটি তা-ই হয়ে উঠেছিলো। শহরের চন্দ্রকান্ত ঘোষ রোডের যে-ভবনটিতে এই দোকানটির অবস্থান, বিশেষ সূত্রে কম্যুনিস্টরাই ছিলেন সে-ভবনটির মালিক। চুয়ান্ন সালে পাকিস্তান সরকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর পার্টি-দরদী জ্ঞান বাগচি মশাইকে মালিকানা দিয়ে এখানে যে বইয়ের দোকানটি খোলা হয় তারই নাম দেয়া হয় 'নয়া জামানা পুঁথিঘর'। জেল ফেরত কমরেড রতু রায় হন দোকানের প্রধান কর্মচারি বা ম্যানেজার। তাই, স্বভাবতই এটি হয়ে ওঠে নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টির লোকজন ও তাদের সহযোগীদের আড্ডাস্থল। এই আড্ডায় নিয়মিত আসতেন ছাত্রনেতা কাজী আবদুল বারি, বিভূতি আচার্য, আবদুল আলী, আশুতোষ ধর, সুধীর দাস, নরেশ পাল এবং এ-রকম আরো অনেকে। আলতাব আলী, জ্যোতিষ বোস, অজয় রায়, মহাদেব সান্যাল, বেণীমাধব দেব, ওয়াহেদ আলীর মতো জেল ফেরত কমরেডদেরও বৈকালিক আড্ডা জমতো এই নয়াজামানা পুথিঘরেই।

শৈলেন রায়ের বাসা আর পুঁথিঘরের আড্ডায় যাদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম তারা—অর্থাৎ কম্যুনিস্টরা—যে অন্য সকল বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কৃতী লোকদের থেকে আলাদা—সে কথা বুঝতে

আমার বিলম্ব হয়নি। জীবিকার জন্যে কমরেড শৈলেন রায় হয়েছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। অথচ নেত্রকোনার রামেশ্বরপুরে সম্পন্ন জোতদার-তালুকদার পরিবারের মানুষটির এমনটি করার কোনোই প্রয়োজন হতো না, যদি তিনি কম্যুনিস্ট না হয়ে বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন। তার ভাই রতু রায় কম্যুনিস্ট হওয়ার দরুনই জেল খেটে খেটে আর আত্মগোপনে থেকে থেকে জীবনে সংসারী হওয়ার কোনো সুযোগই পেলেন না। দৃষ্টিক্ষীণতায় বহুদিন যাবত ভুগছিলেন। সাতান্ন সালে যখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তখনই দেখেছি, তিনি অনেক মোটা লেন্সের চশমা ব্যবহার করেন। তারপর জঙ্গী শাসক আইয়ুবের জেল থেকে যখন বেরিয়ে এলেন চৌষট্টি সালে, তখন দেখলাম, তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ। শৈলেন রায়ের শ্যালিকা-পুত্র অজয় রায় ছিলেন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। তার সম্পর্কে সংক্ষেপে অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ধনঞ্জয় দাশ তাঁর আত্মকথা *আমার জন্মভূমি ঃ স্মৃতিময় বাংলাদেশ*-এ। সেই অজয় রায়ও নিঃস্বের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। উনিশশো সাতান্ন/আটান্ন সালে মহাদেব সান্যালের মতোই তাঁরও জীবিকা ছিলো ছাত্র-পড়ানো। আটান্নর আইয়ুবী আমল থেকে তাঁর পলাতক জীবন ও মাঝে মাঝে কারাবরণ।

কমরেড জ্যোতিষ বোসের সঙ্গেও আমার পরিচয় সেই উনিশশো সাতান্ন সালেই। দীর্ঘদিন পরে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে কম্যুনিস্টদের মধ্যে একটা সংসারী আমেজ দেখা দিয়েছিলো। সে আমেজের মধ্যেই জ্যোতিষ বোস বিয়ে করলেন ছায়া সেনকে। ছায়া সেন তখন মাত্র ক্লাস এইটের ছাত্রী। তাকে নিয়ে সংসারও করবেন, আর পড়াশোনা করিয়ে ম্যাট্রিকটাও পাস করাবেন—এ-রকমই সংকল্প করেছিলেন কমরেড জ্যোতিষ বোস। ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ মিশনের কাছাকাছি অবস্থিত তার পৈতৃক বাসভবনের বৈঠকখানায় বসে আমাদের কাছে সেদিন তিনি তার সংসার-জীবনের পরিকল্পনার ছকটা তুলে ধরছিলেন। আমরা ছিলাম চারজন। আবদুল কুদ্দুস, আবদুল আলী, বাণেশ্বর দাস আর আমি। চারজনই আনন্দমোহন কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। জেলে যাওয়ার গল্প, পলাতক থাকার গল্প, এমনকি পুলিশের হাতে নির্যাতিত হওয়ার গল্পও তিনি এমনভাবে বলে যাচ্ছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিলো—এ সবই বুঝি খুব মজার ব্যাপার। আহা, এ-রকম মজা আমরাও যদি চেখে দেখতে পারতাম!

কিন্তু এ-সব যে মোটেই মজার ব্যাপার নয়, জ্যোতিষ বোসের—এবং আমাদের পরিচিত অন্য অনেক কমরেডের—জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলো একান্ত কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করেছিলাম। নিজের জীবনেও এ সবের তেতো স্বাদ একেবারে কম পাইনি।

আরেক ছাত্র কম্যুনিস্টকে দেখেছিলাম– বিভূতি আচার্য যার নাম। মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের ছেলে। না, মুক্তাগাছার বিখ্যাত মহারাজার বাড়ির কেউ নয়। তবে ওই জমিদারিরই ছোটখাটো হিস্যা ছিলো তাদের। আর ছোট সাপও তো সাপই! ছোট হোক বড়ো হোক, জমিদার বাড়ির ছেলে বলতেই আমাদের সামনে একটা দূরত্বের ও বৃহত্ত্বের ছবি ফুটে উঠতো। কিন্তু অবাক হলাম বিভূতি আচার্যকে দেখে। সাধারণ পোশাক পরা, সাধারণ মধ্যবিত্ত ছেলেদের মতোই চলাফেরা। একাধিক বার বিএ ফেল করলেও পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বইপত্র পড়ায় ভীষণ মনোযোগ। বিশ্বরাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদিতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমরা চমৎকৃত হয়ে যেতাম।

প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা বিক্রি করতে দেখেছি কমরেড ওয়াহেদ আলীকে। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা মোটেই বেশি কিছু নয়। কিন্তু দেশি-বিদেশি রাজনীতির জ্ঞান খুবই পাকা।

ময়মনসিংহ শহরের পুরোনো বাসিন্দাদের একজন। পরিবারের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিলো না। সে-অবস্থাকে আরো ভালো করার কোনো চেষ্টাই না করে কমরেড ওয়াহেদ কম্যুনিজমের আদর্শের বেদিমূলে জীবনের সব আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ জেলখাটা, আত্মগোপনে থাকা, আর প্রকাশ্য কাজের সুযোগ পেলে তার জন্যে একেবারে সর্বস্ব সমর্পণ করা।

নয়া জমানা পুঁথিঘরের আড্ডাতেই দেখেছি সদ্য জেল-ফেরত কমরেড বেণীমাধব দেবকে। সদা প্রফুল্ল আর সদা হাস্যময় মানুষটি। অথচ একটুকুতেই রেগে যান। তাঁর এই দুর্বলতাটাকে কাজে লাগায় সবাই। সুযোগ পেলেই তাঁকে রাগিয়ে মজা দেখে। প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিয়ে তখনো, সেই সাতান্ন সালেও, তিনি কুমার। এই কৌমার্য ঘুচানোর ব্যাপারে তাঁর অভিনব সব প্রয়াসের মধ্যে বেশ মজার মজার উপাদান মিলতো। আর প্রায়শই কৃত্রিমভাবে একেকটা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে নিয়ে বেণীবাবুর বন্ধুরা বেশ মজা করতেন।

অথচ, এ-সব ক্ষ্যাপামির পরও, তাঁর কম্যুনিস্ট সত্তাটি ছিলো খুবই সিরিয়াস ও নির্ভেজাল। শেরপুরের কমরেড রবি নিয়োগীর রিক্রুট কমরেড বেণীমাধব দেব সমাজ বদলানোর কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। কম্যুনিজমের আদর্শকে অঙ্গীকার করেই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁকে মরণ কামড় দিতে ছাড়েনি। আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় তার বিশ বছর পর তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো এই দারিদ্র্যের কামড়জনিত ক্ষতের দরুনই। প্রতিক্রিয়াশীল পাক শাসকদের অমানবিক অত্যাচার-উৎপীড়নের পাশাপাশি এই দারিদ্র্যের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখেছি মহাদেব সান্যাল, জ্যোতিষ বোস, ওয়াহেদ আলীসহ আরো অনেক কমরেডকে। কিন্তু সেই সঙ্গে অবাক বিস্ময়ে এও লক্ষ করেছি যে, সমাজের বিরূপতা, রাষ্ট্রের উৎপীড়ন বা দারিদ্র্যের দংশন—কোনো কিছুই তাঁদের উঁচু মাথা নিচু করতে পারেনি, আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি, কিংবা নৈরাশ্যের অন্ধকূপে নিমজ্জিত করতে পারেনি। পুরাণে নীলকণ্ঠের কথা পড়েছি যিনি সমুদ্রমন্থনজাত বিষ নিজে পান করে পৃথিবীকে বিষমুক্ত করেছিলেন। আর বাস্তবে পাকিস্তানি জামানার কম্যুনিস্টদের দেখে আমার মনে হয়েছে যে, এঁরা পুরাণকারের কল্পনার নীলকণ্ঠকেও ম্লান করে দিয়েছেন।

কম্যুনিস্টদের অজস্র ভুলের কথা আমি জানি। সেই সব ভুলের কথা তুলে অন্য অনেকের মতো আমিও তাদের কম সমালোচনা করিনি। কিন্তু একান্ত কাছে থেকে যখন কম্যুনিস্টদের দেখলাম তখন বুঝলাম যে, ভুলত্রুটির চেয়ে এঁরা অনেক অনেক বড়ো। নেত্রকোনার একজন সুরসিক কম্যুনিস্ট ঠাট্টা করে বলতেন, 'কম্যুনিস্ট কথাটার অর্থ জানো? কম+অনিষ্ট=কমানিষ্ট। এ থেকেই হয়েছে 'কম্যুনিস্ট'। অর্থাৎ যারা কম অনিষ্ট করে তারাই হচ্ছে কম্যুনিস্ট। অন্য সবাই সমাজের অনেক বেশি অনিষ্ট করে। সারা দুনিয়ায় কম্যুনিস্টরা যদি অনিষ্ট করেও থাকে, তবে করেছে খুব কম মানুষের।'

ঠাট্টা করে তিনি বোঝাতে চাইতেন যে, বুর্জোয়া রাজনীতিকরা শতকরা পাঁচ/দশজন বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়ার ইষ্ট করার লক্ষে শতকরা নব্বই জন মানুষের অনিষ্ট করে। আর কম্যুনিস্টরা শতকরা নব্বই জন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের ইষ্ট করতে চায় বলে দশজনের অনিষ্ট তাদের করতেই হয়। এ কাজ করতে গিয়ে তারা অনেক 'ভুল' করে বটে, কিন্তু 'অন্যায়' করে না। কম্যুনিস্ট মানেই সত্যিকারের ন্যায়নিষ্ঠ।

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আমার বিরূপতা কেটে যেতে থাকে। নেত্রকোনা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তি আমার ভাবনায় আরো পরিবর্তন নিয়ে আসে। ময়মনসিংহে এসে কম্যুনিস্টদের নীলকণ্ঠ রূপ প্রত্যক্ষ করে তো আমি পুরোপুরি অভিভূতই হয়ে পড়ি। তাছাড়া কম্যুনিস্টদের মুখেই তাদের আত্মসমালোচনা শুনে আমার সমালোচনার ধার ভোঁতা হয়ে আসে, বিরূপতা প্রায় মিলিয়ে যায়। ছেচল্লিশে পাকিস্তান দাবিকে সংখ্যালঘুর আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করাটা ছিলো একান্তই ভ্রান্ত—সাতান্ন সালে মুক্তকণ্ঠেই কম্যুনিস্টদের এ-কথা স্বীকার করে নিতে দেখি। এরপর পাকিস্তানোত্তর কালে, 'রনদিভে থিসিস' যে ছিলো একান্তই হঠকারী—এ-রকম কথা নয়াজমানা পুঁথিঘরের আড্ডার অনেক কম্যুনিস্টকে অনেকবারই বলতে শুনেছি। অন্তত বায়ান্ন সাল থেকে যে পাকিস্তানের কম্যুনিস্টরা সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছিলো—সাতান্ন সালে এ-রকম ধারণা আমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে যায়। পাকিস্তানের অন্যতম জন্মবীজ-রোপণকারী হয়ে ব্রিটিশ ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি যে পাপ করেছিলো, পাকিস্তানে বসবাসকারী কম্যুনিস্টরা—বিশেষ করে 'হিন্দু' কম্যুনিস্টরা—তারই প্রায়শ্চিত্ত করে চলছিলো। তাদের সব কর্মকাণ্ড যে পাকিস্তানের মৃত্যুবীজকে লালন করার কাজেই নিবেদিত, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উপলব্ধিতে তা সঠিকভাবেই ধরা পড়ে। সেই উপলব্ধি থেকেই তারা কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে ওঠে, পাকিস্তানের মৃত্যু ঠেকাবার লক্ষেই কম্যুনিস্ট-দমনে উঠে পড়ে লেগে যায়।

এ-সময়ে কম্যুনিস্টরা সমাজ ও রাজনীতির যে-ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করতো, কিংবা বিভিন্ন গণসংগঠনের মাধ্যমে যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করতো, সেগুলো সবই আমার কাছে সঠিক বলে মনে হতো। কাজী আবদুল বারি, অজয় রায় আর জ্যোতিষ বোসের পরামর্শে ছাত্রসমাজের মধ্যে এ- সবের প্রচারকাজেও তাই উৎসাহের সঙ্গেই লেগে গিয়েছিলাম।

এখন যেমন সাহিত্যিক-খ্যাতি-পাগল ছাত্র-তরুণরা নানাভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' বা 'অনিয়মিত সাহিত্য-সংকলন' প্রকাশ করে, আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন আমাদের পক্ষে তেমনটি করা সম্ভব হতো না। অন্তত মফস্বল শহরে তো নয়ই। সে-সময়ে 'প্রতিভা' জাহিরের জন্যে আমরা যে মাধ্যমটিকে বেছে নিতাম সেটি হচ্ছে 'দেয়াল পত্রিকা'। আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হয়েই এ-রকম অনেকগুলো দেয়াল পত্রিকা দেখতে পেলাম। কিন্তু এর কোনোটিকেই আমার কাছে খুব মানসম্মত বলে মনে হলো না। একদিন সুধীর দাসের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলছিলাম। সুধীর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব দিলো, 'চলো, আমরাই একটা পত্রিকা বের করে ফেলি।' আমিও তার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আনন্দমোহন কলেজের দেয়ালে শোভা পেলো '*দিশারি*'। এই দেয়াল পত্রিকাটির সম্পাদক যতীন সরকার, শিল্পী সুধীর দাস আর প্রকাশক আমিনুল ইসলাম।

সুধীর দাসও নেত্রকোনা কলেজ থেকেই আইএ পাস করে আনন্দমোহনে এসে বিএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলো। সে হলো একজন স্বভাবশিল্পী। ছবি আঁকায় তার হাত এতো চমৎকার যে, এ-বিষয়ে কোনোরূপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই যে সে কোথাও পায়নি, সে কথা কেউই বিশ্বাস করতো না। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন সালে নেত্রকোনা শহরের কম্যুনিস্টরা তাকে দিয়ে নানা ছবি আঁকিয়ে নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলো, তার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে এ-দেশের মানুষের দুঃখদুর্দশা ও

নানা আন্দোলনের রূপ খুবই চমৎকারভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। কম্যুনিস্টদের প্রেরণাতেই স্বভাবশিল্পী থেকে সুধীর হয়ে উঠেছিলো গণশিল্পী। ময়মনসিংহে এসে তার সেই গণশিল্পী সত্তাটারই চরিতার্থতা ঘটলো '*দিশারি*কে কেন্দ্র করে। দিশারির সম্পাদকীয় লিখতাম আমি, আর সে-সম্পাদকয়িকে সচিত্র করে তুলতো সুধীর। সুধীরের আঁকা কার্টুনগুলো তো অনেকের গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিতো। দিশারির লেখাগুলো এমন উগ্র হয়ে উঠেছিলো যে, অচিরেই এটি কম্যুনিস্টদের দেয়ালপত্র হিসেবে পরিচিত হয়ে গেলো। আর আমার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের গায়েও কম্যুনিস্টের ছাপ পড়ে গেলো। আসলে সুধীর ছিলো মূলত শিল্পী এবং শিল্পী বলেই অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। সেই সংবেদনশীলতা থেকেই সে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো, কম্যুনিজমের দর্শন বা কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মসূচির খুঁটিনাটি নিয়ে সে মাথা ঘামাতো না।

আমি নিজেও কম্যুনিজমের দর্শনটি সহজে গ্রহণ করতে পারিনি। কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বেড়ে গেলেও তাঁদের 'নাস্তিক্য' আমার মোটেই ভালো লাগতো না।

বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ চিন্তাবিদের হিন্দুধর্মের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে আমি ছেলেবেলা থেকেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মভাষ্যও আমাকে আকর্ষণ করেছিলো। স্কুল জীবনেই পুরোনো *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* অনেকগুলো সংখ্যা আমার হাতে পড়ে। আমি গোগ্রাসে গিলতে থাকি সেগুলো। হয়রত মুহম্মদের জীবনকথা ও ইসলামের তত্ত্বব্যাখ্যামূলক অনেক বই ও প্রবন্ধ আমি কলেজে ঢোকবার আগেই পড়ে ফেলি। এ-সব পড়ার ফলে নিজেকে আমি সাম্প্রদায়িক ধর্মের উর্ধ্বে বলে ভাবতে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করার একটা অভ্যাস আমার মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে, ধর্ম সম্পর্কে তর্কবিতর্ক আমার খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্মবিরোধিতা বা নাস্তিক্য আমি বরদাশ্‌ত করতে পারতাম না। অর্থাৎ আমি হয়ে উঠেছিলাম একজন যুক্তিশীল ভাববাদী। ঈশ্বরের ব্যক্তিক রূপে আমার বিশ্বাস ছিলো না, কিন্তু একটা নৈর্ব্যক্তিক ঐশ্বরিক শক্তিতে আমি বিশ্বাসী ছিলাম। সেই ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন বিভিন্ন যুগের অবতার, নবী বা মহাপুরুষবৃন্দ—এ ব্যাপারেও ছিলাম নিঃসংশয়।

নেত্রকোনার কলেজ-জীবনের একটি দিনের কথা এখনো আমার মনে পড়ে। মাত্র কয়েকদিন আগে কলেজে ভর্তি হয়েছি। শিক্ষক ও সহপাঠিদের কাছে তখনো প্রায় অপরিচিতই। এরই মধ্যে একদিন ইসলামের ইতিহাসের ক্লাসে অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন, 'কোরানের একেবারে প্রথম যে সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছিলো তার প্রথম কথাগুলো কী?'

ক্লাসভর্তি ছাত্র সবাই চুপ। কেউই উত্তর দিতে পারছে না। আমি তখন আস্তে আস্তে উঠে বললাম, 'ইকরা বিস্‌মে রাব্বিকাল্লাজি খালাক...।'

সেদিন ধুতি পরে ক্লাসে গিয়েছিলাম। তাই সবার দৃষ্টি আমার ওপর পড়লো। অধ্যাপক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী করে জানো? তুমি কি আরবি পড়েছো?'

আমি সবিনয়ে জানালাম যে, আরবি ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তবে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বাংলা বইয়ে পড়া অনেক আরবি শব্দ বা বাক্যাংশ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। অধ্যাপক আবদুল গনি তখন আমাকে ক্লাসের পর তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি কোরান শরীফের একটি ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ আমাকে পড়তে দিলেন। বিপুল উৎসাহে সেই বইটি আমি পড়ে ফেলেছিলাম। বিশেষ করে সে-বইয়ের প্রায় আশি পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি আমি

খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলাম। অধ্যাপক গনির কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করার আগ্রহ আমার আরো বেড়ে গিয়েছিলো।

সেই আগ্রহ নিয়েই আনন্দমোহন কলেজের কেরানি মোহিনী বাবুর কাছ থেকে এনে পড়েছিলাম মানবেন্দ্রনাথ রায়ের *হিস্টরিক্যাল রোল অব ইসলাম* বইটির অধ্যাপক আবদুল হাই-কৃত বাংলা অনুবাদ '*ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান*'। পরে মানবেন্দ্রনাথের মূল ইংরেজি বইটিরও এক কপি জোগাড় করে পড়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই ইসলাম ও হযরত মুহম্মদ সম্পর্কে যে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছিলাম, সন্দেহ নেই, মানবেন্দ্র নাথের বইটি পড়ে সে শ্রদ্ধা আরো গভীর ও যুক্তিভিত্তিক হলো। কিন্তু আমার অভ্যস্ত চিন্তায় একটা প্রচণ্ড আঘাত হানলো এ বইয়ের প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত বস্তুবাদী ব্যাখ্যাটি। আমি নিজেকে যুক্তিবাদী বলেই মনে করতাম। আসলে আমার সে যুক্তি ছিলো ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন কিংবা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ, বস্তুবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিচার করলে সে যুক্তির ভিত্তিই যে নড়ে ওঠে, মানবেন্দ্রনাথের বই আমাকে সেই সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিলো। কিন্তু সে- সত্যের তীব্র আলো আমি ঠিক সহ্য করে উঠতে পারছিলাম না। অধ্যাত্ম শক্তির কোনো অস্তিত্বই নেই, সবকিছুই বস্তু ও বস্তুর শক্তিতে চলে, ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মতো ব্যাপারটিও একটি বস্তুগত ব্যাপার মাত্র—এ-সব কথা আমার কাছে একবোরেই অসহনীয় মনে হলো। আমার সমস্ত সত্তা এর বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠতে চাইলো, আবার সে-চিৎকারের শক্তিও যেনো আমার ভেতর থেকে উবে গিয়েছিলো। প্রত্যাদেশ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেমন আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না, তেমনি সে-ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করার মতো কোনো জোরালো যুক্তিও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

সে যে কি এক যন্ত্রণাকর অবস্থা! এ যেনো ত্রিশঙ্কুর মতো স্বর্গ আর মর্ত্য, বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, আস্থা আর অনাস্থা, আস্তিকতা আর নাস্তিকতার মধ্যবর্তী এক নিরপেক্ষ এলাকায় অবস্থান। সে-এলাকায় অবস্থানের যন্ত্রণা সবাইকে জীবনের কোনো না কোনো সময়ে ভোগ করতে হয় কি না, আমার জানা নেই। কিন্তু আমি এ যন্ত্রণাকর অবস্থানে কিছুকালের জন্যে হলেও থেকেছি এবং বুঝেছি যে, এ অবস্থানে বেশিদিন বাস করা যে কোনো মানুষের পক্ষেই অসম্ভব।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে আমাকে মুক্তির পথ দেখালেন কমরেড রতু রায়। আমার কথাবার্তা থেকে তিনি আমার মানসিক সংকটের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভাববাদ এবং বস্তুবাদের পার্থক্য সম্পর্কে প্রাথমিক কথাগুলো আলোচনা করে তিনি চেষ্টা করলেন যাতে আমি চিন্তার বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারি। আমার হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট একটি বই—জোসেফ স্তালিনের *দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*। বইটি আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। এ-বইটা পড়েই যেনো আমার মনের কতকগুলো গিঁট খুলে গেলো। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বইটির বক্তব্যও আমার কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এলো। ভাববাদী যুক্তিবাদের সঙ্গে বস্তুবাদী যুক্তিবাদের পার্থক্যটাও উপলব্ধি করতে পারলাম।

এ ব্যাপারে আমাকে আরো সাহায্য করলেন কমরেড অজয় রায় ও কমরেড জ্যোতিষ বোস। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অজয়দার বিচরণ। ইতিহাস থেকে দর্শন, সমাজতত্ত্ব থেকে সাহিত্য—সব বিষয়কেই তিনি দেখতেন দ্বান্দিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে যান্ত্রিক বস্তুবাদের পার্থক্যটি অজয়দাই আমার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। মানবেন্দ্রনাথ

রায়ের চিন্তার বিভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমি সচেতন হতে পারি অজয়দার আলোচনা শুনেই। মরিস কর্নফোর্থ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন আর সুশোভন সরকারের বই পড়ার পরামর্শও তিনিই আমাকে দিলেন। সুশৃঙ্খলভাবে পড়াশোনা করার ব্যাপারে সেদিন যদি অজয়দার সাহায্য না পেতাম, তবে আমার বিভ্রান্তি যে কোন পর্যন্ত গিয়ে গড়াতো—আজকে তা ভাবতেও পারি না।

আর জ্যোতিষ দা আমাকে ধারণা দিলেন বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি যে কেবল আলোচনা বা পড়াশোনা করেই পুরো আয়ত্ত করা যায় না, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েই যে কেবল একজন মানুষ জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি অর্জন করতে পারে—জ্যোতিষ দা আমাকে সেই দিকটিই বুঝিয়ে দিলেন। নেত্রকোনার আবদুল কুদ্দুস আগে থেকেই কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত ছিলেন। আমার চেয়ে বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়ো হয়েও ময়মনসিংহে আমার সহপাঠি হওয়াতে এবং 'নয়াজামানা'র আড্ডাধারী হওয়াতে, তার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জ্যোতিষদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আসলে তিনিই ঘটিয়ে দেন। ময়মনসিংহের ছাত্রজীবনে জ্যোতিষদার সঙ্গে মাত্র কয়েকদিনই দীর্ঘসময়ব্যাপী বৈঠকের সুযোগ পেয়েছিলাম। এই বৈঠকগুলোই আমার চেতনার রূপান্তরে দীর্ঘস্থায়ী অবদান রেখেছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান*-এ উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পাঠ করে আস্তিকতা ও নাস্তিকতার মধ্যবর্তী যে যন্ত্রণাময় এলাকায় আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের সঙ্গে পরিচয় সে-এলাকা থেকে আমাকে উদ্ধার করলো। এ-অবস্থানে উত্তরিত হতে অবিশ্যি আমার বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিলো। কিন্তু যখন ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের মোটামুটি মর্ম গ্রহণে সক্ষম হলাম, তখন যথার্থই একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে সমস্ত মনপ্রাণ ভরে গেলো। বলতে গেলে, একটা নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম আমি। আমার পূর্বেকার জীবনদৃষ্টি আমার নিজের কাছেই একটা কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হলো। সে সময় থেকে এ বিশ্বাস আমার সত্তার সঙ্গে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে, একজন লোক যতো গভীর ও বিস্তৃত পাণ্ডিত্যের অধিকারীই হোক না কেন, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে না পারলে তার পাণ্ডিত্য তাকে এমন সব অসঙ্গতির পাঁকে নিক্ষেপ করবে, যা থেকে তার উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।

আস্তে আস্তে অবিশ্যি এও উপলব্ধি করতে পারি যে, বই পড়ে ডায়ালেকটিকের কয়েকটি সূত্র মুখস্থ করতে পারাটাই যথেষ্ট নয়। মুখস্থ করা ডায়ালেকটিক বরং মানসিক অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণের সৃষ্টি করে। আর এ ধরনের অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিদের দুর্গন্ধযুক্ত উদগারে আশপাশের পরিবেশ পর্যন্ত দূষিত হয়ে ওঠে।

আসলে ডায়ালেকটির বস্তুবাদী দর্শন বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র নয়। এটি জগত ও জীবনকে অবলোকনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেমন তেমনি এটি একটি বিরাট ও মহান ভাবাদর্শ এবং এ-হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন। শ্রমিক শ্রেণীর একজন রূপে আন্তর্জাতিকতার চেতনাদীপ্ত সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম হয়েই এ-দর্শনটি আয়ত্ত করা সম্ভব। এ-দর্শন তত্ত্ব ও প্রয়োগের মণিকাঞ্চন-সম্মিলনে সৃষ্ট। প্রয়োগহীন তাত্ত্বিকতা দিয়ে যারা 'সেলফস্টাইলড' ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী হন, তাদের অনেকেরই করুণ পরিণতি আমি বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাছাড়া, এ-দর্শনটির সূত্র একবার আয়ত্ত হয়ে গেলে চিরকালের জন্যেই নিশ্চিত হওয়া গেলো, তেমনটিও অবশ্যই নয়। প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহের সঙ্গে এ-দর্শনের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে

মিলিয়ে নিতে না পারলে—কিংবা কোনো না কোনোভাবে সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেলে—জীবন থেকে ডায়ালেকটিকের সূত্র হারিয়ে যায়। আর তখনই নানা অপদর্শন মাথায় এসে ভর করে, সে-সব দর্শন দিয়ে ডায়ালেকটিককে 'শোধন' করে নেয়ার চিন্তাও মনে জাগে। তাছাড়া, আমাদের সমাজের বাস্তব পরিবেশটাই সঠিক দর্শনকে ধরে রাখার এতো প্রতিকূল যে, পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে পদে পদে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের জন্যে এ-পথ তো একেবারেই ক্ষুরধার। অনেক ঝড় ঝাপটার মধ্যে সঠিক দর্শনটিকে ধরে রাখার পরও তো জীবনের একেবারে উপান্তে এসে চিন্তায় ও কর্মে অনেককেই দেউলিয়া হয়ে যেতে দেখেছি।

সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাববাদী বিভ্রম ও হতাশা

সাতান্ন সালের নভেম্বর কি ডিসেম্বরে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিলো ময়মনসিংহ শহরের দুর্গাবাড়িতে। সে অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ তৎকালীন ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিলো। সংবর্ধনা সভাটির উদ্যোক্তা ছিলো ময়মনসিংহের হিন্দুদের শতাব্দী প্রাচীন সংগঠন 'আর্যধর্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা'। সংক্ষেপে যার পরিচয় 'ধর্মসভা' নামে। দুর্গাবাড়িই এই ধর্মসভার কর্মকেন্দ্র তথা প্রাণকেন্দ্র। উনিশ শতকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের চ্যালেঞ্জের মুখে ময়মনসিংহের সনাতনপন্থী হিন্দুরা এই ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলো। সে সভাকে কেন্দ্র করেই এখানে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিলো। ধর্মসভারই আমন্ত্রণে উনিশ শতকের শেষ দশকে দুর্গাবাড়িতে এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী বিদেশিনী মহিলা এ্যানি বেসান্ত। উনিশ শতকের ষাটের দশকে ময়মনসিংহের দুর্গাবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা' অনেক চড়াই-উৎরাই বেয়ে আজো বিশ শতকের উপান্তে এসেও বেশ সচল ও সক্রিয় রয়ে গেছে।

সাতান্ন সালে সেই ধর্মসভার পক্ষ থেকে দুর্গাবাড়িতে যারা ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন তাদের কাউকেই আমি তখন চিনতাম না, তাদের কারো নামও আমার এখন মনে নেই। তবে, সে-সময়ে ধর্মসভার কর্মকর্তাদের মধ্যে যে ছিলেন ময়মনসিংহের অনেক প্রবীণ হিন্দু আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি এবং এঁদের মধ্যে আইনজীবীদেরই ছিলো প্রাধান্য—সে-কথা আমার জানা ছিলো। সেদিন একজন প্রবীণ আইনজীবী ডেপুটি হাইকমিশনারের উদ্দেশে ইংরেজিতে লেখা যে দীর্ঘ মানপত্র পাঠ করেছিলেন তার মূল বক্তব্যটি আমার আজো বেশ মনে আছে। সে-সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা দুঃখ-দুর্দশার বিবরণে ভরা ছিলো সেই মানপত্রটি। এ দেশের হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নানা বৈষম্যমূলক আচরণের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে মানপত্রটিতে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের সক্রিয় সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিলো। মানপত্রে লিখিত বিবরণ যে একান্তই সত্য ছিলো সে-কথা অস্বীকার করা যাবে না। দ্বিজাতিতত্ত্বের নিষ্পেষণে পাকিস্তানের হিন্দুদের জীবন যে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, তা তো সকলেরই জানা।

কিন্তু এ-সব কথা ভিন্ন রাষ্ট্রের একজন ব্যক্তিকে জানানোর সার্থকতা কোথায়? এ রকম করা কি বেআইনি নয়?...আবার, তাই-বা কী করে হয়? ময়মনসিংহের ঝানু আইনজ্ঞরা কি কোনটা আইনি আর কোনটা বেআইনি জানেন না?

যতোক্ষণ মানপত্র পাঠ হচ্ছিলো ততোক্ষণ এ সব প্রশ্নই আমার মনে খোঁচা দিচ্ছিলো। সে-রকম খোঁচা সম্ভবত সংবর্ধিত কূটনীতিকটির মনেও লাগছিলো। তাই বোধ হয় সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বললেন : আপনাদের দুঃখদুর্দশার বিবরণ শুনে আমি খুবই বিচলিত। আপনাদের প্রতি আমার সহানুভূতির অন্ত নেই। আপনাদের সমস্যা আমি বুঝি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এ-ও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আপনাদের সমস্যা সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখার যোগ্য আমি নই। আপনারা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের হাতেই নিহিত রয়েছে আপনাদের সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। আপনারা নিজেরাই সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন, সমাধানের সূত্রও আপনারাই অন্বেষণ করে নেবেন। আমি কেবল আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাই জ্ঞাপন করতে পারি। এর বেশি কিছু নয়।

এ রকম আরো কিছু সহানুভূতিসূচক কথাবার্তা বলে ভারতীয় কূটনীতিক তার বক্তব্য শেষ করলেন এবং ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ কিছু বই দুর্গাবাড়ি ধর্মসভা পাঠাগারে উপহার দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

তার এ-রকম বক্তব্যে সমাগত হিন্দু শ্রোতারা মোটেই খুশি হতে পারেনি। তাদের কথা হচ্ছে: আমরা যে পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু রূপে নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি ও নানা ধরনের নির্যাতন ভোগ করছি তার জন্যে তো ভারতীয় নেতারাই দায়ী, তারাই তো ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ মেনে নিয়ে আমাদেরকে নেকড়ের মুখে ফেলে দিয়ে গেছে। এখন তারা দায়িত্ব অস্বীকার করবে কী করে? পঞ্চাশ সালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্বের কথা তো তারা স্বীকারই করে নিয়েছে। এখন সে-কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানি হিন্দুদেরকে কতো ধরনের মানসিক আশ্রয়ই না আঁকড়ে ধরতে দেখেছি! নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির অভিনব ব্যাখ্যার মতো হিন্দুরা আরেকটি বড়ো আশ্রয় ও আশ্বাসের কল্পসৌধ নির্মাণ করে নিয়েছিলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে। নেতাজীকে নিয়ে কতো ধরনের কল্পনারই না তারা বিস্তার ঘটিয়েছে! নেতাজীর মৃত্যুসংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করতো এ-রকম হিন্দু আমি পঞ্চাশের দশকের শেষেও খুব বেশি দেখিনি। নেতাজী অবশ্যই জীবিত আছেন এবং তিনি একদিন সশরীরে আবির্ভূত হয়ে খণ্ডিত ভারতকে আবার অখণ্ড করে তুলবেন, হিন্দু-মুসলমান আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে থাকবে না, পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান এই দু'রাষ্ট্রেরই অবলুপ্তি ঘটে যে নতুন রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হবে তার সর্বাধিনায়ক হবেন নেতাজী এমন ধরনের কল্পনার জাল শুধু অশিক্ষত-অর্ধশিক্ষিত হিন্দুরাই বুনতো না, অনেক 'সুশিক্ষিত' হিন্দুও এ-রকম জাল বোনায় শরিক হতো। এ-সময়েই হঠাৎ খবর রটে গেলো যে, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার শৌলমারিতে এক অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন সাধুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই সাধু আর কেউ নন, ইনিই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। লাখ লাখ লোক প্রতিদিন যাচ্ছে এই সাধু সন্দর্শনে এবং তারা সকলে এমন সব নিদর্শন দেখে আসছে যাতে 'অকাট্য' প্রমাণ মিলছে যে সাধু রূপেই নেতাজী আবির্ভূত হয়েছেন! নেতাজীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রও না-কি শৌলমারিতে গিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে এসেছেন যে, এই সাধুই তারা কাকা অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু। অতএব, আর ভয় নেই! নেতাজী এবার এসেছেন আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে! তার এই আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে পরাভূত হবে সব আসুরিক শক্তি!! 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বলে যে আশ্বাসবাণী দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছিলো, কলিযুগে তাই বাস্তব হয়ে উঠবে সুভাষচন্দ্রের মধ্যদিয়ে।

লোকসেবক নামে একটি বাংলা দৈনিক আসতো কোলকাতা থেকে। সেই লোকসেবকে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো শৌলমারিতে সাধুরূপে আবির্ভূত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র (!) সম্পর্কে। প্রতিদিনই এই প্রতিবেদনে রহস্য রোমাঞ্চে ভরা নানা ঘটনা ও রটনার কথা থাকতো। নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ শহরে হিন্দুদের কয়েকটি দোকানে *লোকসেবক* আসার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতে দেখেছি। কে কার আগে শৌলমারির সাধুর খবর জেনে নেবে, জেনে সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিক শক্তিতে আবির্ভাব সম্পর্কে নিঃসংশয় হবে। এমনিভাবেই হিন্দুরা যুগে যুগে অবতারবাদের কিংবা অবতার-প্রতিম মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে শক্তি ও স্বস্তি পেতে চেয়েছে। সেই চিরাচরিত পথ ধরেই তারা, বিংশ শতকের মধ্যপর্বেও, সুভাষচন্দ্রের মতো সেক্যুলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আধ্যাত্মিক রহস্যময়তায় মুড়ে প্রায়-অবতার বানিয়ে ছেড়েছে।

এ-সময়ে আরেকজন মনীষীরও অবতারত্বের কথা বেশ জোর প্রচার পেয়ে যায়। তিনি শ্রীঅরবিন্দ। অরবিন্দ অবিশ্যি ঋষি অরবিন্দ পরিচয়েই আগে থেকে পরিচিত, কাজেই তার পক্ষে অবতার হয়ে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে মজার কথা হলো, পাকিস্তানি হিন্দুদের কাছে অরবিন্দের অবতার রূপটি প্রকটিত হয়েছিলো তার জীবনাবসানের পরে। বাল্যকাল থেকেই ইউরোপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অরবিন্দ, সকলকে অবাক করে দিয়ে, চিত্তাচেতনায় হয়ে ওঠেন ঘোর প্রাচ্যপন্থী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিন্দু। উনিশ শো পাঁচ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হওয়ার পরই তিনি হঠাৎ করে হয়ে গেলেন যোগী ও ঋষি, ফরাসি-অধিকৃত পণ্ডিচেরিতে আশ্রম স্থাপন করে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলেন তার ঋষিত্বের বিভূতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাকে শ্রদ্ধা জানালেন 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' বলে। সেই অরবিন্দ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন উনিশশো পঞ্চাশ সালে। এরপর 'শ্রীমা' নামে পরিচিতা এক ফরাসিনী হলেন তাঁর উত্তর-সাধিকা। অরবিন্দের লোকান্তরিত আত্মার সঙ্গে নাকি শ্রীমার ছিলো সার্বক্ষণিক সংযোগ এবং তারই মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিলো শ্রী অরবিন্দের এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা সে-সময়কার হিন্দুদের অনেককেই অপরিসীম আশাবাদে উজ্জীবিত করে তুলেছিলো। বাণীটি ছিলো এ-রকম: পাকিস্তান রাষ্ট্রটি টিকে থাকবে মাত্র দশ বছর। অর্থাৎ সাতচল্লিশের আগস্টে যে পাকিস্তানের জন্ম, সাতান্নর আগস্টে বা তার আগেই ঘটবে তার মৃত্যু।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটির খুব ব্যাপক প্রচার ঘটেছিলো কি-না জানি না। তবে আমি দেখেছি, আমাদের আশপাশের কয়েকটি গ্রামে মোটামুটি লেখাপড়া জানা হিন্দুদের মধ্যে এ-বাণীটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো। পণ্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত *শ্বভূত* নামে একটি মাসিক পত্রিকা আসতো। সে-পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষেই মুদ্রিত থাকতো পাকিস্তানের মৃত্যু সম্পর্কীয় অরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণীটি। নন্দীগ্রামের কৈলাস দাস পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে হিন্দুদের ছোটখাটো বৈঠকে ওই বাণীটির ব্যাখ্যা করতেন, আর হিন্দুরা অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিনাশ-সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে যে তাদের ভিনদেশে পাড়ি জমাতে হবে না, অরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণীটি তাদের মনে এ-রকম আশ্বাসের সঞ্চার ঘটিয়ে এক ধরনের প্রশান্তি এনে দিতো।

কিন্তু উনিশশো সাতান্নর আগস্ট মাস চলে গেলো, অথচ পাকিস্তান যথারীতি টিকে রইলো এবং স্বভাবতই, ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসীদের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে গেলো। দেখা দিলো হতাশাও।

অবিশ্যি অলৌকিকতায় বিশ্বাস যাদের নিশ্ছিদ্র তাদের কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণীটির একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খাড়া করে বলতে লাগলো যে, 'আসলে মহাপুরুষের বাণীর স্থূল অর্থ করা ঠিক নয়। এ তো 'সূক্ষ্ম' জগতের ব্যাপার। সূক্ষ্ম জগতে পাকিস্তানের মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটে গেছে, আমরা স্থূল দৃষ্টি দিয়ে তা দেখতে পাচ্ছি না মাত্র।'

এ-রকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বিপুলসংখ্যক মানুষের আধিভৌতিক দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে না। তবু অনেক মানুষই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করে প্রাকৃত দুঃখ অতিক্রমণের স্বপ্ন দেখে, একটা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলে অন্য আরেকটা বিশ্বাসে আশ্রয় নেয়। সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হিন্দুদের একেক গোষ্ঠীকে দেখেছি একেক ধরনের বিশ্বাসকে ধরে আশ্রয় ও আশ্বাস খুঁজতে। অরবিন্দ-ঘরানার মতো অন্য সব সাধু, সন্ন্যাসী, গুরু বা 'অবতারপুরুষ'দের ঘিরে গড়ে ওঠা ঘরানার অনুবর্তীরাও পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে নানা ধরনের ধারণা ও বিশ্বাসে আশ্বস্ত হতে চাইতেন। স্বরূপানন্দ নামক একজন ধর্মগুরু সম্পর্কে লেখা একটি বইয়ে পড়েছি: তিনি নাকি উনিশশো একান্ন সালেই বলেছিলেন যে, পাকিস্তান টিকে থাকবে আর মাত্র বিশ বছর। গুরুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ায় শিষ্যদের গুরুভক্তি গাঢ়তর হয়েছিলো নিশ্চয়।

সাতান্ন/ আটান্ন সালে ময়মনসিংহে শৈলেন রায়ের বাসা আর নয়াজামানা পুথিঘরের রাজনৈতিক আড্ডার বাইরে আমার অরাজনৈতিক আড্ডাও ছিলো কয়েকটি। সে-সব আড্ডায় আমার সঙ্গী হতো শচীন আইচ। ইংরেজি ভাষায় শচীনের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তার সারল্য ও অকপটতা অচিরেই আমাকে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত করে ফেললো। তার পুরোনো বন্ধুদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় ঘটলো এবং দেখলাম যে, শচীনের মতোই তারাও প্রায় সবাই রাজনীতি-অনীহ ও গতানুগতিক ভাবনার অনুসারী, তবে ব্যবহারে অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। শচীনের এ-রকম একজন পুরোনো বন্ধু ভূদেব আচার্যের সঙ্গে একদিন কথা হলো। ভূদেবের বড়ো ভাই বিভূতির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিলো। দেখলাম: বিভূতির মতো ভূদেব মোটেই রাজনীতিমনস্ক নয়, তবে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। সকল পরীক্ষায় তার খুবই ভালো রেজাল্ট।

কী একটি সরকারি চাকুরির জন্য সে দরখাস্ত করেছিল। ইন্টারভিউও দিয়েছিল। ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রথমেই নাকি তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তুমি তো হিন্দু, তবে তুমি ভারতে যাও নি কেন?'

প্রশ্নটি শুনেই সে তেতে উঠেছিলো। তবু নিজেকে সংযত করে প্রশ্নের উত্তরে সে-ও ছোট্ট একটু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলো, 'কেন যাবো বলুন তো?'

তখন ইন্টারভিউ বোর্ডের আরেকজন তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু খুবই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ঠিক নয় কি?"

এবার আর ভূদের সংযত থাকতে পারলো না। বললো, "জওহরলাল নেহেরু একজন খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি—কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি জানি না, তিনি 'আপনাদের প্রধানমন্ত্রী' কী না।"

ইন্টারভিউয়ের এই অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করে সেদিন আমাদের আড্ডায় ভূদের আরো অনেক কথা বলেছিল। পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি অমানবিক ও অপমানকর আচরণের যে-সব তথ্য সে তুলে ধরেছিল, তার একটিকেও অসত্য বলার কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু সে-সব তথ্যের ব্যাখ্যা যে-দৃষ্টিকোণ থেকে সে করেছিলো, সে-দৃষ্টিকোণটিকে কিছুতেই আমি

অনুমোদন করতে পারছিলাম না। অগ্রজ বিভূতির সঙ্গে অনুজ ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গির আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে-তফাৎটি কম্যুনিস্টের সঙ্গে অকম্যুনিস্টের।

যে-সব অরাজনৈতিক হিন্দুর সঙ্গে তখন কথা বলেছি তাদের সবার মধ্যে বিভূতি আচার্য কিংবা তার মতো কম্যুনিস্টদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিই প্রত্যক্ষ করেছি। পাকিস্তানি বিরূপ বাস্তবের ধাক্কায় সবাই আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ভাববাদী বিভ্রম ও প্রতিকারহীন হতাশায়।

জঙ্গী শাসকদের জংলী আইন

জন্মসূত্রে আমি হিন্দু। আমার এই হিন্দুত্ব নিতান্তই একটি ইচ্ছানিরপেক্ষ বাস্তবতা। কিন্তু এই বাস্তবতাকেই যদি চূড়ান্ত ভেবে নিতাম, হিন্দু পরিচয়টাকেই যদি সর্বসাধ্যসার মনে করতাম, তাহলে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থান যাওয়ার পথ খোঁজাটাকেই আমার সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে ধরে নিতে পারতাম। অথবা এমন কোনো ধর্মগুরুর সন্ধান করতাম যিনি আমাকে তার অলৌকিক শক্তি বলে পাকিস্তানের মৃত্যুর দিনক্ষণটি বলে দিতে পারেন এবং তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর পুরো আস্থা স্থাপন করে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে থাকার যন্ত্রণাকে একান্ত সাময়িক ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যেতাম। অথবা ত্রাণকর্তারূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নতুন অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় কল্পস্বর্গে বাস করতে পারতাম।

কিন্তু আমার পক্ষে এমন কিছুই করার আর উপায় রইলো না। কারণ, আধুনিক জ্ঞানবৃক্ষের যে ফল ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ, তাই খেয়ে আমি চিরকালের জন্যে হয়ে গেছি কল্পস্বর্গচ্যুত। এখন বাস্তবের রুক্ষ কঠোর মাটির বুকে আমি দণ্ডায়মান। ডায়ালেকটিক আমাকে শিখিয়েছে যে, এই বাস্তবকে বদলানোর কাজে হাত লাগানোই আমার দায়িত্ব এবং একা একা নয়, সংঘবদ্ধতার মধ্যদিয়েই সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। সংঘের অন্তর্গত থেকে 'আমার যেটুকু সাধ্য' সেটুকুই করে যেতে হবে আমাকে। খুব বড়ো কিছু রোমান্টিক কিছু করার দুঃসাহসী কল্পনা বাদ দিয়ে নিজের শক্তি ও সাধ্যের সীমার মধ্যে বিচরণ করাই উত্তম। যেহেতু আমি তখন ছাত্র, তাই ছাত্রদের নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়াই আমার জন্যে হবে স্বধর্মোচিত আচরণ, সে-কথাই আমাকে বোঝালেন আমার সে সময়কার রাজনৈতিক গুরুস্থানীয় কমরেডগণ।

ছাপ্পান্ন সালে যে ঐক্যের স্লোগান নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম, সে ঐক্য আর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কাজী আবদুল বারি ছাত্রলীগ ত্যাগ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। কাজী বারির ছাত্রজীবনেরও অবসান ঘটলো। কলেজ ছেড়ে তিনি পুরোপুরি সক্রিয় ও সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে যোগ দিলেন, ময়মনসিংহ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে গেলেন। এ অবস্থায় ময়মনসিংহ জেলায় ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলার ভার পড়লো আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী আবদুল কুদ্দুসের ওপর।

আমি তখন নতুন রাজনৈতিক দর্শনে দীক্ষা নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় রীতিমতো টগবগ করছি। আমাদের সময়ে কলেজগুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ধারা এখনকার চেয়ে অনেক পৃথক ছিলো। এখন যেমন ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রশিবির ইত্যাদি ছাত্র সংগঠনগুলো দলীয় ভিত্তিতে কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তখন এরকম

তো না। নির্বাচনের আগে আগেই ছাত্ররা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে প্যানেল পেশ করতো, একেকটি প্যানেলের সমর্থকদের নিয়ে একেকটি দল দাঁড়িয়ে যেতো। দলগুলোর নাম হতো এ ধরনের– ভাতী, সংহতি, অগ্রণী, জাগরণ ইত্যাদি। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত এসব ল লুপ্ত হয়ে যেতো। আবার পরের বছর নির্বাচন এলে নতুন করে দল গড়ার তোড়জোড় লতো। আনন্দমোহন কলেজে এ রকম একটা দল কিন্তু ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে গড়ে ঠেছিলো। অর্থাৎ অন্য দলগুলোর মতো এ দলটি কেবল ছাত্রসংসদ নির্বাচনের তাৎক্ষণিক য়োজনে সৃষ্ট হয়ে নির্বাচনের শেষে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। সারাবছর ধরেই এ দলের সদস্যরা াত্রদের মধ্যে আদর্শগত প্রচার চালিয়ে যেতো এবং দলটির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা রতো। এ দলটির নাম 'প্রগতি'। আমি যে বছর আনন্দমোহনে ভর্তি হই তার ছয়/সাত বছর াগে এ দলটির জন্ম হয়েছিলো। সেই থেকে প্রায় প্রতি বছর এ দলটিই কলেজ ছাত্র সংসদের ধিকাংশ আসন দখল করতো। বাম প্রত্যয়সম্পন্ন ছাত্ররাই এ দলটিতে সংগঠিত হয়েছিলো সে দলটিকে 'কম্যুনিস্ট' বলে গালি দিতো অনেকেই। 'প্রগতি'র সদস্যরা যে-সব স্লোগান তো, কথায় কথায় যে সব বাকবন্ধ উচ্চারণ করতো, তাতে তাদেরকে কম্যুনিস্ট বলার খুবই ঙ্গত কারণ ছিলো। সাতান্ন-আটান্ন সালে আমি ছিলাম 'প্রগতি' দলের একজন মুখর সদস্য। শেষ করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে যে-রকম আগুনঝরানো বক্তৃতা াম তাতে আমি তো একেবারে একজন পাক্কা কম্যুনিস্ট ব'নে গেলাম। নয়া জামানা খঘরের আড্ডা ও অজয়দা-জ্যোতিষদাদের সঙ্গে বৈঠক থেকে প্রগতি-ভাবনায় আমার যে ক্ষা হয়েছিলো, তাতে 'কম্যুনিস্ট' বলে আমাকে কেউ গালি দিলে মনে মনে বেশ পুলকিত ধ করতাম।

সেবার কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচনে 'প্রগতি' দল খুব সুবিধা করতে পারেনি। সাহিত্য-াদক, বার্ষিকী সম্পাদক এবং এ রকম আরো দু'একটি পদ প্রগতির দখলে থাকলেও সভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অন্য দলের তে চলে যায়।

আবদুল কুদ্দুস বললেন, 'এভাবে হবে না। ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রগতিশীল ধ্যানধারণা ড়িয়ে দেয়ার জন্যে উপযুক্ত সংগঠন চাই। ছাত্র ইউনিয়নকেই সে-রকম একটি সংগঠনরূপে ড় করাতে হবে। তাই ঠিক করেছি—ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটি মহকুমা শহরের লজগুলোতে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের শাখা গড়ে তুলবো। আগামী বিষ্যুৎবারে জামালপুর বা। চলো আমার সঙ্গে।'

আমি তো একে পায়ে খাড়া। ছাত্রলীগে কাজ করে ছাত্র সংগঠনের কাজের ধারা সম্পর্কে টুটা ধারণা এর মধ্যেই আমার গড়ে উঠেছিলো। খুব উৎসাহ নিয়ে কুদ্দুস ভাইয়ের সঙ্গে ামালপুর গেলাম।

জামালপুরের কমরেড আশুদত্ত আশেক মাহমুদ কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে াদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা জামালপুরে ছাত্র ইউনিয়ন নের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেললাম। স্থির হলো: অক্টোবর মাসে (আটান্ন সালের) রা আবার জামালপুর যাবো এবং সমমনা ছাত্রদের একটি সাধারণ সভায় ছাত্র ইউনিয়নের ালপুর শাখা প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হবে।

কিন্তু হায়, সেই অক্টোবর এলো ভিন্ন মূর্তি ধরে। আটই অক্টোবর সকালে ঘুম থেকে উঠেই পাকিস্তানে মার্শাল ল' জারি হয়ে গেছে। সভাসমিতি সংগঠন সব নিষিদ্ধ। দু'বছর আগে

পাকিস্তানের গণপরিষদের গৃহীত সংবিধান বাতিল। দেশের রাজনৈতিক নেতারা কেউ গৃহবন্দি, কেউ কারাবন্দি। রেডিওতে বেত্রদণ্ড, জেল, জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ঘোষণা শুনে শুনে মানুষের রক্ত হিম হয়ে এলো। চার দেয়ালের মধ্যেও কেউ মন খুলে কথা বলার সাহস পায় না।

নয়াজামানা পুঁথিঘরে পুলিশ এসে তালা লাগিয়ে দিলো। রতুবাবু গ্রেফতার হলেন। অজয় দা, জ্যোতিষ দা, আলতাব আলী এবং এ-রকম অন্যসব কমরেড আত্মগোপন করলেন। আমাদের সবকিছু ছত্রখান হয়ে গেলো।

সাত অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার ঘোষণায় সামরিক আইন জারি হয়েছিলো, আর সাতাশ অক্টোবর সেই মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাপতি আইউব খান হলেন পাকিস্তানের হর্তাকর্তা বিধাতা। আরো কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা হলেন তার সহযোগী। জঙ্গীদের হাতে জংলী আইনের চললো অবাধ ব্যবহার। সে আইনের প্রথম কাজই হলো মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়া। অর্থাৎ 'ওরা ভয় দেখিয়ে করছে শাসন, জয় দেখিয়ে নয়।' চিরাচরিত অভ্যাসমতো রাস্তার পাশের নর্দমায় হয়তো একজন বসে গেছে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে, অমনি তার পিঠে পড়ে যাচ্ছে ডাণ্ডার বাড়ি। কারো ঘর বা দোকানের সামনে কিছু আবর্জনা জমে রয়েছে, ডাণ্ডা মেরে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে করা হচ্ছে জরিমানা। কারো মাথায় লম্বা চুল, তার পিঠে লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে দু'ঘা। কেউ রাস্তার ডান দিকের বদলে বাঁ দিকে হাঁটছে, তারও সেই দশা। ফরমান জারি হচ্ছে: প্রত্যেকের ঘরের দেয়ালে সাঁটা বিভিন্ন পোস্টার কিংবা কালির লিখন তুলে ফেলতে হবে বারো বা ষোল ঘণ্টার মধ্যে, বাড়ির সামনের গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে এক্ষুণি, দোকানে প্রতিটি পণ্যের মূল্যতালিকা টানিয়ে দিতে হবে এই মুহূর্তে ...। আদেশ অমান্যকারীকে কী ধরনের কঠিন কঠিন শাস্তি পেতে হবে তাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দুর্গাপূজার ছুটি হলো। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গেলাম। দেখলাম: গ্রামেও জঙ্গী আইনের আতঙ্ক আছে, তবে শহরের মতো নয়। গাঁয়ের মানুষেরা বরং জঙ্গী আইন জারি হওয়াতে বেশ খুশি হয়েছে বলেই মনে হলো। তারা হাজামজা পুকুরের সংস্কারে লেগে গেছে ও কচুরিপানা ধ্বংস করছে। জঙ্গল পরিষ্কার করার নামে, কিছুটা ভয়ে এবং কিছুটা উৎসাহের প্রাবল্যে, বড়ো বড়ো ফলবান বৃক্ষও কেটে ফেলছে। শহরে গিয়ে তারা অনেকেই জঙ্গী আইনের প্রয়োগ দেখে এসেছে, সেখানে জঙ্গী শাসনের অনেক সুফল দেখতে পেয়েছে। তারা দেখেছে: শহরের রাস্তাঘাট আর বাড়িঘরের দেয়াল সব ঝকঝকে পরিষ্কার, দোকানে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে দরাদরি করতে হয় না, নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিসের দাম কমে গেছে, দুধে কেউ জল মিশায় না, অসাধু ব্যবসায়ীরা সব সন্ত্রস্ত, অফিস-আদালতের কাজকর্মেও ঘুষের আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে, ট্রেনে কোনো বিনা টিকিটের যাত্রী নেই। হ্যাঁ, আটান্ন সনে মার্শাল ল জারির সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত অল্পদিনের জন্যে হলেও, এরকম বেশ কিছু কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন জনসাধারণ সত্যি সত্যিই প্রত্যক্ষ করেছিলো এবং এ-রকম প্রত্যক্ষ করে জঙ্গী নায়ক আইউব খানকে যে তারা সোল্লাস ও সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছিলো, সে-কথাও অস্বীকার করা যাবে না। পল্লীগানের আসরেও তাদের উল্লাসের প্রকাশ আমি দেখেছি। এক বয়াতিকে আসরে উঠে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গানে জঙ্গী শাসনের দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেও শুনেছি। তার সেই গানের একটি ছত্র আজো আমার মনে পড়ে—'টিটি সাবের গরম পকেট হইয়া গেছে ঠাণ্ডা'। টিকিট না করে ট্রেনে উঠতে যে টিটিরা যাত্রীদের

উৎসাহিত করতো এবং এই বিনা টিকিটের যাত্রীদের কিছু সুবিধা দিয়ে তাদের কাছ থেকে আদায় করা পয়সায় নিজেদের পকেট গরম করতো, আইউবের জঙ্গী শাসন সেই টিটিদের গরম পকেট ঠাণ্ডা করে দিয়েছে বলে পল্লীর এই বয়াতিটি খুবই উল্লসিত হয়েছিলেন।

এ-ধরনের উল্লাস অবশ্যই বেশিদিন টেকেনি, সামরিক শাসন সম্পর্কে জনগণের মোহমুক্তি ঘটতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। তবু, রাজনীতিকদের গণবিরোধী আচরণই যে জনগণকে রাজনীতি-বিতৃষ্ণ করে তোলে, এবং এরকম রাজনীতি-বিতৃষ্ণ জনগণই যে স্বৈরাচারকেও স্বাগত জানিয়ে বসে—এই বেদনাদায়ক সত্যটি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। স্বৈরাচারী আইউবের অভ্যুত্থানের পটভূমিটি তো রাজনতিকদের মতলববাজিতা, অবিমৃষ্যকারিতা, অদূরদর্শিতা ও সংকীর্ণতার মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছিলো। চুয়ান্ন সালে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে জনগণ মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতিকদের সমর্থন দিয়েছিলো, সেই রাজনীতিকরাই জনগণের সঙ্গে বেঈমানির চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলেন। রাজনীতিকদের চারিত্রিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই সামরিক বেসামরিক আমলাচক্র দেশের রাজনীতিকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে এসেছিলো। তারাই ইচ্ছেমতো রাজনীতিকদের ক্ষমতার মসনদে বসাতো ও মসনদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো। চুয়ান্ন থেকে আটান্ন—এই ক'বছরে পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে কতো বার যে সরকারের কতো রকম ভাঙাগড়া হয়েছে তার সঠিক হিসেবে দেয়া শক্ত। এমনও হয়েছে যে, সকালে যে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছে বিকেলেই সেটি ভেঙে গেছে, এসেছে অন্য আরেকটি। সে-সময়ে তো এ-রকম একটি কৌতুকই চালু হয়ে গিয়েছিলো :

সরকারি চাকরির এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?'

চাকরি প্রার্থীর জবাব, 'ঠিক বলতো পারবো না। কারণ, আমি আজ সকালে খবরের কাগজ পড়তে পারিনি।'

রাজনীতির এ-রকম অস্থিতিশীল অবস্থা তো ছিলোই। তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে যেদিন প্রচণ্ড মারামারি হলো, পরিষদের সদস্যদের হাতেই খুন হলেন ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী, সেদিন থেকে রাজনীতিকদের মর্যাদা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলো।

এই পটভূমিতেই রাজনীতিকদের অপসারণ করে ক্ষমতার মসনদ দখল করে বসে পাকিস্তানের জঙ্গী নায়করা এবং পেয়ে যায় আমজনতার সরব অথবা নীরব সমর্থনও।

তবে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে যেখানে যতো চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন তারা সবাই চিন্তিত হয়ে উঠলেন, জঙ্গীদের জংলী আইন দেশকে বর্বরতার কোন অতলে তলিয়ে দেবে সে কথা ভেবে তারা আতঙ্কিত হলেন।

ভীষণ আতঙ্কিত, ক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত হতে দেখলাম হেকিম ভাইকে। জঙ্গী শাসকরা প্রথমেই বড়ো আঘাত হেনেছে দেশের জনগণের শিক্ষার ওপর। শিক্ষা ব্যবস্থার 'আমূল' পরিবর্তনের লক্ষে তারা একটি শিক্ষা কমিশন বসিয়েছে। এই 'আমূল' কথাটা সম্পর্কে ঠাট্টা করে হেকিম ভাই বলেছিলেন, 'আমূল পরিবর্তন বলতে এরা আসলে বুঝেছে যে শিক্ষার মূলটিই উপড়ে ফেলতে হবে। জনগণ যদি সত্যি সত্যিই শিক্ষিত হতে থাকে, তবে কিছুতেই স্বৈরাচারী শাসন চালানো যাবে না। জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার উপায় খুঁজে বের করার জন্যেই তো এরা শিক্ষা কমিশন বসিয়েছে।'

কথাটার সত্যতা অবিশ্যি এসএম শরীফের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরই প্রমাণিত হলো। তবে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্যোগটির প্রথম প্রমাণ সামরিক শাসকরা রেখেছিলো আট্টান্ন সালের অক্টোবরেই এদেশের গ্রাম এলাকার অধিকাংশ হাইস্কুলের সরকারি স্বীকৃতি বাতিল করে দিয়ে। আমার ছোট ভাই মতীন্দ্র তখন বেখৈরহাটি হাইস্কুলে ক্লাস টেনে পড়তো। অর্থাৎ সে উনষাট সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। কিন্তু স্কুলের স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাওয়ায় সেবার আর তার পরীক্ষা দেয়া হলো না। এ-রকমই হলো গ্রামাঞ্চলের স্কুলের অগণিত ছাত্রের নিয়তি। আমাদের এলাকার বেখৈরহাটি, শাহাগঞ্জ, লক্কাখোলা, আশুজিয়া, নওপাড়া, সান্দিকোনা, তেলিগাতি—এ-রকম সব হাইস্কুলেরই 'এফিলিয়েশন' কেটে দেয়া হলো। কেবল বিভিন্ন থানা হেডকোয়ার্টারের কয়েকটি স্কুলের এফিলিয়েশন বজায় রাখা হয়েছিলো। বোঝা গেলো : গ্রামের সাধারণ মানুষের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখুক—সে-রকমটি পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের মোটেই অভিপ্রেত ছিলো না।

আশুজিয়া হাইস্কুলের এফিলিয়েশন কেটে দেয়ায় খুবই মর্মাহত হলেন আমাদের হেকিম ভাই। চুয়ান্ন সাল থেকে তিনি আশুজিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত চেয়ারম্যান (তখন এ পদটির নাম ছিলো 'প্রেসিডেন্ট')। চেয়ারম্যানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্কুলটির উন্নয়নে তিনি নানাভাবে সহায়তা করে আসছিলেন। এর দৈন্যদশা অনেক পরিমাণে কেটেও গিয়েছিলো। কিন্তু সামরিক শাসনের আঘাতে এখন তার অস্তিত্বই বিপন্ন।

মাত্র এক বছর আগে নবগঠিত রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সামরিক শাসন তার সেই নতুন রাজনৈতিক জীবনেরও ছন্দপতন ঘটিয়ে দিলো। তাই তার কথায় কেবল ক্ষোভ আর হতাশার সুর।

তবে আমার বন্ধু শাহিদ কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেও হতাশ হয়নি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও সে পথের অন্বেষণে বিরত রইলো না, আত্মগোপনকারী কম্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চললো।

গ্রাম বাংলায় শিক্ষার হাল হকিকত

উনষাট সালের জুনে বিএ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে গেলাম। এখন থেকে আমাকে রোজগারের পথে নামতে হবে, তা না হলে সংসারের চাকাটি আর ঘুরবে না।

আমাকে যিনি 'নাতি ছাত্র' বলতেন, সেই জয়চন্দ্র রায় আমাকে আশুজিয়া হাইস্কুলের মাস্টারিতে বহাল করে দিলেন। 'এফিলিয়েশন' কাটা যাওয়ার পর ইস্কুলটির অবস্থা খুবই করুণ। কুমুদ ভট্টাচার্য বছরখানেক আগেই এ-ইস্কুল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। হেড মাস্টার ক্ষিতীশ চক্রবর্তী আত্মহত্যা করেছেন। বাঁশহাটি গ্রামের আবদুল মজিদ যদিও এসেছেন নতুন হেড মাস্টার হয়ে, তবু তিনি নামেই হেডমাস্টার, সপ্তাহে দু'দিনও ইস্কুলে আসেন না। আর কেনই বা আসবেন? যেখানে মাসের শেষে দক্ষিণা পাবার নিশ্চয়তা নেই, কোনো ক্লাসেই দশ/বারো জনের বেশি ছাত্রের উপস্থিতি নেই, মাসের পর মাস চলে গেলেও কোনো ছাত্রের মাইনে দেবার গরজ নেই, সে-ইস্কুলের হেডমাস্টার ইস্কুলে এসে কী করবেন? তবে শুনেছি : সপ্তাহে সপ্তাহে তিনি ঢাকা যান, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আর ডিপিআই অফিসে ধর্না দেন, ইস্কুলের এফিলিয়েশন পাবার জন্যে তদবির করেন। বছর শেষ না হতেই মার্শাল ল'র দুর্নীতি

বিরোধী ভাবমূর্তি শেষ হয়ে গেছে, আবার সেই তদবিরের দিন ফিরে এসেছে, তদবির করেই ইস্কুলের এফিলিয়েশন ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই, বরাবরের মতোই ইস্কুলের পড়াশোনার ব্যাপারে সবকিছু জয়চন্দ্র বাবুকেই সামাল দিতে হয়। এ জন্যেই আমাকে তার সহকর্মি শিক্ষক বানাতে পেরে জয়চন্দ্র বাবু খুবই খুশি হলেন। কিন্তু তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি খুব আশাবাদী হয়ে উঠতে পারলেন না। আমিও আমার মাতৃপ্রতিম এ বিদ্যামন্দিরটি (আলমা মেটার) সম্পর্কে আশাবাদ পোষণ করার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না। একে তো ইস্কুলের এফিলিয়েশন পাওয়ার বিষয়টিই অনিশ্চিত হয়ে আছে। এফিলিয়েশন না পেলে কেউ এখানে থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারবে না, আর তা না পারলে কোনো ছাত্রই এ ইস্কুলে পড়বে না। আবার এফিলিয়েশন পেলেই যে ইস্কুলের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজেই, আমার নিতান্ত ব্যক্তিস্বার্থের বিবেচনাতেও—অর্থাৎ আমার দরিদ্র পিতার সংসারের চাকায় কিঞ্চিত তেল জোগানোর ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও—আশুজিয়া ইস্কুলটিকে খুব প্রশস্ত মনে হলো না।

জয়চন্দ্র বাবুকে কখনো সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতে শুনিনি। কিন্তু এবার সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে অনেক কড়া কড়া কথা বলে গেলেন তিনি।

'ওরা কলমের এক খোঁচায় ইস্কুলের এফিলিয়েশন কেটে দেয়, কিন্তু আশুজিয়া ইস্কুলের মতো একেকটি ইস্কুল গড়ে তুলতে গ্রামাঞ্চলের মানুষরা যে কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে ওরা কি তার কোনো খবর রাখে? পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কিংবা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের টাকায় এ সব ইস্কুল খোলা হয়নি। কোনো গভর্নমেন্ট এসব ইস্কুল চালানোর জন্যে কোনো পয়সা খরচ করেনি।

'গাঁয়ের মানুষরা যেমন ইস্কুলের জন্যে জমি দিয়েছে, ঘর করে দিয়েছে, আসবাবপত্রের জোগান দিয়েছে, তেমনি আমরা অর্থাৎ গাঁয়ের ছেলেরাই শহর থেকে লেখাপড়া শিখে এসে ইস্কুলে প্রায় বিনা মাইনেয় মাস্টারি করেছি। গাঁয়ে গাঁয়ে এ ইস্কুলগুলো যদি গড়ে না উঠতো, তবে দেশের নানা জায়গায় এতো সব সচেতন শিক্ষিত লোকের দেখা মিলতো না; স্বদেশী আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠতো না, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের এতো সিপাইও কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। আর আজ কিনা বন্দুকের জোরে ক্ষমতায় বসে একদল অর্বাচীন এসব ইস্কুলকে 'ব্যাঙের ছাতা' বলে বিদ্রূপ করছে। সারাদেশে নাকি ব্যাঙের ছাতার মতো ইস্কুল গজিয়েছে। তারা এখন ব্যাঙের ছাতা সাফ করতে চায়। বদমাশ আর কাকে বলে!...যাদের ঘাড়ে পা দিয়ে ওরা পাকিস্তান বানিয়েছে তাদেরই ছেলেপুলেদের ওরা এখন মূর্খ করে দেবার মতলব এঁটেছে, জাতিটাকে অশিক্ষিত করে রেখে নিরাপদে রাজত্ব করতে চাইছে।...এ দেশের কপালে আরো অনেক দুর্ভোগ আছে।'

এসব কথার সূত্র ধরে বৃদ্ধ জয়চন্দ্র রায় তার বাল্যজীবনের কথায় ফিরে যান। গাঁয়ের গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে শহরে গিয়ে কতো কষ্টে লেখাপড়া শিখেছেন সে-সব বলতে বলতে তিনি স্মৃতিতাড়িত হয়ে ওঠেন। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধকে কথায় পেয়ে বসে। আশুজিয়া, নওপাড়া, সান্দিকোনা, কেন্দুয়া—এমন সব হাইস্কুলের জন্মবৃত্তান্তসহ ইতিহাস বর্ণনা করে যেতে থাকেন। আশুজিয়া আর নওপাড়া—দুটোই ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রাম। আশুজিয়ার লোকেরা যখন গাঁয়

ইস্কুল বানিয়ে ফেললো, নওপাড়ার মানুষদের তখন তা প্রেস্টিজে ঘা দিলো। তারাও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়েই স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে লাগলো। এ প্রতিযোগিতার গল্প শুনতে শুনতে আমার বারবার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মাস্টার মহাশয়' গল্পটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো। সেই গৌসাইগঞ্জ আর নন্দীপুর দুই গাঁয়ের মানুষের ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা, এক গাঁয়ের ব্রজ মাস্টার ও অন্য গাঁয়ের হারান মাস্টারের মধ্যে বিদ্যার লড়াইয়ের কৌতুককর কাহিনী। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পটির হাস্যরসের অন্তরালে নিহিত আছে যে সমাজসত্য সেটি হচ্ছে: উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকেই গ্রামবাংলার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে ইংরেজি ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে, সে-কাজে গ্রামের সচ্ছল মানুষ তথা জোতদার- তালুকদাররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কোনো কোনো তালুকদার বা গ্রামীণ সামন্ত ভূস্বামী অবিশ্যি গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের কাজটি সুদৃষ্টিতে দেখেনি। ইস্কুলে পড়ে চাষাভুষার ছেলেদের চোখ খুলে গেলে তারা আর তালুকদারদের মান্যগণ্য করবে না—এরকম ভয় অনেকেরই ছিলো। সেইভয় থেকেই তারা গাঁয়ে ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছে। নেত্রকোনারই কোনো এক গাঁয়ের এ-রকম এক তালুকদারের কথা আমার বাবার মুখে শুনেছি। গ্রামের কিছু যুবক একটি ইস্কুল খোলার জন্যে সেই তালুকদারের কাছে চাঁদা চাইতে গেলে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'ইস্কুলের জন্যে কোনো চাঁদা আমার কাছ থেকে পাবে না, আমি এ-গাঁয়ে কোনো ইস্কুল হতে দেবো না। তার চেয়ে তোমরা বরং একটি যাত্রার দল বানাও, যা টাকা লাগে সব আমি দেবো।'

এ-রকম ইস্কুল-বিরোধী তালুকদার কিছু কিছু থাকলেও ওরা খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারেনি। গাঁয়ের প্রভাবশালী মানুষগুলো বরং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রমাণকে জোরদার করার জন্যেই গাঁয়ে ইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। ভিন গাঁয়ের সঙ্গে এ-রকমই একটি প্রতিযোগিতার কৌতুককর বিবরণ শুনেছিলাম সেদিন স্নেহভাজন প্রদীপ চক্রবর্তীর মুখে। প্রদীপদের গ্রাম শাখুয়াইয়ের দুটো পাড়া—বাগিশপুর আর রামনাথপুর। দু'টো পাড়ার মধ্যে দূরত্ব মাত্র ছশো গজের। অথচ, প্রভাত কুমারের 'মাস্টার মহাশয়' গল্পের গৌসাইগঞ্জ-নন্দীপুরের মতোই রামনাথপুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাগিশপুরের প্রভাবশালী তালুকদারের নেতৃত্বে একরাতে একটি ইস্কুল ঘর তৈরি হয়ে যায়।

যাই হোক, কথায় কথায় জয়চন্দ্র রায় সেদিন শুধু আশুজিয়া বা নওপাড়ার মতো গ্রামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করেননি, উনিশ শতকে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থাটি কেমন ছিলো তাও তার বর্ণনায় উঠে আসে। তার বর্ণনার সঙ্গে আমার বাবার মুখে শোনা অনেক কথা মিলিয়ে দেখে আমাদের এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমার একটা ধারণা গড়ে ওঠে। আমার বাবা এসব কথা শুনেছেন তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার ঠাকুর্দার মুখে। আমার ঠাকুর্দা তো একসময় নিজেই ছিলেন শিক্ষক—অর্থাৎ গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয়। সেই পাঠশালাটিও তার নিজেরই প্রতিষ্ঠিত। বলা যেতে পারে, গ্রামীণ শিক্ষা প্রসারে একজন নায়কের ভূমিকাই তিনি পালন করে গেছেন।

ঠাকুর্দার জন্ম সময়ে, আঠারো শো পঁয়ষট্টি সালে তখন নেত্রকোনা এলাকায় কোনো ইংরেজি ইস্কুল ছিলো না। আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে প্রতিষ্ঠিত 'ময়মনসিংহ জিলা ইস্কুল'ই ছিলো সে-সময়কার বিশাল ময়মনসিংহ জেলার একমাত্র ইংরেজিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দূরদূরান্তের গাঁয়ের খুব অল্প লোকেরই তাদের ছেলেদের ময়মনসিংহ শহরে রেখে পড়ানোর সামর্থ্য ছিলো। আমার ঠাকুর্দার, আমার বাবার এবং আমার জন্ম যে গ্রামে সেই চন্দপাড়ায়, তখন ঈশান দত্ত

একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। সেই পাঠশালাতেই ঠাকুর্দার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। সেকালের গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষের মতোই কোনো ইংরেজি ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। তবে নিজে নিজে প্রচুর পড়াশোনা করে বাংলা ও সংস্কৃতে তিনি কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে বলা যায় একজন যথার্থ স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত মানুষ। যৌবনে পাশের গ্রাম ভগবতীপুরে তিনি যে পাঠশালা খোলেন, সে পাঠশালায় বাংলা ও গণিত শিক্ষায় পাকা হয়ে কেউ কেউ শহরে গিয়ে ইংরেজি ইস্কুলেও ভর্তি হয়েছে। চন্দপাড়ার ঈশান দত্ত কিংবা আমার ঠাকুর্দা রামদয়াল সরকারের মতো দলপা গ্রামে ছিলেন গোবিন্দ দেব। এই গোবিন্দ মাস্টারের পাঠশালার খুব সুনাম ছিলো। সিংহের গাঁয়ের কুঞ্জ কিশোর পাল যে পাঠশালা খুলেছিলেন তারই ছাত্র ছিলেন জয়চন্দ্র রায়। বৃদ্ধ বয়সেও জয়চন্দ্র বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তার শিক্ষক কুঞ্জ কিশোর পালের নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি।

এসব গুরুমহাশয়দের পাঠশালারই কোনো কোনোটি পরে 'নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়'রূপে সরকারি অনুমোদন পেয়ে যায়। যেমন পেয়ে গিয়েছিলো আমার ঠাকুর্দার 'ভগবতীপুর পাঠশালা'টি। সেটিই আরো পরে হয় 'ফ্রি প্রাইমারি ইস্কুল'। তবে সে হচ্ছে অনেক পরের অর্থাৎ চল্লিশের দশকের গোড়ায় যখন শেরে বাংলা ফজলুল হকের চেষ্টায় বঙ্গদেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ঘটে তখনকার কথা। উনিশ শতকের শেষ, এমনকি বিশ শতকের একেবারে গোড়াতেও, গ্রামবাংলায় আধুনিক শিক্ষার প্রসার খুব কমই ঘটেছিলো।

নেত্রকোনায় মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারো শো বিরাশি সালে। সে-বছরই নেত্রকোনা শহরে খোলা হয় একটি মিডল ইংলিশ ইস্কুল। সেটিই পাঁচ বছর পরে, আঠারোশ সাতাশি সালে, পরিণত হয় হাইস্কুলে। এটিই নেত্রকোনার প্রথম ইংরেজি ইস্কুল। ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রখ্যাত লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের নামে এর নাম হয় 'দত্ত হাইস্কুল'। রমেশ দত্ত কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, তিনি ইস্কুলটির উদ্বোধন করেছিলেন মাত্র। তার মাধ্যমে সামান্য কিছু সরকারি আনুকূল্যও হয়তো ইস্কুলটির কপালে জুটেছিলো। এর বেশি কিছু নয়। আসলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো স্থানীয় লোকদেরই উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে। নেত্রকোনা শহরে উনিশ শো নয় সালে ন্যাশনাল হাইস্কুল (পরে যার নাম হয় চন্দ্রনাথ হাইস্কুল) ও চৌদ্দ সালে আঞ্জুমান হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাও ঘটে এরকম স্থানীয় জনগণের উদ্যোগেই। শহর থেকে গ্রামেও সে-রকম উদ্যোগের সম্প্রসারণ ঘটে এবং তারই ফলে উনিশ শো চৌদ্দ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আশুজিয়া হাইস্কুল। ক্রমে কেন্দুয়া, নওপাড়া ও সান্দিকোনার মতো গ্রামেও হাইস্কুল খোলা হতে থাকে। সেসব হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেই অনেকে ময়মনসিংহ, ঢাকা বা কোলকাতায় যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করতে। 'বাংলার বাঘ' নামে খ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তখন না-কি বলেছিলেন যে, বাংলার প্রতি ঘরে তিনি গ্রাজুয়েট তৈরি করবেন। প্রতি ঘরে না হোক, প্রায় প্রতি গ্রামে বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশক থেকে দু'একজন করে গ্রাজুয়েটের দেখা মিলতে থাকে। অথচ, উনিশ শতকের আশির দশকে নেত্রকোনার চন্দনকান্দি গ্রামের গিরীশ চৌধুরী যেদিন কোলকাতা থেকে বিএ পাস করে বাড়ি এসেছিলেন সেদিন নাকি দূরদূরান্তের বহু লোক তাঁকে দেখার জন্যে চৌধুরী বাড়িতে ভীড় করেছিলো। বিএ পাস করা একজন ব্যক্তি সেদিনকার গ্রামবাংলার মানুষের কাছে ছিলো একান্ত দুর্লভ বিস্ময়কর দর্শনীয় বিষয়। সম্ভবত গিরীশ চৌধুরীই ছিলেন আমাদের এলাকার প্রথম বিএ তথা গ্রাজুয়েট।

যেদিন আমার বিএ পরীক্ষার ফল বেরুলো এবং জানা গেলো যে আমি পাস করেছি, সেদিন জয়চন্দ্র বাবুর কী আনন্দ! পারেন তো তিনি আমাকে মাথায় তুলে নাচতে শুরু করে দেন! তার যে-কোনো ছাত্রের সামান্য কৃতিত্বেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। একালে এমন ছাত্রপ্রাণ শিক্ষক কেউ আছেন কি না সন্দেহ।

বেখৈরহাটি হাইস্কুলের এফিলিয়েশন কেটে দেয়ার পর উনষাট সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিতে পেরে আমার ছোট ভাই মতীন্দ্র সে-বছরেরই জানুয়ারিতে বারহাট্টা হাইস্কুলে ক্লাস টেনে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো। আমার বিএ পরীক্ষার ফল বেরোবার দু'দিন পরই সে আমার জন্যে বারহাট্টা হাইস্কুলের হেডমাস্টার আবদুল হাকিম সাহেবের একটি বার্তা নিয়ে বাড়িতে এলো। যদিও আবদুল হাকিম সাহেবের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিলো না, তবু তিনি তার ইস্কুলে একজন সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এ যেনো মেঘ না চাইতেই জল। থানা হেডকোয়ার্টারের একটি সচ্ছল হাইস্কুলে একশো পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি আমার জন্যে তখন একান্তই লোভনীয়। কিন্তু আশুজিয়া হাইস্কুলের প্রতি তো আমার একটি নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, সেটিকে উপেক্ষা করি কী করে?

জয়চন্দ্র বাবুকে বিষয়টি জানালাম। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, 'এ-রকম একটি সুযোগ ছেড়ে দেয়া তোর পক্ষে মোটেই ঠিক হবে না। আমাদের এ-স্কুলে যদি তোকে রাখা যেতো তাহলে সেটা আমার জন্যে হতো খুবই আনন্দের। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। এখানে পড়ে থাকলে তোর ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার, মাসের পর মাস খেটে যেতে হবে নামমাত্র বেতনে। তাই বলি, তুই বারহাট্টা ইস্কুলেই জয়েন কর।...তবে আরেকটা কথা। স্কুল মাস্টারিতেই যাতে জীবনপাত করতে না হয়, সেদিকটায় খেয়াল রাখবি। তোকে অবশ্যই এমএ পাস করতে হবে। বছরখানেক মাস্টারি করে কিছু পয়সা জমিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার চিন্তাটা মাথায় রাখিস।'

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কণ্ঠে আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। তার আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই বারহাট্টা হাইস্কুলে যোগ দিলাম।

'অগত্যা', গোলাম মোস্তফা ও রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর স্মৃতি

উনষাট সালের আগস্ট থেকে একষট্টির আগস্ট—দু'বছর ছিলাম বারহাট্টা হাইস্কুলে। এখানেই ছাত্র হিসেবে পাই নির্মলেন্দু গুণকে, পরে (অর্থাৎ ষাট/ সত্তরের দশকে) জননন্দিত কবিরূপে সারা দেশে যার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। উনষাটে নির্মলেন্দু ছিলো ক্লাস এইটের ছাত্র। বেশ মেধাবী। পড়াশোনার মতো দুষ্টামিতেও তার মেধার পরিচয় সে যখন-তখনই প্রকাশ করতো। আবার আবৃত্তি বা রচনা প্রতিযোগিতাতেও সমান উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতো এবং অনায়াসে পুরস্কার পেয়ে যেতো। কবিতাও অবশ্যই লিখতো। তবে, বাঙালি বালক বা কিশোরের কবিতা লেখাকে কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখা ছাড়া বড়ো কিছু বা সিরিয়াস কিছু বলে সাধারণত কেউ মনে করে না। আমিও না। কোন্ বাঙালি জীবনের এক পর্যায়ে কাব্যরোগে আক্রান্ত না হয়? আমিও তো হয়েছিলাম। বয়ঃসন্ধিকালের কবিতা লেখাকে আমিও তাই একটা অপরিহার্য ও সাময়িক রোগ বলেই মনে করতাম। সে-কারণেই বারহাট্টা হাইস্কুলের কিশোর ছাত্র নির্মলেন্দুর সেদিনকার কাব্যচর্চার মধ্যে ভবিষ্যতের কবি নির্মলেন্দু গুণকে শনাক্ত করতে পারিনি—আমার এ-অক্ষমতার কথা আমি নির্দ্বিধায় কবুল করি।

উনষাট সালে বারহাট্টা হাইস্কুলে আমি ছিলাম তরুণতম শিক্ষক। প্রবীণ সহকর্মিরা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, আমার তারুণ্যের প্রগলভতাকে প্রশ্রয়ও দিতেন। তারা আমাকে শিক্ষক সংসদের সম্পাদক নির্বাচিত করেছিলেন এবং স্কুলের প্রতিনিধি রূপে নানা কাজেকর্মে এখানে সেখানে আমাকেই পাঠাতেন। এ-সব ব্যাপারে আমারও ছিলো প্রচণ্ড উৎসাহ। সেই উৎসাহ নিয়েই আমি সে-বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতি'র কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। তিন দিনের সেই সম্মেলনের একটি দিন নির্ধারিত ছিলো ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারের জন্যে। সেই সেমিনারে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা।

গোলাম মোস্তফার কবিতার সঙ্গে তো আমরা পাঠ্যপুস্তকের কল্যাণে ছেলেবেলা থেকেই পরিচিত। ক্লাস টু-এ পড়ার সময়েই পড়েছিলাম তার 'বনভোজন' কবিতাটি। উপরের ক্লাসে উঠে পরিচিত হয়েছিলাম 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'—গোলাম মোস্তফা রচিত এই অবিস্মরণীয় পংক্তিটির সঙ্গে। ছাত্রজীবনেই তার 'বিশ্বনবী'র চমৎকার গদ্যশৈলী আমাকে মুগ্ধ করেছিলো।

অবিশ্যি পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই যে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের ক্রীড়নক হয়ে গিয়েছিলেন সে খবরও আমার জানা ছিলো। '*নওবাহার*' পত্রিকায় উর্দুভাষার পক্ষে তাঁর ওকালতি সেদিনকার প্রগতিশীল তরুণ সমাজকে একান্তভাবেই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলেছিলো। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ক্ষুব্ধ তরুণদের মুখপত্র *অগত্যা*য় গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে যে-সব অম্লমধুর মন্তব্য প্রকাশিত হতো সে-সবের সঙ্গেও আমি পরিচিত ছিলাম। *অগত্যা* তো গোলাম মোস্তফার নামই দিয়েছিলো 'গোলমাল মোস্তফা'। প্রায় প্রতি সংখ্যা *অগত্যা*তেই তার সম্পর্কে কোনো না কোনো টিপ্পনি থাকতোই এবং অনেক সময়ই তাতে শালীনতার সীমা লংঘিত হতো। একবার *অগত্যা*য় গোলাম মোস্তফার একটি কবিতার কয়েকটি লাইন ছাপা হলো–

'বেতারের খুঁটি এই নিশান মোদের, ইরাক আজম সাথে যোগ আছে এর'... এরপরই একান্ত ধৃষ্ট ও অশিষ্ট মন্তব্য : 'আমাদের ইচ্ছা হয় গোলমাল কবিকে এই খুঁটির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে মাথাটা ক্ষুর দিয়ে ভালো করে কামিয়ে তার ওপর গোল মতো একটা সুপুরি রেখে কাঠের খড়ম দিয়ে আস্তে আস্তে ভাঙতে।'

অগত্যা'র কোনো কপিই এখন আমার হাতে নেই। কিন্তু সে-সময়ে এ-পত্রিকায় প্রকাশিত চুটকিগুলো এতোবার করে আমি পড়েছি যে, সে-সবের অনেকগুলোই আমার মুখস্থ হয়ে যায়, এখনো আমি সেগুলো স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারি। জানি, স্মৃতি মানুষকে প্রায়শই প্রতারিত করে। আমি এখানে *অগত্যা* থেকে যে উদ্ধৃতি পেশ করলাম তাতেও হয়তো স্মৃতির প্রতারণাজনিত কিছু ভুল থেকে যেতে পারে তবু খুব বেশি ভুল যে নেই, এ-কথা জোরের সঙ্গেই বলতে পারি। অবিশ্যি *অগত্যা*'র কোন সংখ্যায় এটি ছাপা হয়েছিলো তা মনে নেই। *অগত্যা*'র সব কপি সংগ্রহ করে কোনো পরিশ্রমী গবেষক যদি এ-পত্রিকার লেখাগুলোর একটা নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেন, তবে সেটি হতে পারে আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

শুধু গোলাম মোস্তফা নয়, সে-সময়কার সকল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিক্রিয়াশীল কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কেই নানা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে *অগত্যা*'র পাতা ভর্তি

থাকতো। মওলানা আকরম খাঁর নাম দেয়া হয়েছিলো 'আক্রমণ খাঁ'। আকরম খাঁর পত্রিকা *আজাদ* ও *মোহাম্মদী*তে আরবি 'সিন' অক্ষরের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে 'স' না লিখে লেখা হতো 'ছ'। যেমন—ইছলাম, মোছলমান, ইছহাক ইত্যাদি। এ নিয়ে বিদ্রূপ করেই আকরম খাঁর পরিচয় দেয়া হয়েছিলো এভাবে—'মাছিক মোহাম্মদীর ছম্পাদক মওলানা আক্রমণ খাঁ।' একবার *অগত্যায়* এক পাঠকের একটি চিঠি ছাপা হয় (এ-পত্রিকায় পাঠকের চিঠি বলে যা ছাপা হতো তার সবই সত্যিকার পাঠকের লেখা কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। এমনও হতে পারে যে, সম্পাদকমণ্ডলীই কাল্পনিক পাঠকের নাম দিয়ে এ-সব চিঠি পত্রস্থ করে নিজেদের মনোমত জবাব লিখে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেন।) চিঠিটিতে বলা হয়েছিলো যে, এই পাঠক আকরম খাঁকে একটি পত্র লিখতে চান এবং পত্রে তাকে 'কলিজেশ্বর' বলে সম্বোধন করতে চান। কারণ বাংলার সঙ্গে উর্দু মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি তৈরি করে আকরম খাঁ তার 'প্রাণেশ্বর' হয়ে গেছেন। কিন্তু তাকে তো আর 'প্রাণেশ্বর' বলে সম্বোধন করা যায় না। তাই প্রাণেশ্বরের বদলে 'কলিজেশ্বর' লিখলে কেমন হয়, এই পাঠক *অগত্যা* সম্পাদকের কাছে সে-বিষয়েই পরামর্শ চাইছেন। উত্তরে সম্পাদক পরামর্শ দিয়েছেন:

> *'না, শুধু 'কলিজেশ্বর' লিখলে হবে না। লিখতে হবে—আয় মেরে গুলে চামান, নূরে দামান, আজাদ-কা-প্রোপ্রাইটার, বাংলা মে উর্দু মিশায়ে কা জগাখিচুড়ি বানানে কা এক নম্বর ওস্তাদ আক্রমণ খাঁ কলিজেশ্বর।'*

ফাজলামো ও ফাৎরামির জন্যে *অগত্যা* প্রচুর খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেছিলো। *অগত্যা* মানী লোকের মান হনন করছে—এ-রকম অভিযোগ ছিলো অনেকেরই। সন্দেহ নেই, তারুণ্যের উগ্রতার প্রকাশ *অগত্যা*'য় খুব বাড়াবাড়ি রকমেই ঘটেছিলো। তবু, 'ধমক দিয়ে ঠাসা' পাকিস্তানি শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে *অগত্যা* যে হালকা চালে গভীর সত্য কথা শুনিয়ে দেয়ার গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলো, শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অপ্রিয় সত্যকথনের সাহস জুগিয়েছিলো, আপাতশ্রুতিতে ধৃষ্ট ও অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করেই অনেক তথাকথিত মানী লোকের মুখোশ খুলে দিয়েছিলো—এসব কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

যাই হোক, যে কবি গোলাম মোস্তফার প্রতি শৈশবে আমার মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছিলো, অথচ *অগত্যা*'র পাতায় নানা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য পড়ে যার সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছিলো, শিক্ষক সমিতির সেমিনারে একান্ত কাছে থেকে সেই কবিকে দেখতে পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনে খুশি হতে পারলাম না। আমাদের সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে তিনি যে-সব কথাবার্তা বলেছিলেন সে-সব ছিলো একান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল। বক্তৃতার প্রথমেই তিনি সে-সময়কার তরুণ লেখকদের প্রতি তীব্র আক্রমণের শেল নিক্ষেপ করলেন। এঁদের বিরুদ্ধে তাঁর অনেক অভিযোগ। লেখায় এঁরা কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষার প্রতি এদের দারুণ অবজ্ঞা, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করে এরা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকে নষ্ট ও বিকৃত করে ফেলছে, পাকিস্তানের তাহজিব-তমদ্দুনের প্রতি এদের কোনো শ্রদ্ধা নেই। পূর্ব পাকিস্তানে সে-সময় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যেসব পরিভাষা তৈরি করা হয়েছিলো, সে-সবের বিরুদ্ধেও অনেক বিষোদগার করলেন। পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণেই এখানকার দেশপ্রেমহীন কিছু লোক এ-সব দুর্বোধ্য ও সংস্কৃত-কণ্টকিত পরিভাষা তৈরি করেছে বা সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করেছে। এ-সব বাদ দিয়ে আমাদের

অবশ্যই খাঁটি পূর্ব পাকিস্তানি পরিভাষা নির্মাণ করে নিতে হবে। সব শেষে তিনি এ-দেশের লেখকদের সহজ ভাষায় লিখতে ও পূর্ব পাকিস্তানি ভাষা ব্যবহার করতে উপদেশ দিলেন।

গোলাম মোস্তফার বক্তব্য সেমিনারে উপস্থিত তরুণ শিক্ষকদের পছন্দ হয়নি। তারা অনেকেই এর মৃদু প্রতিবাদ জানালেন। আমি সভয়ে ও সবিনয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুযায়ীই যে ভাষা কঠিন বা সহজ হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মন্তব্যের প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম। আর জিজ্ঞেস করেছিলাম—পূর্ব পাকিস্তানি ভাষা বলতে তিনি কী বোঝাতে চান? পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে কোনটিকে দিয়ে আমরা পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্য সৃষ্টি করবো?

সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সে- সময়কার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার এমএন নন্দী (মন্মথ নাথ নন্দী)। ডাক্তার নন্দী পরিভাষা সম্পর্কে গোলাম মোস্তফার বক্তব্য মেনে নিতে পারেননি। তিনি জানালেন যে, এখানকার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি নিজেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই তিনি জানেন : প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কাতেই পরিভাষা-সৃষ্টিতে নিযুক্ত কেউই পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতদের তৈরি 'পরিভাষা কোষ'গুলো আগে খুলেও দেখেননি। এরপরও যদি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমাদের তৈরি পরিভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তবে বলতে হবে যে দু'দেশের ভাষার অভিন্নতার জন্যেই এমনটি হয়েছে। বাংলা পরিভাষা সৃষ্টিতে সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ কেন অপরিহার্য তার ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও ডাক্তার নন্দী অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরলেন। ভাষাবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়ে একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর এমন গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সেমিনারের শ্রোতারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন, চট্টগ্রামের একজন শিক্ষক—মিলন প্রভাস বড়ুয়া। আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে সভাপতি দ্রুত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

গোলাম মোস্তফার সেদিনকার কথাগুলো অবশ্যই বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রমী কিছু ছিলো না। পাকিস্তানবাদীরা যদিও প্রতিনিয়ত জিন্নাহর উক্তি উদ্ধৃত করে বলতো যে, 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যেই এসেছে', তবু মনে মনে তারা বোধহয় সব সময়ই এই অস্বাভাবিক কৃত্রিম রাষ্ট্রটির বিনাশ-আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকতো। তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পেতো আবহমান বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে। বাঙালি সংস্কৃতির যে কোনো রকম অভিব্যক্তির মধ্যেই তারা পাকিস্তানের তাহজিব-তমদ্দুন ধ্বংসের আলামত দেখতে পেতো। আর পেতো হিন্দু গন্ধ। সারমেয়র চেয়েও তীক্ষ্ণ এদের ঘ্রাণশক্তি। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বানাতে না পেরে বাংলাকেই উর্দু বানানোর চেষ্টা, তাও না পেরে বাংলার হরফ বদলানোর কোশেশ, তাতেও ব্যর্থ হয়ে বাংলা হরফের সংস্কারের নামে সংহারের ষড়যন্ত্র—একের পর এক এ-সব তারা করেই চললো।

এলো উনিশ শো একষট্টি সাল। সারা পৃথিবী জুড়ে চললো রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন। কিন্তু যে বাংলা ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ, সেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অধিবাস যে ভূখণ্ডে, সেই পূর্ব পাকিস্তানেই রবীন্দ্রনাথকে অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করার মতো একটি চক্রের অভ্যুত্থান ঘটলো। পাকিস্তানে তখনো জঙ্গী শাসনই চলছে। জঙ্গী শাসকরা যদিও রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলো না, তবু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীর একটি দল মওলানা আকরম খাঁর *আজাদ* পত্রিকার ওপর ভর দিয়ে হাউমাউ শুরু করে দিলো। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুসলিম-বিরোধী, কাজেই মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে যারা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী নিয়ে মেতে উঠেছে তাদের

উদ্দেশ্য এই মুসলিম রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করে হিন্দু-শাসিত যুক্তবঙ্গের পথ খোলসা করা—এমন ধারা বক্তব্যের বান ছুটলো *আজাদ*-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে, নানা প্রবন্ধে-নিবন্ধে ও চিঠিপত্রে। *আজাদ*-এর এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দাঁড়ালো *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ*। বিশেষ করে ইত্তেফাক। আমরা দেখেছি : উনিশশো সাতান্ন সালে কাগমারি সম্মেলনকে উপলক্ষ করে *ইত্তেফাক* যে ভূমিকা নিয়েছিলো তা ছিলো আজাদের ভূমিকারই অনুরূপ। তার চেয়েও উগ্র বরং। *আজাদ* যে- রকম যে-কোনো প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে পাকিস্তান-ধ্বংস ও যুক্তবাংলা প্রতিষ্ঠার ভারতীয় চক্রান্ত দেখতে পেতো, *ইত্তেফাক*ও সেদিন ওই কাগমারি সম্মেলনের মধ্যে সে-রকমই দেখছিলো। সেদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান ছিলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৃত্তসীমার ভেতর। তাই সোহরাওয়ার্দী-সমর্থক ইত্তেফাকেরও কট্টর পাকিস্তানবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা। কিন্তু আটান্নর সামরিক শাসন ক্ষমতার বৃত্ত থেকে সোহরাওয়ার্দীর মতো রাজনীতিকদের দূরে সরিয়ে দেয়ার পর একষট্টিতে ইত্তেফাকের অবস্থানও স্বাভাবিকভাবেই অন্যরকম হতে বাধ্য। যে-কারণেই হোক, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে আজাদের তথা প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানবাদীদের রবীন্দ্র-নিন্দা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরোধিতাকে *ইত্তেফাক* যে-রকম প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করেছিল, ভাবীকালের বাঙালিকেও তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে, আমি তো মনে করি, আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত পাকিস্তানবাদী প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী ও তাদের মুখপত্র আজাদের প্রতিও। কারণ, আজাদের রবীন্দ্র-নিন্দার প্রতিক্রিয়াতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র শিক্ষিত সমাজে রবীন্দ্র-বিতর্ক অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক আলোচনার সীমা ছাড়িয়ে এ-বিতর্ক একটা রাজনৈতিক চারিত্র্য লাভ করে বসে এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশে এর ভূমিকা হয়ে পড়ে সুদূরপ্রসারী। প্রতিক্রিয়াশীলদের রবীন্দ্র-বিদ্বেষই এদেশে রবীন্দ্রচর্চার (অন্তত রবীন্দ্র-সচেতনতার)—বিবৃতি ঘটানোতে অনুঘটকের কাজ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন জনপ্রিয়তা যে একষট্টি সালের আগে ছিলো না—এ-কথা মানতেই হবে। প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি সেদিন এমন রবীন্দ্রবিরোধী ভূমিকায় প্রকাশ্যে অবতীর্ণ না হতো, তবে হয়তো আমাদের দেশে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ততো জোরদার হতো না, বড়জোর বিদগ্ধ সাহিত্যসেবী মহলেই তা সীমাবদ্ধ থাকতো। তার বদলে সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে তো বটেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত কয়েক মাসব্যাপী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জোয়ার বয়ে গিয়েছিলো। আমরাও বারহাট্টা ক্লাবে জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীকে ঘিরে ঢাকায় যে সব কর্মকাণ্ড চলেছিলো সে সবের বিবরণ আমরা নানা বইপুস্তকে পাই। কিন্তু বারহাট্টার মতো একটি স্থানে (যে স্থানটি আসলে একটি গ্রামই) রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনের রেকর্ড কি কেউ রেখেছে কোথাও? রাখেনি বলেই—কিংবা ইতিহাসকাররাও রাজধানীর বাইরের মানুষের ভাবনাচিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না বলেই—সমাজ ও সংস্কৃতির খণ্ডিত ইতিহাস নিয়েই আমাদের তুষ্ট থাকতে হয়।

আমি তখন বারহাট্টা ক্লাবের সাহিত্য-সম্পাদক। কাজেই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর আয়োজনের সঙ্গে আমাকে প্রত্যক্ষভাবেই সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়েছিলো। লক্ষ করেছি : থানা পর্যায়ের কিছু কিছু অফিসার ছিল ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল, তারা *আজাদ* পত্রিকার ভাষায় কথা বলতো। তবে হাজার চেষ্টা করেও তারা রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান বন্ধ করতে পারেনি। কারণ বারহাট্টায়

রবীন্দ্র-অনুরাগী তথা প্রগতিশীলদের পাল্লাই ভারি ছিলো। অফিসারদের অধিকাংশই ছিলেন প্রগতিপন্থী। তখন বারহাট্টা ক্লাবের সভাপতি ছিলেন সাব রেজিস্ট্রার আশরাফ হোসেন। উদারচিত্ত এ-মানুষটি সেদিন বারহাট্টা ক্লাবকে প্রতিক্রিয়াশীলদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নৃপেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীও ছিলেন একান্ত দৃঢ়চিত্ত সংস্কৃতিসেবী। এছাড়া ছিলেন আজিজুল ইসলাম খান, ওয়াজেদ আলী, আমজাদ আলী ও আলতাফুর রহমান খানের মতো ত্যাগব্রতী ও প্রগতিচেতন রাজনীতিক নেতাকর্মী। এরা সকলেই রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনকে একটা পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। নির্মলেন্দু গুণের মতো অনেক কিশোর ছাত্রের উৎসাহ-উদ্দীপনা তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানকেই একান্ত প্রাণবন্ত করে রেখেছিলো। মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন নেত্রকোনা মহকুমার তৎকালীন গণসংযোগ অফিসার মোফাজ্জল আলী। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকারের এমন একজন রবীন্দ্র-অনুরাগী কর্মচারীর সরস ও সজীব আলোচনা আমাদের সকলকে সেদিন অবাক করে দিয়েছিলো।

আইউব-বিরোধী আন্দোলনের বীজতলা তৈরি

বাষট্টি সাল পর্যন্ত মোটামুটি আরামেই রাজত্ব করলেন পাকিস্তানের জঙ্গবাহাদুর মোহাম্মদ আইউব খান। অন্তত প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন বা বিক্ষোভ হয়নি। সামরিক শাসন জারির মাত্র তিন মাস পরে, উনষাট সালের জানুয়ারিতে আদমজী জুটমিলের পঁচিশ হাজার শ্রমিক মালিকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে ধর্মঘট সংগ্রামে নেমেছিলো, সামরিক শাসনকর্তারা নৃশংস ও বর্বর দমননীতি চালিয়ে সে সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। আদমজীর পর অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের আন্দোলনও তারা দমন করেছিলো একই পদ্ধতিতে। ডাণ্ডা মেরে সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছি—এ রকম ভেবে আইউব আর তাঁর জঙ্গী চেলা চামুণ্ডারা বেশ আত্মপ্রসাদে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষজনও ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, আইউব খানকে গদি থেকে নামাতে পারে এমন কোনো বাপের বেটার জন্ম পাকিস্তানে হয়নি।

আইউব খানদের আত্মপ্রসাদ ও দেশের নাগরিককূলের হতাশা একেবারে অকারণ ছিলো না। আন্দোলন-সংগ্রামের জন্যে যাদের ওপর মানুষ ভরসা করে সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্লীবতা আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। জঙ্গি আইনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর কোনো রাজনৈতিক দলই সে আইন অমান্য করতে সাহসী হয়নি। প্রকাশ্যে তো নয়ই, গোপনেও নয়।

তবে ব্যতিক্রম তো নিশ্চয়ই ছিলো। কেউ-না-কেউ কোথাও-না-কোথাও হয়তো জঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে কোনো-না-কোনোভাবে প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ রকম কোনো প্রতিবাদকারীর খবর আমার জানা ছিলো না। ব্যতিক্রমী হিসেবে আমি শুধু জানতাম কম্যুনিস্টদের। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানে কম্যুনিস্টরা যে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলো না, সে তো সবাই জানে। প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ থেকে তারা বহুদিন থেকেই ছিলো বঞ্চিত। তবু সে সময়কার পূর্ব পাকিস্তানে অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনেরই কম্যুনিস্টদের চেয়ে বেশি সংহত সাংগঠনিক শক্তি ছিলো না।

যদিও কম্যুনিস্টদের গোপন তৎপরতা তখনো পর্যন্ত ফলপ্রসূ কিছু করে উঠতে পারেনি, তবু তাদের সাধ্য মতো ভবিষ্যতের আন্দোলনের বীজতলা তৈরির কাজে নিজেদের তারা নিযুক্ত

রেখেছিলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। বীজতলা তৈরির খবরটি আমার কাছেও পৌঁছে গিয়েছিলো। পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন দু'জন মানুষ। একজনের নাম আজিজুল ইসলাম খান, অন্যজন শাহ আবদুল মোতালেব ওরফে সুরুজ মিঞা। সুরুজ মিঞার সঙ্গে আমি অনেক আগে থেকেই পরিচিত। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল ছয়েক দূরে বায়রাউরা গ্রামে তাঁর বাড়ি। আমার বন্ধু আবদুস শাহিদের সঙ্গেই নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁকে দেখেছি। যদিও তিনি প্রথমে আওয়ামী লীগ ও পরে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁর রাজনীতির মূলটি প্রোথিত ছিলো নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন গভীরে। বারহাট্টার কাছাকাছি গ্রাম যশমাধবের অধিবাসী আজিজুল ইসলাম খানেরও তাই। বারহাট্টায় গিয়েই, উনষাট সালে, আজিজুল ইসলাম খানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন বারহাট্টা হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, বারহাট্টা ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান, এলাকার নানা ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তার সক্রিয় ভূমিকা।

এরা দু'জনে মিলেই কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন স্রোতধারাটির সঙ্গে, খুব ক্ষীণ হলেও, আমারও একটা যোগসূত্র তৈরি করে দিলেন। পার্টির সাইক্লোস্টাইল করা মুখপত্র *শিখা* নিয়মিত আমার হাতে আসতে লাগলো। *শিখা*'র পাতা থেকেই পার্টির বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে থাকলাম। জানলাম: সামরিক শাসন জারির কিছুদিন পরই কম্যুনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যালোচনায় বসে। সে বৈঠকে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণগুলোও খতিয়ে দেখা হয়। পার্টি লক্ষ করে যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ সংকটে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কায়েমি স্বার্থের রক্ষক গোষ্ঠীটি যে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না, এ রকম ধারণা তারা করে ফেলতে পেরেছিলো। তাদের প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও ছিলো শঙ্কাকুল। এ-সব লক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটি তার প্রস্তাবে বলে :

'ইরাক বিপ্লব ও বাগদাদ চুক্তির সঙ্গে ইরাকের সম্পর্কচ্ছেদের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধচক্রান্তে এক সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। সে অবস্থাতে ঐ যুদ্ধচক্রান্তে পকিস্তানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তাই তখন পাকিস্তানে সামরিক জোট বিরোধী আন্দোলন দৃঢ় হাতে দমন করা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেও প্রয়োজন হয়েছিলো। অতএব, শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীই নয়, পরন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের 'গ্লোবাল স্ট্রাটেজি' তথা যুদ্ধ চক্রান্তের স্বার্থেও পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিলো।'

[দ্রষ্টব্য : খোকা রায়ের '*সংগ্রামের তিন দশক*' (ঢাকা-১৯৮৬) পৃষ্ঠা-১৭৫]

এই সামরিক শাসনের অবসান যারা চায় তাদের ঐক্যবদ্ধ করার একটা তাগিদ কম্যুনিস্ট পার্টি অনুভব করেছিলো। সেই তাগিদ থেকেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, রাজবন্দিদের মুক্তি এবং খেটে খাওয়া মানুষের আশু ও জরুরি সমস্যার সমাধান—এ রকম কিছু ন্যূনতম দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যমোর্চা গঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাটাই পার্টি তার সদস্য, কর্মি ও সমর্থকদের সামনে তুলে ধরেছিলো।

কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বেশ দ্রুত গতিতেই পার্টির কর্মি ও সমর্থকরা জেনে যায়, তাদের হতাশা কেটে যেতে থাকে, সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। এ সব তৎপরতা চলতো কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে। অন্যের কাছে তো দূরের কথা, কোনো

কর্মি বা সমর্থকের সামনেও পুরো তৎপরতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতো না। *শিখায়* যা পড়তাম (কিংবা সাধারণ কর্মিদের জন্যে প্রচারিত পার্টির কিছু সার্কুলারের মধ্যে যা পেতাম) তার বাইরে কোনো কিছু, এমনকি আমার বিশ্বস্ত বন্ধুদের কর্মতৎপরতার বিষয়ে, জানাও তখন আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তবু টের পেলাম : আবদুস শাহিদ পার্টির কাজের সঙ্গে বেশ গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, বেশকিছু নতুন কর্মি রিক্রুট করেছে, অনেক কট্টর কম্যুনিস্ট বিরোধীকেও কম্যুনিস্ট সমর্থক বানিয়ে ফেলেছে, অত্যন্ত শান্ত ও প্রায় গোবেচারা ধরনের আবদুল মতিনকেও সে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। কুনিহাটি গ্রামের মৌলবী আবদুল গনি সাহেবের পুত্র আবদুল মতিনকে তো আমি তার বাপের মতো গোঁড়া মুসলমান বলেই জানতাম। সেই মতিনকে কম্যুনিস্ট বানিয়ে ফেলা মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ, আমার মতো আরো অনেককে অবাক করে দিয়ে শাহিদ সেই প্রায় অসম্ভব কাজটিই করে ফেলে। আর কম্যুনিস্ট রূপে মতিন সে সময় নানা কাজে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে থাকে।

দীননগর গ্রামের আবদুল আজিজ শুধু একজন কৃতী শিক্ষকই ছিলেন না, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও সাধারণ্যে তাঁর পরিচিতি ছিলো। নেত্রকোনা ন্যাপের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক। কিন্তু সামরিক শাসন জারির পর সবাই তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকের ভূমিকাতেই দেখতে পেলো। রাজনীতির সাতে-পাঁচে আর এই লোকটি নেই—মাস্টারিতে তার নিষ্ঠা দেখে দেশ-গাঁয়ের মানুষের হয়তো এ রকমই ধারণা হয়েছিলো। অথচ সেই নিরীহ ইস্কুল-মাস্টারটি যে কম্যুনিস্ট পার্টির পলাতক নেতা ও পাকিস্তানি শাসকদের ঘোর শত্রু মনিসংহকে নিয়ে চলাচল করেন, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাকে নানা স্থানে নিয়ে যান, অন্য অন্য নেতা-কর্মিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন—কাকপক্ষীটিও বোধহয় তা টের পায়নি।

এ রকমই আরেক জন ইস্কুল মাস্টার ছিলেন হরিশঙ্কর চৌধুরী, যার কথা আগেও একবার বলেছি। নেত্রকোনার উকিলপাড়ায় একটা ছোট্ট বাসায় তিনি থাকতেন। সকাল-বিকাল তার ছোট্ট ঘরটিতে বসে ছাত্র পড়াতেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি আসর জমাতেন তরুণ ছাত্র, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিকর্মিদের নিয়ে। মিতবাক অথচ সুরসিক হরিশঙ্কর বাবু যে আসরের মধ্যমণি, সে আসর যে হবে সূক্ষ্ম ও মার্জিত রসিকতার একটি স্নিগ্ধ প্রস্রবণের মতো, তেমনটিই তো স্বাভাবিক। তবু কিন্তু কোনোমতেই সেটি অলস বিশ্রম্ভালাপের আড্ডা হয়ে ওঠেনি। শিক্ষক হরিশঙ্কর চৌধুরীর উকিলপাড়ার আসরটি আসলে ছিলো নেত্রকোনার প্রগতি-আন্দোলনের একটি অচিহ্নিত যোগাযোগ কেন্দ্র। আইউবী জঙ্গি শাসনের আমলে কেন্দ্রটি একান্তভাবেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো।

নেত্রকোনা শহরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মৃণাল বিশ্বাস ও তার ভাইদের প্রায় সবাই ছিলেন কম্যুনিস্ট। পুরো পরিবারটিই ছিলো প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত। জঙ্গি শাসনের সেই ভীতিকর দিনগুলোতেও, অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও, এই পরিবারটি রাজনৈতিক সক্রিয়তা বজায় রেখেছিলো।

এ রকম মার্কামারা বা মার্কাহীন রাজনৈতিক কর্মিরাই যে কেবল জঙ্গী শাসন-বিরোধী আন্দোলনের বীজতলা তৈরিতে নিযুক্ত ছিলেন, তা নয়। অনেক অবিশ্বাস্য স্থান থেকে, এমনকি শাসকচক্রের একেবারে ভেতর মহল থেকে, অনেকে এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। অর্থাৎ বাঘের ঘরেও ছিলো ঘোগের বাসা। যে আমলা-কর্মচারীদের দিয়ে শাসকরা তাদের

স্বৈরশাসনের থাবা সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত করে দেয়, তাদের মধ্যেও সে-শাসনের সক্রিয় ও অক্রিয় শত্রুর সংখ্যা একেবারে কম ছিলো না। বারহাট্টায় এ রকমই একজন সরকারি কর্মচারীর সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর প্রসঙ্গসূত্রে তার নামটি আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি আশরাফ হোসেন। বারহাট্টার তৎকালীন সাবরেজিস্ট্রার। সার্কেল অফিসার ছিলো সে সময়ে থানা পর্যায়ে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অফিসার। বারহাট্টায় সার্কেল অফিসারের অফিস ছিলো না। তাই মর্যাদার বিচারে সেখানকার সাবরেজিস্ট্রারই ছিলেন সবার ওপরে। সাব রেজিস্ট্রার আশরাফ হোসেনের বৈদগ্ধ্য, সংস্কৃতি-মনস্কতা ও উদারতার পরিচয় বারহাট্টায় পা দিয়েই পেয়েছিলাম। কিছুদিন পর পেলাম তাঁর অন্যতর পরিচয়। সেটি রাজনীতি-সম্পৃক্ততার। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। সে সময় থেকেই মণি সিংহ ও খোকা রায়ের মতো কম্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ। কর্মজীবনেও সে সংযোগ ছিন্ন হয়নি, সংগুপ্ত হয় মাত্র। অর্থ সাহায্য থেকে শুরু করে আরো নানাভাবে কম্যুনিস্টদের তিনি সহায়তা করতেন। আত্মগোপনকারী অনেক কম্যুনিস্ট নেতা তাঁর ময়মনসিংহ শহরের বাসায় অনেকবার এসে আশ্রয় নিয়েছেন, গোপন বৈঠক করেছেন। জনাকীর্ণ শহরের বাসভবনে নিষিদ্ধ মানুষদের আশ্রয় দান করার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি আছে সন্দেহ নেই, তবু বারহাট্টার মতো ছোট্ট জায়গায় থানা-পুলিশের একেবারে নাকের ডগায় এমনটি করার ঝুঁকি নিশ্চয়ই অনেক বেশি। অথচ, সে রকম ঝুঁকি নিতেও পিছপা হননি প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকারের প্রগতিশীল এই কর্মচারীটি। থানার খুবই কাছে একটি ছোট্ট বাসায়, সেই উনষাট সালে, তিনি থাকতেন। এই বাসাতেই, মিলিটারির হুলিয়া মাথায় নিয়ে, দিন তিনেকের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন নেত্রকোর কম্যুনিস্ট নেতা সুকুমার ভাওয়াল।

সে সময়ে পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিলো। সে সূত্রেই বিভিন্ন গোপন আস্তানায় কমরেড সুকুমার ভাওয়ালের সঙ্গে আমার দেখা হতো। একবার দেখা হলো কমরেড অজয় রায়ের সঙ্গে। যশমাধব গ্রামে আজিজুল ইসলাম খানের এক আত্মীয়ের বাড়িতে দু'দিন দু'রাত পলাতক অজয়দার সাহচর্যে কাটিয়েছিলাম। তার সঙ্গে সেবার অনেক বাকবিতণ্ডা ও তর্কবিতর্ক হয়েছিলো। বিভিন্ন বিষয়ে আমি হতাশা প্রকাশ করলেও অজয়দাকে দেখলাম প্রচণ্ড আশাবাদী। নানা তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি বললেন যে, কিছুটা সময় লাগলেও দেশে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু হবেই। আইউব সম্পর্কে জনগণের মোহ এরই মধ্যে কাটতে শুরু করেছে। অজয়দা তার সেই আশাবাদ আমার এবং আমার সেদিনকার সঙ্গীদের মধ্যেও সঞ্চারিত করে ছেড়েছিলেন।

এর কিছুদিন পরই অজয়দার গ্রেফতারের খবর পেলাম।

ঈশ্বরগঞ্জে কমরেড পরেশ দাসের বাড়িতে কমরেড জ্যোতিষ বোস আর সুকুমার ভাওয়াল পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন উনষাট সালের শেষ দিকে। সেই সঙ্গে পরেশ দাস আর তার স্ত্রীও গ্রেফতার হয়েছিলেন। পরেশদার স্ত্রী ছাড়া পেলেও কোর্টের বিচারে পরেশ দা ও সুকুমার দা'র সাজা হয়ে যায়। পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সুকুমার দা'র ওপর তো পুলিশ অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এতে বেশ কিছুদিনের জন্যে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

কাজী আবদুল বারিও এরই কাছাকাছি সময়ে গ্রেফতার হয়ে যান। তার সঙ্গে ছিলো নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ কাগজপত্র। এই 'বিপজ্জনক' মানুষটিকে জঙ্গি শাসকরা তাদের জংলী আইনে বিচারের নামে প্রহসন করে চৌদ্দ ঘা বেতের বাড়ি দেয়। এতে চিরজীবনের জন্যে তিনি বধির হয়ে যান ও স্নায়ুবৈকল্যে আক্রান্ত হন।

কমরেড জ্যোতিষ বোসেরও কারাদণ্ড হয়। জঙ্গি শাসকরা তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিলামে বিক্রি করে দেয়। স্বামীর 'অপরাধে' তাঁর স্ত্রী ছায়া বোস সদ্যজাত কন্যাসন্তান নিয়ে আশ্রয়হীন ও নিরাপত্তাহীন হয়ে নানাজনের করুণানির্ভর জীবন যাপনে বাধ্য হন।

শাহিদের কাছে *শিখা* সহ আরো নানা নিষিদ্ধ কাগজপত্র আছে—এই খবর পেয়ে পুলিশ তার গ্রামের বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু সে সব কাগজপত্রের হদিস পায়নি। শাহিদের ছোট ভাই সেগুলো আগেই সরিয়ে ফেলেছিলো।

এরকম হয়রানি ও নির্যাতন চালিয়েও জঙ্গী শাসকরা নীলকণ্ঠ কম্যুনিস্টদের দমন করতে পারেনি। বরং তারা যে সার্থকভাবেই আন্দোলনের বীজতলা তৈরি করতে পেরেছিলো, বাষট্টির ছাত্র বিক্ষোভেই তার প্রমাণ মেলে।

ছাত্র আন্দোলন বনাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

দু'বছর বারহাট্টা হাইস্কুলে মাস্টারি করে একষট্টির আগস্টে ছেড়ে দিলাম। বাংলায় এমএ পড়ার জন্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। মাস্টারের চেয়ার ছেড়ে আবার ছাত্রের বেঞ্চে।

রাজশাহীতে যদিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো উনিশ শো তেপ্পান্ন সালে, তবু প্রতিষ্ঠার আট বছর পরেও, একষট্টি সালেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ তৈরি হয়ে ওঠেনি। সে সময়েও রাজশাহী শহরের বাইরে মতিহারে বিরাট এলাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলছে মাত্র।

তখন মতিহারে কয়েকটি মাত্র নির্মীয়মাণ ভবনে চার-পাঁচটি বিভাগের ক্লাস চালু হয়েছে। অধিকাংশ ক্লাস বসে রাজশাহী সরকারি কলেজ ভবনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসও শহরে পদ্মার পাড়ে, লালকুঠিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস নেই। রাজশাহী কলেজের ফুলার হোস্টেলেই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অবস্থান করে। এছাড়া শহরের এখানে-ওখানে কিছু বাড়ি ভাড়া নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। মতিহারে যাদের ক্লাস হতো সে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে চড়ে শহর থেকে যাতায়াত করতো। কিছু ছাত্রের জন্যে অবিশ্যি মতিহারে কয়েকটি টিন শেডে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো। এমনই এক জৌলুসহীন অবস্থার মধ্যে তখনকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিন কাটাতে হতো যে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে তুলনা করে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগতো।

আমার সঙ্গে শচীন আইচও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েছিলো। সে ভর্তি হয়েছিলো ইংরেজির এমএ ক্লাসে। আমরা দু'জনেই শহরের রানীবাজারে সুধীর গোবিন্দ মৈত্রের বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকার জায়গা করে নিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শচীনের এক ধরনের ভীতিরোগ দেখা দিলো। রাস্তায় বেরোলেই সে মারা যাবে—এমন একটা ধারণা তাকে পেয়ে বসে। এমন কি ঘরেও সে একা থাকতে ভয় পেতে লাগলো, আমাকে সে কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে চাইতো না। শেষ পর্যন্ত তাকে আমি ময়মনসিংহে তার বাসায় রেখে আসতে বাধ্য হলাম। তার আর এমএ পড়া হলো না।

শচীন রাজশাহী থেকে চলে যাওয়ার কিছুদিন পরই—বাষট্টির ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে—দু'দু'টো ঘটনা ঘটে গেলো। প্রথমটি ছাত্র আন্দোলন ও পরেরটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঢাকাতে আইউব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পরও রাজশাহীর ছাত্ররা

নিরুত্তাপই ছিলো। রাজধানীর তুলনায় এই বিভাগীয় সদরটির ছাত্রদের রাজনৈতিক সচেতনতা কিছুটা কম থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে একটা বিশ্ববিদ্যালয় তো আছে সেখানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতো পিছিয়ে থাকবে কেন—এ ধরনের অনুযোগ ঢাকার ছাত্রদের কাছ থেকে প্রতিনিয়তই আসতে লাগলো। রাজশাহীর ছাত্ররা কি মার্শাল ল'র ডাণ্ডার ভয়ে আন্দোলনে নামছে না? এতোই যদি ভয়, তবে তারা শাড়ি আর চুড়ি পরে অন্দরে চলে গেলেই পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার শখ কেন তাদের? সত্যি কি না জানি না, এ-কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নাকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নামে ডাকযোগে শাড়ি ও চুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলো। হতে পারে এ-সব কথা নিতান্তই রটনা, তার পেছনে ঘটনা হয়তো একটুও ছিলো না। পুরুষের শাড়ি আর চুড়ি পরার কথা বলে কাপুরুষ বাঙালি পুরুষতন্ত্র তার বিকৃত পৌরুষের অহমিকার তৃপ্তি ঘটায়। এ-ধরনের রটনার মূলেও হয়তোবা এরকমই তৃপ্তিলাভের অভিলাষ কার্যকর ছিলো।

সে যাই হোক, কিছুটা দেরিতে হলেও বাষট্টি সালে রাজশাহীতে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিলো, প্রচণ্ডতা ও তীব্রতায় তা ঢাকার চেয়ে কম ছিলো না কিছুতেই। একদিন সরকারি কলেজের ক্যাম্পাসে রাজশাহীর প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক ছাত্র সমবেত হয়ে এক বিরাট মিছিল বের করার প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু কলেজের গেট অতিক্রম করার আগেই পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে পড়ে যায়। ছাত্রদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পরে পুলিশ সমানে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। ছাত্ররা দৌড়ে গিয়ে ফুলার হোস্টেলে আশ্রয় নেয় এবং ছাদের ওপর থেকে পুলিশদের লক্ষ করে সমানে ইট ছুঁড়ে মারে। কয়েক ঘণ্টা প্রচণ্ড লড়াই চলে। বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়। কাজী শহীদ নামক একজন ছাত্রের সামরিক আদালতের বিচারে চৌদ্দ বছরের জেল হয়ে যায়।

ঘটনার দিন বিকেলেই রাজশাহী কলেজের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ফুলার হোস্টেল ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। ওই হোস্টেলের দরোজা তাদের জন্যে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ছাত্র মতিহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মীয়মান ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেয়, অনেকেই আপাতত বাড়ি চলে যায়। কিন্তু আন্দোলন তাতে স্তব্ধ হয় না। আন্দোলনের তীব্রতার মুখে জঙ্গি শাসকরাই বরং তাদের জংলি আইনে নেয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়, আটক ছাত্রদের ছেড়ে দেয়, চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্র কাজী শহীদও অচিরেই সসম্মানে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

আইউব-বিরোধী তথা মার্শাল ল' বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জনমনে বিশেষ আশাবাদে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছে যে-সময়, সে-সময়েই প্রতিক্রিয়াশীলরা দেশের মানুষের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়। খবর এলো : পশ্চিমবঙ্গের মালদহে প্রচণ্ড মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গা লেগে গেছে। রাজশাহীর সীমান্তবর্তী বলে মালদহ থেকে অতি সহজে নানান ধরনের সত্যিমিথ্যে খবর এখানে এসে পৌঁছায় এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এ-সময়েই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আজম খান যান রাজশাহী সফরে। নানা জায়গায় তিনি মালদহের দাঙ্গা সম্বন্ধে উত্তেজনকার বক্তৃতা দিতে থাকেন। সে সব বক্তৃতায় ভারতের মুসলমানদের জন্যে যেমন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তেমনি পাকিস্তানের হিন্দুরা যে পরম নিশ্চিন্তে বাস করছে সে কথাও বারবার উল্লেখ করেন। এ-দেশেও দাঙ্গা করার জন্যে যে তিনি প্রকাশ্যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের উস্কানি দিয়েছেন, তা অবশ্যই নয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শাসকদের

শাসন-কৌশলই এমন যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম বিভিন্ন উপায়ে তারা সব সময়ই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে জাগিয়ে রাখে। তাদের শুভেচ্ছামূলক বাচনভঙ্গির মধ্যেও সে কৌশলটি সক্রিয় থাকে।

পাকিস্তানের অন্যতম জঙ্গি নায়ক আজম খানের বক্তব্যও নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎসাহিত হওয়ার মতো অনেক উপাদানই ধারণ করেছিলো। তাই তার রাজশাহী সফর শেষ হওয়ার পরপরই সেখানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং সে যে কতোখানি ভয়াবহ তার বর্ণনা দেয়া আমার সাধ্যাতীত।

দাঙ্গা যখন শুরু হয়ে গেলো, তখন রাণীবাজারে সুধীর গোবিন্দ মৈত্রের বাসায় অবস্থান করতে আমার সাহসে কুলালো না। ইংরেজির ছাত্র বারহাট্টার তাহের উদ্দিন খান মতিহার থেকে খবর পাঠালেন : আমি যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শহর ছেড়ে সেখানে চলে যাই।

শহর ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই বিকেলে আমাদের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সুধেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে তার বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি স্যার বাসায় নেই। লালকুঠিতে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস) কী একটা মিটিং করতে গিয়েছেন। পরিবারের বয়স্ক পুরুষদেরও সকলেই বাইরে। দু'জন গুণ্ডা মতোন লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত বাড়িটাতে থমথমে ভাব। ঘরে ঢুকে দেখি স্যারের স্ত্রী সজল চোখে হাত থেকে সোনার চুড়ি খুলছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কী করছেন কাকি মা?'

ঝরঝর করে কাকিমার চোখ থেকে জল ঝরে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে কাকিমা যা বললেন তার সারমর্ম হলো: উঠোনে দাঁড়ানো গুণ্ডা দুটো এ পাড়ারই বাসিন্দা। তারা জানাতে এসেছে যে, আজ রাতেই এ বাড়িতে হামলা হবে এবং বিহারী গুণ্ডারা সুধেন্দু বাবুর মেয়ে দুটোকে ধরে নিয়ে যাবে। তবে পাড়ার গুণ্ডারা সুধেন্দু বাবুর বাড়ির লোকদের আশ্বাস দিচ্ছে যে, যদি তাদের হাতে এক্ষুণি একশোটি টাকা তুলে দেয়া হয় তবে তারা এ- বাড়ি পাহারা দেবে, বিহারী গুণ্ডাদের এখানে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।

(পাঠক, দয়া করে একশো' টাকার মূল্যমান বাষট্টি সালের নিরিখে বিচার করুন— আজকের চাঁদাবাজদের দাবির সমমানে নয়। সেদিনকার চাঁদাবাজ গুণ্ডারা একশো' টাকার বেশি দাবি করার মতো সাহস অর্জন করতে পারেনি, তখনকার অর্থনীতিই তাদের সে সাহস দেয়নি।)

—'কিন্তু হাতের চুড়ি খুলছেন কেন?' উদ্বেগের সঙ্গে আমি কাকিমার কাছে জানতে চাইলাম।

— 'এছাড়া কী করি বলো? নগদ টাকা তো এখন আমার হাতে নেই, এই ক'গাছা চুড়ি দিয়েই ওদের মুখ বন্ধ করতে হবে।'

আমি খুব জোরের সঙ্গে বললাম, 'না, তা হবে না। আমি এক্ষুণি লালকুঠিতে যাচ্ছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি এই গুণ্ডাদের হাতে কিছুই তুলে দেবেন না। যা করবার হয় স্যার নিজেই করবেন।'

লালকুঠিতে গিয়ে খবরটা জানানো মাত্রই মিটিং ভেঙে দিয়ে সবাই উঠে পড়লেন। উপাচার্য মমতাজ উদ্দিন আহমদ, রেজিস্ট্রার (নামটি আজ আর মনে নেই), বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং আরো কয়েকজন অধ্যাপক ও কর্মচারি সুধেন্দু বাবুকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার বাসায় চলে এলেন। উপাচার্য টেলিফোনে রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনারকে খবরটি জানিয়ে দিলেন। গুণ্ডা দুটো অবিশ্যি এরই মধ্যে কেটে পড়ে।

সারা শহরের হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় তাদের অনেকেই নিজ নিজ বাসা ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে থাকে। সুধেন্দু বাবুদের পাড়ার সব হিন্দু সুধেন্দু বাবুর বাসায় এসে আশ্রয় নেয়। কারণ, এ বাসাটা দেয়ালঘেরা থাকায় অন্য অনেক বাসার চেয়ে ছিলো সুরক্ষিত। তা ছাড়া এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত অধ্যাপকের বাসা; অনেকেরই ধারণা হয়েছিলো যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রভাবে শাসন কর্তৃপক্ষও এ-বাসাটির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। তাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অধ্যাপক সুধেন্দু ভট্টাচার্যের বাসাটি এলাকার হিন্দুদের আশ্রয় শিবিরে পরিণত হয়ে যায়। আমারও আর মতিহার যাওয়া হলো না। কাকিমা আমাকে কিছুতেই যেতে দিলেন না। মাসখানেক সুধেন্দুবাবুর বাসাতেই থেকে যেতে হলো।

দাঙ্গার সময়ে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের অনুপ্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কুড়ি/ বাইশ জন ছাত্র সারা রাত ধরে সুধেন্দু বাবুর বাড়িতে পাহারায় নিযুক্ত রইলো। আমরা সবাই মিলে ছাদের ওপর ইটের টুকরো জড়ো করলাম। উদ্দেশ্য: গুণ্ডারা হামলা করতে এলেই ইট ছুঁড়ে তাদের প্রতিহত করবো।

ছাদের ওপরই বিনিদ্র কাটালাম কয়েক রাত।

সুধেন্দু বাবুর বাসায় বা রাজশাহী শহরের অন্য কোথাও অবিশ্যি কোনো হামলা হয়নি। কিন্তু শহরের আশপাশের এলাকাগুলো যে পৈশাচিক হামলার শিকার হয়েছিলো তা সুধেন্দু বাবুর বাড়ির ছাদের ওপর বসেই কিছুটা প্রত্যক্ষ ও অনেকখানি অনুমান করতে পেরেছি। সন্ধ্যার কিছু পরই চারদিকে আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে, আর শোনা গেছে গগনভেদী আর্তচিৎকার। ছাদে বসেই আমরা শিউরে শিউরে উঠেছি, আর অক্ষম ক্ষোভে ঠোঁট কামড়িয়েছি। সকালবেলায় দেখেছি রাস্তা দিয়ে চাঙারি করে বয়ে নিয়ে যাওয়া বহুসংখ্যক লাশের মিছিল। গ্রাম থেকে বহু লোক শহরে চলে এলো। তাদের অনেকেই ভারতের এ্যাসিস্টেন্ট ডেপুটি হইকমিশনারের রাজশাহীস্থ অফিসের সামনে গিয়ে ভিড় করলো মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের জন্যে।

সেবার সবচেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা (ভুল বললাম, দাঙ্গা নয় হত্যাকাণ্ড) হয়েছিলো রাজশাহী শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামে। যতোদূর মনে পড়ে, গ্রামের নামটি দারসা। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে অবশ্যই সে-হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয়নি। তবে লোকমুখে ভেসে আসা খবরের স্বাভাবিক অতিরঞ্জনটুকু বাদ দিলে যা থাকে তা শতাংশের একাংশই গায়ের রক্ত হিম করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। শুনেছি, দারসার হিন্দুরা নাকি একটি দেয়ালঘেরা ইস্কুল বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো। আর এটাই হয়েছিলো ঘাতকদের জন্যে মোক্ষম সুযোগ। নারী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সকলকেই তারা ধরে ধরে এনে ছুরি মেরে লাশ বানিয়ে একটা একটা করে পাশের পুকুরে ফেলে দিয়েছিলো। পুকুরটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিলো। পরদিন খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর কয়েকজন লোক সেখানে যায়। লাশের স্তূপ আর রক্তের প্রবাহ দেখে তারা নাকি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো। উন্মত্ত রক্তপিপাসুরা ওই রোরুদ্যমান সৈন্যদেরও আক্রমণ করতে গেলে তাঁরা গুলি চালায় এবং ছ'জন লোক মারা যায়।

সৈন্যদের হাতে এই ছ'জন লোকের নিহত হওয়ার সংবাদটি গুজব থেকে পাওয়া নয়। সৈন্যরাই এ-কথা সেদিন মাইকযোগে রাহশাহী শহরে প্রচার করে এবং কারফিউ জারি করার ঘোষণা দেয়। এরপর আমরা দেখলাম : সেনাবাহিনীই দাঙ্গা থামানোর দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে দিয়েছে, আর দাঙ্গা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'সর্প হইয়া দংশন করো, ওঝা হইয়া ঝাড়ো'—কার সম্পর্কে কথাটি বলেছিলেন মরমী কবি? অপার্থিব নিরাকার জগদীশ্বর সম্পর্কে? নাকি পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রের জঙ্গি শাসকদের সম্পর্কে?

পশ্চিমবঙ্গের মালদহের মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গা, সেখান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে কিছু মুসলমানের রাজশাহীতে চলে আসা, দাঙ্গাপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের রাজশাহীতে অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজনের স্বাভাবিক ক্ষোভ ও হতাশা এবং এ-সময়েই জঙ্গি গভর্নর আজম খানের রাজশাহী সফর ও তার কৌশলী বক্তৃতায় ছাত্র আন্দোলন-প্রসূত সরকার বিরোধী গণচেতনাকে সাম্প্রদায়িক খাতে ঘুরিয়ে দেয়ার ধূর্ত প্রয়াস—এ-সবের ফলে বাষট্টিতে রাজশাহীতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা ঘটে এবং মূলত সেখানেই তা কেন্দ্রীভূত থাকে। তবে, রাজশাহীর মতো ততোটা ব্যাপক না হলেও দেশের অন্যান্য জায়গাতেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিলো বৈকি। রাজধানী ঢাকা নগরীতেই বাষট্টির তিরিশে মে সন্ধ্যার ম্লানালোকে ঘাতকের ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারান অজাতশত্রু কবি প্রজেশ কুমার রায়।

দাঙ্গা বন্ধ হবার পরও অনেকদিন সুধেন্দু বাবুর বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র পাহারায় ছিলো। এ সময়ে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মানবিকতার যে পরিচয় পেয়েছি তার তুলনা মেলা ভার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই শুধু নয়, নিজের ছেলে মুহম্মদকেও ডক্টর হক সুধেন্দু বাবুর বাড়ি-পাহারার কাজে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। মুহম্মদ তখন কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র। বয়স নেহাতই কম। কাটাকাটি খুনোখুনির পরিবেশে তার পক্ষে ভয় পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিলো না। তাছাড়া তার মায়ের পক্ষে সন্তানের জন্যে উদ্বেগাকুল থাকা তো ছিলো একান্তই স্বাভাবিক। তাই প্রথম দিনেই রাত আটটার দিকে মুহম্মদ তার মায়ের কথা বলে সুধেন্দু বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে যায়।

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই মুহম্মদকে দেখা গেলো অধ্যাপক সুধেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়ির গেটে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে।

- 'কী ব্যাপার মুহম্মদ?' স্যার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

কাঁদো কাঁদো হয়ে মুহম্মদ জানালো: কাল রাতে বাড়ি ফিরে যেতেই তার বাবা একেবারে আগুন হয়ে ওঠেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথা হলো, 'ইউনিভার্সিটির এতোগুলো ছেলে বিপদের মুখে থাকতে পারলো, আর তুমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এলে? তুমি একাই মায়ের ছেলে, আর ওদের বুঝি মা-বাবা নেই, ওদের প্রাণের কোনো মূল্যই নেই?'

রাতেই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। অনেক বকুনি খেয়েও তার মা তাকে কোনো রকমে ঘরে রেখেছিলেন। ভোরে উঠেই সে চলে এসেছে। এখন সুধেন্দু বাবু যদি ডক্টর হককে বুঝিয়ে না বলেন তবে বেচারা আর নিশ্চিন্তে ঘরেই ফিরতে পারবে না।

আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের এ-রকম আচরণ মোটেই লোক দেখানো ব্যাপার ছিলো না। অনেক উপলক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছি যে, তিনি ছিলেন সব রকম মোনাফেকির ঊর্ধ্বে। আকাশের মতোই যেমন উদার তার হৃদয়, তেমনি আকাশের বজ্রের মতোই একান্ত কঠোর তার ব্যক্তিত্ব। আবার এই কঠোর ব্যক্তিত্বের-আবরণে যে মনটিকে তিনি ধারণ করতেন তা যে কতো বেশি কোমল, তাও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নানা জনের নানা রূপ

রাজশাহীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে মানব চরিত্রের বহু রকম দিকই উন্মোচিত হয়েছে আমার সামনে। নীচতা ক্ষুদ্রতা ভীরুতা দোদুল্যমানতা যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি এ সবের বিপরীত সব মানস প্রবণতার প্রকাশও। অনেকেই হিন্দুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছেন, সাধ্য মতো তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এ-ধরনের অমানবিকতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আবার 'হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ওপর যা হয়েছে তার তুলনায় এ-দেশের হিন্দুদের কিছুই করা হয়নি'—ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হিন্দুদের বারবার এমন কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের ত্রাস ও আতঙ্ক বাড়িয়ে দেবার দুর্বুদ্ধির প্রকাশও অনেকের মধ্যে দেখেছি।

বাষট্টির দাঙ্গার পুরো সময়টা এবং তারপরও বেশ কিছুদিন—আমি অধ্যাপক সুধেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়িতে কাটিয়েছিলাম বলেই নানান কিসিমের মানুষকে কাছে থেকে দেখার ও তাদের কথা শোনার সুযোগ আমার হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের তো সে-সময়ে সে-বাড়িতে নিয়মিত উপস্থিতি ছিলোই, প্রশাসনের উঁচু-নিচু মাঝারি পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা কর্মচারিও খোঁজখবর নিতে প্রায় রোজই সেখানে যেতেন। প্রায় সারাদিনই এবং রাতেরও অন্তত দেড় প্রহর, নানা জাতের মানুষের সংলাপে মতবিনিময়ে বাড়িটা জমজমাট হয়ে থাকতো। সারাক্ষণ এ-রকম বিভিন্ন মানুষের সাহচর্য বিষণ্ণতার হাত থেকে মুক্ত থাকতে আমাদের অনেক পরিমাণে সহায়তা করেছিলো। আবার এ বাড়িতে সমাগত অনেক মানুষের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করেও তুলতো। শহরের আশপাশের গ্রামগুলোর হিন্দুদের বাড়িঘর যখন পুড়ে ছাই করে দেয়া হচ্ছে, ঘাতকের ছুরি যখন তাদের নিহত ও আহত করছে, গ্রাম থেকে তারা যখন দলে দলে নিরাপত্তার সন্ধানে শহরের দিকে ছুটে আসছে, রাজশাহীর রাণীবাজার এলাকার হিন্দুরা যখন নিজেদের ঘর ছেড়ে অধ্যাপক সুধেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়িতে আশ্রয়ের জন্যে ছুটে আসছে তখন মাঝারি পদের একজন সরকারি কর্মকর্তা যা তা বলে সেই সন্ত্রস্ত মানুষদের ধমকাতে লাগলেন।

—'কোথায় রায়ট দেখলেন আপনারা? কিছুই তো হয়নি এখানে। রায়ট তো হয়েছে মালদায়। মালদা'র সব মুসলমানের বাড়ি লুট হয়েছে, মুসলমান বস্তিগুলো পুড়ে ছাই হয়েছে, মুসলমান মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। সেখান থেকে পালিয়ে আসা লোকদের মুখে এ-সব কথা শুনে কোন্ মুসলমানের না রক্ত গরম হয়ে ওঠে? আমাদের এখানে এ-রকম কিছু হয়েছে কি? দিব্যি ভালো আছেন আপনারা। তবু নিজেরাই এখানে শুধু শুধু প্যানিক সৃষ্টি করছেন নানা গুজব শুনে।'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো ছিলো ওর কথাগুলো। তবু ভেতরে ভেতরে তীব্র জ্বালা নিয়েও কেউই মুখ ফুটে কিছু বলছিলো না। হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো—'কিছুই যদি এখানে না হবে তো, আপনি কি বলতে চান এই যে লোকগুলোকে চাঙারিতে করে গাঁ থেকে নিয়ে আসা হলো, এরা কি সব ডিসপেপসিয়ায় মারা গেছে?'

কর্মকর্তাটি আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। কোনো পরোয়া না করে আরো উঁচু গলায় বলতে লাগলাম, 'মালদায় মুসলমানদের মেরেছে, তাদের বাড়িঘর লুট করেছে, আগুন লাগিয়েছে, মেয়েদের ইজ্জত লুট করেছে কারা? এখানকার হিন্দুরাই কি সীমানা পেরিয়ে গিয়ে

এসব করে এসেছে? আর সে সবের কি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এখানকার হিন্দুদের ওপর এসব করাটা জায়েজ বলে আপনি মনে করেন?' ... ...

আমার গলা ক্রমেই চড়ে যাচ্ছিলো। বাইরের ঘরে বসে আমরা কথা বলছিলাম। কিন্তু আমার কলিংবেল-নিন্দিত কণ্ঠস্বর ভেতরে-বাইরে সকলকে হতচকিত করে তুলেছিলো। বিরক্ত, ব্যস্ত ও ত্রস্ত হয়ে সুধেন্দু বাবু বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। এবং তার এই অর্বাচীন ছাত্রটির এ-রকম বেয়াদবির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে কর্মকর্তাটির কাছে নিজেই মাফ চাইতে লাগলেন। কর্মকর্তাটি তখন সুযোগ পেয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করে চললেন। জলে বাস করে যে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না সে-কথাটি বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

এর দু'দিন পরই অধ্যাপক সুধেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়িতে পাকিস্তান সরকারের 'বুদ্ধি বিভাগ' -এর একজন লোক এসে এই বেয়াদব ছাত্রটির (অর্থাৎ আমার) নাম, বাপের নাম, বাড়ির ঠিকানা এবং এ-রকম আরো কিছু তথ্য খাতায় লিখে নিয়ে গেলো। সুধেন্দু বাবুসহ বাড়ির সবাই ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে যে খুব শিগগিরই পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে—এ-বিষয়ে সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন। আশঙ্কা করতে লাগলেন: এই বাচাল ছোকরাটির দোষে তাদের না দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

পুলিশ অবিশ্যি সেবার আমাকে ধরেনি। একটি অখ্যাত ছোকরার বাচালতাকে গুরুত্ব দিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলা যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, অন্তত এটুকু কাণ্ডজ্ঞান যে পুলিশের ছিলো তা বোঝা গেলো। এ দাঙ্গার সময়ে রাজশাহী শহরের বেশ কিছু গণ্যমান্য হিন্দুকে ধরে নিয়ে জেলে আটকে রেখেছিলো। তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি, কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে ছিলো না। বেয়াদবির জন্যেই বোধহয় তাদের কারাবাস করতে হয়েছিলো। কিল খেয়ে কিল চুরি করতে যারা শেখেনি, স্থানকালপাত্র বিবেচনা না করে যারা কোদালকে কোদাল বলে যায় অনায়াসে, তারা বেয়াদব ছাড়া আর কী? এ-রকম বেয়াদবদের জন্যেই ছিলো পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইন। জেলের বাইরে থাকলে যারা দাঙ্গার নিন্দা করবে, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের দাবি জানাবে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হয়েও অপ্রিয় সত্য কথা বলতে যারা একটুও ইতস্তত করবে না, এমন লোকদেরকে জেলে পুরে রাখাই তো পাকিস্তানের মতো একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে প্রশাসনের কাজ চালাবার জন্যে একান্ত সুবিধাজনক, নিরাপদ।

পাকিস্তানি শাসকরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের দেশপ্রেমহীনতার অপবাদ দিতো, অথচ এ সম্প্রদায়ের খাঁটি দেশপ্রেমিক ও স্পষ্টভাষী মানুষদের তারা একদম সহ্য করতে পারতো না। কিছু ধামাধরা বা 'জি-হুজুর' মার্কা লোকই ছিলো তাদের পছন্দ। এ-রকম কিছু লোক রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে সব সময়েই মজুত থাকতো। নানা উপলক্ষে এদের দিয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন পর্যায়ের শাসনকর্তারা নিজেদের মর্জিমাফিক বিবৃতি দেয়াতো। শ্রী অমুকচন্দ্র রায়, অমুককুমার শর্মা, অমুকনাথ দাস—এ-রকম কতকগুলো লোককে 'সংখ্যালঘু নেতা' বলে আখ্যায়িত করে পত্রিকার পাতায় তাদের নামে বিবৃতি ছাপা হতো। সে-সব বিবৃতিতে ভারতের মুসলমান-বিরোধী দাঙ্গার জন্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ভারত সরকারের নিন্দা থাকতো, আর পাকিস্তানে হিন্দুসহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সদাশয় পাকিস্তান সরকারের উদার ও সদয় ব্যবহারের জন্যে বিবৃতিদাতারা কৃতজ্ঞতার বন্যায় সকলকে

ভাসিয়ে দিতে চাইতো। বিভিন্ন পেশাধারী বিশেষ করে উকিল মোক্তারদের মধ্য থেকেই এ-রকম চিরকৃতজ্ঞ 'সংখ্যালঘু নেতা' জোগাড় করা হতো। ময়মনসিংহে এ-রকম একজন 'হিন্দু' উকিল তো স্থানীয় মুসলিম লীগের অনেক নেতার মুরুব্বির মতোই ছিলেন। মুসলিম লীগের খেদমতের বিনিময়ে তার কপালে 'তমঘা-ই-খিদমত' খেতাবও জুটেছিলো। ব্রিটিশ আমলে এ-রকম লোকেরাই হিন্দু হলে হতেন 'রায় সাহেব' ও 'রায় বাহাদুর', আর মুসলমান হতেন 'খান সাহেব' ও 'খান বাহাদুর'।

ময়মনসিংহের এই উকিলটি অবিশ্যি 'রায় সাহেব' বা 'রায় বাহাদুর' ছিলেন না। কোনো কোনো জেলায়, ষাটের দশকেও, সরকারের ধামাধরায় নিপুণ কিছু কিছু রায় সাহেব বা রায় বাহাদুরের অস্তিত্ব ছিলো। রাজশাহীতেও, বাষট্টি সালে, এ-রকম একজন রায় বাহাদুর ছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও, স্বাভাবিকভাবেই, তার ভূমিকা রায় বাহাদুর-সুলভ ধামাধরারই ছিলো। স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষের দুর্দশায় তার চিত্তবৈকল্য ঘটেনি একটুও, কিংবা সরকার-তোষণেও ভাটার টান লাগেনি। অধ্যাপক সুধেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়িতেই তার আচরণ সম্পর্কে হিন্দুদের মুখে নানা অম্লমধুর কথা শুনেছি। সুধেন্দু বাবুর ছোট ভাই ভূপেন ভট্টাচার্য ছিলেন অত্যন্ত রসিক মানুষ। দাঙ্গার দুর্যোগের দিনগুলোতেও অনেক রসের কথা বলে তিনি আমাদের চাঙ্গা করে রাখতেন। কি করে কোনো লোক প্রথমে রায় সাহেব ও পরে রায় বাহাদুর হতো তার কায়দা-কানুন বর্ণনা করে একদিন তিনি একটি মজার গল্প বলেছিলেন। গল্পটি এ-রকম:

ইংরেজ লাট সাহেবকে রোজ দু'বার করে নিয়মিত সালাম দিয়ে এক ব্যক্তি 'রায় সাহেব' হয়েছিলেন। এরপর সেই রায় সাহেব লাট সাহেবের বাড়িতে গেলেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যে। লাট সাহবে তার অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে পাশে নিয়ে বসেছিলেন। রায় সাহেব প্রথমে লাট সাহবকে ও পরে লাট সাহেবের পত্নীকে সালাম দিলেন। এরপর লাট সাহেবের পত্নীর পেটে একটা সালাম ঠুকলেন। লাট সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞস করলেন, 'এটা কী করলে রায় সাহেব? আমার বিবির পেটে সালাম দিলে কেন?'

রায় সাহেব হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'উনার পেটে যিনি আছেন তিনি তো কিছুদিন পরে মাটিতে নেমে আসবেন। আসার আগেই তাকে 'অ্যাডভান্স' সালামটি জানিয়ে রাখলাম।'

লাট সাহেব খুশিতে একবোরে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরকম রাজভক্ত মানুষ ক'জন হয়? লাট সাহেব রায় সাহেবের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'তুম রায় বাহাদুর বন যাওগে।'

কয়েকদিনের মধ্যেই সেই রায় সাহেব প্রমোশন পেয়ে 'রায় বাহাদুর' হয়ে গেলেন।

এ-রকম রসের গল্প শুজবে মেতে থেকে আমরা দাঙ্গার উদ্বেগকে প্রশমিত করতে চাইতাম।

কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে উদ্বিগ্ন হিন্দুদের উদ্বায়ু (হিস্টিরিয়া) রোগগ্রস্তের মতো কথাবার্তা আমাকে খুবই আহত করতো। জানি, চারপাশের নানা অমানবিক ঘটনা প্রবাহের চাপে ওদের চিন্তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। তবু, ওরা যখন বলতো যে, এদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে ওখানকার মুসলমানদের বুঝিয়ে দেবে 'কতো ধানে কতো চাল' কিংবা এখানকার মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে নিজেদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী রূপটি প্রকট করে তুলে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা বলতো, তখন ওদের ওরকম অসুস্থ মনোবৃত্তির প্রতিবাদ না করে আমি পারতাম না। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে প্রায় সর্বদাই আমার

উত্তেজিত বাক্যবিনিময় হতো এবং আমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে কাউকেই আমি পাশে পেতাম না। দাঙ্গার কারণে যতো না, তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করতাম আমি মানুষের এ ধরনের বিকারগ্রস্ত মানসিকতার প্রকাশ দেখে।

তবে বাষট্টিতে রাজশাহীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী চেতনার বহিঃপ্রকাশও দেখেছি এবং সেটিই আমাকে সুতীব্র আশাবাদে উজ্জীবিত করে তুলেছিলো।

ঢাকার দু'একটি সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ইন্ধন জোগালেও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বাঙালি জাতীয় চেতনাই তখন প্রবল হয়ে উঠছিলো। রাজশাহী থেকে তখন প্রকাশিত হতো একটি অত্যন্ত উন্নতমানের সাহিত্যপত্র '*পূর্বমেঘ*'। এর সম্পাদক ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তফা নূরউল ইসলাম। শেষোক্ত জন ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক। তাঁর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চিন্তাধারার সঙ্গে আমি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তিনিই সম্ভবত ইউরোপ-প্রত্যাগত বদরুদ্দীন উমরকে বাংলা লেখায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এ-সময়েই '*পূর্বমেঘ*'-এ বদরুদ্দীন উমরের কয়েকটি চমৎকার মননশীল লেখা ছাপা হয়েছিলো। ওই লেখাগুলোই পরে '*সাম্প্রদায়িকতা*' নামক চটি বইটিতে সংকলিত হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের এরকম বলিষ্ঠ প্রয়াস এর আগে আর এ-দেশে দেখা যায়নি।

জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে সাম্যবাদীদের নেপথ্য বিধান

বদরুদ্দীন উমরকে আমি প্রথম দেখি রাজশাহীতে—উনিশশো একষট্টি সালে! দূর থেকেই দেখেছি, কাছে যাওয়ার সাহস পাইনি। বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনের অধ্যাপক হন, পরে তাঁকেই বিভাগীয় প্রধান করে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ। আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, তাই তাঁর কাছ থেকে যদিও প্রত্যক্ষভাবে পাঠ গ্রহণের সুযোগ আমার ছিলো না, তবু তিনি তো সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সম্মানিত শিক্ষক, আর আমি একজন সাধারণ শিক্ষার্থী মাত্র। তাই, তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে না গিয়েও, দূর থেকেই তাঁকে আমার শিক্ষক রূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। এরপর তার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

বাষট্টি সালে দাঙ্গা চলার সময়েই '*পূর্বমেঘ*'-এ প্রবন্ধ প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী লেখালেখির সূচনা ঘটানোর পর থেকে বদরুদ্দীন উমর অবিরাম উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলটি অন্বেষণ করতে থাকেন, নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে সেই অন্বেষার প্রতিবেদন প্রকাশ করে চলেন। বাষট্টি থেকে সাতষটি সালের সময়-পরিধিতে তিনি এমন কতকগুলো প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেগুলো সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশের কার্যকারণ সম্পর্ককে একান্ত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলো। এই প্রবন্ধগুলোরই সংকলন—'*সাম্প্রদায়িকতা*', '*সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*', '*সংস্কৃতির সংকট*'।

সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী লেখা উমরের আগেও অনেকেই লিখেছেন নিশ্চয়। সে-সব লেখায় আবেগ ছিলো, আন্তরিকতা ছিলো, মানবিকতা ছিলো, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি অহৈতুকী ভালোবাসারও প্রকাশ ছিলো। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ তথা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ছিলো না। উমরের বিশ্লেষণে ছিলো ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী দর্শন তথা মার্কসবাদের সুনিপুণ প্রয়োগ। দ্বিজাতিতত্ত্ব যে একান্তই ভুয়া একটি তত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর মার্কসবাদের আলো

ফেললে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। উমরের লেখাতেও তা-ই হয়েছিলো। আর দ্বিজাতিতত্ত্বই যদি ভুয়া প্রমাণিত হয়, তবে সে-তত্ত্ব দিয়ে গড়া যে রাষ্ট্র পাকিস্তান, সে-রাষ্ট্রটির ভিত্তিমূলই তো কেঁপে ওঠে। তাই, উমরের সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কীয় লেখাগুলো পড়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-বিধায়করাও কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। কাঁপুনির সঙ্গে তাদের শুরু হয়েছিলো চিড়বিড়ানি। উমরের যুক্তির জবাব যুক্তি দিয়ে দেয়ার এলেম বা হিম্মত কোনোটাই তাদের ছিলো না। এলোপাথাড়ি গালাগালি দিয়েই তারা গায়ের জ্বালা জুড়োতে চেয়েছিলো। উমরের বইগুলো বাজেয়াপ্ত করার দাবিও তারা তুলেছিলো। সাহিত্যপত্র '*পূর্বমেঘ*'-এর পাতায় উমরের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বক্তব্যের সমালোচনা করে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের একটি লেখা ছাপা হয়েছিলো এবং *পূর্বমেঘেই* উমর তার দাঁতভাঙা জবাবও দিয়েছিলেন। জানতাম: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ছিলেন কট্টর পাকিস্তানবাদী। তবু, ইংরেজি সাহিত্যের এই খ্যাতনামা অধ্যাপকের চিত্তাচেতনায় বিবর্তন ঘটে উদারতার সঞ্চার হয়েছে বলে এক সময়ে আমার মনে হয়েছিলো। একষট্টি সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় তিনি *আজাদ* পত্রিকার সঙ্গে গলা মেলাননি। তিনি বরং সোৎসাহে শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের 'জাতীয় কবি' নন—এই অজুহাত তুলে এদেশে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের যারা বিরোধিতা করেছিলো তাদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেছিলেন: রবীন্দ্রনাথ হলেন একজন মহৎ কবি, 'জাতীয় কবি' হওয়া কোনো মহৎ কবির পক্ষেই গৌরবজনক নয়। চসার, শেক্সপীয়র, বালজ্যাক বা ভলতেয়ারের মতো রবীন্দ্রনাথও যে সমগ্র পৃথিবীরই বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধার পাত্র এমন অভিমত তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু এই 'উদার' সাজ্জাদ হোসায়েনও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পড়ে একেবারে ক্ষেপে গেলেন। ক্ষেপে গেলেন সৈয়দ আলী আহসানের ভাই সৈয়দ আলী আশরাফও। আবুল মনসুর আহমদের মতো রাজনীতিক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীও উমরের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন। অর্থাৎ উমরের লেখায় সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণ সূত্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচিত হতে দেখে পাকিস্তানবাদীদের সকলেই বিচলিত হয়ে উঠলেন। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ পাকিস্তানবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের তো বটেই, সামান্যতম উদারতারও সহাবস্থান অসম্ভব। তাই, কখনো কোনো পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবী যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে উদারতাবাদের কোলে আত্মসমর্পণ করে বসেনও, পরমুহূর্তেই তাকে সেখান থেকে ছিটকে পড়তে হয়, আরো প্রচণ্ডভাবে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে আঁকড়ে ধরতে হয়। এ কারণেই সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিলেও সাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় সৈয়দ আলী আশরাফের বৈদগ্ধ্য ও ঔদার্যের প্রকাশ ঘটলেও পাকিস্তানবাদ তাকে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ বৃত্তেই আটকে রাখে। এদের মতো মানুষেরা, তাই, পাকিস্তান প্রেমে উন্মত্ত হয়ে স্বজাতি অর্থাৎ বাঙালি জাতির বিরুদ্ধেই অবস্থান গ্রহণ করে বসেন। সম্প্রদায়কে 'জাতি' ভাবার এই তো স্বাভাবিক পরিণাম।

বদরুদ্দীন উমর জাতীয়তাবাদেরও সমর্থক নন। মার্কসবাদী রূপে জাতীয়তাবাদকে তিনি বুর্জোয়া মতাদর্শ বলেই জানেন। তবু, মজার কথা হলো, ষাটের দশকে তাঁর লেখাগুলো এ-দেশে বাঙালি জাতীয়তবাদের প্রসারেই প্রভূত সহায়তা করেছে। 'বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ

প্রত্যাবর্তন' কথাটি ষাটের দশকের তরুণ প্রজন্মের ভেতর জাতীয় আত্মচেতনা জাগানোর ক্ষেত্রে মন্ত্রের মতো কাজ করে। বাঙালি মুসলমান কীভাবে কাল্পনিক প্যান ইসলামের স্বপ্ন ছেড়ে স্বদেশের মাটিতে নেমে আসে ও ধীরে ধীরে বাঙালিত্বকে বরণ করে নিতে থাকে, তারই বস্তুনিষ্ঠ ও নিপুণ বিশ্লেষণ ছিলো উমরের রচনাবলিতে। এভাবেই বদরুদ্দীন উমর হয়ে ওঠেন পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয় জাগরণের অন্যতম পুরোধা তাত্ত্বিক।

মার্কসবাদী রূপেও উমর একান্ত স্বকীয়তাসম্পন্ন বলেই এ-দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ষাটের দশকে তথাকথিত 'মস্কোপন্থী' বা 'পিকিংপন্থী' রূপে বিভাজিত কম্যুনিস্ট গ্রুপগুলোর কোনোটার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে যুক্ত রাখতে পারেননি। হয়ে পড়েন প্রায় নিঃসঙ্গ। তবে, এই নিঃসঙ্গতা তাঁকে নৈরাশ্যবাদী করেনি। আদর্শনিষ্ঠা তাঁর মেরুদণ্ডকে সব সময়েই সোজা রেখেছে। এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেননি। যদি করতেন তাহলে অনেক অর্থবিত্ত ও লোভনীয় পদের অধিকারী থাকতে পারতেন। তার বদলে স্বেচ্ছায় তিনি বেছে নিয়েছেন বিত্তবৈভবহীন ও পদমর্যাদাহীন এক অনিশ্চিত জীবন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে, এবং পাকিস্তান আমলেও, উমরের অনেক রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারিনি; কিন্তু তাঁর চিন্তার সততা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ জাগেনি কোনো দিনই।

বদরুদ্দীন উমরের দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি (স্বাধীনতার পরে যেটি হয় বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি বা সিপিবি) মার্কসবাদ-বিচ্যুত ও 'সংশোধনবাদী' একটি দল। এ-দলটি তার সমালোচনার শিকার হয়েছে অনেক কারণেই। প্রধান কারণটি বোধহয় এ-দলের আওয়ামী লীগ তথা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রতি দুর্বলতা।

অথচ এ বিষয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির বিবেচনা ছিলো সম্পূর্ণ অন্যরকম। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদভিত্তিক সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রসারকে কম্যুনিস্ট পার্টি একটি ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ঘটনারূপেই গ্রহণ করেছিলো। পার্টি লক্ষ করে যে, ষাটের দশকের শুরু থেকেই বাঙালি জাতির ভেতর 'জাতীয় অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা' 'প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিলো', এবং "গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহলের কোনো কোনো অংশে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি' গুঞ্জরিত হচ্ছিলো।" সিপিবি নেতা খোকা রায় জানিয়েছেন, "১৯৬০-৬১ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতর 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সব সভ্যই 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবিকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। এই বিষয়ে অভিমত পার্টি একটি সার্কুলারে সে-সময় প্রকাশ করেছিলো।" (*'সংগ্রামের তিন দশক'*, পৃষ্ঠা ১৮১)।

তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনায় নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি 'পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য, অন্তত আওয়ামী লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির ভেতর ঐক্য ও সমঝোতা, একান্ত প্রয়োজন' বলে মনে করে। সামরিক শাসন জারির পর, সবরকম প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করেই, কম্যুনিস্ট পার্টি যখন আইউব-বিরোধী আন্দোলনের বীজতলা তৈরিতে নিযুক্ত ছিলো তখন, এমনকি, দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীও কম্যুনিস্টদের ওপরই ভরসা করতে চেয়েছিলেন। আইউব খান 'এবডো' নামক একটি সামরিক আদেশ জারি করে সোহরাওয়ার্দীসহ পাকিস্তানের বাঘা বাঘা রাজনীতিকদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাঁদের বিরুদ্ধে এই আদেশ জারি করা

হবে তারা পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্যে পার্লামেন্টসহ যে কোনো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন। অবিশ্যি 'এবডো'র নোটিশপ্রাপ্ত রাজনীতিকদের একটি ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের লোক দেখানো বিধানও আইউব খান রেখেছিলেন। আসলে এই ট্রাইব্যুনালে হাজার জোরালো যুক্তি দেখালেও লাভ যে কিছুই হবে না, আইউব যাদের টার্গেট করেছেন তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগই যে বহাল থাকবে, এ-কথা অন্যান্য রাজনীতিকের মতো সোহরাওয়ার্দীও জানতেন এবং এ-ও জানতেন যে, প্রচণ্ড গণআন্দোলন সৃষ্টি না করতে পারলে আইউবকে কাবু করা যাবে না। অথচ আওয়ামী লীগসহ কোনো রাজনৈতিক দলেরই সে-রকম আন্দোলন সংঘটনের যোগ্যতা যে নেই সে-কথাও তার অজানা ছিলো না। তবে '*ইত্তেফাক*' সম্পাদক তফাজ্জল হোসনে মানিক মিঞাকে তিনি বলেছিলেন যে, একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই গণআন্দোলনের সূচনা করতে পারে। আইউবের 'এবডো' ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখতে পারেন, যদি কম্যুনিস্ট পার্টি আন্দোলন শুরু করার প্রতিশ্রুতি তাকে দেয়। ট্রাইব্যুনালে যে-সব বক্তব্য উত্থাপিত হবে সেগুলোকে আন্দোলনের কাজে লাগানো যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। সোহরাওয়ার্দীর এই অভিমত '*সংবাদ*' সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীকে মানিক মিঞাই অবহিত করেন। কারণ জহুর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে যে গোপন কম্যুনিস্ট পার্টির সংযোগ ছিলো এ-কথা মানিক মিঞা জানতেন। মানিক মিঞার অনুরোধ রক্ষা করে জহুর হোসেন চৌধুরী কম্যুনিস্ট পার্টিকে সোহরাওয়ার্দীর অভিমতটি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এ-সব কথা বিবৃত করে সত্তরের দশকে জহুর হোসেন চৌধুরী '*সংবাদ*'-এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ প্রবন্ধে প্রকাশিত বেশ কিছু তথ্য বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্যে বিশেষ গুরুত্ববহ। পত্রিকার পাতাতেই প্রবন্ধটি আমি সে-সময়ে পড়েছিলাম। এরপর সেটি আর কোথাও সংকলিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

খোকা রায় তাঁর '*সংগ্রামের তিন দশক*'-এ সোহরাওয়ার্দীর প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেননি। তবে সে বইয়ে তিনি উনিশ শো একষট্টি সালের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যকার বৈঠকের বিবরণ দিয়েছেন। সে বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিব ও মানিক মিঞা এবং কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে মনি সিংহ ও খোকা রায়। এদের মধ্যে অনুষ্ঠিত তিন চারটি বৈঠকে আইউব শাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার সম্ভাব্যতা ও প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিলো। শেখ মুজিব তখনই স্বাধীন পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে দিতে চেয়েছিলেন। স্বাধীন পূর্ববাংলার দাবিতে কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন থাকলেও সেই একষট্টি বাষট্টি সালে এ-দাবি নিয়ে আন্দোলন করার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি বলেই পার্টি মনে করতো। তাই সামরিক শাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দিদের মুক্তি, চুয়ান্নর একুশ দফা কর্মসূচি মোতাবেক পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন, ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার এবং শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলাই সে-সময়ের জন্যে বাস্তব-সম্মত বলে কম্যুনিস্ট পার্টি অভিমত প্রকাশ করেছিলো। শেখ মুজিব তখনকার মতো কম্যুনিস্ট পার্টির এ-অভিমতই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে পূর্ববাংলার স্বাধীনতার জন্যেই আন্দোলন করতে হবে—উনিশ শো একষট্টি সালেই শেখ মুজিব এ-কথা বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন।

যাই হোক, আওয়ামী লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, বাষট্টির একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়েই আন্দোলনের সূচনা ঘটাতে হবে। কিন্তু তিরিশ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় তার পরদিন অর্থাৎ বাষট্টির একত্রিশ জানুয়ারিতেই ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। বাষট্টির এই আন্দোলনই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে। আইউব-নিয়োজিত কুখ্যাত শিক্ষা কমিশনের প্রতিক্রিয়াশীল রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সেই আন্দোলনে শ্রমিক জনতাও যোগ দেয়। সতেরোই সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত হন পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহণ সংস্থার কন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা।

বাষট্টিতে যার শুরু, নানা চড়াই-উৎরাই বেয়ে সেই আন্দোলনেরই পরিণতি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ও একাত্তরের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে। আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদই হয় প্রধান শক্তি, জাতীয়তাবাদীরাই এসে যেতে থাকে আন্দোলনের পুরোভাগে। তবে, জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলনের নেপথ্য বিধান করে দেয় যে সাম্যবাদীরাই—সে সত্য থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত নয়।

ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়াল ভাঙা

'পেয়িং গেস্ট' কথাটার কোনো দেশীয় প্রতিরূপ নেই।' 'গেস্ট' শব্দটির বাংলা 'অতিথি' হয়তো যথার্থই। কিন্তু এর সঙ্গে 'পেয়িঙ' যুক্ত হলে ইংরেজি গেস্টকে আর বাংলায় অতিথি বলা চলে না। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে অতিথি হলেন নারায়ণ। এই নারায়ণ যার গৃহে পদধূলি দিতেন তিনি ধন্য হয়ে যেতেন, তাঁর সেবা করতে পেরে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। সেবার বিনিময়ে অতিথির কাছ থেকে পয়সা নেবেন—তেমন ভাবাই তো ছিলো পাপ। তবে, এটাও ঠিক, অতিথি কখনো অনির্দিষ্টকালের জন্যে গৃহস্থের ঘাড়ে চেপে বসে থাকতেন না। মাত্র এক তিথি বা চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে যিনি কারো বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন, তিনিই অতিথি। এমনটিই 'অতিথি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং এর ব্যবহারিক অর্থও ছিলো তা-ই।

কিন্তু যে-লোক এক তিথি ছাড়িয়ে বহু পক্ষ বা বহু মাস ধরে কারো বাড়িতে অবস্থান করতে থাকে তাকে যেমন অতিথি বলা যায় না, তেমনি তাকে বিনি পয়সায় সেবাও দেয়া চলে না। এমন লোককে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করতে হয় অথবা তাকে সেবা প্রদান করলে বাধ্য হয়ে তার মূল্য আদায় করতে হয়। মূল্যের বিনিময়ে সেবা প্রদানের প্রথাটির প্রচলন, স্বাভাবিকভাবেই, ঘটে পাশ্চাত্য দেশে। সে-দেশেই, তাই, উদ্ভব ঘটে 'পেয়িং গেস্ট' শব্দটিরও। এক পর্যায়ে বিকশিত পুঁজিবাদের পাশ্চাত্য দেশ থেকেই আমাদের মতো হতদরিদ্র দেশেও পণ্যে রূপান্তরিত অতিথি-সেবার ধারণাটি চলে আসে এবং সেই সঙ্গে এসে যায় 'পেয়িং গেস্ট' শব্দটিও। রাজশাহী শহরের রাণীবাজারে সুধীর গোবিন্দ মৈত্রের বাড়িতে 'পেয়িং গেস্ট' হয়ে থাকার আগে এ-শব্দটির সঠিক তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করতে পারিনি।

মৈত্র বাড়িতে এসেই দেখতে পেলাম যে, কিছু লোককে পেয়িং গেস্ট হিসেবে সেবা প্রদান করে একটি দরিদ্র পরিবার নিজেদের আহারের সংস্থান করতে এবং কোনো রকমে টিকে থাকতে পারছে। মৈত্র মহাশয়ের সহধর্মিণী, যাকে আমরা বলতাম 'মৈত্র মাসি', ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও প্র্যাকটিকেল ভদ্রমহিলা। ক্ষয়িষ্ণু ও ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারের সন্তান সুধীর গোবিন্দ

মৈত্র লেখাপড়া জানতেন খুবই সামান্য। বোধহয় ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। পঞ্চাশ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাস হওয়ার পর স্ত্রী ও নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে মৈত্র মহাশয় পড়ে যান একান্ত বিপাকে। সেই বিপাক থেকে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমাদের মৈত্র মাসিই তাঁকে উদ্ধার করেন।

না, শুরু থেকেই তিনি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট রাখতে শুরু করেননি। এ-ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেন অনেক পরে। এর আগে মৈত্র মাসি তার স্বামীর জন্যে জীবিকার অন্যতম ক্ষেত্রের সন্ধান করেছিলেন। মৈত্ররা পৌরোহিত্য করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তবে, পৌরোহিত্য করার অধিকার থাকলেও সুধীর গোবিন্দ মৈত্র বা তার পূর্বপুরুষরা কেউই পুরোহিত ছিলেন না। কারণ, ছোট হলেও তারা তো জমিদার। জমিদাররা বাড়িবাড়ি ঘুরে পুরুতের কাজ করতে যাবেন কেন?

কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। ভালো কোনো চাকরি-বাকরি করার শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করার মূলধন কোনোটাই যেহেতু সুধীর গোবিন্দ মৈত্রের নেই, জমিদারি চলে যাওয়ার পর তিনি কি করবেন? মৈত্র মাসি স্বামীকে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। তুমি তো বামুনের ছেলে বামুন। গলায় এক গাছা পৈতা আছে। এই পৈতা দিয়েই তুমি রোজগার করতে পারো। পুরুত ঠাকুর হয়ে যাও। পুরুত ঠাকুরদের রোজগার একেবারে কম নয়। যজমানদের কাছ থেকে চালকলা আর দক্ষিণা যা পাবে তা দিয়ে কোনো রকমে অন্তত জীবনটা তো বাঁচানো যাবে।'

কিন্তু বামুনের ছেলে হলেও পুরুতগিরি করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। এর জন্যে যেমন একটা বংশগত পশ্চাৎপট চাই, তেমনি পুরুত হওয়ার একটা টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন পড়ে। আর পেশাদার পুরুতদের এমন একটা কৃত্রিম ভঙ্গি থাকতে হয় যা অতি সহজে যজমানদের মনে এক ধরনের সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। সুধীর গোবিন্দ মৈত্রের এ-সব কোনো কিছুই নেই। তা ছাড়া বংশপরম্পরায় একটি পুরোহিত পরিবারের থাকে সুনির্দিষ্ট যজমান গোষ্ঠী। কুল পুরোহিতকে পরিত্যাগ করে কোনো যজমানই সাধারণত নতুন পুরোহিতের কাছে যেতে চায় না। এ অবস্থায় মৈত্র মাসি চাইলেও ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বা নবশাখদের মধ্য থেকে যজমান জোগাড় করে নিয়ে তার স্বামীর পক্ষে পুরুতের ব্যবসায়ে নামা সম্ভব ছিলো না।

মৈত্র মাসি এতেও হাল ছাড়েননি। তিনি স্বামীকে পাঠিয়ে দিলেন রাজশাহী শহর থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে বাগদি পাড়ায়।

কোনো শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাগদিদের মতো অন্ত্যজ জাতের লোকদের যজমান বানিয়ে তাদের পুরোহিত হয় না। হলে সে সমাজচ্যুত হয়, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজে তার আর ঠাঁই থাকে না। মৈত্র মাসি সমাজচ্যুতির পরোয়া করেন না, জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামান না। ভাত না থাকলে জাতের কী দাম আছে? কিন্তু মৈত্রদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা আত্মীয়-স্বজনরা, যাঁরা বড়ো চাকুরে কিংবা ডাক্তার মাস্টার উকিল ইঞ্জিনিয়ার, তাঁরা ব্যাপারটিকে খুব সহজ মনে মেনে নিতে পারেন না। তাদের গৃহিণীরা মৈত্র মাসিকে বলেন, 'আমাদের চৌদ্দ পুরুষের কেউ পুরুতগিরি করেননি। তা বামুনের ছেলে পুরুত হলে নিন্দার অবিশ্যি কিছু নেই। তাই বলে তোর স্বামীকে তুই ছোটজাত বাগদিদের পুরুত হতে দিলি? লজ্জায় যে আমাদের মাথা কাটা যায়।'

মৈত্র মাসি তাদের প্রশ্ন করেন, 'কেন, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে কেন? তোমাদের স্বামী বা ছেলেরা যে ডাক্তারি করে তারা কি কেবল বামুন রোগীরই চিকিৎসা করে? উকিল কি মেথর মক্কেলের মামলা করে দেয় না? মাস্টার কি বেছে বেছে কেবল উঁচু জাতের হিন্দুর ছেলেমেয়েদেরই পড়ায়? ডাক্তার উকিল মাস্টার যদি বামুন-শূদ্র বা হিন্দু-মুসলমান সব জাতের রোগী বা মক্কেল বা ছাত্র নিতে পারে, তবে আমার স্বামী বাগদিদের পুরোহিত হয়ে কি দোষ করলো?'

তার দাঁতভাঙা যুক্তির সামনে কেউ তিষ্টোতে পারেনি।

মৈত্র মাসি খুব আলাপী মহিলা ছিলেন। আলাপে আলাপে তিনি তাঁদের পরিবারের সব কথাই আমার কাছে খোলাখুলি বলে ফেলতেন, কোনো রূপ লুকোছাপা করতে জানতেন না। স্বামীকে বাগদিদের পুরোহিত বানিয়ে তিনি যে পরিবারটিকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন মৈত্রমাসি সে-কথা গর্বের সঙ্গেই উল্লেখ করতেন। তাঁর বড়ো মেয়েটিও বলতো, 'বাবার গলার পৈতাটিই আমাদের অনেকদিন ধরে খাবার জুগিয়েছে। ওটি না থাকলে আমরা বেঁচে থাকতেই পারতাম না।'

সুধীর গোবিন্দ মৈত্রের পরিবার-পরিজনের খাবার জোটার ব্যাপারটা একান্ত বাস্তবই ছিলো বটে এবং সে বাস্তবের খবর মৈত্র পরিবারের সদস্যদের মুখ থেকেই পেয়েছিলাম। কিন্তু শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণকে (অর্থাৎ 'আসল' ও 'খাঁটি' ব্রাহ্মণকে) পুরুত রূপে পেয়ে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বাগদিরা যে কী পরিমাণে খুশি হয়ে উঠেছিলো তা তাদের না দেখে বা তাদের কথা না শুনেও আমি ঠিকই কল্পনা করে নিতে পেরেছিলাম। দুলে বাগদি হাড়ি ডোম মুচি—এ-রকম অন্ত্যজ জাতের লোকেরা নিজেদের 'হিন্দু' বলেই বিবেচনা করে, আদম শুমারিতেও তাদের নাম হিন্দুর তালিকাতেই লেখা হয়, হিন্দুদের শাস্ত্র মেনেই তারা পূজা-পার্বণ বা বিবাহ ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানও করে বা করতে চায়। অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজ ওদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্যে কোনো ব্রাহ্মণ- পুরোহিতেরই ব্যবস্থা রাখেনি। এমনকি, তারা নিজেদের উদ্যোগে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের আচার অনুসরণ করতে চাইলেও উঁচু জাতের হিন্দুদের হাসির খোরাক হয়েছে বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়েছে। কখনো কখনো সেই শাস্ত্র অনুসরণ করতে গিয়ে কারো কারো করুণ পরিণতিও ঘটেছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে অত্যন্ত দরদ দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুদের এ-রকম কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। শরৎচন্দ্রের যে কোনো পাঠক 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের সেই দুলে বৌটির কথা স্মরণ করতে পারবেন। রসিক দুলের বৌ অভাগীর সাধ ছিলো যে, তার মরার পর ছেলে কাঙালি ওই বামুনদের মতো আচার অনুষ্ঠান পালন করে তার মুখে আগুন দেবে, আর তাতেই সে মুখুজ্যে গিন্নির মতো রথে চড়ে স্বর্গে চলে যাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের হৃদয়হীনতা দুলে বৌয়ের এই সাধটুকুও পূর্ণ হতে দেয়নি। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে মধু ডোমের কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। ডোমেদের কোনো ব্রাহ্মণ-পুরোহিত না থাকলেও নিজেদের জাতের মধ্য থেকেই কেউ কেউ গলায় পৈতা ঝুলিয়ে স্বঘোষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সেজে পুরোহিতের কাজ করে। মধু ডোমের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে এ-রকমই দু'জন পুরোহিতের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গিয়েছিলো। মেয়ে পক্ষের পুরোহিত রাখাল পণ্ডিতের মন্ত্রজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেছিলো বরপক্ষের পুরোহিত শিবু পণ্ডিত। রাখাল পণ্ডিত মন্ত্র পড়াচ্ছিলো, 'মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।... ... ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ।' শিবু পণ্ডিত এই মন্ত্র শুনে রাখালের মুখ চেপে ধরেছিলো। শিবুর মতে রাখাল ব্যাটা মন্ত্রের 'ম'

ও জানে না। শিবু নিজে তখন সকলকে তাক লাগিয়ে 'আসল' মন্ত্রগুলো বললো, 'মধুডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ। যতদিন জীবনং ততোদিন ভাতকাপড় প্রদানং সাহা।'

শিবুর মুখে এই সব অসাধারণ মন্ত্র শুনে ডোমদের সকলে বলতে লাগলো, 'হ্যাঁ, একজন শাস্ত্রজানা লোক বটে! মন্তর পড়ালে বটে। রাখাল পণ্ডিত এতোকাল আমাদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিলো।'

অনুমান করতে পারি: রাজশাহীর বাগদিরা তাদের নিজেদের ভেতরকার রাখাল পণ্ডিত বা শিবু পণ্ডিতদের বদলে একেবারে 'আসল' ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সুধীর গোবিন্দ মৈত্রকে পেয়ে হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গিয়েছিলো। তাই তারা তাদের সাধ্যের চেয়েও বেশি দক্ষিণা দিয়ে এই ব্রাহ্মণকে তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলো।

কিন্তু এই ব্রাহ্মণের কপালে এ-রকম সুখ বেশিদিনের জন্যে লেখা ছিলো না। বাগদিরাও বর্ণহিন্দুদের মতোই দলে দলে দেশত্যাগ করে হিন্দুস্থানে পাড়ি জমাতে লাগলো। সুধীর গোবিন্দ মৈত্রের পৌরোহিত্যের পালেও লাগলো ভাটার টান। তখনই বাড়িতে পেয়িং গেস্ট রাখার ব্যবস্থা করে মৈত্র মাসি নতুন কায়দায় তার সংসারটির হাল ধরলেন। আমি আর শচীন সে বাড়িতে যাওয়ার আগে থেকেই সেখানে পেয়িং গেস্ট ছিলো রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ফণীভূষণ দাস ও শিবুপদ সাহা। ওরা হোস্টেলে সিট পেয়ে চলে গেলে আমিই ময়মনসিংহ থেকে জোগাড় করে নিয়ে গিয়েছিলাম হরকিশোর মিশ্র আর অহীন্দ্র চৌধুরীকে।

প্রাক্তন জমিদার ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সুধীর গোবিন্দ মৈত্র বাগদিদের পুরুতগিরি করলেও পাকিস্তান জামানায় বর্ণহিন্দুরা তাকে সমাজচ্যুত করেনি বা করতে পারেনি। কিংবা ছাত্রদের পেয়িং গেস্ট রেখেও, অর্থাৎ সাদামাটা কথায় ভাতের ব্যবসা করেও, মৈত্র পরিবারটি 'পতিত ব্রাহ্মণ' হয়ে যায়নি। এর আগের জামানায় মানে ইংরেজ আমলে হলে এদের সমাজচ্যুত বা পতিত হতেই হতো। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বর্ণহিন্দু জমিদার-তালুকদারদের সৃষ্ট নয়া সামন্ততন্ত্রে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের হৃদয়হীন বিধানই হিন্দু সমাজের ওপর নিষ্ঠুরভাবে চেপে বসেছিলো। কোলকাতার মতো মহানগরীতে বিত্তবান হিন্দুরা সে-বিধানকে কখনো কখনো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারলেও গ্রামে বা মফস্বল শহরে তেমনটি করা কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির বিধানে জন্মসূত্রেই যার জন্যে যে আচার ও কর্ম নির্দিষ্ট থাকতো তার বাইরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন ছিলো। পাকিস্তান জামানায় সে-সব কঠিন দেয়াল ভেঙে পড়লো। পঞ্চাশের দশকেই ময়মনসিংহ শহরেও এমন একটি ভাঙন প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

বাঙালি হিন্দুরা বিভিন্ন দেবদেবীর যে সব মূর্তির পূজা করে সে সব মাটির মূর্তি কিন্তু যে কেউ বানাতে পারে না। বানালেও সে মূর্তি দিয়ে পূজা হবে না। পূজা হবে কেবল 'আচার্য ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়ভুক্ত কারিগরের তৈরি মূর্তিতে। এমনকি পাল-পদবিধারী কুমারদের তৈরি মূর্তিকে পূজা করাও বিধিসম্মত ছিলো না। অথচ, পঞ্চাশের দশকে ময়মনসিংহ শহরে দেখলাম হিন্দুদের পূজার মূর্তি তৈরি করে দিচ্ছে একজন মুসলমান শিল্পী। নাম তার রশিদ।

সে-সময়ে ময়মনসিংহে দাশুবাবু ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ একজন মূর্তি শিল্পী। বালক রশিদ কী করে জানি দাশু বাবুর শিষ্য হয়ে পড়ে। অল্পদিনেই শিষ্য শিল্পনৈপুণ্যে গুরুকে ছাড়িয়ে যায়। ময়মনসিংহ শহরের পূজারিরা দাশু বাবুর চেয়ে রশিদের তৈরি মূর্তিকেই বেশি পছন্দ করতে থাকে, মুসলমানের তৈরি মূর্তিকে পূজা করা শাস্ত্রসম্মত কিনা সে প্রশ্ন তারা একবারও তোলে

না। মনসা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা— সারা বছর ধরে রশিদ এ সব মূর্তি তৈরি করে চলে, দুর্গাপূজার সময় তার ডিমান্ড একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে যায়। তার তৈরি সকল মূর্তিই হতো গতানুগতিকতা বর্জিত ও মৌলিকতার স্পর্শমণ্ডিত। শাস্ত্রীয় বিধান মেনেই যদিও দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে হয়, তবু শিল্পীর স্বাধীনতাও এতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে প্রতিভাধর শিল্পী রশিদ মূর্তি শিল্পে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করতে থাকে।

শুধু পূজার মূর্তিই নয়, পূজামণ্ডপের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতো রশিদের তৈরি পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক মূর্তিগুলো। সেগুলোতেই বরং তার প্রতিভা আরো উজ্জ্বলতর রূপে মূর্ত হয়ে উঠতো। দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্রের মূর্তি নির্মাণ করতে করতে সে ঝুঁকে পড়লো একান্ত বাস্তব সাধারণ মানুষের মূর্তি নির্মাণের দিকে। মেহনতি কৃষক আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের কয়েকটি মূর্তি তৈরি করে সে শিল্পরসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে যায়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের স্নেহদৃষ্টি লাভেও সে ধন্য হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আরো একটি কাজ করতো রশিদ। পূজামণ্ডপে বসে সে চণ্ডীপাঠ করতো। তার সুরেলা কণ্ঠ আর নিখুঁত উচ্চারণের চণ্ডীপাঠ শুনতে শুনতে মানুষ তন্ময় হয়ে যেতো। ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়াল ভাঙায় রশিদ এভাবেও অবদান রেখেছিলো। ছেলেবেলায় শুনেছি: ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ চণ্ডীপাঠ করলে তার জিভ খসে পড়ে। অথচ, চণ্ডীপাঠ করে অব্রাহ্মণ ও অহিন্দু রশিদের জিভ খসে পড়েছিলো বলে শুনিনি।

তবে তার বিরুদ্ধে অনেকেরই জিভ শাণিত হতে দেখেছি। বুৎপূজারি হিন্দুদের বুৎ তৈরি করে দেয় যে-লোকটি সেও তো বুৎপূজারিদেরই দলের। এই অভিশপ্ত লোকটিকে মুসলমান বলবে কেন?

যারা তাকে অভিশপ্ত আর অমুসলমান বলতো তারাই তাকে একাত্তরের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে তুলে দেয়। মিলিটারির ক্যাম্প থেকে সে আর ফিরে আসেনি। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অগণিত শহীদের রক্তের স্রোতে মিশে যায় আরেকজন শহীদের রক্ত। শহীদ শিল্পী রশিদের রক্ত।

দেয়াল ভাঙার সূচনা: পাকিস্তানের আগে

এদেশে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়ালটি পাকিস্তান জামানাতেই ভেঙে পড়েছিলো। এবং এ-ব্যাপারে, পরোক্ষ হলেও, পাকিস্তান রাষ্ট্রটির একটি জোরালো ভূমিকা ছিলো। পাকিস্তানি উৎপীড়নের ধাক্কায় হিন্দুদের শান্তি ও স্বস্তি বিপর্যস্ত হয়েছিলো অবশ্যই। তবে সেই ধাক্কাতেই তাদের রক্ষণশীলতার দেয়ালটিও যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিলো, সে-কথাও অস্বীকার করা যাবে না। যে-কাজটি নিজেরা করতে পারেনি, সেটিই তাদের উৎপীড়ক প্রতিপক্ষ করেছিলো।

তাই বলে এমন ভাবাও সঙ্গত হবে না যে, পাকিস্তান জামানার আগে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়ালটিতে কোনো ফাটলও দেখা দেয়নি, কিংবা হিন্দুরা সে দেয়াল ভাঙার কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। বাঙালির ইতিহাসের যে কোনো পাঠকই উনিশ শতকের হিন্দু কলেজের ছাত্র তথা ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহের খবর জানেন। ইয়ং বেঙ্গলের একজন মুখপাত্র রূপে এক হিন্দু সন্তানই লিখেছিলেন যে, তারা হিন্দু ধর্মকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করেন।

(It there is anything that we hate from the botton of our heart, it is Hinduism.) এ-রকমই আরেকজন হিন্দু ছাত্র গঙ্গাজল স্পর্শ করে আদালতে শপথ করতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ তিনি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করেন না। মুসলমানের দোকান থেকে গরুর মাংস কিনে খেয়ে তার হাড়গুলো সোল্লাস চিৎকারে ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিক্ষেপ করে ওই ইয়ংবেঙ্গল হিন্দু সন্তানরাই হিন্দুত্বের সংস্কারের মাথায় তীব্র পদাঘাত হেনেছিলো।

ইয়ং বেঙ্গলের এ-রকম কালাপাহাড়ি আচরণের কথা বাদও দিই যদি, রামমোহন বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন যে হিন্দু রক্ষণশীলতার দেয়ালে বেশ বড়ো ধরনের ফাটল ধরিয়েছিলো, সে-কথা না মেনে পারবো না। এমনকি পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রকৃত হিন্দু ধর্মব্যাখ্যাও, আপাত রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও, সেই দেয়াল ভাঙার কাজেই সহায়তা করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয়ের বাণীও দেয়াল ভাঙার ক্ষেত্রে কম অবদান রাখেনি।

তবু, এ-সবের পরও, বলতেই হবে যে, রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকল মনীষীর ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের প্রয়াস হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে ব্যাপ্ত হতে পারেনি। নাগরিক সমাজে এ-সব যতোটা সুফল ফলিয়েছিলো, গ্রামীণ সমাজে ততোটা পারেনি। নাগরিক সমাজেরও উচ্চস্তরে এ-সবের প্রভাব ছিলো একরকম, মধ্য ও নিম্নস্তরে অন্যরকম। কোলকাতা মহানগরীতে যে রকম ছিলো, মফস্বলের শহর-নগরগুলোতে সে-রকম নয়। গ্রামীণ হিন্দু সমাজ তো ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের হৃদয়হীন বিধানের দাপটে জবুথবু হয়ে থেকেছে এই সেদিন পর্যন্ত।

তবে গ্রামীণ সমাজেও দেয়াল ভাঙার প্রক্রিয়া চলছিলোই। সে প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজে উদ্ভূত ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারের প্রভাব পড়েছিলো বটে, কিন্তু এর আসল শক্তিটি এসেছিলো গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব বাস্তবতা থেকে। সে-বাস্তবতাকে আমি সে-সমাজের একেবারে ভেতর থেকে দেখেছি। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে লোকসমাজ যে লৌকিক রীতিপদ্ধতিতেই রুখে দাঁড়িয়েছিলো তার উল্লেখ আগেই করেছি। অপমানে জর্জরিত নিরক্ষর কৃষকদের ভাবলোক যে গঠিত হয়েছিলো সম্প্রদায়ের গণ্ডিভাঙা সমন্বয়ের উপাদান দিয়ে, আর তাতে যে বিদ্রোহের ভাবও প্রচুর পরিমাণে ছিলো, সে সবের পরিচয়ও জেনেছি। আবার, বেদনার সঙ্গে এও লক্ষ করেছি যে, লোকসমাজের সমন্বয়ী ধর্মচিন্তা ও বিদ্রোহী চেতনা শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মসম্প্রদায়ই এক সময়ে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। এ-রকম করতে গিয়ে উভয় সম্প্রদায়কেই আবার নিজেদের ভেতরকার দুর্বলতা ও অসঙ্গতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে এবং তাতে অভ্যন্তরীণ সংঘাতও কম হয়নি। সংঘাত-সমন্বয়ের এ-প্রক্রিয়াতেই গ্রামীণ হিন্দু সমাজের ভেতরেও ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়াল ভাঙার কাজটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিলো।

আমার নিজের গ্রাম ও তার আশপাশের গ্রামগুলোর হিন্দুদের মধ্যে এ-প্রক্রিয়াটি ছেলেবেলায় আমি নিজেও কিছুটা অবলোকন করেছি, গুরুজনদের মুখেও অনেক কথা শুনেছি।

হিন্দু সমাজে—বিশেষ করে গ্রামে—কি ধরনের রক্ষণশীলতা-যে ছিলো, কতো যে-তার কুঠুরি আর দেয়াল ছিলো, যুক্তিহীন সংস্কার-যে মুক্তবুদ্ধিকে কতোভাবে দাবিয়ে রেখেছিলো, তুচ্ছ আচারের মরুবালি রাশি যে বিচারের স্রোতপথকে কেমনভাবে গ্রাস করে নিয়েছিলো—

সে-সবের বিবরণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে হয়তো একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হবে। সমস্ত হিন্দুর জন্যে প্রযোজ্য কতকগুলো সাধারণ নিষেধবিধি তো ছিলোই, তার ওপর জাতভেদ-কণ্টকিত হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতের জন্যে ছিলো কতকগুলো বিশেষ বিশেষ বিধিবিধান। সে-সব বিধিবিধান লংঘন করলেই জাত যেতো। এই জাত যাওয়ার বিষয়টাকে বুঝানোই তো এখন কঠিন ব্যাপার। অথচ তখন ব্রাহ্মণ্য বিধিবিধানের একটু এদিক-ওদিক করলেই, পান থেকে চুন খসলেই, জাত যেতো। সমাজে একঘরে হতে হতো। ধোপা-নাপিত বন্ধ হতো। অবিশ্যি একঘরে হওয়া থেকে কিংবা জাত খোয়ানো থেকে ফেরারও পথ ছিলো বটে। সে-পথ হলো প্রায়শ্চিত্তের। 'প্রায়শ্চিত্ত' কথাটার আক্ষরিক অর্থ হলো 'পাপক্ষয়-সাধন কর্ম'। অভিধানেই তার ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে—'প্রায়ঃ শব্দের অর্থ তপঃ অর্থাৎ তপস্যা এবং চিত্ত শব্দের অর্থ নিশ্চয়; নিশ্চয়-সংযুক্ত অর্থাৎ পাপক্ষয় সাধন বিষয়ে নিশ্চিত তপস্যা প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত।' তবে আভিধানিক অর্থ যাই হোক, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবহারিক অর্থ হয়ে গিয়েছিলো অন্যরকম। এর সঙ্গে তপস্যা টপস্যার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। ওই বিধানে যা কিছুই পাপ বলে সাব্যস্ত হতো তা থেকে পরিত্রাণের জন্যে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান করতে হতো। সেই অনুষ্ঠানটিরই নাম প্রায়শ্চিত্ত। সেই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের আসল বিষয়টিই হচ্ছে: ব্রাহ্মণকে অর্থ, স্বর্ণ, বস্ত্র, ধেনু ইত্যাদি দান করতে হবে। পাপের রকম অনুযায়ী দানেরও আছে রকমফের। তবে যে-রকম পাপই হোক, ব্রাহ্মণকে তার মূল্য না দিয়ে তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না, অর্থ দিয়েই পাপের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

আর হিন্দুর পাপ যে কতো কিছুতে হতো তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা কে তৈরি করতে পারবে?

স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানে কলিযুগের হিন্দুর জন্যে একটি বড়ো পাপ হলো সমুদ্রযাত্রা। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যে-হিন্দু বিলাত যেতো, তার জাত খোয়ানো ছিলো অবধারিত। তবে শিক্ষিত বিলেত ফেরতদের কেউই সাধারণত জাতের পরোয়া করতেন না এবং গ্রামসমাজের সঙ্গে তাদের খুব একটা সম্বন্ধ থাকতো না বলেই পরোয়া না করে পারতেন। কেউ কেউ অবিশ্যি ব্রাহ্মণ্য বিধান মেনে মাথা ন্যাড়া করে, গোবর খেয়ে ও ব্রাহ্মণকে অর্থ দান করে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করতেন এবং সেভাবেই খোয়ানো জাত ফিরে পেতেন। যাঁরা তা করতেন না তাঁদের অনেককে হিন্দু সমাজের বাইরে অন্য সমাজে গিয়ে আশ্রয় নিতে হতো। বাবার মুখে শুনেছি: কিশোরগঞ্জের রমেশ চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণ ডাক্তারি পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন। বিলেত ফেরত এই ডাক্তার প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হননি বলে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি আমেরিকায় গিয়ে হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন বলে যাঁকে নিয়ে হিন্দুদের গর্বের অন্ত নেই, সেই স্বামী বিবেকানন্দকেও হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রার অপরাধে 'সমাজচ্যুত' করেছিলো। তাঁকে তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে ঢুকতে দেয়নি। জাত খোয়ানো এই লোকটি মন্দিরে ঢুকলে মন্দির যে অপবিত্র হয়ে যাবে।

তবে স্বামী বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বলে তাকে সমাজচ্যুত করলেও তাঁর কিছু যায় আসে না, জাত খোয়ানো নিয়েও তাঁর ভয় পাবার কিছু ছিলো না। সন্ন্যাসী রূপে তিনি তো ছিলেন সব জাতবর্ণের ঊর্ধ্বে। কিন্তু সমাজে যাদের বাস করতে হতো তারা যখন ব্রাহ্মণ্য বিধানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হিন্দু সমাজে একঘরে হয়ে যেতেন, তখন তাদের বাসযোগ্য অন্যতর কোনো সমাজকে খুঁজে নিতেই হতো। তাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নিতেন।

ব্রাহ্মরা আসলে ছিলেন ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কারত্যাগী 'এনলাইটেন্ড হিন্দু'। এই এনলাইটেন্ড হিন্দুদের গ্রামসমাজে অবস্থান করা খুব কঠিন হতো, স্বভাবতই তারা হতেন শহর-নগরের বাসিন্দা। শহর-নগর থেকে তাদের কেউ কেউ যখন গ্রামের বাড়িতে যেতেন, তখন প্রথাবদ্ধ গ্রামীণ সমাজের ঘোলাজলের ডোবাতেও তারা ঢেউ জাগিয়ে তুলতেন। এদের অনেকেই ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার তালুকদার শ্রেণীর মানুষ। তাই গ্রামীণ সমাজপতিরা এদের সঙ্গে সহজে এঁটে উঠতে পারতেন না।

নেত্রকোনার চন্দনকান্দি গ্রামের সূর্যকান্ত চৌধুরী ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত গ্রামীণ ভূস্বামী। কায়স্থ জাতের এই তালুকদারটি স্বাভাবিক ভাবেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তার ইংরেজি শিক্ষিত পুত্র গিরীশ চৌধুরী ও শ্রীশ চৌধুরী এবং পৌত্র মনোরঞ্জন চৌধুরী ও সরোজ রঞ্জন চৌধুরীর অবস্থান ছিলো তার বিপরীত মেরুতে। তারা দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও শহর-নগরে ব্রাহ্মদের সঙ্গেই ছিলো তাদের ওঠা-বসা। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানের প্রতি তাদের মোটেই আনুগত্য ছিলো না। আমাদের এলাকার প্রথম গ্রাজুয়েট গিরীশ চৌধুরী ছিলেন উকিল। শহরেই ছিলো তার কর্মস্থল। শ্রীশ চৌধুরী কী একটা সরকারি চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর তিনি গ্রামের বাড়িতে চলে এলেন। কিন্তু গাঁয়ের মানুষের চোখে তাঁর আচার-আচরণ হয়ে উঠলো একান্তই কালাপাহাড়ি। ছাগমাংস তার প্রিয় খাদ্য ছিলো, তাই প্রায়ই তার বাড়িতে ছাগ হত্যা করা হতো। ছাগহত্যা বা ছাগমাংসভক্ষণ হিন্দুর জন্যে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু যে নিষিদ্ধ কাজটি শ্রীশ বাবু করলেন সেটি হচ্ছে চর্মকারের কাছে ছাগচর্ম বিক্রি করে দেয়া। চামড়া বেচা হচ্ছে কসাই কিংবা মুচিদের ব্যবসা। কায়স্থ সন্তান শ্রীশ চৌধুরী চামড়া বিক্রি করে তো প্রকারান্তরে কসাইয়ের ব্যবসাই করলেন। অর্থাৎ নিজের জাত থেকে নিচে নেমে পড়লেন, অস্পৃশ্যের দলভুক্ত হেয়ে গেলেন। তাই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণরা তার বাড়িতে জলস্পর্শ করতে পারেন না, তার পুরোহিত হতে পারেন না, তিনি 'পতিত' হয়ে গেছেন। এখন এই পাতিত্য মোচনের একমাত্র পথ প্রায়শ্চিত্ত করা। সেই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই ব্রাহ্মণরা শ্রীশ বাবুর ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন।

শ্রীশ বাবু তাদের বললেন, 'হ্যাঁ, পাপ যদি আমি করে থাকি তো প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করবো। কিন্তু আমি পাপ করেছি কি না সেই রায় কে দেবে? আপনাদের কি সেই রায় দেবার অথরিটি আছে? স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান কি অভ্রান্ত? স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী বিধান দেয়ার প্রকৃত অথরিটি হচ্ছে কাশীর পণ্ডিতসমাজ। সেই পণ্ডিতসমাজ যদি আমাকে পাপী বলে সাব্যস্ত করে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়, তবেই আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।...বিষয়টি নিয়ে কাশীতে আপনারা পত্র লিখুন। আমিও আমার বক্তব্য তাদের লিখে জানাবো। এরপর ঠিক হবে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না।'

কাশীর পণ্ডিত সমাজ কিন্তু শ্রীশ বাবুর পক্ষেই রায় ছিলেন। কারণ, শাস্ত্রমতে হিন্দু কখনো 'বৃথা মাংস' ভক্ষণ করতে পারে না। দেবতার কাছে যে পশু উৎসর্গ করা হয়, সেই পশুর মাংস ভক্ষণই শাস্ত্রসম্মত। দেবতার কাছে উৎসর্গ না করে কোনো পশু বধ করে তার মাংস খাওয়া হলেই হয় 'বৃথা মাংস ভক্ষণ'। পূর্ববাংলার নেত্রকোনা এলাকার হিন্দুদের সবাই যেহেতু বৃথা মাংস ভক্ষণ করে, তাই এটি সেখানে প্রথাসিদ্ধ হয়ে গেছে। যেখানে দেবতাকে উৎসর্গ না করেও আহারের জন্যে ছাগবধ করা হয়, সেখানে কেউ ছাগচর্ম বিক্রি করলেও তা প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য অপরাধ হতে পারে না।

কাশীর পণ্ডিত সমাজের এ-রায় আমাদের এলাকার ব্রাহ্মণদের খুব বেকায়দায় ফেলে দিলো। অগত্যা তারা একটা আপস ফর্মুলা উত্থাপন করলেন। বললেন: কাশীর পণ্ডিত সমাজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদিও আমরা কোনো কথা বলতে পারি না, তবু দেশাচার মান্য করে চলাই তো আমাদের উচিত। বর্ণহিন্দুর পক্ষে চামড়া বিক্রি করা হলো দেশাচার বিরুদ্ধ একটি কাজ। শ্রীশ বাবু যখন এ-রকম কাজ করেই ফেলেছেন, তখন কী আর করা যাবে! এখন ব্রাহ্মণ সমাজের মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি যদি একদিন তার বাড়িতে আমাদের ভোজে আপ্যায়িত করেন, তবে তার বিরুদ্ধে আমাদের আর কোনো অভিযোগ থাকে না।

শ্রীশ বাবু শুনে বললেন, 'এতো খুবই আনন্দের কথা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যদি আমার বাড়িতে একবেলা অন্ন গ্রহণ করেন তো আমি ধন্য হয়ে যাই।'

ব্রাহ্মণদের পাতেও তিনি ছাগমাংস পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। ভোজনপর্বের মাঝামাঝিতে যখন ব্রাহ্মণগণ পরমানন্দে ছাগশিশুর কচি হাড় চর্বণ করছিলেন, তখনই শ্রীশ বাবুর পূর্ব বন্দোবস্ত মতো সেখানে একটি মুচি এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই শ্রীশ বাবু ভোজনরত ব্রাহ্মণদের সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'ও, তুই বুঝি পাঁঠার চামড়া নিতে এসেছিস? দে, দাম দে।...ওরে কে আছিস, ওকে চামড়াগুলো দিয়ে দে তো।'

শ্রীশ বাবুর হাতে দাম দিয়ে চামড়াগুলো মাথায় তুলে নিয়ে মুচিটি চলে গেলো। ভোজনরত ব্রাহ্মণরা আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। কিছুই বললেন না, খাওয়া ছেড়ে উঠেও পড়লেন না।

সেই থেকে এ এলাকার হিন্দুদের মধ্যে চামড়া বিক্রির প্রচলন হয়ে গেলো।

এ-ঘটনাটির বর্ণনা আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছি। ঘটনাটি বিশ শতকের বিশের দশকের শেষ দিককার। এ সময়েই পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অব্রাহ্মণেরা অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। তারা আর ঢালাওভাবে শূদ্রত্ব স্বীকার করে নিতে রাজি থাকে না। কায়স্থরা বলতে থাকে: আমাদেরকে বামুনরা মিছিমিছি শূদ্র বানিয়ে রেখেছে। আমরা তো আসলে ক্ষত্রিয়। কাজেই আমরা এখন থেকে ক্ষত্রিয়ের আচার পালন করবো। বাপ-মা কিংবা গোষ্ঠী-জ্ঞাতিদের কেউ মারা গেলে ব্রাহ্মণেরা 'অশৌচ' ধারণ করে মাত্র এগারো দিন, আর শূদ্র রীতিতে আমাদের অশৌচ হয় এক মাস। এখন থেকে আমরা আর এক মাস ধরে অশৌচ ধারণ করবো না। বামুনদের কথায় আমরা শূদ্র হয়ে থাকবো কেন? ক্ষত্রিয়দের মতোই আমাদের অশৌচ হবে তেরো দিন।'

কায়স্থের চেয়ে 'নিচু' জাতের মানুষেরাও ব্রাহ্মণবিরোধী হয়ে ওঠে। ধোপা, নমশূদ্র, কৈবর্ত ও পাটনিদের মধ্যেও অনেকে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে বসে এবং গলায় উপবীত (পৈতা) ধারণ করতে থাকে। এ-ব্যাপারে পাবনা জেলার কাওয়াকোলা নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য লিখিত 'জাতিভেদ', 'শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার', 'জলচল', 'খাদ্যাখাদ্য বিচার' ইত্যাদি পুস্তকগুলো বিশেষ প্রেরণা জোগায়। এ-সমস্ত পুস্তকে ভট্টাচার্য মহাশয় বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ও স্মৃতিশাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে অব্রাহ্মণ জনগণের হীনমন্যতা দূর করতে সহায়তা করেন। বিধবা বিবাহের পক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে উনিশ শতকের কোলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সে-নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়েছে। কিন্তু মফস্বলের অধিবাসী দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য 'বিশ শতকের গোড়ায় পূর্ববাংলায় পল্লী এলাকার হিন্দু

সমাজে যে সংস্কার আন্দোলন সৃষ্টি করেন, সে-বিষয়ে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের গবেষকগণ প্রায় নীরব। অথচ বিদ্যাসাগরের চেয়ে দিগিন্দ্র নারায়ণের সংস্কার আন্দোলনের মূল্য কম তো নয়ই, এক অর্থে বেশিই বরং। নাগরিক মনীষী বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা সবাই জানে। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কারক দিগিন্দ্র নারায়ণ পূর্ববঙ্গের পল্লীর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তথাকথিত নিচু জাতের হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তার কথা এখন কেউই আর স্মরণ করে না।

বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে পল্লীবাংলায় যে ধর্মান্দোলনগুলো হয়েছিলো সে গুলোই আসলে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দুর্গে প্রবল আঘাত হেনেছিলো। ব্রাহ্মণদের এতোদিনকার একচেটিয়া অধিকার ভেঙে ফেলে এ-সময়েই অব্রাহ্মণের মধ্যে থেকেও ধর্মগুরুদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

সেকালের পূর্ব ময়মনসিংহের জগদল গ্রামের ভারত ব্রহ্মচারী মহোদয় কায়স্থকুলে জন্ম নিয়েও একজন বিশিষ্ট ধর্মসাধকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ-সন্তানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এ-রকমটি এর আগে কখনো হতে পারতো না। কারণ, হিন্দুধর্ম তো আসলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মই। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ না হয়ে কারো পক্ষে ধর্মগুরু হওয়া তো ছিলো অসম্ভব ব্যাপার।

ভারত ব্রহ্মচারী পূর্ব ময়মনসিংহের বৈরাটি, জগদল, লক্ষ্মীয়া ও মালনী গ্রামে চারটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এক উদারতামূলক ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তারই সুযোগ্য শিষ্য অশ্বিনীকুমার ধর '*সোনার বাংলা*' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন ও পরে এটির নাম হয় '*ভারত সমাজ*'। জমিদার অধ্যুষিত গৌরীপুরের পাশের একটি গণ্ডগ্রাম ভালুকায় সে-সময়ে 'হরিপ্রেস' নামে একটি ছাপাখানা বসানো হয়েছিলো। হরিপ্রেস থেকেই এই মাসিকপত্রটি ছাপা হতো। ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা-বিরোধী উদার ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টিতে এই পত্রিকার অবদান অসামান্য। এ-পত্রিকাটিও দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের সংস্কারমূলক চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলো।

নতুন এ-ধর্মান্দোলনের অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আমাদের চন্দপাড়ার দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস। আমার ঠাকুর্দার অনুজ-প্রতিম এ-মানুষটিকে আমরা 'দাস দাদা' বলে ডাকতাম। কায়স্থ বংশীয় হয়েও দাস দাদা ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক পৈতা ধারণ করে নিজের পৌরোহিত্যেই দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান করেন। তিনি নিজ হাতেই দুর্গা এবং অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমাও তৈরি করতেন। এ-সবই ছিলো ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের সুস্পষ্ট লংঘন। একজন অব্রাহ্মণের এ-রকম স্পর্ধা ব্রাহ্মণ সমাজ-নায়কদের সহ্য হয়নি। আশুজিয়ার পণ্ডিত গিরিশ বেদান্ততীর্থ উদ্যোগী হয়েছিলেন দেবেন্দ্র দাস মহাশয়কে সমাজচ্যুত করতে, কিন্তু সফল হননি। বরঞ্চ গ্রামাঞ্চলের আরো অনেক অব্রাহ্মণই দেবেন্দ্র দাস মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকেন। পুরো হিন্দু সমাজটাকে ব্রাহ্মণ্য ফ্রেমে বেঁধে রাখার জন্যে যে-সব বিধিবিধান তৈরি হয়েছিলো, কোলকাতা মহানগরে উনিশ শতকে ও গ্রাম বাংলায় বিশ শতকের বিশের দশক থেকে সে ফ্রেম ভেঙে বেরিয়ে আসার একটা দুর্দমনীয় প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো।

বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি বনাম পাকিস্তানি তমদ্দুন

হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার দেয়াল ভাঙার কাহিনী বর্ণনা করা পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শনের জন্যে প্রাসঙ্গিক কিনা, এ প্রশ্ন হয়তো অনেকেই তুলতে পারেন। কিন্তু আমি বিষয়টিকে একটু অন্য দিক থেকে দেখি। আমি মনে করি হিন্দুদের সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং সে-রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে আসার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পর্যায়ের সঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম ও মৃত্যু উভয়েরই নিবিড় সম্পর্ক আছে।

হিন্দু রক্ষণশীলতা নিজের সম্প্রদায়ের ভেতরই যেখানে অজস্র কুঠুরি বানিয়ে আত্মবিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, সেখানে অন্য সম্প্রদায়কে কাছে টানা তো তার পক্ষে অসম্ভবই। তবু, প্রথাশাসিত গ্রামীণ সমাজের লৌকিক সংস্কৃতিতে এমন একটি ঐক্যসূত্র ছিলো যা সকল সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতো। কিন্তু এক সময় সেই সেতুটি জীর্ণ ও অকেজো হয়ে পড়ে। মুসলমানদের ভেতর থেকে যখন একটি শিক্ষিত ও আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে, তখন সেই মধ্যবিত্ত তরুণরা হিন্দুদের সকল আচরণের মধ্যেই মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রকাশ দেখতে পায়। তারাও মুসলিম রক্ষণশীলতার দুর্গটিকে আরো পোক্ত করে নিয়ে সেখানে বসেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার তীর ছুঁড়তে শুরু করে দেয়। হিন্দু রক্ষণশীলতাই আরো যুক্তিহীন হয়ে, কিংবা অভিনব সব কুযুক্তির আশ্রয় নিয়ে, প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের সৃষ্টি করেছিলো। মুসলিম মধ্যবিত্ত তার উদ্ভব লগ্নেই এই হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তারাও এখন এর মোকাবেলা করতে চায় মুসলিম রিভাইভ্যালিজম দিয়ে। এ-ধরনের সব রিভাইভ্যালিজমই অতীতের এক কল্পলোক সৃষ্টি করে তাতে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখে। মুসলিম রিভাইভ্যালিজমও তাই করেছিলো।

মুসলিম রিভাইভ্যালিজম যখন স্বাতন্ত্র্য-চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে জঙ্গীরূপ ধারণ করতে থাকে, তখন হিন্দুরাও তাদের সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্যেই অভ্যন্তরীণ সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। উনিশ শতকে যে-সংস্কার আন্দোলন মূলত নাগরিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, বিশ শতকে তাই নতুন রূপে গ্রামীণ সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে। ছেচল্লিশে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পৃষ্ঠপটে হিন্দু মহাসভার মতো প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলও যে অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলন সংগঠিত করে প্রগতিশীল ভূমিকায় মঞ্চাবতীর্ণ হয়েছিলো, তাও আমরা লক্ষ করেছি।

অন্যদিকে যতোই অতীতের কল্পলোকের গুণগান করুন না কেন, বর্তমানকে উপেক্ষা করে যে বাস্তবে টিকে থাকা যায় না সে-কথা মুসলিম রিভাইভ্যালিজমের প্রবক্তারাও হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকে। নাসারাদের ভাষা শেখা জায়েজ কিনা, ইংরেজ শাসকদের চাকরি-বাকরি করা ঠিক কিনা ও দেশটি 'দারুল হরব' কিনা—এ-সব তর্কবিতর্ক পেছনে ফেলে বিশ শতকের সচেতন মুসলমান যুগের বাস্তবতাকে গ্রহণ করে নিতেই বেশি পরিমাণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এবং তা হতে গিয়েই অগ্রবর্তী হিন্দুদের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে যায়। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে কেবল যে হিন্দুদের গালাগালি আর অতীত মুসলিম গৌরবের রোমন্থন করলেই চলবে না, এ বিষয়েও তাদের বোধোদয় ঘটে। তারা বুঝে নেয় শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে হলে নিজেদেরও প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আর সে-শক্তির বিস্তার ঘটাতে হবে শিক্ষায় মননে ক্রীড়ায় সাহিত্যে নৃত্যে চিত্রে এক কথায়

সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল এলাকায়। সে-সময়ে তাই যে কোনো বিষয়ে যে কোনো মুসলমানের কৃতিত্ব সকল মুসলমানকে গর্বে ও গৌরবে স্ফীত করে তুলতো। গাঁয়ের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানও বহুভাষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী শহীদুল্লাহর প্রসঙ্গ গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতো, বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতি ছাত্র হুমায়ুন কবিরকে ছেলেপুলেদের সামনে মডেল হিসেবে উপস্থিত করতো, বিজ্ঞানসাধক কুদরত-ই-খোদার নামটি বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতো। ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠপালদের বিপরীতে সামাদদের নিয়ে মুসলমানদের অহংকার ছিলো সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধেরই স্পষ্ট প্রকাশ। একটি ধর্মান্ধ গোঁড়া গোষ্ঠী নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে নানা কটুকাটব্য করলেও শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই অপরিসীম সমাদর পেয়ে যান এই কবি। তাঁর শ্যামাসংগীত ও বৈষ্ণব ভাবাত্মক ভজনগুলো (কিংবা অন্যান্য গানে ও কবিতায় হিন্দু পুরাণের ব্যবহার) অনেককে বিব্রত করলেও ইসলামী গান কবিতা গজলের নজরুল ইসলাম গৃহীত হন মুসলিম জাগরণের কবিরূপে। সংগীত নৃত্য চিত্র শরিয়ত-সম্মত কিনা সে-বিতর্কে সংস্কৃতি মনস্ক তরুণ মুসলমানরা মওলানা আকরম খাঁর মতো ইসলাম বিশেষজ্ঞকে পর্যন্ত তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে পেয়ে যান। মওলানার *'সমস্যা ও সমাধান'* গ্রন্থটিতে গীতবাদ্য সহ নানা ললিতকলার সমর্থনে কোরান হাদিসের প্রচুর উদ্ধৃতি মুসলমান কলা রসিকদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেয়। আব্বাস উদ্দীন, জয়নুল আবেদিন আর বুলবুল চৌধুরী শুধু শিল্পী রূপেই নন, 'মুসলমান শিল্পী' হিসেবেও হন মুসলমান-নন্দিত।

এ-ভাবেই বিশ শতকের শুরু থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যে (অর্থাৎ অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ে) নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত নানা ক্ষেত্রে কৃতির সঞ্চয় করে 'সাম্প্রদায়িক আত্মবিশ্বাসে' বলীয়ান হয়ে ওঠে। সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হচ্ছিলো বলে মুসলমান মধ্যবিত্তের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভাবনায় সাম্প্রদায়িকতাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এবং হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের প্রতিক্রিয়া-থেকে-উদ্ভূত ও বিকশিত মুসলিম রিভাইভ্যালিজমই মুসলমানদেরকে 'সব পেয়েছির দেশ' পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখায়।

কিন্তু বাস্তবে এই স্বপ্নের রাষ্ট্রটির জন্ম হয়ে যাওয়ার পর স্বপ্নভঙ্গ হতেও বেশিদিন লাগে না। আটচল্লিশ থেকে আটান্ন—এই এক দশকেই বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত যেনো এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলে। মুসলমান ও ইসলামের নাম করে তাদের যে কী পরিমাণে প্রতারিত করা হয়েছে, মধ্যবিত্তের মর্মে মর্মে সে উপলব্ধির সঞ্চার ঘটে। এই উপলব্ধিই তাদের চেতনা থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্তিকে খসিয়ে দেয়। শাসক দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছিলো যে আওয়ামী মুসলিম লীগের, সে-দলটি 'মুসলিম' বাদ দিয়ে হয়ে যায় শুধু 'আওয়ামী লীগ'। আর তা থেকেই বেরিয়ে আসে রেডিক্যাল রাজনৈতিক গোষ্ঠী 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'। এরও আগে জন্ম নেয় 'গণতন্ত্রী দল'। অর্থাৎ রাজনীতিতে মুসলিম রিভাইভ্যালিজমের আবেদন অনেক দূরে সরে যায়, সেক্যুলার ভাবনাচিন্তাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আবার এসব কিছুর পেছনে বস্তুবাদী কম্যুনিস্টদের অনুঘটকের ভূমিকাটাও একেবারে গোপন থাকে না।

অন্যদিকে মূলত হিন্দুদের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছিলো যে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এর জিগির, পাকিস্তানের জন্মের পর তো সে- জিগিরের সব কার্যকারিতাই নিঃশেষ হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যায় হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর যারা এ-দেশে রয়ে গেলো তারা ছিলো

বৈষয়িক প্রভাব প্রতিপত্তিহীন। তাদের জমিদারি তালুকদারি মহাজনি নেই, বড়ো ব্যবসায়ী শিল্পপতিও তারা নয়, বড়ো সড়ো চাকরিতে তো তাদের অবস্থান শূন্যের কোঠায়। কাজেই হিন্দু জুজুর ভয় দেখিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে চাপা দিয়ে রাখা অসম্ভব হলো। মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের অবমাননাকর ব্যবহারের গল্প নতুন প্রজন্মের মুসলমান তরুণ তরুণীদের কাছে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হলো না। কারণ তারা দেখলো : মুরুব্বিরা যেমন বলে থাকেন হিন্দু ছেলে মেয়েরা তো তাদের তেমন অস্পৃশ্য বিবেচনা করে না, মফস্বল শহরে ও গ্রামে-গঞ্জেও হিন্দু-মুসলমানে একসঙ্গে পানাহার করে, নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একই সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

শুধু তাই নয়। পাকিস্তান জন্মের পর পর কেন্দ্রীয় গণপরিষদ ও পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদের মুসলিম আসনগুলোতে সরকারি মুসলিম লীগ দলেরই ছিলো একাধিপত্য। সেখানে বিরোধী দলের আসনে বসে বাঙালির মাতৃভাষার অধিকারসহ গণমানুষের নানা দাবি দাওয়া তুলে ধরেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে মনোরঞ্জন ধর পর্যন্ত প্রবীণ হিন্দু রাজনীতিকরাই। এর জন্যে তাঁদের নানা কুৎসা ও নির্যাতনও সইতে হয়। আত্মগোপনকারী ও কারাগারে আটক (এবং খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত) কম্যুনিস্ট কর্মীদেরও অধিকাংশই হিন্দু। অথচ হিন্দু হয়েও তাঁরা যে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাননি, এবং পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থে যে তাঁরা কথা বলেন, আন্দোলন করেন, নির্যাতিত হন—এ-ও তো সকলে চোখের সামনেই দেখে। কাজেই 'হিন্দুরা দেশদ্রোহী ও হিন্দুস্থানের দালাল'—পাকিস্তানবাদীরা অবিরাম এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে গেলেও এর ধার খুব বেশিদিন ধরে বজায় থাকে না।

আগে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে-সব অভিযোগ ছিলো সে-সব নিশ্চয়ই একদিনে দূর হয়ে যায়নি। এক সময়ে প্রতিপত্তিশালী হিন্দুদের কার্যকলাপ ও ব্রাহ্মণ্য আচার নিয়ম অবশ্যই সাধারণভাবে মুসলমানদের হিন্দুবিরোধী করে তুলেছিলো। সেই বিরোধিতার মুখে নিজেদের শক্তিকে সংহত করার জন্যে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়াল ভেঙে যে উদারতার বাতাবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলো তাতে তারা মুসলমানদের ডাকেনি, একথা ঠিক। কিন্তু একবার দেয়াল ভেঙে গেলে কারো প্রবেশই আর নিষিদ্ধ থাকে না। তাই গ্রামে-গঞ্জে জাতপাত আর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দুদের সংস্কার আন্দোলনের সীমানা অনায়াসেই হিন্দুসমাজের বাইরেও প্রসারিত হয়ে যায়। তারা অহিন্দুদেরও আর অস্পৃশ্য করে রাখে না। হিন্দুদের রক্ষণশীলতা ও অনুদারতাই দ্বিজাতিতত্ত্বকে শক্তি যুগিয়ে পাকিস্তানের জন্মকে ত্বরান্বিত করেছিলো। আবার, রক্ষণশীলতার দেয়াল ভেঙে-বেরিয়ে-আসা হিন্দুদের ভূমিকাই পাকিস্তানোত্তর নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের কাছে দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতাও তুলে ধরেছিলো। দ্বিজাতিতত্ত্ব অসার প্রমাণিত হওয়ার পরই পকিস্তানের মৃত্যুর প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তাই বলছিলাম: হিন্দুদের রক্ষণশীলতার দেয়াল ও সে দেয়াল ভাঙার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই সম্পর্কযুক্ত।

সাম্প্রদায়িকতার জিগির দিয়ে পাকিস্তানোত্তর কালের তরুণদের, বিশেষ করে ছাত্রদের, আর ভজানো যায় না। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ছাত্রলীগ ও রেডিক্যাল ভাবনার অনুসারী ছাত্র ইউনিয়ন—সচেতন ছাত্র সমাজের প্রায় সকলেই এই দুটো ছাত্র সংগঠনের কোনো একটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। মতের খুঁটিনাটি কিংবা নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাতের ফলে দু'দলের মধ্যেই

হয়তো নানা ফ্যাকশনের সৃষ্টি হয়েছে, ডান-বামের চেতনায় এরা নানাভাবে দোলায়িত হয়েছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবনায় আক্রান্ত হয়েছে খুব কম ছাত্র তরুণই। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা-ভিত্তিক 'ইসলামি ছাত্র সংঘ' বৃহত্তর ছাত্রসমাজের মধ্যে কোনো আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেনি।

তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে মনীষা-সম্পন্ন প্রবীণরাও এসে যোগ দেয়ার ফলে এদেশে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী বা রিভাইভ্যালিস্ট 'তমদ্দুন' দ্রুত বিলীয়মান হয়ে যেতে থাকে। প্রসার ঘটতে থাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক ভাবনার। বাংলা ভাষার জন্যে সংগ্রামের মধ্যেই নয় শুধু, আটচল্লিশ থেকে সাতান্ন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কয়েকটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-সম্মেলন আর একষট্টিতে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকীর উৎসবের মধ্যেও আমরা এর প্রমাণ পেয়ে যাই।

বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির এই প্রসারে পাকিস্তানি তমদ্দুনওয়ালারা আতঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তমদ্দুনের বদলে সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা মানেই তো পাকিস্তানের অক্কা পাওয়া। এই অক্কা পাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এরা নানা বালকসুলভ আচরণ করতে থাকে।

তেষট্টি সালে এমএ পরীক্ষা দিয়েই আমি গৌরীপুর হাইস্কুলে মাস্টারি নিই। আমাকে ম্যাট্রিক ক্লাসে বাংলা পড়াতে হতো। ক্লাস নাইনে বাংলা সাহিত্যের জন্যে নির্বাচিত পাঠ্য বইটি দেখে তো একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। কবি গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত এই সংকলনটিতে সম্পাদক একটি দীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান। ভূমিকাটিতে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসটি অভিনব। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা রূপে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে,—গোলাম মোস্তফার মতে এ-বক্তব্য ভুল। তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলা হচ্ছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। সংস্কৃতের চেয়ে সেমেটিক ভাষা আরবির সঙ্গে এর সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। হিন্দুরা সব সময়েই বাংলা ভাষার শত্রুতা করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যেও হিন্দুদের কোনো মৌলিক অবদান নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিই হয়েছে খ্রিষ্টান মাইকেল, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান নজরুল—এই তিন অহিন্দুর হাতে। কথাগুলো পড়ে মনে হলো ভাগ্যিস নজরুল মুসলমান হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। আর মাইকেল হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্ম ত্যাগী ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথের ঔরসে জন্ম নিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন! হিন্দু হলে এরা বোধ হয় কেউই বাংলা ভাষার কবি হতে পারতেন না।

নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি (যেটি আসলে একটি গান, এবং হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রতিবাদে রচিত) গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত এই বইটিতে সংকলিত হয়েছিলো। কিন্তু কবিতাটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছিলো সেই অবিস্মরণীয় দু'টি পংক্তি যাতে এই কবিতার মর্মবাণী বা অন্তঃসার নিহিত:

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

এ থেকেই বইটির সংকলয়িতা তথা পাকিস্তানি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' বইটিতে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বাংলা ভাষার উৎপত্তির অভিনব ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন।

পাকিস্তানবাদীরা এ-ইতিহাস নিয়ে কিছুদিন বাজার গরম করতে চাইলেও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক আবদুল হাইসহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতকীর্তি পণ্ডিতদের কেউই সুফিয়ানের যুক্তিপ্রমাণহীন ও স্বকপোল-কল্পিত মতকে স্বীকৃতি দেননি। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই যে-মতটি গৃহীত হয়নি সেই মতটিকেই তেষট্টি সালে গোলাম মোস্তফাকে দিয়ে ইস্কুল-পর্যায়ে চালু করে দেয়ার প্রয়াসের মধ্যে নিশ্চয়ই পাকিস্তানি শাসকদের একটা বদমতলব ছিলো। সেটি হচ্ছে এদেশের মানুষকে আবহমান কালের বাঙালির ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তথাকথিত পাকিস্তানি তমদ্দুনের অনুসারী বানানো। এই বদ মতলব থেকেই জঙ্গী শাসক আইউব খান 'হরফুল কোরান' দিয়ে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেন, ধামাধরা পণ্ডিতদের দিয়ে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করান, এমনকি বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে 'পাকিস্তানি জবান' বানানোর মূর্খসুলভ স্পর্ধা ও দুঃসাহস নিয়ে ঘোষণা করেন :

'সারি জবান মিলিজুলি কর এক জবান বানা চাহিয়ে, উয়ো উর্দু নেহি, উয়ো বাংলা ভি নেহি, উয়ো পাকিস্তানি জবান।'

বাঙালির জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানি জবান ও তমদ্দুন'-এর এসব ষড়যন্ত্র বাঙালিরা অবশ্যই সফল হতে দেয়নি। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো।' গৌরীপুরে বসেই সংবাদপত্রের পাতায় পড়লাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে তেষট্টি সনের বাইশে থেকে আটাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদযাপনের খবর। এই অনুষ্ঠানে যে 'প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, আলোচনা শুনেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে' এর হেতু ও তাৎপর্য বর্ণনা করে একজন গবেষক সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে অস্ফুট বিকাশ শুরু হয়েছিলো সেকালে, তাই টেনে নিয়ে গেছে সবাইকে অনুষ্ঠানের দিকে।"

[সাঈদ-উর-রহমান— '*পূর্ববাংলার রাজনীতি- সংস্কৃতি ও কবিতা*' (ঢাকা-১৯৮৩) পৃষ্ঠা ৮৩]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দ্বান্দ্বিক চরিত্র

পাকিস্তানের জন্মের তিন দিন আগেই, সাতচল্লিশের এগারো আগস্ট, পাকিস্তানের জনক বলে কথিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বকে নাকচ করে দিয়েছিলেন—এ-রকম মন্তব্য অনেকেই করেছেন। পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম সভায় তার ওই ভাষণকে বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে, জিন্নাহ সাহেব ওই ভাষণেই পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন।

হ্যাঁ, জিন্নাহর এগারোই আগস্টের ভাষণে অনেক সুস্থ ও যৌক্তিক বক্তব্য ছিলো, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধেই তিনি সেদিন কথা বলেছিলেন। আর তাছাড়া এ কথাও তো সত্য যে, জিন্নাহর আদতে ধর্ম নিয়ে কোনোদিনই মাথাব্যথা ছিলো না; তাঁর মনমানস গড়ে উঠেছিলো পশ্চিমা সেক্যুলার শিক্ষাদীক্ষার পরিমণ্ডলে; তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অর্ধেক সময় কেটেছে সেক্যুলার রাজনীতি করেই।

কিন্তু তা হলেই বা কী হবে? জীবনের এক পর্যায়ে এসে ব্যক্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার লক্ষে নিজেকে তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ

'মুসলমান' কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্র হলেন, আবার অগণিত দলিত ও নির্যাতিত মুসলমানেরও মনে স্বপ্ন জাগিয়ে তাদেরকে সাম্প্রদায়িকভাবে সংঘবদ্ধ করে তুললেন এবং নিজেই পাকিস্তান নামক বিষবৃক্ষটির জন্ম দিলেন। এরপর যতোই তিনি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ভালো কথা বলুন না কেন, তার সে- সব কথা যেন তাঁকেই ব্যঙ্গ করতে থাকে। বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে যে অমৃত ফলের আশা করা যায় না, অচিরেই তিনি তা নিজেও বোধহয় টের পেলেন। তাই, যে ক'দিন বেঁচেছিলেন সাতচল্লিশের এগারোই আগস্টের ভাষণের আর পুনরাবৃত্তি করেননি। বরং আটচল্লিশের মার্চে ঢাকায় এসে তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই শুধু ঘোষণা করলেন না, পূর্ববাংলার হিন্দু ও কম্যুনিস্টদের প্রতি ইঙ্গিত করে সকলকে এদের সম্পর্কে সাবধান থাকতে বললেন ও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, 'পূর্ববাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ।' আরো বললেন, 'আমরা বাঙালি বা সিন্ধি বা পাঠান বা পাঞ্জাবি এ-কথা বলার প্রয়োজন কি? না, আমরা সকলেই হলাম মুসলমান।'

লক্ষ করার বিষয়: এবার আর তিনি 'পাকিস্তানি' জাতির কথাও বললেন না, যেমনটি সাতচল্লিশের এগারো আগস্টে বলেছিলেন। আটচল্লিশের একুশ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত জিন্নাহর ভাষণটি পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি পাকিস্তানে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের নাগরিক অধিকারই স্বীকার করেন না, তার মতে এখানকার সকল অমুসলমানই দেশদ্রোহী। যে মুসলমানরা বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের কথা বলে তারা বিভ্রান্ত এবং ওই অমুসলমানরাই তাদের বিভ্রান্ত করেছে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে দিলে পাকিস্তানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—পাকিস্তানের জনক মহোদয় প্রকারান্তরে এ-কথাই বলে গেলেন। ঢাকা থেকে করাচিতে ফিরে যাওয়ার পাঁচ মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হলো। এরপর তাঁর উত্তরসূরিরাও নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার উত্তরাধিকারই বহন করে চললেন।

এই উত্তরাধিকার বহনের অর্থ হচ্ছে: দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের—বিশেষ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা, তাদের ওপর সর্বদা মানসিক নির্যাতন করা, স্বাভাবিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে বাস্তবে তাদেরকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা এবং মাঝে মাঝে তাদের জানমালের ওপর হামলা করা। এই শেষের কাজটিই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে নগ্ন ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সব দেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এ-কাজটি করে থাকে। উপমহাদেশটি ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রেই এ-কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যায়, উভয় রাষ্ট্রেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যখন তখন সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়। তবে, ভারতে গণতন্ত্রের (আসলে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের') প্রক্রিয়াটি চালু থাকার ফলে সেখানকার সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা নিজেদের দেশে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে যেমন প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে পেরেছেন, তেমনি বিভিন্ন দাঙ্গার সঠিক তথ্যও সেখানকার দায়িত্ববান সাংবাদিক ও ইতিহাসকাররা বই-পুস্তক লিখে জনগণকে জানাতে পেরেছেন। এ-মুহূর্তে আমার হাতের কাছে এ-রকম যে বইটি আছে সেটি শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*দাঙ্গার ইতিহাস*'। কোলকাতা থেকে উনিশশো তিরানব্বই সালে প্রকাশিত প্রায় চারশো পৃষ্ঠার এ- বইটিতে বিরানব্বই সাল পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রে যতোগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তার সবগুলোর পক্ষপাতহীন বর্ণনা আছে। শুধু বর্ণনা নয়, যৌক্তিক বিশ্লেষণও। তীব্র ঘৃণাও। কিন্তু পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তথ্যভিত্তিক ইতিহাস কেউ

লিখে রাখেননি, লিখে রাখতে পারেননি। পাকিস্তানে অন্য অনেক কিছুর মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর প্রকাশ—এমন কি দাঙ্গা হয়েছে বলে স্বীকার করাও ছিলো নিষিদ্ধ। আর পাকিস্তানের সেই ঐতিহ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশেও পরিত্যক্ত হয়নি, এ-তথ্যটিই বড়ো বেশি মর্মপীড়াদায়ক।

তবু, স্বাধীন বাংলাদেশের কথা আপাতত মুলতুবি থাক। এখন শুধু বলি পাকিস্তান জামানার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথাই। পাকিস্তানের দাঙ্গার কোনো লিখিত ইতিহাস না থাকলেও উনিশশো পঞ্চাশ, বাষট্টি আর চৌষট্টি—অন্তত এই তিনবার যে এখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর জঘন্য হামলা হয়েছে, সে-কথা কেউই লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এই তিনবারের দাঙ্গাই আমার স্মৃতিতে ছাপ রেখে গেছে। পঞ্চাশে আমি গ্রাম্য কিশোর, বাষট্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, চৌষট্টিতে এক ইস্কুলের শিক্ষক। পঞ্চাশ আর বাষট্টির দাঙ্গার কিছু কথা তো আগেই বলেছি, এবার বলছি চৌষট্টির কথা।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ও কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অস্ত্রটিকে বারবার ব্যবহার করেছে তাদের নিজেদের সংকট মোচনের জন্যে। চৌষট্টিতেও তাই করতে চেয়েছিলো। তবে যে কোনো অস্ত্র যে বারবার ব্যবহার করলে তার ধার ক্ষয়ে যায়, চৌষট্টির দাঙ্গায় তারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো।

চৌষট্টির দাঙ্গা তীব্রতায় ও নৃশংসতায় আগের সব দাঙ্গাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো কিনা বলতে পারবো না। তবে এ-কথা বলতে পারি যে, চৌষট্টি সালে দাঙ্গার বিরুদ্ধে যে-রকম প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো সে-রকমটি আগে কখনো হয়নি। সরকারি নিষেধবিধিকে উপেক্ষা করে এখানকার সকল পত্রপত্রিকায় দাঙ্গা ও দাঙ্গা-প্রতিরোধের সব খবর বিস্তৃত অনুপুঙ্খসহ ছাপা হয়েছিলো, তীব্র আবেগ নিয়ে সেদিন বাঙালি সাংবাদিকরা সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রামে কলমের অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। *'আজাদ'*-এর মতো সাম্প্রদায়িকতাবাদী কাগজও অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গে মিলে দাঙ্গাবিরোধী যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিলো। আর এবারই সর্বপ্রথম এখানকার রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সচেতন শ্রমিক সমাজ পর্যন্ত সকলে মিলে সমস্বরে আওয়াজ তুললেন—'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও'। শুধু ফাঁকা আওয়াজ নয়, সক্রিয় প্রতিরোধেও নেমে পড়েলেন। দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়েই দাঙ্গাবাজদের হাতে প্রাণ দিলেন সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী আমির হোসেন চৌধুরী। শোনা যায়, ঘাতকের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে তিনি একটি দুষ্কৃতকারীকে নিজ হাতে গুলি করেছিলেন। অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ সমরে তিনি আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেননি। নজরুল-সাহিত্যের প্রবল অনুরাগী ও বিপ্লবী মানবতাবাদী এই শহীদ বুদ্ধিজীবীর কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। অথচ, এঁর আত্মত্যাগ সেদিনকার সকল পূর্ববঙ্গবাসীর বিবেককে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেয়। আর তাতেই সারাদেশ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়ে। রাজধানীতে সে- সময় একটি শক্তিশালী 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয়েছিলে। আমির হোসেন চৌধুরী নিহত হওয়ার পর (চৌষট্টির সতেরো জানুয়ারি) দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই কমিটি একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিলো। ইশতেহারটি ছিলো এরকম :

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ি পোড়ান হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে, এমনকি আমির হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুণ্ডারা মুসলমান ছাত্রীনিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় গুণ্ডার কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্বপাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি, আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

পূর্ববাংলার মানুষের জীবনের উপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমরা পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহবান জানাইতেছি।

× প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন,

× গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন,

× পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন।

'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'র এই ইশতেহারটি প্রচুর সংখ্যায় বিলি করা হয়েছিলো, সংবাদপত্রেও বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই মনের কথার প্রতিফলন ঘটেছিলো। অন্য অন্যবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে সাধারণ মানুষদের অনেককেই সরকারি প্রচারণায় বিভ্রান্ত হতে দেখেছি। 'এদেশের হিন্দুদের গায়ে আঁচড়টিও লাগছে না, অথচ ভারতের মুসলমানদের ওপর কি অত্যাচারটাই না করা হচ্ছে!'—অনেকের মুখেই সরকারি প্রচারণার এ রকম প্রতিধ্বনি শুনেছি। কিন্তু চৌষট্টি সালের জানুয়ারিতে শুনলাম অন্যরকম কথা। এ-সময়ে আমি গৌরীপুর থেকে ট্রেনে ময়মনসিংহে ও নেত্রকোনায় কয়েকবার যাতায়াত করেছি, শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। ট্রেনের সাধারণ যাত্রী কিংবা শহরের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে দেখলাম : ভারতের দাঙ্গা নয়, এ-দেশের নিরীহ মানুষের ওপর হামলার জন্যেই সকলের কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়ছে; সর্বসাধারণের সেই ক্ষোভই সর্বত্র তীব্র প্রতিরোধের জন্ম দিচ্ছে। প্রতিরোধের এই তীব্রতা দেখে সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের শাসন-কর্তৃপক্ষ সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিলো। তড়িঘড়ি করে তারা দাঙ্গা থামাতে সক্রিয় হলো। যদি তা না হতো, কর্তৃপক্ষ যদি গড়িমসি করে আরো কিছুদিন দাঙ্গা চলতে দিতো, তাহলে কী যে ঘটতে পারতো আর কী যে ঘটতো না তা বলা খুবই মুশকিল। 'ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন তবে স্বর্ণলঙ্কাই পোড়া'—এই বলে বাঙালি সেদিনই হয়তো এ-অঞ্চলে পাকিস্তানকে কবর দিয়ে দিতো। একাত্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করতো না।

যাহোক, এ-সবই হচ্ছে জল্পনা-কল্পনার বিষয়। বাস্তবটি হচ্ছে যে, চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সে-সময়কার পাকিস্তানের বাঙালিদের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতার একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো। এই নতুন মাত্রাটিই ক্রমে আরো প্রসারিত হয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিপরীতে

বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাকে শক্তিশালী করে তুলেছিলো এবং বাঙালির এ-জাতীয় চেতনাই সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের মৃত্যু পরোয়ানা রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলো।

পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা ভাষা-আন্দোলন থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামগুলোর কথা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই বিবৃত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা খুব বেশি করেননি বলেই আমার ধারণা। অথচ, এ-দাঙ্গাগুলোর তাৎপর্য বহুমুখী। এগুলোর গুরুত্বকে অস্বীকার করে যথার্থ ইতিহাস রচনা করা চলে না।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থের ধারকরা প্রধানত দুটো বিবেচনা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতো।

এক. সাম্প্রদায়িক গোলযোগ চলতে থাকলে দেশের অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা থেকে নাগরিকদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে রাখা যায়, জনগণের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রামগুলোকে সাময়িকভাবে হলেও ভোঁতা করে দেয়া যায়, অনেকটা নিশ্চিন্তে শাসন-শোষণ চালিয়ে যাওয়া যায়।

দুই. দাঙ্গা লাগলেই হিন্দুরা দলে দলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে থাকে, তখন তাদের সয়-সম্পত্তি দখল করে নেয়ার মোক্ষম সুযোগ পাওয়া যায়; তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে একটি লাভজনক কর্ম।

হ্যাঁ, পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শাসকগোষ্ঠীর অনেক সুবিধা করে দিয়েছিলো এবং অনেককেই লাভের মুখ দেখিয়েছিলো বটে। কিন্তু এ হচ্ছে মুদ্রার এক পিঠ। অন্যপিঠের চিত্র অন্যরকম।

পাকিস্তান আর ভারত এই দু'য়ের এক রাষ্ট্রে দাঙ্গা লাগলে অন্য রাষ্ট্রে তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে উভয় রাষ্ট্রেরই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিপন্ন হয়ে পড়ে এং উভয় রাষ্ট্র থেকেই সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের প্রবণতা দেখা দেয়। তাতে ভারত ও পাকিস্তান দু'রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে যদিও ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তানে চলে আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, তবু অন্তত প্রথম দিকে বাস্তুত্যাগীদের চাপে পাকিস্তানেরই ক্ষতির আশঙ্কা বেশি দেখা দিয়েছিলো। কারণ পাকিস্তানের হিন্দুর চেয়ে ভারতের মুসলমানের সংখ্যা বেশি আর আয়তনে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে অনেক ছোট। ভারতের সব মুসলমান পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিলে পুরো পাকিস্তান রাষ্ট্রটিই তলিয়ে যাবে। এ-রকম আশঙ্কা থেকেই সে-সময়ে অনেকে পাকিস্তানে দাঙ্গা রোধ করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। কেউ কেউ পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর উৎপীড়নের ফলে ভারতের মুসলমানদের বিপন্ন হওয়ার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক মিলে উনিশশো পঞ্চাশ সালে দাঙ্গার সময়ে যে 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' গঠন করেছিলেন সেই কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিলো—

> 'আমরা আমাদের মুসলমান ভাইগণকে সবিনয়ে দৃঢ়ভাবে বলিব যে , এই প্রকার কার্যের [অর্থাৎ পাকিস্তানের হিন্দুদের হত্যা ও উৎপীড়ন করা] দ্বারা পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতসারে তাহারা ভারতে চারি কোটি মুসলমানের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং পাকিস্তানের অশেষ ক্ষতিসাধন করিতেছেন। এ প্রকার কার্যের ফলে আকস্মিক লোকবিনিময়ে রাষ্ট্রের উপর এমন চাপ পড়িবে যে, তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবে। উচ্ছৃংখল কার্যকলাপের ফলে, শিল্পবাণিজ্য এবং স্কুল-কলেজ,

ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া উভয় রাষ্ট্রই অচল হইবে যার ফলে আমাদের এই সাধের আজাদী বিপন্ন হইবে।...পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, কলিকাতা বা হিন্দুস্থানের কোন অংশে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন অন্যায়ের জন্য এ দেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা চলে না। মুসলমানদের ন্যায় তাহারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তখন জানমালের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ দাবী আছে। এ কথা প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিত যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বিনিময়ে জামানত হিসাবে বাস করিতেছে না। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বলেই বাস করিতেছে। অতএব একজন মুসলমানের যে তারই মত একজন পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক এমন একজন হিন্দুর উপর কোন অবস্থাতেই অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিত যে, পশ্চিবঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরপরাধ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহাতে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনই উপকার হইবে না। বরং বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এখনও যে সব কোটি কোটি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দেশে শান্তি রক্ষার দ্বারা পাকিস্তানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার দ্বারাই একমাত্র হিন্দুস্থানের মুসলমানদের আপনারা সত্যিকার উপকার করিতে পারেন।'

বোঝা গেলো : দূরদৃষ্টিহীন প্রতিক্রিয়াশীলরা আপাত লাভের তাড়নায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের প্রশ্রয় দিলেও সুস্থবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা এর ভয়াবহ পরিণতির কথা সহজেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানের জন্মের মাত্র তিন বছর পরে পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় অবিশ্যি প্রগতিচেতন মানুষেরাও বিষয়টিকে নিতান্তই উদার মানবিকতার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সকলের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানোর বেশি কিছু তারা করেননি। কিন্তু এর বারো বছর পরে বাষট্টির দাঙ্গা তাদের দৃষ্টিকে আরো স্বচ্ছ করে দিলো, বদরুদ্দীন উমরের মতো বুদ্ধিজীবীদের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ সাম্প্রদায়িকতার কার্যকারণ সম্পর্কটিকে সকলের সামনে স্পষ্ট করে তুললো। আর চৌষট্টির দাঙ্গা বাঙালির চেতনায় প্রচণ্ড ঘা দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিলো এবং প্রতিরোধে উজ্জীবিত করলো। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বদলে ভাষিক জাতীয়তার বোধ বাঙালি মুসলমানের মধ্যে প্রবলতর হয়ে উঠলো। এই ভাষিক জাতীয়তার রুদ্ররোষ জাগ্রত হতে দেখেই চৌষট্টির পর পাকিস্তানের শাসক শোষকরা আর কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটাতে সাহস পায়নি।

এভাবেই পঞ্চাশ, বাষট্টি আর পঁয়ষট্টির দাঙ্গায় প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও কায়েমি স্বার্থের ধারকরা যেমন নানাভাবে লাভবান হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তাদের স্বার্থের দুর্গটিতে আঘাত হানতে পারার মতো শক্তিও ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। এবং সে শক্তিই এক সময়ে আরো প্রবল হয়ে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রটিরই ওপর মৃত্যুশেল নিক্ষেপ করেছিলো।

অর্থাৎ অন্য সবকিছুর মতোই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও একটি দ্বান্দ্বিক চরিত্র আছে। তাই বলি: পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর দ্বান্দ্বিক তাৎপর্য অনুধাবন না করতে পারলে পাকিস্তানের মৃত্যুর রহস্যও পুরোপুরি উন্মোচন করা যাবে না।

চৌষট্টির জানুয়ারির পর পঁয়ষট্টির জানুয়ারি। মুসলমানি জোশের বদলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা যে বাঙালিত্বের দীপ্ত চেতনায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে এবং হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায় অংশ না নিয়ে দাঙ্গাবাজদের শায়েস্তা করতে লেগে যাবে, চৌষট্টির জানুয়ারির আগে পাকিস্তানের কোনো শাসকই এমনটি বোধহয় ভাবতে পারেননি। ভাবতে পারেননি জঙ্গী শাসক আইউব খান ও তার একান্ত অনুগত ছোটলাট মোনেম খানও। তবু, তখনই, ক্ষমতা হারাবার আশঙ্কাও সম্ভবত তারা করেনি। কারণ, ইতিমধ্যেই আইউব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি অদ্ভুত চিজ সৃষ্টি করেছেন। সেই মৌলিক গণতন্ত্রীদের 'আস্থা ভোট' নিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, পাকিস্তানের জন্যে একটি শাসনতন্ত্রও জারি করেছেন। সেই শাসনতন্ত্রে মৌলিক গণতন্ত্রীদেরই ভোটে প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা রেখেছেন। কিন্তু এ- সব পরিষদ নিতান্তই ঠুঁটো জগন্নাথ। সকল ক্ষমতার মালিক প্রেসিডেন্ট আইউব। তার এই শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করতে কিংবা তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে, কেউ যাতে না পারে তার জন্যেও নানা আইন তিনি জারি করে রেখেছেন। এভাবে আঁটঘাট বেঁধে দুনিয়ার সামনে তার স্বৈরশাসনের একটি 'গণতন্ত্রী' রূপ তুলে ধরার জন্যে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। পঁয়ষট্টির দুই জানুয়ারি সেই নির্বাচন।

যে নির্বাচনের ভোটার হচ্ছে আইউবের একান্ত অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও সুবিধাভোগী আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী (বাঙালিরা যাদের 'আশি হাজার ফেরেশ্‌তা' বলে বিদ্রূপ করতো), সেই নির্বাচনে যে আইউব খান জিতবেনই সে-বিষয়ে স্বভাবতই তিনি ছিলেন আস্থাবান। জিতেছিলেনও তিনি। কিন্তু যে-রকম ভেবেছিলেন সে-রকম সহজে নয়। অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে তো নয়ই। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর বিরোধী প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ্ সমগ্র পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের শতকরা মাত্র ছত্রিশ ভাগ পেলেও পূর্ব পাকিস্তানে তিনি পেয়েছিলেন প্রায় সাতচল্লিশ শতাংশ ভোট। আইউব খানের অনুগ্রহভাজন মৌলিক গণতন্ত্রীরাই তার বিরুদ্ধে এতোগুলো ভোট দিয়েছিলেন। জনসাধারণের ভোটাধিকার ছিলো না বটে কিন্তু তারা মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে শাসকদের সব অনুগ্রহ ও নিগ্রহ উপেক্ষা করে জনগণের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে তারা এতোগুলো ভোট দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু জনসাধারণের চাপে নয়। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিজেদের মধ্য থেকেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সচেতন ও সক্রিয় আইউব বিরোধী তথা স্বৈরাচার-বিরোধী রূপে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমার হেকিম ভাই, মানে আশুজিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, ছিলেন এ-রকমই একজন মৌলিক গণতন্ত্রী। ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ভোট দেয়ার জন্যে তিনি সারা নেত্রকোনা মহকুমার মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে রীতিমতো 'ক্যাম্পেন' করেছেন। মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর তিনি যে বিষাদ ও হতাশায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, এ সময়ে তা পুরোপুরি কেটে গিয়েছিলো। এখানকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে হেকিম ভাইয়ের মতো প্রকৃত গণতন্ত্রমনা মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিলো না। সে-কারণেই নেত্রকোনা মহকুমায়, উনিশ শো ষাট সালেও, মৌলিক গণতন্ত্রীরাই আইউব খানের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অনাস্থা ভোট দিয়েছিলো। তাই সে-সময়ে ময়মনসিংহের একজন জেলা-কর্মকর্তা কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত নেত্রকোনাকে 'পূর্ব পাকিস্তানের কেরালা' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানভক্ত ও

গণবিরোধী ওই কর্মকর্তাটি যদিও তার ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন, তবু আমরা এ-আখ্যা পেয়ে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদে প্রসন্ন হয়েছিলাম।

ফাতেমা জিন্নাহ সেদিন জনগণেরই কাছে গণাধিকারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচনী সভাগুলোতে যে-রকম জনসমুদ্রের সৃষ্টি হতো সে-রকমটি আগে কোনো সভাতেই কখনো হয়নি। তিনি যেদিন ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজের মাঠে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন সেদিন আমি অনেক চেষ্টা করেও মাঠের কাছাকাছি পৌঁছতে পারিনি। সারাটা শহরই যেন সেদিন জনসভার ময়দানে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

ভোটের ফল প্রকাশের পর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যতোটা না হতাশ হয়েছিলো তার চেয়ে বেশি হয়েছিলো ক্ষুব্ধ এবং মৌলিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে মোহমুক্তও। মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রতি তারা ধিক্কারেও সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। কোথাও কোথাও এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা জনতার নিগ্রহেরও শিকার হতে লাগলো। 'নির্বাচিত' প্রেসিডেন্ট হয়েও আইউব মোটেই স্বস্তি লাভ করতে পারেননি।

তেষট্টির নভেম্বরে আমার এমএ পরীক্ষার ফল বেরোবার পর স্কুল ছেড়ে কোনো কলেজের শিক্ষকতায় ঢোকার জন্যে চেষ্টা-তদবির করতে থাকি। ময়মনসিংহ শহরের নাসিরাবাদ কলেজে ইন্টারভিউ দিই। বেশ বড়ো সড়ো একটি ইন্টারভিউ বোর্ড। সে বোর্ডে নাসিরাবাদ কলেজের অধ্যক্ষ রিয়াজউদ্দিন আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে প্রায় কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। বাইরে থেকে একজন পদস্থ ব্যক্তিকে বোর্ডের প্রধান করে আনা হয়েছিলো। এই পদস্থ ব্যক্তিটি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন না, তবে সাহিত্য সম্পর্কে যে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এমন একটি আত্মশ্লাঘা তাঁর ছিলো। প্রথমে অবিশ্যি তিনি আমাকে সাহিত্য বিষয়ক কোনো প্রশ্ন করেননি। কেবল বললেন, 'আপনি কেন এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন? দু'দিন পরেই তো ইন্ডিয়ায় চলে যাবেন। আপনাকে এ্যাপয়ন্টমেন্ট দিলে এই কলেজের তো লাভ হবে না কোনো। আবার তো দরখাস্ত চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।'

তার মন্তব্যটি আমাকে প্রচণ্ড আহত করলেও আমি এর জবাবে কিছুই বললাম না। একেবারে মূক হয়ে রইলাম। আমার আশু দেশত্যাগ সম্পর্কে যিনি এমন নিশ্চিত তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করি আমি কোন্ যুক্তি দিয়ে?

যাই হোক, ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যতম সদস্য মাহবুবুল আলম (ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে সে-সময়কার বাংলার অধ্যাপক) আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'উভয় বাংলার জীবিত মুসলমান কবিদের মধ্যে কাকে আপনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন?'

আমি বললাম, 'জসিম উদ্দীনকে।'

সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের সেই প্রধান ব্যক্তিটি তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'নজরুল কি মারা গেছেন?'

তার ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠের বিদ্রূপাত্মক কথায় বোর্ডের সবাই হেসে উঠলেন।

সকলের হাসি থামলে আমি বললাম, 'সাহিত্য ক্ষেত্রে জীবিত কবি বলতে আমরা তাঁকেই বুঝি যিনি সাহিত্যিক হিসেবে জীবিত, অর্থাৎ সৃষ্টিশীল। এই বিচারে বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাবান কবি নজরুল তো মৃতই। উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালেই কবি নজরুলের মৃত্যু হয়ে গেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তাই আমি নজরুলের কথা না বলে জসিম উদ্দীনের নামটি বলেছি।'

আমার এ-কথায় হাসির স্থলে বোর্ডে একটা গম্ভীর ভাবের সঞ্চার হলো। অধ্যাপক মাহবুবুল আলম তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'পল্লীকবি হিসেবে জসিম উদ্দীনকে আপনি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থটিতে সার্থক বলে মনে করেন?'

আমি বললাম, 'জসিম উদ্দীন তো পল্লীকবি নন।' —'কী কী, কী বললেন? জসিম উদ্দীন পল্লীকবি নন?' ফ্যাসফেসে কণ্ঠের প্রধান ব্যক্তিটি যেনো আকাশ থেকে পড়লেন।

আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম, 'হ্যাঁ, জসিম উদ্দীনকে আমি মোটেই পল্লী কবি বলে মনে করি না। পল্লীকবি বলতে আমরা তাদেরই বুঝি যারা পল্লীর বাসিন্দা, নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর, মূলত মুখে মুখেই যারা কবিতা রচনা করেন। ময়মনসিংহের পল্লীর মনসুর বয়াতি কিংবা রামু মালীদের মতো কবিরাই হচ্ছেন পল্লীকবি। জসিমউদ্দীন পল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি তো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন নগরবাসী কবি। তবে পল্লী সাহিত্য তথা লোক সাহিত্য- সংস্কৃতির সঙ্গে তার নিবিড় যোগ আছে, তিনি পল্লীর মানুষের হাসিকান্না তার কবিতায় তুলে এনেছেন, পল্লীর মানুষের ভাষাভঙ্গিও কিছুটা নিয়ে এসেছেন। আসলে তিনি লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের নবায়ন ঘটিয়ে এক ধরনের আধুনিক নাগরিক কবিতাই রচনা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি '*নক্সীকাঁথার মাঠ*' ও '*সোজন বাদিয়ার ঘাট*'—এই দুটো কাব্যেই যথার্থ সার্থকতা দেখিয়েছেন।'

'সোজন বাদিয়ার ঘাট? বলুন তো সোজন বাদিয়ার ঘাটের প্রথম লাইনটি কী?' ফ্যাসফেসে কণ্ঠের প্রশ্ন।

'আমার মনে নেই।'

—'ওঃ, আপনি আসলে কোনো ওরিজিন্যাল বই পড়েননি। কেবল কতকগুলো সমালোচনার বই পড়েছেন।' এই বলে তিনি নিজেই '*সোজন বাদিয়ার ঘাট*'-এর প্রথম লাইনটি দু'তিনবার আবৃত্তি করলেন—'ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল *ঝুবঝুব* করে রে ভাই, ফুল ঝুরঝুরে করে।'

এরপর তিনি আমার দিকে নিতান্ত করুণার দৃষ্টি মেলে ধরলেন। আমি খুবই অপমানিত বোধ করলাম। আমার দ্বিতীয় রিপু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাই একটু কঠোর ভাষাতেই বলে ফেললাম, — 'আপনি যাকে ওরিজিন্যাল বই বলছেন তা যে আমি একেবারে কম পড়েছি, তা নয়। বরং একটু বেশি পড়েছি বলেই হয়তো কোনো একটা বিশেষ বইয়ের প্রথম লাইনটি মনে করে রাখা সম্ভব হয়নি।'

ধরেই নিয়েছিলাম যে নাসিরাবাদ কলেজে আমার চাকরি হবে না। কিন্তু দু'তিন দিন পরেই শুনলাম যে, একজন বাদে ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্য সকল সদস্যই আমার উত্তরে খুব খুশি হয়েছেন। মাহবুবুল আলম, শামসুল ইসলাম আজিজুল হক চৌধুরী ও নজরুল ইসলাম— বোর্ডে এই চারজন বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। অর্থাৎ এঁরাই ছিলেন 'বিষয় বিশেষজ্ঞ'। তাই, বোর্ডের অন্য সকলের চেয়ে এদের সুপারিশেরই গুরুত্ব ছিলো বেশি। এরা সকলে আমাকেই নিয়োগপত্র দেয়ার জন্যে জোর সুপারিশ করলেন।

আমি চৌষট্টি সালের পয়লা আগস্ট থেকে ময়মনসিংহ শহরের নাসিরাবাদ কলেজে বাংলার শিক্ষক হলাম।

চৌষট্টির জানুয়ারিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে আমি গৌরীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক, আর পঁয়ষট্টির জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে নাসিরাবাদ কলেজের। দাঙ্গার জন্মমৃত্যু—১৯

সময় থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যে আবহটির সৃষ্টি হয়েছিলো, এক বছর পরে, নির্বাচনের সময়েও তা অটুট থাকতে দেখলাম। ময়মনসিংহ শহরে বেশ কয়েকজন 'হিন্দু'কে হিন্দু-মুসলমান সাধারণের ভোটে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচিত হতে দেখেছি। ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেয়ার উপলক্ষ করে কোনো সাম্প্রদায়িক জিগির ওঠেনি।

কিন্তু এই অতি সুন্দর আবহটিকে কৃত্রিমভাবে নষ্ট করে দেয়া হলো পঁয়ষট্টির সেপ্টেম্বরে। আইউব খান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধ বাধানোর পেছনে সিআই এ'র কী ভূমিকা ছিলো, আইউব সিআই'র পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলেন কি না; আইউবের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের কী ধরনের টানা পোড়েন তখন চলছিলো—এসব নিয়ে রাজনীতি বিশ্লেষকরা অনেকে অনেক কথা বলেছেন, ভবিষ্যতে আরো হয়তো বলবেন। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

যুদ্ধ তো দেখিনি, তবে যুদ্ধের হুংকার শুনেছি রেডিও পাকিস্তানে। রেডিও খুললেই শোনা যেতো কাফের-বিরোধী চিৎকার। হিন্দুস্থানের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ মানে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ। মানে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই এ-দেশের হিন্দুদের যারা 'হিন্দুস্থানের চর' বলে জেনে এসেছে, হিন্দুস্থানের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ লেগে যাওয়ার পর তো আর সেই শত্রুর চরদের তারা কিছুতেই মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করতে দিতে পারে না। এ সময়ে, তাই, হিন্দুদের অনেককেই ভারতীয় নাগরিক বলে চিহ্নিত করে 'বন্দি শিবির'-এ নিয়ে রাখা হলো। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এ- রকমই একটি 'বন্দি শিবির' খোলা হয়েছিলো। সবাইকে অবিশ্যি বন্দি শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অনেকেই—যেমন উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি কারাবন্দি হলেন। অনেকের সম্পর্কেই নানা রকম অবিশ্বাস্য গুজব ছড়ানো হলো। অমুকের বাড়িতে ভারতীয় হাই কমিশনের লোকজন যাতায়াত করে, অমুক ভারতে গিয়ে এদেশের গোপন তথ্য পাচার করে দিয়ে আসে, অমুক ব্ল্যাক আউটের সময় ছাদে লাইট জ্বালিয়ে ভারতীয় বিমানকে শহরের দিশা দেখিয়ে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ময়মনসিংহের একজন খুব নামকরা ডাক্তার ছিলেন কে. পি. ঘোষ। তার বাড়িতে নাকি অয়্যারলেস সেট পাওয়া গিয়েছিলো, ব্রহ্মপুত্রের ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার জন্যে নাকি তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। এরকম আরো সব হিন্দু ডাক্তার-উকিল-ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে এমন সব গুজব এমন নিপুণভাবে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হলো যে, এ-সবের সত্যতা সম্পর্কে কোনো মুসলমানের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও যেনো দেখা দিতে না পারে।

পঁয়ষট্টিতে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। হিন্দুদের শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে কিংবা তাদের সম্পত্তি লুট করা হয়েছে—এমন কিছু শুনিনি। কিন্তু তাদের ওপর মানসিক নির্যাতন একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো।

সাম্প্রদায়গতভাবে তাদের সকলকেই সন্দেহের পাত্র করে তোলা হলো। 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' তো তারা অনেকদিন ধরেই হয়েছিলো, এবার পুরোপুরি স্বদেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলো। 'আমার জন্মভূমিটিকে আমিও ভালোবাসি'—এমন কথা উচ্চারণ করার অধিকারটুকু পর্যন্ত যেন তাদের কারো রইলো না। প্রচার মাধ্যমগুলোতে এমন একটি গণ-হিস্টিরিয়ার সৃষ্টি করা হলো যে, কিছুকালের জন্যে হলেও সকলের সাধারণ বিচারবুদ্ধিই যেনো লোপ পেয়ে যায়, যুক্তি-বিচার-বিবেচনা সব বিসর্জন দিয়ে সবাই যেনো 'রেডিও পাকিস্তান'-এর মনমোহিনী কথার জালে আটকা পড়ে যায়।

যুদ্ধ লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কে. পি. ঘোষ, ডাক্তার অবনী নন্দী, ডাক্তার রবি সেন, উকিল কুমুদ চক্রবর্তী, জ্যোৎস্নাময় দত্ত, ব্যবসায়ী মোহিনী মোহন বণিক, ভাই সেন এবং এরকম আরো অনেককেই গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। রাজনীতির সঙ্গে এদের কারো প্রায় কোনো যোগই ছিলো না। কেউ কেউ ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি করলেও পাকিস্তান আমলে ছিলেন নিতান্ত সাদামাটা গৃহস্থ। যারা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন, পাকিস্তানকে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার প্রত্যয় ছিলো যাদের রাজনীতির মূলমর্ম, তাঁরা যে গ্রেফতারির হাত থেকে রেহাই পাবেন না সে-তো জানা কথাই। অজয় রায়, জ্যোতিষ বোস, মহাদেব সান্যাল, মন্মথ দে, সুকুমার ভাওয়াল, রবি নিয়োগী, নগেন সরকার, গঙ্গেশ সরকার—এ-সব কম্যুনিস্ট নেতা পাকিস্তান আমলে খুব কম সময়ই জেলের বাইরে থাকতে পারতেন, পঁয়ষট্টি সালে এদের সবাইকে একসঙ্গে জেলে পুরে দেয়া হলো। কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর, বিনোদ চক্রবর্তী—এ-রকম সকলেরই হলো একই নিয়তি। হালুয়াঘাট থেকে ধরে আনা হলো মদনমোহন পালকে, কিশোরগঞ্জ থেকে ডাক্তার প্রফুল্ল বীরকে, নেত্রকোনা-টাঙ্গাইল-জামালপুর থেকে এ-রকম আরো অনেককে।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও একজন গ্রেফতার হয়েছিলো। সে আলোকময় নাহা। আনন্দমোহন কলেজে সেও 'প্রগতি' দল করতো। ওই 'প্রগতি'র সূত্রেই, ছাত্রজীবন থেকেই, তার কম্যুনিস্ট নামে পরিচিতি।

ষাটের দশকের গোড়ায় আলোকময়ের বাবা মারা যান। তার ভাইবোনরা আগে থেকেই ভারতে বসবাস করে আসছিলেন। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে এমনটি মোটেই অস্বাভাবিক ছিলো না। কোলকাতা-কেন্দ্রিক অবিভক্ত বাংলায় চাকরি-বাকরির সুবাদে অনেকেই কোলকাতাসহ যে- সব জায়গায় বসবাস করতেন, সাতচল্লিশে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্যাণে সেগুলো সবই ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, আপন হয়ে পড়ে আরেক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান'। এভাবেই তখন অনেকের জন্মভূমি বিদেশভূমি হয়ে গিয়েছিলো। আলোকময় নাহার ভাইবোনদের জন্যেও তাই হয়েছিলো। কিন্তু আলোকময় তো তার জন্মভূমিতেই অবস্থান করছিলো। এবং সে-অবস্থানে ছিলো গভীর দেশপ্রেমের উৎসার। অথচ, কি আশ্চর্য, আলোকময়কে দেশদ্রোহিতার অপবাদ সইতে হলো, ভারতের দালালির অভিযোগে পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তাকেও কারাবাস করতে হলো।

মনোরঞ্জন ধর ছিলেন যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার সদস্য। প্রশ্নাতীত তার স্বদেশপ্রেম, নির্ভীকতা ও সততা। আর এগুলোই হয়েছিলো তাঁর অপরাধ। এর জন্যে বারবারই তাকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে প্রবেশ করতে হয়েছে। কারাগারেও তার নির্ভীক আচরণের কোনো ব্যত্যয় দেখা দেয়নি। তাঁরই অন্যতম কারাসঙ্গী অবনী নন্দীর মুখে শুনেছি পঁয়ষট্টি সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ময়মনসিংহ জেলখানায় জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা মনোরঞ্জন ধরসহ 'পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন'-এ গ্রেফতারকৃত বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর কুশল জিজ্ঞাসার জবাবে মনোরঞ্জন ধর ওই কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি তো আমাদের কুশল সংবাদ জানতে এসেছেন, কিন্তু বলতে পারেন কি আমরা এখানে কেনো?'

প্রশ্ন শুনে কর্মকর্তাটি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। মনোরঞ্জন ধরই আবার বললেন, 'জানি, আপনি এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। আমার কাছেই শুনুন। আসলে আমরা আমাদের জন্মের অপরাধেই এখানে এসেছি।'

কর্মকর্তাটি নিশ্চয় কথাটার ইঙ্গিতটি ধরতে পেরেছিলেন। তাই চুপ করে রইলেন। মনোরঞ্জন ধর আবার প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কি একটি সভ্য রাষ্ট্রের সভ্য সরকারের অধীনে বাস করছি বলে আপনি মনে করেন?'

কর্মকর্তাটি, বোধগম্য কারণেই, এবারও নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

পঁয়ষট্টির যুদ্ধের বিপরীত ফল: বাংলার স্বাধীনতার রক্তবীজ

পঁয়ষট্টির পাকভারত যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিলো তার তাপ তো আমার গায়েও লেগেছিলো। আমি যে হিন্দু সে কথা আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। এর আগে আমার ছাত্র জীবনের দুটো বছর ময়মনসিংহ শহরে কাটলেও মাত্র এক বছর আগে আমি এ শহরে কর্মজীবন শুরু করেছি, তাই তখনো এখানে আমার ব্যাপক পরিচিতি গড়ে ওঠেনি। সে-কারণেই পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের চাবুকের হাত থেকে আমি বেঁচে গেলাম, সেবার আমাকে জেলে যেতে হলো না। তবে আমার বন্ধু আলোকময় নাহা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে নিয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, আমাকে সাবধানে চলতে-বলতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু কী ভাবে সাবধান হবো আমি? আমার বয়স তখনো তিরিশ পূর্ণ হয়নি, তখনো অকৃতদার আমি, আজন্ম চঞ্চল বাচাল আমি, কী করে হঠাৎ চলনে-বলনে সুধীর ও সংযত হয়ে যাই? ভারতের সঙ্গে যুদ্ধকে উপলক্ষ করে যারা সহসাই ঘোরতর পাকিস্তানবাদী হয়ে উঠেছিলো এবং এক ধরনের 'শভিনিজমে' আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো, আমার সে-সব 'মুসলমান' বন্ধুদের সঙ্গে সে-সময় তুমুল তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়তাম। আবার 'হিন্দুদের' পরিমণ্ডলেও আমি বেমানান হয়ে পড়েছিলাম। কারণ ঘটনাবলির একপেশে 'হিন্দু' ব্যাখ্যা আমি মেনে নিতে পারতাম না। কাজেই পঁয়ষট্টিতে বড়ো যন্ত্রণাবিদ্ধ সময় কেটেছে আমার।

যুদ্ধের পর আস্তে আস্তে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের বন্দি হিন্দুরা জেল থেকে ছাড়া পেতে লাগলেন। আমি তাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা করলাম। কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধরের'বা দুর্গেশ পত্রনবিশের প্রতিক্রিয়া যেমন বুঝতে চেষ্টা করেছি, তেমনি কম্যুনিস্ট মহাদেব সান্যালের সঙ্গেও কথা বলেছি। আবার, রাজনীতি-সংস্পর্শহীন ব্যবসায়ী মোহিনী মোহন বণিক কিংবা সংস্কৃতিসেবী ডাক্তার অবনী নন্দীর চিন্তাচেতনার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। এদের সকলের বিষয়গত ও ভাবনাগত অবস্থানে পার্থক্য থাকলেও এরা সকলে একই নিয়তির অধীন হয়েছিলেন জন্মগত হিন্দুত্বের কারণে। পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধ দেশের মানুষের অন্য সকল পরিচয়কে গৌণ করে দিয়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে বড়ো বিশ্রী রকমে প্রকট করে তুলেছিলো।

আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পঁয়ষট্টির জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী দলীয় প্রার্থী ফাতেমার পক্ষে জনউত্থান পর্যন্ত প্রবাহিত নানা ঘটনা ধারার জোয়ারভাটার মধ্যদিয়ে এখানে সাম্প্রদায়িকতার শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে আসছিলো। কিন্তু সেই মুমূর্ষু সাম্প্রদায়িকতাকে জেহাদের টনিক খাইয়ে পঁয়ষট্টির সেপ্টেম্বরে নতুনভাবে চাঙা করে তোলা হলো। রেডিও পাকিস্তানে সে-সময়ে যেসব গান, কবিতা, নাটিকা, কথিকা, জীবন্তিকা ইত্যাদি প্রচার করা হতো সে-সবের ভেতরে ভারত-বিরোধিতার নামে চলতো হিন্দু-

বিদ্বেষের বিষোদগার। তখনো এদেশে টেলিভিশনের ব্যাপক প্রচলন ঘটেনি বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে রেডিও ছিলো। সস্তায় ট্রানজিস্টার কিনে গাঁয়ের কৃষকও তা ক্ষেতের আলে রেখে দিয়ে রেডিওর অনুষ্ঠান উপভোগে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলো। সেই সুযোগেই পাকিস্তানের শাসককুল নানা মোহিনী মিথ্যা দিয়ে এদের সকলের কান ভারি করে তুলেছিলো। কান থেকে মনে, মন থেকে প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে এই মিথ্যাগুলোই এক ধরনের আবেশের সৃষ্টি করে ফেলেছিলো। সেই আবেশের বশে পাকিস্তান রক্ষার জন্যে সে-সময়ে হয়তো জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেও তারা দ্বিধা করতো না।

শুধু নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষই নয়, সুশিক্ষিত বিদগ্ধজনও পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমের মায়ার ফাঁদে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আটকা পড়ে গিয়েছিলেন এবং এঁদের অনেকেই সেই প্রচার কাজে নিজেদেরও যুক্ত করে নিয়েছিলেন। ফররুখ আহমদ বা তালিম হোসেনের মতো পাকিস্তানবাদী কবিরা যে নিজেদের অন্তর্গত বিশ্বাস থেকেই এ-সময়ে জেহাদী কবিতা লিখবেন, তেমনটিই তো ছিলো স্বাভাবিক। তাই ফররুখ লিখলেন—

জঙ্গে জেহাদ! জঙ্গে জেহাদ
এল জেহাদের দিন!
চল মুজাহিদ জেহাদী জামাতে
উদ্যত সঙ্গীন।
চল নিয়ে দিলে আল্লাহ্‌র নাম
খুন খোশরোজ এল পরগাম
গাজী বা শহীদ হবে তুমি জানো
দ্বিধা সংশয়হীন।

আর তালিম হোসেন 'ক্ষমা করব না'
কবিতায় হিন্দুস্থানীয় 'হামলাকারী দুশমন'দের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—

হামলা করেছ, পাক ওয়াতনের পরে
দুশমন আমি করব না ক্ষমা, করব না।
আগুন জ্বেলেছ এই শান্তির ঘরে
জালিম তোমাকে না মেরে আমি মরব না।

তবে মজার কথা হলো, পঁয়ষট্টির যুদ্ধ এই পাকিস্তানবাদী কবিদের সঙ্গে সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী প্রগতিচেতন কবি-সাহিত্যিক-চিন্তকদেরও এক ধরনের আবেশে আবিষ্ট করে ফেললো। এদের অনেকেই, একান্ত সাময়িকভাবে হলেও, পাকিস্তানি মৌতাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। [দ্রষ্টব্য : সাঈদ-উর রহমানের *'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা'*, পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৬] কবি হাসান হাফিজুর রহমান তো অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে যুদ্ধশিবির পর্যবেক্ষণ করলেন এবং *'সীমান্ত শিবির'* শীর্ষক একটি বই লিখে 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রবর্তিত '৬ই সেপ্টেম্বর' পুরস্কার পেয়ে গেলেন। 'পাকিস্তানের জাতীয় বীরদের গুণ বা কার্যাবলীর ভিত্তিতে রচিত অথবা পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষায় সহায়তাকারী গ্রন্থই পুরস্কারের জন্যে বিবেচিত হতো। [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০৩]

পাকিস্তান নামক একটি কৃত্রিম ও অবৈধ রাষ্ট্রের পক্ষে ভৌগোলিক অখণ্ডতা বা তথাকথিত সংহতি রক্ষা করে এতোদিন ধরে বেঁচে থাকা মোটেই সম্ভব হতো না, যদি না এ-রকম নানান

কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে একে বাঁচিয়ে রাখা হতো। পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বারবার এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যে পদ্ধতিটির নাম—অভিভাবন বা সাজেশন (Suggestion) প্রদান। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদভিত্তিক পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে যে, মানুষের মানস গঠনে অভিভাবন বা সাজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপাদান। সম্মোহিত অবস্থায় তো মানুষকে অভিভাবিত করা যায়ই, এমনকি জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ নানাভাবে অভিভাবিত হয়ে থাকে। জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ পুরো জেগে থাকে না। অর্থাৎ তখনো মস্তিষ্কের কিছু অংশ আধাঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। এ-অবস্থাতেই বাইরে থেকে আসা নানা সাজেশন—মুখের কথা কিংবা লিখিত ভাষার আকারে—মস্তিষ্কের ওই আধাঘুমন্ত অংশে জোরালো উত্তেজনার সৃষ্টি করে ও মানুষ ওই কথাগুলো বিশ্বাস করে বসে, তার ভেতর বিশেষ ধরনের সংস্কার ও ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায়। এ-বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেই একজন পাভলভপন্থী মনোবিজ্ঞানী বলেন, 'এমন অনেক কিছু আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করি, যার বাস্তব ভিত্তি নেই। গোটা মস্তিষ্কের যুক্তিতর্ক, সামগ্রিক বিচার পদ্ধতি আমরা সব সময় মেনে চলি না। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, মস্তিষ্ক সব সময় সামগ্রিকভাবে কাজ করে না। খণ্ডিত আধা-ঘুমন্ত অংশ সমগ্র থেকে আলাদা হয়ে অভিভাবনের জোরে আমাদের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারকে অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত করে। '[ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, '*পাভলভ পরিচিতি*', দ্বিতীয় পর্ব (কোলকাতা ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৪৬]

ঠিক এ-ব্যাপারটিই পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ-দেশের মানুষের মধ্যে ঘটেছিলো। যুদ্ধ বা যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে এ-রকমই ঘটানো হয়ে থাকে। ফ্যাসিবাদীরা কেমনভাবে নির্জলা মিথ্যা দিয়ে, কিংবা সামান্য পরিমাণ সত্যে প্রচুর মিথ্যার ভেজাল মিশিয়ে, মানুষকে অভিভাবিত করে বিকৃত ও অসুস্থ বানিয়ে ফেলে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগে এবং যুদ্ধ চলাকালেও, জার্মানিসহ বহু দেশে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। অনেক বিবেকবান বুদ্ধিজীবীও যে ফ্যাসিবাদের কাছে নিজেদের বিবেক বন্ধক রেখে মানবতা-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তাও তো আমরা দেখেছি। তাই, পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর প্রচারের গোলকধাঁধায় সাধারণ মানুষের মতো সৎ বুদ্ধিজীবীদেরও কেউ কেউ যদি পথ হারিয়ে থাকেন, কৃত্রিম স্বদেশপ্রেমের উগ্রতায় তাদের মস্তিষ্কের একাংশে যদি চরম উত্তেজনার সঞ্চার ঘটে থাকে, তবে তাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না মোটেই। মানবমনের স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটেছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞান এ-ও আবিষ্কার করেছে যে, অবাস্তব ও ভুল বিশ্বাসে সব মানুষ সব সময়ের জন্য অভিভাবিত হয়ে থাকে না; প্রকৃত বাস্তবের রূঢ় আঘাতে পূর্বেকার অভিভাবন ভেঙে যায়, মানুষ তার ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসগুলো নতুনভাবে যাচাই করে নেয়ার তাগিদ বোধ করে, মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করে।

পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের প্রায় অব্যবহিত পরেই, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চিন্তাভাবনাতেও মনোবিজ্ঞানের এ নিয়মটিই কার্যকর হতে থাকে। অচিরেই সকলের ঘোর কেটে যায়। বানিয়ে তোলা আবেগের উত্তেজনার অবসান ঘটে যাওয়ার পর এখানকার মানুষ বাস্তব সত্যের দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে দেখে। তাকিয়েই উপলব্ধি করে :

আরে, এতাক্ষণ তো আসল সত্যের দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। চিলে কান নিয়ে গেছে বলে আন লোকের কানকথা শুনে চিলের পেছনে পেছনে ধাওয়া করেছিলাম, অথচ

নিজের কানে হাত দিয়ে দেখিনি সেটি যথাস্থানে আছে কিনা! কাশ্মীরের মুসলমানদের আজাদ করার জন্যে আমরা ভারতের সঙ্গে জেহাদ করেছি, কিন্তু আমাদের নিজেদের আজাদী রক্ষা করা যাবে কিনা সেদিকে খেয়াল করিনি। এক হাজার মাইলের ব্যবধানে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থিতি, আর এই দু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে 'শত্রু' রাষ্ট্র ভারত। এই শত্রু যদি সত্যি সত্যিই সেদিন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতো তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো সাধ্য ছিলো না তাকে রক্ষা করার। এখানে থেকে যতোই জেহাদি জোশ দেখাই না কেন, আসলে তো যুদ্ধের সময় আমরা বেঁচেছিলাম শত্রু রাষ্ট্রের করুণার ওপর। আমাদের পাকিস্তান রেডিও থেকে দম্ভ ভরে বলা হচ্ছিলো যে, আমাদের বীরযোদ্ধারা বিমান আক্রমণ করে পশ্চিবঙ্গের কলাইকুণ্ডা বিমানবন্দর বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আমরা এ কথা শুনে জয়ের গর্বে স্ফীত হয়েছি। কিন্তু ভারত যদি তার বিমানবহর নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, তাহলে কী হতো? না, আমরা অবশ্যই বিনাযুদ্ধে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতাম না। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়ে যেতাম। তবে আমাদের সেই 'সর্বশক্তি'র সীমানা কতোটুকু? পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভুরা কি আমাদের ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার বানিয়ে রাখেনি? আমাদের প্রতিরক্ষার কোনো শক্তিশালী ব্যবস্থা না রেখেই কি ওরা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়নি? কেবলমাত্র ইসলাম আর পিআইএ বিমান ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অন্য কোনো যোগসূত্র নেই—এমন কথা পঁয়ষট্টির আগেও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরা বলেছেন। পঁয়ষট্টির যুদ্ধে পিআইএ'র সেই সংযোগও বিচ্ছিন্ন ও অকার্যকর হয়ে গেলো। বাকি রইলো কেবল ইসলাম। সেই মহান ও পবিত্র ইসলামকে এবারও ওরা প্রতারণার কাজে ব্যবহার করলো, স্থূল সাম্প্রদায়িক প্রচার দিয়েই ওরা আমাদের মনমেজাজকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। এ-আচ্ছন্নতাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। নতুন জেগে-ওঠা এসব উপলব্ধিই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দিকে ঠেলে দিলো। পঁয়ষট্টির যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানে যে-রকম পাকিস্তান-প্রেম ও পাকিস্তানি আবেগ জাগিয়ে তুলেছিলো, সেরকম প্রেম ও আবেগ অন্য কোনো ঘটনা থেকেই এর আগে কখনো জাগেনি। আবার, প্রচণ্ড আঘাত হেনে সেই পাকিস্তান-প্রেম ও পাকিস্তানি আবেগকে যা বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে সে-রকম বড়ো ধরনের ঘটনাটিও এবারই প্রথম ঘটলো। সেই প্রয়োজন বোধ থেকেই, যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা ও প্রতিরক্ষা আইনের তোপের মুখেও, সচেতন বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িক প্রচারণার প্রতিবাদ করলেন। 'যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো '*সমকাল*' সাহিত্যপত্রে। প্রবন্ধটির লেখক আবু আহসান। অনেক পরে জানা গিয়েছিলো যে, আবু আহসান আসলে প্রখ্যাত প্রবন্ধকার আবদুল হকের ছদ্মনাম। পাকিস্তানের একজন সরকারি কর্মচারি হয়েও আবদুল হক এ-প্রবন্ধটিতে সাম্প্রদায়িক প্রচারণার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে শাসক চক্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এরপর ওই '*সমকাল*'-এর পাতাতেই 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ- : পুনর্নিরীক্ষা' নামে যে প্রবন্ধটি লিখলেন তাতে তো তিনি পাকিস্তানের মূল ভাবাদর্শকেই তুলোধুনো করে ছাড়লেন। রীতিমতো 'রাষ্ট্রবিরোধী' ছিলো সেই প্রবন্ধটি। মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো এতে।

এই পটভূমিতেই ছেষট্টির ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত হলো শেখ মুজিবের ছয় দফা। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিরূপে এই ছয় দফা যে সঠিক সময়ে সঠিকভাবেই উত্থাপিত হয়েছিলো তা শুধু বাঙালিদের মধ্যে এর বিপুল জনপ্রিয়তা থেকেই বোঝা যায়নি, বোঝা

পিরেছিলো এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর তুমিত প্রতিক্রিয়া দেখেই। প্রেসিডেন্ট আইউব খান শেখ মুজিব তথা বাঙালি জাতির প্রতি 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকি দিয়ে ছয় দফার প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের আবেগকে আরো বাড়িয়ে দিলেন। এই ছয় দফাতে কি এমন নতুন কথা কিছু ছিলো যা এর আগে কখনো বলা হয়নি? না, ছয়দফা সালের মুক্তাক্ষরীয় এসব দফার উনিশ নম্বর দফাটিতেই ছয় দফার মূল কথাগুলো ছিলো। এরও আগে, ষেচ্ছাতন্ত্র সালের জানুয়ারিতে, 'পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল'-এর আত্মপ্রকাশই ঘটেছিলো 'পাকিস্তানে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি' জানিয়ে। এই দলের প্রথম অধিবেশনেই পাঞ্জাবের সাদ শওকত হায়াত খান স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের পলিসে আমীন থাকিয়া পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগের সঠিক সন্ধান রাখা এবং তাহা নিরসনের উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কল্পনা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং এই প্রদেশের বিবিধ উন্নতির উপায় নির্ধারণ একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দ্বারাই সম্ভব!' এই জন্যেই শওকত হায়াত খান সেদিন পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে সম্মিলিতভাবে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর সালেই কম্যুনিস্ট পার্টির অধিবেশনে একজন কমরেড পূর্ববাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন। সাতান্ন সালে কাগমারি সম্মেলনে মওলানা ভাসানী তো পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলায়কুম' জানিয়ে দেয়ার ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর সালেই যে কিছু দূরদর্শী ও সাহসী ছাত্র 'পূর্ববাংলা নিয়ারেশন স্কুল' গঠন করে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সে-তথ্যও তো আজ আর গোপন নেই। একষট্টি সালের সেপ্টেম্বরে তিনটি আর্বাবীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহান পাকিস্তানের দুই অংশের জন্যে দুই আর্থবীতির সুপারিশ দেখেছিলেন। আর চৌষট্টি সালের জুলাই মাসেই যে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত ছাত্রনীয়ের অজান্তরে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠিত হয়ে গিয়েছিলো, সে-তথ্যও আজ অনেকেই জানে।

তাই বলছিলাম, শেখ মুজিবের ছয় দফায় একেবারে নতুন কিছু ছিলো না। পরিস্থিতির জন্যেও অত কিছুদিন পর—অর্থাৎ আটচল্লিশ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে পঞ্জীভূত যে পাকিস্তান-বিদ্বেষী চিন্তাচেতনা একটু একটু করে বল হেলে চলছিলো, তারই একটা বাস্তবিক পরিণতি এই ছয় দফায় রূপ ধারণ করেছিলো।

তবে ছয় দফার আন্দোলন নতুন কিছু আনুক আর নাই আনুক, নতুন ছিলো এর প্রচারের ব্যাপকতা, গভীরতা ও প্রবলতা। ছয় দফার প্রচার যে-চরম গতীর ও প্রবল হয়েছিলো, এর আগে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের দাবিতে উত্থাপিত কোনো বক্তব্য বা কর্মসূচীই সে চরম হয়নি—হতে পারেনি; কারণ এর আগে তো এই ভাবনাটুকু আসেনি। উপযুক্ত লড় ভাবা কি কোনো কালে সম্ভবপর আসে?

উপযুক্ত এই দলটির জন্মেই শেখ মুজিবুর রহমান স্বীকৃতির আন্দোলনে ছিলেন, এমনকি তার সেই আন্দোলন কারাবরণ পর্যন্ত। বাহান্ন সালেই কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে শেখ মুজিব পূর্ববাংলার স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এবং তখনো সেই আন্দোলন শুরু করার সময় হয়নি বলে কম্যুনিস্ট নেতারা যুক্তি দেখে নিয়ে ফিরি যে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, সেই ধৈর্যের ফল ফলতে এসেছিলো—উনিশ শো বেয়াল্লি সালে। আর তাই তার হাতে তুলে নিতে পাকিস্তানের সকি সমস্যার সমাধানটুকু। সকি সমস্যার সমাধান

এই পঁয়ত্রিশ সালে অন্তত সঙ্গে যুক্ত না থাকিয়ে দিতো, তাহলে এমনভাবে তাদের গলায় ছয় দফার দড়ি পড়তো না। এবং ছয় দফার দড়িতেই ফাঁস আটকে এক পর্যায়ে এখানে পঁচিশজনের মৃত্যু ঘটতো না। ছয় দফার স্বাধীনতার কথা না থাকলেও, পাকিস্তানি শাসকদের মনে হয়েছিলো যে, ওতেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ লুকিয়ে আছে। সেই বীজকেই ওরা নিশ্চিহ্নের যন্ত্র দিয়ে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলো। তার পরিণতি তো সবারই জানা।

ছয় দফার শক্তি ও বাঙালিত্বের জাগরণ

শেখ মুজিব প্রস্তাবিত ছয় দফার নানামুখী প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, বিভিন্ন মহল থেকে এর বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হচ্ছিলো। এ সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাতাদের আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটছিলো।

পঁয়ত্রিশ সেপ্টেম্বর মাসের ছয় তারিখে সৃষ্টিত সর্বাত্মক পাক-ভারত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে সত্তরের তাসখন্দে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের উদ্যোগেই এ যুদ্ধবিরতি ঘটে। কোসিগিনের মধ্যস্থতাতেই হেরাতির জাবুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে এক বৈঠকে মিলিত হন। সে বৈঠকেই যুদ্ধোপরান্ত একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

যুদ্ধবিরতি আর শান্তিচুক্তির মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের জেহাদি জোশ শেষ হয়ে যায়। শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও। সারা পাকিস্তানেই আইউবের ভাবমূর্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জনতাকী আওয়ামী-পিডিতে তারা আইউব-বিরোধী মিছিল করে। পুলিশ সে মিছিলে গুলি চালালে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানই আইউব-বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। আর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনোজে তো পঁয়ত্রিশের যুদ্ধের উত্তেজনার বদলে নেমে এসেছে নিস্তেজনা। দেখা দিয়েছে নতুন ধরনের বিচার-বিবেচনা। ঠিক সে-সময়েই পাকিস্তানের রাষ্ট্রী কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে না করলেও তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতার আর্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। অন্তত আইউব-বিরোধী চিন্তা তো একটা রূপই ধারণ করেছে।

পাকিস্তানের উভয় অংশের অধিবাসীদের ভাবনাচিন্তার এ-পটভূমিতেই ন্যাশনাল কনভেনশনের ডাক, আউলিয়া মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও আওয়ামী লীগ—এই পাঁচটি দল পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। উদ্দেশ্য—একটি সরকার বিরোধী মোর্চা গড়ে তোলা।

এ-সম্মেলনেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান সেই বহুখ্যাত 'ছয় দফা' প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সম্মেলনে মিলিত পাঁচ দলের কোনো দলই এ-রকম প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না, এমনকি আওয়ামী লীগও না। আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যরাও জানতেন না যে, শেখ মুজিব এমন একটি প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপন করবেন। ফলে এ-প্রস্তাব সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, মুজিবকে এ-নিয়ে সম্মেলনে কোনো আলোচনারই সুযোগ দেয়া হয় না। মুজিব, তাই, সংবাদ সম্মেলন করে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে ছয় দফা সম্পর্কে জানিয়ে নিয়ে চলায় ফিরে এলেন। পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা মেনে নিতে জানিয়ে দিয়ে চলায় ফিরে এলেন। পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা মেনে নিতে জানিয়ে দিয়ে চলায় ফিরে এলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গেলো। বাস্তবে পাকিস্তান মানেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গেলো। বাস্তবে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিলুপ্তিই ঘটলো। আওয়ামী লীগ হয়ে উঠলো সম্পূর্ণ রূপে

বাঙালিদের প্রতিষ্ঠান, আর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের মূল নেতা এবং অচিরেই তিনি আওয়ামী লীগের নেতা থেকে উন্নীত হয়ে গেলেন বাঙালির জাতীয় নেতায়। এক সময়ে ছাত্রদের দেয়া খেতাব 'বঙ্গবন্ধু' তার নামের সঙ্গে অনপনেয় সূত্রে গেঁথে গেলো।

আওয়ামী লীগের স্থপতি ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আমৃত্যু তিনিই ছিলেন আওয়ামী লীগের অবিসংবাদিত নেতা। শেখ মুজিবেরও তাঁর প্রতি ছিলো গভীর শ্রদ্ধা ও নিঃশর্ত আনুগত্য। সেই সোহরাওয়ার্দী মারা গেলেন তেষট্টি সালের পাঁচ ডিসেম্বর। এরপর থেকেই শেখ মুজিবের হাতে এসে যায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব। আটান্ন সালে আইউবের সামরিক শাসনে সকল রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিবই প্রথম আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং সেটি ঘটিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই।

সোহরাওয়ার্দী যদি সে-সময়েও বেঁচে থাকতেন তাহলে কী হতো? ছেষট্টি সালে আওয়ামী লীগ কি 'ছয় দফা' ঘোষণা করতে পারতো? পূর্ব পাকিস্তান শতকরা আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে বলে যে-সোহরাওয়ার্দী সাতান্ন সালের জুন মাসেই ঘোষণা করেছিলেন, সেই সোহরাওয়ার্দী কি ছেষট্টি সালে অন্যরকম কথা বলতেন? সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে কি বাঙালিত্বের আবেগ ছিলো, যে-আবেগ দিয়ে তিনি পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বাংলার স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকারের পথ বেয়ে স্বাধীনতার উপল উপকূলে পৌঁছে যেতে পারতেন?

জানি, এ-ধরনের হাইপোথেটিকাল প্রশ্নের কোনো নিঃসংশয় উত্তর দেয়া যায় না। তবু এ-সব প্রশ্ন আমার মনে জাগে। সোহরাওয়ার্দীকে যে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' আখ্যা দেয়া হয়, পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে সে আখ্যা হয়তো একেবারে অযৌক্তিক নয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ক্রিয়াশীল ছিলো। কিন্তু তাঁর মন যে বাঁধা পড়ে ছিলো ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর চক্রের জালে, মূলত তিনি যে ছিলেন অভিজাত গোষ্ঠীর স্বার্থেরই ধারক-বাহক, গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ার মন মেজাজ যে তার মোটেই ছিলো না—তাঁর সারা জীবনের আচার-আচরণ তো সে-রকমই সাক্ষ্য দেয়। তাই, আমার মনে হয়, সোহরাওয়ার্দী বেঁচে থাকলে মুজিবের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হতো। সে-ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দী যদি ছয় দফার মতো কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি হাজিরও করতেন, তবে একে তিনি বড়োজোর রাজনৈতিক দরকষাকষির হাতিয়ার করে তুলতেন—বাঙালি গণমানুষের হাতে মুক্তি সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দিতেন না। জীবনমঞ্চ থেকে সোহরাওয়ার্দী অপসৃত হয়েছিলেন বলেই এ-দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে শেখ মুজিবের পক্ষে নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করা অনেক সহজ হয়ে উঠেছিলো। সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্য হলেও মুজিব ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া, তার সামাজিক প্রেক্ষাপটও ছিলো সোহরাওয়ার্দীর থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। শেখ মুজিব যতোখানি রাজনীতিক ছিলেন, তারচেয়ে বেশি ছিলেন দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমই যে তাঁর নিজের দেশটিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে-আইউবকে পাকিস্তানের ক্ষমতার মঞ্চে বসিয়েছিলো, সেই আইউবের সঙ্গেই ষাটের দশকে তার কিছুটা স্বার্থের সংঘাত লেগে গিয়েছিলো। তাই, আইউবকে উৎখাত করে অন্য কোনো বিশ্বস্ত অনুগামীকে গদিতে বসানোর প্রয়োজন মার্কিনিরা

তখন অনুভব করেছিলো। এ-কারণেই শেখ মুজিব যখন 'ছয় দফা' উত্থাপন করলেন, তখন অনেকেই বলতে লাগলেন যে, এটি হচ্ছে মার্কিনি চাল। এমনকি, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-ই হচ্ছে এই ছয় দফার প্রণেতা—বামপন্থী বলে পরিচিত অনেকের মুখেই এমন কথাও শোনা যাচ্ছিলো। এ-রকম কথা যাঁরা বলছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমি কিছুকালের জন্যে গলা মিলিয়েছিলাম। আমিও সেদিন ছয় দফাকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম।

তবে, ছয় দফার সমালোচনা করলেও এর অন্তর্বস্তুকে বাতিল বা অস্বীকার করতে পারছিলাম না। শেখ মুজিব মার্কিনপন্থী হলেও হতে পারেন। কিন্তু তাঁর ছয় দফায় যে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে, তাই বা অস্বীকার করি কী করে? শেখ মুজিব প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি নন, তার ছয় দফা বাঙালি উঠতি বুর্জোয়াদের স্বার্থের অনুকূল, ছয় দফায় বাঙালি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের কোনো দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়নি—এ-সব কথা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু তাই বলে ছয় দফাকে গণবিরোধী বলি কী করে? ছয় দফাকে প্রতিক্রিয়াশীল বললে কি প্রতিক্রিয়াশীল আইউব তথা সকল পাকিস্তানবাদীদেরই সমর্থন করা হয় না?

এ-সব প্রশ্ন ও সন্দেহ নিয়ে আমি ও নেত্রকোনার শ্রী হরিশংকর চৌধুরী আলাপ-আলোচনা করতাম। কিন্তু দু'জনের কেউই নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিলাম না।

হরিশংকর চৌধুরী সে সময় নেত্রকোনা থেকে ময়মনসিংহে চলে এসেছেন, দত্ত হাইস্কুল ছেড়ে ময়মনসিংহ শহরে রাধাসুন্দরী গার্লস হাইস্কুলে মাস্টারি নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গেই তখন দিনরাত চুটিয়ে আড্ডা দিই এবং নিয়মিত *'পিকিং রিভিউ'* পড়ি। শুধু *'পিকিং রিভিউ'* নয়, চীন ও রাশিয়া থেকে প্রকাশিত মার্কসবাদী বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকায় তখন আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আইউবের সামরিক শাসন জারির পর থেকে এ-দেশে প্রায় সবরকম কম্যুনিস্ট সাহিত্যই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নীহার সরকারের *'ছোটদের রাজনীতি'* কিংবা অনিল মুখার্জির *'সাম্যবাদের ভূমিকা'*র মতো গণবোধ্য মার্কসবাদী বইগুলোও তখন লুকিয়ে চুরিয়ে পড়তে হতো। অথচ, কী আশ্চর্য, চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সালের আইউবি স্বৈরশাসনের চণ্ডতার মধ্যেই চীন-রাশিয়া থেকে আসা মার্কসবাদী বইপত্রে এখানকার বাজার সয়লাব হয়ে গেলো। আমরা তখন মার্কসীয় ক্লাসিকসহ নানা ধরনের প্রগতিশীল সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান পাঠের অবাধ সুযোগ পেয়ে গেলাম। এ-সবের ওপর আর কোনো নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকলো না। বুর্জোয়া শাসন নীতির সব ক্ষেত্রেই বোধহয় এ-রকম বস্ত্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

এ-সময়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত বিরোধ তুঙ্গে উঠে গিয়েছিলো। সে বিরোধের তাপ এসে লাগলো পূর্ব পাকিস্তানের আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির গায়েও। বাষট্টি সালের শেষ দিকেই পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দু'জন সদস্য—মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদার—চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির অনুরাগী ও সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। এদের মতামত এখানকার পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কমিটিই করে দিয়েছিলো। আমরা পার্টির গোপন মুখপত্র *'শিখা'*র পাতায় এদের বক্তব্য পাঠ করেছিলাম। পাঠ করে হরিশংকর বাবু ও আমি দু'জনই যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আমাদের সমর্থনের পাল্লাটা চীনের দিকেই বেশি পরিমাণে ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ ছিলো আমাদের নিয়মিত *'পিকিং রিভিউ'* পাঠ। সোভিয়েতের কম্যুনিস্ট পার্টি বিপ্লবী উদ্যম হারিয়ে সংশোধনবাদী হয়ে পড়েছিলো বলেই আমাদের মনে হয়েছিলো।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ভাবনায় পরিবর্তন দেখা দেয়। বিশেষ করে মওলানা ভাসানী যখন আমাদের দেশের পিকিংপন্থীদের নিয়ে আইউব খানকে নানা ইস্যুতে সমর্থন জোগাতে লাগলেন, তখন আমরা অন্যরকমভাবে ভাবতে বাধ্য হলাম। ষেষট্টি সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আইউব খানের প্রতিনিধিরূপে চীন সফর করে আসার পর থেকেই মওলানা পিকিংপন্থী হয়ে ওঠেন এবং আইউবকে বিব্রত না করার ('Don't disturb Ayub') নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। মওলানার পিকিংপন্থী অনুসারীদের অনেকে আইউবকে 'প্রগতিশীল' বলেও প্রচার করতে থাকে। এই পিকিংপন্থীরা পঁয়ষট্টি সালের এপ্রিল মাসেই এ-দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেন। পঁয়ষট্টি সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এরা আইউবকে সমর্থন জানান এবং ভারত-বিরোধী জজবায় মেতে ওঠেন। চীনা নেতৃত্ব ভারত-বিরোধী, তাই এরাও ভারত-বিরোধী। ভারত বিরোধিতার সুবাদে চীন যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন জানিয়ে মার্কস-লেনিনের মৌল নীতি থেকেই বিচ্যুত হয়ে গেছে—এ-কথা আমাদের দেশের চীনপন্থীরা একবারেও ভেবে দেখলেন না। পাক-ভারত যুদ্ধের আগে যেমন এরা ছাত্র ইউনিয়নকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন, তেমনি এদের প্ররোচনাতেই যুদ্ধের পরে—ছেষট্টির জুলাই-আগস্টে—ন্যাপও দু'ভাগ হয়ে যায়। সবশেষে ছেষট্টির ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের মূল কম্যুনিস্ট পার্টিটিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

ছেষট্টির ফেব্রুয়ারিতে যখন শেখ মুজিবের ছয় দফা ঘোষিত হলো, তখন আমাদের মধ্যে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বের সঞ্চার হয়েছিলো। বিশেষ করে পিকিংপন্থীদের ছয় দফা বিরোধিতার বাড়াবাড়ি আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তখনো অবিশ্যি পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিক বিভক্তি ঘটে যায়নি।

হরিশংকর বাবুই সে-সময়ে আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে পার্টির মতামত ও নির্দেশ আমাকে অবহিত করতেন। ছয় দফা সম্পর্কে পার্টির অভিমত পেতে বেশ বিলম্ব হচ্ছিলো বলে আমাদের টেনশন খুব বেড়ে যাচ্ছিলো। অনেক প্রতীক্ষার পর সে অভিমত জানতে পেলাম।

ছয় দফা সম্পর্কে সেদিনকার কম্যুনিস্ট পার্টির অভিমতটি অনেক পরে, স্বাধীন বাংলাদেশে, পার্টি নেতা খোকা রায় তার স্মৃতিকথায় যেভাবে বিবৃত করেছেন সেটিই আমি এখানে হু-বহু তুলে দিচ্ছি।

"পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল।

"তবে, আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে ৬ দফা কর্মসূচীকে যেভাবে 'বাঙালী জাতির মুক্তিসনদ' বলে অভিহিত করা হচ্ছিল, কম্যুনিস্ট পার্টি তার সাথে একমত হতে পারেনি। কম্যুনিস্ট পার্টির অভিমত ছিল যে, ৬ দফা কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে বাঙালী জাতির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবি ধ্বনিত হয়েছিল। সেজন্য পার্টি ঐ কর্মসূচীর প্রত্যেকটি দফাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান, ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষকদের উপর থেকে সামন্তবাদীদের শোষণের উচ্ছেদ এবং শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের উপর থেকে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণের বিলোপ ছাড়া আপামর বাঙালী জনগণের মুক্তি সম্ভব ছিল না। অথচ ৬ দফা কর্মসূচীতে ঐ সব শোষণ উচ্ছেদের দাবি ছিল না।

"তাই কম্যুনিস্ট পার্টি ৬ দফার আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন হিসাবে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেও ঐ কর্মসূচীকে 'বাঙালী জাতির মুক্তির সনদ' বলে মনে করে নাই।

"৬ দফা কর্মসূচীতে ১. সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, ২. আমূল ভূমিসংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি, ৩. বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়করণ ও ৪. শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী ও মাহিনার গ্যারান্টি—এই চারটি দাবি অন্তর্ভুক্ত করে ঐ কর্মসূচীকে প্রকৃত অর্থে বাঙালী জাতির মুক্তির সনদে পরিণত করার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদনও জানিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে পার্টির ঐ নীতি ও বক্তব্য 'দৈনিক সংবাদে' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। পার্টির ঐ নীতি পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মহলে সমাদৃত হয়েছিল।"

[খোকা রায় : *'সংগ্রামের তিন দশক'*, পৃষ্ঠা ১৯৬]

কম্যুনিস্ট পার্টির এই বিশ্লেষণ ও অভিমত যে সঠিক ছিলো তা পরবর্তী ঘটনাধারায় প্রমাণিত হয়েছে। ছয় দফার সংগ্রামই বাঙালিকে আস্তে আস্তে জঙ্গি করে তুলেছিলো। ছয় দফার দাবিকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষেই পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা শেখ মুজিবকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় জড়িয়েছিলো। সে মামলাই পাকিস্তানের প্রতি বাঙালির পবিত্র ঘৃণা উদ্রেকে প্রচুর পরিমাণে সহায়তা দেয়। কম্যুনিস্ট পার্টি ছয় দফার সঙ্গে অন্য যে চারটি দাবি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলো, সেগুলোই উনসত্তরে ছাত্রদের এগারো দফায় সংযোজিত হয়। এগারো দফা বাঙালির জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েই একদিন স্বাধীনতার এক দফায় রূপ নেয়। পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্ম অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

ষাটের দশকে ভাবাদর্শের সংগ্রাম

ছেষট্টির মার্চ কি এপ্রিলে আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন কবীর চৌধুরী। উনসত্তরের মার্চ পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহে ছিলেন। এই ক'বছরে কবীর চৌধুরীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছিলো। তাঁর স্নেহসান্নিধ্য আমার চৈতন্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আনুষ্ঠানিক অর্থে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন না, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাঁর ছাত্র হতে পেরে আমি ধন্য হয়েছিলাম।

তেরো শো তেয়াত্তর বঙ্গাব্দের নববর্ষে (অর্থাৎ উনিশ শো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে) ময়মনসিংহ শহরের পণ্ডিতপাড়া ক্লাবে কবীর চৌধুরী একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির কথা বলেছিলেন। নববর্ষ উৎসব পালনের মধ্যদিয়ে যে আমরা আমাদের বাঙালি সত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি, এবং এখানেই যে এই উৎসবটি পালনের গুরুত্ব, কবীর চৌধুরী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এ-কথাগুলো উল্লেখ করেছিলেন।

কথাগুলো ছিলো আমারও মনের কথা। কবীর চৌধুরীর মতো একজন বিদগ্ধ মানুষের মুখে এ কথাগুলোই শুনে আমার নিজের মনের ভাবনাগুলোকে আরো ভালো করে গুছিয়ে নিতে উৎসাহিত হলাম। পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান পণ্ডিতপাড়া ক্লাবে হয়েছিলো সকাল বেলায়, বিকেল

বেলায় অনুষ্ঠান ছিলো মুকুল ফৌজে। ময়মনসিংহ মুকুল ফৌজের সংগঠক ও অধিনায়ক আমির আহমদ চৌধুরী আমাকে সে-অনুষ্ঠানে বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি সোৎসাহে সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

মুকুল ফৌজের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জেলার একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। (জেলা প্রশাসক নন)। তিনি ছিলেন কানে খাটো। পদাধিকার বলেই তিনি শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতি বা প্রধান অতিথির আসনটি দখল করে বসতেন। এবং অনেক দীর্ঘ ভাষণ দিতেন। তাঁর ভাষণে একটি কথাই বারবার ঘুরেফিরে আসতো। কথাটি হচ্ছে : 'পাকিস্তান না হলে আমি সার্কেল অফিসারের চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারতাম না, পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিলো বলেই আমি জেলা পর্যায়ের এমন একজন কর্মকর্তা হতে পেরেছি।'

এই লোকটিকেই বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানেও সভাপতির আসনে বসে থাকতে দেখে আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তবু সকালবেলায় কবীর চৌধুরীর আলোচনা শুনে আমার ভেতরে যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিলো সেই উৎসাহের বশেই আমি অনেক কথা বলে ফেললাম। বললাম : আমাদের অনেক উৎসব আছে। ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন কিংবা বুদ্ধপূর্ণিমাও আমাদের দেশের মানুষের উৎসব। কিন্তু এগুলো সবই বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। এ-সবের মধ্যেও সর্বজনীনতার উপাদান কিছু কিছু আছে নিশ্চয়ই, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি ভেঙে এ-সব উৎসবে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষরাও শরিকানা লাভের কিছু সুযোগ পায় অবশ্যই। তবু, স্বীকার করতেই হবে যে, এ-সব উৎসব সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল বাঙালিকে এক সঙ্গে মেলাতে পারে না। কিন্তু পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণে বাংলাদেশের সকল মানুষই একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে। এই উৎসবই আসলে বাঙালির জাতীয় উৎসব। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করে আবহমান কালের বাঙালি এই ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবটি পালন করে এসেছে। বর্তমানে যখন নতুন করে সাম্প্রদায়িক ভাবনার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে তখন তো এ-উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মানুষ সেই গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই এবার অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে নববর্ষ উৎসব পালিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই শুভ লক্ষণ।

আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভাপতি একেবারে ফেটে পড়লেন। অনুষ্ঠানটির পুরো কর্মসূচি সমাপ্ত করতে না দিয়েই তিনি সভাপতির ভাষণ শুরু করে দিলেন। আগেই বলেছি, এই ভদ্রলোক ছিলেন কানে খাটো। আমার সব কথা তার কানে ঢুকেছিলো কিনা জানি না। তবে 'বাংলাদেশ' 'বাঙালি' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই কয়েকটি শব্দ যে তার 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে'ই প্রবেশ করেনি শুধু একেবারে যে কলিজা ফুটো করে দিয়েছিলো, তার ক্রুদ্ধ বাকবিন্যাসেই তা বোঝা গিয়েছিলো। তিনি বলতে লাগলেন :

'আমি বুঝতে পারছি না, আমি কি এখন পূর্ব পাকিস্তানে আছি না ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোনো জায়গায় আছি? বাংলাদেশ বলে কোনো দেশ আছে বলে তো আমার জানা ছিলো না। আমি তো জানতাম যে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা এবং আমরা সবাই পাকিস্তানি। কিন্তু আজ পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ শহরে বসে আমাকে শুনতে হচ্ছে বাংলাদেশের কথা। শুনতে হচ্ছে যে, আমরা বাঙালি। এ কিসের আলামত?...আসলে বাংলাদেশ আর বাঙালির নাম করে আমাদের মধ্যে অতি সুকৌশলে ভারতীয় কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে, এমনকি মুকুল ফৌজের মতো সংগঠনের শিশু-কিশোরদের চিন্তাকেও বিকৃত করে ফেলার চক্রান্ত চলছে। এ-ব্যাপারে এখনই সতর্ক না হলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, বিদেশি

অনুপ্রবেশকারী ও চক্রান্তকারীরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে।...ব্রিটিশ আমলে তো কখনো এ-রকম নববর্ষের অনুষ্ঠান দেখিনি। তখন হিন্দু মহাজনরা পয়লা বৈশাখে হালখাতা করতো। আর আজ করা হচ্ছে বর্ষবরণ। শুধু বর্ষবরণ নয়। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তবরণ। কতো কী? আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন যে, এ-সব অনুষ্ঠান আসলে প্রকৃতি-পূজা মাত্র? ইসলাম সব সময়ই প্রকৃতিপূজার বিরোধী। অথচ আজকে এ-দেশের মুসলমানদের প্রকৃতি পূজারী বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।...আপনারা এই সব বিদেশি চক্রান্তকারীদের চিনে রাখুন। আপনারা...'

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাকেই যে সেই কথিত চক্রান্তকারীদের একজন বলে শনাক্ত করা হলো, এ-কথা সবাই বুঝে গেলেন। চক্রান্তকারী ধরা পড়ায় সেই অনুষ্ঠানের শ্রোতা-দর্শকদের কেউ কেউ অবশ্যই খুশি হয়েছিলেন। তবে সকলেই খুশি হওয়ার দলে ছিলেন না। অনেকেই আমার সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন। শঙ্কিত আমি নিজেও হলাম। একজন ক্ষমতাবান সরকারি কর্মকর্তা যেখানে আমার বক্তব্যের মধ্যে পাকিস্তান-বিরোধী চক্রান্ত আবিষ্কার করে ফেলেছেন, সেখানে যে-কোনো সময় যে আমার ওপর 'পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন'-এর খড়্গ নেমে আসতে পারে—আমার শুভানুধ্যায়ীদের এমন আশঙ্কাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিই কী করে?

যদিও সত্যিসত্যিই আইনের খড়্গাঘাত আমার ঘাড়ে পড়েনি, তবু সে-খড়্গটিকে প্রতিনিয়ত আমার সামনে আন্দোলিত করে করে এমন একটা ভীতির ভাব সৃষ্টি করে রাখা হলো যে, আসল খড়্গাঘাতটিই আমার জন্যে এরচেয়ে কম অস্বস্তিকর হতো।

এ-রকম ছিলো উনসত্তরের পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত। প্রবল গণআন্দোলনের ধাক্কায় আইউবের পতন ও ইয়াহিয়ার উত্থানের পর অনেক পরিমাণে স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিলো। আসলে চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি জামানার উনসত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে একাত্তরের পঁচিশ মার্চ—এই দু'বছরই এ-দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করেছে। আর এই দু'বছরই রাজত্ব করেছে লম্পট, মদ্যপ ও দুনিয়ার জঘন্যতম নরঘাতকদের একজন, যার নাম ইয়াহিয়া খান। বাঙালির এ-রকম দুশমন তো আর দু'টি ছিলো না। সারা দুনিয়াতেই বা এ-রকম গণদুশমন ক'টি আছে? অথচ, আমি কিনা সেই ইয়াহিয়ার রাজত্বকালকেই প্রশংসা করে ফেললাম! এতে একান্ত সঙ্গতভাবেই, যে-কোনো বাঙালি আমাকে ধিক্কার জানাতে পারেন।

আসলে গণদুশমনদের হাত দিয়েও কখনো কখনো যে কিছু কিছু গণমুখী কাজ হয়ে যায়, এটিই বোধহয় সমাজ বিকাশের দ্বান্দ্বিক নিয়ম তথা ইতিহাস-বিধাতার পরিহাস। সেই পরিহাসের ফলেই ইয়াহিয়া তার রাজত্বের প্রথম দু'বছরে এমন কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বসে যেগুলো পরিণামে বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামে অনেক পরিমাণে অবস্থানগত সুবিধা করে দেয়। যেমন—এই লোকটিই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে চারটি প্রদেশ পুনর্গঠন করে, আইউবি মৌলিক গণতন্ত্রের পরোক্ষ নির্বাচনের বদলে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্যমূলক জন প্রতিনিধিত্বের জায়গায় জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রবর্তন করে। পাকিস্তানের দু'অংশের সংখ্যাসাম্য বাতিল করে দেয়ার ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ১৬৯টি ও পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টি। আর এতেই সত্তরের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসতে

পারে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে ইয়াহিয়া যতো চণ্ডরূপই দেখাতে থাক, স্বাধিকার-চেতন বাঙালিকে দমন করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে এবং স্মরণীয় যে, এ-অবস্থাটি সৃষ্টির পেছনে ইয়াহিয়া আর তার সাঙাৎদের নিজেদেরই রয়েছে যথেষ্ট অবদান। অর্থাৎ ছাপ্পান্ন সাল থেকে বলবৎ সংখ্যাসাম্য তুলে দিয়ে ওরা, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, বাঙালির হাতে বাড়তি শক্তির জোগান দিয়ে ফেলে।

তাছাড়া, শোনা যায়, ইয়াহিয়া তার সেনাবাহিনীর বিশেষ অনুসন্ধানী বিভাগটির প্রতিবেদন থেকে নিশ্চিত হয়েছিলো যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন আওয়ামী লীগ একটি আসনও পাবে না, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানেও এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী দলটি সবগুলো আসন দখল করতে পারবে না। এখানেও অন্তত পঁচিশ/তিরিশ ভাগ আসন পাকিস্তানবাদী দক্ষিণপন্থী দলগুলো পেয়ে যাবে। পরিণামে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাঙালি জাতীয়তাবাদ-বিরোধীদের হাতেই থাকবে। এই বিশ্বাস থেকেই ইয়াহিয়া আত্মপ্রসন্ন থেকেছে এবং মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর খুব একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি। তাই, ঊনসত্তরের মাঝামাঝি থেকে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত আমরা যেরকম স্বচ্ছন্দে ও বিনা বাধায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছি, নানা বিষয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে অবাধে প্রগতিশীল মত ব্যক্ত করেছি, সে রকমটি সারা পাকিস্তান আমলে আর কখনো করতে পারিনি। সত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আলোকময় নাহার নেতৃত্বে গানের দল নিয়ে আমরা সারা ময়মনসিংহ শহর পরিক্রমা করেছি, বিপুল সংখ্যক মানুষ আমাদের মিছিলে সামিল হয়েছে, শহীদ দিবসের অনেকগুলো আলোচনা সভায় আমরা অনেক কড়া কড়া কথা বলেছি। সত্তর সালে বিপুল উদ্দীপনায় আমরা লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করেছি, কোনো কর্তৃপক্ষীয় বাধার সম্মুখীন হইনি। এর আগে পাকিস্তানে লেনিনের নাম উচ্চারণই প্রায় নিষিদ্ধ ছিলো, তাঁকে নিয়ে উৎসবের সমারোহ করা কিংবা প্রকাশ্যে লেনিনবাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা তো ছিলো সম্পূর্ণ অসম্ভব। একারণেই বলছিলাম যে, চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি শাসনে একমাত্র ইয়াহিয়ার অগণতান্ত্রিক শাসনের প্রথম দু'বছরই এ-দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করেছে। তবু, এর আগেও, চৌষট্টি সালে ময়মনসিংহ শহরের নাসিরাবাদ কলেজের শিক্ষক হওয়ার পর থেকেই প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছি— যদিও কর্তৃপক্ষীয় ধমক খেতে হয়েছে প্রতিনিয়তই। তবে, সুখের কথা, সেই দুর্বিনীতকালেও আমরা এমন কিছু সহৃদয় ও সাহসী মানুষকে পেয়েছি যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকারের কর্মচারি হয়েও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা জুগিয়েছেন।

চৌষট্টিতেই আনন্দমোহন কলেজ ও নাসিরাবাদ কলেজের কয়েকজন ছাত্র মিলে 'সুন্দরম' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলো। প্রগতিচেতন এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলো আবদুর রফিক, বিমল কান্তি দে, মতীন্দ্র সরকার, নূরুল হক, আমীন আহমদ চৌধুরী, সরদার নূরুল আনোয়ার ও তারিক সালাউদ্দীন। বছরখানেক পরেই অবিশ্যি সংগঠনটি সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। ময়মনসিংহের কলেজের পাঠ চুকিয়ে ওরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ওই সাতজনের প্রথম চারজনই হয়েছে অধ্যাপক। আমীন আহমদ চৌধুরী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা এবং পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি পেয়ে বর্তমানে (১৯৯৫) মেজর জেনারেল পদে আসীন। সরদার নূরুল আনোয়ার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের চাকরি থেকে শুরু করে অনেক ঘাটের পানি খেয়ে এখন কোথায়

গিয়ে ভিড়েছে জানি না। সেকালের তুখোড় আবৃত্তিকার তারিক সালাউদ্দীন আজ শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত ও হতশ্রী।

'সুস্থ প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলা' ছিলো 'সুন্দরম'-এর ঘোষিত আদর্শ। এর অঘোষিত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে-সময়কার ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার আবদুল খালেক। চৌষট্টির সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরে খালেক সাহেবের সভাপতিত্বে 'সুন্দরম' ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলো। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো 'পাকিস্তানের সংস্কৃতি'। আলোচক ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও পঁচাত্তরের নভেম্বরে জেলখানায় নিহত), সৈয়দ আবদুস সুলতান (বায়ান্তর সাল থেকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার), রিয়াজ উদ্দিন আহমদ (সে-সময়ে নাসিরাবাদ কলেজে অধ্যক্ষ) ও মুসলিম চৌধুরী (তখনকার ময়মনসিংহ জেলার 'এডুকেশন অফিসার')। আলোচকদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ।

পাকিস্তানের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মুসলিম চৌধুরী তেমন কিছু বলেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি ভাবনার প্রসঙ্গ টেনে এনে সাধারণভাবে সংস্কৃতি সম্পর্কে খুবই হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছিলেন তিনি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তখনই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ধারক। তার আলোচনায় তাই বাঙালি সংস্কৃতির ওপরই জোর পড়েছিলো বেশি, বাঙালি সংস্কৃতিকে অবদমনের জন্যে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগও কম ছিলো না। সৈয়দ আবদুস সুলতান তখনো মুসলিম লীগের রাজনীতি ছাড়েননি; তবে সে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যে খুব বিবিবনা হচ্ছিলো না, এমন কথাও বাজারে চালু ছিলো। তাঁর আলোচনা তাই সেদিন হয়েছিলো অনেকটা 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে' গোছের। কিন্তু তার বক্তৃতাশৈলী খুবই চমৎকার ছিলো বলে শ্রোতাদের কাছে তার কথাগুলো উপভোগ্য হয়েছিলো।

আমি তখন কলেজের তরুণ শিক্ষক। গা থেকে ছাত্রের গন্ধ একেবারে মুছে যায়নি। তাই কথাবার্তায় ভয়ডর বা বৈষয়িক বিবেচনাটা ছিলো খুবই কম। 'পাকিস্তানের সংস্কৃতি' বলে কোনো একক সংস্কৃতির অস্তিত্বেই আমার বিশ্বাস ছিলো না। বহুজাতিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংস্কৃতিও বহু। সেই বহুর মধ্যে বাঙালিদের সংস্কৃতিই প্রধান, কারণ বাঙালি জাতির মানুষেরাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। একাধিক জাতি আছে যে-রাষ্ট্রে, সে-রাষ্ট্রের সাংগঠনিক কাঠামোকে হতে হয় ফেডারেল ধরনের। ফেডারেল রাষ্ট্রে সংস্কৃতি বা কালাচরেরও ফেডারেশন গড়ে উঠতে পারে, কোনো একটি নামে বা পরিচয়ে সে-রাষ্ট্রের সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা চলে না। পাকিস্তান রাষ্ট্রেও তাই আছে পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বালুচি, পাঠান, বাঙালি প্রভৃতি সংস্কৃতি—পাকিস্তানি সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। পাকিস্তানের প্রতিটি সংস্কৃতিরই নির্বাধ বিকাশ নিশ্চিত করা পাকিস্তানি রাষ্ট্রবিধায়কদের দায়িত্ব। অথচ সে-দায়িত্ব পালনের বদলে তারা 'পাকিস্তানি সংস্কৃতি' নামে একটি কিম্ভূত পদার্থ সৃজনের অপপ্রয়াসে রত। বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশকে তারা নানাভাবেই রুদ্ধ করতে চাইছে। এ-রকমটি মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

এ-সব কথাই খুব কড়া ভাষায় সেদিন আমি বলেছিলাম। আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন আমারই কলেজের অধ্যক্ষ রিয়াজউদ্দিন আহমদ সাহেব। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়ায় এখানে বহু জাতির বা বহু সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পাকিস্তানের সংস্কৃতির মূল মর্ম হচ্ছে ইসলাম, ইসলামের বিধানই হবে পাকিস্তানি সংস্কৃতির একমাত্র চালিকাশক্তি, 'কালচারের ফেডারেশন' ধারণাটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতির পরিপন্থী।

রিয়াজউদ্দিন সাহেবের এই বক্তব্য সভায় বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করলো, প্রতিক্রিয়া হলো মিশ্র ধরনের। প্রবীণ শ্রোতারা তার বক্তব্যে খুশি হলেও নবীনদের মধ্যে একটু ভিন্ন মতের অনুরণন শোনা গেলো। সবাই সভাপতির মন্তব্য শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলো। পাকিস্তান সরকারের একজন পুলিশ অফিসার হয়ে সভাপতি এখানে কী অবস্থান গ্রহণ করেন, সবারই কৌতূহল সেদিকে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে সভাপতি কিন্তু পাকিস্তানের সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির কথাই বেশি করে বললেন। আমার 'কালচারের ফেডারেশন' সম্পর্কীয় বক্তব্যকে তিনি সরাসরি সমর্থন জানালেন। পাকিস্তান সরকার-নিযুক্ত একজন পুলিশ অফিসারের মুখে এ-রকম বক্তব্য শোনা যাবে বলে বোধহয় শ্রোতাদের কেউই আশা করেননি।

একাত্তরে যখন শুনলাম পুলিশ অফিসার আবদুল খালেক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, তখন সেটি আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিলো। চৌষট্টি সালে যিনি বাঙালিত্বের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রাখতে পারেন, একাত্তরে তিনি মুক্তিযোদ্ধা হওয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পারেন?

ষাটের দশকে যারা পাকিস্তানের সঙ্গে ভাবাদর্শের সংগ্রাম করেছে, একাত্তরে তারাই বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে সামিল হয়েছে।

ভাবাদর্শের সংগ্রামের ব্যাপক বিস্তৃতি

আটান্নয় সামরিক শাসন জারির পর থেকে সারা ষাটের দশক জুড়ে স্বৈরশাসন চললেও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কখনো থেমে থাকেনি। প্রবল নিপীড়নের ফলে রাজনীতিকদের সংগ্রাম কখনো কখনো ঝিমিয়ে পড়লেও ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির সংগ্রাম বিরামহীনভাবেই চলেছে। অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে তো কর্তৃপক্ষের প্রতিরোধের মুখে এ-সংগ্রাম অনেক বেশি গতিবেগ পেয়েছে বরং। ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির সংগ্রামে বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা ও নৈপুণ্য রাজনীতিকদের নানাভাবে সহায়তা করেছে। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র, প্রগতিশীল বইপত্র বাজেয়াপ্ত করার পাঁয়তারা, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ ও নজরুলের 'মুসলমানীকরণ'—এরকম অনেক কিছুর বিরুদ্ধেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী ও ছাত্রদের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি ভাবাদর্শ যতো বেশি চণ্ডরূপ ধারণ করেছে, বাঙালি মধ্যবিত্ত তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ সম্পর্কে ততো বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নির্মোক ভেঙে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির উদার ভূমিতে পা রেখেছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় তারা যেমন 'মুখের কথা কাইড়্যা' নেয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, তেমনি এরপর তাদের ভাষার বর্ণমালার বিরুদ্ধে যতোবার যতো চক্রান্ত পরিচালিত হয়েছে সে-সব চক্রান্তকেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছে। তাদের কবি 'দুঃখিনী বর্ণমালা'র প্রশস্তি রচনা করেছেন, তাদের পণ্ডিতরা সেই বর্ণমালার দুঃখ ঘুচানোয় সক্রিয় হয়েছেন। পাকিস্তানি স্বৈরশাসক তথাকথিত জাতীয় ভাষা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে মেতেছে, আত্মসচেতন বাঙালি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছে। পাকিস্তানবাদীরা রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার অপচেষ্টা চালিয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতিসেবীরা

রবীন্দ্রচর্চার বিস্তার ঘটিয়েছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ধারকরা নজরুলের খণ্ডীকরণ ঘটিয়ে তাকে 'মুসলমান' বানাতে চেয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীলরা নজরুলের অখণ্ড সত্তার উন্মোচন ঘটাতে প্রবৃত্ত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল কূপমণ্ডূক ও ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আধুনিক বিজ্ঞানচেতনাসম্পন্ন বই-পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার পায়তারা করেছে, উদার জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতাবাদীরা সেই অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছে।

সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের এই সংগ্রামে, সন্দেহ নেই, রাজধানী ঢাকার সংস্কৃতিকর্মি ও বুদ্ধিজীবীরাই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন। তবে, সে-সংগ্রাম একান্তভাবে ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে থাকেনি বলেই তা জোরদার হতে পেরেছিলো, এবং পরিণামে পাকিস্তানি ভাবাদর্শকে স্থানচ্যুত করে বাঙালিত্বের প্রতিষ্ঠাদানে সক্ষম হয়েছিলো।

ময়মনসিংহের মতো জেলা শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও আমি এ-বিষয়টিই লক্ষ করেছি।

ষাটের দশকের প্রায় গোড়া থেকেই মুসলিম চৌধুরী ছিলেন ময়মনসিংহের 'জিলা শিক্ষা অফিসার'। শ্রীহট্ট-সন্তান এই সুরসিক ভদ্রলোক প্রায় এক দশক ময়মনসিংহে ছিলেন। এমন বিদগ্ধ সাহিত্যপ্রাণ অমায়িক ও উদার হৃদয় মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের '*সঞ্চয়িতা*'র প্রায় পুরোটাই তাঁর মুখস্থ ছিলো। নানা আলোচনা সভায় সিলেটি উচ্চারণে মুসলিম চৌধুরীর রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি হতো খুবই উপভোগ্য। এমন একজন রবীন্দ্রপ্রেমিক সরকারি কর্মচারিকে পেয়ে ষাটের দশকের সেই বিরূপ সময়টিতে আমাদের খুবই সুবিধা হয়েছিলো।

চৌষট্টি সালে 'সুন্দরম্' সংগঠনটির পাশাপাশি আমার ছোট ভাই মতীন্দ্র সরকার, আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র নূরুল হক, মতীন্দ্রর ছাত্র খগেশ কিরণ তালুকদার এবং আরো কয়েকজন তরুণ মিলে গড়ে তুলেছিলো 'বাংলাভাষা প্রচার-অভিযান সমিতি'। এর সভাপতি হয়েছিলেন আমার বন্ধু ও সহকর্মী রাহাত খান, সম্পাদক মতীন্দ্র সরকার। 'জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করুন'—এ-রকম স্লোগান নিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে এ-ধরনের বেশকিছু সমিতি গড়ে উঠেছিলো। ময়মনসিংহের তরুণদের ওই সমিতিটিও ছিলো অনুরূপ। অল্প কয়েকদিনেই এই সমিতিটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছিলো। বাংলা ভাষা ব্যবহারের আবেদন জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করা, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সেঁটে দেয়া, অফিসে অফিসে গিয়ে সকলের কাছে বাংলায় অফিসের কাজকর্ম করার জন্যে অনুরোধ জানানো—এ-সবই ছিলো এ-সংগঠনটির কর্মকাণ্ড। একবার প্রেসক্লাবে একটি সেমিনারও করেছিলো এরা। সেমিনারে সভাপতি ছিলেন মুসলিম চৌধুরী। এ-সেমিনারেই বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটেছিলো। একজন অধ্যাপিকা বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি ময়মনসিংহসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের উচ্চারণভঙ্গি নিয়ে কিছু কটাক্ষ করেছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই অধ্যাপিকা জন্মসূত্রে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয়, পশ্চিমবঙ্গসুলভ উচ্চারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি সব সময় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতেন, এবং 'বাঙাল'দের সামনে তার উচ্চমন্যতাকে গোপন রাখতেন না।) পূর্ববাংলার মানুষদের উচ্চারণরীতি পরিবর্তনের জন্যে তিনি উপদেশবাণীও বর্ষণ করেছিলেন। সভাপতির আসনে বসে শ্রীহট্ট-সন্তান মুসলিম চৌধুরী ওই অধ্যাপিকার বক্তব্যে যে রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করছিলেন সে-অস্বস্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অধ্যাপিকার বক্তৃতা শেষ

হতেই সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীহট্টীয় উচ্চারণভঙ্গিতে বেশ মজা করে তিনি বলতে লাগলেন—"বেগম সাহেবার কথাগুলো আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না। উনি যে-অঞ্চলে জন্মেছেন সে-অঞ্চলের উচ্চারণভঙ্গি খুবই সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে বাংলার সকল অঞ্চলের মানুষকে যে ওই রকম উচ্চারণেই কথা বলতে হবে—তেমন দাবি তিনি করতে পারেন না। কারণ 'ভাষা'র মূল বিষয় হলো 'ভাব'। ['ভাষা' ও 'ভাব' শব্দ দু'টি তার উচ্চারণে হয়ে গিয়েছিলো অনেকটা 'বাষা' ও 'বাব'-এর মতো।] ভাব প্রকাশই হলো বড়ো কথা, উচ্চারণের জন্যে কিছু আসে যায় না। ['উচ্চারণ' শব্দটিও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন অনেকটা 'উচ্চারণ'-এর মতো] ওই যে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় আছে—নায়ক বলছে নায়িকাকে—

কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা,
কোথায় পাইবাম দড়ি,
তুমি হও গহীন গাঙ
আমি ডুইব্যা মরি।

[এই কথাগুলো তিনি বলেছিলেন পুরো সিলেটি উচ্চারণে]—এখানে 'উচ্চারণ' শুদ্ধ হলো না বলে কি ডুইব্যা মরণ আঁটকিয়া রইলো?'

সারা সভায় হাসির রোল উঠলো।

উচ্চারণ সম্পর্কে কোনো কথা উঠলেই মুসলিম চৌধুরীর ওই বক্তৃতাটির কথা আমার চট করে মনে পড়ে যায়।

পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে উনিশ 'শো উনসত্তরের ফেব্রুয়ারি—এই ক'বছরে ময়মনসিংহ শহরের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের নানাভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন মুসলিম চৌধুরী ও কবীর চৌধুরী। এরা দু'জনই সরকারি কর্মচারি হলেও পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক ভাবদর্শের বিপরীত ভূমিতেই ছিলো এদের অবস্থান। ময়মনসিংহের প্রায় সব সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনের সঙ্গেই এরা যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সে-সময়কার ময়মনসিংহ শহরে 'মোমেনশাহী সাহিত্য মজলিস' ছিলো একটি বনেদি সাহিত্য সংগঠন। পঞ্চাশের দশকে প্রখ্যাত লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ যখন জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা রূপে ময়মনসিংহে কর্মরত ছিলেন তখন তার হাতেই এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা ঘটে। এ-সংগঠনটির নির্মিতিতে সে-সময়কার আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইনের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এর পড়তি দশা হলেও তখনো এটি মোটামুটি সক্রিয়। খান সাহেব আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো 'শুক্রবাসরীয় সাহিত্য সংসদ'। আর ছিলো ময়মনসিংহ 'প্রেসক্লাব'। নামে প্রেসক্লাব হলেও এটি শুধু সাংবাদিকদের ক্লাব ছিলো না, ছিলো শহরের সকল সুধীজনের মিলনকেন্দ্র।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'মোমেনশাহী সাহিত্য মজলিস' বিলুপ্ত হয়ে গেছে, 'শুক্রবাসরীয় সাহিত্য সংসদ' কোনো রকমে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সক্রিয় আছে কেবল ময়মনসিংহ 'প্রেসক্লাব'। আরো আছে 'আর্য ধর্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভা' ও 'মুসলিম ইনস্টিটিউট' নামে দুটো প্রতিষ্ঠান। নামেই প্রকাশ যে, এ-দুটো প্রতিষ্ঠানই ধর্ম সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। কিন্তু তাই বলে এ-দু'য়ের একটিকেও পুরোপুরি, অন্তত নিন্দার্থে, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করা উচিত হবে না।

প্রথমেই ময়মনসিংহ শহরের 'দুর্গাবাড়ি'তে অবস্থিত 'আর্য ধর্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভা'র কথা বলি। দুর্গাবাড়ি, বলাবহুল্য, হিন্দুদের একটি ধর্মকেন্দ্র। আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে

ময়মনসিংহের ধনাঢ্য ও ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ দুর্গাবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন। এর দশ বারো বছর আগেই ময়মনসিংহ শহরে ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ব্রাহ্মরাই এ-শহরে আধুনিক চিন্তাচেতনার গোড়াপত্তন করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রগতিশীল ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসারে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে রোষের সঞ্চার ঘটে। সেই রোষ থেকেই ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে তারা সংগঠিত হন। দুর্গাবাড়ি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ঘটে তাঁদের সংগঠিত হওয়ার সূচনা। ব্রাহ্মসমাজের বিপরীতে দুর্গাবাড়িকে কেন্দ্র করেই তারা গড়ে তোলেন 'আর্য ধর্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভা'—সংক্ষেপে 'ধর্মসভা'। উনিশ শতকের ষাটের দশকে যে প্রতিষ্ঠানটির পত্তন ঘটেছিলো একুশ শতকে এসেও তার অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটেনি। তবে একটি রক্ষণশীল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও কালের গতিতে তার চরিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। উদ্যোক্তাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ-প্রতিষ্ঠানটি আস্তে আস্তে অনেক সেক্যুলার কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়ে। 'ধর্মসভা' পরিচালিত দুর্গাবাড়ি পাঠাগারটি ছিলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সে-পাঠাগারে ধর্মীয় পুস্তকের সংগ্রহ যতো না ছিলো, তারচেয়ে অনেক বেশি ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তকসম্ভার। 'হিন্দু' ছাড়া কেউ ধর্মসভার সদস্য হতে না পারলেও ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই দুর্গাবাড়ির পাঠাগারটি ব্যবহার করতে কোনো বাধা থাকে না। দুর্গাবাড়িতে প্রতি পূর্ণিমায় তিনদিনব্যাপী শাস্ত্র, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হতো। প্রথম দিনে শাস্ত্র সম্মেলন, দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য সম্মেলন ও তৃতীয় দিনে সঙ্গীত সম্মেলন। পূর্ণিমা তিথিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের নাম ছিলো 'পূর্ণিমা সম্মেলন'। প্রথম দিনের শাস্ত্র সম্মেলনটি অবিশ্যি ছিলো নিতান্তই 'পণ্ডিতি' ব্যাপার। হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রের নানা আনুষ্ঠানিক বিধি-বিধানই ছিলো এ-সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়, তাই এতে সাধারণ রসপিপাসু মানুষের তেমন কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলনে ধর্মবর্ণের বাধা ডিঙিয়ে সকল সম্প্রদায়ের রসলিপ্সু মানুষ দুর্গাবাড়িতে সমবেত হতেন। সাহিত্য সম্মেলনে ধর্মভিত্তিক বিষয়বস্তুর পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রচুর পঠিত হতো। পূর্ণিমা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর মতো সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আরো নানা অনুষ্ঠানে দুর্গাবাড়ি সারা বছর জমজমাট হয়ে থাকতো। প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় উদযাপিত হতো 'বুদ্ধজয়ন্তী'। বুদ্ধের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে খুব গভীর তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা হতো সেখানে। ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় অনেক বিদেশি ছাত্রও পড়তে আসতো। এদের মধ্যে বৌদ্ধ ছাত্রদের দুর্গাবাড়ির বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবে যোগদান করতে আমি কয়েকবারই দেখেছি।

হিন্দুদের 'আর্য-ধর্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভা' বা 'ধর্মসভা' যেমন হিন্দুত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক সেক্যুলার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়, 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'ও তেমনি কেবল ইসলাম ও মুসলিমের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। আমরা তো জানি : আমাদের দেশে নাগরিক মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটেছিলো, বলতে গেলে, সম্প্রদায়-ভিত্তিতেই। উনিশ শতকে কোলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপরতলার কিছু মানুষকে নিয়েই। এরপর দেশের বিভিন্ন স্থানে নগরায়ণের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ওই হিন্দু মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীটিরই বিস্তার ঘটতে থাকে বেশ কয়েক দশক ধরে। এদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেও, স্বাভাবিকভাবেই, হিন্দুত্বের ছাপ পড়ে—অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক চরিত্র ধারণ করে। এর অনেক পরে

মুসলমান সমাজ থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে যে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীটি উঠে আসে সেটিও যে চরিত্রে সম্প্রদায়-চেতনাকেই ধারণ করবে তাতে অস্বাভাবিকতার কী আছে? ময়মনসিংহ শহরেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যেমন হিন্দু সম্প্রদায়-চেতনা নিয়েই বিভিন্ন নাগরিক মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো, তেমনি বিলম্বে উদ্ভূত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ 'আঞ্জুমান'-এর মতো যে-সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলো সে-সবের মধ্যেও স্ব-সম্প্রদায়প্রীতিই স্বাভাবিক প্রাধান্য পেয়েছিলো। মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভীপ্সাকে ধারণ করেই বিশ শতকের তিরিশের দশকে 'মুসলিম ইনস্টিটিউটে'র প্রতিষ্ঠা। যতোই সম্প্রদায়চেতনা থাকুক, এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ থাকে আধুনিকতাকে ধারণ করার দিকেই। আধুনিক নানা বিষয়ের চর্চাই হয়ে ওঠে এর উপজীব্য, মুসলিম সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষদের জন্যও এর দরোজা একেবারে বন্ধ থাকে না। অন্তত পাকিস্তান আমলে তো ময়মনসিংহের মুসলিম ইনস্টিটিউটকে আমি এক ধরনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করতেই দেখেছি। ইনস্টিটিউটের পরিচালন ব্যবস্থায় মুসলিম-নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকলেও এর নানা কর্মকাণ্ডে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই অংশগ্রহণে কোনো বাধা থাকেনি। ষাটের দশকে মুসলিম ইনস্টিটিউটের অনেক অনুষ্ঠানেই আমি অংশ নিয়েছি—আমার জন্মগত সম্প্রদায়-পরিচয় নিয়ে সেখানে কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলিম ইনস্টিটিউট নিশ্চয়ই সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছিলো। কিন্তু ষাটের দশকে মুসলিম ইনস্টিটিউটে যে-সব আলোচনা সভায় আমি যোগ দিয়েছি সেগুলোতে নানাভাবে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনাই আমি শুনেছি। পুলিশ সুপার আবদুল খালেক, এডুকেশন অফিসার মুসলিম চৌধুরী, সরকারি আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ কবীর চৌধুরী এবং এ-রকম আরো অনেকে মুসলিম ইনস্টিটিউটের আলোচনা সভায় যে-সব বক্তব্য রাখতেন সে-সব কোনো মতেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্য বা পাকিস্তানি ভাবাদর্শের পোষকতা করতো না। ইনস্টিটিউটের রক্ষণশীল কর্মকর্তারা নিজেরা যা-ই ভাবুন না কেন, তাদের চিন্তা-ধারা তখন যুগের দাবির কাছে পরাভব মানতে বাধ্য হয়েছিলো।

আর দুর্গাবাড়ির ধর্মসভার পক্ষে তো পাকিস্তানি ভাবাদর্শের পোষকতা করার বিষয়টি ছিল একেবারেই অবান্তর। পূর্ণিমা সম্মেলনের উদ্যোক্তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপবাদ মাথায় নিয়েই বাঙালি সংস্কৃতির সনিষ্ঠ চর্চা করে চলেছিলেন। পূর্ণিমা সম্মেলনের কয়েকটি অনুষ্ঠানে মুসলিম চৌধুরীর সরস ও বলিষ্ঠ বক্তব্য সে-সময়ে ময়মনসিংহ শহরের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যথেষ্ট চাঙা করে তুলেছিলো।

এভাবে ষাটের দশকের ময়মনসিংহ শহরে, 'মোমেনশাহী সাহিত্য মজলিস' বা 'প্রেসক্লাবে'র মতো বিদ্বৎসভাগুলোর পাশাপাশি 'ধর্মসভা'বা 'মুসলিম ইনস্টিটিউটে'র মতো সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু কিছু কর্মকাণ্ডেও পাকিস্তানের ভাবাদর্শবিরোধী ভূমিকাই পালিত হচ্ছিলো। তবু, এ-সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের যে এ-ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ও পিছুটান ছিলো, সে-কথাও স্বীকার করতেই হবে। তাই, তরুণরা এগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকতে খুব পছন্দ করতো না, তারা তাদের নিজস্ব সংগঠন নিয়ে এগিয়ে এলো। 'সুন্দরম'—এর পর গড়ে উঠলো 'আমরা সমুদ্রমুখী'। কবীর চৌধুরীর সক্রিয় আনুকূল্যে কাজকর্ম চালিয়ে 'আমরা সমুদ্রমুখী' অল্পদিনেই ময়মনসিংহ শহরে সাড়া জাগিয়েছিলো। একটি রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন হিসেবে পাকিস্তানবাদীরা একে চিহ্নিত করেছিলো, পাকিস্তানের 'বুদ্ধিবিভাগ' এর পেছনে

লেগেছিলো। তরুণ ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান 'আমরা সমুদ্রমুখী'র সঙ্গে আমি যদিও সাংগঠনিকভাবে যুক্ত ছিলাম না, তবু এর সব কর্মকাণ্ডেই অংশগ্রহণ করতাম বলে আমার বিরুদ্ধেও পাকিস্তানবাদীদের আক্রোশের কমতি ছিলো না।

মুসলিম চৌধুরী কখনো সরাসরি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতেন না। কিন্তু কবীর চৌধুরীর সংস্কৃতি-সম্পর্কিত আলোচনাতেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ অনেক তীক্ষ্ণতার সঙ্গে উঠে আসতো। উনিশ শো ছেষট্টি সালের ছয় সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ টাউন হলে 'পাকিস্তান প্রতিরক্ষা দিবস' পালন করা হয়েছিলো। এক বছর আগে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তারা অবশ্যই ছিলেন সরকারি আশীর্বাদপুষ্ট জঙ্গী পাকিস্তানবাদী। তারা অনেক গরম গরম কথা বলেছিলেন। তাদের সব কথাতেই ছিলো উগ্র সাম্প্রদায়িকতার উদগার। কিন্তু, সেই অনুষ্ঠানেই, কবীর চৌধুরী সম্পূর্ণ বিরীতধর্মী কথা বলে সভার শ্রোতা ও উদ্যোক্তাদের অবাক করে দিয়েছিলেন। পাক-ভারত যুদ্ধকে উপলক্ষ করে এদেশে যে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীতকে অপাংক্তেয় ও অবাঞ্ছিত ঘোষণার যে অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে, পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির নামে আবহমানকালের বাঙালি সংস্কৃতিকে যেভাবে অবদমন করা হচ্ছে, এ-সবই অত্যন্ত অশুভ ফল বয়ে আনবে বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর কিছুদিন পরে জিলা পরিষদ হলে সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত আরেকটি অনুষ্ঠানেও তিনি এ-কথাগুলোই আরো তীক্ষ্ণভাবে উপস্থিত করলেন, প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি-ব্যাখ্যাতাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন।

সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ হয়ে কবীর চৌধুরী যে-সব কথাবার্তা বলে চলছিলেন, এবং তরুণদের যে-সব কর্মকাণ্ডে উৎসাহ জোগাচ্ছিলেন তাতে তার ওপর রাষ্ট্রশক্তির সুনজর থাকার কথা নয়। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত কবীর চৌধুরী ছিলেন লা-পারওয়া।

মুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনানী রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

সৈয়দ নজরুল ইসলাম একান্ত আবেগে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'অসাধারণ কাজ করছেন আপনারা। আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিলো এ-রকম কিছু করার। কিন্তু পারিনি, চেষ্টা করেও পারিনি। আর এখন তো রাজনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি, সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। তবু এটা বুঝি যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ না করতে পারলে আমাদের রাজনীতি কোনোমতেই এগিয়ে যাবে না।...এই যে আবহমান বাঙালির সংস্কৃতিকে তুলে ধরলেন, জোরালোভাবে উপস্থিত করলেন, এ-রকমটি তো খুবই দরকার এ-সময়।...আপনারা এগিয়ে যান, আমার সহযোগিতা সব সময়ই পাবেন। তবে, সরাসরি আমার মতো রাজনীতির মানুষকে এর সঙ্গে জড়াবেন না। তাহলে আপনাদের কাজে অনেক বাধা আসবে।...এসব কাজ করতে তো টাকা-পয়সার প্রয়াজন। সে-ব্যাপারে আমি আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।'

কথাগুলো তিনি বলেছিলেন ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ হলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কথাগুলোর উপলক্ষ একটু আগে সমাপ্ত হওয়া 'আমরা সমুদ্রমুখী'র একটি অনুষ্ঠান। সময়টা সাতষট্টির সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরের একটি সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়েছিলো মতীন্দ্রর লেখা একটি গীতিআলেখ্য—'কালের যাত্রার ধ্বনি'। আলেখ্যটিতে ছিলো চর্যাপদের কাল থেকে

শুরু করে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি চমৎকার রূপরেখা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন অধ্যাপক আজিজুল হক চৌধুরী। অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম (যিনি পরে আমেরিকা থেকে মৎস্যবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন) স্বরচিত জারী গানে বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক রূপটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছিলেন। আলোচনা করেছিলাম আমি ও অনুষ্ঠানের সভাপতি কবীর চৌধুরী।

পুরো অনুষ্ঠানটি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন। যিনি পরবর্তীকালে আমাদের মুক্তিসংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, স্বাধীন দেশের কারাগারে আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই সৈয়দ নজরুলের কর্মজীবনের প্রধান অংশটি অতিবাহিত হয়েছে ময়মনসিংহ শহরেই। আমার বন্ধুদের অনেকেই আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসের জাঁদরেল অধ্যাপক সৈয়দ নজরুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ নেত্রকোনা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আমি যখন আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হই, সেই সাতান্ন সালের আগেই সৈয়দ নজরুল অধ্যাপনা ছেড়ে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছেন। তবে কলেজে পড়ার সময়েই আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাই একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে। আটান্ন সালের গোড়ার দিকে আনন্দমোহন কলেজে জাতিসংঘের এক 'নকল অধিবেশনে'র অনুষ্ঠান হয়েছিলো। 'গণচীনের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি' ছিলো অধিবেশনে'র আলোচ্য বিষয়। সৈয়দ নজরুল তখন অধ্যাপনায় না থাকলেও তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যক্ষ সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন তাঁকে ওই বিতর্ক অনুষ্ঠানটিতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়েছিলাম, আর সৈয়দ নজরুল হয়েছিলেন তিউনিসিয়ার প্রতিনিধি। সেই 'জাতিসংঘ অধিবেশনে'র ছ'বছর পর কর্মসূত্রে ময়মনসিংহ শহরে এসে মুসলিম ইনস্টিটিউট, প্রেসক্লাব, মোমেনশাহী সাহিত্য মজলিস এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে নানা আলোচনায় যোগ দিয়ে তাঁর পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ অনুভব করি। নানা উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হতো মূলত সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে, রাজনীতির প্রসঙ্গ তাতে খুব কমই থাকতো। বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতিক সৈয়দ নজরুল ইসলামের কথা জানে, কিন্তু খুব কম লোকই তার সংস্কৃতি-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত। আমরা যারা ময়মনসিংহে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম তাদের কাছেই তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনার স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছিলো।

সাতষট্টি সালের জুনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনে খান আবদুস সবুর ও খাজা শাহাবুদ্দিনের রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্য বাঙালিদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার চেতনাকে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলে। তারই ফলে, একষট্টির পরে, আবার এখানে রবীন্দ্র চর্চার জোয়ার আসে। আগে এখানে পঁচিশ বৈশাখে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হতো বেশ সাড়ম্বরেই, কিন্তু বাইশ শ্রাবণে রবীন্দ্র মৃত্যুদিবস পালনের রেওয়াজ খুব একটা ছিলো না। সাতষট্টি সালেই প্রথম পাকিস্তানি শাসকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করা হয়। শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও।

'মুকুল ফৌজ' সংগঠনটিকে খুব একটা প্রগতিবাদী বলা যায় না, পাকিস্তানি আদর্শের প্রতিই বরং এর পক্ষপাতিত্ব ছিলো। ময়মনসিংহে কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই মুকুল ফৌজের চরিত্র পাল্টে যেতে থাকে। সাতষট্টি সালে এখানে অন্যান্য সংগঠনের মতো

মুকুল ফৌজকেও দেখি রবীন্দ্রচর্চায় ব্রতী হতে। ময়মনসিংহ মুকুল ফৌজের কর্ণধার আমীর আহমদ চৌধুরীকে আমরা একজন দক্ষ ক্রীড়াসংগঠক বলেই জানতাম, সংস্কৃতির অন্য কোনো শাখায় তাঁকে আগে কখনো মনোযোগী হতে দেখিনি। সেবারই প্রথম দেখলাম আমীর আহমদ চৌধুরী সোৎসাহে তার মুকুল ফৌজকে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য মঞ্চায়নে লাগিয়ে দিয়েছেন। অমার্জিত পাকিস্তানবাদীরা 'শ্যামা' মঞ্চায়ন নিয়ে নানা কুৎসা রটনা করেছে, বলেছে 'হিন্দুদের সঙ্গে মিলে এখানে কালীর নাচ নাচানো হচ্ছে।' গুণ্ডা লাগিয়ে ওরা নাট্যানুষ্ঠানটি পন্ড করেও দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমীর আহমদ চৌধুরী ওদের সব কুৎসা উপেক্ষা করে ও চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে খুবই সাফল্যের সঙ্গে 'শ্যামা'র মঞ্চায়ন সম্পন্ন করালেন। ময়মনসিংহে রবীন্দ্রচর্চায় আরেকটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো।

রবীন্দ্র-বিদ্বেষী তথা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির দুশমনরা এ সবের ফলে আরো ক্ষেপে যায় এবং একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে। আটষট্টি সালে 'আমরা সমুদ্রমুখী' আয়োজিত রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তারা সরাসরি হামলা করে বসে। খান সাহেব আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠান হচ্ছিলো। সে-সময়কার একজন প্রতিশ্রুতিশীল ছোটগল্পকার নীলু দাস বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান বাঙালির সংস্কৃতিকে কতোটা সমৃদ্ধি দিয়েছে তারই কথা। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সাংস্কৃতিক সম্পদে আমরা কেন একেবারেই দীন হয়ে যাবো, সে কথাটারই তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কয়েকটি যুবক চিৎকার করে উঠলো, 'চুপ করুন, চুপ করুন।' বক্তার সামনে তর্জনী উচিয়ে বলতে লাগলো, 'থাকবেন পাকিস্তানে আর হিন্দুস্থানের কবির গুণগান করবেন, সেটি হবে না। পাকিস্তানে থাকতে হলে ইকবালের কথা বলতে হবে, নজরুলের কথা বলতে হবে।' তারপরই ওরা একটা অভিনব স্লোগান তুললো—'রবীন্দ্রগোষ্ঠী মুর্দাবাদ, নজরুলগোষ্ঠী জিন্দাবাদ।'

মঞ্চে উঠে ওরা এক টান মেরে রবীন্দ্রনাথের ছবিটি ছিঁড়ে ফেললো। হারমোনিয়াম—তবলা আছাড় দিয়ে ফেলে দিলো। পকেট থেকে ছোরা বের করে আস্ফালন করতে লাগলো। ফুলের বাগানে বুনো শূয়োরের মতো ঢুকে ওরা সুন্দর অনুষ্ঠানটিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেলো।

আমার সুরসিক বন্ধু অধ্যাপক আবদুল কাদির খান পুরো ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন ছিলেন। পরদিন প্রেসক্লাবের আড্ডায় বসে তিনি আগের দিনের রবীন্দ্রস্মৃতিবাসরে ওই বর্বরদের হামলার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। 'রবীন্দ্রগোষ্ঠী মুর্দাবাদ, নজরুলগোষ্ঠী জিন্দাবাদ' স্লোগানটির উল্লেখ করে তিনি বলছিলেন, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'রবীন্দ্রনাথ বড়ো না, নজরুল বড়ো' তা হলে আমি কি বলবো জানেন? বলবো—'রবীন্দ্রনাথও বড়ো না, নজরুলও বড়ো না। বড়ো হচ্ছে লাঠি। লাঠি যার হাতে আছে তার চেয়ে বড়ো কেউ নেই!'

তখনো বোমাবাজির ব্যাপক প্রচলন ঘটেনি। লাঠিবাজি করেই তখন গুণ্ডামি চলতো, মাঝে মাঝে ছোরা বের করে ভয় দেখানোই যথেষ্ট হতো। এ-রকম একদল লাঠিবাজ গুণ্ডাকেই ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকরা 'এনএসএফ' (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নাম দিয়ে সংগঠিত করেছিলো এবং এদের দিয়েই তারা নানা অপকর্ম করাতো। 'নজরুলগোষ্ঠী জিন্দাবাদ' বলে এরাই সেদিন 'রবীন্দ্রগোষ্ঠীকে' শায়েস্তা করতে গিয়েছিলো।

আসলে 'রবীন্দ্রনাথ বড়ো না নজরুল বড়ো' এই মূঢ় প্রশ্নটি তুলে পাকিস্তানবাদীরা দীর্ঘকাল ধরে চূড়ান্ত মূঢ়তার প্রদর্শনী করেছে। গাঁয়ের স্কুলে পড়ার সময়ই রবীন্দ্র-নজরুলের এই দ্বৈরথ দেখেছি। নজরুল আর পাকিস্তানি জোশ তখন এক হয়ে গিয়েছিলো। নজরুলের

নোবেল প্রাইজটি পাওয়ার কথা ছিলো, হিন্দু আর ইংরেজরা মিলে ষড়যন্ত্র করে সেটি নজরুলের বদলে রবীন্দ্রনাথকে পাইয়ে দিয়েছে; নজরুলের পেছনে মেয়ে লাগিয়ে দিয়ে হিন্দুরা তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে দিয়ে হিন্দুয়ানি গান-কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে।—এ ধরনের হাস্যকর স্থূল বক্তব্য তো গাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত পাকিস্তানি জোশওয়ালা মানুষদের মুখে শুনেছিই, শহরের শিক্ষাভিমানীদের নজরুল চর্চাতেও হাস্যকরতার পরিচয় কম পাইনি।

আমাদের জেলা শহরে বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক বলে পরিচিত একজন বক্তা তো নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েই বলতে শুরু করতেন :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।' আর নজরুল বলেছেন, 'বল বীর, চির উন্নত মম শির।' এতেই বোঝা যায় যে, নজরুল হলেন পৌরুষের কবি আর রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত দুর্বল আত্মনিবেদনপ্রবণ একজন কবি।...রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক, কেবল হিন্দুশাস্ত্রের নানা কথা নিয়ে গান-কবিতা লিখেছেন, মুসলমানের কথা কিছুই লিখেননি। নজরুল রবীন্দ্রনাথের মতো সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বলেই হিন্দুর পুরাণ নিয়েও কতো কথা বলেছেন।...রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলা তো একান্তই মিথ্যাচার। বিশ্বকবি বলা যায় শেক্সপীয়রকে। তিনি যে বলেছেন, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ...' এটি হচ্ছে বিশ্বজনীন বাণী, বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে তা সত্য, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য। আর অন্যদিকে, হিন্দুদের উপনিষদে যে-সব কথা আছে সে-সবেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেসব হচ্ছে হিন্দুদের বিশ্বাসের কথা, বিশ্বজনীন বাণী নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হন কী করে?...তা ছাড়া পৃথিবীর সব বড়ো কবিরই একেকটি মাস্টারপিস থাকে। যেমন—ফেরদৌসির শাহনামা, শেক্সপীয়রের হ্যামলেট, গ্যেটের ফাউস্ট। রবীন্দ্রনাথের কি এমন কোনো মাস্টারপিস আছে?...

এই বক্তাকে সমর্থন জানানোর মতো লোকও ছিলো কিছু। সারাদেশ জুড়েই এ-রকম ছিলো। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের তুলনা করে নজরুলকে বড়ো আর রবীন্দ্রনাথকে ছোটো প্রমাণ করার জন্যে কতো ধরনের কুযুক্তিই না ওরা উত্থাপন করতো। এ-রকম করতে গিয়ে নজরুলের প্রকৃত মহত্ত্বকেই ওরা খর্ব করতো, প্রতিনিয়ত তাঁকে খণ্ডিত ও বিকৃত করে তুলতো, নিজেদের অসংস্কৃত মন ও হীনমন্যতারই পরিচয় রাখতো।

ষাটের দশকেই ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও কাজির সিমলায় কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সুস্থ নজরুল চর্চার সাধু উদ্দেশ্য এর পেছনে কতোটুকু ক্রিয়াশীল ছিলো জানি না। তবে আমরা জানি : সে-সময় সারাদেশে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা দিয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাহিত্যকর্ম থেকে প্রেরণা নিয়ে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি-চেতনার ধারাটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। পাকিস্তানবাদীরা নজরুলকে ব্যবহার করে বাঙালির সেই নবজাগ্রত চেতনাকেই ভোতা করে দিতে চেয়েছিলো, প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারা-প্রবাহটিকে প্রতিরোধ করারই একটি মরিয়া প্রয়াস গ্রহণ করেছিলো। ঢাকা থেকে শিল্পীদের এনে ত্রিশালে নজরুলসঙ্গীত পরিবেশন করা হতো। সব রকম নজরুল সঙ্গীত নয়, কেবল যেগুলো দিয়ে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রচার করা সম্ভব সেগুলোই। শুনেছি, ত্রিশালে প্রথমবারের নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানেই একজন সরকারি বক্তা বলেছিলেন :

নজরুল অনেক হামদ-নাত রচনা করেছেন, অনেক ইসলামী গান ও কবিতা লিখেছেন। এ-সবই আমাদের পাকিস্তানের আদর্শকে মজবুত করে তুলেছে। কিন্তু নজরুল কিছু কিছু

খোদাদ্রোহী কথাও বলেছেন। তিনি 'খোদার আসন আরশ' ছেদন করতে চেয়েছেন, 'ভগবান-বুকে পদচিহ্ন এঁকে' দিতে চেয়েছেন। এ-সবই হচ্ছে বড়ো ধরনের গুনাহ্। এই গুনাহ্র জন্যেই আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তিনি আর এখন কথাই বলতে পারেন না, তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে।...আসুন, আমরা সকলে তার জন্যে দোয়া করি, আল্লাহ্ যেন তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

তবু, এ-সবের পরও, বলতেই হবে যে, নজরুলের বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত ত্রিশাল ও কাজির সিমলায় যারা নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সাংবাৎসরিক ব্যবস্থাটির প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা একটি মহৎ কাজ করে গিয়েছেন। ওই গ্রামাঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষরাও আজ নজরুলের কথা জানে। তারা জানে : নজরুলের মতো একজন বড়ো কবি তাদেরই এলাকায় তাঁর ছেলেবেলায় কিছুটা সময় কাটিয়ে গেছেন। এর জন্যে তাদের গর্বের অন্ত নেই। নজরুলের নামে তারা স্কুল করেছে, কলেজ করেছে, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। এলাকার তরুণরা নজরুলচর্চার প্রেরণা পাচ্ছে।

তাছাড়া, সেকালের পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষীয় মহলের যে-রকম মতলবই থাকুক না কেন, নজরুলকে তারা তাদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের ঘেরাটোপে আটকে রাখতে পারেনি।

পারেনি যে, ষাটের দশক শেষ হওয়ার আগেই তার প্রমাণ মিললো। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধাক্কায় পাকিস্তানি অনেক বদমতলবের মতো নজরুলের 'পাকিস্তানিকরণে'র মতলবও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। ঊনসত্তরের ত্রিশালে নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিলো তাতে অধ্যাপক আলী নওয়াজ, শামসুজ্জামান খান, সেকান্দর হায়াৎ, রিয়াজুল ইসলামসহ ময়মনসিংহ শহর থেকে অনেকেই আমরা যোগ দিয়েছিলাম। এর আগের বছরগুলোতে এখানে নজরুল সম্পর্কে যে-ধরনের কথাবার্তা বলা হতো সে-বারের কথাবার্তাগুলো হলো তার থেকে অন্য রকম। নজরুলের রচনায় হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সম্মিলন, ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি নজরুলের ঘৃণা, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ, কৃষক-শ্রমিকের প্রতি তাঁর সংগ্রামী আহ্বান—এ-সব কথাই সেবারকার আলোচনায় উঠে এসেছিলো। গ্রামের শ্রোতারা এসব শুনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। আর তারই ফলে স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিক্রিয়াশীলদের চিড়বিড়ানি শুরু হয়ে গিয়েছিলো। মঞ্চের পেছনে বসে থাকা জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা তো পাশের একজনের সঙ্গে অনুচ্চকণ্ঠে, অথচ তীব্র রোষে, বলে যাচ্ছিলেন, 'নজরুলকে নিয়ে পলিটিকস্ করা হচ্ছে।...নজরুলকে নিয়ে এতো মাতামাতি করার কী আছে?...পশ্চিমবঙ্গে কি এভাবে নজরুলজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়?....আমাদের সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। কথা বলতে গিয়ে আমাদের ঈমান-আকিদার কথা, আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শের কথাও আমরা মনে রাখি না...।'

সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সংগ্রামে কতিপয় অখ্যাত সৈনিক

আটচল্লিশ সাল থেকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এদেশে পাকিস্তানের ভাবাদর্শ-বিরোধী সংগ্রাম চলে আসছিলো। সে সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের একেবারে অজানা নয়। বেশ কিছু বই-পুস্তকে সে ইতিহাস লেখা হয়েছে। তবে বই পুস্তক পড়ে যা জানা যায় তা একেবারেই মোটা দাগের কিছু তথ্য। সে-সব তথ্য মূলত রাজধানী-কেন্দ্রিক নানা কর্মকাণ্ডের,

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ভূখণ্ডটির অন্য অন্য জনপদের খবর বই-পুস্তকে খুব কমই পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই, দেশের বিভিন্ন স্থানে যতো বড়ো বড়ো ঘটনাই ঘটুক না কেন, সে সবের চেয়ে রাজধানী-জাত অনেক ছোট ঘটনারও প্রভাব অনেক বেশি বড়ো হয়ে দেখা দেয়। রাজধানীর কেন্দ্র থেকে সে-সব ঘটনার প্রভাব দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় ঘটনার রূপ নেয়। রাজধানীর বাইরে প্রত্যন্ত এলাকার ঘোলা জলের ডোবায় খুব বড়ো ঢিল ছুঁড়ে মারলেও তার ঢেউ তো ডোবার ভেতর পাক খেতে খেতেই মিলিয়ে যায়, জাতীয় তরঙ্গের রূপ নিতে পারে না। তাই, রাজধানী-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের বিবরণই যে লিখিত ইতিহাসের পাতায় সিংহভাগ জুড়ে থাকবে তা হয়তো খুব অসঙ্গতও নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

তবু, মানতেই হবে, ঢাকা-থেকে-সূচিত সংস্কৃতি-আন্দোলন ও ভাবাদর্শের সংগ্রাম মোটেই সফল হতো না, যদি সেই আন্দোলন-সংগ্রামে দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের সংযুক্তি না ঘটতো। আর সে সংযুক্তি ঘটতেই পারতো না, যদি সেই আন্দোলন সংগ্রামের বীজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগে থেকেই পোঁতা না থাকতো। কিন্তু, দুঃখ এই, সেই বীজ পোঁতার ইতিহাসকে আমরা যথাযথ মূল্য দিইনি, মফস্বল শহর বা-গ্রাম-গঞ্জের মানুষের চৈতন্যলোকের খোঁজ-খবর নেয়ার খুব একটা গরজ বোধ করিনি। একারণেই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অখণ্ড ইতিহাসটি অজানাই থেকে গেছে।

আমি এখানে সেই অজানা ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হচ্ছি না, সে-যোগ্যতাও আমার নেই। আমি কেবল স্মৃতির জানালা খুলে ষাটের দশকের ময়মনসিংহ শহরটার দিকে একটু উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছি।

চৌষট্টি সনেও ময়মনসিংহ শহরে পাকিস্তানবাদিদের তৈরি রবীন্দ্র-বিরোধিতার আবহ প্রত্যক্ষ করি। তবে সে-বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করার মতো শক্তিও এখানে অনুপস্থিত ছিলো না। এ-শহরে রবীন্দ্রচর্চার একটা অন্তঃশীল প্রবাহ দীর্ঘকাল ধরেই বিদ্যমান ছিলো। উনিশ শো ছাব্বিশ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহে এসেছিলেন। অনেকগুলো সভায় তিনি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সে স্মৃতি রোমন্থন করার মতো অনেক প্রবীণ ব্যক্তি সে-সময়েও, ষাটের দশকেও, জীবিত ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত থেকে রবীন্দ্র-চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন অনেক তরুণ সংস্কৃতি-কর্মিও। যেমন আলোকময় নাহা, নূরুল আনোয়ার, আনোয়ারুল হক, সুমিতা হোম রায়, নবনীতা চক্রবর্তী এবং এ-রকম আরো অনেকে। তাদের মধ্যে নুরুল আনোয়ারের রবীন্দ্র-চর্চা ছিলো সবচেয়ে গভীর ও দুঃসাহসী। এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমেদের পুত্র নুরুল আনোয়ার তখন ছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র। কৃষিবিদ্যায় তাঁর অনুরাগ কতোখানি ছিলো, আমরা বলতে পারবো না। তবে তাঁর ক্রিকেট-অনুরাগ ও রবীন্দ্র-অনুরাগ ছিলো স্বতঃপ্রকাশিত ও সর্বজনবিদিত। তরুণদের ক্রিকেট খেলায় উৎসাহিত করে তুলতে তাঁর উৎসাহ ছিলো প্রচণ্ড। এদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব'। সে-ক্লাবের সদস্যদের নিয়েই তিনি তৈরি করেছিলেন আরেকটি সংগঠন 'সন্ধান গোষ্ঠী'। বাড়ির ছাদের ওপর কিংবা ব্রহ্মপুত্রের ধারে সার্কিট হাউস সংলগ্ন গীর্জার আমতলায় 'সন্ধান গোষ্ঠী' প্রতিবছর রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতো। সন্ধান গোষ্ঠীর কর্ণধার নুরুল আনোয়ারের রবীন্দ্র-চর্চাকে দুঃসাহসী বলছি এ কারণে যে, পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও ভারত থেকে 'চোরাচালান' করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পুরনো গ্রামোফোন রেকর্ড আনাতেন তিনি। আমরা তো জানি চোরাচালানি যারা করে তারা হয়

মূলত তেল নুন লাকড়ির কারবারি, বৈষয়িক লাভ-অলাভটাই হয় তাদের মুখ্য বিবেচনা। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের মতো স্থূল বৈষয়িকতার স্পর্শশূন্য নিতান্ত 'আধ্যাত্মিক' বিষয়ের চোরাচালানি নিয়ে কেউ মেতে থাকতে পারে, নুরুল আনোয়ার ছাড়া এ-রকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের একটি গানই যে কতো ভিন্ন ধারার গায়কী ঢঙে একাধিক শিল্পী গেয়েছেন, বিভিন্ন রেকর্ড থেকে তার তুলনামূলক বিচারে নুরুল আনোয়ারের ছিলো সীমাহীন আগ্রহ। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নুরুল আনোয়ারের মতো এমন শুদ্ধতাবাদী আমি খুবই কম দেখেছি। ক্রিকেটের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে যেমন ইংল্যান্ডের নেভিল কার্ডাস ও ভারতের শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে পত্রালাপ করতেন, তেমনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিভিন্ন খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর পত্রযোগাযোগ ছিলো রবীন্দ্র-স্নেহধন্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশারদ শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি এদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ওয়াহিদুল হকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান ভাণ্ডারী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের স্নেহভাজন হন তিনি। শৈলজারঞ্জন যে বায়ান্তর সালের পর একাধিকবার ময়মনসিংহে এসেছেন এবং এখানকার ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখিয়েছেন তাতে প্রধান প্রবর্তনা ছিলো নুরুল আনোয়ারেরই।

সুমিতা হোম রায়দের পরিবারটি ছিলো রবীন্দ্র-রসধারায় স্নাত, এবং বলতে গেলে, রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলেরই অন্তর্গত। সুমিতার এক জ্যাঠামশাই নীহাররঞ্জন রায় তো বিশ্বখ্যাত মনীষী। তিনি শুধু '*বাঙালির ইতিহাস*'-এরই অমর লেখক নন, তাঁর '*রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*' রবীন্দ্র সমালোচনা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। সুমিতারই আরেক জ্যাঠা মশাই অমল হোম দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। তাঁর '*পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ*' রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় জ্ঞাপক একটি চমৎকার বই।

রবীন্দ্র চর্চার এ-রকম উত্তরাধিকার নিয়েই সুমিতা ও তাঁর অন্যান্য ভাই-বোনেরা বেড়ে ওঠেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে এঁদের সবারই কিছু না কিছু দখল আছে। এদের মধ্যে সুমিতা সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ অধিকার অর্জন করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাঠ নেন তিনি ময়মনসিংহের প্রখ্যাত সঙ্গীতগুরু মিথুনদে'র কাছে। একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে আকাশ বাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে অতিথি শিল্পী রূপে সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশেষ কৃতির পরিচয় রাখেন।

ষাটের দশকে সুমিতাদের বাসায় প্রতি বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হতো সমস্ত রকম বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে। সেখানে অনেকের সঙ্গে আলোকময় নাহাও এসে যোগ দিতেন। আলোকময় নাহা ছিলেন স্বাভাবিক সঙ্গীত-প্রতিভার অধিকারী একজন উঁচু মানের শিল্পী। এক সময়ে তো ময়মনসিংহে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর আলোকময় নাহা যেন একার্থবোধক হয়ে উঠেছিলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বলতেই আলোকময় নাহার চেহারাটি সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠতো। পরে যখন আলোকময় নাহা আর সুমিতা হোমরায় পরিণত সূত্রে আবদ্ধ হলেন, তখন ময়মনসিংহের সকলের নিকটই এই দম্পতিকে রাজযোটক বলে মনে হয়েছিলো। এই শিল্পী দম্পতির কাছে সকলের প্রত্যাশা ছিলো অনেক। কিন্তু হায়, একানব্বইয়ের ডিসেম্বরের আট তারিখে আলোকময় নাহার অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু সকলকে চরমভাবে আশাহত ও বেদনাবিধুর করে তুললো। সুমিতা হোম রায় সুমিতা নাহা হয়ে সেই বেদনার স্মৃতিকেই ধরে রাখলেন।

সঙ্গীত-সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল চর্চার পাশাপাশি মননচর্চাতেও ষাটের দশকে নতুন গতিবেগের সঞ্চার ঘটে। মননচর্চার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান বই। বইয়ের জন্যে গণপাঠাগারের

সহায়তা তো অপরিহার্যই। তবু ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহের যে একটি ভিন্ন মাত্রা আছে তা অস্বীকার করা যাবে না। ষাটের দশকের ময়মনসিংহে পুস্তকসংগ্রহের মধ্যে মননের সেই মাত্রাটিরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন শহরের সানকিপাড়া এলাকার অধিবাসী আনোয়ারুল হক। নূরুল আনোয়ার যেমন দুঃসাধ্য সাধনায় ভারত থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড সংগ্রহ করে আনতেন, নানা বিষয়ের গ্রন্থ সংগ্রহে আনোয়ারুল হকেরও ছিলো তেমনি দুঃসাধ্য সাধনা। গ্রন্থনির্বাচন ও সংগ্রহেই শুধু তিনি রুচি, যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেননি, গ্রন্থ সংরক্ষণে তাঁর নিপুণ প্রযত্নও যে কারো মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। তাঁর এই বিপুল ও অমূল্য সংগ্রহকে শুধু যখের ধনের মতো নিজের জন্যেই আগলে রাখেন নি, ময়মনসিংহের যে কোনো অনুসন্ধিৎসু মানুষের জন্যেই তাঁর গ্রন্থাগারের দরজা তিনি খুলে দিতেন। এখানকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ও পাকিস্তান-বিরোধী ভাবাদর্শের সংগ্রামে আনোয়ারুল হকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটির ভূমিকাকে খাটো করে দেখা মোটেই ঠিক হবে না।

প্রখ্যাত আইনব্যাখ্যাতা ও বিদগ্ধ রসজ্ঞ গাজী শামছুর রহমান ষাটের দশকের শেষের দিকে ময়মনসিংহে এসেছিলেন এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে। এ-রকম পদাধিকারী ব্যক্তিরা সাধারণত 'পাবলিকে'র ছোঁয়া এড়িয়ে চলেন। কিন্তু গাজী শামছুর রহমান হলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ও ভিন্নধর্মী একজন মানুষ। বয়স ও পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তিনি আমাদের আড্ডায় ভিড়ে গেলেন। অথচ আমাদের আড্ডাগুলো মোটেই 'নির্দোষ' ছিলো না। তখন আমরা নিতান্ত অলস ও লক্ষহীন বিশ্রম্ভালাপের জন্যে মিলিত হতাম না। অনেক সিরিয়াস বিষয়, এবং তখনকার রাষ্ট্রশক্তির বিবেচনায় একান্ত নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক বিষয়ই, আমাদের আড্ডায় উঠে আসতো।

এ-সময় আমরা একটি অনামী পাঠচক্র বা আলোচনাচক্র গড়ে তুলেছিলাম। সেই চক্রের চক্রধর হয়ে পড়েছিলেন গোলাম সামদানী কোরায়শী। বিস্ময়কর মানুষ ছিলেন এই সামদানী।

সামদানী সাহেব আটষট্টির শেষ দিকে আমারই সহকর্মি রূপে নাসিরাবাদ কলেজের বাংলা বিভাগে যোগ দেন। এর আগে কয়েক বছর ধরে বাংলা একাডেমীতে তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার সঙ্গে '*পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*' সংকলনের কাজ করেন। ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পর (তখনো 'মহাপরিচালক' পদটির সৃষ্টি হয়নি) সামদানী সাহেব একাডেমীতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। তাই, বাংলা একাডেমী তথা ঢাকা ছেড়ে তিনি ময়মনসিংহে চলে এলেন।

গোলাম সামদানী কোরায়শী ছিলেন 'মমতাজুল মোহাদ্দেসিন' উপাধিধারী জবরদস্ত মওলানা। ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার পড়াশোনা শেষ করে তিনি সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন, এবং শেষ পর্যায়ে বাংলায় এমএ পাস করেন। মূল আরবি, পার্সি ও উর্দু থেকে অনেক বইয়ের তিনি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অক্ষয় কীর্তি ইবনে খলদুনের 'আল মুকাদ্দিমা'।

আমি যখন সামদানী সাহেবকে আমার সহকর্মি রূপে পেলাম তখন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম যে, মাদ্রাসায় পড়া এই মানুষটি গোঁড়া মোল্লা তো ননই, প্রচলিত অর্থে ধর্মবিশ্বাসীও নন। নাস্তিক না হলেও প্রচণ্ড সংশয়বাদী। ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত দৃঢ়, অথচ হৃদয়টি তাঁর একান্তই কোমল। ধর্মীয় বিষয়ে সীমাহীন পাণ্ডিত্য, অথচ ধর্মের কঠোর সমালোচক।

আমার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রথম দিকে প্রায়ই তাঁর ঠোকাঠুকি লেগে যেতো। ধর্ম সম্পর্কে নির্মোহ হয়েও মার্কসবাদকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

এরপর দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গলাভ করেছি। বলা উচিত : প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে উঠেছিলাম আমরা দু'জন। নানা বিষয়ে মতান্তর হয়েছে, কিন্তু মনান্তর হয়নি একদিনের জন্যেও। এক সময় তো দু'জনেই লক্ষ করলাম যে আমাদের মধ্যে মতান্তরও প্রায় অবশিষ্ট নেই। আমি যে তাঁর কাছে কতো কিছু শিখেছি তার সঠিক বিবরণ দেয়ার সাধ্য আমার নেই। বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস ও দর্শনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করে করে সব সময় আমি তাঁকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছি। তিনি আমার সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন পরম আন্তরিকতায়। আমাদের যৌথ অনুশীলনের এক পর্যায়ে দেখলাম : তিনি ডায়ালেকটিক বস্তুবাদকে তাঁর জীবন দর্শনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে মানবিক জ্ঞানের কোনো উত্তরাধিকারকেই বর্জন করেননি। বিভিন্ন সভায় বা ঘরোয়া আলোচনায় তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার গুরু হচ্ছেন সাতজন। প্রথম গুরু সক্রেটিস, দ্বিতীয় গুরু শ্রীকৃষ্ণ, তৃতীয় গুরু গৌতম বুদ্ধ, চতুর্থ গুরু যীশু খ্রীষ্ট, পঞ্চম গুরু হযরত মুহম্মদ (দঃ), ষষ্ঠ গুরু কার্ল মার্কস এবং সপ্তম গুরু একান্তই আমার নিজের আমার পিতা।'

'অপরীক্ষিত জীবন তো যাপনের উপযুক্তই নয়' (A life un-examined is not worth living) সক্রেটিসের এই বক্তব্যকে তিনি সারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাস থেকেই সারা জীবন চালিয়েছেন আত্মসমীক্ষা। তাঁর বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে কখনো কোনো ফাঁক দেখা যায়নি। অন্যায় দেখলে তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তেন। কোনো অন্যায়ের প্রতিকার না করতে পারলে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন, সেই কষ্টের অভিব্যক্তি তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠতো, রাগে কাঁপতে থাকতেন। মহানবি বলেছেন—অন্যায়কে প্রতিরোধ করবে, যদি না পারো তবে প্রতিবাদ করবে, তাও যদি না পারো তবে অন্তত মনে মনে ঘৃণা করবে। শেষেরটুকু হচ্ছে দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ, এটুকু না করলে ঈমানের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

সামদানী সাহেব যথার্থ ঈমানদার ছিলেন বলেই দুর্বলতম ঈমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না। পাকিস্তানকে তিনি একটি বে-ঈমানি রাষ্ট্র বলেই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই, পাকিস্তানি ভাবাদর্শ-বিরোধী সংস্কৃতি-সংগ্রামের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যুক্ত না হয়ে তিনি পারেননি। ময়মনসিংহে সে-সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিলো খুবই উজ্জ্বল।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথা

পঁয়ষট্টির দোসরা জানুয়ারিতে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আইউব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ হেরে যাওয়ায়, জনগণ আইউব-উদ্ভাবিত মৌলিক গণতন্ত্রের স্বরূপটি পুরোপুরি চিনে নিতে পারে। সবাই বুঝে নেয় : তথাকথিত এই মৌলিক গণতন্ত্রে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই, এ ব্যবস্থায় কোনো দিনই প্রকৃত গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। তাই, এরপর যখন মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটেই পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের অনুষ্ঠান হয় তখন জনসাধারণ তাতে কোনোই আগ্রহ দেখায় না। পঁয়ষট্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অভিজ্ঞতাই তাদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সঙ্গে ওই ভূয়া মৌলিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেয়।

আবার পঁয়ষট্টির সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কোনো মতেই পূর্ব পাকিস্তানের

নিরাপত্তা দিতে পারবে না। তাই এ অঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই-ই চাই। বাঙালি জনগণের এই চাওয়াকেই মূর্তরূপে উপস্থাপন করে শেখ মুজিবের ছয় দফা।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই ছয় দফাকে আঁতুড়েই হত্যা করতে চাইলো, এর বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দিলো। কিন্তু সবই যখন ব্যর্থ হলো, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই ছয় দফা যখন যৌবনের অমিত তেজ নিয়ে স্পর্ধিত হয়ে উঠলো, তখন আইনের অস্ত্র দিয়ে একে ধ্বংস করা যায় কিনা শাসকরা তা-ই পরখ করে দেখতে চাইলো। তারা শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে সামরিক বেসামরিক কিছু কর্মচারি ও অন্যান্য পেশার পঁয়ত্রিশ জন বাঙালির বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা দায়ের করলো। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত এই মামলায় অভিযোগ আনা হলো : এই আসামীরা ভারতের আগরতলায় বসে পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত এঁটেছে।

পাকিস্তানি শাসকরা বোধহয় ভেবেছিলো যে ভারতের সঙ্গে মিলে শেখ মুজিবরা পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র করেছিলো—এমন কথা শুনেই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা মুসলমানি জোশে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে কোমর বাঁধবে, শেখ মুজিবদের দুশমন বলে ঠাওরাবে, আর তারই পরিণামে ছয় দফার দফারফা হয়ে যাবে। অথচ, কী আশ্চর্য, ঘটলো তার উল্টোটা। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকদের দায়ের করা মামলাকে মিথ্যা মামলা বলে জেনেই ওদের সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মামলাই আবার এ অঞ্চলের মানুষের সুপ্ত স্বাতন্ত্র্য-চেতনাকে জাগিয়ে তুললো। সে সময়ে সংবাদপত্রের পাতায় আমরা রোজ অধীর আগ্রহে মামলার ধারাবিবরণী পড়েছি। পড়তে পড়তে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়েছি। আবার উৎসাহিত ও স্বপ্নাতুরও হয়েছি। ক্ষুব্ধ হয়েছি পাক শাসকদের মিথ্যাচারে। ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়েছি মামলার আসামীদের প্রতি ওদের বর্বর নির্যাতনের কথা শুনে। উৎসাহিত হয়েছি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দিতে নির্ভীকতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে। আর শাসকদের মিথ্যা অভিযোগটিই যদি সত্য হয়ে উঠতো তাহলে কেমন হতো, সে কথা কল্পনা করে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছি। পত্রিকার পাতায় অভিযোগের বিবরণ পড়ে অনেকের চোখেই স্বাধীনতার স্বপ্ন চকচক করে উঠতে দেখেছি।

অভিযোগকারী সরকার ও তার পক্ষের রাজসাক্ষীরা বলেছে : চৌষট্টি সাল থেকেই করাচিতে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রটি শুরু হয়েছিলো, এরপর পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টিতে ঢাকা ও চট্টগ্রামে কয়েকটি সভায় সে ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে তোলা হয়, সাতষট্টির বারো জুলাই আগরতলায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে তার চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়ে যায়। ওই ষড়যন্ত্রকারীরা নাকি তাদের পরিকল্পনা সফল করার জন্যে বেশ বড়ো ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সে-কর্মসূচিতে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক কর্মচারিদের দলভুক্ত করার কথা যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো ভারত থেকে অস্ত্র আমদানির কথাও। দেশে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে উপযুক্ত সময়ে ক্ষমতা দখল তথা স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতিও তারা গ্রহণ করে রেখেছিলো, আর সে জন্যে ভারত ছাড়া অন্য রাষ্ট্র থেকেও নাকি বৈষয়িক সাহায্য পেয়েছিলো।

ঢাকার খবরের কাগজগুলো—বিশেষ করে '*ইত্তেফাক*' ও '*সংবাদ*'—ষড়যন্ত্র মামলার শুনানির বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরতে লাগলো। সব আড্ডায় ও সমাবেশে চললো কেবল এই মামলারই আলোচনা।

কলেজে আমার সহকর্মী কিংবা আশপাশের পরিচিতজনদের মধ্যে যাদের কট্টর পাকিস্তানবাদী বলে জানতাম, ওই মামলা চলার সময়ে তাদেরও পাকিস্তানপ্রীতি শিথিল হয়ে পড়তে দেখলাম। আর তরুণ প্রজন্ম যে পাকিস্তানবাদকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে তা আর গোপন রইলো না।

পাকিস্তানি শাসকরাই কি আগরতলা ষড়যন্ত্রের কল্পিত কাহিনী প্রচার করে বাঙালি জনগণের মনে স্বাধীনতার সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে দিলো না? বাঙালিরা তখনো যা করেনি তা করার জন্যেই কি পাকিস্তান তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুললো না? একাত্তরে বাঙালিদের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পরোক্ষ অনুঘটকের কাজটি কি উনসত্তরেই পাকিস্তানি শাসকরা করে রাখলো না?

উনসত্তরের জানুয়ারির গোড়াতেই ছাত্ররা ঘোষণা করলো এগারো দফা। এই এগারো দফা শুধু শেখ মুজিবের ছয় দফাকে সম্পূর্ণতা দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধিকার-চেতনাকেই পুষ্ট করে তুললো না, পাকিস্তানি শাসনমুক্ত ভবিষ্যত বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রূপরেখাটিও জনগণের সামনে তুলে ধরলো। যদিও বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট দাবি তখনো কেউই উচ্চারণ করেনি, তবু বাঙালি জাতির স্বাধীনতার অন্তঃসারকে ধারণ করেই সংঘটিত হয়েছিলো উনসত্তর সালের এগারো দফা-ভিত্তিক গণঅভ্যুত্থান। এই গণঅভ্যুত্থানই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নামে-জারি-করা সকল পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন করে দিলো, বাঙালি-স্বার্থবিরোধী কতিপয় বাঙালি মন্ত্রী ও নেতাসহ আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দিলো, শেখ মুজিবসহ মামলার আসামীদের মুক্ত করে নিয়ে এলো। উনসত্তরের গণআন্দোলন পর্বেই, জানুয়ারির বিশ তারিখে, শহীদ হলেন ছাত্রনেতা আসাদ। চব্বিশ তারিখে ইস্কুল ছাত্র মতিয়ুর ও শ্রমিক রুস্তম। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দি সার্জেন্ট জহুরুল হক ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে নিহত হলেন ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখে, আর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর শামসুজ্জোহাকে।

ময়মনসিংহ শহরে আন্দোলনের উত্তাল রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলাম চব্বিশে জানুয়ারি। রাজপথের মিছিলে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলো আমারই একান্ত প্রিয় ছাত্র আলমগীর মনসুরকে, যার ডাক নাম ছিলো মিন্টু। মিন্টু হত্যার পরে একশো চুয়াল্লিশ ধারার নিষেধ বিধি উপেক্ষা করে রাজপথে ছাত্রজনতার যে রকম উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হলো, তেমনটি ময়মনসিংহ শহরে এর আগে কেউ দেখেনি। পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে ছাত্ররা জামার বোতাম খুলে বুক পেতে দিয়ে বললো, 'গুলি ছুঁড়ো, আমাদের বুকেও গুলি ছুঁড়ো।'

এ-রকম অকুতোভয় তারুণ্যের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের হাত আর সেদিন বন্দুকের ট্রিগার স্পর্শ করতে পারেনি। শুনেছি, পুলিশও নাকি সেদিনকার অভিনব পরিস্থিতিতে এক ইতিবাচক আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিলো।

কর্তৃপক্ষ একশো চুয়াল্লিশ ধারা তুলে নিতে বাধ্য হলো। মিন্টুর মরদেহ নিয়ে যে বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়েছিলো, প্রথাসম্মতভাবেই তা ছিলো মৌন—কোনো স্লোগান সেদিন রাজপথকে প্রকম্পিত করে তোলেনি। কিন্তু মৌনের শক্তি স্লোগানের মুখরতাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। 'মৌনমুখর' কথাটির তাৎপর্য বোধহয় আমি প্রথম স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম আমার স্নেহভাজন ছাত্র মিন্টুর শোক মিছিল দেখেই।

আমার ভাবাবেগ সেদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। অজাতশত্রু কিশোর ছাত্রটি হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছিলো, তার সতীর্থরা তার মরদেহ স্পর্শ করে দেশমাতৃকার দুর্দশামোচনের শপথ গ্রহণ করলো, আর আমি তার শিক্ষক হয়ে কী করলাম? শ্রেণীকক্ষে কিংবা বক্তৃতামঞ্চে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলি, কিন্তু আজ সে-সব আমার নিজের কাছেই একান্ত অন্তঃসারশূন্য গলাবাজি বলে মনে হলো, আত্মধিক্কারে জর্জরিত হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইলো না।

প্রিন্সিপালের তলব পেয়ে সন্ধ্যায় কলেজে গিয়ে আরেক ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। কলেজের কেরানিরা কাগজপত্র ঘেঁটে কিছুতেই এমন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারছেন না যে, আলমগীর মনসুর মিন্টু নামক নিহত ছাত্রটি নাসিরাবাদ কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আগেই অন্যত্র চলে গিয়েছিলো। অথচ, মরার সময় মিন্টু যে এ-কলেজের ছাত্র ছিলো না, এ-কথা প্রমাণ করতে না পারলে এ কলেজের ওপর সরকারি গজব নেমে আসবে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ না-কি এমন কথা বলেই বারবার প্রিন্সিপালকে টেলিফোনে ধমকাচ্ছেন। প্রিন্সিপালসহ আমার সকল সহকর্মী মুখ ব্যাজার করে বসে আছেন—নিহত ছাত্রের শোকে নয়, কলেজের ওপর গজব পড়ার ও নিজেদের জীবিকাচ্যুতির আশঙ্কায়। আমরা সবাই জানতাম যে, তখনকার গণবিরোধী শাসকদের হাতে সে-রকম আশঙ্কা অচিরেই বাস্তব হয়ে ওঠা মোটেই অসম্ভব নয়। তবু হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে কিছু বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেলো। ভবিষ্যতে যা হবার হবে, এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদেরই ছাত্র মিন্টুর জন্যে অন্তত আনুষ্ঠানিক শোক প্রকাশ করা। তার হত্যার প্রতিবাদ বা নিন্দা করার সাহস আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু নিহত ছাত্রটির জন্যে শোক প্রকাশও না করে যদি 'সে আমাদের ছাত্র ছিলো না' সে-কথা প্রমাণের জন্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তবে তা মোটেই শিক্ষকসুলভ আচরণ হবে না। এই ক'টি কথা বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বর বোধহয় অস্বাভাবিক ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। সকলেই তাতে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব মুখ কালো করে মোনাজাতের জন্যে দু'হাত তুলে বললেন, 'আসুন, আমরা মিন্টুর রুহের মাগফেরাত কামনা করি।'

এর দু'তিন দিন পরই প্রিন্সিপাল সাহেব আবার শিক্ষকদের মিটিং ডাকলেন। বললেন, 'ছাত্ররা ক্লাসে আসছে না। শুধু আমাদের কলেজে নয়, সব স্কুল-কলেজেই। তবু, আমাদের কলেজটির ওপরই প্রশাসনের বিষ নজর পড়েছে। আমাদের কলেজের ছাত্ররাই নাকি বেশি উচ্ছৃংখল, ওরাই নাকি শহরের সব স্কুল-কলেজের ছাত্রদের উস্কানি দেয়।...প্রশাসনের নির্দেশ : আমাদের সকলকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রদের ও তাদের অভিভাবকদের বোঝাতে হবে, ছাত্রদের ক্লাসে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে, তা না হলে....।'

আমি বললাম, 'বর্তমান আন্দোলনটি হচ্ছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতেই ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করছে। শিক্ষক হিসেবে কোনো রূপ রাজনীতির সঙ্গেই আমাদের সংশ্রব নেই। এখন যদি আমরা ছাত্রদের ক্লাসে নিয়ে আসার জন্যে তাদের বা অভিভাবকদের বোঝাতে যাই, তবে আমরাও তো এক পক্ষের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বিতর্কিত হয়ে পড়বো। এ রকমটি আমরা হতে যাবো কেন? আমরা নিজেরা তো আর ক্লাস বর্জন করিনি, ছাত্ররা ক্লাসে উপস্থিত হলে আমরা তাদের পড়াবোই, তা না করে...।'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রিন্সিপাল সাহেব চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনি সাবধান হয়ে যান যতীন বাবু। আপনার মতো শিক্ষকদের জন্যেই বিপদ-আপদ এসে পড়ে।

তলে তলে রাজনীতি করেন, আর মুখে বলেন যে, রাজনীতির সঙ্গে কোনো সংশ্রব নেই। আপনার বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট আছে, আপনি...।'

সহকর্মী বন্ধু সেকান্দর হায়াত আমার পক্ষে দু'এক কথা বলতে যাচ্ছিলেন। তিনিও প্রিন্সিপাল সাহেবের ধমক খেয়ে বসে পড়লেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে আন্দোলন আরো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলো। সব স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ। এ সময়েই একদিন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনালেন। বললেন, 'সেদিন আমি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত ছিলাম। সে-অবস্থায় আপনাকে কিছু অবাঞ্ছিত ও কটু কথা বলে ফেলেছি বলে আমি খুবই দুঃখিত।'

এরপর তিনি নেপথ্যের কিছু বিষয় বিবৃত করলেন।

আড়াই বছর আগে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলায় আমাকে রাষ্ট্রবিরোধী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করেছিলেন যে জেলা কর্মকর্তাটি, তিনিই প্রিন্সিপাল রিয়াজউদ্দিন আহমদ সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে অনেকদিন ধরে অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন। মিস্টু নিহত হওয়ার পর ময়মনসিংহের ছাত্ররা অনেক বেশি জঙ্গি হয়ে ওঠায় আমার বিরুদ্ধে ওই কর্মকর্তাটির আক্রোশ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর বিশ্বাস, আমিই পেছন থেকে নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্রদের নষ্ট করছি, তা না হলে ছাত্ররা এতো বেপরোয়া হয়ে উঠতো না।

রিয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'সেদিন সকালেও ওই কর্মকর্তাটি টেলিফোনে আমাকে আপনার সম্পর্কে এ-সব কথাই বলেছিলেন। আপনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছি না এ বলে আমাকে দোষারোপ করছিলেন।...বলতে গেলে আমাকে হুঁশিয়ারই করে দিচ্ছিলেন।...এই সব নানা কারণে আমার টেনশন বেড়ে গিয়েছিলো, তাই সেদিন আপনাকে...।'

প্রিন্সিপাল সাহেবের মুখে আমার সম্পর্কে 'কানে খাটো' জেলা কর্মকর্তাটির ধারণার কথা শুনে আমি যেমন অবাক হয়েছিলাম, তেমনি কৌতুকও বোধ করেছিলাম। আমার এতো ক্ষমতা। এতো বড়ো একটা ছাত্র আন্দোলনের পরিচালক হয়ে গেলাম আমি—আমার এমন অমিত শক্তির পরিচয় ওই 'কানে খাটো' লোকটি ছাড়া অন্য কেউ দূরে থাক আমি নিজেও জানতে পেলাম না!

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরও বছর দেড়েক ওই ভদ্রলোক ময়মনসিংহেই কর্মরত ছিলেন। তখনো নানা আলোচনা সভায় তাকে দেখা গেছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সে-সময়ে তার কথাবার্তার ধরন-ধারণ সম্পূর্ণ অন্যরকম, বাঙালি সংস্কৃতির মহিমাকীর্তনে তিনি উচ্চকণ্ঠ। কৃতী আমলারা এ-রকমই চালাক-চতুর হয়ে থাকে, মৌসুম অনুযায়ী খোলস পাল্টানোয় তাদের অপরিসীম দক্ষতা।

উনসত্তরে জনতার আত্মশক্তির উন্মেষ

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান শুধু শেখ মুজিব আর আগরতলা মামলার আসামিদেরই নয়, জেল থেকে বের করে আনলো সব রাজবন্দিকেই। মুক্তি পেলেন মণি সিংহ সহ কম্যুনিস্ট বন্দিরাও।

উনিশশো আটচল্লিশ/উনপঞ্চাশের পর মণি সিংহকে কেউ প্রকাশ্যে দেখতে পায়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার যে প্রচণ্ড দমন নীতি চালায় তাতে

কম্যুনিস্টদের পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। জেলখানাগুলো ভরে গিয়েছিলো কম্যুনিস্ট বন্দিদের দিয়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্রশক্তির এ রকম আক্রমণ থেকে পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কম্যুনিস্ট নেতারা আত্মগোপনে থাকার কৌশল গ্রহণ করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ—যেমন নেপাল নাগ, খোকা রায়, নিরঞ্জন গুপ্ত, ফণী গুহ, মণি সিংহ, আলতাব আলী, অবনী বাগচী, বারীণদত্ত—আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়েই পুলিশের নজর এড়িয়ে চলতে ও দীর্ঘকাল ধরে পার্টির কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থাতেই সাতষট্টির নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক মণি সিংহ আকস্মিকভাবে গ্রেফতার হয়ে যান। এরপর আবদুস সালাম নাম ধারণ করে পার্টির অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কমরেড বারীণ দত্ত। বছরখানেক পরে, আটষট্টির অক্টোবরে, গোপনেই পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সে কংগ্রেসে বারীণ দত্ত তথা আবদুস সালামই পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে মণিসিংহ সহ অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ময়মনসিংহে মণি সিংহকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়েছিলো। ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও মহিলা পরিষদের কর্মিরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কাজে উৎসাহের সঙ্গে লেগে গিয়েছিলো। সাধারণের মধ্যেও উৎসাহের কমতি দেখা দেয়নি। টংক আন্দোলনখ্যাত মণি সিংহকে নিজের চোখে দেখেছে তখনকার প্রজন্মের খুব কম মানুষই। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সবাই এতো কথা শুনেছে যে, এই মানুষটির একটা কল্পরূপ সবার মনের পটে আঁকা হয়ে গেছে। তাই, সফল গণঅভ্যুত্থানের পর এই মানুষটিকে নিয়ে একটি উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে চায় সবাই।

কিন্তু প্রমাদ গুণলো কট্টর পাকিস্তানবাদীরা। মণি সিংহের মতো একজন কম্যুনিস্ট, যে লোকটি পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই এই মুসলিম রাষ্ট্রটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেছিলো কতকগুলো জংলী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, যে লোকটিকে মুসলিম লীগ সরকার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছিলো, সেই লোকটিই পাকিস্তানের বুকে পেয়ে যাবে নাগরিক সংবর্ধনা! তাহলে তো কম্যুনিস্টদের হাতে পাকিস্তানের পরাভবই মেনে নিতে হয়! না, তেমনটি কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। মরিয়া হয়ে ওরা কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে সেই পুরোনো কুৎসা কীর্তন নতুন করে শুরু করলো—রাশিয়ার দালাল, হিন্দুস্থানের চর, ইসলামের দুশমন, খোদাদ্রোহী ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাকিস্তানবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষ ও মণি সিংহকে সংবর্ধনা দেয়ার উদ্যোগে তাদের গায়ে জ্বালা ধরে যাবার ব্যাপারটা স্বাভাবিক ও বোধগম্য। কিন্তু ছয় দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থনে যারা এতোদিন গলাফাটা স্লোগান দিয়েছে তাদেরও একটা অংশকে যখন পাকিস্তানবাদীদের সঙ্গে গলা মিলাতে দেখলাম, তখন অবাক না হয়ে পারলাম না। ওদেরই কেউ কেউ বলতে লাগলো, 'কম্যুনিস্টরা ফাঁকতালে মতলব হাসিল করতে চাইছে। আমাদের শেখ সাহেব রাওয়ালপিন্ডি গেছেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে, আর এই ফাঁকে কম্যুনিস্টরা মণি সিংহকে হিরো বানিয়ে তোলার ব্যবস্থা করছে।...এতোদিন গর্তের তলায় লুকিয়ে থেকে এখন সুযোগ পেয়ে মাথা ভাসিয়েছে, সব ক্রেডিট নিজেরা নিয়ে নিতে চাইছে...।'

দেখা গেলো : ময়মনসিংহে মণি সিংহের সংবর্ধনা বানচাল করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী বলে পরিচয়দানকারী কিছু লোকের একটা অশুভ

আঁতাত গড়ে উঠেছে এবং সেই আঁতাত সন্ত্রাস সৃষ্টির পথ ধরেছে। কম্যুনিস্টদের তারা কিছুতেই মাথা তুলতে দেবে না। প্রথমেই তারা টার্গেট করলো কমরেড অজয় রায়কে। অজয় দা ময়মনসিংহ শহর থেকে বাসে চেপে ফুলবাড়িয়ায় যাচ্ছিলেন। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কতকগুলো লোক সেই বাসেই উঠে বসেছিলো। কিন্তু অজয় রায়ও যে সেই বাসেই আছেন তা ওরা টের পায়নি। অজয় দা দীর্ঘদিন জেলে ও আত্মগোপনে থাকায় ওরা তাঁকে চিনতো না। তবে হাবভাব দেখে ও কথাবার্তা শুনে অজয় দা ওদের মতলব বুঝে ফেললেন। তাই ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত না গিয়ে মাঝপথেই তিনি এক জায়গায় নেমে পড়লেন। ওদিকে অজয় দার সমর্থকদের কাছে খবর পৌঁছলো যে, গুণ্ডারা তাকে রাস্তায় আক্রমণ করেছে। সে খবর পেয়ে তারাও সশস্ত্র হয়ে এগিয়ে এলো। যাই হোক, যখন জানা গেলো যে, অজয় দা নিরাপদেই রয়েছেন তখন সবাই শান্ত হলো। প্রতিরোধের শক্তি দেখে প্রতিপক্ষও দমে গেলো।

তবু শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তারা মণি সিংহের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি বাতিল করে দিতে বাধ্য হলেন। কারণ, বিষয়টিতে সাম্প্রদায়িক রঙ ধরতে যাচ্ছিলো। বিশেষ করে হিন্দু ব্যবসায়ীরা ভয় পাচ্ছিলেন যে, এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে লুটপাট শুরু হয়ে যায় কি না। নানা লোকে তাদের এ রকম ভয়ই দেখাচ্ছিলো। আর এ কথা কে না জানে যে, এ দেশের হিন্দুদের অতি সহজেই ভয় দেখানো যায়? ব্যবসায়ী ছাড়াও শহরের হিন্দুদের আরো কেউ কেউ তাদের ভয় ও উদ্বেগের কথা জানিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি না করার জন্যে উদ্যোক্তাদের অনুরোধ জানালেন। উদ্যোক্তারা তাদের অনুরোধ বিবেচনায় না নিয়ে পারলেন না।

যে কোনো বড়ো ধরনের গণআন্দোলনেই নানা ধরনের শক্তির সমাবেশ ঘটে, অনেক বিপরীতধর্মী শক্তিও একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সাময়িকভাবে একত্র মিলে যায়। কিন্তু উদ্দেশ্যটি সফল হয়ে যাবার পর সেই ঐক্যটি স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙে যায়, তখন আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর বিভিন্নমুখী স্বার্থের সংঘাতই প্রবল হয়ে ওঠে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বেলাতেও তা-ই হয়েছিলো। কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার ব্যাপারটি তো দীর্ঘকালের, সেটি এতো সহজে অবশ্যই দূর হয়ে যাবার নয়। কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার সূত্র ধরেই অন্তর্লীন সাম্প্রদায়িকতাকেও কাজে লাগানো যায়। এতো বড়ো একটি গণঅভ্যুত্থানও যে সেই কম্যুনিস্ট বিরোধিতা ও অন্তর্লীন সাম্প্রদায়িকতাকে মুছে দিতে পারেনি তারই প্রমাণ পাওয়া গেলো ময়মনসিংহে মণি সিংহকে সংবর্ধনা দিতে না পারার মধ্যে। তবে, এ রকম পরোক্ষ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শক্তি যে ক্ষীয়মান হয়ে আসছিলো তারও প্রমাণ পাওয়া গেলো জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্রসংঘে'র একটি সভাকে উপলক্ষ করে।

পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার পর শেখ মুজিব মুক্ত হয়ে এসে ছাত্রসমাজের এগারো দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। রেসকোর্স ময়দানে দেয়া এক সংবর্ধনা সভায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ভূষিত করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতিই হয়ে ওঠে এখানকার রাজনীতির মূল ধারা, আর ছাত্রদের এগারো দফা সেই মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেয় র‍্যাডিকেল উপাদান। রাজনীতির এই ধারাটিকে মেনে নেয়া যে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তাদের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়, সে তো সহজেই বোঝা যায়। তারা এগারো দফার তীব্র বিরোধিতা শুরু করে দেয় উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতেই।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে ময়মনসিংহের টাউনহল মাঠে ইসলামী ছাত্রসংঘ একটি জনসভা আহ্বান করে। আমরা কয়েক বন্ধু মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানেই পুলিশের

দারোগা মোজাহারুল ইসলাম সাহেবকেও 'সিভিল ড্রেসে' বাইসাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পুলিশ হলেও মোজাহারুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো। তিনি ছিলেন কবি। ময়মনসিংহের 'শুক্রবাসরীয় সাহিত্য সংসদে'র সভায় নিয়মিত কবিতা পাঠ করতেন। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার ইসলাম সাহেব? পুলিশের ধড়াচূড়া ছেড়ে একেবারে পৌরজন হয়ে এখানে এলেন যে!'

ইসলাম সাহেব ঠোঁটে তর্জনী চেপে বললেন, 'চুপ, চুপ।...আমাকে তো সরকার ডিআইবি বানিয়ে দিয়েছে। মানে আমি এখন গুপ্ত পুলিশ।'

—'তা, আপনাকে হঠাৎ ব্যক্ত থেকে গুপ্ত করে দেয়ার হেতু?'

—'আরে, তাও বুঝলেন না? সরকার জানে যে, আমার সাহিত্য টাহিত্য করার বাতিক আছে। তাই আপনাদের, মানে সংস্কৃতিওয়ালাদের, খবরাখবর আমি ভালো সরবরাহ করতে পারবো।' বলেই আমার পিঠে দুটো চাপড় দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

চিনাবাদাম চিবোতে চিবোতে আমরা বক্তৃতা শুনছিলাম। ওরা বলছিলো ওদের 'আটদফা'র কথা। আটদফায় কী কী ছিলো তা আজ আর মনে নেই। তবে মনে আছে, ছাত্রসমাজের 'এগারো দফা'র বিরুদ্ধে ওরা বিষোদগার করে চলছিলো। এগারো দফা যে বিদেশিদের মদদে তৈরি, কম্যুনিস্টরা যে বদ মতলব নিয়ে এগারো দফা ফিরি করছে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই যে এগারো দফাওয়ালাদের মূল লক্ষ—এ সবই ছিলো ওদের বক্তৃতার উপজীব্য।

হঠাৎ দেখলাম সভামঞ্চে বৃষ্টির মতো ঢিল পড়তে শুরু করেছে। মুহূর্তেই সভা বন্ধ। শুরু হয়ে গেছে ধুন্ধুমার আর দৌড়াদৌড়ি। আমরাও দৌড়ে রাস্তায় ওপাশে তাহেরুদ্দীন মল্লিকের ছাপাখানা 'এনাম প্রেসে' গিয়ে উঠলাম। শুক্রবাসরীয় সাহিত্য সংসদের অন্যতম কর্মকর্তা মল্লিক সাহেব আমাদের চা-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু গুপ্ত পুলিশ মোজাহারুল ইসলাম সাহেব চা না খেয়েই উঠে পড়লেন।

'আপনারা বসুন। আমি একটু ডিউটি করে আসি।' বলেই তিনি বাইসাইকেলে চেপে বসলেন।

দশ বারো মিনিট পরেই ফিরে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। একটু ধাতস্থ হয়ে তাঁর দশ মিনিটের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন।

টাউন হল মাঠ থেকে বিদ্যাময়ী ইস্কুলের দূরত্ব আধ মাইলের বেশি হবে না। কিন্তু এইটুকু জায়গার মধ্যেই আমাদের গুপ্ত পুলিশ মহোদয় অনেকগুলো মারামারির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। না, মারামারি নয়। একতরফা মার। তুমুল মার খাচ্ছে আটদফাওয়ালারা। মার খেতে খেতে কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে রাস্তার ড্রেনে। সেখানেও রেহাই নেই। সমানে মার চলছেই। এ রকম একটি ছেলেকে বিদ্যাময়ী স্কুলের পাশের ড্রেনটিতে তুমুল পিটুনি খেতে দেখে প্রহারকারী যুবকদের তিনি বলেছিলেন, 'এভাবে ওকে মারছো কেন তোমরা? ছেড়ে দাও ওকে। তোমাদের নেতারা কোথায়? তোমরা...।'

তার কথা আর শেষ করতে পারেননি। ওরা তার দিকে এমনভাবে তাকালো যে, ভাবলেন পিটুনিটা বোধহয় এবার তার ঘাড়েই পড়বে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ছেড়ো না ওদের, আচ্ছাসে মার দেও'—বলেই তাড়াতাড়ি উল্টোমুখি সাইকেল চালিয়ে চলে এলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে গুপ্ত পুলিশ (অথচ কবি) মোজাহারুল ইসলাম সাহেব বললেন, 'যখনই কোনো গণআন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় তখনই গণবিরোধীরা ধর্মের ধুয়া তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে লেগে যায়। এবারো এরা তাই করতে চাইছে।...তবে, এবার খুব সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

উনসত্তরে এ রকম বোধোদয় হয়ে যাওয়ার ফলেই বোধহয় একাত্তরে নির্দ্বিধায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পেরেছিলেন।

পঁচিশে মার্চ আইউবের পদত্যাগ, ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখল ও জঙ্গী শাসন জারির মধ্যদিয়ে সেবারের গণঅভ্যুত্থান পর্বের সমাপ্তি ঘটে। মওলানা ভাসানী যে উনিশশো তেষট্টি সাল থেকেই 'আইউবের প্রচ্ছন্ন সমর্থক' হয়ে গিয়েছিলেন—সে কথা ঠিক। তবু, উনসত্তরের গণআন্দোলন ছাত্রদের দ্বারা সূচিত হলেও মওলানাই যে ছিলেন এর 'প্রাণপুরুষ'—সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। সে সময়ে মওলানা যে 'ঘেরাও' আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এ দেশে তা ছিলো একান্তই অভিনব। প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা অন্যান্য ক্ষমতাধর মানুষদের অফিস বা বাড়ি ঘেরাও করে জনসাধারণের দাবি আদায় করার এই পদ্ধতিকে এদেশে এর আগে কখনো কাজে লাগানো হয়নি। কেবল শহরের মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমিত না থেকে গ্রামগঞ্জের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েই উনসত্তরের গণআন্দোলন যথার্থ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিলো এবং কোথাও কোথাও তা সহিংস রূপও ধারণ করেছিলো, আইউব-প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যানই শুধু নয়—দু'জন মেধাবী গবেষক সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন—'মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত ধ্বংস করার জন্যে ছাত্রনেতারা আন্দোলনের সময় মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে, অনেক জায়গায় মৌলিক গণতন্ত্রীরা পদত্যাগে রাজি না হলে মানুষ তাদের বাধ্য করেছিলো পদত্যাগ করতে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের সুনজরে দেখার কোনো কারণ ছিলো না। অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে তারা রাজনৈতিক শক্তিরও অধিকারী হয়েছিলো এবং এ দুটোর মিলিত শিকার ছিলো বঞ্চিত গ্রামবাসীরা। এছাড়া চোর, ডাকাত, গরুচোর, টাউট এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের দালালদের অনেকক্ষেত্রে গণআদালতে বিচার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। অন্যদিকে, স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি এ সুযোগে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে লুটপাটে অংশ নিচ্ছিলো। ছাত্র বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো ঘটনাবলী এবং এতে তারা হয়ে উঠছিলেন উদ্বিগ্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রায় দশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারীর সংখ্যা ছিলো ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাত্র।'

[মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় : *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* (ঢাকা-১৯৯৫) পৃষ্ঠা ৪১-৪২]

জনতার আদালত যে কী প্রচণ্ড শক্তিধর হতে পারে জামালপুরে মাদারগঞ্জ থানার মানুষ উনসত্তরে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলো। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাহীন চর এলাকা মাদারগঞ্জে একটি কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এর বছরখানেক আগে। আমার ভাই মতীন্দ্র ছিলো সে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। সে সূত্রেই আমার সেবার মাদারগঞ্জে যাওয়া। গণআন্দোলনের ওখানকার মানুষদের বীরত্বের কাহিনী শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বহুকাল ধরে মাদারগঞ্জের 'জইট্যার চর' গ্রামটি ছিলো গরুচোরদের ঘাঁটি। এখানকার চোরেরা দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে গরু চুরি করে এনে আটকে রাখতো, এবং গেরস্তের কাছ থেকে মোটা

টাকা আদায় করে সে গরু ফেরত দিতো। থানা-পুলিশের অনুমোদন ও সহায়তা নিয়ে বহু বছর ধরে এ রকম ঘটনা ঘটে আসছিলো। বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেনদরবার করেও গেরস্তরা কোনো প্রতিকার পায়নি। উনসত্তরে প্রতিকারের পথ নিজেরাই বেছে নিলো। এলাকার মানুষ চারদিক থেকে এই গ্রামটি ঘেরাও করে ফেলে ও চিহ্নিত চোরদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কিছু চোরকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে জবাই করে ফেলে। গরু চোরদের সরদার জয়নাল হজ করে এসে নাম নিয়েছিলো জয়নাল হাজী। লোকজন যখন ওই জয়নাল হাজীকে ধরে জবাই করতে নিয়ে যাবে, তখন সে নাকি নামাজ পড়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে তাদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলো। লোকেরা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলো। তবে নামাজ শেষ করার পরপরই তাকে কোতল করে ফেলে।

মাদারগঞ্জে যাদের মুখে আমি গণরোষের এই সব লোমহর্ষক বিবরণ শুনছিলাম তারা বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মওলানা ভাসানীর নাম উচ্চারণ করছিলো। মওলানা ভাসানী সেখানে যাননি। তাদের অনেকেই মওলানাকে কোনোদিন দেখেওনি। তবু মওলানার বিপ্লবী আহ্বানে তারা আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলো বলে তাদের এই কৃতজ্ঞতা।

উনসত্তরে যদি জনগণের আত্মশক্তির জাগরণ না ঘটতো তাহলে একাত্তরে তারা মুক্তিযোদ্ধা হতে পারতো না।

নানান কিসিমের ডান-বামের প্রাদুর্ভাব

গণঅভ্যুত্থানের সমাপ্তি ঘটবে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে—এমনটি অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত ছিলো না। তবু, উনসত্তরের পঁচিশ মার্চ আইউবের বদলে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতা দখল করে বসলো এবং দেশে আবারো মার্শাল ল' জারি হলো, তখন জনসাধারণ খুব একটা অখুশি হয়নি। আইউব-মোনেমের পতনের মধ্যদিয়ে আন্দোলনের একটি বড়ো বিজয় ঘটলো—এরকমই হয়েছিলো জনগণের মনোভাব। আর মার্শাল ল' সম্পর্কে উনসত্তরের মানুষের মনে আটান্নর মতো ভীতি, উদ্বেগ বা সমীহা কোনোটাই ছিলো না। ইয়াহিয়ার মার্শাল ল' যে আইউবের মতো হতে পারবে না, তার প্রকৃতি যে অনেকটা নিরামিষই হবে—জনগণ তাও বুঝে নিয়েছিলো। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান না করে যে নতুন সামরিক সরকার পার পাবে না, জনগণের মনে এমন প্রত্যয়েরও জন্ম হয়েছিলো। আট মাস পরে ইয়াহিয়ার এক ভাষণে জনগণের সে প্রত্যয়েরই সমর্থন পাওয়া গেলো। 'এক লোক এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে সত্তর সালের অক্টোবরের পাঁচ তারিখ সাধারণ নির্বাচন হবে, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দেয়া হবে, পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্যেই অধিকতর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হবে—উনসত্তরের আটাশে নভেম্বর এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া এ রকমই সব প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে। সত্তরের পয়লা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে সব বাধানিষেধ উঠে যাবে—ওই ভাষণে ইয়াহিয়া এ-রকম ঘোষণাও দেয়।

এ-সবই হচ্ছে সফল গণঅভ্যুত্থানের প্রাপ্তি। মার্শাল ল' সত্ত্বেও এ-সময়েই যে দেশের মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে নাগরিক স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেছিলো যা এর আগের বাইশ বছরে কখনো করতে পারেনি, এ-কথাটি আমার বারবারই মনে পড়ে। তাই, আগেই একবার এ-

কথাটি বলেছি যদিও, তবু আরেকবার তার পুনরাবৃত্তি না করে পারলাম না। এ সময়ে মানুষের অধিকারবোধ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছিলো। রাজনৈতিক নেতারা স্বভাবতই অনেক কৌশলী, তাই তারা গুণে গুণে পা ফেলেন। কৌশলের খাতিরে তারা অনেক সময় নীতিকেও আড়াল করে রাখেন। কিন্তু তরুণ ছাত্ররা সহজ কথা সহজ ভাষায় বলতেই পছন্দ করে, জনগণের অভীপ্সাকে তারাই স্পষ্ট ভাষায় রূপ দেয়। এবারও, তাই, স্পষ্ট কথা বলতে ছাত্ররাই প্রথম এগিয়ে এলো। ইয়াহিয়ার আটাশ নভেম্বরের ভাষণে বেশ কিছু ভালো ভালো কথা থাকলেও সামরিক শাসনের খাড়া ঝুলিয়ে রাখলে যে এসব কথার কানাকড়িও মূল্য থাকে না, ছাত্ররা বেশ জোরেশোরেই সে-কথাটা বললো। অবিলম্বে সামরিক শাসন-প্রত্যাহার করে নিয়ে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবি জানালো তারা। তাছাড়া তাদের দাবির মধ্যে আরো ছিলো : 'সকল রাজবন্দি ও রাজনৈতিক কারণে সামরিক সাজাপ্রাপ্ত ও আটক সকল বন্দিদের মুক্তি' এবং 'রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা, সামরিক আইনের মামলা, ঘোষিত সাজা, গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রভৃতি অবিলম্বে প্রত্যাহার।'

'১১-দফার সংগ্রাম চলবেই/ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্র সমাজের অভিমত' শিরোনামে সে-সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের ইস্তেহারে ঘটেছিলো তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর প্রজ্ঞার প্রকাশ। দীর্ঘ ইস্তেহারের 'আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নাই' শীর্ষক অনুচ্ছেদটিতে ছাত্ররা বলেছিলো—

'ইহা সকলের জানা আছে যে আমাদের দেশে গণতন্ত্র বিকাশে ও বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জাতীয় অধিকার লাভের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী গত ২২ বছরব্যাপী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে এবং দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে দেয় নাই। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কাজেই নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববাংলাসহ সকল ভাষাভাষী জাতির পূর্ণ ও প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্যে আজ আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকিতে হইবে ও আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অন্যথায় বর্তমান বিজয়সমূহও পুনরায় নস্যাৎ হইবার আশংকা আছে।...এক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে চাই যে, শুধু নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র অর্জন করিলেই জনগণের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এ-কথা আমরা মনে করি না। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির উচ্ছেদ, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, বাঙালিসহ সকল জাতির পূর্ণ জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়াই দেশ মুক্তির পথে যাইতে পারে। এই জন্য নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার অর্জিত হয় উহা ঐ লক্ষে অগ্রসর হইবার একটি পথ মাত্র।'

ইশতেহারটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ছয়জন ছাত্রনেতা। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের শামসুদ্দোহা ও নূরুল ইসলাম এবং ছাত্রলীগের তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রব তো ছিলেনই, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহীম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলামও ছিলেন। এ-রকম ইশতেহারে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতারা যে স্বাক্ষর করবেন তা তো একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন নামক ছাত্র সংগঠনটির পরিচয় যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এই ইশতেহারের সঙ্গে এ-সংগঠনের নেতাদের

সংযুক্তির বিষয়টি অস্বাভাবিকই মনে হবে। অথচ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এই অস্বাভাবিককেও স্বাভাবিকে পরিণত করে ফেলেছিলো।

এনএসএফ নামে পরিচিত জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনকে কোনো ছাত্র সংগঠন না বলে ছাত্র নামধারী ভাড়াটে গুণ্ডাদের একটি বাহিনী বলাই সঙ্গত। ষেষট্টি সাল থেকে এই বাহিনীটিকেই প্রগতিশীল ছাত্রদের দমনের কাজে লাগানো হয়। গভর্নর মোনেম খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর এম ও গনির প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট হয়ে এ-বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এনএসএফ'র তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করেই ষাটের দশকের সুস্থ ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে হয়। সাধারণ ছাত্রদের হাতেই নিহত হয় 'পাঁচপাণ্ডব' নামে পরিচিত, একজন কুখ্যাত এনএসএফ নেতা, যে নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে তার রুমে সাপ পুষতো বলে শোনা যায়। জাগ্রত ছাত্রসমাজ যখন এগারো দফার আন্দোলন শুরু করে, এবং সে আন্দোলন যখন গণঅভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করতে থাকে, তখন ছাত্রজনতার রুদ্ররোষের হাত থেকে এনএসএফ-ওয়ালাদের রক্ষা করার কোনো ক্ষমতাই থাকে না গণবিরোধী শাসকের হাতে। তাই বাধ্য হয়েই, নিজেদের চামড়া বাঁচানোর খাতিরেই, এনএসএফ নেতৃত্ব এগারো দফা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। উনসত্তরের জানুয়ারিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ ও ইপিআরের হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিতে দেখি মাহবুবুল হক দোলন, নাজিম কামরান চৌধুরী, ইব্রাহিম খলিল, সাইফুল্লাহ্ চৌধুরী ও জমির আলীর মতো এনএসএফ নেতাদেরও। উনসত্তরের নভেম্বরেও তাই দেশের ছাত্রসমাজ তথা জাগ্রত জনগণের মূলধারার সঙ্গে এনএসএফ নেতারা আন্তরিক সক্রিয়তায় সংযুক্ত থাকুক আর নাই থাকুক, এ-ধারার প্রকাশ্য বিরোধিতা করার শক্তি ও সাহস তারা হারিয়ে ফেলে।

তবে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল ছাত্ররা এ বিষয়ে সচেতন থাকে যে, 'দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও উগ্র হঠকারী বামপন্থীগণ কর্তৃক পুনরায় নির্বাচন বানচালের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার বিপদ এখনও আছে' তারা তাই তাদের ইশতেহার শেষ করে 'দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও উগ্র দক্ষিণ ও উগ্র বামের বিপদের বিরুদ্ধে ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ' হওয়ার জন্যে 'জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তির' প্রতি আহ্বান জানিয়ে। এ আহ্বান ছিলো খুবই সঠিক ও সময়োচিত।

উগ্র দক্ষিণপন্থীদের তৎপরতা তো পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিলো। এবার হঠাৎ করে সারা দেশজুড়ে উগ্র বামাচারের ঝড়ো যাওয়া বইতে লাগলো। যে পাকিস্তান শুরু থেকেই কম্যুনিস্ট ও বামপন্থীদের ওপর সীমাহীন দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিলো, সেই পাকিস্তানেই কী করে যে হরেক কিসিমের বামের প্রাদুর্ভাব ঘটে গেলো, সেটি একটি প্রহেলিকাই বটে। এতোকাল যাদের বাম বলে লোকে জেনে এসেছিলো, সেই মণি সিংহ ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে এবার শোনা গেলো : না, এরা মোটেই বাম নয়। এরা হলো গিয়ে 'সংশোদনবাদী' আর 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল'। এদের দিয়ে বিপ্লব হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

অথচ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকরা কিন্তু ওই 'সংশোদনবাদী'দের যথেষ্ট সংশোধিত বা পাকিস্তানের জন্যে নিরাপদ বলে উনসত্তর/সত্তর সালেও মনে করেনি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে যে 'সংশোদনবাদী'রা কারামুক্ত হয়ে এসেছিলেন—যেমন মণি সিংহ ও অজয় রায়—তারা উনসত্তরের মে-জুন মাসের মধ্যেই আবার কারারুদ্ধ হয়ে গেলেন। ইয়াহিয়ার তখনকার নিরামিষ মার্শাল ল'ও এদের সম্পর্কে হিংস্রতা পরিহার করতে পারেনি।

এদের বিপরীতে নিজেদের যারা সাচ্চা বিপ্লবী আর খাঁটি বাম বলে প্রচার করতো তারা মোটেই এক গোষ্ঠীর লোক ছিলো না। নানা গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত ওই সব বামদের নানা 'থিসিস', জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নানা 'মূল্যায়ন' নানা 'রণনীতি ও রণকৌশল'। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষও তাদের কম নয়। তবে সাধারণের কাছে তাদের সবাই 'পিকিংপন্থী' নামে পরিচিত এবং কয়েকটি বিষয়ে তারা একই রকম বা প্রায় একই রকম মতের অনুসারী। যেমন—তারা সবাই 'মস্কো' অথবা 'মস্কোপন্থী'দের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টিকে তারা কেউই খাঁটি কম্যুনিস্ট বলে মনে করে না; এ-দেশেও সোভিয়েত পার্টির অনুসারী 'পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি' ও 'মোজাফফর ন্যাপ' এবং এদের অনুগামী 'ছাত্র ইউনিয়ন'-ও একান্তই বিপথগামী; এই বিপথগামী 'মস্কোপন্থী'রা বাঙালি বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি আওয়ামী লীগের লেজুড়ে পরিণত হয়ে গেছে।

পিকিংপন্থী বলে পরিচিত কিছু ছাত্র প্রায়ই আমার কাছে আসতো। পশ্চিমবঙ্গের নক্সালপন্থীদের নানা কাগজপত্র, ওখানকার নক্সালদের মুখপত্র *'দেশব্রতী'*র কাটিং এবং চারু মজুমদারের লেখা পুস্তিকা আমাকে দিয়ে যেতো। ওদের নিজেদের কর্মসূচি ও কাজকর্মের বিবরণও আমাকে শোনাতো। ওদের চোখেমুখে দেখেছি প্রত্যয়ের আলো, সুন্দর আগামীর স্বপ্ন। বিশেষ করে দুটি ছেলের কথা আমার আজো প্রায়ই মনে পড়ে। তাদের একজনের নাম মহিউদ্দীন বাহার ও আরেকজন দেলোয়ার আহমদ চঞ্চল। 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'—মাও সেতুঙ-এর এই উক্তিটি ঘুরেফিরেই তারা উচ্চারণ করতো। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ যে অসম্ভব সে-সম্পর্কে তাদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিলো না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাহার কোথায় কী করছে জানি না। চঞ্চল তেয়াত্তর কি চুয়াত্তর সালে রাজশাহীর কোনো এক এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অল্প কিছুদিন আগে আমার বাসায় এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজা। মোর্তজা ছিলেন আপাদমস্তক ও কায়মনোবাক্যে বিপ্লবী। বিপ্লবই ছিলো তার সর্বক্ষণের ধ্যানজ্ঞান। বিপ্লবের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই নিবেদিত ছিলো তাঁর সকল চিন্তা ও কাজ। সব রকম কপটতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে ছিলো তার অবস্থান। পেশায় চিকিৎসক হয়েও দর্শন ও সাহিত্যের অনুশীলনে তিনি ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান। এক সময় বার্নাড শ'-এর রচনাবলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন। ধ্রুপদী মার্কসীয় গ্রন্থের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে ছিলো তার অক্লান্ত প্রয়াস। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই একাত্তরের চৌদ্দ ডিসেম্বর এ-দেশের আরো কয়েকজন মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শহীদ হয়েছিলেন আমার একান্ত সুহৃদ ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজাও।

মোর্তজার সঙ্গে আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্য খুব বেশিদিনের নয়। তবু অল্পদিনেই—কোনো কোনো বিষয়ে মতানৈক্য নিয়েই—আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। আটষট্টি সালে তো তিনি ঘোর 'পিকিংপন্থী'। পিকিংপন্থীদের সকল কথার সঙ্গেই যে আমি দ্বিমত পোষণ করতাম, তা নয়। বরং ওদের কিছু কিছু বক্তব্যের আমি দৃঢ় সমর্থক ছিলাম বলেই আমার মনে হতো, তা নয়। বরং ওদের কিছু কিছু বক্তব্যের আমি দৃঢ় সমর্থক ছিলাম বলেই আমার মনে হতো। কিন্তু মোর্তজা 'মস্কোপন্থী' পার্টির কারো কারো দৃষ্টিতে আমি 'পিকিংপন্থী' হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মোর্তজা যখন মাও সেতুঙ-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতি তার নিঃশর্ত আনুগত্য ও কট্টর সমর্থনের কথা বলতে লাগলেন, তখন আমি তার প্রতিবাদ না করে পারলাম না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা একান্ত মূঢ়তা এবং চীনের ওই তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব

মার্কসবাদ-বিরোধী—এ-কথা আমি খুব জোরের সঙ্গেই সেদিন বলেছিলাম। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে যখন বুঝতে পারলাম যে মোর্তজা আমার কথায় আহত হচ্ছেন, তখন আমি তর্কের রাশ টেনে ধরলাম, আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলাম, গৃহাগত অতিথি বন্ধুর মনঃকষ্টের কারণ হয়েছি ভেবে দুঃখিত ও লজ্জিত হলাম।

নিজে 'মস্কোপন্থী'দের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও 'পিকিংপন্থী'দের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বক্তব্য আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু ওদের কোনো গোষ্ঠীরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কীয় বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়—উগ্র বাম বিচ্যুতির সময়ে—কম্যুনিস্টরা উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিলো, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল মনীষীকেই 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিয়েছিলো, তাদের সকলকেই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বলে চিহ্নিত করেছিলো। অল্পদিন পরেই অবশ্যি আত্মসমালোচনা করে এ-সব বালখিল্য বক্তব্য সে সময়কার বামপন্থীরা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো। কিন্তু সেই বাতিল কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শোনা গোলো দেড় দশক পরে 'নক্সালপন্থা' কিংবা 'পিকিংপন্থা'র অনুসারীদের মুখে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে তো এ-সব কথা আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো এ-কারণে যে, ঠিক এই কথাগুলোই এখানকার দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরও কথা। ভঙ্গি আলাদা, কিন্তু সিদ্ধান্ত এক। একদল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্র বিরোধিতা করছে, অন্যদলের রবীন্দ্র-নিন্দা প্রগতি ও বামপন্থার আলখাল্লা গায়ে দিয়ে। প্রগতিকামী যে তরুণটি ডানপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে, বাম মোড়কে পরিবেশিত সেই একই বক্তব্যকে সেই তরুণটিই হয়তো পরম সমাদরে গ্রহণ করেছে।

উগ্র ডান ও উগ্র বাম যে একই বিন্দুতে এসে মিলে যায়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারেও তার প্রমাণ মেলে।

উদ্‌ভ্রান্ত বামপন্থা ও মওলানা ভাসানীর দুর্বোধ্য চরিত্র

উনসত্তর সালে রবীন্দ্রজয়ন্তীর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে একজন বালখিল্য বামাচারীর দেখা পেয়েছিলাম।

বামপন্থী ছাত্র-যুবকরাই অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলো। ওদের চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন, কিন্তু মনে অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজনের মধ্যেও সেই সংশয় নিরসনের পথসন্ধান কিংবা জিজ্ঞাসার জবাব খোঁজাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যেই বোধহয় তারা আমাকে আলোচনার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলো। আমি মহামতি লেনিনের একটি কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। তলস্তয়কে যখন রাশিয়ার চ্যাংড়া কম্যুনিস্টরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করে দিতে চেয়েছিলো তখন লেনিন বলেছিলেন যে, 'তলস্তয় হচ্ছেন রুশ বিপ্লবের দর্পণ।' তলস্তয় ছিলেন একজন মহৎ শিল্পী। মহৎ শিল্পীদের সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য—'যে কোনো সত্যিকার মহৎ শিল্পীই তার শিল্পকর্মে বিপ্লবের কোনো না কোনো মর্মগত অংশের প্রতিফলন না ঘটিয়ে পারেন না।' রবীন্দ্রজয়ন্তীর তরুণ শ্রোতাদেরকে লেনিনের এই উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম : মহৎ শিল্পী রবীন্দ্রনাথেরও রচনায় স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবের নানা উপাদান ধরা পড়েছে, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী সত্তাটি আমাদের অবশ্যই চিনে নিতে হবে। '*অচলায়তন*', '*মুক্তধারা*', '*রক্তকরবী*' ও '*রথের রশি*'—এই কয়েকটি নাটক থেকে দৃষ্টান্ত টেনেই আমি 'বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ'কে উপস্থিত করেছিলাম।

আলোচনা করতে করতেই আমি লক্ষ করছিলাম যে, শ্রোতাদের একেবারে পেছনের সারিতে প্রায় আমারই সমবয়সী একজন লোক, চোখে যার পুরু লেন্সের চশমা, তাঁর পাশের শ্রোতাদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছেন। তার কথাগুলো যে ছিলো আমারই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য তা তার মুখচোখের ভাব ও হাত নাড়া দেখেই আন্দাজ করতে পারছিলাম। আমার আলোচনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ও কৃত্রিম উচ্চারণে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা অধ্যাপক বাবু, 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে'—রবি ঠাকুর এ কবিতাটি কবে লিখেছিলেন?"

তার কথায় ব্যঙ্গের সুর থাকলেও আমি শান্ত ও স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলাম, "এটি তো 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'নববর্ষা' কবিতার প্রথম ছত্র। ক্ষণিকা প্রকাশিত হয় বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরুতে সম্ভবত উনিশশো দুই কি তিন সালে। ওই কবিতাটি ওরই কাছাকাছি সময়ের লেখা হবে।"

—"সে সময়ে কি দেশের মানুষের দুঃখ-দৈন্য-অভাব ছিলো না?"

—"তা তো ছিলোই।"

—"দুঃখ-দৈন্য-ছিলো, মানুষ ছিলো ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থান, আর সেই সময়েও—আপনি যাকে বলেছেন 'বিপ্লবী'—সেই প্রজা-শোষক জমিদার রবি ঠাকুরের হৃদয় একেবারে ময়ূরের মতো নাচে? তখনো তার হৃদয় নাচে এবং নাচতে পারে?"

—"হ্যাঁ, নাচে এবং নাচতে পারে। কারণ তখনো তো মানুষের ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ থাকেনি।"

—"মানে?"

—"মানে অতি পরিষ্কার। মানুষের দুঃখ দৈন্য চিরকালই ছিলো, তবু সেই দুঃখদৈন্যের মধ্যেও নরনারী পরস্পরকে ভালোবেসেছে, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করেছে, হেসেছে, খেলেছে। সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে কেবল কান্নাকাটি করেনি, কিংবা বিপ্লবের নামে গলাকাটা শুরু করে দেয়নি। বর্ষায় ময়ূর যেমন পেখম মেলেছে, মানুষের হৃদয়ও তেমন নেচেছে, মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথেরও হৃদয় নেচেছে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয় এ রকম নাচতো বলেই তিনি যান্ত্রিক বস্তুবাদী হননি কিংবা লেনিন-কথিত 'ইনফ্যান্টাইল ডিজ-অর্ডারে' আক্রান্ত হননি...।"

আমার কলিংবেল-নিন্দিত কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ও উগ্রতা ঝরে পড়েছিলো, আমি রীতিমতো অভদ্র হয়ে উঠেছিলাম। তবে ওই বামাচারী মানুষটিকে দেখলাম তিনি যে ভঙ্গিতে আমার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে শুরু করেছিলেন শেষে সে ভঙ্গিটি পরিহার করেছেন, আমার অভদ্র আচরণের মুখে খুবই ভদ্র ও সংযত হয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত হাসিঠাট্টার মধ্যেই আমরা দু'জনে হাত মিলালাম।

উনি ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে এসেছিলেন সম্ভবত বাহার ও চঞ্চলদের মতো বামপন্থী তরুণ ছাত্রদের আমন্ত্রণেই। চঞ্চল নামের ছেলেটি ভেতরে ভেতরে খুবই চঞ্চল ও অশান্ত হলেও আচরণে ছিলো ভদ্র ও বিনয়ী। আমাকে সে 'সংশোধনবাদী' বলেই জানতো। তবু নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে বারবার সে আমার কাছেই ছুটে আসতো। আবার, আমি যেহেতু তার শিক্ষক, সেজন্যে শ্রদ্ধার ভাবটি বজায় রেখেই সে আমার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতো, উদ্ধত আচরণ বা বেয়াদবি কখনো করতো না। লক্ষ করেছি, যখনই সে আমার 'সংশোধনবাদী'

বক্তব্যের বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তির জোগান দিতে পারে না, তখনই সে ঢাকায় তার নেতাদের কাছে চলে যায়। তাদের কাছ থেকে তথ্য ও যুক্তির অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। সে গল্প কবিতাও লিখতো। শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্কটি বুঝতে চাইতো। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য তার ও তার সহমর্মিদের কাছে নিতান্তই অবিপ্লবী মনে হতো। আবার তাদের একান্ত কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবী সাহিত্য তত্ত্বটিও তারা খুঁজে পাচ্ছিলো না। তাই হয়তো তারা ওই বিপ্লবী তাত্ত্বিক কমরেডটিকে ময়মনসিংহে নিয়ে এসেছিলো। তবে, স্বাভাবিকভাবেই, সত্তর সালে বামমার্গীদের কার্যকলাপ তত্ত্ব আলোচনার মধ্যে সীমিত থাকে না। দ্রুত 'অ্যাকশন'-এ চলে যাওয়ার জন্যে তারা ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো : 'সারাদেশে এখন চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বুর্জোয়াদের দল আওয়ামী লীগ সেই বিপ্লবী পরিস্থিতি নষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি ইলেকশন করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে মণি সিংহ-মোজাফফরের অনুসারী সংশোধনবাদী চক্রটি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। ভোটের রাজনীতি দিয়ে দেশের কোনো কল্যাণ হবে না। চাই বিপ্লব। বিপ্লবের লক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই তারা স্লোগান তুললো 'ভোটের আগে ভাত চাই।'

এই স্লোগানটি তারা তুলেছিলো মওলানা ভাসানীর প্রশ্রয়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। বামপন্থীরা বরাবরই ভেবে এসেছে যে তারা মওলানাকে ব্যবহার করছে। কিন্তু আসলেই মওলানা কি তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন? এর জবাবে 'হ্যাঁ' বলা কোনো মতেই সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানী দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনো ডানে কখনো বামে সঞ্চরণ করেছেন। চলার পথে প্রয়োজন ও পছন্দমতো কখনো ডানদের কখনো বামদের সঙ্গে নিয়েছেন, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। পাকিস্তানের জন্মের পর শাসকদল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক সংগঠন তিনি গড়ে তোলেন সেই আওয়ামী মুসলিম লীগে তো ডানদেরই প্রাধান্য ছিলো, তবু বামরাও সে সংগঠনকে আশ্রয় করতে বা সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়েছে। আর এই বামদের সমর্থন নিয়েই তিনি আওয়ামী লীগের ডানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং সাতান্ন সালের পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মতো একটি রেডিক্যাল রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। আবার তেষট্টি সাল থেকে যে তিনি নানাভাবে ডানপন্থী স্বৈরাচারী আইউব শাহীকে সমর্থন জোগাতে শুরু করেন, সে বিষয়টিও তো মিথ্যা নয়। এ নিয়ে রাজনীতি-বিশ্লেষকদের কেউ কেউ আলোচনাও করেছেন। তবে তেষট্টির আগেও, এমনকি সাতান্ন সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করার সময়কালেও, মওলানার ভূমিকা নিতান্ত সরল ও সহজবোধ্য ছিলো না। চুয়ান্ন সালে পূর্ববাংলার মানুষের নির্বাচনী রায়কে নস্যাৎ করে দিয়ে এখানে যখন ৯২ (ক) ধারা (অর্থাৎ গভর্নরের শাসন) জারি করা হয়, তখন মওলানা ভাসানী ছিলেন দেশের বাইরে। গভর্নর ইস্কান্দর মির্জা সে সময় ঘোষণা করেছিলেন যে, ভাসানী দেশে ফিরে এলে তাকে গুলি করে মারা হবে। অথচ, এই মির্জাই যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন তখন ভাসানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে উঠলো একান্ত হৃদ্য। আটান্নর শেষ বা উনষাটের শুরুতে ছাপ্পান্নর সংবিধানের অধীনে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে—এ রকমটি যখন সবাই আশা করছে, তখনই রেডিক্যাল রাজনৈতিক দল ন্যাপের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান

ভাসানী যে অন্যরকম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে কথা আমি ময়মনসিংহের কমরেড আলতাব আলীর মুখে শুনেছি। আটান্নর জুলাই কি আগস্ট মাসে আলতাব আলী গিয়েছিলেন মওলানার সঙ্গে দেখা করে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে। মওলানা নাকি তখন তাকে বলেছিলেন, 'ইস্কান্দর মির্জাকে আমাদের সমর্থন জানাতে হবে। উনিই হবেন পাকিস্তানের নাসের।'

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেয়ার জন্যে মিসরের জামাল আবদুন নাসের তখন সারা দুনিয়ার প্রগতিশীলদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। সেই নাসেরের সঙ্গে কিনা মওলানা ভাসানী তুলনা দিচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার!

কমরেড আলতাব আলী অবাক হয়ে বলেছিলেন, আপনি একি বলছেন হুজুর? আমরা যখন আগামী ইলেকশানের প্রস্তুতির কথা চিন্তা করছি, তখন আপনি বলছেন ইস্কান্দর মির্জাকে সাপোর্ট দেয়ার কথা। মওলানা বলেছিলেন, 'ইলেকশান টিলেকশান হবে না। চুপচাপ বসে থাকো। দেখো, কী হয়।'

এর মাস দুই পরেই ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ঘোষণা দিয়েছিলেন, সংবিধান বাতিল করে দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এ রকমটি যে ঘটবে মওলানা ভাসানী কি আগে থেকেই তা জানতেন?

ইস্কান্দর মির্জা অবশ্যি সামরিক আইন জারি করার তিন সপ্তাহের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হলেন, মঞ্চাবতীর্ণ হলেন আইউব খান। মওলানাকেও ঢাকার একটি বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হলো। আইউব একটি তথাকথিত শাসনতন্ত্র জারি করার পর এক সময় মওলানা মুক্ত হয়ে এলেন, জনগণের দাবির সঙ্গে তিনিও কণ্ঠ মেলালেন। তারপর আইউবের দূত রূপে তার চীনে যাওয়া এবং এর পরবর্তী সময়ের ভূমিকা নিয়ে যতো প্রশ্নই আমরা উত্থাপন করি না কেনো, উনসত্তরে গণঅভ্যুত্থানের এক পর্যায়ে তো সেই মওলানাকে আমরা গণআকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র রূপেই পেলাম। আবার সত্তরে সাধারণ নির্বাচনের আগে-পরে তার ভূমিকায় তো হরেক রকম রঙ ধরেছে। এই অল্পদিনের মধ্যেই কখনো তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে জান কোরবান করার কথা বলেছেন, কখনো 'লাহোর প্রস্তাব' বাস্তবায়নের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, কখনো ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হয়েছেন, কখনো বা একেবারে স্বাধীন পূর্বপাকিস্তানের ঘোষণাই দিয়ে ফেলছেন। যে 'চীনপন্থী' কম্যুনিস্টরা মওলানাকে ঘিরে রেখেছিলেন তারা প্রায় সবাই একাত্তরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই তার নেতৃত্ব অস্বীকার করলেন, অথবা তিনিই তাদের দূরে ঠেলে দিলেন। পাকিস্তানের এককালের প্রখ্যাত বামপন্থী ছাত্রনেতা তারিক আলী থেকে শুরু করে এখানকার হাজী দানেশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, বদরুদ্দীন উমর, মাহবুব উল্লাহ কিংবা মফিদুল হক পর্যন্ত অনেকের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিয়ে মওলানার ভূমিকার সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন তরুণ গবেষক ডক্টর মোহাম্মদ হাননান তার *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*-এ [দ্রষ্টব্য : ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, (ঢাকা-১৯৯২), পৃষ্ঠ ২১২-২১৯]

আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিতজনদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আবদুস সাত্তার মওলানা ভাসানী সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া মন্তব্য করেছেন।

সাত্তার ভাই শেরপুরের লোক। উনিশ শো আঠাশ সালে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছেন। সারা জীবনের

অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত তাঁর মূল্যবান স্মৃতিকথা *আমার দেশ আমার জীবন*। এই স্মৃতিকথারই এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

'আইয়ুবের প্রতি সমর্থন ও ছয়দফা আন্দোলনের বিরোধিতার মাধ্যমে ভাসানীর গৌরবময় জীবনে অধঃপতনের সূচনা হয়। অবশেষে '৭০-এর নভেম্বরে বরিশালের মহাদুর্যোগকে কেন্দ্র করে ভাসানী, আতাউর রহমান ও পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিঞার আকস্মিক স্বাধীনতা ঘোষণা, অতিবিপ্লবী পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করার এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিলো। সেই কারণেই পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতার এই তিন প্রবক্তাকে সারা বাংলা ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিয়েছিলেন এবং ২৫ মার্চে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই তিন সৈনিকের দুইজন আতাউর রহমান খান ও পীর মোহসেন উদ্দীন আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। পাকবাহিনী মওলানা ভাসানীর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে অথবা পরিকল্পনামাফিক ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেন। তার দক্ষিণ হস্ত মশিউর রহমান যাদু মিঞা ভারত থেকে ফিরে এসে সরকারের পক্ষে প্রচারে অবতীর্ণ হন। স্বাধীনতার পর মওলানা ভাসানী বাংলাদেশে ফিরে এসেই সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-বিদ্বেষ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্তের রাখিবন্ধনের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-বিদ্বেষের প্রায় মৃত্যু ঘটেছিলো মওলানা ভাসানী তাকে পুনর্জীবন দান করে জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের পুনঃআবির্ভাবের সুযোগ করে দিলেন। শেখ মুজিবের অন্ধ বিরোধিতা ও জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানিয়ে এই বর্ষীয়ান নেতা শেষ জীবনে এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের যে ক্ষতি করে গেলেন তা অপূরণীয়। প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং অবশেষে ঐ আন্দোলনের বৃহত্তম ক্ষতিকারক মওলানা ভাসানী সত্যই এক দুর্বোধ্য চরিত্র।' [অধ্যাপক সৈয়দ আবদুস সাত্তার : *আমার দেশ আমার জীবন* (ঢাকা-১৯৯৫), পৃষ্ঠা ১৫২-৫৩]

ভোটের রাজনীতি ও জনগণের প্রজ্ঞা : 'ভোটের আগে ভাত চাই' কিংবা

'ভোটের বাক্সে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'—এরকম স্লোগান সত্তর সালের পূর্ব পাকিস্তানকে উচ্চকিত করে তুললেও এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই ভোটের ব্যাপারে ছিলো অপরিসীম উৎসাহ। সে উৎসাহের সামনে ভোট-বিরোধীদের 'বিপ্লবী কণ্ঠস্বর' আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। তবু কট্টর ভোট-বিরোধী একটি গোষ্ঠী তাদের বিরোধিতার আদর্শ পরিত্যাগ করেনি। জনগণের ভালো করতে চায় তারা, অথচ বেকুব জনগণ তাদের সমর্থন করে না! এ দুঃখ তারা রাখবে কোথায়! জনগণের ওপর বড়ো অভিমান হয় তাদের। এ-রকম একটি অভিমানী গোষ্ঠীই বোধ হয় সেদিন মনের দুঃখে বনে চলে গিয়েছিলো। দেয়াল লিখনে তারা জানিয়ে দিয়েছিলো—'শুয়রের বাচ্চা জনগণ, করগে তোরা নির্বাচন, চললাম আমরা সুন্দরবন'। না, এই লিখনটি কোনো দেয়ালে আমি নিজ চোখে দেখিনি। একটি সাপ্তাহিকে এ রকম একটি দেয়াল লিখনের যে-ছবি ছাপা হয়েছিলো সেটিই দেখেছিলাম। গুজব রটেছিলো : বিপ্লবীদের একটি গোষ্ঠী সুন্দরবনের গভীরে ঘাঁটি তৈরি করে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এক সময় তারা বন থেকে বেরিয়ে এসে বুর্জোয়াদের উৎখাত করবে, দেশে প্রলেতারিয়েতের রাজত্ব কায়েম করবে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করা কিংবা কৃষকদের মুক্তাঞ্চল গঠন করার কথাও

তখন খুব শোনা যাচ্ছিলো। 'ইতিহাসের দুই নাম, নক্সালবাড়ি ভিয়েৎনাম'—এই স্লোগান ও নক্সাল নেতা চারু মজুমদারের 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'ও অনেক শহুরে ছাত্র-যুবকের প্রাণে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। তবে, সত্যি কথা হলো, জনগণ এ-আগুনে ইন্ধন জোগায়নি। তাই, এ-আগুন এখানে ওখানে খপ করে জ্বলে উঠেই দপ করে নিভে গেছে।

এ দেশের মানুষ ইলেকশান ও ভোটের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। ইউনিয়ন বোর্ড আর লোকাল বোর্ডের ইলেকশানেই ভোটে তাদের হাতে খড়ি। তারপর সেই ইংরেজ আমলেই আইন সভায় প্রতিনিধি পাঠাতেও তারা ভোট দিয়েছে। ছেচল্লিশ সালে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেই পাকিস্তানের জন্মকে সম্ভব করে তুলেছে। আবার পাকিস্তান সৃষ্টির পর দোর্দণ্ড প্রতাপ মুসলিম লীগ সরকারকে চুয়ান্ন সনে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এই ভোটের শক্তিতেই। অবশ্যি তাদের ভোট পেয়েই একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ক্ষমতাধর হয়েছে, জনগণের শাসক ও শোষক হয়ে বসেছে। জনগণের ভোটের জোরে ক্ষমতায় বসেই এই শাসক-শোষকরা জনগণের রায়কে উপেক্ষা ও অপমান করেছে, জনগণকে প্রতারিত করেছে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানের জঙ্গ বাহাদুররা জঙ্গি শাসন জারি করে জনগণের ভোটের অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। গণদুশমন ওই শাসক শোষকরা জনগণের হাতের ওই ভোটের অস্ত্রটিকে ভীষণ ভয় করে বলেই তো তাদের নিরস্ত্র করে রাখতে চায়। জঙ্গি শাসক আইউবের 'মৌলিক গণতন্ত্র' তো জনগণকে নিরস্ত্রকরণেরই অপর নাম। তবু, মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থাতেও ভোটের যেটুকু অধিকার জনগণের হাতে ছিলো সে অধিকারটুকুরই সর্বাধিক ব্যবহার তারা করতে চেয়েছে। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে ভোট দিতেও তাদের উৎসাহে ঘাটতি পড়েনি। এমনকি, পঁয়ষট্টির জানুয়ারিতে তারা মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটেই আইউবকে গদিচ্যুত করে ফাতেমা জিন্নাকে ক্ষমতাসীন করার স্বপ্ন দেখেছে।

তাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে অবশ্যই। প্রমাণিত হয়েছে যে, তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের দিয়ে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তবে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বলেই জনগণ নিষ্ক্রিয় হতাশার কোলে আত্মসমর্পণ করে বসেনি। তারা বরং অধিকতর সক্রিয় ও সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। স্বপ্নভঙ্গের ফলেই মরীচিকার মোহ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে, বাস্তব সচেতন হয়েছে, আসল শত্রুদের ভালো করে চিনে নিয়েছে। যাদের আমরা অজ্ঞ মূর্খ অশিক্ষিত বলে জানি, সেই সাধারণ জনগণ আসলে অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী। এই প্রজ্ঞার বলেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিক্ষা নেয়, কিংবা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তারা প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠে। সঠিকভাবে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে তারা জানে, আবার যখন তাদের ভোটকে শাসকরা প্রহসন বানিয়ে ফেলবে বলে বুঝে ফেলে তখন তারা ভোট দেয়া থেকে বিরতও থাকতে পারে। অর্থাৎ তারা তাদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞা বলেই জানে কখন কোন নির্বাচনে ভোট দিতে হবে আর কোন নির্বাচন বর্জন বা প্রত্যাখ্যান বা প্রতিহত করতে হবে। সে কারণেই পঁয়ষট্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তারা যেমন ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলনকে মনে প্রাণে সমর্থন জানিয়েছে, তেমনি এর পরে মৌলিক গণতন্ত্রকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। সেই আন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানের পরিণতিতেই সত্তরে জনগণ তাদের হারানো ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছে। সেই ফিরে পাওয়া অধিকার তারা ছেড়ে

দেবে কেন? ভাতের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ জর্জরিত অবশ্যই। ভাতের প্রয়োজন তাদের কাছে বড়ো বেশি তীব্র। কিন্তু ভোটের অধিকার ছেড়ে দিলেই কি তারা ভাতের অধিকার পেয়ে যাবে? স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তারা মনের গভীরে সযতনে সংগোপনে লালন করে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভোটের বাক্সে লাথি মারলেই কি স্বাধীনতা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে?

এ-প্রশ্নগুলো তারা এ-রকম ভাষায় করে না বটে, কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদের জানা আছে বলেই ভোটবিরোধীদের বালখিল্য আহ্বানে তারা সাড়া দেয় না। লক্ষ স্থির করে ফেলে তারা। ছেচল্লিশে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে ভোটের বাক্স ভরে তুলেছিলো যারা, সত্তরের নির্বাচনে তারাই সেই পাকিস্তানের কবর রচনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার প্রস্তুতি নেয়। ক্ষুদ্র একটি বামপন্থী গোষ্ঠীর নির্বাচন-বর্জনের প্রয়াসকে এদেশের জনগণ প্রত্যাখ্যান করে।

সত্তরের নভেম্বরে প্রলয়ংকরী সামুদ্রিক ঝড়ে এখানকার একটি অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ যখন প্রাণ হারায়, এবং পাকিস্তানের শাসককুল এ-রকম বিপর্যয়েও সীমাহীন ঔদাসীন্য ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়, তখন পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের বিন্দুমাত্র মোহও আর অবশিষ্ট থাকে না। মোহমুক্তির এই প্রেক্ষাপটেই সত্তরের ডিসেম্বরের নির্বাচনে এখানকার ভোটাররা বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে তাদের ভোটগুলো উজাড় করে দিয়ে দেয়। চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের মতো সত্তরের নির্বাচনেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিলো নৌকা। চুয়ান্নয় যে জনগণ নৌকাকে তাদের প্রাণের প্রতীক বানিয়েছিলো, ষোল বছর পরে তারাই আবার সেই নৌকায় নতুন করে পাল উড়িয়ে দিলো।

সত্তরে ময়মনসিংহ সদর থানা নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন সৈয়দ আবদুস সুলতান। কৃতী আইনজীবী সুলতান সাহেব ছিলেন একজন বিশিষ্ট লেখক ও সুবক্তা। 'মোমেনশাহী সাহিত্য মজলিস' সহ ময়মনসিংহের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সংযোগ ছিলো। সেই সূত্রে আমি তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানতাম। সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত হৃদ্য। কিন্তু রাজনীতিতে তো আটষট্টি সাল পর্যন্তও সুলতান সাহেব ছিলেন মুসলিম লিগার। কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। উনসত্তরে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে সত্তরেই তিনি দলীয় মনোনয়ন পেয়ে যান। দু'দিন আগেও যিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতেন তাঁকেই আওয়ামী লীগের মতো অসাম্প্রদায়িক দল নমিনেশন দিয়ে দেয়ায় সে দলের অনেককেই ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি। কিন্তু ভোটারদের মনে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তারা তখন কোনো বিশেষ প্রার্থীকে চেনে না, চিনতেও চায় না। তারা কেবল চেনে শেখ মুজিব আর তার নৌকা। চুয়ান্ন সালে বলতো হক সাহেবের নৌকা, এবার বলে মুজিবরের নৌকা। সত্তরের নির্বাচনের সময় কিংবা তার পরেও গাঁয়ের লোকের মুখে 'বঙ্গবন্ধু' কথাটা শুনিনি। 'বঙ্গবন্ধু' না বলে তাঁর প্রতি যে তারা শ্রদ্ধা ভালোবাসা কম দেখিয়েছে, তা কিন্তু নয়। তাদের মুখে 'মুজিবর' নামটির দরদভরা উচ্চারণের মধ্যেই এই মানুষটির প্রতি তাদের আপন-জনসুলভ নির্ভরতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। নৌকায় ভোট দিলে সে ভোটটা পেয়ে যাবে মুজিবর—এই ছিলো তাদের সহজ হিসাব। কাজেই কোন প্রার্থীকে তারা ভোট দিচ্ছে, কী তার নাম পরিচয়, এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না।

গাঁয়ের নিরক্ষর কৃষকদের (অর্থাৎ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের) এই সহজিয়া আচরণ ও বিবেচনাকে শহুরে শিক্ষিত মানুষেরা মোটেই ভালো চোখে দেখে না। ওই অশিক্ষিত

মানুষগুলো চলে হুজুগে ভর করে, গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররা যেমন বোঝায় তেমনি তারা বোঝে, রাজনীতির জটিল সূক্ষ্ম বিষয় বুঝবার মতো ক্ষমতা বা যোগ্যতা তাদের নেই—শিক্ষাভিমানী মানুষদের এ-রকমই উন্নাসিক ধারণা।

সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে কিন্তু এদের এ-রকম ধারণার ফাঁক ও ফাঁকিগুলো অতি সহজেই ধরা পড়ে। উনিশ শো সাঁইত্রিশ, ছেচল্লিশ ও চুয়ান্নর নির্বাচনে বাংলার নিরক্ষর কৃষকরা যে যথাক্রমে প্রজাপার্টি, মুসলিম লীগ আর যুক্তফ্রন্টকে ভোটে জিতিয়ে দিয়েছিলো তা কি কেবল হুজুগের বশেই? কিংবা হুজুগই যদি হয়ে থাকে তবে সে হুজুগে কি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ছিলো না? জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার একেকটি বৃহৎ ইস্যুকে কেন্দ্র করেই কি সে হুজুগ সৃষ্টি হয়নি? আর এ ক্ষেত্রে গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বরদের মেনেই কি তারা চলেছে? আমরা তো জানি : গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররা সব সময়েই কায়েমি স্বার্থের ধারক, সাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তাদের অবস্থান। সবগুলো নির্বাচনেই তো কৃষকরা ওই সব কায়েমি স্বার্থবাদী মোড়ল মাতব্বরদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। ওই সব নির্বাচনে একেকটি জাতীয় ইস্যুই প্রধান হয়ে এসেছে, নির্বাচনগুলোর চরিত্র হয়ে উঠেছে রেফারেন্ডামের। কাজেই এ সব নির্বাচনে ভোটারদের কাছে বিশেষ প্রার্থীটির ব্যক্তিগত পরিচয় মোটেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় না, বড়ো হচ্ছে তার দলীয় পরিচয়। আর দলীয় পরিচয়ের প্রতীক হয়ে আসে তার বড় নেতা, সেই নেতাকে লক্ষ করেই তারা ভোট দেয়। তাই সাঁইত্রিশ, ছেচল্লিশ ও চুয়ান্ন—প্রত্যেকবারের নির্বাচনেই তাদের সে সময়কার আস্থাভাজন নেতার কথায় তারা 'কলাগাছে' ভোট দিয়েছে। না কলাগাছ মার্কায় নয়। নেতারা ভোটারদের বলেছেন, 'আমরা যাকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছি সে যদি কলাগাছও হয়, তবু তাকেই আপনারা ভোটটা দেবেন। কলাগাছ হলেও আমাদের কথাতেই সে চলবে-ফিরবে, তাকে ভোট দিলেই আমরা আপনাদের প্রাপ্য আদায় করে দিতে পারবো।'

সত্তরের নির্বাচনেও তারা তাদের নেতা শেখ মুজিবের কলাগাছেই ভোট দিয়েছে। নৌকা প্রতীকটিকেই তারা চিনেছে, অন্য কোনো দিকেই তাকানোর প্রয়োজন মনে করেনি। এ রকম করে যে তারা ভুল করেনি, ইতিহাসই তার সাক্ষী। তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষাভিমানী লোকেরা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পরিভাষা ব্যবহার করে রাজনীতির সূক্ষ্ম জটিলতার বিশ্লেষণ করতে পারেন। অগণিত অনক্ষর কৃষক ভোটাররা তা না পারলেও তাদের নিজেদের স্বার্থটি বোঝার ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাদের আছে, ভোটের বেলায় সেই ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয়ই তারা রাখে।

বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ ছড়ায় বরং শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কিংবা কায়েমি স্বার্থের ধারকদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও তাদের নেতারাই, অশিক্ষিত ও নিঃস্ব নির্যাতিত কৃষকরা নয়। চুয়ান্নর নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেছে যারা তারা কি হুজুগে চলা কৃষক, না মতলববাজ শিক্ষিত নেতা? সত্তরের নির্বাচনেও তো শিক্ষাভিমানীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারাই নানা অভিনব তত্ত্ব হাজির করেছে ও মুখরোচক স্লোগান তুলেছে। নানান কিসিমের ডান-বাম দলের এরাই তো স্রষ্টা। এদের কেউ যেমন বিপ্লবের নামে 'ভোটের আগে ভাত' কিংবা 'ভোটের বাক্সে লাথি মেরে বাংলাদেশ স্বাধীন করার' কথা বলেছে, তেমনি এদেরই অন্যগোষ্ঠী ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়ে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরোধিতা করেছে। ওরাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতা শেখ মুজিবকে ব্যঙ্গ করে বলেছে 'বঙ্গবন্ধুর রঙ্গ দেখে অঙ্গ

জ্বলে যায়', সাম্প্রদায়িক উস্কানি ভরা স্লোগান দিয়েছে 'জয়বাংলা জয়হিন্দ, লুঙ্গি খুইল্যা ধুতি পিন্দ'। ও রকম সকল ডান-বাম গোষ্ঠীর সকল রকম মুখরোচক স্লোগানকে প্রত্যাখ্যান করেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর ভোটাররা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের একশো বাষট্টিটি আসনের মধ্যে একশো ষাটটিতেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে দিয়েছে। অন্য দুটো আসনের একটিতে জিতে যান চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়, আর অন্যটিতে পূর্ব পাকিস্তানের এককালের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন।

তাহলে কি ওই দুটো আসনের ভোটাররা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছিলো? সারা দেশে যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদী নৌকার জোয়ার, তখন সেই জোয়ারের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটাররা কেন ভোট দিলো উপজাতির রাজাকে? আর ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলের ভোটাররা বাঙালির মাতৃভাষার দুশমন ও বায়ান্নর একুশের খুনী নূরুল আমিনকে?

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নেই। তবে অনুমান করতে পারি : ওখানকার পাহাড়ি অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব ও কৃষ্টিগত অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে সংগত কারণেই গুরুত্ব দিয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের জোয়ারে আত্মসমর্পণের আত্মঘাতী নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তাদের রাজাকে ভোট দিয়ে তারা ভুল করেছে, এমন কথা সম্ভবত বলা যায় না।

ময়মনসিংহের নান্দাইলের ঘটনাটিকে মোটামুটি কাছে থেকেই অনুধাবন করবার সুযোগ আমার হয়েছে। নান্দাইলে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিক উদ্দিন ভূইয়া। ভূইয়া সাহেব সংগ্রামী নেতা। এ জেলায় আওয়ামী লীগ দলটিকে গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অবদানের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ভাষা আন্দোলনের জন্যে তিনি কারা নির্যাতনও ভোগ করেছেন। গণমনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও কম ছিলো না। অথচ, নান্দাইলের ভোটাররা তাঁর বদলে নূরুল আমিনকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিলো। এরও কারণ, আমি মনে করি, ভোটারদের ভ্রান্তি নয়। এর আগে প্রতারিত হয়েছে বলেই নেতাদের বিরুদ্ধে নান্দাইলের ভোটারদের প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিলো। চুয়ান্নর নির্বাচনে শেরে বাংলা ফজলুল হক সে সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খালেক নেওয়াজকে 'কলাগাছ' খাড়া করে তাঁর পক্ষে নান্দাইলবাসীদের ভোট চেয়েছিলেন। নান্দাইলের ভোটাররা শেরে বাংলার প্রতি একান্ত স্বাভাবিক ও সংগত আনুগত্য প্রকাশ করে খালেক নেওয়াজকেই ভোট দিয়েছিলো। কিন্তু ভোটে জেতার পর খালেক নেওয়াজ ভোটারদের আস্থার মর্যাদা রক্ষা করেননি। তাঁর দলত্যাগ ও অন্যান্য কার্যকলাপ এলাকাবাসীদের রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো। রোষ ও ক্ষোভ শুধু খালেক নেওয়াজের বিরুদ্ধে নয়, খালেক নেওয়াজদের দল ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও। অন্যদিকে এরই প্রতিক্রিয়া থেকে তাদের মনে নূরুল আমিনের প্রতি সহানুভূতি জন্মে গিয়েছিলো। নূরুল আমিনের মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে চাওয়ার পর যারা ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদের কারো আমলেই এলাকার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি বলে নান্দাইলবাসীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো। এ-রকম নানা ক্ষোভ রোষ ও প্রতিক্রিয়া থেকেই, সারা দেশে নৌকার জোয়ার সত্ত্বেও, সত্তরের নির্বাচনে নান্দাইলের ভোটাররা উল্টোমুখী অবস্থান নেয়। এ-রকম ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্যেও ভোটারদের বুদ্ধি বিবেচনাকে কটাক্ষ না করে রাজনৈতিক নেতাদেরই আত্মসমালোচনার কষ্টি পাথরে নিজেদের যাচাই করে নেয়া উচিত নয় কি?

সত্তরের নির্বাচনে পর্যুদস্ত সাম্প্রদায়িকতা

সত্তরের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের সঙ্গে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন রেডিক্যাল রাজনৈতিক দল ন্যাপের একটি ঐক্যজোট গড়ে উঠকু— আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির এ রকমই প্রত্যাশা ছিলো। ন্যাপও বারবার আওয়ামী লীগকে ঐক্য প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রতিবারই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। আওয়ামী লীগের ডানপন্থীরাই যে ঐক্যের কট্টর বিরোধী ছিলো, সে কথা ঠিক। তবে অন্যরাও যে ঐক্য প্রস্তাবকে সুনজরে দেখেছে, তেমন বলা যাবে না। আওয়ামী লীগে যাঁরা ছিলেন উদারপন্থী বা বামঘেঁষা, আন্দোলনে তারা ন্যাপ-কম্যুনিস্টদের সহায়তা নিতে আগ্রহী ছিলেন। আওয়ামী লীগ দলের অভ্যন্তরেই নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট হবার মতো বহু লোক ছিলো, নিজেদের মধ্যেই দলের মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে কম গুঁতোগুতি চলছিলো না। এর ওপর যদি অন্য দল এসে প্রার্থী পদে ভাগ বসায় তবে সমস্যা আরো প্রকটই হয়ে উঠবে। কাজেই ঠেকাও ন্যাপ-কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য।

আওয়ামী লীগের মূল নেতাদের ঐক্যভীতি অবিশ্যি অন্য কারণে। অন্য দলের সঙ্গে নির্বাচনী মোর্চা করা মানে সেই দলের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েই মোর্চার প্রার্থী পদে মনোনয়ন দেয়া। এমনটি করলে আওয়ামী লীগ বহির্ভূত অন্যদলের সদস্যটির ওপর তো আওয়ামী নেতা নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ফলাতে পারবে না। আওয়ামী লীগের মতো বড়ো ও রমরমা অবস্থার একটি দলের নেতারা এমনটি মেনে নেবেন কেন? এছাড়া তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে যে রকম গণজোয়ার জাগতে শুরু করেছে তাতে আওয়ামী লীগ একাই অনায়াসে নির্বাচনী দরিয়া পার হয়ে যেতে পারবে, অন্যকে সঙ্গে নেয়ার কোনো প্রয়োজনই পড়বে না। এ সুযোগে অন্য অন্য দলগুলোকে দুর্বল করে দিয়ে আওয়ামী লীগকে আরো শক্তপোক্ত করে তোলার চেষ্টা করাই বরং বুদ্ধিমানের কাজ। তাই, শেখ মুজিব একদিন তো ন্যাপ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেই ফেললেন, 'একটি দল ঐক্য ঐক্য করে আমার মাথা খারাপ করে ফেলছে। অতোই যদি ঐক্যের শখ তো ওরা সাইনবোর্ড বদলে আওয়ামী লীগে চলে এলেই পারে।'

ন্যাপের জন্যে কথাটা খুবই কঠোর ও অপমানজনক ছিলো সন্দেহ নেই। তবু তার পক্ষে সেদিন তা হজম করা ছাড়া উপায় ছিলো না।

শেষ পর্যন্ত, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি সাধারণ সমর্থন জানিয়েও, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকটি আসনে ন্যাপ তার নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলো আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন নিয়েই। ন্যাপের নির্বাচনী প্রতীক হলো কুঁড়েঘর। ময়মনসিংহ সদর থানার নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপের টিকিটে প্রার্থী হলেন দীর্ঘকালের পোড় খাওয়া কম্যুনিস্ট কমরেড আলতাব আলী। এই এলাকায় জাতীয় পরিষদের আসনেও আওয়ামী লীগের বদলে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের শ্রীমনোরঞ্জন ধরকে ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থন জানালো। আলোকময় নাহা ও আমি তার মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব ও সমর্থক হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলাম। শুধু আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ও সমর্থক হওয়াই নয়, মনোরঞ্জন ধরের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে আলোকময় ও আমি দু'জনই কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম। ময়মনসিংহ সদর ও ত্রিশালের নির্বাচনে ত্রৈলোক্য মহারাজের সমর্থনে গাঁয়ের হাটে-বাজারে চোঙা ফুঁকেছি; আর

ষোলো বছর পরে, সত্তরে, ময়মনসিংহ শহরে ত্রৈলোক্য মহারাজের মতোই আরেকজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর পক্ষে প্রচারে নেমে খুবই আনন্দ ও গৌরব বোধ করলাম। আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করতাম শেখ মুজিব কি ময়মনসিংহের এই আসনটিতে সৈয়দ আবদুস সুলতানকে দাঁড় না করিয়ে এটি মনোরঞ্জন ধরকে ছেড়ে দিতে পারতেন না? এতে কি মুজিবের বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হতো, না জোরদার হতো? মনোরঞ্জন ধর তো শুধু ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামেরই সৈনিক নন, পাকিস্তানি অমানবিক শাসনের বিরুদ্ধেও তো তিনি চব্বিশটি বছর ধরে অবিরাম সংগ্রাম করে এসেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভার সদস্য হিসেবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তার একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কে অস্বীকার করতে পারবে? এ দেশের সকল হিন্দুর মতো 'ভারতের দালাল'—বারবার এই কটাক্ষের শিকার হয়েও তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ভারতে পাড়ি জমাননি। অথচ স্বাধীনতা-সংগ্রামী এই মানুষটি ভারতে চলে গেলে স্বস্তি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা—সবই একান্ত অনায়াসে পেতে পারেন। তার বদলে তিনি নিজের জন্মভূমিকে একটি সভ্য ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয়ে নানা অপবাদ ও নির্যাতন সয়ে গেছেন, বারবার কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন যে সুদূরপ্রসারী লক্ষকে সামনে রেখে, সেই লক্ষ সাধনেই তো মনোরঞ্জন ধর জীবনভর ব্রতী থেকেছেন। শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে এলে মনোরঞ্জন ধর তাকে অভিনন্দিত করে যে তারবার্তাটি পাঠিয়েছিলেন তার ভাষা ছিলো একান্ত উষ্ণ ও হৃদ্য।

যাই হোক, মনোরঞ্জন ধর নির্বাচনে ন্যাপ-কম্যুনিস্টদের সমর্থন পেলেন। কিন্তু তাদের সে সমর্থনেও যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিলো। পার্টি কেন্দ্রের অনুমোদন নিয়েই তারা তাকে সমর্থন জানিয়েছিলো স্থানীয়ভাবে—কেন্দ্রীয়ভাবে নয়। অর্থাৎ ময়মনসিংহে ন্যাপ-কম্যুনিস্টদের কর্মি-সমর্থকরা স্থানীয়ভাবে মনোরঞ্জন ধরের জন্যে কাজ করবে, কিন্তু তার সঙ্গে নির্বাচনী মৈত্রীটা আনুষ্ঠানিক হবে না, পার্টির পক্ষ থেকে তা প্রচারও করা হবে না—আমাদের এ রকম পার্টি-সিদ্ধান্তই জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এটিও এক ধরনের লুকোচুরিই বলা যায়—বামপন্থী লুকোচুরি! এ রকমটি কেন করা হয়েছিলো তা নেতাদের জিজ্ঞেস করেও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আত্মগোপনকারী পার্টি নেতা কমরেড জ্যোতিষ বোসের সঙ্গে এ সময়ে কয়েকবারই আমার দেখা হয়েছিলো। তিনিও আমাকে পার্টির সিদ্ধান্তটিই শুধু জানিয়ে দিয়েছেন, এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি।

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব বাস্তবে ছিলোই না। এককালের ডাকসাঁইটে কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর নিজের ও অন্য কয়েকজন প্রার্থীর পক্ষে 'কংগ্রেস' নামটি ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। অবশ্যি সত্তরের নির্বাচনের কিছুদিন আগেই একটি সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস দলটির আনুষ্ঠানিক পুনরুজ্জীবনের কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে কংগ্রেসের জন্যে 'কলস' প্রতীকটিও মঞ্জুর করিয়ে রেখেছিলেন। ছেচল্লিশেও কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক ছিলো 'কলস'। সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ এ দলের ঘোষিত আদর্শ হলেও, সত্তরেও, মুষ্টিমেয় কিছু 'হিন্দু' ছাড়া কংগ্রেসের অন্য কোনো সদস্য ছিলো না। অর্থাৎ বাস্তবে এটি একটি অতি ক্ষুদ্র হিন্দু সংগঠনেই পরিণত হয়েছিলো।

এরপরও কিন্তু ময়মনসিংহে মনোরঞ্জন ধরের নির্বাচন প্রার্থী হওয়া নিয়ে অনেক রকম প্রশ্নই উঠেছিলো। প্রশ্নগুলো একদিকে তুলেছিলো আওয়ামী লীগ, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দলগুলো।

আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিলো ন্যাপ-কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। ন্যাপ-কম্যুনিস্ট সমর্থকদের সকল ভোট এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট পেলে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরই ভোট কমে যাবে, জিতে যাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ-বিরোধী সাম্প্রদায়িক দলের কোনো প্রার্থী। ন্যাপ-কম্যুনিস্টরা এভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে না লাগলেই কি পারতো না? আর লাগাবেই বা না কেন? ওরা তো আসলে দেশ-জাতি নিয়ে ভাবে না। ওরা হলো গিয়ে রাশিয়ার দালাল। রাশিয়ার নির্দেশেই ওরা সবকিছু করে। বাঙালি জাতি ধ্বংস হয়ে গেলে ওদের কী?

সাম্প্রদায়িক দলগুলোর ভাবনা অন্যরকম। তাদের আশংকা : মুসলমানদের ভোটগুলো নানা দলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে, আর হিন্দুরা একচেটিয়া আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে দেবে। এটি তো ভারতীয় চক্রান্তেরই অংশ।

কিন্তু নির্বাচনের দিন যতো এগিয়ে আসতে লাগলো ততোই দেখা গেলো যে, বিপুল সংখ্যক সাধারণ ভোটার সবরকম সাম্প্রদায়িক বিবেচনাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। শেখ মুজিব, নৌকা আর 'জয়বাংলা'—এছাড়া অন্য কোনো চিন্তা তাদের মাথায় নেই। নৌকায় ভোট দিলে দেশটি 'হিন্দুস্থান' হয়ে যাবে—এরকম প্রচার মুসলমান ভোটারদের মনে কোনো বিকার সৃষ্টি করতে পারলো না। মনোরঞ্জন ধর হিন্দু, কাজেই আমাদের ভোটটা তার কলস মার্কাতেই দিতে হবে—এরকম চিন্তায় হিন্দু ভোটাররা আক্রান্ত হলো না। বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সৈয়দ আবদুস সুলতান যে জিতে গেলেন তাতে যেমন ভোটারদের রাজনৈতিক বিবেচনাটাই ছিলো প্রধান, তেমনি হেরে গেলেও মনোরঞ্জন ধর যে ভোটগুলো পেলেন তাতেও সেই ভোটারদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটিই কার্যকর ছিলো। সাম্প্রদায়িক ভাবনা এখানে সামান্যতম প্রভাবও খাটাতে পারেনি। সত্তরের নির্বাচনে এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিলো।

তবু যেমন ময়মনসিংহে তেমনি সারাদেশেই—সাম্প্রদায়িক দলগুলো তাদের পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলো না। তাদের পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ে বস্তুনিষ্ঠতার বদলে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবনাকেই আঁকড়ে ধরলো। 'মুসলমান নয়, হিন্দুদের ভোটেই আওয়ামী লীগ জিতেছে' এরকম মূঢ় সিদ্ধান্তের কোলে আত্মসমর্পণ করে তারা আত্মগ্লানির হাত থেকে বাঁচতে চাইলো, হিন্দু ও মুসলমান ভোটারদের সংখ্যার অনুপাতটির দিক থেকে পর্যন্ত চোখ ফিরিয়ে রাখলো।

সত্তরের নির্বাচনের তাৎপর্য

মনোরঞ্জন ধর নির্বাচনে জয়লাভ করুন—সত্তরে সারা মনপ্রাণ দিয়ে এমনটিই কামনা করেছিলাম। তাই তাঁর পরাজয় স্বভাবতই আমাকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলো। তবে নির্বাচনের সার্বিক ফলাফলে দুঃখের চেয়ে আনন্দই পেয়েছিলাম বেশি। আনন্দের প্রধান কারণ অবশ্যই, আগে যেমন বলেছি, নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার পরাভব। বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি প্রবল আবেগ সেদিন জনসাধারণকে অধিকার করেছিলো। সে আবেগ মোটেই নেতিবাচক ছিলো না। কিংবা হঠাৎ করেই যে একটা যুক্তিহীন আবেগ তখন বাঙালিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, তাও নয়। অত্যন্ত ধীর লয়ে, দীর্ঘ দিনের পরিসরে, অভিজ্ঞতায় পোড় খেয়ে খেয়ে এই জাতীয়তাবাদী আবেগটি তার সত্তায় ধারণ করে সত্তরের নির্বাচনকালে বাঙালি নতুন

প্রত্যয়ে জেগে উঠেছিলো। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শীর্ষক প্রচারপত্রটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতরকার যে বৈষম্যের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছিলো তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বিক্ষোভের সুস্পষ্ট প্রকাশ ছিলো, সে বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে হিসেবের পাওনা বুঝে নেয়ার প্রত্যয়ও ছিলো। তবু সে প্রত্যয় তখনো যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করার পর্যায়ে উঠে যায়নি—সে কথাটিও মনে না রাখলে চলবে না। নির্বাচনের সময়েই এখানকার সকল মানুষ পাকিস্তানের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলো এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যেই নৌকায় ভোট দিয়েছিলো—এমন কথা যদি বলি তবে তা হবে নিতান্তই অতিকথন। পাকিস্তান তার নিজের জায়গায় থাকুক আপত্তি নেই। কিন্তু বাঙালির স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা চাই-ই। সত্তরের নির্বাচনে এই ছিলো সেদিনকার পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের মানুষের মনোভঙ্গি। তবে এই মনোভঙ্গির নিভৃতেই যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটিও অঙ্কুরিত হচ্ছিলো, তাও অস্বীকার করতে পারবো না। নির্বাচনের পর যখন স্বাধিকারের দাবিটি পাকিস্তান একেবারেই অস্বীকার করে বসেছিলো, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'র মতো মনোভাব জানিয়ে দিয়েছিলো, তখনই স্বাধিকার-কামনার যবনিকা ভেদ করে বাঙালি স্বাধীনতার পতাকা হাতে বেরিয়ে আসে।

নির্বাচনের সময়েই জনগণকে এভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সত্তরের নির্বাচনটিকে তিনি ভোটারদের সামনে ছয় দফার পক্ষে বা বিপক্ষে রেফারেন্ডাম রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ জনগণকে তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন যে, আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ঘটলেই ছয় দফা কার্যকর হবে, ছয় দফা কার্যকর হলেই বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। এর অন্যথা হলে বাঙালির সামনে আর কোনো আশা-ভরসা থাকবে না।

শুধু ছয় দফা নয়। ছয় দফার ভিত্তিতে স্বাধিকার অর্জিত হয়ে যাবার পর কী হবে—সে প্রশ্নেরও জবাব বঙ্গবন্ধু বাঙালি জনগণের সামনে রেখে দিয়েছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি যে ছাত্রদের এগারো দফার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তা থেকে পিছু হটে তো যানইনি, বরং নির্বাচনী ওয়াদায় সে সমর্থনটিকে আরো দৃঢ় ও স্পষ্ট করে তুললেন। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি—এরকম সব সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসার ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করলেন।

ছয় দফা কিংবা এগারো দফার কোনোটিতেই ছিলো না এমন কতকগুলো দাবিও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করা হয়েছিলো। এ ইশতেহারে প্রশাসনের গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে বলা হয়েছিলো যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস বিলুপ্ত করা হবে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিটি প্রদেশে নিযুক্তির ব্যবস্থা চালু করা হবে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জেলা প্রশাসন গঠন করা হবে, সবগুলো মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে সেগুলোকেই প্রশাসনের মূলকেন্দ্র রূপে গড়ে তোলা হবে। 'মানুষের ওপর মানুষের শোষণ' বন্ধ করার জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের অঙ্গীকারের কথাও ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণ এবং 'সরকারি বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারিদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার' কথাও বলা হয়।

এমনকি বঙ্গবন্ধু নিজেকে একজন 'সমাজতন্ত্রী' বলেও ঘোষণা করেন। অর্থাৎ যে কোনো প্রগতিকামী বাঙালি একটা নির্বাচনের মধ্যদিয়ে যতোটুকু প্রাপ্তির আশা করতে পারে, তার প্রায় সবটুকুই বঙ্গবন্ধু তার দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রকাশ করে

ফেলেছিলেন। কাজেই অধিকতর প্রগতিশীল ও বাস্তববাদী কোনো কর্মসূচি হাজির করে আওয়ামী লীগের মতো একটি বৃহৎ দলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা সে সময়ে এখানকার কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীরই ছিলো না।

এ রকম অবস্থার মুখোমুখি হয়েই বিভিন্ন গোষ্ঠীর পিকিংপন্থীরা নির্বাচনে পিঠটান দিলো এবং 'বুর্জোয়া' নির্বাচনের বিরুদ্ধে নানা মার্কসীয় বাক্যগুচ্ছ আউড়িয়ে নিজেদের অক্ষমতাকে আড়াল করতে চাইলো। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি কিংবা মুজিবের মুখে সমাজতন্ত্রের কথা নিয়ে ওরা নেতিবাচক ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মেতে উঠলো।

অন্যদিকে, মস্কোপন্থী নামে পরিচিত দল ও গোষ্ঠীগুলো আওয়ামী লীগ ও মুজিবের প্রগতিমুখী বক্তব্যকে একান্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এর বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেছিলো। তারা জানতো : আওয়ামী লীগ মূলত বাঙালি ধনিক গোষ্ঠীর দল এবং ধনিক মানেই শোষক এবং সে কারণে সর্বহারা মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে তারা অন্যান্য শোষক শ্রেণীগুলোর সঙ্গে আপসে দ্বিধা করে না এবং সংগ্রামে থাকে দোদুল্যমান। তবু কথিত মস্কোপন্থীরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানিয়েছিলো। পিকিংপন্থীদের নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করার অপবাদ মাথায় নিয়েও তারা সেই সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়নি। কারণ, ইতিহাসের হাতে-মার-খাওয়া বাঙালি বুর্জোয়াদের দল আওয়ামী লীগের বিশেষ সময়কার প্রগতিশীল ভূমিকাটিকে তারা শনাক্ত করতে পেরেছিলো। তা' পেরেছিলো বলেই ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মূল্যায়ন করে তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) তাই বলে, 'এগারো দফা কর্মসূচি হলো মূল বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কর্মসূচি। এক্ষেত্রে এগারো দফা কার্যকর করণের প্রশ্নে তাই বিপ্লবী লক্ষের স্বার্থ হতেই বড়ো ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের সঙ্গে দরকার মতো সহযোগিতা ও ঐক্য কায়েমের নীতি অনুসরণ করা এখনকার একটি কর্তব্য।' এই কর্তব্যবোধ থেকেই সত্তরের নির্বাচনে ন্যাপ কম্যুনিস্টরা আওয়ামী লীগকে সক্রিয় সমর্থন জানায়। তবে আওয়ামী লীগের শ্রেণীচরিত্র ও সে দলের মনোনীত অনেক প্রার্থীর প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলো। এর বিরুদ্ধে একটি কার্যকর প্রতিরোধও ন্যাপ-কম্যুনিস্টরা তৈরি করতে চেয়েছিলো। তাই কতকগুলো আসনে তারা নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো এবং কিছু আসনে মনোরঞ্জন ধরের মতো ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলো। কিন্তু ন্যাপ-কম্যুনিস্টদের এই অবস্থানটির সমর্থনে ভোটাররা এগিয়ে আসেনি। ময়মনসিংহেই দেখলাম, জাতীয় পরিষদের আসনটিতে মনোরঞ্জন ধর আর প্রাদেশিক পরিষদেরটিতে আলতাব আলী নির্বাচিত হতে পারলেন না, দুটোতেই বিপুল সংখ্যায় ভোট পেলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। তাই বলে ভোটাররা যে মনোরঞ্জন ধর কিংবা আলতাব আলীর মতো ত্যাগব্রতী ও স্বদেশপ্রেমিক মানুষগুলোকে নস্যাৎ করে দিলো, তাও কিন্তু নয়। এদের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীরা এদের সম্পর্কে নানা কুৎসা রটনা করেছে, অনেক নোংরা কথাও বলেছে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক সাধারণ ভোটার এ সব নোংরামির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেনি। তাদের অনেককে বরং বলতে শুনেছি যে, 'এই ভালো মানুষগুলো নৌকা মার্কা না নিয়ে অন্য মার্কায় দাঁড়ালো কেন? এরা যদি নৌকা মার্কা নিতো তাহলে তো আমাদের সবার

ভোটগুলোই পেয়ে যেতো, দেশের কতো ভালো হতো।' কেউ কেউ এমনো বলেছে, 'এবার ওরা ভোট না পাক, পরেরবার আমরাই তাদের ভোট দেবো। এবার মুজিবুরের নৌকাটারই জেতা দরকার।' 'কেবল নৌকা দিয়া কাম অইবো না, এরপরে আইতাছে কুড়ে ঘর। হেই কুঁড়েঘরই গরিব মাইনসেরে সুখ দিবো।'—এ রকম কথা আমি গ্রামের বেশ কিছু কৃষকের মুখেই শুনেছি। অথচ, যারা এ রকম বলেছে তারাও সত্তরে কিন্তু কুঁড়েঘরে নয়, নৌকা মার্কাতেই ভোট দিয়েছে। আশা করে থেকেছে, মুজিবুরের 'নৌকা' এমন একটা 'জয়বাংলা'র প্রতিষ্ঠা করবে, যে জয়বাংলায় অনায়াসে কুঁড়েঘরের মানুষরাই রাজত্ব করবে। 'জয়বাংলা' শব্দটা তাদের কাছে ছিলো একান্তই ব্যঞ্জনাগর্ভ। এই ব্যঞ্জনার সঠিক অর্থ ভদ্রলোকের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা কঠিন। তথাকথিত ভদ্রলোকের বৃত্তসীমার বাইরে মানুষরা সত্তরে-একাত্তরে পাগলের মতো যে 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়েছে সে জয়বাংলার অর্থ কোনো অভিধানে লেখা নেই। এর অর্থ তারা ঠিক করে নিয়েছে তাদের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, স্বপ্ন আর উল্লাস দিয়ে। যদিও এর পরবর্তীকালের রাজনীতি কৃষক জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেনি, রাজনীতিকদের কার্যকলাপই তাদের কল্পনার মূলোচ্ছেদ করেছে, তাদের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তাদের উল্লাসকে বিষাদে পরিণত করেছে। তবু সত্তরের নির্বাচনের সময় সাধারণ মানুষদের সরল অভিব্যক্তির কথা শুনতে শুনতে নিরক্ষর জনগণের বিচারবুদ্ধির ওপর আমার আস্থা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। বুঝেছি : আমরা শিক্ষাভিমানী মানুষরা আমাদের প্রচণ্ড রাজনৈতিক পাণ্ডিত্য দিয়ে নানা কূটতর্ক করেও যে সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হই, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবর্জিত জীবনবাদী সাধারণ মানুষগুলো তাদের নিজের মতো করে নিজের ভাষায় তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝে নেয়, এবং সেই অনুযায়ী তাদের কর্তব্য করে। তাই, যখন দেখি যে, দীর্ঘকালের সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার সাধারণ হিন্দু ভোটাররাও মনোরঞ্জন ধরের বদলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সৈয়দ আবদুস সুলতানকেই বেছে নিলো, তখন আমার আকাঙ্ক্ষার পরাভবের দরুন মনে আঘাত পেলেও জনগণের বিচারশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে পারিনি। সব রকম গোষ্ঠী স্বার্থের চিন্তা এক পাশে সরিয়ে রেখে বাঙালিত্বের মর্যাদাকেই সেদিনের মতো তারা সর্বসাধ্যসার করে নিয়েছিলো বলেই দেশ তখন একটা প্রচণ্ড সংঘশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে পেরেছিলো। সেই শক্তি বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে দারুণ আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলো। সকল মানুষের যেন রাতারাতি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে যায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি বাঙালির নিরঙ্কুশ সমর্থন এই দলটিকে বিশেষ দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। ওয়াদা খেলাপের যে 'ঐতিহ্য' আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের আছে, সে ঐতিহ্য অনুসরণ করা যে এবার আর সম্ভব হবে না তা আওয়ামী নেতারা বুঝে ফেলেন। বঙ্গবন্ধু সে বিষয়টি তার দলের বিজয়ী প্রার্থীদের আরো ভালো করে বুঝিয়ে দেন একাত্তরের তেসরা জানুয়ারিতে রমনা রেসকোর্সের এক বিশাল জনসমাবেশে। ছয় দফা নির্বাচনী ওয়াদাকে তিনি পবিত্র ওয়াদা বলে ঘোষণা করেন। তিনি যদি এ ওয়াদা খেলাপ করেন তবে তাকে 'জীবন্ত মাটিতে পুঁতে' ফেলার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান কানান। জনগণের সামনে নেতার এ রকম ঘোষণার পর তার দলের নির্বাচিত প্রার্থীদের পক্ষে ওয়াদা খেলাপ করার আর কোনো পথ খোলা থাকে না। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতারা যেমন ছয়দফা ভিত্তিক সংবিধান রচনার পক্ষে আপসহীন প্রত্যয় ঘোষণা করেন, তেমনি রেডিক্যাল ছাত্রসংগঠন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ইউনিয়ন(মতিয়া গ্রুপ)ও বিশেষ জরুরি কাউন্সিল ডেকে দাবি জানায় যে,

'পাকিস্তানে যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডারেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দিতে হইবে।' এরকম দাবি তো স্পষ্টতই স্বাধীনতার দাবি। ছাত্র ইউনিয়ন এ দাবি উত্থাপন করে একাত্তরের ফেব্রুয়ারির চৌদ্দ তারিখ। এর আগের দিনই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন যে, মার্চের তিন তারিখে ঢাকায় নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। অথচ সে ঘোষণার একদিন পরই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখে, পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পেশোয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান যে, তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় যাবেন না।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতার এই অস্বীকৃতি পূর্ব পাকিস্তানে স্বভাবতই প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সে প্রতিক্রিয়ার বিবরণ সে সময়কার পত্রপত্রিকার পাতা থেকে তুলে এনেছেন ডক্টর মোহাম্মদ হান্নান তার *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* দ্বিতীয় খণ্ডে আছে এর প্রামাণ্য নিদর্শন। আরো অনেক লেখক তাদের লেখায় সে সময়কার অবস্থার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। আমি আর সে সবের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি মফস্বল শহরের বাসিন্দা। রাজধানী ঢাকা নগরীর প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে সে বছরের একুশ ফেব্রুয়ারিতে ময়মনসিংহ শহরের জনতার যে বিদ্রোহ বিক্ষোভের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলাম তা থেকেই ভবিষ্যত সংগ্রামের ছবিটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো।

'স্বাধীনতা' এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো?

একাত্তরের মার্চের তিন তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে বলে ইয়াহিয়ার ঘোষণা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। ভুট্টোর মতিগতি দেখে সন্দেহ হচ্ছিলো যে, অধিবেশন হয়তো নাও বসতে পারে। সারাদেশে একটা 'কী হয়, কী হয়' ভাবনা। তবু মানুষ আশা ছাড়েনি। এখানকার গণপ্রতিনিধিরাও ছয়দফাভিত্তিক সংবিধান রচনার প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন। 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'র স্লোগান আকাশে-বাতাসে রণিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু এখানকার মাটি থেকে পাকিস্তানের উচ্ছেদ হয়েই যাবে—এ রকম ভাবনা, তখনো, একেবারে নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠেনি। ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন না বললেও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা তার সঙ্গে একমত হননি। তারা অনেকেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন, তাকে সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন। এমন কি স্বয়ং ইয়াহিয়া খানও শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে উল্লেখ করেছেন। তবু, এর পরও, ফেব্রুয়ারির ছাব্বিশ তারিখে তেসরা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল হয়ে গেছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্যি আটাশ তারিখের দৈনিক *পাকিস্তান*-এর 'সর্বশেষ খবর' কলামে জনগণকে আশ্বস্ত করা হয় যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়নি, মার্চের তিন তারিখেই ঢাকাতে এ অধিবেশন বসবে, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সব দলের সঙ্গে ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও তার পূর্ব ঘোষণার পুনর্বিবেচনা করে অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। আর এদিকে, সাতাশে ফেব্রুয়ারিতে, আওয়ামী লীগের পার্লমেন্টারি পার্টির বৈঠকে পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া পেশ করা হয়ে

গেছে। মুজিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে বৈঠকে সংবিধানের খসড়াটি পাঠ করে শুনিয়েছেন ডক্টর কামাল হোসেন। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে যাবে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়াই বাঙালি স্বাধিকারের স্বাদ উপভোগ করবে, জয়বাংলা আর জয় পাকিস্তান একই সঙ্গে উচ্চারণে কোনো বাধা থাকবে না—একাত্তরের ফেব্রুয়ারির শেষ দিনটি পর্যন্ত, নানা রকম সংশয় ও আশঙ্কা সত্ত্বেও, সর্বসাধারণের মধ্যে মোটামুটি এ রকম ধারণাই বহাল ছিলো।

সবই ওলোট পালোট হয়ে গেলো মার্চের প্রথম দিনে। সেদিন দুপুরে রেডিও পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়া সংক্রান্ত ইয়াহিয়া খানের বিবৃতিটি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা স্টেডিয়ামে কি রকম তুলকামাল কাণ্ড ঘটেছিলো সে খবর পত্রিকার পাতায় পড়েছি, নিজ চোখে দেখিনি। তবে এ খবর ময়মনসিংহ শহরে এসে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গী মিছিলগুলো রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়েছিলো সেগুলো দেখেছি। আওয়ামী লীগের নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তখন ঢাকায়। জাতীয় নেতা হিসেবে অনেক বড়ো ও কঠিন দায়িত্ব নেয়ার জন্যে তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ময়মনসিংহ শহরে আছেন রফিক উদ্দিন ভূইয়া। নির্বাচনী যুদ্ধে তিনি যদিও নুরুল আমিনের হাতে 'পরাজিত' হয়েছেন, তবু সারা ময়মনসিংহ জেলায় আওয়ামী লীগের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। আর একাত্তরের মার্চে শুধু আওয়ামী লীগের নন, বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামেরই অন্যতম নেতৃপদে তিনি আসীন। তাই টাউন হলের সামনে তিনি যখন নিজ হাতে আগুন ধরিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাটি পুড়িয়ে ফেলেছেন, তখন এর প্রতীকী তাৎপর্যটি অনেক বড়ো হয়ে দেখা দিলো।

পাকিস্তানবাদী দক্ষিণপন্থী দলগুলো তখন একেবারেই কোণঠাসা। ওরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার কথাটিও খুব জোরেশোরে বলতে পারছিলো না, কারণ তা বললে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করা হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলার হিম্মৎ সে সময়ে কারো ছিলো না। তাই দক্ষিণপন্থী নেতারা শেখ মুজিবের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে ভুট্টোকে অনুরোধ জানিয়ে চলছিলেন। তারা আশা করছিলেন যে ভুট্টো-মুজিবের সহযোগিতায় যদি ছয়দফা ভিত্তিক সংবিধানও গৃহীত হয়, তাহলেও পাকিস্তান কোনো রকমে টিকে যাবে। অধ্যাপক মোজাফরের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী ন্যাপের যদিও আদর্শগতভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের কথা নয়, তবু তখনো, একাত্তরের মার্চের প্রথম সপ্তাহেও, সোজাসুজি বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলতে ন্যাপও এগিয়ে আসেনি। একটা দ্বিধা বোধ হয় তার রয়েই গিয়েছিলো। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সে আন্দোলন মাঝপথে আপসের চোরাবালিতে হারিয়ে যাবে কি-না, এমন প্রশ্নও সন্দেহে তারা দীর্ণ হচ্ছিলো। তা ছাড়া এ আন্দোলনের নেতারা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা নিয়ে অগ্রসর হবে, না সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নামবে—সে প্রশ্ন ও ছিলো। গোপন কম্যুনিস্ট পার্টিও এসব বিবেচনায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো।

কিন্তু মার্চের প্রথম দিন থেকেই জনসমুদ্রে জাগলো বাঁধভাঙা জোয়ার। রাজনৈতিক দলের আদেশ-নির্দেশের জন্যে জনতা আর তখন বসে থাকতে রাজি নয়। সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীকে অনেক পেছনে ফেলে জনতার মিছিল অনেক সামনে এগিয়ে এসেছে। পাকিস্তানের নামনিশানা মুছে না যাওয়া পর্যন্ত এ মিছিল থামবে না। ছয়দফা এখন অতীতের ব্যাপার। এখন শুধু একটাই লক্ষ্য—স্বাধীন বাংলাদেশ। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

জন-উত্থানের এই প্রবলতার মুখে বুদ্ধিজীবীরাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। ঢাকার মতো ময়মনসিংহের বুদ্ধিজীবীরাও গণসংগ্রামের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত হওয়ার তাগিদ অনুভব

করলেন। ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের তৎকালীন সম্পাদক সৈয়দ আহমদ বুদ্ধিজীবীদের একটা সভা ডাকলেন। সেই সভাতেই গঠন করা হলো 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির'। এই সংগঠনটিতে ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই প্রাধান্য ছিলো। কয়েকজন সাংবাদিক, উকিল, ডাক্তার ও বেসরকারি চাকুরেও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। একাত্তরের মার্চের সেই বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের কথা উঠলেই আমি একান্ত স্মৃতি-তাড়িত হয়ে পড়ি। খুব বেশি করে মনে পড়ে গোলাম সামদানী কোরায়শী, আলোকময় নাহা আর ডক্টর মোস্তফা হামিদ হোসেন—আমার এই তিন জন প্রয়াত সুহৃদের কথা। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাংলার অধ্যাপক ছিলেন আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শামসুজ্জামান খান। বর্তমানে (১৯৯৬) তিনি বাংলা একাডেমীর ফোকলোর বিভাগের পরিচালক। এই জামান সাহেবের সৃজনশীলতায় বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছিলো। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেকজন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক কবি। গণকবি বলতে যা বোঝায় তিনি আসলে তা-ই। বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের পক্ষে অতি দ্রুত তিনি অনেকগুলো কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। সে সময়ে বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের ব্যানার নিয়ে ময়মনসিংহ শহরে আমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে সভাগুলো করতাম সে সব সভায় কবি অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক উদাত্ত কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। রুশ কবি মায়াকোভস্কির সঙ্গে তুলনা করে আমরা তাকে সে সময়ে রাজ্জাকোভস্কি বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। তাঁর কবিতা ও আলোকময় নাহার দরাজ গলার গান আমাদের পথসভাগুলোর প্রধান আকর্ষণ। এদের কবিতা আর গান দিয়ে মানুষ জড়ো করেই আমরা বক্তৃতা শুরু করতাম। কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অব এগজামিনেশন মোহাম্মদ হোসেন, অধ্যাপক আলি নওয়াজ, শামসুজ্জামান খান, মুক্তাগাছা কলেজের অধ্যাপক সুধীর দাস, মিস্টু কলেজের অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, নাসিরাবাদ কলেজের অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী, রিয়াজুল ইসলাম এবং এরকম আরো কয়েকজন ছিলেন পথসভাগুলোর বক্তা। আমিও বায়সকণ্ঠে সেই মার্চে অনেক পথসভায় শ্রোতাদের কর্ণপীড়া উৎপাদন করেছি।

ময়মনসিংহ বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের সদস্যরা একজন অবাঙালি অধ্যাপককে তাদের মধ্যে পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার এই শ্রুতকীর্তি অধ্যাপকের নাম আশরাফুল হক। অকৃতদার এই জ্ঞানতাপসের জন্মভূমি ছিলো ভারতের উত্তর প্রদেশ। অথচ, বাংলা ও বাঙালিকে তিনি কী গভীরভাবেই না ভালোবেসে ফেলেছিলেন। মার্চের সেই ঝড়ো দিনগুলোতে সংগ্রাম শিবিরের পথসভায় ভাঙা ভাঙা বাংলায় দরদভরা কণ্ঠে তিনি যখন বাঙালির স্বাধিকারের কথা বলতেন, তখন প্রতিটি শ্রোতা তার আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে যেতেন।

আমার সহকর্মি অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান খুব ভালো বক্তা নন। তবে সাংগঠনিক কাজে দক্ষ। সেই দক্ষতা তিনি সংগ্রাম শিবিরের নেতৃত্ব দানে কাজে লাগিয়েছিলেন। সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন আমাদের পীযূষ দাও। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে পীযূষকান্তি ঘোষকে ময়মনসিংহের সবাই চেনে। সেই পীযূষদা এবার দেখালেন যে, শুধু ক্রীড়ায় নয়, সংগ্রামেও তিনি নিষ্ঠাবান।

আমাদের বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরটির জন্ম হয়েছিলো মার্চের সাত তারিখের আগেই, এর কাজকর্মে তীব্র গতির সঞ্চার ঘটলো আট তারিখ থেকে। বলা নিষ্প্রয়োজন : বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণই আমাদের উৎসাহের পালে হাওয়া লাগিয়ে দিয়েছিলো। সাত তারিখ বেলা

দশটায় প্রেসক্লাবে সংগ্রাম শিবিরের একটা সভা করছিলাম। সভায় বসেই শুনলাম, বিকেলে বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেবেন সেটি ঢাকা বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। সে ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন—অনেকেই এরকম বলাবলি করছিলো। আমাদের সভা সংক্ষিপ্ত করে সবাই তাড়াতাড়ি করে ফিরে গেলাম রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনবো বলে। কিন্তু বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত অধীর অপেক্ষা করে যখন দেখলাম যে 'আমার সোনার বাংলা' গানের পর হঠাৎ করে ঢাকা বেতার স্তব্ধ হয়ে গেছে, তখন আমরা যে কী গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় আক্রান্ত হয়ে পড়লাম তা বুঝিয়ে বলা সত্যিই অসম্ভব। আবার পরদিন সকালে যখন রেডিওতে হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর গলা শুনতে পেলাম, আমাদের তখনকার অনুভূতিও অনির্বচনীয়।

আগের দিন, অর্থাৎ সাতই মার্চে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যখন সরাসরি রেডিও থেকে প্রচার করতে দেয়া হলো না, তখনই ঢাকা বেতারের সকল কর্মি বেতার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসেন। জানিয়ে দেন যে, বঙ্গবন্ধুর পুরো ভাষণটি রেডিও থেকে প্রচার করতে না দিলে তারা আর রেডিও স্টেশনে ফিরে যাবেন না। তাদের অনমনীয়তার কাছে নতি স্বীকার করেই কর্তৃপক্ষ আট তারিখ সকালে সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রচার করতে দেয়।

বারান্দায় বসে সপরিবারে রেডিও শুনছিলাম। পাড়ার বেশ কিছু ছেলেমেয়েও জড়ো হয়েছিলো। আজ ভাবি: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে শুনতে সকলের ভেতর কেমন আবেগ-উত্তেজনার কাঁপন দেখা দিয়েছিলো, সকলের চোখ কেমন চক্‌চক্ করে উঠেছিলো, তার একটা চলচ্চিত্র যদি সেদিন রাখতে পারতাম!

'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কী করে আমাদের হলো'—এই নামে নির্মলেন্দু গুণ একটি কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতার সে কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে 'কবি' আর তার সাতই মার্চের সেই ভাষণকে 'কবিতা' আখ্যা দিয়েছেন। কবিতাটি শুরু এরকম—একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্যে অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান-সৈকতে, 'কখন আসবে কবি?'

আর এর শেষের পংক্তিগুলো—একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের, 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি ঃ
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।
'স্বাধীনতা' শব্দটিই শুধু নয়, বলা উচিত, খোদ স্বাধীনতাই-
'সেই থেকে আমাদের'।

অথচ, সেই সত্যটিকে চাপা দেয়ার জন্যে কি প্রাণান্তকর প্রয়াসই-না আজ চলছে। নির্মলেন্দু তাঁর কবিতার তৃতীয় স্তবকে সে কথাটাই বলে রেখেছেন—

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ

কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ....।

'পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'

ময়মনসিংহ শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত সড়কটির ধারেই মেয়েদের হাইস্কুল—মহাকালী পাঠশালা। সামনে উঁচু দেয়াল। সে সময়ে, একাত্তরে মার্চের নয় কি দশ তারিখে, কোনো স্কুল-কলেজেই ক্লাস হচ্ছিলো না। মার্চের শুরু থেকেই চলছিলো সর্বাত্মক অসহযোগ। তবু, ক্লাস চালু না থাকলেও, কোনো মেয়েদের স্কুলের ভেতরে কোনো ছেলের ঢুকে পড়ার কথা নয়। কিন্তু সেদিন দেখলাম বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া অনেকগুলো ছেলে হৈ হৈ করতে করতে মহাকালী পাঠশালা থেকে বেরিয়ে আসছে। সামনের ছেলেটির হাতে একটি ছবি। রাস্তায় নেমেই ছেলেটি ছবিটিকে উপরে তুলে ধরলো। সবাই দেখলাম : ছবিটি জিন্নাহ্ সাহেবের, যাকে গত চব্বিশ বছর আমরা জিন্নাহ্ বলিনি, বলেছি 'কায়েদে আজম', বলেছি 'জাতির পিতা'। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজিত ও উল্লসিত ছেলেরা 'জাতির পিতা'র সেই ছবিটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। টুকরোগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পা দিয়ে মাড়াতে লাগলো। পরে শুনেছি : শহরে যতো স্কুল-কলেজে বা অফিস-আদালতে জিন্নাহর যতো ছবি ছিলো সবগুলোরই একই পরিণতি ঘটেছে।

বুঝতে বাকি রইলো না যে, মুমূর্ষু পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে অক্সিজেন দিয়েও বাঁচিয়ে রাখার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই শহরেরই রাজপথে এর দেড় বছর আগে, সত্তরের আগস্টে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের একটা মিছিল দেখেছিলাম। মিছিলের স্লোগানটি কানে আসতেই রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। রাজপথ কাঁপিয়ে দিচ্ছে কতকগুলো কচিকণ্ঠের ধ্বনি—'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি তুলে নাও তুলে নাও।'

পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়েই ওরা পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি তুলে নিতে বলছে! এ রকম রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলার পরও পাকিস্তানের সদাজাগ্রত প্রহরী পুলিশ-পুঙ্গবেরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না! কী তাজ্জব ব্যাপার! অমন অঘটন ঘটলো কী করে!

পরে বুঝলাম যে, আসলে তারা শুরু করেছিলো এই বলে—'*পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি* বইটি, তুলে নাও তুলে নাও। কিন্তু বারবার এ রকম বলতে বলতে শেষে স্লোগান থেকে 'বইটি' কথাটা বাদ পড়ে যায়, হয়ে যায়—'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি, তুলে নাও তুলে নাও।' স্লোগানটি

শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিলো যে, বাঙালি কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে মুখ ফস্‌কে যে কথাটি বেরিয়ে এসেছে সেটিই তাদের মনের আসল কথা। আসলে তারা শুধু একটি বইকেই তুলে নেবার দাবি করছে না, তাদের দাবি পাকিস্তানকেই তুলে নেয়া। 'পাকিস্তান'—এই দেশ-নামটি বড়ো কৃত্রিমভাবে সোনার বাংলার বুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো, 'পাকিস্তানি কৃষ্টি' নামের একটি অস্তিত্বহীন অপধারণা দিয়ে এ দেশের শিশু-কিশোরদের মস্তিষ্ক কোষ আচ্ছন্ন করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছিলো। তাদের ওই মিছিলের ভাষা ছিলো সেই অপচেষ্টারই প্রতিবাদ, ওতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো ওই দুঃস্বপ্নের দেশ ও কৃষ্টির হাত থেকে মুক্তিলাভের আর্তি।

পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি নামের বইটি স্কুলের ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে চেপে বসেছিলো উনসত্তরের গণআন্দোলনের পরে, ইয়াহিয়ার জঙ্গি হুকুমাতের আমলে। গণআন্দোলনের ধাক্কায় পাকিস্তানের অবস্থা যে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে সে কথা উপলব্ধি করেই রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা বাঙালি ছেলেমেয়েদের কচিমাথায় নতুন করে পাকিস্তানবাদের বীজ রোপণ করার ব্যবস্থা করলেন। সেই ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই রচনা করা হলো *পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি* বইটি, এবং সে বইটি অবশ্যপাঠ্য করা হলো এখানকার হাইস্কুলগুলোর ক্লাস নাইন-টেনে। অবিভক্ত ভারতবর্ষে কীভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিলো, কীভাবে এই মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষায় ও আচরণে নানা অমিল সত্ত্বেও কিভাবে গড়ে উঠেছিলো একটি 'অখণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনা'—সে সব কথাই লেখা ছিলো *পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি* বইটির পাতায় পাতায়।

বইটির লেখক তথা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে 'অখণ্ড' জাতীয়তাবাদী চেতনা' মানে ছিলো ধর্ম—ইসলাম। তাই, বইটিতে লেখা হয়েছিলো—

"...টেকনাফ থেকে তুরখাম পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের প্রায় সকল অধিবাসীই এক ধর্মবিশ্বাসের সূত্রে আবদ্ধ। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হিসেবে পাকিস্তানিরা একটি সুসংহত জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। আর সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নিজস্ব একটি কৃষ্টিগত বুনিয়াদ।....পাকিস্তানের নিজস্ব কৃষ্টিগত বুনিয়াদকে আমরা পাকিস্তানি কৃষ্টি আখ্যায়িত করিতে পারি। এই পাকিস্তানি কৃষ্টি ও সভ্যতার পশ্চাৎপটই দেশের জনগণের মধ্যে সংহতির একটি যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।"

কথাগুলো ছিলো ডাহা মিথ্যা। পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী সিন্ধি-বেলুচ-পাঠানদের ভাব-ভাবনা ও সংগ্রামের প্রসঙ্গ এখানে তুলছি না। বলছি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কথাই। আটচল্লিশ থেকে উনসত্তরের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে তারা বুঝে নিয়েছিলো : পাকিস্তানি জাতি বলে কোনো জাতি নেই, পাকিস্তানি কৃষ্টি সোনার পাথর বাটিরই আরেক নাম। অথচ, উনসত্তরের উথালপাথাল-করা জনউত্থানের পরও পাকিস্তানের শাসকরা মনে করেছিলো যে, 'সুসংহত পাকিস্তানি জাতি'র কল্পকথা শুনিয়েই তাদের কল্পরাষ্ট্রটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তাদের সেই খায়েশ যে পূর্ণ হবার নয়, সে কথাটিই সত্তরের আগস্টে মিছিল করে জানিয়ে দিয়েছিলো সদ্য-জেগে-ওঠা বাঙালি কিশোর-কিশোরীরা। উচ্চকণ্ঠে তারা *পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি* তুলে নেয়ার দাবি জানিয়েছিলো। আর একাত্তরের মার্চে শুধু দাবি নয়, নিজেরাই পাকিস্তানের মূল উপড়ে ফেলার কাজে হাত লাগালো এ রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা

পুড়িয়ে দিয়ে, তথাকথিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে। এ রকম প্রতীকী কাজে বালক-কিশোরদের প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্যে সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষারই দৃশ্যরূপটি ফুটে উঠেছিলো।

সে আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিলো, এমন কি, পাগলদের কথায় ও আচরণেও। তিন-চার বছর ধরেই একটি পাগলকে দেখেছি ছেঁড়া চট পরে শহরের গাঙিনার পার, মদনবাবু রোড ও নতুন বাজারের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কখনো তার হাতে থাকে খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতা, কখনো কোনো মানুষের ছবি। ওগুলো হাতে নিয়ে কী আবোল তাবোল বকতে থাকে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কিংবা বলা উচিত, তার কথা আমরা কোনোদিন বুঝতে চেষ্টা করিনি, মনোযোগ দিয়ে শুনিওনি। পাগলের কথা তো কথা নয়—প্রলাপ। সে প্রলাপে কে কবে মনোযোগ দেয়? কিন্তু একাত্তরের মার্চে সেই পাগলটিও আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিলো। কোথা থেকে সে জোগাড় করে নিয়ে এসেছে পাকিস্তানের জাতির পিতার একটা ছবি, সে ছবির গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে একটি ছেঁড়া সেন্ডেল, একখণ্ড বাঁশের আগায় ছবিটা ঝুলিয়ে নিয়ে সারা শহর জুড়ে হাঁটছে আর অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলে যাচ্ছে—'জিন্নাহ্ সাবের পাকিস্তান, আজিমপুরের গোরস্থান।' কে তাকে এ কথা শিখিয়ে দিয়েছে জানি না। তবে কথাটা যে সে সময়কার নিদারুণ সত্য, তা তো আর অস্বীকার করতে পারি না। আমরা সবাই বলি, 'ছাগলে কী না খায়, পাগলে কী না কয়?' কিন্তু কোন এক রসিক ব্যক্তি যে এর ওপর টিপ্পনি কেটে বলেছিলেন, 'ছাগলে ঘুষ খায় না, আর পাগলে মিছা কথা কয় না'—সে কথা তো মোটেই 'মিছা' নয়। পাগলরাই সত্য কথা বলে, অথবা অজস্র মিথ্যার ভিড়ে যারা সত্য কথা বলে তারাই পাগল।

সেদিন সারাটা দেশই যেন এ রকম পাগল হয়ে গিয়েছিলো, যাকে বলে মুক্তিপাগল। 'পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'—কবিগুরুর এই আহ্বান একাত্তরের মার্চের, বিশেষ করে সাতই মার্চের, আগে এমন করে কোনোদিন সত্য হয়নি। আওয়ামী লীগের বাইরে অন্য অন্য প্রগতিশীল দল ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতা ছিলো সে সবই মার্চের সাত তারিখ থেকে শূন্যে মিলিয়ে যায়। সাত তারিখেই তখনকার নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক অন্যতম রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপের (যার সভাপতি পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ালি খান) পূর্বাঞ্চল শাখা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে প্রস্তাবে ওই দলের কেন্দ্রেরও সায় ছিলো। সাধারণ নির্বাচনে ওই দলটি বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সরকার গঠন করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো এবং নৌকার প্রবল জোয়ারের মুখেও সে দলের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজেই নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক এই দলটির গুরুত্বকে কোনোমতেই অস্বীকার করা চলে না। এ দলটি যখন বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন সেটি হয়ে ওঠে অনেক গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত একটি প্রস্তাব। তাছাড়া নিষিদ্ধ ও আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক দল 'পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি'র পূর্ণ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো এই দলটির (ন্যাপের) প্রতি। মস্কোপন্থী-বলে-পরিচিত এই কম্যুনিস্ট পার্টি যে সেই ছাপ্পান্ন সাল থেকেই বাঙালিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ভেবে আসছে, এবং বাষট্টি সালেই শেখ মুজিবের সঙ্গে এ নিয়ে এ পার্টির নেতাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে—সে সব খবরও আমাদের জানা। তবু সরাসরি স্বাধীনতার কথা বলার উপযুক্ত লগ্ন কোনটি হবে, সে ব্যাপারে

এ দলটি যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলো তাও অস্বীকার করা যাবে না। এবার সেই সিদ্ধান্তহীনতার পূর্ণ অবসান ঘটলো। মার্চের এগারো কি বারো তারিখেই আমরা কম্যুনিস্ট পার্টির একটি ইশতেহার হাতে পেয়ে গেলাম। মার্চের নয় তারিখে প্রচারিত এই ইশতেহারটির শিরোনাম ছিলো 'শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন/গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।' এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলোর শিরোনাম ছিলো এ রকম—'জনগণের দুশমন কাহারা?' 'প্রকৃত মুক্তির লক্ষে অবিচল থাকুন', 'বিভ্রান্ত হইবেন না', 'দৃঢ়সংকল্প বজায় রাখুন', 'ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করুন', 'সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করুন', 'শ্রমিক-কৃষক ভাইরা এগিয়ে আসুন।'

ইশতেহারটির শুরুতেই বলা হয়েছে—"বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এখানে একটা পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও এইজন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন। এই সংগ্রামে জনগণ সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে অসম সাহসিকতার সহিত মোকাবেলা করিতেছেন এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে বুকের রক্ত ঢালিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। কম্যুনিস্ট পার্টি পূর্ববাংলার সংগ্রামী বীর জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে। পূর্ববাংলার কম্যুনিস্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙালিসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবি করিয়া আসিতেছে। পূর্ববাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ববাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে দাবি উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহাকে ন্যায্য মনে করি, তাই পূর্ববাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরাও সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।"

পার্টির 'কুরিয়ার' মারফৎ এই ইশতেহারটি যেদিন হাতে পেলাম সেদিন সত্যি সত্যিই আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিয়েছিলাম। এর আগে পার্টির ময়মনসিংহ জেলা কমিটির নেতা জ্যোতিষ বোসের সঙ্গে আমাদের (আমার এবং 'পার্টি গ্রুপ'-এর অন্য সদস্যদের) কয়েকবার গোপন সাক্ষাত হয়েছে। স্বাধীনতা সম্পর্কে পার্টি কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দেয়ায় জ্যোতিষদার কাছে প্রতিবারই আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। জ্যোতিষদা অনেক তত্ত্বকথার অবতারণা করে পার্টির অবস্থান সম্পর্কে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমরা বুঝ মানিনি। সারাদেশের মানুষ যখন 'স্বাধীনতা' ছাড়া অন্য কোনো কথাই শুনতে চায় না, তখন কম্যুনিস্ট পার্টির এই 'তত্ত্বের কচকচানি' যে আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, এ রকম কথা বলে আমরা জ্যোতিষ দা'কে রাগাতে চেষ্টা করেছি। তিনি রাগেননি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত যে প্রায় আমাদেরই মতো, এ কথা তাঁর কথাবার্তায় বের হয়ে এসেছে। তবু পার্টির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের সংযত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন।

ইশতেহারটি পেয়ে আমাদের ক্ষোভের অবসান হলো। প্রচণ্ড উৎসাহে স্বাধীনতার কথা বলতে শুরু করলাম। সে সময়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশের প্রধান ফোরাম হিসেবে 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির'কেই বেছে নিয়েছিলাম।

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের পর এর বিরোধিতা করে সোজাসুজি কিছু বলার সাহস কারো রইলো না। সত্যি কথা বলতে কি, এটি হয়ে গিয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও এদেশে পাকিস্তানের মৃত্যুদণ্ডের আদেশনামা। এ অঞ্চলে এ আদেশনামার কট্টর বিরোধী পাকিস্তানবাদীরাও (যেমন মুসলিম লীগ নেতা খান সবুর ও অন্যান্যরা) শেখ মুজিব বা

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু না বলে দোষারোপ করতে লাগলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদেরই। দেশের 'গুরুতর পরিস্থিতি'তে নূরুল আমীনেরও 'প্রাণ আকুল' হলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি অনেক কথাই বললেন, কিন্তু স্পষ্ট করে 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা'র কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। পাকিস্তানবাদী নন, অথচ শেখ মুজিবকে সহ্য করতে পারেন না এমন রাজনীতিক 'বাংলা জাতীয় লীগে'র সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ পর্যন্ত তার দলকে 'শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে কর্মসূচি পালন' করতে নির্দেশ দিলেন। আতাউর রহমান খান তো শেখ মুজিবের ভাষণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই বললেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

আর মওলানা ভাসানী তো অন্তত সে মুহূর্তের জন্যে তার সকল স্ববিরোধিতা পরিত্যাগ করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শেখ মুজিবকে সমর্থন জানালেন। বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হইবে। পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে না, অখণ্ড রাখিব না। ইয়াহিয়ার বাপেরও ক্ষমতা নাই ইহা ঠেকায়।'

একাত্তরের মার্চে, অন্তত পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত, বাংলাদেশে পাকিস্তানের দালাল কেউ ছিলো না। পরে যারা দালাল হয়েছিলো, এ সময়ে তাদের কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধা বা বিপ্লবীর মতো কথা বলছিলো, অন্যেরা মৌন-মূক হয়ে ভবিষ্যতের আশায় ঘাপটি মেরে পড়েছিলো।

এছাড়া আর সবাই ছিলো মুক্তিপাগল। পাগলামি সেদিন সত্যি সত্যিই দুয়ার ভেদ করে চলে এসেছিলো।

ইতিহাসের একটি অমোচনীয় কলঙ্কচিহ্ন

অধিকাংশ বাঙালিই সেদিন সত্যিকারের মুক্তিপাগল হয়ে গিয়েছিলো যদিও, তবু অনেক মতলবি পাগলও যে এদের মধ্যে ভিড়ে গিয়েছিলো এবং আসল পাগল না হয়েও অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে পাগলের অভিনয় করে যাচ্ছিলো, সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না। মতলবি পাগলরাই বরং পাগলামিতে আসল পাগলদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই, স্বভাবত, মতলবিদের ছিলো সংখ্যাধিক্য।

একাত্তরের মার্চে আমার জেলা শহর ময়মনসিংহেও দেখেছি নিজেদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সেবক প্রমাণ করার জন্যে বুদ্ধিজীবীদের পরস্পরের মধ্যে কি প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা! যে বুদ্ধিজীবীটি দু'দিন আগেও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে জান কোরবান করতে একপায়ে খাড়া ছিলেন, তিনিই রাতারাতি ঘোর বাঙালি সেজে গেলেন, এই মুহূর্তেই বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্যে পারলে খালি হাতেই পাকিস্তানি মিলিটারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। জামায়াতে ইসলামী দলের ভাববাহী বুদ্ধিজীবীকেও দেখলাম কোন্ যাদুবলে হঠাৎ করে কট্টর আওয়ামী লিগার হয়ে গেছেন, সেমিনারে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করছেন, 'পশ্চিমা'দের তাড়িয়ে দিয়ে বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবেগভরা বাক্যাবলি উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। সে বাক্যাবলিতে পরিশীলিত স্বদেশপ্রীতির কোনো প্রকাশ নেই, আছে কেবল স্থূল জাতিবিদ্বেষ। ওরা উর্দুতে কথা বলে, আমরা বাংলায়। ওরা রুটি খায়, আমরা ভাত। ওদের মেয়েরা কামিজ পরে আমাদের মেয়েরা শাড়ি। এরকম 'ওরা আর আমরা'র আরেকটি সাম্প্রদায়িক ফর্মুলা দিয়েই এক সময়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব খাড়া করে পাকিস্তানের জন্ম দেয়া হয়েছিলো। সে-সময়কার 'ওরা' ছিলো হিন্দু আর 'আমরা' মুসলমান। সে সময়ে

বলা হয়েছিলো—ওরা ধুতি পরে, আমরা লুঙ্গি, ওরা জল খায়, আমরা পানি; ওরা স্নান করে, আমরা গোসল। আর এখন উর্দু-বাংলা, রুটি-ভাত, শাড়ি-কামিজ এসব দিয়েই নতুন 'ওরা আর আমরা'র বিভাজনকে বোঝাতে চাইলেন সদ্য গজিয়ে ওঠা একদল বাঙালি জাতীয়তাবাদী অর্বাচীন বুদ্ধিজীবী। সে-সময়ে যেমন 'হিন্দু' হঠিয়ে মুসলমানের পাকিস্তান হয়েছিলো, এখন তেমনি 'পশ্চিমা' তাড়িয়ে বাঙালির বাংলাদেশ হবে।

অথচ, পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ কিন্তু এই সদ্য গজিয়ে ওঠা স্থূলচিত্ত বুদ্ধিজীবীদের হাতে হয়নি। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই এখানে নতুন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা। সে সূচনালগ্ন থেকেই এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে থাকে হাজার বছরের বাংলার ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে চেতনায় ধারণ করে। এ জাতীয়তাবাদে কোনো স্থূলতা ছিলো না। নঞর্থক ও রুগণ নয়, একান্ত সদর্থক ও সুস্থ ছিলো এ জাতীয়তাবাদের আবেগ। বাংলার ভাষা, বাংলার বর্ণমালা, বাংলার রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করেই বাঙালির এ-জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে শক্তিমান হয়ে উঠেছিলো। বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনাই ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি। অন্য জাতির অধিকার হরণের কোনো বদ মতলব কিংবা অন্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সামান্যতম ঘৃণাও বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল প্রবক্তাদের মনে স্থান পায়নি। এর প্রবক্তাদের মধ্যে ভাষা-বিজ্ঞানী, সাহিত্য-শাস্ত্রী ও সংস্কৃতি-তাত্ত্বিকরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের জাঁদরেল পণ্ডিতরাও। এঁরা সকলে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের জাতীয় স্বাধিকারের পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের সকল জাতির অধিকারের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবাহ যতোই বেগবান হয়ে ওঠে ও এর সংগ্রাম যতোই সাফল্যের দিকে এগোতে থাকে, ততোই মতলববাজরা এর ভেতরে বেশি বেশি সংখ্যায় উড়ে এসে জুড়ে বসতে শুরু করে। তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদী দাঁড়কাকেরাই জাতীয়তাবাদের ময়ূরপুচ্ছ গায়ে চাপিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। একাত্তরের মার্চে ওই ময়ূরপুচ্ছধারিদের কণ্ঠই অনেক বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। আর তারই নিচে যে বাঙালির জাতীয় চেতনার সুস্থ ধারাটি, একান্ত সাময়িক কালের জন্যে হলেও, চাপা পড়ে গিয়েছিলো—সে এক বেদনা-উদ্দীপক ও কলঙ্কজনক সত্য।

লক্ষ করেছি, রাতারাতি পাকিস্তানি থেকে বাঙালি ব'নে যাওয়া ভোল পাল্টানো ও বোল পাল্টানো লোকগুলোর প্রায় সবাই কম্যুনিস্টদের বিরোধিতায় সমান সোচ্চার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যই চাই এবং সেই সঙ্গে চীন রাশিয়ার দালাল কম্যুনিস্টদেরও অবশ্যই প্রতিহত করতে চাই। কম্যুনিস্টরা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে ওস্তাদ, এবারও ওরা তাই করবে। আমরা বাঙালি। দেশে বাঙালির রাজত্ব চাই। এখানে চীন রাশিয়ার কথা আসবে কেন? অথচ, এই কম্যুনিস্টরা নিজের দেশ বোঝে না। ওদের স্বাদেশ প্রেম নেই মোটেই। কেউ এরা চীনের নামে অজ্ঞান, কেউ রাশিয়ার নামে। চীনপন্থী, রুশপন্থী সব কম্যুনিস্টই বাঙালির শত্রু।

ছেলেবেলা থেকেই এ-কথাগুলো যে কতোবার কতো ভাষায় শুনে আসছি। যখন চীন-রাশিয়ার কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়নি তখন যেমন শুনেছি, তেমনি কম্যুনিস্টরা রুশপন্থী ও চীনপন্থীতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরও শুনেছি। তাই পাকিস্তান যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম আসন্ন বলে আশা করা হচ্ছে যখন, তখনো এ-সব কথা

শুনে অবাক হইনি। মতলববাজরাই যে কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষ প্রচারে উচ্চকণ্ঠ থাকে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতি কোনো কিছুর নামেই মতলববাজী কিংবা উগ্রতা ও বিদ্বেষ প্রচারকে কম্যুনিষ্টরা বরদাস্ত করে না। সামাজিক সব সমস্যাকে তারা দেখে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে। এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিটি সব মতলববাজদেরই সব সময়ই অপছন্দ। তাই পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে পাকিস্তানের শাসকরা যেমন কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়েছিলো, তেমনি সে-আন্দোলনকালে উগ্র বাংলাপ্রেমিকরাও কম্যুনিষ্টদের ওপর মহা বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। বাঙালি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কালেও, এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিটির জন্যেই, কম্যুনিষ্টদের প্রতি ওদের বিরক্তি ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়নি। বরং আরো বেড়ে যায়, আরো উগ্র হয়ে ওঠে। 'বাংলাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'—কম্যুনিষ্টরা এরকম দাবিকে যেমন সমর্থন করেনি, তেমিন এরপর 'বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা চাই' স্লোগানেরও তারা সমালোচনা করেছিলো। সেই বায়ান্ন সালেই কম্যুনিষ্টরা পাকিস্তানকে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করে, এবং এ রাষ্ট্রের সকল জাতির ভাষার (অর্থাৎ বাংলা, উর্দু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পুস্তু, বেলুচি ও গুজরাটির) সমান মর্যাদা দাবি করে। এরপর ধাপে ধাপে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম এগিয়ে নিতে যখন তৎপর হয় তখনো তারা পাকিস্তানের অন্যান্য জাতির অধিকারের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখার কথা বলে, সকল জাতির মেহনতি মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, জাতীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে। আমরা দেখেছি, শেখ মুজিব ছয়দফা ঘোষণা করলে তার প্রতি কম্যুনিষ্টরা যেমন সমর্থন জানিয়েছিলো, তেমনি এও বলেছিলো যে, এতে মেহনতি মানুষের দাবির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জয়লাভের জন্যে দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতি কম্যুনিষ্টরা সব সময়েই জোর দিয়ে এসেছে। একাত্তরের পঁচিশে ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবেও কম্যুনিষ্ট পার্টি পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধিকার সংগ্রাম প্রসঙ্গে বলেছে—'...পূর্ববাংলার জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে, এই সংগ্রাম পাশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণ ও অবাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে নয়। বরং ইহা পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমশত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গ। এই সংগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা ও সমর্থন চাই এবং তাহাদের জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি। এই সংগ্রামের সফলতার জন্যে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবাঙালি জনগণ বিরোধী জিগির এবং মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে।

'পরিশেষে আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংগ্রামে স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির তথা দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা।'

এই ধরনের কথা শুধু 'রুশপন্থী' কম্যুনিষ্ট পার্টিরই নয়। রুশপন্থীদের সঙ্গে মত-পথের অনেক গরমিল সত্ত্বেও 'চীনপন্থী' কম্যুনিষ্টরাও নিশ্চয়ই স্থূল ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী। তারাও শ্রেণীদৃষ্টিতেই সামাজিক সমস্যার বিচার করে। এরকম বিচারধারার অনুসারী আর

যেসব গোষ্ঠী যেমন বিভিন্ন গ্রুপের 'ছাত্র ইউনিয়ন', মোজাফফর ন্যাপ কিংবা শ্রমিক কৃষক পেশাজীবীদের নানা সংগঠন-সবাই ওই 'হঠাৎ বাঙালি'দের চোখে কম্যুনিস্ট। কম্যুনিস্টরা উগ্র বাঙালিত্বের ঘোর বিরোধিতা করেছিলো বলেই একাত্তরের 'হঠাৎ বাঙালি'রা কম্যুনিস্টদের ওপর বড়ো বেশি ক্ষেপে গিয়েছিলো।

'হঠাৎ বাঙালি'দের হঠকারি কথাবার্তার ধূম্রজালে সকল সুস্থ বিচার-বিবেচনাই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিচার-বিবেচনায় যখন সুস্থতা থাকে না তখনই তো নানা রকম মূঢ়তার প্রকাশ ঘটে। সেই মূঢ়তা একাত্তরেও বাঙালিদের একাংশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিলো। 'একটা-দুইটা পাঞ্জাবি ধর, সকাল-বিকাল নাস্তা কর' কিংবা 'একটা-দুইটা বিহারি ধর, সকাল-বিকাল নাস্তা কর'-এ-রকম জিগির তোলার মধ্যেই তারা বাঙালিত্বের চরম প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলো। পাঞ্জাবিদের তো আর হাতের কাছে পাওয়ার উপায় ছিলো না, চোখের সামনে ছিলো বিহারিরা। বাংলা ভাষাভাষী ছাড়া যারাই সাতচল্লিশের পর ভারত থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছে—তারা বিহার, উত্তর প্রদেশ কিংবা অন্য যে কোনো এলাকারই হোক না কেন—বাঙালিদের চোখে সবাই বিহারি। সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের কোন এলাকায় কতো সংখ্যক বিহারির অধিবাস ছিলো আমার জানা নেই। ময়মনসিংহ শহরেই যে তাদের সংখ্যা কতো ছিলো তাও জানি না। শহরের বাঁশবাড়ি, ছত্রিশবাড়ি, সানকিপাড়া—এ-রকম কয়েকটি 'কলোনিতে' বিহারিরা থাকতো। কলোনির বাইরেও কিছু বিহারির বাড়ি ছিলো। কেউ কেউ বলেন, সে-সময়ে ময়মনসিংহে অন্তত পঁচিশ হাজার বিহারি পরিবারের আবাস ছিলো। ওই বিহারিরা তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ছিলো খুবই সচেতন। শুধু তাই নয়। ওদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদিও ছিলো সাধারণ শ্রমজীবী গোষ্ঠীর মানুষ, তবু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ওদের মধ্যে একটি কৃত্রিম উচ্চমন্যতা বোধের সঞ্চার করে দিয়েছিলো। এর ফলে ওদের সঙ্গে এদেশের বাঙালি সমাজের বিচ্ছিন্নতা দুর্ভেদ্য হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতারই সুযোগ নিয়ে একাত্তরের এপ্রিলে এক শ্রেণীর 'বাঙালি' গুণ্ডা ও মতলববাজদের দল বিহারিদের ওপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অমোচনীয় কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দেয়।

সত্তরের নির্বাচনের সময় থেকেই বিহারিদের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে থাকে। তবু সে-সময়ে তারা সরাসরি কোনো হামলার শিকার হয়নি। একাত্তরের মার্চে ইয়াহিয়া যখন জল্লাদ টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করে তখন বাঙালিদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকার করেন। সে-সময়ে ময়মনসিংহের বিহারিরাও টিক্কা খান-বিরোধী মিছিল বের করে, এবং আন্দোলনরত বাঙালিদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। তবু সত্যি সত্যি একাত্ম তারা হতে পারেনি। কারণ, এতো দিনে অবিশ্বাস ও ব্যবধান বাড়তে বাড়তে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে গেছে। তবে, আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা একাত্তরের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদও বিহারিদের ওপর হামলা ঠেকিয়ে রেখেছে। অন্তত ময়মনসিংহ শহরে তো তা-ই দেখা গেছে। সানকিপাড়া বিহারি কলোনিতে সামিয়ানা খাটিয়ে জনসভা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া সে সভায় বিহারিদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন, বিহারিদের ওপর কোনোরূপ অত্যাচার-অবিচার হতে দেয়া হবে না বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, বিহারিদের জন্যে সব আশ্বাস আর ঘোষণা অকার্যকর হয়ে গেলো এপ্রিলের সতেরো তারিখে। তখনো ময়মনসিংহ শহর মুক্ত, পাকিস্তান মিলিটারি তখনো ঢাকা থেকে

এখানে এসে পৌছুতে পারেনি। সেই মুক্ত শহরে মিলিটারিরা বিমান থেকে অনেকক্ষণ ধরে গোলাবর্ষণ করে চললো সতেরোই এপ্রিল।

সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে জঙ্গী বিমান চলে যাওয়ার পর সে-আতঙ্কের সঙ্গে এসে যুক্ত হলো একটি গুজব। শোনা গেলো : সানকিপাড়া কলোনি থেকে বিহারিরা নাকি লাল নিশান উড়িয়ে পাকিস্তানি জঙ্গি বিমানকে শহরের দিশা দেখিয়ে দিয়েছে, আর সেই সংকেত অনুসরণেই পাক মিলিটারিরা গোলাবর্ষণ করে চলে গেছে। যারা সেদিন শহরে ছিল তারা এই গুজবের সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোনো সুযোগ পায়নি। অনেকেই গোলাবর্ষণের পর দ্রুত শহর ছেড়ে চলে যায়। তবে, শহরে যে-সব 'হঠাৎ বাঙালি'রা সেদিন থেকে গিয়েছিল তারা সেদিন বিহারি কলোনি গুলিতে যে-সব পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়েছিল সে-সবের কিছু খবর আমি পরে শুনেছি। সে-সব খবরের এক শতাংশও যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে বাঙালি হিসেবে চিরকাল আমাকে লজ্জায় নতমস্তক হয়ে থাকতে হবে।

সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের শুরুতে

একাত্তরের মার্চের কথা বলতে বলতে এপ্রিলের এমন একটি প্রসঙ্গকে ছুঁয়ে গেলাম যে প্রসঙ্গটি আমরা এড়িয়ে যেতে, ভুলে থাকতে, এমনকি অস্বীকার করতেই চেষ্টা করি। এবং এ-রকম চেষ্টা যে আত্মপ্রতারণারই নামান্তর, তাও মানতে চাই না। আত্মপ্রতারণা যে আত্মঘাতী, সে-কথাটা সব সময়েই মনে রাখা উচিত। সেই ঔচিত্যবোধ থেকেই ময়মনসিংহে বিহারি নির্যাতনের বিষয়টি আমি উল্লেখ করলাম। প্রত্যক্ষ দর্শনজাত নয় বলে আমার কথাগুলো হয়েছে একান্তই ভাসা ভাসা। তবু আমি মনে করি, বিহারিদের প্রসঙ্গটি পাকিস্তানের জন্মমৃত্যুদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখনো এ-অঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্মের পঁচিশ বছর পরও—যখন ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের-পারে বিহারি ক্যাম্পে ওদের করুণ জীবন যাপনের দৃশ্য দেখি, তখন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। সে সঙ্গে অপরাধবোধেও। আবার পাকিস্তান নামক সেই শয়তান রাষ্ট্রটির প্রতি পুরনো ঘৃণাটিও নতুন করে জেগে ওঠে। ভাবি : পৃথিবীতে রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্ভবের পর থেকে পাকিস্তানের চেয়ে জঘন্যতর কোনো রাষ্ট্রের কি জন্ম হয়েছে কোনোদিন? পাকিস্তান তো শুধু তার শত্রুদেরই ক্ষতিসাধন করেনি, চূড়ান্ত ক্ষতি ঘটিয়েছে তার অকপট ও ত্যাগী মিত্রদেরও। বিহারি নামে যারা আজকে পরিচিত, অবিভক্ত ভারতের নানা অঞ্চলে যাদের আদিবাস, পাকিস্তানের জন্যে তাদের অকপট ত্যাগের কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? নিজেদের জন্মস্থান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে না জেনেও যে পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে ব্রিটিশ আমলে প্রতিপক্ষের রোষের শিকার হয়েছে যারা, সেই জন্মভূমি-ত্যাগী পাকিস্তানপ্রেমীদের পাকিস্তানেই কেন ধর্ষিত, লুণ্ঠিত ও নিহত হতে হলো? পাকিস্তানপ্রেমে তো কমতি দেখা দেয়নি ওদের। বংশানুক্রমেই সেই প্রেমে ওরা নিষ্ঠ থেকেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পরও নিজেদের ওরা পাকিস্তানি বলে ঘোষণা করে রেখেছে। কিন্তু এখনো জীবিত আছে যে পাকিস্তান—অর্থাৎ এককালে যা ছিলো পশ্চিম পাকিস্তান—সেই পাকিস্তানকে ওরা নিজের চোখে দেখেইনি। তবু সেই পাকিস্তানই ওদের স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরি ও স্মৃতি-দিয়ে-ঘেরা স্বদেশ। সে স্বদেশের মাটি তারা কোনো দিন ছুঁতে পারবে কিনা কেউ তা জানে না। গত পঁচিশ বছরে ওই অস্বাস্থ্যকর ক্যাম্পে জন্মে নিয়েছে যে সব শিশু,

যাদের শৈশব গড়িয়েছে যৌবনে, প্রকৃতপক্ষে তারাই এখন বিহারিদের ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদেশে জন্মেও তারা বিদেশি, অথচ তাদের কথিত স্বদেশের নেতানেত্রীরা তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকারটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। ত্রিশঙ্কু এক মানবগোষ্ঠীর উদাহরণ হয়ে রয়েছে এই বিহারিরা।

একাত্তরে বাঙালি যখন স্বাধীনতার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখনো পাকিস্তান ওই বিহারিদের নিজের স্বার্থেই পুরোপুরি ব্যবহার করতে চেয়েছে। শুনেছি, তেইশে এপ্রিল ঢাকা থেকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ময়মনসিংহ শহরে ঢোকে। ঢুকেই তারা অতিরিক্ত বিহারি দরদ দেখাতে থাকে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত বিহারিদের স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো ব্যবস্থা তারা নেয় না, বরং ওদের ভেতর প্রতিশোধ স্পৃহা উস্কিয়ে দেয়। ওদের প্রশ্রয় ও উস্কানিতে বিহারিরা অনেক বাঙালির বাড়িঘরে লুটপাটে লেগে যায়। কিছু কিছু বাঙালি নিহতও হয় ওদের হাতে। আর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিহারিদের দুর্দশাকে আন্তর্জাতিক প্রচার প্রোপাগান্ডার কাজে লাগায়। বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামকে ওরা বলে 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র'। ভারতীয়দের লেলিয়ে দেয়া দুষ্কৃতকারীরা বিহারিদের ওপর অত্যাচার করেছে, পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়েছে, ওইসব দুষ্কৃতকারীকে শায়েস্তা করতে পারলেই 'তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধ' শেষ হয়ে যাবে—এসব কথাই ওরা অবিশ্রাম বলে গেছে।

যাই হোক, সেসব হচ্ছে আরো পরের ব্যাপার। আমি বলছিলাম একাত্তরের মার্চের কথা। এবং ময়মনসিংহ শহরের কথা। সারাটা মার্চেই শহরটি ছিলো অগ্নিগর্ভ। চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত শহরেই 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির'-এর ব্যানারে আমরা পথসভা করেছি, গণসংগীত পরিবেশন ও বিপ্লবী কবিতা আবৃত্তি করেছি। পঁচিশ তারিখে আমরা সভা করতে গেলাম শহরের বাইরে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসসংলগ্ন গ্রাম দিঘারকান্দায়। সেখানকার প্রাইমারি স্কুলের সামনে গাঁয়ের মানুষরাই বক্তৃতামঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সভায় প্রচুর গ্রামীণ শ্রোতার সমাগম হয়েছিলো। বক্তা ছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, আবদুর রাজ্জাক, মোস্তফা হামিদ হোসেন—এরা তো ছিলেনই। এছাড়া এমন কেউ কেউ ছিলেন, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের উচ্চশিক্ষার্থীদের বদলে গ্রামের নিরক্ষর মানুষের সামনে বক্তৃতা দেয়ার কথা এর আগে কোনোদিন ভাবতেও পারেননি।

এদের কথা বলতে গিয়েই মনে পড়ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনাত আরা ও অধ্যাপক ডক্টর করিমের সহধর্মিনী মিসেস সোফিয়া করিমের কথা। দিঘারকান্দার সভায় তাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন কিনা আজ আর সে কথা স্মরণ করতে পারছি না। তবে বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের অনেকগুলো পথসভায় অধ্যাপিকা জিনাত আরার উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতার কথা আজো, স্বাধীনতা সংগ্রামের পঁচিশ বছর পরও, অনেকে সগৌরবে ও সানন্দে স্মরণ করেন। জিনাত আরা অবশ্যি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মিসেস করিম সেই যে একাত্তর সালে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমে এসেছিলেন, আজো সে-সংগ্রামে তিনি বিরামহীনভাবে লেগেই রয়েছেন। মিসেস সোফিয়া করিমের অংশগ্রহণ ছাড়া, নব্বইয়ের দশকেও, ময়মনসিংহ শহরে কোনো প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের কথা ভাবাই যায় না।

পঁচিশে মার্চের সন্ধ্যায় শহর থেকে যারা বক্তৃতা দিতে দিঘারকান্দায় গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মতিউর রহমান, গোলাম সামদানী কোরায়শী, রিয়াজুল ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম—এই ক'জন অধ্যাপক বক্তার কথা আমার মনে পড়ছে। এদের বাইরেও হয়তো আরো

দু'একজন ছিলেন। সবাই খুব ভালো বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সকলের কণ্ঠেই দেশপ্রেমের আবেগ ঝরে পড়ছিলো, সকলের বক্তব্যেই পাকিস্তানি দুঃশাসনের হাত থেকে বাঙালি জাতির মুক্তিলাভের আর্তির প্রকাশ ঘটছিলো। তবে, বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিলো : বুদ্ধিজীবীরা যে ভাষায় কথা বলছেন সেটি গ্রামীণ জনগণের বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা নয়। গ্রামীণ শ্রোতারা অখণ্ড মনোযোগে বক্তাদের কথা শুনছে বটে, কিন্তু কঠিন কঠিন শব্দের বেড়া ডিঙিয়ে তাদের বক্তব্যের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারছে না। যে কথাটি তারা শুনতে চায় ঠিক তা যেন ওই বিজ্ঞ বক্তাদের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে না। বক্তৃতার ওই ধারাটি আমি উল্টে দিতে চাইলাম। মঞ্চে উঠেই বললাম : আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগে, এরকমই আরেকটি পঁচিশে মার্চে, পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি দেশে মার্শাল ল' নামে একটি আইন জারি করেছিলো। আমার মনে হয়েছে, এই মার্শাল ল' মানে হলো, 'মার শিয়াল ল'—অর্থাৎ 'শিয়াল মারার আইন'। এর আগে আইউব খানও এ-রকম শিয়াল মারার আইন জারি করেছিলো। এখন কথা হচ্ছে, শিয়ালের প্রতি আক্রোশ থাকে কার?—কুত্তার। মানুষকে যারা শিয়ালের মতো মনে করে তাকে মারার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদেরকে কুত্তা ছাড়া আর কী বলা যায়? ওই পাকিস্তানি জংলি শাসকরা আসলে কুত্তাই। চলুন আমরা আজকে, এই দিনে, ওদের 'মার শিয়াল ল'-এর বিপরীতে জারি করি—'মার কুত্তা ল'। ওই কুত্তাদের মেরে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করবো—আজকে এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

আমার কথাগুলোতে কোনো গভীরতা ছিলো না, এগুলো ছিলো নিতান্তই স্থূল ও হালকা চালের কিছু প্রগলভ উক্তি মাত্র। কিন্তু কথাগুলো বলেছিলাম পূর্ব ময়মনসিংহের উপভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষায়। আর সে কারণেই আমার কথা যে শুধু সরলপ্রাণ গ্রামীণ শ্রোতাদেরই মনকে স্পর্শ করেছিলো, তা নয়। যারা 'স্ট্যান্ডার্ড' বাংলায় কথা বলেন, সেই বুদ্ধিজীবীরাও এতে বেশ আমোদ পেয়েছিলেন বলেই মনে হলো। শুধু আমোদ নয়, আমার ওই গ্রাম্য বাগ্‌ভঙ্গির দরুন আলোচ্য বিষয়টিও যে তাদের কাছে অনেক বেশি অনুভূতিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিলো, সে কথা তারা সে-সময়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে : আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর অকৃত্রিম ও অসাধারণ প্রকাশ-ক্ষমতার সঙ্গে পালিস করা স্ট্যান্ডার্ড ভাষার কোনো তুলনাই চলে না। জনগণের অন্তরে প্রবেশ করার জন্যে যে জনগণের মুখের ভাষার কোনো বিকল্প নেই, সে-কথা বুদ্ধিজীবীরা তো বটেই, জনগণের জন্যে রাজনীতি করেন বলে যারা বাগাড়ম্বর করেন তারাও বোঝেন না। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে যারা কুণ্ঠিত হন না কখনো, সেই কম্যুনিস্ট নেতারাও যে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি তার হাজারো কারণের মধ্যে একটি বড়ো কারণ বোধহয় জনগণের ভাষা থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়া। তাদের মগজের কোষগুলো ভরপুর হয়ে থাকে কম্যুনিস্ট পরিভাষায়, জনগণের সঙ্গে আলাপে সেই পরিভাষাগুলোর তারা অজীর্ণ উদগার ঘটান, পরিভাষাকে জনগণের ভাষায় প্রাঞ্জল অনুবাদ করতে পারেন না। জনগণের ভাষায় জনগণের সঙ্গে কথা বলতে একান্ত পারঙ্গম, এরকম অন্তত দু'জন বক্তার বক্তৃতা আমি শুনেছি। এদের একজন প্রয়াত কৃষকনেতা আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী, অন্যজন শ্রমিক নেতা জসিম মণ্ডল। এদের কাছ থেকে যদি আমাদের সকল প্রগতিশীল নেতা ও বুদ্ধিজীবী গণভাষার ও গণমনস্তত্ত্বের তালিম নিতেন, তবে তারা অনায়াসে জনগণের অন্তরে প্রবেশ করতে পারতেন, ধর্মব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল ডেমাগগদের বাকচাতুরি জনতাকে বিভ্রান্ত করতে পারতো না।

সেদিন দিঘারকান্দায় একটি সফল জনসভা করতে পেরে আমরা, বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের সদস্যরা, খুশিতে টইটম্বুর হয়ে ঘরে ফিরছিলাম। বুদ্ধিজীবী হয়েও শ্রমজীবীদের সঙ্গে যে আমরা একাত্ম হতে পেরেছি, সে-কথা ভেবে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম। খুব সহজেই যে আমরা স্বাধীনতা পেয়ে যাবো, এমন সরল বিশ্বাসও আমাদের মনে জন্মে গিয়েছিলো। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই যে আমাদের খুশি দূর হয়ে যাবে, আত্মপ্রসাদ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, সরল বিশ্বাসে প্রচণ্ড ঘা লাগবে, পঁচিশে মার্চের রাত দশটায়ও আমরা তেমন ভাবতে পারিনি।

খুব ভোরে দরোজায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দে জেগে উঠলাম। দরোজা খুলে দেখি : পাশের বাসার নজরুল ইসলাম খোকনের বোন রুবী। সে বললো, এই মাত্র তাদের বাসায় খোকনের বন্ধুরা এসে খবর দিয়ে গেছে যে, ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ভেঙে গেছে, ঢাকায় মিলিটারিরা সমানে বাঙালিদের মেরে চলছে, ময়মনসিংহের দিকেও তারা এগিয়ে আসছে। খোকন তার বন্ধুদের নিয়ে শহরে বেরিয়ে গেছে, বলে গেছে আমিও যেন তাড়াতাড়ি চলে যাই।

দ্রুত প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে বেরিয়ে দেখি সারা শহরের মানুষ যেন ঘর ছেড়ে রাজপথে বেরিয়ে এসেছে। আপাতত তাদের লক্ষ শহরের খাগডহর এলাকায় অবস্থিত ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে পাঞ্জাবি সেনাদের বাঙালিরা ঘিরে রেখেছে, পাঞ্জাবিরাও বন্দুক তাক করে আছে বাঙালিদের দিকে। অর্থাৎ পাঞ্জাবি-বাঙালি মুখোমুখি যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সব বাঙালিই সৈনিক। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিনেই ময়মনসিংহবাসীও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লো।

ইপিআরের পাঞ্জাবি কিংবা অন্য কোনো পাকিস্তানি সেনা যাতে শহরে ঢুকতে না পারে তার জন্যে রাস্তার এখানে-ওখানে এরই মধ্যে অনেক ব্যারিকেড তৈরি হয়ে গেছে। গাছের ডাল, ভাঙা ল্যাম্পপোস্ট, কেরোসিনের ড্রাম, টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চি—যে যা হাতের কাছে পাচ্ছে তাই দিয়ে ব্যারিকেড বানাচ্ছে। থানার পুলিশরাও জনগণের সহযোগী। রাজারবাগ ব্যারাকের পুলিশরা যে বীরত্বের সঙ্গে পাক মিলিটারির হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে, সে খবর ময়মনসিংহ শহরেও পৌঁছে গেছে। দু'দিন আগেও যে পুলিশরা আন্দোলনকারী জনতার দিকে বন্দুক তাক করে ধরেছে, আর জনতাও একান্ত ঘৃণায় যে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়ে মেরেছে, সেই বাঙালি পুলিশ আর জনতা আজ এক হয়ে গেছে। সকলেই ছুটছে খাগডহর ইপিআর ক্যাম্পের দিকে।

ছাব্বিশে মার্চ সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলে। একপক্ষে ইপিআর-এর কতিপয় বাঙালি সৈনিক এবং তাদের সহযোগিতায় বিপুল জনতা; আর অন্যপক্ষে ইপিআর ক্যাম্পের ষাট-সত্তরজন অবাঙালি সেনা, ওদের কোনো সাহায্যকারী নেই, ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে আসারও কোনো উপায় নেই। সারাদিনের যুদ্ধে ওরা সব মারা পড়লো।

ছাত্রকর্মীরা ট্রাকে করে সারাদিন ধরে মাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করে চললো। পঁচিশে মার্চের রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু যে বার্তাটি ইপিআর-এর ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন সেটি ছাব্বিশ তারিখেই ময়মনসিংহেও পৌঁছে গিয়েছিলো। সেদিন ছাত্রলীগের কর্মিদের পাশে সেই বার্তা প্রচার করতে দেখলাম এনএসএফ কর্মিদেরও। ময়মনসিংহের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মিরা ছাব্বিশ তারিখেই ডামি রাইফেল কাঁধে নিয়ে সারা শহরে মার্চপাস্ট করে। তাদের প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় ইউওটিসি'র ক্যাডেট শাহ

মুজতবা ও ইসমাইল তরফদার। ওরা পয়লা মার্চ তারিখেই—জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল সংক্রান্ত ইয়াহিয়ার ঘোষণার পরপরই—প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করেছিলো, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেটি অতি দ্রুত একটি জঙ্গি মিছিলে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। ছাব্বিশে মার্চেই ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মিরা গোপন কম্যুনিস্ট পার্টি ও মোজাফফর ন্যাপের কর্মিদের সঙ্গে মিলে মহাকালী পাঠশালায় একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করে। সাতাশে মার্চে এরা মিছিল নিয়ে ময়মনসিংহ জেলখানায় যায় ও কমরেড অজয় রায়কে মুক্ত করে নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে নেতৃত্বের ভূমিকাটি ছিলো ন্যাপ নেতা কফিলউদ্দিন লালমিয়ার। মিছিলে ছিলেন কমরেড মন্মথ দে, আজিজুল ইসলাম খান, আলোকময় নাহা, আবদুল কুদ্দুস, মকবুল হোসেন, নজরুল ইসলাম খোকন এবং প্রদীপ চক্রবর্তীর মতো কম্যুনিস্ট, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। অজয়দাকে মুক্ত করে আনার ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া ও সৈয়দ আহমদ।

সাতাশ তারিখেই সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা শুনলাম। আহা, কী যে ভালো লাগলো। যারা নিজের কানে জিয়ার কথাগুলো শোনেনি তাদের কাছেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের মুখ থেকে সে কথাগুলো পৌছে গেলো। সকলের উৎসাহের পালে লাগলো নতুন হাওয়া। নিরস্ত্র বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে সেদিন একজন সশস্ত্র সেনাপতির যোগদানের ঘটনাটির গুরুত্বই ছিলো অপরিসীম। আর তার কণ্ঠের ধ্বনি তো সেদিন বাঙালির কানে ধ্বনিত হয়েছিলো মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো।

জিয়ার ওই বেতার ভাষণটি নিয়ে পরে অনেক ধূম্রজাল ছড়ানো হয়েছে। তাকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ প্রয়াস চালানো হয়েছে। অথচ এ-রকম করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তার আপন কৃতিই তাকে ইতিহাসে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। বেতারের ক্ষীণ তরঙ্গে ভেসে আসা কণ্ঠধ্বনি বাঙালির অন্তরে মুক্তি সৈনিক জিয়ার জন্যে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার আসন বিছিয়ে দিয়েছিলো মুক্তিসংগ্রামের শুরুতেই। কিন্তু জিয়ার অতিভক্তের দল চাইলো তাকে এমন একটি আসনে বসাতে যেটি তার কোনোমতেই প্রাপ্য নয়। বঙ্গবন্ধুকে স্থানচ্যুত করে জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার স্পর্ধাও তারা দেখালো। আর এ-রকমটি করে তারা জিয়াউর রহমানের আসল ভূমিকাটিকেও আড়াল করে দিলো, তাঁর প্রাপ্য আসনটি থেকেও তাকে টেনে নামালো, তার তর্কাতীত মর্যাদাকে বিতর্কিত করে ফেললো।

প্রত্যাশার ফুল ও সংশয়ের কাঁটা

কমরেড অজয় রায় জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

গত এক/দেড় মাস ধরে প্রচণ্ড উত্তেজনার আগুনে আমরা নিজেদের তাতিয়ে নিয়েছি, কেবলই ভেবেছি স্বাধীনতা আমাদের হাতের মুঠোয় প্রায় এসেই গেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয়কেই আমরা বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিতে রাজি হইনি। মার্চের শুরু থেকেই আমরা মুক্তির মাতাল তরণীতে সওয়ার। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল প্রতীককেই আমরা একে একে প্রত্যাখ্যান করে চলেছি। পাকিস্তানের 'চাঁদ-তারা সাদা আর সবুজ নিশান' নামিয়ে ফেলে সগর্বে উড়িয়ে দিয়েছি রক্ত সূর্য লাঞ্ছিত পতাকা, যে পতাকার বুকে আঁকা 'আমার সোনার বাংলা'র মানচিত্র।

বিজাতীয় ভাষায় শব্দাবলিতে গাঁথা 'পাকসার জামিন সাদবাদ' আর আমার জাতীয় সংগীত নয়, তাকে স্থানচ্যুত করেছে 'আমরি বাংলা ভাষা'য় রচা 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি...'। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রটির সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগ, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বদলে বাঙালি জনগণের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের প্রতি সরকারি-বেসরকারি সকল মহলের আনুগত্য—এইসব কিছুই আমাদের পুরনো থেকে নতুন অবস্থানে নিয়ে এসেছে, সে-অবস্থান থেকে কেউ যে আর আমাদের সরিয়ে নিতে পারবে না সে-বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। এমনকি নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের ওপর ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি মিলিটারিদের অতর্কিত হামলায় আমাদের সরল বিশ্বাসে প্রচণ্ড ঘা লাগলেও মুহূর্ত পরেই সে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম, গভীরতর আত্মপ্রসাদ ও প্রচণ্ডতর আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। কসাই টিক্কাখানের রেডিওতে প্রচারিত হুংকারভরা ভাষণকে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। ভাষণটি শেষ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই শহরের সবক'টি রাস্তায় নেমে এসেছিল অনেকগুলো মিছিল। সবগুলো মিছিলের একই স্লোগান-'টিক্কাখানের ঘোষণা, মানি না মানি না'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে ২৫ মার্চ রাতেই গ্রেফতার হয়েছেন—এ-খবর আমরা এক ফোঁটাও বিশ্বাস করিনি। আমরা বিশ্বাস করেছি, কিংবা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেছি, বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যেই আছেন এবং অলক্ষে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকায় পাক সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচারের খবরে আমরা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু কোনো কিছুই আমাদের অবিচলিত প্রত্যয়কে বিচলিত কিংবা সংশয়ান্বিত করতে পারেনি। বরং পঁচিশে মার্চের রাতের আক্রমণের পর যখন অন্যতম বাঙালি সেনাপতি মেজর শফিউল্লাহ দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ময়মনসিংহে চলে আসেন, তখন আমাদের প্রত্যয়দীপ্ত আনন্দে আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। মুক্ত ময়মনসিংহে আমরা একজন অধিনায়ক পেয়ে গেলাম। সর্বাত্মক গণ অসহযোগের ধাক্কায় জেলা প্রশাসন প্রায় এক মাস ধরেই অকেজো হয়েছিলো। মেজর শফিউল্লাহ্ ময়মনসিংহে এলে জনগণের একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনেই যেন তিনি প্রশাসক হয়ে গেলেন, কোনো রাষ্ট্রীয় ফরমানেরই প্রয়োজন পড়লো না। মার্চের ২৭ কি ২৮ তারিখের সকালে একদল বিদ্রোহী সৈন্য যখন শহরের প্রধান সড়কটি দিয়ে দৃপ্তপায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন সেই মিছিলে আমরা আমাদের স্বাধীনতার লাল সূর্যটিকেই দেখতে পেয়েছিলাম। সৈন্যদের মিছিলটি যখন সিটি স্কুলের সামনে তখন হঠাৎ শোনা গেলো একটা গুলির শব্দ। বেশ কিছু দূরে থেকেই শব্দটা শুনেছিলাম। অনেকের সঙ্গে আমিও দৌড়ে সেখানে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি রাস্তার ওপর পড়ে আছে একটা মানুষের নিথর নিষ্প্রাণ দেহ। ওই মানুষটাকে আমি চিনতাম। ওর নাম তুলসী রাজভড়, পুরুষানুক্রমে এ দেশে বসবাসকারী 'পশ্চিমা' বা হিন্দিভাষী হিন্দুদের একজন। তুলসীর কোনো পূর্বপুরুষ উত্তর প্রদেশ না বিহার থেকে এদেশে এসেছিলো তার সঠিক খবর সেও হয়তো জানতো না। রাজনীতি-টাজনীতি নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতো না। গতর খাটিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে জীবন চালাতো। এদেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিলো সম্প্রীতির। তবু 'পশ্চিমা' পরিচয় তুলসিদের সঙ্গে বাঙালিদের একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েই গিয়েছিলো। বাড়িতে ওরা হিন্দিতে কথা বলতো, বাইরে বাংলায়। তবে সে-বাংলায় পশ্চিমা টান ও হিন্দি শব্দের মিশেলে তাদের পশ্চিমা বলে সহজেই চেনা যেতো। ওই পশ্চিমা ভাষাতেই নাকি তুলসী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। আর তা শুনেই বাঙালি সৈন্যদের মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিলো। বিজাতীয় শত্রুদের

কেউ বলে চিহ্নিত করে এদের একজন হঠাৎ তুলসীর ওপর গুলি ছুঁড়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই তুলসী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে লাশ হয়ে যায়।

নিরীহ গোবেচারা তুলসীর মৃত্যু সবাইকে শোকাহত করেছিলো, অনেকের চোখেই জল দেখেছিলাম। কিন্তু, কি আশ্চর্য, তুলসীর হত্যাকারীর প্রতি কাউকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখিনি সে সময়ে। বরং নিহতের জন্যে শোকের সমপরিমাণেই—কিংবা কিছুটা বেশি পরিমাণে ছিলো হত্যাকারির প্রতি সহমর্মিতা। আহা ওই সৈনিক বেচারারা বিদ্রোহ করে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে অনিশ্চিতের পথে নেমে এসেছে, কেউ বলতে পারে না এই বিদ্রোহের শেষ পরিণাম কি হবে! যদি বাংলাদেশ স্বাধীন না হয়ে পাকিস্তানই টিকে যায় তবে ওদের মৃত্যুদণ্ডতো অনিবার্য। এরকম অনিশ্চিত জীবন যারা বেছে নিয়েছে তাদের মনমেজাজ তো গরমই থাকবে। তাই হঠাৎ যদি একটা অবাঙালিকে দেখে ওদের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়, আর রাগের বশে গুলিই করে বসে, তবে ওদের দোষ কি? অবশ্যি তুলসীরও কোনো দোষ ছিলো না। অদ্যদোষেই বেচারা মারা পড়লো। কি যে দুর্মতি হয়েছিলো ওর। তা না হলে সে-সময়ে বাঙালি মুক্তিসেনাদের সামনেই-বা 'পশ্চিমা' ভাষায় কথা বলতে যাবে কেন সে?

এভাবেই সেদিন তুলসী হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বা পরোক্ষদর্শী মানুষদের সহানুভূতির পাল্লা হত ও ঘাতকের জন্যে প্রায় সমান ভারি হয়ে গিয়েছিলো। একই রকম দরদ ও মমতায় তারা হত 'পশ্চিমা' তুলসী রাজভড়ের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেছিলো, এবং ঘাতক বাঙালি সৈন্যদের জন্যে আতিথ্যের আয়োজন করেছিলো।

আমরা সেদিন সীমাহীন বিশ্বাস ও প্রত্যাশা অর্পণ করেছিলাম বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারদের ওপর। সেই বিশ্বাস ও প্রত্যাশার জোরেই শক্তিশালী শত্রুর বেষ্টনির মধ্যে থেকেও মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওই সশস্ত্র ও অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষিত বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকদের সক্রিয় সহায়তার জোরেই আমাদের তরুণরাও শিক্ষিত অস্ত্রধারী হয়ে উঠবে, এবং তারা সবাই মিলে অচিরেই দেশকে শত্রুমুক্ত করে ফেলবে—এ-রকম আস্থা উঠবে, এবং তারা সবাই মিলে অচিরেই দেশকে শত্রুমুক্ত করে ফেলবে—এ-রকম আস্থা আমাদের মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিলো। দুশমনদের আমরা 'পানিতে মারবো', ভাতে মারবো, 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবো', 'দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো মারবো, 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবো', 'দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাআল্লাহ্'—বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের এরকম টুকরো টুকরো বাক্য আমাদের আশাবাদকে সতেজ করে রেখেছিলো।

কিন্তু জেল থেকে আসা কমরেড অজয় রায়ের কথাগুলো এ-রকম সরল আশাবাদের বেলুনটাকে অনেক পরিমাণেই চুপসে দিলো। অজয় দাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, আমি, আলোকময় নাহা, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম এবং এ রকম আরো কয়েকজন।

অজয়দা বলছিলেন—'ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। কোনো দেশই মুক্তিযুদ্ধে খুব সহজে বা অনায়াসে জয়লাভ করতে পারে না। এর জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়। মুক্তিযুদ্ধ হয় অনেক দীর্ঘস্থায়ী। ভিয়েৎনামের দিকেই তাকিয়ে দেখো না। কতো বছর ধরে ওদেশের মানুষ যুদ্ধ করছে, কতো ত্যাগ স্বীকার করছে। ওদের তুলনায় আমাদের প্রস্তুতি কতোটুকু? শেখ মুজিব যে গ্রেফতার হয়েছেন এতে তো কোনোই সন্দেহ নেই। এখন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেবে কে? আওয়ামী লীগের তেমন সাংগঠনিক প্রস্তুতি আছে? আর আমাদের দেশের যে ভৌগলিক অবস্থান তাতে ভারতের সাহায্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অপরিহার্য। ভারতের সঙ্গে এ-বিষয়ে শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের কতোখানি সমঝোতা হয়েছে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট

নয়।... এদিকে মুজিবের সঙ্গে আলোচনার নাম করে ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা সব কিছু বেশ ভালোভাবেই গুছিয়ে নিয়েছে। গুছিয়ে নিয়েই আক্রমণটা করেছে। ওদের মোকাবেলা করা আমাদের জন্যে খুবই কঠিন। প্রচুর নিরস্ত্র মানুষ মারা পড়বে, প্রচুর...।'

অজয়দার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। চিৎকার করে বলে ফেরেছিলাম, 'তা হলে আমাদের কী হবে? আমাদের মুক্তিযুদ্ধ...'।

অজয়দা হেসে বললেন, 'না, আমি কোনো ভয় বা হতাশার কথা বলছি না। কম্যুনিস্টরা বিপদের সামনে ভয় বা হতাশা ছড়ায় না। কম্যুনিস্টদের দর্শন মার্কসবাদ তো আশাবাদেরই দর্শন।'

'মার্কসবাদ একটি আশাবাদী দর্শন'—একথাটা অজয়দার মুখে সেই ৫৭ সাল থেকে বহুবারই শুনেছি। শুনে শুনে মনের ভেতর অপরিমেয় শক্তি পেয়েছি। এবারো সেই শক্তির ছোঁয়া পেলাম।

অজয় দা বললেন—জনগণের শক্তিতেই কম্যুনিস্টরা সব সময় বিশ্বাস রাখে। সেই জনগণকে নিয়েই আমাদের সব বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।...রেলপথের বা অন্য সড়কের ব্রিজগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে, কিংবা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে বলে, পাক মিলিটারিরা যে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে এসে পৌছতে পারবে না, এমনটি মনে করো না।...আজ হোক কাল হোক, শহর তোমাদের ছাড়তেই হবে। গ্রামগঞ্জের জনগণকে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করতে হবে।...এখানে তোমাদের সমমতের যারা আছে তাদের সবাইকে খবর দাও। ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান আর মোস্তফা হামিদ হোসেনের কথা তো জানি। আর কে আছে?...ছাত্রদের সঙ্গে তো কথা হচ্ছেই।...মহাদেব সান্যাল কোথায়? শিল্পী শাহতাব? সেকান্দার হায়াৎ...

এ-রকম আরো অনেকেরই খোঁজ-খবর নিলেন অজয় দা। সবার সঙ্গেই যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলাম।

কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানে এক বন্ধুর মুখে একজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতার কথা শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। ২৫ মার্চের পরই ওই নেতা শহর ছেড়ে সস্ত্রীক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চলে গিয়েছিলেন। এ কয়দিনে আমার বন্ধুটির সঙ্গে তার কয়েকবারই দেখা ও কথা হয়েছে। ওই নেতা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। পাকিস্তানের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তার ওই বিমর্ষতা। তার কথা হলো : পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের ওপর খুবই অবিচার করেছে সন্দেহ নেই। সে জন্যে ওদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য বুঝে নেয়ার জন্যে আমরা সংগতভাবেই এতোদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি। কিন্তু আন্দোলনটা এখন যেদিকে মোড় নিচ্ছে, সে-রকমটি মোটেই বাঞ্ছিত ছিলো না।...পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হতে পারে, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কেমন করে পাবো আমরা? আমাদের নিজের শক্তিতে তো তা হচ্ছে না। এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। এটি কেমন করে হয়? 'হিন্দু ভারত' হলো আমাদের 'ইটার্নাল এনিমি'। ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই তো আমরা পাকিস্তান এনেছিলাম। আজ সেই এনিমির সাহায্য নিয়ে আমাদের স্বাধীন হতে হবে? এটা কোন ধরনের স্বাধীনতা হবে?

ওই নেতাটি অবশ্যি কিছু দিন পরই ভারতে চলে গিয়েছিলেন, এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষেই কাজ করেছিলেন। তবু, আমার বন্ধুর কাছ থেকে সে-নেতার বিশেষ ধরনের

মনোভাবের কথা শুনে সেদিন খুব একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। পরে দেখেছি, এ-রকম মনোভাব সম্পন্ন নেতা আরো অনেকেই ছিলেন। এদের কেউ ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন, কেউ রাজাকার হয়েছেন। সে কারণেই, স্বাধীনতার পরে, এ-রকম আনুষ্ঠানিক মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের রাজাকারদের পক্ষে যোগদানের ফলে রাজাকারের সংখ্যা ও শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও পাকিস্তানের ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপে বসতে পেরেছে।

ভারতের বা অন্য কোনো দেশের সাহায্য ছাড়াই যদি আমরা জয়লাভ করতে পারতাম, তবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের কৃতিত্ব অবশ্যই অনেক বেশি হতো। তবে যে কোনো কারণেই হোক, ভারতের সাহায্য আমাদের নিতে হয়েছে। এতে কি আমাদের মর্যাদা হানি হয়েছে? আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের বা স্বদেশ প্রেমের কি কোনো ঘাটতি ছিলো? আমরা কি কারো করুণার দান হিসেবে স্বাধীনতা পেয়েছি? আমরা কি স্বাধীনতার জন্যে অপরিমেয় মূল্য দিই নি?

স্বাধীনতা আন্দোলনে ও সংগ্রামে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদেরও অনেকের মস্তিষ্ককোষ যে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ছিলো, এ এক মর্মান্তিক সত্য। সেই সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলোতে কোণঠাসা ও ম্রিয়মাণ হয়ে ছিলো, বিনষ্ট বা বিলীন হয়ে যায়নি। একাত্তরের মার্চে 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির'-এর সভাগুলোতে আমি দ্বিজাতিতত্ত্বকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতাম। বলতাম—বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর রচিত হয়ে গেছে। আলোকময় নাহাও এ-রকমই বলতো, এবং মহাউৎসাহে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-এর মতো স্বদেশি গানগুলো গাইতো। এতে যে আমরা 'লিবার‍্যাল' বলে পরিচিত অনেক মানুষেরও ক্রোধের শিকার হয়েছিলাম, সে-বিষয়ে আমাকে সচেতন করে দিয়েছিলেন বন্ধু সৈয়দ আমীরুল ইসলাম। বেশ কয়েকজন 'গণ্যমান্য' লোকই তার কাছে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। বলেছেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, এ তো বেশ ভালো কথা। কিন্তু এ নিয়ে আলোকময় নাহা আর যতীন সরকারের এতো লাফালাফি কেন?'

৩১ মার্চ শ্রী মনোরঞ্জন ধরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হলো। অস্থিরভাবে তিনি পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'তোমার কাছে এখনই আমি লোক পাঠাতে চেয়েছিলাম। শুনেছো তো, কুমিল্লায় ধীরেন দা'কে (ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত) পাক সেনারা ধরে নিয়ে গেছে।...সারা দেশেই এমনটি হবে। তোমারও এখন তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে দেয়া উচিত। আমি আজই চলে যাচ্ছি। আপাতত গৌরীপুরের কাছে ডেউয়াখলা গ্রামে গিয়ে উঠবো। এরপর দেখা যাবে, কী করা যায়। খুব কঠিন সময় এসেছে আমাদের জন্যে।'

মুক্তিযুদ্ধ ও কৃষকের মনোলোক

এপ্রিলের শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, শহর আমাদের ছাড়তেই হবে। যে কোনো সময় ঢাকা থেকে পাকসেনারা ময়মনসিংহে চলে আসতে পারে।

কিন্তু যাবো কোথায়? এবং কী ভাবেই বা যাবো? গ্রামের বাড়িতে ঘরদোর প্রায় নেই বললেই চলে। সে সময়ে একটি ছোট্টো ঘরে কোনোমতে মাথা গুঁজে আছেন আমার বাবা আর ঠাকুরমা। তবে গ্রামে গিয়ে উঠতে পারলে থাকার কোনো অসুবিধা যে হবে না তা জানি।

প্রতিবেশীরাই পরম আদরে আমাদের রাখবে। কিন্তু এখন সেখানে সকলকে নিয়ে যাওয়াই খুব কঠিন। নেত্রকোনা শহর থেকে দশ মাইল দক্ষিণে আমাদের গ্রাম। কাঁচা সড়ক। বাহন বলতে একমাত্র রিকশা। লটবহর নিয়ে সেই রাস্তা পাড়ি দেয়া মোটেই সহজ নয়। তাছাড়া ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা পর্যন্ত যাওয়ারই তো কোনো সহজ বাহন নেই। রেল চলে না, বাস চলে না। পাকসেনার চলাচলকে দুঃসাধ্য করে তোলার জন্যে ব্রিজ ও কালভার্টগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে, বড়ো বড়ো গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড বানানো হয়েছে। পাকসেনাদের জন্যে হয়তো এ সব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা আপাত দুঃসাধ্য হয়েছে, কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্যে হয়ে পড়েছে প্রায় অসাধ্য।

সাড়ে তিন বছর আগে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছি। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শচীন আইচের ছোটো বোন কানন আইচ আমার সহধর্মিণী। পুত্র সুমনের বয়স সোয়া দু' বছর। প্রায়ই সে নানা অসুখ-বিসুখে ভোগে। ওর জন্যেই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা। আমি, আমার মা, ছোটো ভাই, ছোটো বোন, একটি দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নি এবং আমার স্ত্রী ও পুত্র—এই সাতজন তখন আমরা ময়মনসিংহের ভাড়াটে বাসায় থাকি। শহর ছেড়ে এই বৃহৎ পরিবার নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবো তাই যখন ভাবছিলাম, তখন শচীন জানালো যে, তারা ফুলবাড়িয়ায় তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। যে-গ্রামে তাদের বাড়ি, ময়মনসিংহ শহর থেকে তার দূরত্ব মাইল বিশেক মাত্র, সেখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা সে-সময়েও একান্ত দুরূহ হয়ে ওঠেনি। তাই শচীন যখন তার বোন ও ভাগ্নেকে (অর্থাৎ আমার পত্নী ও পুত্রকে) সঙ্গে নিয়ে গেলো, তখন সমস্যার আংশিক ও আপাত সমাধানে আমি কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু সেই স্বস্তি যে অচিরেই চূড়ান্ত অস্বস্তির রূপ নেবে তা তখন বুঝতে পারিনি।

দু'একদিন পর আমি পরিবারের আর সবাইকে নিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত ট্রাকে, কিছুদূর রিকশায় এবং কিছুটা গোরুর গাড়িতে করে নেত্রকোনা শহর হয়ে বারহাট্টায় গিয়ে পৌঁছলাম। বারহাট্টায় আমি দু'বছর মাস্টারি করেছি, এ-এলাকায় অনেকেই আমার পরিচিত, আমার শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যাও এখানে অনেক। তাছাড়া ছোটো ভাই মতীন্দ্র এই বারহাট্টা ইস্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাস করেছে। তারও বন্ধুবান্ধব এখানে কম নেই। তাই বারহাট্টাতেই আপাতত আশ্রয় নেয়া সমীচীন মনে করলাম।

বারহাট্টার পাশেই কলমাকান্দা থানা। কলমাকান্দার পরই সীমান্ত। এরপরই ভারতের মেঘালয় রাজ্য। কাজেই বারহাট্টায় থাকলেই সীমান্ত পাড়ি দেয়াটাও অনেক সহজ হবে। এ-বিবেচনাটাও মাথায় ছিলো। তাই মা-বোন-ভাগ্নির সঙ্গে মতীন্দ্রকে বারহাট্টায় রেখে আমি গ্রামের বাড়িতে বাবা ও ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু বারহাট্টায় আর আমার ফিরে যাওয়া হলো না। ফুলবাড়িয়ায় স্ত্রী-পুত্রের খবর নেয়াও অসম্ভব হয়ে উঠলো। পাকসেনারা কিছুদিনের মধ্যেই ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোনা শহরগুলো দখল করে নিলো। পথঘাট আর আমাদের জন্যে নিরাপদ রইলো না।

এপ্রিলের চার কি পাঁচ তারিখে গ্রামের বাড়িতে যাই। গ্রামের মানুষের চেতনার রূপান্তর দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার মতো একটি লোকও আমি সেদিন আমার গাঁয়ে কিংবা আশপাশের গাঁয়ে পাইনি। যাদের আমি এক সময় কট্টর মুসলিম লিগার বা পাকিস্তানপন্থী বলে জানতাম, তাদেরও অনেককে দেখলাম চূড়ান্ত পাকিস্তানবিরোধী হয়ে যেতে, তাদেরও মুখে 'জয়বাংলা' ধ্বনি। তাই বলে সবারই যে চেতনার সত্যি সত্যি রূপান্তর

ঘটে গিয়েছিলো, তা নয়। গোঁড়া পাকিস্তানপন্থিদের কেউ কেউ পরিস্থিতির রূপান্তর দেখে তাদের বুলির রূপান্তর ঘটিয়েছিলো মাত্র। এবং তারা যে সুযোগের অপেক্ষায় থেকেই তখনকার মতো সংযত আচরণ করে যাচ্ছিলো তা বোঝা গিয়েছিলো মাসখানেক পরেই। নেত্রকোনা শহরটি যখন আর শত্রুমুক্ত রইলো না, পাকসেনারা যখন সেখানে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলো তখনই অন্য অন্য শহরের মতো সেখানেও তারা পাকিস্তানপন্থিদের দিয়ে তথাকথিত শান্তি কমিটি গঠন করলো। সেই শান্তি কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেই আমাদের এলাকারও পাকিস্তানপন্থিদের কেউ কেউ রাজাকার রিক্রুটে মনোযোগ দিয়েছিলো। তবে এ এলাকা থেকে যারা রাজাকার হয়েছিলো তাদের সংখ্যা ছিলো একেবারেই নগণ্য।

আমাদের রামপুর বাজারটি তখন আগের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাজারে অনেকগুলো স্থায়ী দোকান, ক'বছর আগে দোকানের সংখ্যা এর দশ ভাগের এক ভাগও ছিলো না। পাঁচ বছর আগেও রামপুর বাজারে কোনো চায়ের দোকান দেখিনি। এখন দেখলাম রাস্তার ধারেই অন্তত দশটি দোকানে সারাক্ষণ কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে। আর সবগুলো দোকানেই, শহরের মতোই জমজমাট আড্ডা। সে আড্ডায় গাঁয়ের কিশোর-তরুণ-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সকলের সমাবেশ। আড্ডা চলে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। তবে নিতান্ত অলস আড্ডা নয়। কথাবার্তা সব মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে, অর্থাৎ পাঞ্জাবিদের এ দেশ থেকে তাড়াতে, আর কতোদিন লাগবে? ভারত কি আমাদের সাহায্য করবে না? বঙ্গবন্ধু এখন কোথায় আছেন?

এ-সব প্রশ্ন তারা করে বটে, কিন্তু মজার কথা হলো, প্রশ্নগুলোর উত্তর তারা নিজেরাই ঠিক করে রেখেছে। সকলের কাছ থেকে তারা সেই উত্তরই শুনতে চায়। যদি কেউ একটু অন্যরকম কথা বলে, তাদের ঠিক-করে-রাখা উত্তরের সঙ্গে যা মেলে না তেমন কিছু যদি বলে কেউ, তবে আর তার রক্ষে নেই। পারে তো তার ওপর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলতেই হবে : খুব তাড়াতাড়িই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, পাঞ্জাবিরা আর বেশিদিন এদেশে টিকে থাকতে পারবে না, ভারত আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবে, বঙ্গবন্ধু দেশের ভেতরে থেকেই গোপনে যুদ্ধ পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

আসলে মুক্তিপাগল জনতা তখন তাদের প্রশ্নের উত্তরে নিরেট বাস্তবের সত্য জানতে চাইতো না। যা ঘটেছে সেই সত্য নয়, যা ঘটা উচিত সেই সত্য জানতে চাইতো। চাইতো ভাবসত্যের শক্তিতে শক্তিমান হতে, আপন আকাঙ্ক্ষার আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করতে।

শহর থেকে সাইকেলে বা রিকশায় যে কেউ এ পথ দিয়ে যেতেন তাকেই রামপুর বাজারে নামতে হতো, ব্যাকুল জনতার প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। এ রকমই একজন বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে পঁচিশে মার্চ রাতেই পাকসেনারা গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে।' নামতে হতো। ব্যাকুল জনতার প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। এ রকমই একজন বলেছিলেন, করলো। তারপর সেই ভদ্রলোক তার কথা কোনোরকমে ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁচলেন। বললেন : শেখ সাহেব যে গ্রেফতার হয়েছেন এ-কথা তিনিও বিশ্বাস করেন না। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় এ-রকম একটা খবর বেরিয়েছে বলে তিনি শুনেছেন, সেই শোনা কথাটিই তিনি বলেছিলেন মাত্র।

বাজারে বা গাঁয়ের কোনো বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত অনেকে একত্রে বসে রেডিওর খবর শোনে। 'রেডিও পাকিস্তান'-এর খবর তারা শুনতে চায় না, শুনলেও বিশ্বাস করে না।

আকাশবাণী-বিবিসি-ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ ও সংবাদভাষ্যের প্রতিই তাদের আগ্রহ। বিশেষ করে আকাশবাণী। আকাশবাণীতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠে 'সংবাদসমীক্ষা' তাদের আশা ও আশ্বাস জোগায়।

গাঁয়ের নিরক্ষর ও প্রায়-নিরক্ষর মানুষগুলো যেন রাতারাতি রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছে। সম্প্রদায় ও জাতির সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ও তাদের চেতনার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়েছে। কথায় কথায় তারা জাতিসংঘের নাম উচ্চারণ করে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ-থান্ট্ (অনেকেরই উচ্চারণে 'উথান') নামটি সকলের মুখে মুখে। তারা জেনে গেছে : বাঙালিদের ওপর পাকসেনাদের নির্যাতনে রাশিয়া দেশটি ভীষণ অসন্তুষ্ট। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, তাই, আচ্ছা করে প্যাঁদানি দিয়েছে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানকে। বাঙালির ওপর পাকিস্তানিরা অত্যাচার করেছে এতোদিন, এখন আর তা চলবে না। আমরা আর এখন একা নই। রাশিয়ার মতো দেশ আমাদের পক্ষে। 'উথান' আমাদের পক্ষে। আর সবার ওপরে আছে ভারত।

কয়েক বছর আগেও এই রামপুর বাজারের আড্ডায় আড্ডাধারিদের ভারতের (তাদের ভাষায় 'হিন্দুস্থান'-এর) বিরুদ্ধে কতো বিষোদগারই না করতে দেখেছি। হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান তো মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তানের দুশমন না হয়েই পারে না। সেই দুশমন দেশটিই কী করে যেন কোনো জাদুমন্ত্রবলে বন্ধু ও সুহৃদ হয়ে গেলো! আজ আর কেউ সে দেশকে 'হিন্দুস্থান' বলে না, বলে 'ভারত' কিংবা 'ইন্ডিয়া'। সবাই ভারতনেত্রী ইন্দিরা গান্ধী নামটি উচ্চারণ করে একান্ত আপনজনের মতো। আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের সমর্থনে বাঙালি কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রচারিত বক্তব্যগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেনো আবিষ্ট হয়ে যায়। শুধু আবিষ্ট নয়, আশায় আনন্দে উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নিজের পাশে শক্তিমান ও দরদী বন্ধুর উপস্থিতি অনুভব করে।

রেডিও থেকেই গাঁয়ের মানুষ একটি নতুন শব্দও শিখে নেয়—'স্বীকৃতি'। এই 'স্বীকৃতি' কথাটার মধ্যেও সম্ভাব্য একটা শক্তির উপাদান খুঁজে পায় তারা। ভারত যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তবে আর কোনো ভাবনাই থাকে না আমাদের, কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না। ভারত কেন এখনো স্বীকৃতি দিচ্ছে না? কবে দেবে? পরস্পরের কাছে প্রতিনিয়ত এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে সবাই।

আরো প্রশ্ন করে : ভারত তো আমাদের বন্ধু। তবে তারা এখনো কেনো দুশমন পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদের সৈন্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করছে না? এ প্রশ্নে গ্রামীণ সারল্যের একটা অদ্ভুত প্রকাশ দেখেছিলাম করিম ভাই ও তার কয়েকজন কৃষক সাথীর মধ্যে। রামনগর গ্রামের কৃষক করিম ভাইয়ের বয়স তখন পঞ্চাশের কোঠায়। ছেলেবেলা থেকেই আমি তার ও তার মতো আরো অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষকের স্নেহ পেয়ে এসেছি। বড়ো হয়ে শহর থেকে যখন বিভিন্ন সময় গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি, তখন করিম ভাই খুবই কৌতূহলের সঙ্গে আমার কাছ থেকে দেশের রাজনীতির নানা খবর জানতে চাইতেন। এবার, স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিতে তার কৌতূহল যে অনেক বেশি হবে তাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু, কী আশ্চর্য, এবার তিনি কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। দেখা হতেই সোজাসুজি আমাকে অভিযুক্ত করে বসলেন। বললেন, 'তুমি অহনো এইখানে বইস্যা রইছো কিয়ের লাইগ্যা? তুমি ইন্ডিয়ায় যাইয়া হেই দ্যাশের গবরমেন্টের কাছে আমরারে সৈন্য দিয়া সাহায্য করণের কথা কও না ক্যারে কেন?।

আচমকা তার এ-রকম কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। আমাকে হাসতে দেখে তিনি রীতিমতো রেগে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন, 'হাসত্যাছো কিয়ের লাইগ্যা? এইডা কি একটা হাসির কথা অইলো? তোমার মতো শিক্ষিৎ মানুষরা যদি ভারতের গবরমেন্টের কাছে আমরার অবস্থাডা বুজাইয়া কয়, তাইলে কি তারা তোমরার কথা ফালাইয়া দিতে পারবো? পাকিস্তানের মিলিটারিরা আমরার দেশের মাইনসেরে মাইর‍্যা শ্যাষ কইর‍্যা দিতাছে, তারারে এইডা জানাইলে তারাও তারার মিলিটারি পাডাইয়া দিয়া পাকিস্তানি মিলিটারিগুলারে খতম কইর‍্যা দিবো, আমরাও বাইচ্যা যাইয়াম।...আর বইস্যা না থাইক্যা হেই দেশে যাইয়া আমরার বাচনের একটা ব্যবস্থা কইরা আইস্যো।'

করিম ভাইয়ের সঙ্গে সেদিন আর কারা ছিলেন আজ মনে নেই। তবে তার সাথীদের সবাই যে করিম ভাইয়ের কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন, সে কথা বেশ মনে আছে। কৃষকের বিশ্বাস কী সরল আর সবল!

শুধু বিশ্বাস নয়, কৃষক একেক সময় একেকটা প্রত্যয়কে আশ্রয় করে। সেই প্রত্যয়ই তার শক্তি। সেই প্রত্যয়ের বশেই যে কৃষক একদিন 'লড়কে লেঙ্গে' বলে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলো, সেই কৃষকই আজ 'জয়বাংলা' বলে সেই পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটানোর জন্যে জীবন পণ করে বসেছে।

শুধু তাই নয়। কৃষকের প্রত্যয় থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী 'মিথ'-এর সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের জন্মের সময় সৃষ্টি হয়েছিলো একরকম মিথ, বাংলাদেশের জন্মমুহূর্তে অন্য আরেক রকম। একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতেই গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মুখে এ-রকম একটি নবসৃষ্ট মিথের পরিচয় পেলাম। মিথটি হানাদার পাকিস্তানিদের নিয়োজিত জঙ্গি গভর্নর টিক্কা খানকে নিয়ে। শহরে থেকেই শুনেছিলাম যে, টিক্কা খান বাঙালি মুক্তিসেনানিদের হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু পরে এ-ও জেনেছিলাম যে, খবরটি সত্য নয়। কিন্তু গাঁয়ের কৃষক সে-খবরকে শুধু সত্য বলেই বিশ্বাস করেনি, তা থেকে একটি আখ্যানও তৈরি করে নিয়েছে। সে আখ্যানটি এরকম :

টিক্কা খান তো মারা পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ ছেড়ে রাওয়ালপিন্ডিতে চলে যায়। তখন টিক্কা খানের ছেলে এসে ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি যে ফিইর‍্যা আইলা, আমার বাজানেরে কই রাইখ্যা আইছো?' ইয়াহিয়া তার জবাব দিতে চায় না, নানা আবোল-তাবোল বলে টিক্কার ছেলেকে বুঝ দিতে চেষ্টা করে। এরপরও সে বুঝ না মানলে ইয়াহিয়ার মিলিটারি মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। সে ওই ছেলেকে 'শূওর কা বাচ্চা' বলে গাল দেয়। টিক্কার ছেলেও কম যায় না, কারণ সেও তো মিলিটারিরই বাচ্চা। ইয়াহিয়ার গালি শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওই মাতাল বদমাইশটাকে সে গুলি করে বসে। সেই গুলিতে অবশ্যি ইয়াহিয়া মারা যায়নি, তবে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে আছে।

রামপুর বাজারে বসেই এই আখ্যানটি আমি শুনেছিলাম। কৃষকের তৈরি এ-আখ্যানটি শুধু নেহায়েৎ গালগল্প ছিলো না। এর ভেতর কৃষকের কৌতুকবোধ ও কল্পনাশক্তির পরিচয় যেমন মেলে, তেমনি এর পেছনে যে সক্রিয় ছিলো পাকিস্তানি দুশমনদের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-রকম আখ্যান সৃষ্টির মধ্যদিয়ে কৃষক-জনতার ইচ্ছা পূরণেরই অভিব্যক্তি ঘটে।

এই সময়েই আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছিলো রওশন আরার কাহিনী। পঁচিশে মার্চ ঢাকার রাস্তায় যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে চলছিলো, তখন রওশন আরা

নামের এক কলেজ ছাত্রী ওদের ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিয়ে ট্যাংকটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো—এই বানোয়াট খবরটিও গ্রামের মানুষের সাহসী কল্পনার উজ্জীবন ঘটায়। মুখে মুখে পল্লবিত হতে থাকে রওশন আরার কাহিনী, সৃষ্টি হয় রওশন আরা মিথের। রওশন আরার মতো একটা মেয়ে যদি দেশের জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারে, তবে আমরা মরদরা কেন তা পারবো না?

কৃষক জনতার সরল ও সবল প্রত্যয় এবং সেই প্রত্যয় থেকে উৎসারিত নানা মিথ—এ সবই ছিলো মুক্তিযুদ্ধে কৃষক-জনতার শক্তিশালী মানস অস্ত্র। এই অস্ত্রের গুরুত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, কিংবা কৃষকের মনোলোকের বৈশিষ্ট্যের খবর না নিয়ে, কোনোমতেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও অন্তরঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যাবে না।

গাঁও গেরামে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

এপ্রিলেও আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে পাইনি। এর ওর মুখে শুনেছি এরকম একটি বেতারকেন্দ্র নাকি খোলা হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রটি খুবই দুর্বল বলে আমাদের কাছে তার ধ্বনিতরঙ্গ এসে পৌছায় না। তখন আকাশবাণী থেকে যা কিছু প্রচার করা হতো গাঁয়ের মানুষের কাছে তার প্রতিটি শব্দই হয়ে ওঠে একান্ত বিশ্বাস্য ও মান্য। এমনকি যে কথা আকাশবাণী বলেনি সে কথাও তারই বরাত দিয়ে মানুষ মুখে মুখে প্রচার করে, কিংবা নিজের ইচ্ছাপূরণের অনুকূলে তার ভাষ্য রচনা করে নেয়। যেমন, একরাতে আকাশবাণীর একটি কথিকায় বলা হলো : বাংলাদেশের মানুষ হানাদার বাহিনীর জন্যে অর্থের জোগান দিতে কিছুতেই রাজি নয়। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। সেই পাটের থেকে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই পশ্চিম পাকিস্তানিরা আত্মসাত করে নেয়। এবার আর বাংলাদেশের কৃষক তাদের সেই সুযোগ দেবে না। জানা গেছে যে, কৃষকরা এবার আর জমিতে পাট বুনবে না।

পরদিন সকালেই দেখলাম আমার ছেলেবেলায় এক বন্ধু (যে প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি না পেরিয়েই পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দেয় এবং কৃষিকাজে মন দিয়ে যে এখন একজন জাঁদরেল গৃহস্থ হয়েছে) বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে, 'জয়বাংলা গবরমেন্ট অর্ডার দিছে ইবার আর নাইল্যা (পাট) করণ যাইবো না। পাকিস্তানিরা আমরার নাইল্যা বেচা টাকা দিয়া বোমা-বন্দুক কিইন্যা আইন্যা আমরারেই মারে।...কাজেই যারা যারা নাইল্যা ক্ষেত করছুইন তারার হগলেরই হেই ক্ষেত ডাইঙ্গা দেওন লাগবো।'

এবং সত্যি সত্যিই দেখলাম তাই হলো। সকল কৃষক ক্ষেতের পাট গাছ নষ্ট করে দিলো। শুধু আমাদের গ্রামে নয়, আশপাশের সব গ্রামেও। পরে শুনেছি, সারা বাংলাদেশ জুড়েই এ রকমটি হয়েছে।

কিছুদিন পর যখন পাকিস্তান একশো টাকার নোট বাতিল করে দিলো এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে সব নোট ব্যাংকে জমা দিয়ে নতুন নোট নিয়ে আসার জন্য সাধারণকে নির্দেশ দিলো—তখনো আকাশবাণীর এক কথিকায় বলা হলো যে, বাংলাদেশের মানুষ ওই সব একশো টাকার নোট জমা দিয়ে পাকিস্তানিদের বাঙালিঘাতী অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ জোগান দিতে রাজি নয়। (অবশ্য আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, ওই কথিকাটি আকাশবাণী থেকে

না স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিলো। কারণ সে সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানও গ্রামে থেকেই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম।) গাঁয়ের কৃষকরা এই কথিকাটির অর্থ করলো : 'জয়বাংলার গবরমেন্ট' একশো টাকার নোট জমা দিতে নিষেধ করেছে এবং এ রকম সব নোট নিজেদের কাছে রেখে দিতে বলেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে সব নোটের বদলে তাদের নতুন নোট দেয়া হবে।

দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই অনেকে পাকিস্তানি একশো টাকার নোটগুলো নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে। বিশ্বাস করেছে যে, দেশ স্বাধীন হলে সেই নোটের বদলে নতুন সরকারের কাছ থেকে নতুন নোট পাবে। তবে এ কথাও ঠিক : এ রকম একশো টাকার নোটের মালিক গাঁয়ের সাধারণ কৃষকের মধ্যে খুব বেশি ছিলো না। গাঁয়ে যারা টাকাওয়ালা তারা ধনী কৃষক ও জোতদার। কৃষক সমাজের ভেতরে থেকেও এদের জাত আলাদা। এদের বৈষয়িক বুদ্ধি খুবই প্রখর। মেহনতি কৃষক বা ভাগচাষীদের গায়ের রক্ত চুষেই এদের বাড়-বাড়ন্ত। গাঁয়ের মহাজন বা ব্যাপারিদের উদ্ভবও এদের ভেতর থেকেই। কাজেই বেনে বুদ্ধিতেও এরা পাকা। 'জয়বাংলা'র প্রতি এদের সমর্থন থাকলেও জয়বাংলার আবেগের তোড়ে ভেসে যেতে এরা রাজি নয়। তাই, দশ/পনেরো মাইল দূরের ব্যাংকে গিয়ে নোট জমা দিয়ে আসতে এরা একটুও ভুল করে না।

অন্যদিকে, যারা সাধারণ কৃষক, যারা নিজেদের মালিকানার সামান্য জমিতে গতর খাটিয়ে ফসল ফলায় কিংবা অন্যের জমি ভাগে চাষ করে, তারাই সমগ্র কৃষক সমাজের তথা গাঁয়ের মানুষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। চির দারিদ্র্যের ভেতরই তাদের বসবাস। তবু গায়ের রক্ত জল করে তারাও কিছু টাকা জমায়, রাখে মাটির পাতিলে, বালিশের খোলে কিংবা ঘরের বাঁশের খুঁটি ফুটো করে তারই ভেতরে। এভাবেই তাদের কারো কারো কাছেও একশো টাকার নোট দুটো একটা জমা হয়ে যায়। লোককথায় আমরা টুনির ধনের গল্প শুনেছি। এক টুনটুনি কোত্থেকে একটি টাকা কুড়িয়ে পেয়ে তার বাসায় নিয়ে রেখেছিলো। আর সেই এক টাকার গর্বেই সে বলে বেড়াতে শুরু করেছিলো—'রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে।' এ রকম টুনির ধনের মতো একশো টাকা মূল্যমানের নোট নিয়ে টুনির মতোই একান্ত ক্ষুদ্র মেহনতি কৃষকেরও গর্ব। সেই গর্বই সে একাত্তরে মিশিয়ে দিয়েছিলো 'জয়বাংলা'র গর্বের সঙ্গে। জয়বাংলার গর্বের সেই টুনির ধনকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলো মুক্তবাংলার সরকারের হাতে তা তুলে নিয়ে নতুন গর্বের ধন পাবে বলে। (কিন্তু একান্ত স্বাভাবিক ও বাস্তব কারণেই তা পায়নি এবং এই না-পাওয়া তার স্বাধীনতার গর্বকে ভীষণভাবে আহত করে। তবে, সে প্রসঙ্গ এখন নয়।)

আকাশবাণী শুনে গাঁয়ের মানুষকে সবচেয়ে বেশি উল্লাসে ফেটে পড়তে দেখেছিলাম সতেরোই এপ্রিল রাতে। সেদিনই মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করেন। আকাশবাণীতে সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচার করা হয়েছিলো। সে বিবরণী শুনে শহরের মানুষের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো জানি না। গাঁয়ের মানুষের প্রতিক্রিয়া আমি প্রত্যক্ষ করেছি। বুঝেছি, তাদের আস্থা ও প্রত্যয় মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে।

গ্রামে গিয়ে, একটুও দেরি না করে, হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, চুয়ান্ন সাল থেকে যিনি আওজিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্মলগ্ন থেকে যিনি এ পার্টির কেন্দুয়া থানা শাখার সভাপতি, আমার সেই

হেকিম ভাইকে দেখলাম কেমন যেন নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হয়ে গেছেন। আগের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা আর নেই। সিনিকের মতো তাঁর কথাবার্তা। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করেন বটে, কিন্তু যাদের হাতে এ সংগ্রামের নেতৃত্ব সেই আওয়ামী লীগ দলটির ওপর তাঁর মোটেই আস্থা নেই। সেই আস্থাহীনতা থেকেই মুক্তিসংগ্রামের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর হতাশা। সেই হতাশাই তাকে অসুস্থ ও উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে।

তবে আমি বরাবরই দেখে এসেছি, হেকিম ভাই যতো হতাশ আর অসুস্থই থাকুন না কেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি অল্প সময়েই চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। এবারও তাই দেখলাম। এই মুক্তিসংগ্রামে যে আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকা চলবে না, এ বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন। হেকিম ভাই সেই বায়ান্ন সালের মতোই যেনো আরেকবার উৎসাহে জ্বলে উঠতে চাইলেন। বসুর বাজারের পাশের মাঠটিতে একটি জনসভা ডাকলেন। অনেক লোকের জমায়েত হলো। গাঁয়ের কৃষক, দোকানদার, গ্রাম্য ডাক্তার, স্কুল মাস্টার এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রের উপস্থিতিতে সভা জমজমাট হয়ে উঠলো। হেকিম ভাই-ই প্রথমে বক্তৃতা দিলেন। তিনি যে কবি, সে বক্তৃতায় তারই প্রকাশ ঘটেছিলো। জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো, তিনি যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছেন, নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করছেন। যে সব শব্দ ও উপমা তিনি তাঁর বক্তৃতায় ব্যবহার করছিলেন সেগুলো সেখানকার অধিকাংশ শ্রোতারই বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। তবু সে সব শব্দ ও উপমা তিনি কেন টেনে এনেছিলেন? নিজেকে শোনানোর জন্যেই নয় কি? কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলিম লীগের রাজনীতিকে সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের জন্মের পর মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েও যিনি আশা রেখেছিলেন যে, দেশটিতে ইসলামিক ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা হবে এবং সেই লক্ষ্যেই মহা-উৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন তমদুন মজলিসে, সেই তিনিই নিজের তিল তিল স্বপ্ন ও আবেগ দিয়ে গড়া পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটাতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। এর কৈফিয়ৎ কি নিজের কাছে না দিয়ে তিনি পারেন? নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছিলেন বলেই তার সেদিনের কথা অন্য কেউ বুঝলো কি বুঝলো না সেদিকে তার খেয়াল ছিলো না।

আগাগোড়া যারা পাকিস্তানপন্থী ছিলো, পাকিস্তানি দুঃশাসনের প্রতি যাদের কোনোই ক্ষোভ ছিলো না, বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলোতে যারা অনায়াসে বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পেরেছিলো, বাংলাদেশের সেই সব বিবেকহীন মানুষগুলোর ভাবনাচিন্তা ছিলো একান্তই স্থবির ও একমাত্রিক। বিবেকহীন বলেই আপন বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াবার কোনো দায় তাদের ছিলো না। আর পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে যারা ছিলো অসম্পর্কিত, সেই তরুণ প্রজন্মের বাঙালিদের দৃষ্টি তো সামনের দিকে, বাঙালির জন্যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্মদানই তাদের লক্ষ। তাদের বিবেক তো একান্ত পরিষ্কার, নিজের কাছে কৈফিয়ত দেবার জন্যে কিছুই তাদের নেই। কিন্তু হেকিম ভাইয়ের মতো যারা পাকিস্তানের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, তারাই যখন সেই পাকিস্তানের ধ্বংসের প্রয়োজনে হাত লাগাতে বাধ্য হলেন, তখন তারা অবশ্যই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে নিয়ে পারেন না। হেকিম ভাই ছাড়াও এরকম আরো কিছু মানুষকে আমি খুবই কাছে থেকে দেখেছি এবং তাদের আত্মদ্বন্দ্বের পরিচয়ও কিছু কিছু পেয়েছি। এই মানুষদের অনেকে আত্মদ্বন্দ্বে জয়ী হতে পেরেছেন, অনেকে তা পারেননি। যারা জয়ী হতে পেরেছেন তারাই

অতীতকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেছেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে যুক্ত হয়েছেন। আর যারা নিজেদের ভেতরকার পাকিস্তানি ও সাম্প্রদায়িক সত্তাটিকে পরাজিত করতে পারেননি, অথচ বাঙালিত্বের আবেগেও ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হয়েছেন, তাঁরাই থেকে গেছেন চির দোদুল্যমান। বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সময়টিতে তাঁদের কেউ নিষ্ক্রিয় থেকেছেন, কেউ পাক হানাদারদের তৈরি তথাকথিত 'শান্তি কমিটি'তে যোগ দিয়ে বা অন্যভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। আবার এদেরই কেউ কেউ কখনো কখনো নিজেদের আচরণের জন্যে লজ্জিত বা অনুতপ্ত যে হননি, তাও নয়। তবু শেষ বিচারে এই দোদুল্যমান মানুষগুলোকে মুক্তিকামী বাঙালির দুশমন ও পাকিস্তানের দালাল বলেই চিহ্নিত করতে হয়।

মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে হেকিম ভাইয়ের ভেতর কোনো দোদুল্যমানতা ছিলো না। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মোহপাশ তিনি অনেক আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানোত্তর কালে পাকিস্তানবাদী মুসলিম লীগ নেতাদের আচরণে তাদের প্রতি যে অবিশ্বাস তার ভেতর দেখা দিয়েছিলো, সেই অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়েই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ নেতাদের দিকেও তাকিয়েছিলেন। নেতৃত্বের ওপর এ রকম অবিশ্বাসই তাকে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ী করে তুলেছিলো। সেই সংশয় সত্ত্বেও তিনি যে বাঙালি জাতির এই মুক্তিযজ্ঞ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন না, পাকিস্তান নামক যে প্রতারণার ফাঁদে তিনি যৌবনে পা দিয়েছিলেন সেই ফাঁদ থেকে যে তাকে বেরিয়ে আসতে হবেই—বসুর বাজারের সভায় হেকিম ভাই সেদিন সে কথাগুলোই স্বগতোক্তির মতো বলে গিয়েছিলেন।

হেকিম ভাইয়ের বক্তৃতার পর সকলের করণীয় নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি আসলে কোথায় কীভাবে কোনদিকে যাবে তা তখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছিলো না। একটি মুক্তিযুদ্ধ যে শুরু হয়েছে, এবং এ যুদ্ধ যে অনেক তীব্র হয়ে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় অবিশ্যি ছিলো না। কিন্তু গাঁয়ের তরুণরা প্রশ্ন করছিলো, 'কীভাবে আমরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবো, কারা কোথায় আমাদের রিক্রুট করবে?' এ প্রশ্নের জবাব এপ্রিলের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেও আমরা জানতাম না। তবু বসুর বাজারের সেদিনের সভায় খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের নেতৃত্বে 'সংগ্রাম পরিষদ' ধরনের একটা শিথিল সংগঠন আমরা খাড়া করেছিলাম। গাঁয়ে যাতে কোনো পাকিস্তানি দালালের উদ্ভব ঘটতে না পারে, আইনশৃঙ্খলার যাতে অবনতি না ঘটে, ব্যবসায়ীরা যাতে জিনিসপত্রের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অনুচিত মূল্যবৃদ্ধি না ঘটাতে পারে, কোনো সাম্প্রদায়িকতার যেন সৃষ্টি না হতে পারে—এই সব বিষয়ে সচেতন থাকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করাই 'সংগ্রাম পরিষদ-এর দায়িত্ব বলে সেই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো।

মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব

সাতষট্টির পরে বেশ ক'বছর গ্রামের বাড়িতে আসা হয়নি। এরপর এলাম এই একাত্তরের এপ্রিলে। ছেষট্টির ছয়দফা, আটষট্টি-উনসত্তরের আইউব বিরোধী আন্দোলন, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন ও একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা—এ-সব যে গ্রামের মানুষের ভাবনায় ও আচরণে অসাধারণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে তা সহজেই বোঝা যায় তবে পরিবর্তনের প্রকৃতি ও প্রকাশ

সকলের মধ্যে একই রকম নয়। সামাজিক অবস্থান, বয়স, শিক্ষা, কিংবা পারিবারিক পরিবেশভেদে পরিবর্তনের প্রকৃতি যেমন পৃথক, এর প্রকাশও তেমনি স্বতন্ত্র।

আমাদের এলাকার গ্রামগুলোতে বেশ কিছু ধনী কৃষক পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এগুলো সবই মুসলিম পরিবার। ব্যাপকভাবে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলেই এগুলোর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। আর এভাবেই জন্ম হয়েছে কিছু মাঝারি মাপের স্বচ্ছল পরিবারেরও। এ সব পরিবারের মূল উপজীবিকা কৃষি হলেও সে সঙ্গে আয়ের অন্যান্য পথও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কেউ ছোট খাটো ব্যবসা করে এবং কারো ছেলেপুলে প্রাইমারি কিংবা হাইস্কুলে মাস্টারি অথবা শহরে অন্য কোনো চাকরি করে। উকিল কিংবা ডাক্তারও হয়েছে দু'একজন। এ পরিবাগুলোর সদস্যদের চরিত্র আর এখন মেহনতি কৃষকের নয়। কৃষকের সরল আর সবল বিশ্বাস এখন তাদের নেই। তাদের মাথায় এখন নানান প্যাঁচ, ভাবনায় হরেক রকম জটিলতা। একই পরিবারের ভেতরে একাধিক ও পরস্পর-বিরোধী ভাবনাচিন্তার ট্রেন্ড।

মুসলিম কৃষক সমাজের মধ্য থেকে ইংরেজ আমলে বা পাকিস্তান জামানার গোড়ার দিকে বেরিয়ে এসেছিলেন যে-সব গ্রামীণ এলিট তাদের সঙ্গে এ-সমাজের নতুন এলিটদের চিন্তা ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারটি আমার কাছেও বিশেষভাবে ধরা পড়েছিলো আমার ছেলেবেলার শিক্ষক সোনাফর মাস্টার সাহেবের তখনকার অবস্থান ও তার প্রতি গ্রামের তরুণদের আচরণ দেখে।

একাত্তরে রামনগর গ্রামের সোনাফর মাস্টার সাহেবের বয়স পঁচাত্তরের কম নয়। চুয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ সাল—এই তিন বছর আমি রামপুর প্রাইমারি স্কুলে তাঁর কাছে পড়েছি। তিনিই ছিলেন এই স্কুলটির প্রধান শিক্ষক। শুধু প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন, তিনি তখন দলপা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, রামপুর পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার এবং সরকারি বেসরকারি এ-কমিটি সে-কমিটির চেয়ারম্যান বা মেম্বার। একসঙ্গে এতোগুলো দায়িত্ব পালন করতে গেলে কাজের চাপে অবশ্যই হিমশিম খাওয়ার কথা। অথচ তাঁর চলাফেরা দেখে এরকম মনে হতো না। প্রায় সারাক্ষণই তাকে দেখেছি মজলিসি মেজাজে এখানে-ওখানে আসর জমিয়ে বসতে, নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে গল্পগুজব করতে। আসলে এ-সব মজলিস বা আড্ডাগুলোর মধ্যেই অনেক সামাজিক কাজকর্ম তিনি সেরে ফেলতেন, অনেক বিচার-সালিশও সেখানে সম্পন্ন হয়ে যেতো। আর তাছাড়া সব কাজে সাহায্য করার জন্যে তার ভক্তরা যেন সব সময় তৈরি হয়েই থাকতো। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসিয়াল কাজের জন্যে তিনি একজন খুব দক্ষ কেরানি পেয়েছিলেন। কাজেই বোর্ডের কাজ নিয়ে তাকে খুব মাথা ঘামাতে হতো না, কেরানি সাহেবের বাড়িয়ে দেয়া কাগজপত্রে চোখ বুঁজে কিছু সই দিয়ে দিলেই চলতো। রামপুরের কামিনী কুমার চক্রবর্তী ও চন্দনপাড়ার নগেন্দ্র দত্ত তাঁকে পোস্টমাস্টারি চালাতে সাহায্য করতেন। তবু অন্য সব দায়িত্ব ও দেনদরবার সেরে স্কুলের মাস্টারি করার মতো সময় তিনি খুব কমই পেতেন। তার দুই সহকর্মি শিক্ষক নগেন্দ্র নন্দী ও সুরেশ পণ্ডিত ছাত্রদের পড়ানোর কাজ চালিয়ে নিতেন। সপ্তাহে দু'তিন দিনের বেশি তিনি স্কুলে যেতে পারতেন না। অথচ, এ নিয়ে তার সহকর্মিদের কিংবা গাঁয়ের অন্য মানুষদের কারো কোনো অভিযোগ ছিলো না। এমনকি স্কুল ইন্সপেক্টরও সোনাফর মাস্টারের স্কুলে অনুপস্থিতিটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। পল্লীর জননেতা ও সমাজসেবী হিসেবে সোনাফর মাস্টার সকলের শ্রদ্ধেয়। তার ওপর সকলের আস্থা ও নির্ভরতা।

সাধারণ কৃষকের ছেলে সোনাফর উদ্দিন ম্যাট্রিকও পাস করেননি। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েই স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর গুরু ট্রেনিং স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে (জিটি পাস করে) প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হয়েছিলেন। এইটুকু অ্যাকাডেমিক শিক্ষাই সোনাফর মাস্টারকে গ্রামে এলিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্যে যথেষ্ট হয়েছিলো। তার সমসময়ে আমাদের গ্রাম এলাকায় তার মতন এ রকম 'নন ম্যাট্রিক জিটি'ও মুসলমানের মধ্যে কম ছিলেন। তাছাড়া তিনি কাব্যচর্চাও করতেন, অর্থাৎ ছন্দ মিলিয়ে পদ্য রচনা করতেন। বিভিন্ন আসরে তার সে-সব পদ্য তিনি পড়ে শোনাতেন, শ্রোতারা তাতে খুবই আমোদ পেতো। চলতি রাজনীতির খোঁজখবর যেমন তিনি ভালোভাবেই রাখতেন, তেমনি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গেও তার পরিচয় ছিলো খুবই ঘনিষ্ঠ। হিন্দু পুরাণ সম্পর্কে তার জ্ঞান সকলকে অবাক করে দিতো। হরধনু ভঙ্গ করে জনক রাজার কন্যা সীতাকে বিবাহ করেছিলেন রামচন্দ্র। সেই সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো লংকার রাজা রাবণ। রামচন্দ্র বানর সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করেছিলেন—রামায়ণের এই বহুল প্রচলিত কাহিনী তো আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু গ্রামীণ লোকসমাজে মানুষের মুখে মুখে কিংবা রামমঙ্গল গানের আসরে গায়েনের তাৎক্ষণিক উপস্থাপনায় রামকাহিনীর কতো যে রূপভেদ তৈরি হয়েছিলো তার খবর আমাদের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞরাও খুব কমই রাখেন। কৃষক সন্তান সোনাফর মাস্টার ছিলেন ওই সব লৌকিক রামকথার ভাণ্ডারী। রামকথার অনেকগুলো রূপভেদের সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি একটি চমৎকার পালা রচনা করেছিলেন। এই পালাটিতে জনক ও রামচন্দ্রের রাজরূপের চেয়ে কৃষকরূপই বড়ো হয়ে উঠেছিলো। কৃষকের সেই সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় যে-রাবণ সে হচ্ছে গ্রামীণ জোতদার-মহাজনেরই প্রতিভূ। সোনাফর মাস্টার তার সেই পালাটিতে জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক প্রজার বিজয়ের প্রত্যয়ই ঘোষণা করেছিলেন।

ছেলেবেলায় মাস্টার সাহেবের লেখা এই পালাটি আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিলো। কিন্তু মাস্টার সাহেব সেটি সংরক্ষণ করেননি। পরে অনেকবার খোঁজ করেও পালার পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করতে পারিনি। বড়ো হয়ে যখন সমগ্র নজরুল-রচনাবলী পড়েছি, তখন লক্ষ করে অবাক হয়ে গিয়েছি : নজরুল রামকথার যে তাৎপর্য নিষ্কাশন করেছিলেন সেটি সোনাফর মাস্টার সাহেবের পালার বক্তব্যের সঙ্গে স্বরূপে এক। মাস্টার সাহেব নজরুলের ওই রচনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তবু, দুজনের বক্তব্যে এ-রকম ঐক্য ঘটে যাওয়ার কারণ সম্ভবত লোককথার স্পিরিটের মধ্যেই নিহিত আছে।

সোনাফার মাস্টার তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে কৃষকপ্রজা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বিশ ও তিরিশের দশকে মুসলমান কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা যে কোনো লেখাপড়া জানা মানুষের জন্যে এরকমটিই ছিলো স্বাভাবিক। সে সময়েও মুসলিম লীগ যে একান্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি, সাঁইত্রিশ সনের নির্বাচনে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষকপ্রজা পার্টির বিজয়ই তার প্রমাণ। সে-সময়কার পূর্ব ময়মনসিংহে আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী কৃষকপ্রজা পার্টির নেতা হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বোকাইনগরীর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের সোনাফর মাস্টার সাহেব। বোকাইনগরীর অনুসরণেই তিনি প্রাকৃত বাংলায় লোকায়ত বাকরীতি ও প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগ করে চমৎকার গণমনোহর বক্তৃতা দিতেন। তিনি যে কৃষকের সন্তান সেটির জন্যেই ছিলো তাঁর গর্ব, সে গর্বই তিনি সকল কৃষক-সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চাইতেন। বোকাইনগরী ও সোনাফর মাস্টারদের

মতো মানুষদের প্রয়াস যে গ্রামবাংলায় মুসলমান কৃষকদের হীনমন্যতা অনেক পরিমাণেই দূর করে দিতে পেরেছিলো, সে কথা মানতেই হবে। চল্লিশে লাহোর প্রস্তাব উথাপনের পরে যখন মুসলমান সমাজে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়, বলতে গেলে মুসলিম লীগই হয়ে ওঠে সকল মুসলমানের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন, তখন সোনাফর মাস্টারও মুসলিম লিগার হয়ে যান। এবং মুসলিম লিগার হলেও সাম্প্রদায়িক হননি। আমি জানি, এই তথ্যটির সত্যতা সম্পর্কে অনেকেই তীব্র সন্দেহ ব্যক্ত করবেন। মুসলিম লিগারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিই দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, তাই সোনাফর মাস্টার নামক এক ব্যক্তি মুসলিম লিগার হয়েও অসাম্প্রদায়িক হন কী করে?

কী করে হন তা বলতে পারবো না। তবে সোনাফর মাস্টার যে মুসলিম লিগার হয়েও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী থেকেছিলেন, আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছি। পাকিস্তানের জন্মের আগে মুসলিম লীগের পক্ষ নিয়ে মহেন্দ্র চৌধুরী, কামিনী চক্রবর্তী কিংবা পবিত্র দাশের সঙ্গে সোনাফর মাস্টার সাহেবকে খোলামেলা তর্কবিতর্ক করতে দেখেছি। তর্কের ক্ষেত্রে আপন আপন অবস্থান থেকে একটুও হেলেননি এঁরা। অথচ তারপরও যে এঁরা সম্প্রীতি ও প্রসন্নতা বজায় রাখতে পেরেছেন তার মূল কারণটা নিহিত ছিলো সোনাফর মাস্টারের উদার চরিত্রের মধ্যেই। মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবকে তিনি এ দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান বলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাস পোষণের জন্যে তাঁকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপরায়ণ হতে হয়নি। যে হিন্দু ভদ্রলোকদের সঙ্গে পাকিস্তান নিয়ে তিনি তুমুল তর্কবিতর্ক করতেন তাঁদের তিনিই ছিলেন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী। শুধু 'ভদ্র' হিন্দুরা নয়, তথাকথিত 'ছোটোলোক' হিন্দুরাই সোনাফর মাস্টারকে বেশি আপন বলে ভাবতো। দলপা আর আশুজিয়া—পাশাপাশি দুটো ইউনিয়ন বোর্ড, সোনাফর মাস্টার দলপা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু দলপা ইউনিয়নের সংলগ্ন রামপুর ও চন্দপাড়া সহ আশুজিয়া ইউনিয়নের অনেকগুলো গ্রামের হিন্দুরা ন্যায়বিচারের জন্যে সোনাফর মাস্টারের ওপরই ভরসা রাখতো। পাকিস্তানের জন্মের ঠিক আগে এবং পরে যখন বেশ কয়েকবার আমাদের এলাকাতেও সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বেধে যাওয়ার মতো অবস্থার উদ্ভব ঘটেছিলো, তখনো শেষ পর্যন্ত যে তা ঘটতে পারেনি তাতে সোনাফর মাস্টারের অবদান ছিলো সবচেয়ে বেশি। অথচ তিনি মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন বা পাকিস্তানবাদ পরিত্যাগ করেননি একদিনের জন্যেও। চুয়ান্নর নির্বাচনেও তিনি ছিলেন যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে, সত্তরের নির্বাচনেও উল্টো হাওয়ার পন্থি।

একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসে এই সোনাফর মাস্টারকে দেখলাম খুবই বিমর্ষ। বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তিনি বেশ সুস্থ ও সবল। ইচ্ছে করলে সে সময়ে তিনি 'জয়বাংলা'র পক্ষে বা বিপক্ষে একান্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা হলেন না। তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেও মনের দিক দিয়ে যে শান্ত থাকতে পারছিলেন না আচরণে তার প্রকাশ ঘটে যাচ্ছিলো। আমার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলেও সামান্য কুশল বিনিময়ের চেয়ে বেশি আর কিছু বললেন না। তাঁর এ রকম শীতল ব্যবহারে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। রামপুর প্রাইমারি স্কুলে আমার যারা সহপাঠী ছিলো—অর্থাৎ যারা আমার মতোই সোনাফার মাস্টার সাহেবের ছাত্র—সেই সুরুল, হামিদ, রাশিদ, তাহেররা বললো যে, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। গত ইলেকশানের পর থেকেই তিনি তাঁর প্রাক্তন ছাত্র বা আশপাশের লোকজনের সঙ্গে খুব কম কথা বলেন, প্রায় সব সময়েই গম্ভীর হয়ে থাকেন, অস্থিরভাবে পায়চারি করেন। প্রথম দিকে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে

কিছু যুক্তি উথাপনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অন্য সকলের মধ্যে উল্টোভাবের প্রসার দেখে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তরুণদের প্রায় সবাই এখন তাকে এড়িয়ে চলে, তার ছেলে হাশিম উদ্দিনের অবস্থানও 'জয়বাংলা'র শিবিরে। মন খুলে কথা বলার মতো কাউকে পান না বলেই পারতপক্ষে তিনি মুখ খোলেন না। কেবল অন্তরঙ্গ দু'একজনের সঙ্গেই একান্ত নিভৃতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ নামক এক 'পাগলামি' ও মুসলমান ছেলেছোকরাদের এ-ধরনের 'আত্মঘাতী' কর্মকাণ্ডের জন্যে ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেন।

দলপা আর আশুজিয়া—পাশাপাশি এই দুই ইউনিয়ন বোর্ডে দীর্ঘদিন ধরে চেয়ারম্যানগিরি করেছেন যথাক্রমে সোনাফর মাস্টার ও খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। দু'জনের বয়সের ব্যবধান প্রায় বিশ বছরের। পাকিস্তান আন্দোলনে দুজনেই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। মাস্টার সাহেব পাকিস্তানবাদের বৃত্তের মধ্যেই আটকে রইলেন, আর হেকিম ভাই সারা জীবন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করেই এক সময়ে পাকিস্তানবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেন ও বাংলাদেশ সৃষ্টির আয়োজনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিলেন। একজন অতীতকে আঁকড়ে ধরে থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হলেন, অন্যজন নতুনকে স্বাগত জানিয়ে মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেন।

গ্রামের মুসলিম সমাজের মনোভাবের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এই দু'জনকে দুটি প্রতীকী চরিত্র বলে আমার মনে হয়।

সমাজমানসের বহুমুখী দ্বন্দ্ব ও মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও তার প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করতে হলে শুধু মোটা দাগে এ যুদ্ধের শত্রুমিত্রদের কথা বললেই যথেষ্ট হবে না। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বলে আমরা যাদের নির্দেশ করি তাদের ভেতরেও যে ছিলো নানা ভাবনার ধারা-উপধারা, ছিলো নানান ধরনের আত্মদ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতা, একই পরিবার থেকে যে বেরিয়ে এসেছিলো মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার, আবার ঘোষিত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকাররাও যে সকলে সব সময় নিজ নিজ দায়িত্বে নিষ্ঠাবান না থেকে প্রতিপক্ষের স্বার্থসাধক কাজকর্ম করে বসেছে—সে-সমস্ত বিষয়ও অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধটি ছিলো অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া, এই জটিলতার সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা প্রায়শই আত্মপ্রতারণার শিকার হই।

একই পরিবারে বাপ-ছেলের মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলেছে দ্বন্দ্ব। বাপ পাকিস্তানের দালাল বা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আর ছেলে হয়েছে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার—এ রকম দৃষ্টান্ত তো অনেক আছে। এ ধরনের স্পষ্ট দ্বন্দ্বের কথা আমি এখানে বলছি না। আমি বলতে চাইছি সূক্ষ্মতর দ্বন্দ্ব-বিরোধের কথা। পাকিস্তানি মিলিটারির অত্যাচার-উৎপীড়নে যে কোনো পরিবারের সবাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন, সবাই এ অবস্থার অবসান চাইছেন। কিন্তু পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি বলেছেন, 'পাকিস্তান ভেঙে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগের ছেলেছোকরারা বড়ো বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এই বাড়াবাড়ির ফলেই তো আমাদের এই দুর্ভোগ।...এখনো সময় আছে। একটা মীমাংসা হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।'

পরিবারের তরুণ সদস্যটি পিতার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'কোনো মীমাংসার আর সুযোগ নেই এখন। হানাদারদের তাড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। আর পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের চা-ই চাই।'

এই নিয়ে পিতাপুত্রের ঘোর তর্ক ও মন কষাকষি।

এ-রকম মতের দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে বারবার আমার বন্ধু সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও তার বাবা সৈয়দ আফসার উদ্দিন সাহেবের মধ্যেকার বাদ-প্রতিবাদের কথাগুলো মনে পড়ে। না, আমি নিজের কানে পিতাপুত্রের বাদ-প্রতিবাদ শুনিনি। তাঁরা আমাকে সাক্ষী রেখে মতের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হননি। নানা কথাপ্রসঙ্গে আমীরুল ইসলামই তার পিতার ক্ষোভের কথাগুলো আমাকে জানিয়েছেন। পিতার সঙ্গে সে সময়ে তার যে-সব সংলাপ হয়েছিলো, মুক্তিযুদ্ধের সময় পিতার যে-দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছিলো, সে-সব নিয়ে সৈয়দ আমীরুল ইসলাম স্বাধীনতার পরে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন—'*আমার পিতা অসুস্থ*।' আমি উপন্যাসটি একাধিকবার পড়েছি। উপন্যাসের কাহিনীতে অবশ্যই, স্বাভাবিকভাবেই, নানা কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ আছে। তবে, পিতাপুত্রের সংলাপগুলোতে কাল্পনিকতা প্রায় নেই বললেই চলে। পিতা সৈয়দ আফসার উদ্দিন আর পুত্র আমীরুল ইসলামের সংলাপে পাকিস্তান প্রসঙ্গে দুই প্রজন্মের মনোভঙ্গির পার্থক্যটিই ফুটে উঠেছে।

আফসার সাহেব একজন আইনজীবী। জীবিকার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে প্রথম যৌবনে অনেক কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। সে-সংগ্রামে তাঁর প্রতিপক্ষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রায় কেউই আজ আর এদেশে নেই। আফসার সাহেব যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন যাঁরা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, জাতে তাঁরা হিন্দু। এদের প্রতিষ্ঠাকে অতিক্রম করে কোনো মুসলমানের ছেলের নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা কী যে কঠিন কর্ম ছিলো তা আজকালকার ছেলেছোকরারা বুঝবে কেমন করে? কেমন করে বুঝবে পাকিস্তান না হলে এদেশের মুসলমানরা আজো কোন পর্যায়ে থাকতো? পাকিস্তানের জন্ম হলো বলেই তো সেই প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দুদের পরাক্রমের অবসান ঘটলো, ওরা অনেক দীর্ঘদিনের অনেক কায়েমি আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, অনেকে দেশ থেকেই পালালো। আর তার ফলেই তো এদেশের মুসলমানরা মানুষের মর্যাদায় আসীন হতে পারলো। যে পাকিস্তানের কল্যাণে এ-রকমটি সম্ভব হয়েছে একালের মুসলমান ছেলেরা কিনা সেই পাকিস্তানটিকেই ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে। হিন্দুরা কিংবা ভারতের নেতারা পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানের জন্মকে যেমন তারা ঠেকাতে চেয়েছে, জন্মের পর সেই পাকিস্তানকে ধ্বংসের জন্যে তারা অবিরাম চেষ্টা করে গেছে। এখন তো পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ছেলেরাই হিন্দু ও হিন্দুস্থানের হাতে পাকিস্তান ধ্বংস করার সেই সুযোগটি তুলে দিয়েছে।

না, অধ্যাপক সৈয়দ আমীরুল ইসলামের আইনজীবী পিতা সৈয়দ আফসার উদ্দিন সাহেব হুবহু এ-রকম ভাষাতেই যে-কথাগুলো বলেছেন, তা নয়। তবে তিনি কিংবা তার সমবয়সী সমভাবুক মানুষেরা যা বলতেন তার মর্মার্থ এ রকমই। ওই প্রজন্মের কৃতী ও প্রতিষ্ঠিত মানুষদের পাকিস্তান-প্রীতি ও পাকিস্তান ভাঙার ভীতির আরো একটা বড়ো কারণ ছিলো। গ্রাম ও শহর দু'জায়গাতেই সমান ক্রিয়াশীল ছিলো সে কারণটি। সেটি হচ্ছে সম্পত্তি বিষয়ক। শহরে দেখেছি : পাকিস্তান আমলে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তেরা যে বাড়িগুলোতে বসবাস করতো সেগুলোর প্রায় সবক'টিরই পূর্বতন মালিক ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা এই দেশ ছেড়ে চলে গেছে তাদের বাড়িগুলোর মালিকানাও বদলে গেছে। এই বদল যে সব ক্ষেত্রে 'আইনসঙ্গত' ও নীতিসঙ্গতভাবে ঘটেছে, তা মোটেই নয়। পরিত্যক্ত হিন্দু সম্পত্তির মালিকানা বদলের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে যদি একটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত চালানো হয়, তবে কেঁচো

খুঁড়তে গিয়ে শুধু সাপ নয়, অনেক বড়ো বড়ো অজগর বেরিয়ে পড়বে। নব্য মালিকদের এই অদৃশ্য অজগরকে বড়ো ভয়। সে-ভয় আসলে তাদের একান্ত হীনমন্যতা ও অপরাধবোধজাত। বাস্তবে ওই সব মালিকানার শব-ব্যবচ্ছেদের কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না। তবু, ভারতের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান ভেঙে যে বাংলাদেশ তৈরি করা হবে সে-বাংলাদেশে হুড়মুড় করে দেশত্যাগী হিন্দুরা এসে ঢুকে পড়বে, তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরগুলো পুনর্দখল করে নেবে, মুসলমানদের ফকির বানিয়ে ছাড়বে—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতেই প্রবীণ প্রজন্মের কিছু লোকের মনে এ-ধরনের এক স্বকপোলকল্পিত ভীতি বাসা বেঁধেছিলো। এই ভীতিই তাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়, পাকহানাদার বাহিনীর দালালি করতে প্ররোচিত করে, তথাকথিত শান্তি কমিটি গঠনের দুর্বুদ্ধি জোগায়।

পাক হানাদাররা যে-সময়ে বাংলাদেশের শহরগুলোকে দখল করে নেয় সে-সময়ে আওয়ামী লীগ-ন্যাপ-কম্যুনিস্ট-ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা শহর ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছেন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে, হিন্দুদের মুষ্টিমেয় কিছু লোক বাদে সবাই শহর ছাড়া। সেই সুযোগ বা দুর্যোগেই শহরে পাক হানাদারদের ছত্রছায়ায় একদল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও পাকিস্তান সহযোগী দালালের সৃষ্টি। শহর ছেড়ে যাওয়া মানুষদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর ও দোকানপাটগুলো দখল করে নেয় ওই সব দালাল ও তাদের আত্মীয়স্বজনেরা। লুটের মালে তাদের ঘর ভরে যায়।

এ-রকমটি ঘটেছে ছোটো বড়ো প্রায় সব শহরেই, কোনো কোনো থানা সদরেও। তবে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, যেখানে পাকসেনারা প্রবেশ করতে পারেনি, সেখানকার অবস্থা ছিলো অন্যরকম। সেখানে কোনো সক্রিয় দালাল গোষ্ঠীর সৃষ্টি হতে পারে নি, লুটেরা দলের দৌরাত্ম্য দেখা যায়নি। তবু, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুদের দেশত্যাগের কল্যাণে গ্রামে যারা সম্পত্তিবান হয়েছিলো তারাও শহুরে সম্পত্তিবানদের মতোই 'যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই'র দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। কারণ, হিন্দু জমিদার-তালুকদার-জোতদার-মহাজনরা দেশছাড়া হওয়ার পর এরাই তো হয় গ্রামের 'পাওয়ার এলিট'। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় এদেরই নিরঙ্কুশ রাজত্ব। হিন্দু ব্রাহ্মণের স্থান দখল করে এরাই হয় 'নয়া আশরাফ', 'আতরাফ মুসলমানে'র প্রতি এরা আচরণ করতে থাকে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণদের মতোই। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ছিলো তাদের শাসন-শোষণকে আড়াল করে রাখার মোহিনী মন্ত্র। আর এখন দেখা যাচ্ছে হঠাৎ গাঁয়ের কৃষক-ক্ষেতমজুররাও 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর বদলে 'জয়বাংলা' মন্ত্র জপতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের আসল মজা যারা বিনা বাধায় লুটে এসেছে এতোদিন ধরে, তাদের কানে 'জয়বাংলা' ধ্বনি তো বিষের মতোই লাগবার কথা। লেগেছেও সেই রকমই। তাই, ভাটি এলাকার কোনো এক গ্রামেও সাধারণ কৃষকের মধ্যে যখন মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দেখেছি, তখন সেই গ্রামের এক ব্যাপারীকে দেখেছি ভিন্ন অবস্থানে। একাধারে জোতদার ও ব্যাপারী এই মানুষটি তার জনমজুর ও কামলাদের কাছে প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে ক্ষোভের কথাগুলো প্রকাশ করেছে। বলেছে, খুব তো মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ কইরা লাফাইতাছ। মজাডা টের পাইবা পরে। বাড়ি-সম্পত্তি ফালাইয়া রাইখ্যা এই দেশ থেইক্যা যে হিন্দুরা হিন্দুস্থানে চইল্যা গেছে, হ্যারা যখন ফিইর‍্যা আইয়া হেইগুলার দখল লইবো, তখন বুঝবা জয়বাংলা কারে কয়। হ্যাই আগের মতন অবস্থা অইবো। আগে কুনো দিন হিন্দু বাড়ির আশপাশ দিয়া কুনো মুসলমানরে জুতা পায় দিয়া ছাতি টাঙাইয়া যাওনের

দিতো? অহনও হ্যাই রকম অইবো। পাকিস্তান না থাকলে সব মুসলমানেরই হিন্দুর গোলাম অইয়া থাকন লাগবো।'

এ-সব উদ্ভট ও কাল্পনিক আশঙ্কার কথায় পাত্তা দেয়নি নতুন প্রজন্মের মুসলমান তরুণরা। শহরে যেমন দেখেছি, গ্রামের তরুণদের মধ্যেও স্বাধীনতা সম্বন্ধে সেই একই রকমের আবেগের প্রকাশই দেখলাম। তবে ছাত্র-তরুণদের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে সে-আবেগের প্রকৃতি ও প্রকাশে ঐক্য ছিলো—এমন কথা বলা যাবে না। বিশেষ করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন—এই দু'দলের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও সে-পার্থক্যজনিত রেশারেশি অনেক ক্ষেত্রেই শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ছাত্রলীগের ছেলেরা একটু বেশিমাত্রায় উগ্রতা নিয়ে নিজেদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পাইওনিয়ার বলে দাবি করছিলো, আর ছাত্র ইউনিয়নকে চিহ্নিত করেছিলো কম্যুনিস্ট অর্থাৎ রাশিয়ার দালাল বলে। ছাত্র ইউনিয়নের দৃষ্টিতে ছাত্রলীগের ছেলেরা ছিলো স্থূল ও অমার্জিত, শ্রেণীদৃষ্টি-বর্জিত উগ্র জাতীয়তাবাদের ধারক ও সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহী। ছাত্রলীগের ছিলো বঙ্গবন্ধু মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি সমালোচনাহীন দৃঢ় আস্থা, ছাত্র ইউনিয়ন শেখ মুজিবকে মানলেও তাঁর সম্পর্কে তাদের সমালোচনাও কম ছিলো না। 'জয়বাংলা' স্লোগান নিয়েও ছাত্র ইউনিয়নের দ্বিধা ছিলো, এ-স্লোগানটির বিপরীতে তারা চালু করতে চেয়েছিলো 'জয় সর্বহারা'। গ্রামে গিয়ে শুনেছি, মার্চের শুরুতে নাকি এই নিয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে ছোটোখাটো একদফা সংঘর্ষও হয়ে গেছে। ছাত্রলিগাররা মিছিলে 'জয়বাংলা' ধ্বনির সঙ্গে জোরেশোরে বলেছে, 'তোমার নেতা আমার নেতা—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব', 'এক নেতা এক দেশ—বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ।' ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের মতে, এ-ধরনের স্লোগানে আছে ফ্যাসিবাদের গন্ধ। তারা কোনো এক নেতার নামে জিগির তুলতে রাজি নয়। আবার, এর বিপরীতে কোন স্লোগানটি জুৎসই হবে তাও ঠিক করতে পারছিলো না। একদিন তারা মিছিলে স্লোগান দিলো 'তোমার নেতা আমার নেতা—এই দেশেরই বীর জনতা।' প্রায় অর্থহীন স্লোগান। এই নিয়েই দু'দলে প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি। মুক্তিযুদ্ধ যখন পুরোপুরি একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি, তখনই ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন এরকম অর্থহীন বিবাদে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো শুনে আমার খুবই দুঃখ লাগলো। এ-নিয়ে আমার বন্ধু শাহিদের সঙ্গে আলাপ করলাম।

শাহিদ প্রকাশ্যে কেন্দুয়া থানা ন্যাপের সেক্রেটারি হলেও তার সঙ্গে গোপন কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্কের কথা আমার জানা ছিলো। তাই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বশেষ মূল্যায়নের কথাটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। এবং ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের এ-রকম অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্ব নিরসনে তারা কী করেছে তা জানতে চাইলাম।

শাহিদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে, ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের দ্বন্দ্বের বিষয়টি অনেক জটিল ও গভীর। আসলে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে এই দুই তরুণ ছাত্রগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মধ্যে। ছাত্রলীগের মূল পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে যদিও সমাজতন্ত্রের কথা ছিলো, ছিলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির কথা এবং এর ফলে ছাত্র ইউনিয়ন তথা বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে এর ব্যবধান খুবই কমে এসেছিলো, তবু আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাকর্মী রক্ষণশীল অবস্থানটিকেই ধরে রেখেছিলেন। সে-কারণেই কোনো বামপন্থীকেই তারা সহ্য করতে পারতেন না। দ্বন্দ্বের মূলটি এখানেই। সে-দ্বন্দ্ব শুধু চিহ্নিত বামপন্থীদের সঙ্গেই নয়। আওয়ামী লীগের একেবারে ভেতর মহলেও যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিলো,

সে কথাও আজ আর গোপন নেই। এছাড়া বামপন্থীরাও যে পুরোপুরি সংকীর্ণতামুক্ত ছিলো, তাই বা কে বলবে? ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা পড়াশোনায় অনেকখানি অগ্রসর বলে তাদের মধ্যে এ-নিয়ে এক ধরনের অহমিকা তথা 'সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স'ও ছিলো। এর ফলে ছাত্রলীগের সঙ্গে তাদের ব্যবহারে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবটি সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়তো। অন্যদিকে পেশীশক্তি প্রদর্শনে ছাত্রলীগের তুলনায় তাদের নৈপুণ্য ছিলো খুবই কম। তাছাড়া দুয়ের মধ্যেই তরুণ সুলভ অসহিষ্ণুতা ও অপরিপক্কতা তো ছিলোই।

এইসব কারণে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির মধ্যেকার ডানবাম দ্বন্দ্বের পুরো মীমাংসা কখনো হয়নি। এ দ্বন্দ্বের নানামুখী প্রকাশ যে মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তিতেও কালো রঙের ছোপ লাগিয়েছে—সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ও একাত্তরের বাংলাদেশ

একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসে আমাদের এলাকার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। ঘুরে ঘুরে নানা স্তরের মানুষের চিন্তাচেতনার পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি গ্রাম-সমাজের রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিও। সেই সঙ্গে পূর্বেকার অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে বর্তমানের তুলনাও করেছি মনে মনে। স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে আমার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো।

রূপান্তর তো সমাজের সব স্তরেই হয়েছে, তবে সর্বত্র সেটি একই ধরনের হয়নি। বর্ধিষ্ণুতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা—দুটোই রূপান্তর-প্রক্রিয়া হলেও একটি সদর্থক, অন্যটি নঞর্থক। একাত্তরে দেখলাম : সম্প্রদায়গত বিচারে গ্রামের হিন্দুরা সবাই নঞর্থক রূপান্তর প্রক্রিয়ার অধীন, সব হিন্দু পরিবারের অবস্থানই চরম ক্ষয়িষ্ণু। এ-রকমটি অবশ্যই একদিনে ঘটেনি। ছেলেবেলা থেকেই যে এই ক্ষয়িষ্ণুতার সূচনা ও ক্রমপরিণতি আমি দেখে এসেছি—সে-কথা আমার এই '*পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন*'-এ বহুবারই স্মরণ ও উত্থাপন করেছি। বিশেষ করে পঞ্চাশের দাঙ্গার আগে-পরে হিন্দুদের বাস্তব অবস্থা ও মানসিক প্রবণতা কেমন দাঁড়িয়েছিলো, নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে কেমন করে তাদের ভেতর বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্য বাসা বেঁধেছিলো, সে সবের বিস্তারিত বর্ণনাই দিয়েছি। তবু একাত্তরে গ্রামে গিয়ে হিন্দুদের অবস্থা দেখে আমি বিষয়টির যে-রকম বিশ্লেষণ করেছিলাম সেটিকেই স্মৃতি থেকে আবার তুলে নিয়ে আসছি।

পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিলো মুসলমানের রাষ্ট্র রূপে। 'মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি'—এই থিয়োরিকে ভিত্তি করে যে তথাকথিত জাতিরাষ্ট্রের জন্ম, সে রাষ্ট্রে মুসলমান ছাড়া অন্যরা যে নিতান্তই ফালতু কিংবা করুণার পাত্র, সে-কথা বোঝার জন্যে খুবই বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না। পাকিস্তানের জনক জিন্নাহ সাহেবের সেই ফালতু কথা—'আজ থেকে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না' ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতিকরা নানা ধরনের কৌশলগত মাতামাতি করেছেন বটে, কিন্তু গ্রাম বা শহরের হিন্দু জনসাধারণের চিত্তে পাকিস্তানকে আপন দেশ বলে ভাবতে পারার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি কখনো হয়নি। বরং এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হতে পারে রাষ্ট্রীয় ভাবে সব সময় সে-রকম ব্যবস্থাই চালু রাখা হয়েছে। চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে হিন্দুরাও সামান্য কিছুদিনের জন্যে আশার একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখলেও দু'মাস যেতে-না-যেতেই ৯২ (ক) ধারার গভর্নরি শাসন জারি হলো যখন, তখনই তাদের চোখের সামনে সে-আলো নিভে গিয়েছিলো। সাতচল্লিশ সাল

থেকেই হিন্দুরা দেশান্তরী হচ্ছিলো। দেশত্যাগের গতিবেগ কখনো বাড়তো, কখনো কিছু কম থাকতো, পুরোপুরি বন্ধ থাকেনি কোনোদিনই।

তবে, গ্রামের তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেশত্যাগে প্রবল অনীহা বরাবরই লক্ষ করেছি। তবু অনীহা সত্ত্বেও, একেক সময় দল বেঁধে তারা দেশ ছেড়েছে। মূলত যারা হিন্দু কৃষিজীবী তারা দেখেছে : হিন্দু বাবুদের জমি হাতছাড়া হয়ে যে মুসলমানদের হাতে যাচ্ছে সেই মুসলমানরা নিজেরাই চাষবাদের কাজে দক্ষ, তাদের কাছ থেকে জমি বর্গা পাওয়ার কিংবা তাদের ক্ষেতে মজুরের কাজ করার কোনো সুযোগ নেই। খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পেরেছে যে, ভারতের আসামে আর কুচবিহারে প্রচুর অহল্যা ভূমি আছে এবং সেখানে কৃষি-মজুরের বড়ো অভাব। তাই দেখা গেছে, আমাদের এলাকার কৃষিজীবী হিন্দুরা পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই মূলত আসাম ও কুচবিহারেই পাড়ি জমিয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগী উচ্চবিত্তের শিক্ষিত হিন্দুদের চাকরি-বাকরির সূত্রে আগে থেকেই কোলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তারা আস্তে আস্তে সপরিবারে সেদিকেই চলে গেলো। যারা কৃষিজীবীও নয়, আবার সচ্ছলতারও কমতি যাদের, ছোটোখাটো ব্যবসা ও সামান্য ভূসম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল যারা, বিপদ ঘটলো তাদেরই। পাকিস্তানে যে থাকা যাবে না, এ-বিষয়ে তারা প্রায় নিঃসংশয়। কিন্তু বোধগম্য কারণেই, দেশ ছেড়ে যাওয়ার বা ভিন দেশে গিয়ে সুস্থির হওয়ার যে উপায় নেই। তবে যেতে যখন হবেই, তার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া দরকার। সে প্রস্তুতির মধ্যে ছিলো :

প্রথমত, পরিবারের কোনো সদস্যকে ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে একটা ঠিকানা তৈরি করা এবং সেই ঠিকানায় এ-ভাবে সে-ভাবে কিছু টাকা-পয়সা পাঠিয়ে সেখানে ঠাঁই নেয়ার একটা ভিত্তি নির্মাণ করে রাখা।

দ্বিতীয়ত, নিজেদের সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলা, কারণ এই লেখাপড়াই (অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি-ডিপ্লোমা) হতে পারে প্রায় নিঃস্ব মানুষগুলোর বৈষয়িক জীবনের তথা জীবিকার প্রধান পুঁজি, এই পুঁজি নিয়েই দেশান্তরে গিয়েও টিকে থাকার একটা উপায় হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

একটা রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের এ-রকমভাবে দেশত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ কি ন্যায়সঙ্গত? এতে কি জন্মভূমির প্রতি সম্প্রদায়গতভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না?

চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানের হিন্দুদের সম্পর্কে এ-রকম প্রশ্ন যে একান্ত মোলায়েমভাবে উত্থাপন করা হয়েছে, তা নয়। এ সব প্রশ্নের সঙ্গে আরো আরো অনেক উদ্ভট অভিযোগ তুলে তাদের সর্বক্ষণ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তারাও সাধারণভাবে বিনা প্রতিবাদে মুখ-বুঁজে এসব অভিযোগের লণ্ডড়াঘাত সহ্য করে গেছে। অভিযোগকারীদের ন্যায়নিষ্ঠা কিংবা দেশপ্রেমের অকৃত্রিমতা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপনের ধৃষ্টতা তারা দেখায়নি। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ না করার বাস্তব বুদ্ধি তাদের ছিলো।

এভাবে-সেভাবে টাকা-পয়সা পাঠানো'টা যে বেআইনি পথে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করা এবং এই কাজটি করে এদেশের হিন্দুরা যে দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিচ্ছে, এ-অভিযোগটা পাকিস্তান আমলে প্রায়ই তাদের বিরুদ্ধে তোলা হতো। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে, এই অভিযোগ যারা করতেন তারাই অনেকে ছিলেন এই দেশদ্রোহী কাজে হিন্দুদের সক্রিয় সহযোগী এবং তারা ছিলেন সে-সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাধন্য প্রতিপত্তিশালী মানুষ। সহজে জলের দামে বাড়ি-সম্পত্তি পাওয়ার জন্যেই অনেক হিন্দুর

'দেশদ্রোহী' কাজে ছিলো তাদের সক্রিয় সহযোগিতা। শোনা গেছে, ওই সব স্বঘোষিত দেশপ্রেমিকদেরই অনেকে অনেক হিন্দুকে নিরাপদে দেশের সীমান্ত পার করে দিয়েছেন এবং তার পেছনে যে সক্রিয় ছিলো প্রচণ্ড স্বার্থবুদ্ধি—সে-কথা বলাই বাহুল্য। সেই স্বার্থবুদ্ধি থেকেই যে তারা অনেক হিন্দুকে প্রথমে দেশত্যাগে উৎসাহিত ও পরে বাধ্য করেছেন, তাও মিথ্যে নয়।

এ-দেশের জনগণের অর্থে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে হিন্দু তরুণরা দেশের মানুষের সেবা করার কোনো দায়িত্ব বোধ করে না, তারা তাদের মেধা ও শিক্ষাকে কাজে লাগায় ভিন্ন দেশের সেবায়। দেশদ্রোহিতার এরচেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী থাকতে পারে?

এ অভিযোগেরও জবাব দেয়ার সুযোগ অভিযুক্তরা কোনোদিন পায়নি, কিংবা সে সুযোগ চায়ওনি। শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যে পাকিস্তানের হিন্দুদের জন্যে একান্ত সংকুচিত করে রাখা হয়েছিলো, দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এই সত্যটি সকলেরই জানা ছিলো, কিন্তু বলতে ছিলো মানা। আর দেশত্যাগী বা ত্যাগেচ্ছু শিক্ষিত তরুণদের দেশদ্রোহী বলার ফ্যাশন যারা রপ্ত করেছিলো তারা কি আসলেই চাইতো যে মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তানে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলের মতোই হিন্দুরা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অবস্থান করুক?

প্রশ্নটির উত্তর নিশ্চয়ই—'না'।

তাই মুখে যারা অভিযোগের তুবড়ি ছোটাতো তারা যে আসলে হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় ছিলো ভীষণ খুশি—এই হচ্ছে ওপেন সিক্রেট।

অথচ এরপরও, অনেক হিন্দুর পক্ষেই এ-ধরনের প্রস্তুতি নেয়ারও কোনো সামর্থ্য ছিলো না। তবু, তারাও পারেনি জন্মভূমিকেই চিরকালের আপন ভূমি ভেবে শিকড় বিস্তার করে অবস্থান করতে। বাস্তবে না হলেও মানসিকভাবে এরা উদ্বাস্তুই হয়ে গিয়েছিলো। দেশত্যাগের সুযোগ, সংগতি বা সম্ভাবনা কোনোটাই যাদের ছিলো না, তারাও এদেশে ছন্নছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়ার মতো বাস করতো। যে সব ক্ষেত্রে বাস্তবে কোনো সমস্যাই ছিলো না, সে সব ক্ষেত্রেও কাল্পনিক ভীতি তাদের অধিকার করে রাখতো, মানসিক স্বাস্থ্যই তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একেই বলে 'মাইনোরিটি কমপ্লেক্স'।

গ্রামে খুব কম হিন্দুকেই নতুন জমি কিনতে দেখা যেতো, বিক্রি করতো প্রায় সবাই। যদিও জমি বিক্রি করাটাও হিন্দুদের জন্যে মোটেই ঝামেলামুক্ত ছিলো না। ইচ্ছেমতো যে কারো কাছে উচিত মূল্যে জমি বিক্রি করা তো তাদের পক্ষে অসম্ভবই ছিলো। আইনি-বেআইনি নানা বাধা অতিক্রম করতে হতো নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করতেও এবং শেষ পর্যন্ত গ্রাম বা অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লোভের কাছে নতি স্বীকার করে নামমাত্র মূল্যে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে হতো। পঁয়ষট্টিতে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' জারি হওয়ার পর তো অবস্থা হলো আরো জটিল ও করুণ।

নতুন জমি কেনা তো দূরের কথা, বাড়িতে একটা গাছ লাগাতে কিংবা নতুন একটা ঘর বানাতেও পাকিস্তানি হিন্দুদের কোনো উৎসাহ ছিলো না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের বদলে কেবল 'দিনগত পাপক্ষয়' করে যাওয়াই হয়ে গিয়েছিলো তাদের জীবননীতি ও জীবনদর্শন। এ-রকম জীবনে সদর্থক রূপান্তরের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না, ক্ষয়িষ্ণুতারই সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে শুধু।

আমাদের রামপুর, চন্দপাড়া, দলপা, চন্দনকান্দী, ভগবতীপুর—এই সব গ্রামে অনেক হিন্দুর বাস ছিলো, তবে তাদের মধ্যে বিশাল মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা বড়ো জোতদার কেউ ছিলো

না। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বসতির বিন্যাস ছিলো মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের নিয়ে আলাদা আলাদা পাড়া গড়ে উঠতো। পাশাপাশি হিন্দুপাড়া ও মুসলমানপাড়ার অবস্থান ছিলো, কিন্তু হিন্দুপাড়ার একেবারে ভেতরে কোনো মুসলমানের বাড়ি কিংবা মুসলমানপাড়ায় কোনো হিন্দুবাড়ি সাধারণত থাকতো না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর গ্রামের লোকবসতির এ বিন্যাসটি আস্তে আস্তে ভেঙে যেতে লাগলো। যে বাড়ির হিন্দুরা দেশান্তরিত হলো তাদের বাড়িটিতে হয়তো হলো ভিনগাঁয়ের কোনো মুসলমানের বসতি—একেবারে হিন্দুপাড়ার ভেতরে। প্রথম প্রথম এতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছে আশপাশের বাড়ির হিন্দুরা। তারপরে সবই সয়ে গেছে। একাত্তরে দেখলাম রামপুরের অক্ষয় সরকারের বাড়ির দু'পাশেই মুসলমান বাড়ি। সরকার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞেস করলাম, 'মুসলমান বাড়ির পাশে থাকতে আপনার অসুবিধে হয় না?' তারা সকলে প্রায় সমস্বরে জবাব দিলেন, 'একদম না। বরং মুসলমান পড়শিরা বিপদে-আপদে আমাদের পাশে যেভাবে এসে দাঁড়ায় সেভাবে আমাদের হিন্দু পড়শিরা কখনো দাঁড়াতো না।'

এরপর তারা মুসলমান প্রতিবেশীদের সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণের অনেক বাস্তব দৃষ্টান্ত আমার সামনে তুলে ধরলেন। এর সঙ্গে প্রতিতুলনা করে দেখালেন পূর্বেকার হিন্দু প্রতিবেশীদের সংকীর্ণতাদুষ্ট ব্যবহারের।

এ-রকম কথা অন্য গ্রামের হিন্দুদের মুখেও শুনেছি। প্রায় সকলেই বলেছেন যে, মুসলমান প্রতিবেশীর সঙ্গে বাস তাদের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা দিয়েছে।

তবু যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রযন্ত্রটি তাদের সতত অস্বচ্ছন্দ ও অনিরাপদ করে রেখেছে, সেটিই হচ্ছে মর্মান্তিক সত্য। একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের অমানবিক রাষ্ট্রনীতিই তাদের এই মর্মান্তিক সত্যের শিকার বানিয়েছে, সহৃদয় প্রতিবেশীর সহমর্মিতা রাষ্ট্রিক ভেদনীতির হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারেনি। সেই ভেদনীতিকে সফল করে তোলার জন্যে প্রতিটি গ্রামে ও শহরেই ছিলো রাষ্ট্রশক্তির সহায়তাপুষ্ট বরকন্দাজরা। সংখ্যায় ওরা লঘু হলেও তাদের ক্ষমতার দাপট ও পৈশাচিক লোভই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সহৃদয়তাকে কোণঠাসা করে রেখেছে। এভাবেই বাংলার মাটিতে চব্বিশটি বছর ধরে পাকিস্তান বেঁচে রয়েছে।

অক্ষয় সরকারের ছেলে অনিল রামপুর প্রাইমারি স্কুলে আমার নিচের ক্লাসে পড়তো। পড়াশোনা তার বেশিদূর এগোয়নি। এখন সে পেটের তাগিদে শহরে এক মিষ্টির দোকানে চাকরি নিয়েছে। এপ্রিলের শুরুতেই সেও শহর ছেড়ে চলে এসেছে। অনেকদিন পরে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ মেতে উঠলাম। অনিলের কথায় কেবলই হতাশা আর বেদনার বিচ্ছুরণ।

অনিলের ঠাকুরদা (অর্থাৎ পিতামহ) অমর সরকার ছিলেন একজন মহাজন। অক্ষয় সরকার তারই একমাত্র পুত্র। অমর সরকার পুত্রের জন্যে মোটামুটি ভালোই বিষয় সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু কথায় বলে 'বসে বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়।' অক্ষয় সরকারেরও হলো সেই দশা। অমর সরকারের মৃত্যুর কয়েক বছর পরই জন্ম হলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের। শুরু হলো হিন্দুদের অস্থিরতা। অন্যদের সঙ্গে হিন্দু মহাজনরাও অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেলো। যারা যেতে পারলো না তারাও ব্যবসা গুটিয়ে ফেললো। পুরোপুরি ঘটালো না যারা তারাও ব্যবসার সম্প্রসারণ বন্ধ করে দিলো। বেখৈরহাটি বাজারে যে বিরাট দোকান ঘরটি ছিলো অমর সরকারের, পুত্র অক্ষর সরকার তা হস্তান্তরিত করে দিলেন। 'কী আর হবে এদেশে দোকানপাট রেখে? চলেই তো যাবো।'—সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সাল থেকে যার মুখে এ রকম

কথা শুনে এসেছি, সেই অক্ষয় সরকার একাত্তরেও পাকিস্তানেই রয়ে গেলেন। একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসে যখন সব হিন্দুই সীমান্ত পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন অক্ষয় সরকারের বোধশক্তিই প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। বিনা চিকিৎসায় দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী, কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। সাতচল্লিশ সাল থেকেই তিনি একটু একটু করে পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করে করে পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছেন, তিন তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, একজন মেয়ে-জামাইকে দীর্ঘদিন সপরিবারে তার বাড়িতে রেখে পুষেছেন। এই করে করে বর্তমানে তার নিঃস্বতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সীমান্ত পাড়ি দেয়ার পাথেয় জোগাড় করাই তার পক্ষে অসম্ভব।

অনিল বললো, 'পাকিস্তানি মিলিটারি আর রাজাকাররা মেরে ফেললেও আমাদের এখানেই থেকে যেতে হবে।...তোমরা যাও ভাই। আমাদের জন্যে আশীর্বাদ রেখো।...যদি বেঁচে থাকি, আর যদি দেশ স্বাধীন হয়, তবে ফিরে এসে আমাদের আবার দেখা পাবে।'

অনিল যে এতো গুছিয়ে এ-রকম করুণ কথা বলতে পারে, আমার ধারণা ছিলো না।

তবে, তার কথা সত্য হয়েছিলো। রামপুর ও আশপাশের প্রায় সব হিন্দুই সীমান্ত পাড়ি দিলেও অনিলরা গাঁয়ে থেকে গিয়েছিলো। আমিও এর প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে বাবা ও ঠাকুরমাকে নিয়ে দেশ ছেড়েছিলাম। এক সময় দেশ শত্রুমুক্ত স্বাধীন হয়েছিলো। কিন্তু অনিলের বাবা অক্ষয় সরকারের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে দেশের বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছিলো। মিলিটারি বা রাজাকারের হাতে নয়, রোগে ভুগে স্বাভাবিক মৃত্যু। মৃত্যুর পর পুত্র অনিল আর সুনীলই তার মুখাগ্নি করেছিলো। তখন গ্রামে অনিলরা ছাড়া বোধহয় আর এক ঘর মাত্র হিন্দু ছিলো—দিনমজুর রামচরণের পরিবার। তবু সনাতন হিন্দু প্রথা মতোই অক্ষয় সরকারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিলো গাঁয়ের মুসলমানদের সহায়তায়।

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে যারা একসঙ্গে অবস্থান করে তারাই বান্ধব। সম্প্রদায়ের কৃত্রিম গণ্ডি ভেদ করেও মানুষ যে পরস্পরের এ-রকম বান্ধব হতে পারে, দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তানের অন্তিম দিনগুলোতেও মানুষ তার প্রমাণ রেখেছে।

ক্ষয়িষ্ণুতার অন্ধকারে প্রগতির আলোকরেখা

পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ধরে এদেশের হিন্দুরা যে কেবলই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে চলেছে, জন্মভূমি যারা পরিত্যাগ করেনি বা করতে পারেনি তারাও যে বিদেশ ভূমিরই মানস বাসিন্দা হয়ে রয়েছে, দেশের রাজনৈতিক আলোড়ন-আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বদলে নিষ্ক্রিয় 'দার্শনিক' হয়ে থাকটাই তারা পছন্দ করেছে—এ-সব কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, সত্য থাকটাই তারা পছন্দ করেছে—এ-সব কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, সত্য কখনো একমাত্রিক নয়। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিলে সত্য খণ্ডিত হয়ে যায়। আর খণ্ডিত সত্য তো মিথ্যারই সহোদর।

যতোই ক্ষয়িষ্ণু বলি পাকিস্তানের হিন্দু সমাজকে, এই ক্ষয়িষ্ণুতার বিপরীত একটি শক্তির ক্ষীণধারাও যে ওই সমাজের ভেতরে ভেতরেই প্রবহমান ছিলো সে-কথাও অস্বীকার করা ঠিক হবে না। মুসলমানদের মতো হিন্দুদের মধ্যেও নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিলো। প্রবীণ হিন্দুদের মধ্যেও যারা ব্রিটিশ আমল থেকে কংগ্রেসী বা বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যারা জেল খেটেছেন, তাদের সঙ্গে

সাধারণ অরাজনীতিক হিন্দুদের একটা পার্থক্য তো গোড়া থেকেই ছিলো। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব মেনে নিয়েই এর স্বরূপ বদলিয়ে ফেলার দুঃসাহসী বাসনা পোষণ করতেন যাঁরা, সেই কংগ্রেসী বা বামপন্থী রাজনীতিকরা নিজেদের হিন্দু পরিচয়কে মোটেই বড়ো মনে করতেন না। সে-রকম মনে করলে তো পাকিস্তানে বাস করার চিন্তাই তারা করতে পারতেন না, রাজনীতি করা তো অনেক দূরের কথা। এই ত্যাগব্রতী ও আদর্শবাদী প্রবীণরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তরুণদের একটা অংশের ওপর গভীর ও তাৎপর্যময় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিলেন। সে-প্রভাবে মুসলমান তরুণ সমাজেই চেতনার রূপান্তর বেশি মাত্রায় হয়েছিলো, এ-কথা ঠিক। তবে পাকিস্তানের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের ভেতরে মহলেও যে সদর্থক ভাবনার একটা হাওয়া বয়ে গিয়েছিলো, সে-কথাও অস্বীকার করা যাবে না। অধিকাংশ বাপ-কাকাই ছেলে-ভাইপোকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পাঠান যে-উদ্দেশ্যে, সে-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে-যে তরুণ শিক্ষার্থীরা সব সময় চলে না বা চলতে পারে না, সে তো জানা কথাই। উনিশ শতকে কলকাতার নব্যধনী হিন্দুরাই উদ্যোগী হয়ে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যটা ছিলো নিতান্তই বৈষয়িক। নিজেরা তো অনেকেই 'ইয়েস-নো-ভেরিগুড' জাতীয় কিছু শব্দ রপ্ত করে নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে কোনো রকমে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি হয়েছেন, প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছেন, হয়ে গেছেন 'হঠাৎ নবাব'। তবুও ভালো করে ইংরেজি ভাষাটা আয়ত্ত করতে না পারার দরুণ সাহেবদের সঙ্গে পুরোপুরি ভাববিনিময় করা সম্ভব হয়নি বলে তাদের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে হীনমন্যতাও বাসা বেঁধেছিলো। তাদের ইংরেজি জ্ঞানকে বিদ্রূপ করে অনেক মুখরোচক গল্পও তৈরি হয়েছিলো সে-সময়। তাই তারা তাদের ছেলেপুলেদের চৌকস ইংরেজিওয়ালা বানিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নিজেরা ধনবান হয়েও ইংরেজ সমাজে সমান মর্যাদার আসনে যে বসতে পারেনি তারই ক্ষতিপূরণ হবে ইংরেজি-শিক্ষিত সন্তানদের দ্বারা—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও কলেজে সন্তানদের পাঠানোর পেছনে এ-রকম বাসনাই ক্রিয়াশীল ছিলো। তাদের সে-বাসনা কিছু পরিমাণে পূরণ হয়েছিলো অবশ্যই। তবে তারা যে রকম আশঙ্কা করেননি সে-রকম ঘটনাই বেশি পরিমাণে ঘটেছিলো। হিন্দু কলেজে পড়া ছেলেরা একেকজন কালাপাহাড় হয়ে উঠেছিলো। বাপ-কাকার হিন্দুত্বকেই তারা যেমন প্রত্যাখ্যান করে বসেছিলো, তেমনি বাপ-কাকাদের 'হঠাৎ নবাব' হওয়ার নৈতিকতা-বিরোধী প্রক্রিয়াটিকেও তার ঘৃণা করতে শুরু করেছিলো। বলা যেতে পারে, এই 'ইয়ংবেঙ্গল'রা তাদের বাপ-কাকাদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো।

এমনটিই হয়, এ-রকমই বাস্তবের নিয়ম। এ-নিয়মই অনেক পরিমাণে কার্যকর হয়েছিলো বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে পাকিস্তানের হিন্দুদের বেলাতেও। বিশেষ করে ষাটের দশকে। দেশত্যাগের প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যে হিন্দু বাপকাকারা তাদের ছেলে-ভাইপোদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতেন, তারা পই পই করে ওদের বলে দিতেন, 'দেখো হে বাপু, তোমাকে পড়তে পাঠানো হয়েছে। ভালোভাবে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করাই তোমার কাজ। নানান হুজুগে মেতে জীবনটাকে নষ্ট করো না। রাজনীতি-ফাজনীতির ধারে কাছেও যেও না। এই দেশে রাজনীতি করে কী হবে আমাদের? পাকিস্তানের রাজনীতি তো মুসলমানদের জন্যে। তারা কি এদেশে আমাদের মান-ইজ্জত নিয়ে থাকতে দেবে?...দেশ তো ছাড়তেই হবে আমাদের। কিন্তু ভিন দেশে যাবে কী সম্বল নিয়ে? সেখানে গিয়ে খাবে কী করে? লেখাপড়া শিখলে ওটাই হবে একমাত্র সম্বল।...কাজেই নিজের বুঝটা বুঝতে চেষ্টা করো বাপু।"

অথচ, তারুণ্য কিন্তু কোনো যুগেই অন্ধ কষে কেবলই নিজের বুঝটা বুঝটা বুঝে নেয় না, পূর্বসূরির বেঁধে দেয়া পথ ধরে চলে না, কোনো ছকেই বাঁধা পড়ে থাকে না। ছক ভেঙে বেরিয়ে আসতে গিয়ে কারো কারো অবশ্যই পা পিছলে যায়, গতির বদলে দুর্গতির পাঁকে তলিয়ে যায়, উদ্‌ভ্রান্তির জালে আটকা পড়ে যায়। এক কথায়, বখে যায়। তবে আরেক দল তরুণ পুরনো ছকটা ভেঙে বেরিয়ে এসে নতুন ও অগতানুগতিক বিচরণ ক্ষেত্রকে বেছে নেয়। বাপদাদার পথ ছেড়ে তারা আলাদা পথ ধরে, প্রগতির অভিযাত্রী হয়।

পাকিস্তানের হিন্দু সমাজেও এ-ব্যাপারটি ঘটেছিলো। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসা হিন্দু তরুণরা সবাই বাপ-কাকার বাসনা পূরণ করে নিতান্ত ভালো ছাত্র ও ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই, সব যুগেই যেমনটি হয়ে থাকে—কিছু তরুণ বখে গিয়েছিলো, বাপ-কাকার আশাভঙ্গ ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছিলো। আর এদেরই অন্য একটা অংশ প্রচলিত হিন্দু মানসিকতার গণ্ডিটাতে আবদ্ধ থাকলো না, 'মাইনোরিটি কম্‌প্লেক্স'কে তারা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলো। বাপ-কাকাদের 'এদেশে থাকা যাবে না'-ধরনের পলায়নী ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী ছাত্রলীগ কিংবা রেডিক্যাল ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লো। ষাটের দশকের একেবারে শেষ দিকে ছাত্রলীগের সঙ্গে অনেকে ভিড়েছিলো। তবে হিন্দু ছাত্রদের যোগ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গেই ছিলো বেশি। কারণ পাকিস্তানি ভাবধারার বদলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গ্রহণ নয় শুধু, জাতিকে আরো এগিয়ে নেয়ার স্বপ্ন কল্পনা তাদের মনকে অধিকার করেছিলো। যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত হয়নি, তাদের অনেকে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রটিকে বেছে নিলো, বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য সন্ধানে ও ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নে মন দিলো। সাম্প্রদায়িকতার বদলে জাতীয়তাবাদ নয় শুধু, শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিচারে প্রবৃত্ত হলো। গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুললো অনেকেই। এ-রকমভাবে বাপ-কাকাদের সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করে নিতে পারলো, বিচ্ছিন্নতা নিরসনের পথ খুঁজে পেলো। স্বদেশ ত্যাগে সমস্যার সমাধান হবে বলে না ভেবে স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী রূপে বিদেশে না গিয়ে স্বদেশে বাস করেই আন্তর্জাতিক চেতনার লালন করে চললো। ষাটের দশকের ছাত্র-রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুসলমান ছাত্রাবাস জগন্নাথ হল পাকিস্তানবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো। এই হল থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও পঙ্কজ ভট্টাচার্যের মতো চৌকস নেতারা। একারণেই জগন্নাথ হলটির ওপর পাকিস্তানি শাসকদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো, একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে বর্বর পাক সেনারা এই হলটিতেই সবচে' বেশি নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছিলো।

শুধু ঢাকাতেই নয়। মফস্বল শহরগুলোতেও হিন্দু তরুণদের মধ্যে চেতনার রূপান্তরের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সুস্থ ধারাটির সঙ্গে তাদের সক্রিয় সংযোগ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছিলো। ময়মনসিংহ শহরে দেখলাম, নেত্রকোণার ভাটি এলাকার অজপাড়া গাঁয়ের ছেলে খগেশ কিরণ তালুকদার আনন্দমোহন কলেজে পড়তে এসে পাকিস্তানবাসী হিন্দু পরিবারের পলায়নী ও ভীরু ভাবনার খোল নলচে পাল্টে ফেলে সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকের শেষ দিকে 'আমরা সমুদ্রমুখী' নামক সাংস্কৃতিক

সংগঠনটি শহরে প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো, খগেশ হয়ে উঠেছিলো সেই সংগঠনটির সামনের সারির কর্মি।

প্রধানত খগেশের উৎসাহেই সত্তর-সালে ময়মনসিংহ শহরে একটি 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এটি ছিলো সবদিক দিয়েই একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। প্রচুর শ্রোতা-দর্শকের উপস্থিতিতে রোজ বিকেল চারটা থেকে শুরু হয়ে চলতো রাত দশটা পর্যন্ত। একেক দিন বাঙালি সংস্কৃতির একেকটি দিক নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা হতো, তারপর হতো সংগীত-নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠান। গারো উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী সংগীত—নৃত্য পরিবেশিত হয়েছিলো একদিন। একদিন ছিলো উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান। একদিন গণসংগীত। অন্য অন্য দিন পল্লী গ্রামের বিভিন্ন শিল্পীদের পরিবেশনা। স্থানীয় প্রবন্ধ পাঠক ও আলোচকরা ছাড়াও সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন—শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গুপ্ত। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে রণেশ দাশগুপ্ত কোলকাতার একটি সাহিত্যপত্রে বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ময়মনসিংহের ওই 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ'টির বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধে রণেশদা লিখেছিলেন যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তারই পরিচয়বাহী ছিলো সপ্তাহব্যাপী ওই অনুষ্ঠানটি।

আসলে পুরো পাকিস্তান আমল জুড়ে শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ-রকম যে-সব 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ', 'সম্মেলন' ও 'সেমিনার' ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেগুলো সবই ছিলো আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এগুলোতে অংশগ্রহণকারী সবাই মুক্তিসংগ্রামী।

মুক্তিসংগ্রামের নেপথ্যবিধানকারী রূপে ষাটের দশকে মুসলমান ছেলেদের পাশাপাশি অনেক হিন্দু ছেলেকেও রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকায় দেখলাম। ময়মনসিংহ শহরে এ-ব্যাপারে সবচে' অগ্রবর্তী হতে দেখেছি প্রদীপ চক্রবর্তীকে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার জোরেই সে ময়মনসিংহ জেলার ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃপদে আসীন হয়েছিলো। প্রদীপের পারিবারিক পটভূমিটা অবশ্যি অন্য অনেক হিন্দু তরুণের চে' একটু অন্য রকম ছিলো। তার বাবা সত্যেন চক্রবর্তী একসময় কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন। তাই শহরে পড়তে আসা অন্য অন্য হিন্দু ছেলেদের অভিভাবকদের মনোবৃত্তির সঙ্গে প্রদীপের বাবার পার্থক্য অবশ্যই ছিলো। অন্যসব কমিউনিস্টদের মতোই তিনিও হয়তো সংগ্রাম করেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটির স্বরূপ বদলে ফেলার স্বপ্ন দেখতেন। পরে যদিও তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তবু তাঁর দেশপ্রেমে কখনো ঘাটতি পড়েনি, দেশত্যাগের মধ্যে সমস্যার সমাধান খোঁজেননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও তিনি দেশেই রয়ে গেলেন। ময়মনসিংহ শহরে অনেকগুলো হিন্দু পরিবার সে-সময় তার ফুলপুরের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো। সে পরিবারগুলোতে বেশ কিছু জোয়ান ছেলেও ছিলো। এরা কেউই মুক্তিযোদ্ধা ছিলো না, অন্তত তখন পর্যন্ত এদের কেউই মুক্তিযোদ্ধা হয়নি। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক রূপটি তখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি। অথচ তখনই এই জোয়ান হিন্দু ছেলেরা পাকিস্তান-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত, এরা গোপনে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এ-সব দুষ্কৃতকারীদের মদদ জোগাচ্ছেন সত্যেন চক্রবর্তী—এ সব অভিযোগ তুলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের পাকিস্তানপন্থী চেয়ারম্যান নানাভাবে তাকে হেনস্থা করতে চাইলো, তার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে বসলো। অকুতোভয় সত্যেন চক্রবর্তী চেয়ারম্যানের অন্যায় দাবির

কাছে মাথা নত করেননি। তখন সেই চেয়ারম্যান হালুয়াঘাট থেকে পাক সেনাদের খবর দিয়ে নিয়ে এলো, এরা চক্রবর্তী পরিবারে আশ্রয় গ্রহণকারী যুবকদের ধরে নিতে চাইলো।

পাক সেনাদের কাছেও সত্যেন চক্রবর্তী একান্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। বললেন, "ওরা আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, ওদের আমি কিছুতেই তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। ওরা কোনোই দোষ করেনি। যদি নিতে হয় তো আমাকেই তোমরা নিয়ে যাও।"

পাক সেনারা তাই করলো। মে মাসের একুশ তারিখ ওরা তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেলো। ওদের ঘাঁটি থেকে তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি, চিরতরে হারিয়ে যান।

প্রদীপ এই খবরটি পায় এর মাসখানেক পরে। সে তখন কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে নেত্রকোণার গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্যে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। এরপর সে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মেঘালয়ে চলে যায় ও কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত শিবিরের মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করে। সদ্য পিতৃবিয়োগ-জনিত বিপর্যয়েও সে ভেঙে পড়েনি বা কর্তব্যচ্যুত হয়নি।

গ্রামে গিয়েও দেখলাম : যে-সব হিন্দু পরিবার সাতচল্লিশ সাল থেকে স্বদেশে নিতান্ত উড়নচণ্ডীর মতো বাস করছিলো, দেশত্যাগ না করেও দেশত্যাগের কল্পনা ও পরিকল্পনা করাই ছিলো যাদের একমাত্র মানসিক আশ্রয় সে-রকম কিছু পরিবারেও ভাবনার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। সে-হাওয়াটা নিয়ে এসেছে সেইসব পরিবারের কিছু তরুণ। কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র এই তরুণদের কেউ ছাত্রলিগার, কেউ ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মী। প্রগতিশীল তারুণ্যের প্রভাবে একান্ত রক্ষণশীল প্রবীণ অভিভাবকেরও যে চিন্তার বদল ঘটে যেতে পারে তারই নমুনা প্রত্যক্ষ করলাম ভগবতীপুরের দিলীপদের পরিবারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দিলীপের বাবা উপেন্দ্র ধর ছিলেন ভগবতীপুর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। একেবারেই টিপিক্যাল হিন্দু। রাজনীতির ত্রিসীমানায় পা দেননি কোনো দিন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিক্রিয়াশীল যদি নাও বলি, রক্ষণশীল বলতেই হবে। পাকিস্তানের গড়পড়তা হিন্দুদের থেকে তাকে আলাদা করে দেখার কোনোই উপায় ছিলো না। অথচ, একাত্তরের এপ্রিল মাসে তার মুখে যে ধরনের কথা শুনলাম তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না। দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে আমূল পরিবর্তন বলতে যা বোঝায়, উপেন্দ্র ধরের ক্ষেত্রে তাই ঘটে গেছে। বুঝলাম, এ পরিবর্তনের উৎস গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত ও নিষ্ঠাবান ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী পুত্র দিলীপ ধর।

আরো কয়েকটি হিন্দু পরিবারেও এমন পরিবর্তনের আঁচ পেলাম। ক্ষয়িষ্ণুতার অন্ধকারেও প্রগতির এ রকম আলোকরেখা দেখে খুবই ভালো লাগলো।

অনিশ্চিত ও শঙ্কিত পদযাত্রা

সাম্প্রদায়িকতাবাদ দিয়ে জাতীয়তাবাদকে ঠেকিয়ে রাখার পাকিস্তানি কৌশল যে বাঙালিরা ব্যর্থ করে দিয়েছিলো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তারই প্রমাণ। তবু, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি শাসকচক্র ও তাদের সহযোগীরা একেবারে মরিয়া হয়ে সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন ব্যবহার শুরু করেছিলো। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলো যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা আসলে হিন্দু ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। তবে তাদের মতে, হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মুসলমানও

বিভ্রান্ত হয়েছে বৈকি। বিভ্রান্ত হয়েই তারা দুষ্কৃতকারীতে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে এই পাকভূমি থেকে ওই সব দুষ্কৃতকারী ও কাফেরদের অবশ্যই উৎখাত করতে হবে। আমরা যাদের মুক্তিযোদ্ধা বলতাম, পাকিস্তানের চোখে তারাই ছিলো দুষ্কৃতকারী। একাত্তরে পাকসেনারা এদেশের সর্বত্র দু'দল লোকেই খুঁজে ফিরতো। একদল 'মুক্তি', অন্যদল 'উন্দু' (হিন্দু)।

'মুক্তি'—মানে মুক্তিযোদ্ধা তো হয়ে-ওঠার ব্যাপার। জন্ম থেকেই কেউ মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায় না। মনে ও মগজে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লালন করে করে এক সময় সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েই একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের সৃষ্টি হয়েছিলো। অবশ্যি এই চিহ্নিত ও সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও এদেশে অচিহ্নিত ও অশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিলো অগণ্য। এরাই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি। নগণ্য সংখ্যক দালালকে বাদ দিলে, বলতে হয়, এদেশের প্রায় সবাই ছিলো মুক্তিযোদ্ধা। তাই, ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল বাঙালি ও বাংলাদেশের সকল আদিবাসী উপজাতির প্রতিই পাকিস্তানের ছিলো বিজাতীয় রোষ, সারা বাংলাদেশ জুড়েই চলেছে পাকিস্তানি উৎপীড়ন। তবু পাকিস্তান রাষ্ট্রটির দর্শন তথা অপদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই একাত্তরেও পাক হানাদাররা হিন্দুদেরকে আলাদাভাবে পাকিস্তানের বিশেষ দুশমন বলে চিহ্নিত করেছে। শুধু চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের এ দেশীয় দালালদের সহযোগিতায় হিন্দুদের নিশ্চিহ্নকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। হিন্দু বসতিগুলোর ওপর পৈশাচিক হামলা চালিয়েছে, হত্যা ধর্ষণ লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ সবই করেছে। হিন্দুদের মধ্যেকার বুদ্ধিজীবী কিংবা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট লোকজন কিংবা সমাজে কোনো না কোনোভাবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা আছে যাদের তাদের তো এই হায়েনাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ই রইলো না। পঁচিশ থেকে একত্রিশ মার্চের মধ্যেই ওদের জিঘাংসার শিকার হলেন গোবিন্দ দেব ও জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মতো বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী যোগেশ ঘোষের মতো প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, দানবীর বলে পরিচিত রণদাপ্রসাদ সাহার মতো বিশিষ্ট নাগরিক।

পাক হানাদারদের এই উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিটি সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাই, গ্রামে তখন দেখেছি, সকল সহৃদয় মুসলমানেরই তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি। গাঁয়ের মুসলমান যুবকদের অনেকে সুযোগ পেলেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে বটে, কিন্তু সপরিবারে দেশত্যাগের চিন্তা আমাদের এলাকার কোনো মুসলমানই করেনি। তবে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মতো সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যে সব জায়গায় পাক সেনারা ঘাঁটি গেড়েছিলো, পাকিস্তানের দালাল ছাড়া অন্য কোনো বাঙালির পক্ষেই সে সব জায়গায় বাস করা সম্ভব ছিলো না। সেখানকার অনেক মুসলমানই পরিবার পরিজনসহ ভারতের মেঘালয় রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে, অথবা বাড়ি ঘর ছেড়ে দেশের ভেতর অন্য কোনো নিরাপদ জায়গায় চলে গেছে। আমাদের এলাকায় অবস্থাটা ঠিক এ রকম ছিলো না। এখানে মে মাসের শেষ নাগাদও পাক সেনারা এসে পৌছায়নি। মে মাসের পরও ওরা এখানে এসে ঘাঁটি গাড়েনি, কেবল সড়ক পথে গাড়ি চালিয়ে মাঝে মাঝে যাতায়াত করেছে মাত্র। সড়কের আশে পাশে বাজারগুলোতে কখনো কখনো ঢুঁ মেরেছে, মানুষের ওপর কিছু হম্বিতম্বি করেছে, দু'একটি খুন জখমও করেছে। রাস্তার পাশের মাঠ থেকে গরু-ছাগল ধরে নিয়ে গেছে।

আবার এদের সম্বন্ধে কিছু কিছু কৌতুককর কথাও শোনা গেছে। নওয়াপাড়া গ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম যে, এক দঙ্গল মিলিটারি একদিন ওই গ্রামের হাটে গিয়ে ঢোকে। হাটে গাঁয়ের এক লোক তার গাছের ফল বিক্রি করছিলো। একটা বেলের তখন কতো আর দাম। বড়ো জোর আট আনা কি এক টাকা। একটি পাকিস্তানি সৈন্য যখন একটি বেল নিয়ে দশ টাকার একটি নোট দিলো, তখন বেলওয়ালা বললো, 'আমার কাছে ভাঙতি নেই'। সৈন্যটি তো আর বাংলা বোঝে না। সে মনে করলো যে বেলের দাম বোধ হয় আরো বেশি। সে তখন আরো একটি দশ টাকার নোট দিলো। এবারো বেলওয়ালা বললো যে তার কাছে ভাঙতি নেই। এরপর স্বাভাবিকভাবেই সেই সৈনিক প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে উর্দুতে কি সব বলতে বলতে বেলওয়ালার গালে বসিয়ে দিলো এক চড়, এবং আরো একটি দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে—অর্থাৎ ত্রিশ টাকা দামে দিয়ে—একটি বেল নিয়ে চলে গেলো। হাটের লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগলো। বেলওয়ালাকে বললো, 'মিলিটারির একটা চড় খেয়েছিস তো কী হয়েছে? এক বেলের দাম তো পেলি তিরিশ টাকা।'

না, এ রকম 'এক চড়ে তিরিশ টাকা'র কৌতুক নাটক অভিনয় করার জন্যে পাক মিলিটারিরা এদেশে আসেনি। পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘে গিয়ে ভুট্টো সাহেব তো বলেই দিয়েছিলোন, 'পাক সেনারা পূর্ব পাকিস্তানে ফুটবল খেলতে যায়নি।' অর্থাৎ ওরা এসেছিলো বেয়াদব বাঙালিদের শায়েস্তা করতে। এই শায়েস্তা করার পদ্ধতিটি যে কী নির্মম ও অমানবিক ছিলো তার বর্ণনা দেয়া আমার সাধ্যাতীত। সে বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজনও হয়তো এখানে নেই। অনেকেই সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর স্মৃতি তাদের চেতনায় ধরে রেখেছেন, অনেক বই পুঁথিতেও সে সবের বিবরণ লেখা হয়েছে।

পূর্ব ময়মনসিংহের সেই গ্রামাঞ্চলে এপ্রিলের চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতে প্রথম আমরা পাক মিলিটারিদের হামলা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অবশ্য একেবারে সামনাসামনি নয়। অন্তত মাইল দশেক দূর থেকে। সেখান থেকেই রায়ের বাজারে মিলিটারিদের লাগানো আগুনের কালো ধোঁয়া দেখেছি।

রামপুর বাজারের দশ মাইল দক্ষিণে আঠারোবাড়ি রেল স্টেশন, তারই পাশে রায়ের বাজার। পাকিস্তানি মিলিটারিরা ভৈরব হয়ে রেলপথে আঠারোবাড়ির দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিলো, আর পথে পথে তাদের অত্যাচারের স্বাক্ষর রাখছিলো। পথেই তারা এদেশের কিছু কুলাঙ্গারকে তাদের দুষ্কর্মের সহযোগী বা দালাল রূপে পেয়ে গিয়েছিলো। কিশোরগঞ্জ শহরে কয়েকজন বিশিষ্ট মৌলানার নেতৃত্বে সে সময়েই একটি দালালচক্র তৈরি হয়ে যায়। শুনেছি, আঠারোবাড়ি রেল স্টেশনে কতিপয় পাকিস্তানপন্থী বাঙালি পাকিস্তানের পতাকা হাতে নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে হানাদার পাক সেনাদের অভ্যর্থনা জানায়। ওরাই তাদের পথ দেখিয়ে রায়ের বাজারে নিয়ে যায়। তখন বাজারের অধিকাংশ দোকানপাটই ছিলো তালাবন্ধ। দোকানদারদের প্রায় সবাই অনুপস্থিত। দালালদের সহযোগিতায় পাক সেনারা বাজারের আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক মানুষকে ধরে নিয়ে আসে। দালালরাই চিনিয়ে দেয় তালাবন্ধ কোন দোকানটির মালিক আওয়ামীপন্থী মুসলমান, কোনটির মালিক কাফের হিন্দু। পাক সেনারা গাঁয়ের লোকদের হুকুম দেয় ওই সব দোকানের তালা ভাঙতে। যন্ত্রচালিতের মতো সে হুকুম তারা তামিল করে। এরপর হুকুম আসে লুট করো। জানি না, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মনে এ রকম হুকুমের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিলো। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার

কাজে নিয়োজিত বলে কথিত সশস্ত্র মানুষেরা লুণ্ঠন দমনের বদলে লুণ্ঠনের আদেশ দেয়—এবং সে আদেশ পালন না করলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়—এমন তো তারা বাপের জন্মে কোনো দিন শোনেনি। তবু, রামপুর বাজারে বসে, আঠারোবাড়ি এলাকার উপদ্রুত মানুষদের মুখেই শুনেছি যে সেদিন সেনানীদের আদেশে রায়ের বাজারে লুণ্ঠনকার্য চলেছিলো অনেকক্ষণ ধরে। আদিষ্ট মানুষেরা দোকানের মালপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, আর আদেশকারীরা ক্যামেরায় তার ছবি তুলে রাখছে বাঙালিদের লুটেরা প্রমাণ করার জন্যে এবং লুট শেষ হতে না হতেই দোকান পাটে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে—যে ক'জন প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ আমাদের কাছে ঘটনার এ রকম বিবরণ তুলে ধরছিলেন তাদের চোখ মুখ থেকে আতঙ্কের ছাপটি তখনো মুছে যায়নি। কী করে যাবে? আমরা যারা সামনাসামনি ঘটনাটি দেখিনি, কেবল দূর থেকে আগুনের কালো ধোঁয়া দেখেছি, সেই আমরাও তো সেদিন আতঙ্কে অবশ হয়ে গিয়েছিলাম।

আঠারোবাড়ি রায়েরবাজারের ঘটনার পর থেকে আমাদের গ্রামেও মিলিটারির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। এতোদিন পর্যন্ত রামপুর বাজারে বসে আমরা কেবল গুজববাহিত নানা খবর শুনেছি, এবং উত্তেজনার আগুনে গা গরম করেছি। কিন্তু এখন আর তা নয়। সবাই বুঝে গেলাম : দুশমন আমাদেরও ঘাড়ের ওপর পড়লো বলে। বিশেষ করে আমাদের রামপুর বাজারটি তো সড়কের ধারেই। এই সড়ক ধরে যে মিলিটারিরা নেত্রকোনা থেকে কেন্দুয়া পর্যন্ত যাতায়াত করবে তারা কি আমাদের ছেড়ে দেবে? নানা জায়গা থেকে যেসব রক্ত হিম করা খবর আসছে তাতে তো নিরাপত্তার ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। তবু, বেঁচে থাকার পথ খুঁজে বের করতেই হবে।

জোয়ান ছেলেদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে আগেই ঘর ছেড়েছে, আরো কেউ কেউ তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই তো আর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব নয়। তাই হানাদার পাক সেনাদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে রামপুর বাজারের দোকানদাররা একটা কৌশল উদ্ভাবন করলো। প্রত্যেকেই তারা একেকটি পাকিস্তানি পতাকা হাতের কাছে রেখে দিলো। সারাদিনরাত তো এখন দোকানে টানানো থাকে রক্তসূর্য লাঞ্ছিত ও বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত সবুজ পতাকা। তারা ঠিক করলো, যখনই পাকিস্তানি মিলিটারির গাড়ির শব্দ শোনা যাবে তখনই তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের পতাকাটা নামিয়ে ফেলে পাকিস্তানি পতাকাটি টানিয়ে দেয়া হবে, এবং মিলিটারির গাড়ি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথারীতি স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উড়তে থাকবে। এ কৌশল কাজে লাগিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত বাজারের দোকানদাররা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলো বৈকি।

তবে সকলেই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, অন্যদের দিন যেভাবেই চলুক, হিন্দুদের পক্ষে এখন শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এদেশে বাস করা অসম্ভব। অথচ, একেবারে সেই মুহূর্তেই দেশত্যাগ করা ছিলো কঠিন। আমাদের এলাকা থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছের বর্ডার হলো মহেশখলা বাজার। মহেশখলার পরই ভারতের মেঘালয় রাজ্য। সেই বর্ডারে পঁচিশে মার্চের পর থেকে পাকিস্তানি সেনাদের কোনো ঘাঁটি ছিলো না। তখন থেকেই এটি মুক্ত এলাকা। কিন্তু মহেশখলা যেতে হয় ছোটো বড়ো কয়েকটি হাওড় পাড়ি দিয়ে। সেই হাওড়গুলোতে জল জমেছে বটে, কিন্তু তখনো নৌকা চলাচলের উপযুক্ত হয়নি, পুরোপুরি বর্ষা নামার আগে তা হবে না। সে পর্যন্ত মরণের ঝুঁকি নিয়েই দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু আমার সকল শুভানুধ্যায়ী মানুষেরা আমাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা হলো যে পাকসেনা কিংবা তাদের দালালেরা আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। কারণ একে তো আমি হিন্দু, তার ওপর কলেজের শিক্ষক। উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা আমাকে তাগাদার পর তাগাদা দিতে লাগলেন, "তুমি এক্ষুনি এ গ্রামটি ছেড়ে দাও। সড়কের ধারে কোনো গ্রামে তোমার থাকা মোটেই ঠিক হবে না। বর্ডার পেরিয়ে এখনই যেতে না পার তো, এখান থেকে দূরে ভাটি এলাকায় চলে যাও। ভাটি এলাকায় খুব শিগগির মিলিটারি গিয়ে পৌছতে পারবে না।"

স্বতস্ফূর্তভাবে তারা অনেকে তাদের ভাটি এলাকার আত্মীয়-স্বজনদের নাম ঠিকানা আমাকে জানাতে লাগলেন। দু'একজন তাদের আত্মীয়দের নামে চিঠি লিখেও আমার হাতে দিলেন। বললেন, 'আমাদের আত্মীয় বাড়িতে তোমার কোনো কষ্ট বা অসুবিধাই হবে না। ওরা তোমাকে মাথায় করে রাখবে।'

আমার জন্যে গ্রামবাসীদের এই স্নেহসিক্ত উদ্বেগ আমাকে অভিভূত করে ফেললো। বাবা আর বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে বাড়িতে ফেলে রেখে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে কি না, এই নিয়ে একটা দ্বিধাও আমার মনে ছিলো। কিন্তু এখন বাবা আমাকে তাড়াতাড়ি গ্রাম ছাড়ার পরামর্শ দিলেন। তাই আর বিলম্ব না করে ভাটি এলাকার উদ্দেশে পদযাত্রা করলাম। ছাব্বিশে মার্চের সকাল থেকেই তো মিলিটারির তাড়া খাওয়া বাঙালি পদযাত্রা শুরু করেছে—অনিশ্চিত ও শঙ্কিত পদযাত্রা। আমিও সেই যাত্রীদের একজন হলাম। সঙ্গী হলো আমার মাস্টার মশাই নগেন্দ্র নন্দীর ছেলে ননী গোপাল ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃবন্ধু কামিনী চক্রবর্তীর ছেলে সুজিৎ। ওরা দু'জনই তখনো ছাত্র—একজন কলেজের ও অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয়ের।

ঠিক করলাম : তিন জনই আপাতত মদন থানার বালালি গ্রামে আমার ছাত্র নূরুল হকের বাড়িতে গিয়ে উঠবো, তারপর অন্য চিন্তা।

'মাটির দেহ খাঁটি কর খুলে তোমার দ্বীল-কোরান'

মদন থানার বালালি গ্রামে আমি এর আগে কোনো দিন যাইনি, রাস্তাঘাটও চিনি না। সুজিৎ বললো, 'এর জন্যে কোনো অসুবিধে হবে না। চলুন প্রথমে পাহাড়পুরে প্রাণেশ বাবুর বাড়িতে যাই। শুনেছি পাহাড়পুর থেকে বালালি খুব বেশি দূরে নয়। সেখানে গেলে অতি সহজেই বালালির নূরুল হক ভাইয়ের বাড়ি খুঁজে বের করা যাবে।'

সুজিৎ চক্রবর্তী—যার ডাক নাম নারায়ণ বা নারু—দার্শনিকতা তার ভেতর নেই, সে এক অস্থির অশান্ত প্রাণবন্ত তরুণ। প্রাণবন্যায় পথের বাধা ভাসিয়ে দিতে তার উৎসাহের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আর সে-উৎসাহের প্রাবল্যে 'যখন চাহে এ মন যা' করে ফেলাই তার স্বভাব, আগে-পিছে তাকিয়ে দেখার হিসেবি বুদ্ধি নিয়ে সে চলে না।

ভাটি এলাকার দিকে পদযাত্রায় আমার অন্য সঙ্গী ননী গোপাল হলো সুজিতের একেবারে সম্পূর্ণ উল্টো। নিতান্তই শীতল নিস্পৃহ, তারুণ্যহীন তরুণ। ময়মনসিংহে আমার বাসায় থেকেই সে স্কুল-কলেজে পড়েছে। স্কুলে প্রতি ক্লাসে একাধিক বছর ধরে অবস্থান করতে করতে কলেজে পা দিতে তার কতো বছর লেগেছে চট করে সে হিসেব করে ফেলা কঠিন।

এ-রকম দুই বিপরীত স্বভাবের সঙ্গী নিয়ে অনিশ্চিত পদযাত্রা শুরু করতে আমি ভয় ও ভরসার দোলায় দুলতে লাগলাম।

যাত্রার শুরুতেই দেখা করলাম হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে। উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হেকিম ভাই সম্ভাব্য নানা বিপদ সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দিলেন। বললেন, গত ক'মাস ধরে ডুব মেরে থাকা পাকিস্তানপন্থীরা আবার মাথা তুলতে শুরু করেছে। পাক মিলিটারিরা শহরগুলো দখল করে নেয়ার পর পাকিস্তানের দালালরা নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে, শহরে শহরে তারা 'শান্তি কমিটি' বানিয়ে কেবলই অশান্তি সৃষ্টি করছে। গ্রামগুলোতেও পাকিস্তানপন্থীরা কিছুটা প্রকাশ্যে ও কিছুটা গোপনে সংগঠিত হচ্ছে। শহরের শান্তি কমিটির সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করছে, শান্তি কমিটির মধ্যস্থতায় পাকসেনাদের সঙ্গেও যোগসূত্র গড়ে তুলছে। কায়দা পেলেই ওরা গাঁয়ে মিলিটারি ডেকে আনবে। মিলিটারিদের ওরাই চিনিয়ে দেবে কে আওয়ামী লিগার, কে কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র, কে হিন্দু। আর মিলিটারিদের যেখানে নিয়ে যেতে পারবে না, সেখানেও ওই দালালরা নানান রকম গোলযোগ পাকিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে। 'জয়বাংলা'-ওয়ালাদের মিলিটারির হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ ওরা খুঁজবেই। কাজেই, হেকিম ভাই আমাকে বললেন, ভাটি এলাকায় গিয়েও আমি যেন খুবই সাবধানে চলাফেলা করি, নিজের পরিচয় যথাসাধ্য গোপন রাখি, অচেনা লোকদের এড়িয়ে চলি।

হেকিম ভাইয়ের বাবা জালাল উদ্দিন খাঁয়ের মধ্যে কিন্তু কোনো উদ্বেগ বা আশঙ্কার প্রকাশ দেখলাম না। গ্রাম বাংলার এই বাউল কবি 'কুছপরোয়া নেই' ভাব নিয়েই সারাটা জীবন কাটিয়ে এসেছেন। এখনো, সেই সাতাত্তর বছর বয়সেও, একই রকম আছেন। জীবনভর তিনি মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছেন লোকায়ত জীবন দর্শনের অস্ত্র হাতে নিয়ে। সে লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, কিন্তু হার মানেননি কোনো দিন। তবে কখনো কখনো বাঙালি জাতির কূপমণ্ডূকতা ও অনৈক্যে ব্যথিত হয়েছেন, অভিমানের বশে স্বজাতিকে ধিক্কার জানিয়ে গানের ভাষায় বলেছেন—

দীন-দরিদ্র সেজেছো আজ আত্মঘাতী জাত-বাঙালি
স্বভাব যেমন হিংসা-প্রিয় জগৎকে তাই খুব দেখালি॥

বিলাত-প্রবাসী নীরদ চৌধুরীও বাঙালিকে 'আত্মঘাতী' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু লোক ঐতিহ্যের ধারক জালাল খাঁ আর বিলেতি ভাবনার চশমাধারী নীরদ চৌধুরীর দৃষ্টি এক নয়। বাউল কবি জালাল খাঁ দেখেছেন যে বাঙালি আত্মঘাতী হয়েছে মোল্লা পুরুতের শয়তানিতে, শোষক শ্রেণীর শোষণে। সমাজে ন্যায় বিচারের অভাব দেখে তার মন হাহাকার করে উঠেছে—

তাজ্জব হয়ে গেলাম বাবা দিন দুনিয়ার ব্যবহারে
চোরেরা খায় খোরমা পোলাও সাধু ঘুরায় দ্বারে দ্বারে॥
পরের সম্পদ করে শোষণ ধনীর ঘরে হয়েছে ধন
খাট পালঙ্কে শুইয়া এখন গাঁজা-মদের আড্ডা মারে॥
দাদা ছিল যার চৌকিদার বড় বড় উপাধি তার
মামারে কয় চাকর আমার বাপ বেটায় তামাক ভরে॥
ভিতর খুঁজলে চুলের মত বাবা মিঞা সাহেব কতো
জাল জুয়াচোর উচ্চাসনে সাধু রয় সব নীচে পড়ে॥
জালাল কহে ভুল বুঝেছো যতই চুরির পথ খুঁজেছো
নাতি-পুতির ভাত মেরেছো হিসাব দিবে একেবারে॥

জালাল খাঁ ইংরেজ রাজত্ব দেখেছেন, পাকিস্তানি শাসনও দেখেছেন। 'পরের সম্পদ করে শোষণ' ধনী হয়েছিলো যারা, সেই 'বাবু'দের দৌরাত্ম্য তিনি যেমন ইংরেজ আমলে প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি পাকিস্তান জামানায় 'মিঞা সাহেব'দের দেখেছেন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যেতে। দাদা যার চৌকিদার ছিলো সেই হয়েছে বড়ো বড়ো উপাধিধারী, সে তো পাকিস্তানেরই বদৌলতে। সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজ যে স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাতে বিশেষ আশাবাদী হয়ে উঠেছেন এই চিরবিদ্রোহী বাউল কবি।

আমাকে বললেন যে ভাটি এলাকার গ্রামে গ্রামে তাঁর অনেক শিষ্য আছে, ওদের সঙ্গে যেন আমি যোগাযোগ করি। ওদেরই মধ্যে একজনের কথা তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন। তার নাম হুসেন আলী। তার গ্রামের নাম সুইত্যার পার। বালালির পথেই পড়বে এই সুইত্যার পার গ্রামটি। আমি যেন সে গ্রামে হুসেন আলীর সঙ্গে দেখা করে যাই। হুসেন আলীর কাছে লেখা একটি চিঠিও তিনি আমার হাতে দিয়েছিলেন।

সঠিক তারিখটি মনে নেই, তবে মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই হবে, বিকেলের দিকে বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে পাঁচ মাইল দূরে বলাই শিমুল গ্রামে পৌছাই। সে-গ্রামেই আমার শিক্ষক ফজলুল হক (ডাক নাম সম্রাজ মিঞা) সাহেবের বাড়ি। মাস্টার সাহেব আমাদের তিনজনকে পেয়ে খুবই খুশি হলেন। সে-সময়ে তিনি, যতোদূর মনে পড়ে, তেলিগাতি হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। বঙ্গবন্ধু-ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই স্কুল ছেড়ে বাড়িতে বসে আছেন। এতোদিন ধরে কথাবলার মতো সঙ্গী না পেয়ে রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। প্রাণ খুলে কথা বলা ও শোনার লোভেই তিনি আমাদের সেদিন তার বাড়িতে রেখে দিলেন, প্রায় সারারাত জেগে আমরা আলাপ করলাম। আলাপে মুক্তিযুদ্ধের অনেক কথাই উঠে এলো। মার্চের শুরুতে যারা 'জয়বাংলা' বলতে অজ্ঞান ছিলো, শহরে মিলিটারি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেরই যে বোল পাল্টে গেছে, মাস্টার সাহেব সে-রকম বেশ কিছু মতলববাজের কথা বললেন। গ্রামগুলোও এখন নিরাপদ নয়, এমন কি ভাটি এলাকারও কোনো কোনো গ্রামে পাক দালালরা আস্তে আস্তে সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাই মাস্টার সাহেবও হেকিম ভাইয়ের মতোই, আমাকে খুব সাবধানে থাকার উপদেশ দিলেন।

তবে, গাঁয়ের যারা খাঁটি কৃষক তাদের ভেতর যে কোনো মতলববাজি নেই, মনে মুখে তারা যে এক, সংকটের দিনগুলোতেও বারবার সে পরিচয় পেয়েছি।

বলাই শিমুল থেকে গেলাম সুইত্যার পার গ্রামে। হুসেন আলী তার বাড়িতে ছিলেন না মাঠে কাজ করছিলেন। মাঠে গিয়েই তার সঙ্গে দেখা করে জালাল খাঁর চিঠিটি তার হাতে দিলাম। বানান করে করে চিঠিটি তিনি পড়লেন। বাউল গুরুর চিঠিটি পড়তে পড়তে শিষ্যের মুখ যে কি রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো তা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। আজও হুসেন আলীর সেই উজ্জ্বল মুখটি প্রায়ই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

গুরুর চিঠি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ ফেলে রেখে তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে চলে এলেন। আমাদের নাম পরিচয় তিনি চিঠিতেই পেয়েছিলেন। তাই বললেন, 'এই গাঁয়ে একটা বামুন বাড়ি আছে। আপনেরারে হেই বাড়িতে খাওনের বন্দোবস্ত কইর‍্যা দিতাছি।' আমরা বললাম, 'না, না, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা আপনার বাড়িতেই খাবো।'

হিন্দু হয়েও আমরা তার বাড়িতে খাবো শুনে তিনি অবাকও হলেন, আবার খুশিও হলেন প্রচণ্ড। তিনি একা নন শুধু। খুশি হলেন তাঁর বাড়ির সবাই। সবাই আমাদের যত্নআত্তিতে লেগে গেলেন।

নিতান্ত গরিব কৃষক তিনি, ভাঙা খড়ো ঘরে কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকেন। কিন্তু আমাদের আপ্যায়নে সেদিন তিনি তাঁর সাধ আর সাধ্য উজাড় করে দিলেন।

দোতরা বাজিয়ে তিনি তাঁর গুরুর রচিত গান আমাদের শোনাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরাই তাঁকে বারণ করলাম। গান শুনে লোক জমায়েত হবে, আর সবাই আমাদের পরিচয় জেনে যাবে এই ছিলো আমাদের আশঙ্কা। অগত্যা তিনি খালি গলায়ই গুন গুন করে 'জালাল গীতিকা'র অনেক কলি আমাদের শোনাতে লাগলেন।

জালালের গানের সঙ্গে আমি আশৈশব পরিচিত। কিন্তু হুসেন আলীর মুখ থেকে সেদিন জালালের গান আর তারই ফাঁকে ফাঁকে কিছু মন্তব্য শুনে এই গানের প্রচণ্ড শক্তিটি আমি নতুন করে অনুভব করলাম।

ছেলেবেলা থেকেই বহুবার আমি গ্রামের ধর্মসভায় গিয়ে 'ওলামায়ে কেরামে'র 'ওয়াজ' শুনেছি, বাউলের আসরে বসে 'বিচার গান'-ও শুনেছি। অনলবর্ষী বক্তা বলে পরিচিত মৌলানারা, প্রায় প্রতিটি ধর্মসভাতেই, আপশোস করে বলতেন : এই যে এখানে দ্বীনের কথা হচ্ছে তাতে শ্রোতার সংখ্যা একেবারে মুষ্টিমেয়, কিন্তু বসতো যদি এখানে গানের আসর তবে এর দশ গুণেরও বেশি লোকের সমাগম হতো।...এই সব গান-বাজনাই মানুষের ঈমান নষ্ট করেছে; নাফরমানিতে দেশ ডুবে যাচ্ছে; আল্লাহ্-রসুলের কথা, কেয়ামতের কথা, শেষ বিচারের কথা কেউ শুনতে চায় না।

যতোই আপশোস করুন মৌলানা সাহেবরা, বাউলের আসরে যোগ দেয়া থেকে গাঁয়ের মানুষকে কোনোদিন তারা ফেরাতে পারেননি। জালাল খাঁ, রসিদ উদ্দিন, মিরাজ উদ্দিনের বাউল গানে গাঁয়ের কৃষক তার মনের কথা যেভাবে আর যে ভাষায় শুনতে পেয়েছে, তেমনটি সে পায়নি কোনো ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে। মোল্লা-মৌলবিদের মুখে সে বেহেশতের সুখের কথা শুনেছে, দোজখের ভয়াবহ আজাবের কথা শুনেছে। বাউলের মুখে শুনেছে রসের কথা, আনন্দের কথা। ওয়াজ মহফিলে সে আল্লাহ্র বিচারের কথা শুনেছে, বাউলের আসরে মহফিলে খোদার প্রেমের কথা, প্রেমিক খোদার কথা শুনতে শুনতে বিচারক আল্লাহ্র কথা সে ভুলে গেছে। তাই সে আসরে জালাল খাঁর তার গানের কথার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মনের আনন্দে সে গেয়ে উঠেছে—

মোল্লাজী কন কি আজি
শুনলে আমার পায় হাসি,
মইলে (মরলে) পরে বিচার হবে
জ্বইলে মরে মোর মন-খাসি॥
কে গড়েছে ভালো মন্দ এই যে দুঃখের দুনিয়ায়
ফুল ফোটে আর গন্ধ ছোটে ফুল বাগানে কার দয়ায়,
কার বা বিচার কে করিবে
আপনার কুল নাশি।

জালাল খাঁর গানে সে যে-আল্লাহ্র পরিচয় পেয়েছে, সে আল্লাহ্ বলেন—

আমি তুমি তুমিই আমি দু'জনার এক পরিচয়
শাস্ত্র পড়ে আমায় জানা কখন কিন্তু নাহি হয়।

তাই শাস্ত্র জানে না বা পড়তে পারে না বলে নিরক্ষর কৃষকের কোনো আপশোস থাকে নি। সে তো পড়তে শিখেছে 'দ্বীল-কোরান', অর্থাৎ অন্তরের গহন গভীরে যে-কোরানের বাণী

সদা-সর্বদা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় সেই কোরান। বাউলের আসরে গিয়েই গাঁয়ের কৃষক সেই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে—

'মাটির দেহ খাঁটি কর খুলে তোমার দীল-কোরান'।

হুসেন আলীর গান আর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হলো : এই দীল-কোরানের নির্দেশ মেনে চলতে পেরেছে বলেই অবিশ্রান্ত পাকিস্তানি প্রচারণাও তাদের ধর্মান্ধ বানাতে পারে নি, সম্প্রদায়-ধর্মের খপ্পরে পড়ে মানব-ধর্মকে তারা বিসর্জন দেয়নি। লক্ষ লক্ষ কৃষক যে আজ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছে তার মূল প্রেরণাটি তো ওরা 'দীল-কোরান' থেকেই পেয়েছে। অসাম্প্রদায়িক লোক ধর্মের সাধক বাউল কবির কাছে তারা শুনেছে—

করিম-কিষণ-হরি-হজরত লীলার ছলে ঘোরে—
ভাবে ডুবে খুঁজে দেখ, ভেদাভেদ কিছু নাইরে॥
হিন্দু কিংবা মুসলমান, শা-বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান
বিধির কাছে সবাই সমান পাপ-পুণ্যের বিচারে...
বাউল কবি জলাল তাদের ডেকে বলেছেন—
দলাদলির ভাবটি ছাড়, বলি বিনয় করে,
কর না দু'দিনের বড়াই, সং সেজে সংসারে—
একই হাতের তৈয়ারি জীব, আসা-যাওয়া এক বাজারে।

হুসেন আলীর ঘরে কোনো খাট-পালঙ্ক ছিলো না। ছোট্ট যে-ঘরটিতে তিনি আমাদের থাকতে দিয়েছিলেন সে-ঘরে ছিলো একটি বাঁশের মাচা। সেই মাচার ওপরই একটি কাঁথা বিছিয়ে যতোদূর সম্ভব পরিপাটি করে আমাদের নৈশ শয্যা রচনা করে দিলেন। আর তিনি নিজে মাটিতে একটি চাটাই পেতে শুয়ে পড়লেন। শিয়রের কাছে রাখলেন একটি ধারালো দা।

আমাদের নিরাপত্তার জন্যেই এ-রকম ব্যবস্থা। কোনো দুশমন যদি ঘরে ঢোকে তবে সঙ্গে সঙ্গেই হুসেন আলীর ওই দায়ের কোপে তার ঘাড়টি ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

কৃষক-সমাজের ভেতর মহলে

সুইত্যার পার গ্রামে হুসেন আলীর বাড়িতে মাত্র একরাতই ছিলাম। পরদিন সকালে উঠে আমরা যখন পাহাড়পুরের দিকে রওয়ানা হলাম তখন হুসেন আলীও আমাদের সঙ্গ নিলেন। আমরা যতোই বলি 'আমাদের সঙ্গে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা ঠিকই পথ চিনে চলে যেতে পারবো' তিনি সে কথা কিছুতেই মানবেন না। তার কথা হলো : পথে হয়তো আমাদের কোনো বিপদ হতে পারে এবং তেমনটি হলে তার বাউল গুরু জালাল উদ্দিন খাঁ কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবেন না।

কিছুদূর পথ চলার পরই হুসেন আলীর এক বন্ধুর দেখা পাওয়া গেলো। তিনিও পাহাড়পুরের দিকেই যাচ্ছিলেন। ওই মানুষটিকে পেয়ে আমরা হুসেন আলীকে বাড়ি ফিরে যেতে রাজি করাতে পারলাম। তবে ফিরে যাওয়ার আগে বন্ধুকে বারবার দিব্যি দিয়ে গেলেন যে তিনি যেন আমাদের পাহাড়পুরের প্রাণেশ বাবুর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরে তার নিজের গন্তব্যে যান।

বন্ধুটি তাই করেছিলেন।

অনেক জলকাদার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা অধ্যাপক প্রাণেশ চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে ছিলাম। প্রাণেশ বাবু আমারই সমবয়সী, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে আমার নিচের সে পড়তেন, এখন কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। তিনি এবং তাঁর বা বনমালী বাবু আমাদের সাদরে স্বাগত জানালেন।

তাঁদের একান্নবর্তী পরিবারে অনেক সদস্য। তার ওপরে বাড়িতে অনেক অতিথি। তিথিদের সবাই আমাদের মতোই অনিশ্চিত পথের যাত্রী। বাড়িতে, বলতে গেলে, তিল ারণেই ঠাঁই নেই। তবু, আমরা সেখানে অবাঞ্ছিত বিবেচিত তো হলামই না, বরং চৌধুরী রিবারের আতিথ্যে পরম আন্তরিকতার স্বাদ পেলাম।

পাহাড়পুরের চৌধুরী বাড়িতে দিন তিনেক ছিলাম। এরই মধ্যে নূরুল হক সেখানে এসে হাজির হলো। গুজব-বাহিত নানান উদ্বেগজনক খবর শুনে আমার খোঁজে সে আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলো। সেখান থেকেই জানতে পারলো যে আমি তারই বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে এসেছি। এর পর এর-ওর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে আমার বর্তমান অবস্থানে তার আগমন।

নূরুল হক আমাকে আর ননী গোপালকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। সুজিৎ গেলো না। ননীগোপালও কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরে গেলো। রয়ে গেলাম আমি একাই, মে থেকে আগস্টের মাঝামাঝি নাগাদ।

এই ক' মাস বালালি গ্রামের নূরুল হকের বাড়িই আমার ঠিকানা ছিলো তবে একটানা পুরো সময়টা আমি সেখানে থাকিনি। কখনো মিলিটারি এসে পড়ার ভয়ে, কখনো বাড়িতে বাবা ঠাকুরমা কী অবস্থায় আছেন সেই খোঁজ নেবার তাগিদে, কখনো বা ভাটি এলাকাটা ভালো করে দেখে নেয়ার কৌতূহলে, এ গাঁ থেকে সে গাঁয়ে ঘুরেছি। অনেক দিন বালালি থেকে চলে গিয়েছি উজানে আমার বাড়ির কাছাকাছি গ্রাম ভটের গাতির সামাদের বাড়িতে। সামাদের মারফতেই বাড়িতে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছি। বাবা গোপনে সামাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। সামাদ আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী এবং নূরুল হকের আত্মীয়। স্কুল ছাড়ার পরে সামাদের সঙ্গে খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এবার রাষ্ট্র বিপ্লবের কালে তার সাক্ষাৎ পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম, সে যে আমার যথার্থ বান্ধব তার পরিচয় পেলাম। কয়েক বারই সে আমাকে নিয়ে ভটের গাতি থেকে বালালি এবং বালালি থেকে ভটের গাতি যাতায়াত করেছে। দু' একবার তার কোনো কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে আতিথ্যও নিয়েছি। তার আত্মীয়রা সবাই কৃষক। সামাদের আত্মীয়রাই নয় শুধু, এই ক'মাসে আমি যে সব পরিবারের আশ্রয়ে থেকেছি তারা সবাই কৃষক। মুসলমান কৃষক। নূরুল হকরাও তা-ই।

গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান রূপে জন্মের পর থেকেই কৃষকদের সঙ্গে আমাদের ওঠা-বসা। চারপাশের মানুষদের অধিকাংশই তো কৃষক। একেবারে ছেলেবেলায় গ্রামে যারা আমার খেলার সঙ্গী ছিলো তাদের প্রায় সবাই তো কৃষক পরিবারেরই ছেলে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর যারা আমার সহপাঠী হলো তাদেরও বেশির ভাগই কৃষক সমাজ থেকে আগত।

তবু, পরিপার্শ্বে এ রকম কৃষক-সম্পৃক্ততা সত্ত্বেও, কৃষক সমাজের থেকে একটা দূরত্ব আমাদের ছিলোই। সে দূরত্ব রক্ষা করে চলার ব্যাপারে আমাদের অভিভাবকরা থাকতেন সদা সতর্ক। কৃষকদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাবও তারা আমাদের মধ্যে সঞ্চার করে দিতে চাইতেন। সকল তথাকথিত ভদ্রলোকেরাই এমনটি করতেন। হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যেই এ

প্রাকটিসটি সবচেয়ে বেশি মাত্রায় চালু ছিলো। গ্রামীণ মধ্যস্বত্বভোগী ধনী ভদ্রলোকেরাই নয় শুধু, গরিব ভদ্রলোকদেরও ছিলো একই দস্তুর। বাঙালি হিন্দুদের সামাজিক বিন্যাসটাই এ রকম যে এ সমাজের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের মধ্যে যারা নিতান্ত দরিদ্র, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তাদের জন্যেও ভদ্রলোকের আসনটি একেবারে পাকাপোক্ত। উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত পরগাছা হয়েও উৎপাদনসংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষদের তারা 'ছোটলোক' বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। খাদ্যের জোগানদার কৃষকদের বলে 'চাষা'। আর এই 'চাষা' শব্দটি যে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিত্যাগ করে একান্তই অবজ্ঞা ও ঘৃণার প্রতীক হয়ে উঠেছে সে কথা তো আমরা সবাই জানি। গতর খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে যারা, সে রকম সব মানুষের গায়েই 'ছোটলোক'-এর ছাপ মেরে দেয় পরশ্রমজীবী স্বঘোষিত ভদ্রলোকেরা। পরিশ্রমের প্রতি তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা, পরশ্রমের ফল আত্মসাৎ করে জীবন যাপন করাই তাদের কাছে পরম মর্যাদাকর। 'চড়া কথা ফাটা পায়, ছোটলোক চেনা যায়'—এরকম প্রবচন ওই ভদ্রলোকরাই তৈরি করেছে। গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ কঠিন মাটিতে ও বর্ষার জলে-কাদায় খালি পায়ে যারা কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, সেই চাষাদের পা কখনো তুলতুলে নরম থাকতে পারে না। সারা বছরই তাদের পা থাকে ফাটা। সেই ফাটা পায়ের মানুষগুলোর কণ্ঠ থেকেও মিহি স্বরধ্বনি নির্গত হয় না, চড়া গলায় কথা বলাই তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মাটিতে চরণ না ঠেকিয়েও যারা মাটির মালিক, সেই ভদ্রলোকদের পদযুগল থাকে পাদুকাবৃত। তাই পা ফাটার আশঙ্কা তাদের থাকে না। পরিশ্রমে পরিতৃপ্ত বলেই তাদের গলা থেকেও নরম নরম বুলি বেরোতে পারে। সেই নরম বুলির ভদ্রলোকদের মুখে যতো মধু থাকে, পেটে থাকে ততো বিষ। সেই বিষে হরহামেশাই জর্জরিত হতে হয় 'চড়া কথা ফাটা পায়ে'র ছোটোলোকদের।

ছোটো, বড়ো, মাঝারি—এরকম নানা স্তরবিন্যস্ত গ্রামীণ ভদ্রলোকদের সকলেই জীবন যাত্রার এমন একটি বেড়া তৈরি করে রাখে যাতে 'ছোটলোক' চাষাদের থেকে সব সময়ই তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। সেই স্বাতন্ত্র্যর বেড়া কখনো যাতে ভেঙে না পড়ে সেদিকে কড়া নজর রাখে একান্ত দরিদ্র ও হা-ভাতে ভদ্রলোকেরাও। তাদের ছেলেপুলেদেরও ঘিরে রাখে অকারণ আত্মাভিমানের পর্দা দিয়ে। তাই ভদ্রলোকের নাবালক ছেলেদেরও 'ছোটোলোক'দের পাড়ার প্রাঙ্গণের ধার থেকেই ফিরে আসতে হয়, ভেতরে প্রবেশ করার শক্তি একেবারেই থাকে না।

কাজেই আবাল্য কৃষক-পরিবৃত হয়ে থেকেও, আমিও কৃষক-সমাজের একেবারে ভেতর মহলে প্রবেশ করতে পারিনি। বিশেষ করে মুসলমান কৃষকদের ভেতর। জাতভেদ-কণ্টকিত হিন্দুসমাজে—অন্তত গ্রামীণ হিন্দুসমাজে—ছুঁৎমার্গের পাঁচিল ভেদ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মিশতে পারাটাই উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্যে সহজ ছিলো না। মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে সত্যিকার অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে যাওয়া বা একাত্ম হওয়া তো ছিলো অসম্ভব।

সেই অসম্ভবের পাঁচিলটাই এবার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো বাঙালির সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম তথা রাষ্ট্র বিপ্লবের ধাক্কায়। সেই ধাক্কাতেই শহুরে ভদ্রলোকদের অনেকে প্রথমবারের মতো গ্রাম চেনেন, গ্রামের কৃষকদের শরণ নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করেন। সেই রামধাক্কা খেয়েই আমিও বাঙালি কৃষক সমাজের একেবারে অন্দর মহলে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর পার হয়ে একাত্তর সালে এসেই কৃষকদের এবং মুসলমান কৃষকের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে আমার।

আমার নাম-পরিচয় যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করেও সবসময় তা পারিনি। যখনই মুসলমান কৃষকরা জেনে ফেলেছে যে আমি হিন্দু, অথচ তাদেরই হাতের রান্না খাচ্ছি, তখনই তারা আমাকে একটু অন্য ধরনের বা ব্যতিক্রমী মানুষ বলে ধরে নিয়েছে। সুইত্যার পার গ্রামে হুসেন আলীর বাড়িতেই এ-ব্যাপারটি আমি প্রথম টের পেলাম। নাগরিক হিন্দু সমাজ যে খাওয়া-দাওয়ায় ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচারের ব্যাপারটি অনেকদিন আগেই চুকেবুকে গেছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ কৃষকরা সে বিষয়ে তখনো তেমন করে সচেতন হয়নি।

বালালি গ্রামে আসার পর থেকে আমি দাড়ি কামাইনি। লুঙ্গি পরে থাকি সব সময়। 'পানি' ও 'গোসল' বলি, ভুলেও কখনো 'জল' বা 'স্নান' বলি না। এখন যেন আমি মুসলমান কৃষক পরিবারেরই একজন। তাদের সঙ্গেই থাকি, খাই, ঘুমাই, কথা বলি। তাদের অন্দর মহলেরও খবর জানতে পারি। গরিব কৃষকদের অবশ্যি অন্দর-বাহির বলে আলাদা তেমন কিছু নেই। মেয়েদের অবরোধবাসিনী করে কিংবা পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা হচ্ছে ধনীদের ব্যাপার, গরিবদের ওসবের বালাই নেই, থাকার উপায়ই নেই। নূরুল হকদের বাড়ির বাইরের ঘরটিতেই আমি থাকতাম বটে, কিন্তু সেখানে শুয়ে বসে থেকেই আমি সারা পাড়ার কর্মরত কৃষক রমণীদের দেখতাম, তাদের ঝগড়া-ফ্যাসাদ চুলোচুলি প্রত্যক্ষ করতাম, তাদের উচ্চকণ্ঠ বকাবকিও শুনতাম। অনক্ষর কৃষক পুরুষদের মতো রমণীরাও রেগে গেলে অবলীলায় যে সব শব্দ ও বাক্য প্রযোগ করে, 'ভদ্র' সমাজের বিচারে সেগুলো মোটেই শ্লীল নয়। কৃষক সমাজের নারী-পুরুষ কিন্তু সচেতন অশ্লীলতায় সেগুলো উচ্চারণ করে না। শ্লীলতা-অশ্লীলতার বাইরে এ সব শব্দ ও বাক্য তাদের আবেগমোচনের একান্ত স্বাভাবিক উপায় মাত্র, এর পেছনে অন্য কিছুর উপস্থিতি নেই।

কৃষক তার আবেগকে লুকিয়ে রাখে না, রাখতে পারে না। প্রেম, ঘৃণা, হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, হিংসা—কৃষকের সব আবেগের প্রকাশই সরব ও সক্রিয়। আবেগের প্রকাশে তার কণ্ঠে কখনো শোনা যায় মেঘের গর্জন, কখনো ঝড়ো হাওয়ার হাহাকার বা মাতলামি, কখনো বাঁধভাঙা জোয়ারের অট্টহাসি। কখনো বর্ষার জল ধারার মতো তার চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। আবার যখন প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন তার চোখ থেকে ঠিকরে বেরোয় আগুনের হল্‌কা। সে-আগুনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুড়ে মারতে একটুও ইতস্তত করে না সে। জান নেয়া আর জান দেয়া দুটোই তার কাছে হয়ে যায় সমান সহজ।

কৃষকের আবেগ খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যক্তিক সীমায় আবদ্ধ থাকে, প্রায়শই তার প্রকাশ সমষ্টিগত রূপ ধারণ করে। একের আবেগ অন্যে ভাগ করে নেয়। পরস্পরের শোকে দুঃখে সারা গাঁয়ের মানুষ দল বেঁধে গলা ছেড়ে কাঁদে, সকলে সকলের সুখে প্রাণ ভরে হাসে। বাংলার কৃষকের চেতনায় এক ধরনের ট্রাইব্যাল সংহতি সব সময়ই সক্রিয়। তাই, এক গাঁয়ের কোনো কৃষকের গায়ে অন্য গাঁয়ের কেউ যখন হাত তোলে বা তাকে অন্যভাবে অপমান করে তখন তা আর নিতান্ত ব্যক্তির ব্যাপার হয়ে থাকে না, দুই গাঁয়ের সকল কৃষকই তখন আপন আপন গাঁয়ের পক্ষ নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়েই হয়তো দুই গাঁয়ের কৃষক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে ওঠে, মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তবু সামষ্টিক মর্যাদার লড়াইয়ে কেউ পিছু হঠতে রাজি হয় না।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েও, কী একটা ব্যাপার নিয়ে, এ রকমই এক মর্যাদার লড়াই প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিলো বালালি ও ফতেপুর গ্রামের মধ্যে। ফতেপুর গ্রামে নূরুল হকের শ্বশুর

বাড়ি। নূরুল হকের স্ত্রী রুপু স্বামীকে ঠাট্টা করে বলেছিলো, 'এবার আর তুমি শ্বশুর বাড়ি যেতে পারবে না। বালালির লোক পেলেই ফতেপুরের মানুষ তার ঠ্যাং ভেঙে দেবে, জামাই বলে খাতির করবে না।'

অন্য সময় হলে হয়তো বালালি ও ফতেপুর গ্রামের ব্যাপারটি এ রকম নিতান্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় হয়ে থাকতো না। মুক্তিযুদ্ধের সময় বলেই হয়তো সেটি খুব বেশি দূর গড়াতে পারেনি। উভয় গ্রামেরই বিবেচক মানুষদের হস্তক্ষেপে একটা মিটমাট হয়ে যায়।

লাগতে লাগতে মিটে যাওয়া ঝগড়াটির সূত্র ধরেই আমি গ্রামীণ কৃষকদের কাইজ্যা-ফ্যাসাদের বহুকাহিনী শুনলাম। নূরুল হকের এক চাচার সঙ্গে আমার অনেক গল্প হতো। বেশ আলাপী মানুষ তিনি। খুব গুছিয়ে গল্প করতে পারতেন। তার কাছে কাইজ্যা-ফ্যাসাদের গল্প শুনতে শুনতে জসীম উদ্দিনের '*নক্সী কাঁথার মাঠ*' '*সোজন বাইদ্যার ঘাট*'-এর কাইজ্যার চিত্রগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

অনক্ষর মেহনতি মানুষ ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব

গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে আপনি হেঁটে যাবেন, অথচ কাউকে আপনার নাম-পরিচয় বলবেন না, তেমনটি একেবারেই অসম্ভব। শুধু আপনার নিজের নাম-ধাম নয়, আপনার ঊর্ধ্বতন অন্তত দু'তিন পুরুষের খবরাখবর, আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা—এ রকম অনেক কিছুই জিজ্ঞাসু জনকে জানাবার জন্যে আপনাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজের গাঁয়ের ভেতরে বাইরের আগন্তুকের প্রতি কৃষকের থাকে সন্দেহ ও কৌতূহল-মিশ্রিত দৃষ্টি। তাই সে প্রতিটি আগন্তুককে বাজিয়ে দেখে নিতে চায়। আগন্তুক সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি পায় না। সন্দেহমুক্ত হলে আগন্তুককে সহজেই সে আপন করে নেয়।

আঁকা-বাঁকা পথ চলতে চলতে আপনি হয়তো বুঝে উঠতে পারছেন না আপনার গন্তব্যস্থলটি ঠিক কোন দিকে। ক্ষেতে কর্মরত একজন কৃষককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, অমুক গ্রামে কিংবা এ গ্রামের অমুকের বাড়িতে যাওয়ার পথ কোনটি?'

কৃষকটি তখন লাঙ্গলে হাত রেখে কিংবা কাটা ধানের আটিটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে। আপনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে। আপনার আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নেবে। আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দেবার আগে আপনাকেই পাল্টা প্রশ্ন করবে, 'আপনের বাড়ি? কই থাইক্যা আইছুইন? অমুকের বাড়িৎ কিয়ের লাইগ্যা যাইবাইন? অমুক আপনের কি অয় (অর্থাৎ তার সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ)?'

সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর সে আপনার গন্তব্যস্থলের সঠিক পথটি দেখিয়ে দেবে, সম্ভব হলে আপনার সাথী হয়ে কিছুদূর আপনাকে এগিয়ে দিতে আসবে, অথবা কাউকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে আপনাকে উদ্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছিয়ে দেবে।

নূরুল হকের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতা আমার কয়েকবারই হয়েছে। তবে আমাকে মুখ খুলতে হয়নি। নূরুল হকই কৃষকের জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে এবং আমার যা হোক একটা কিছু বানানো পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসুর কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়েছে।

গাঁয়ের কৃষকের আত্মীয়-স্বজনও কোনো এক ব্যক্তির বা পরিবারের নয়, সারা গাঁয়ের। অমুক গাঁয়ের কেউ তমুক গাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, কিংবা অমুক গাঁয়ের কারো সকলের।

শালার শ্বশুর বাড়ি তমুক গাঁয়ে, তাতেই সেই দুই গাঁয়ের প্রত্যেকে প্রত্যেকের কুটুম। এবং সে পরিচয় দিয়ে যে কেউ যে কারো বাড়িতে গিয়েই উঠুক না কেন, কুটুমের মর্যাদা সে ঠিকই পাবে। গাঁয়ের কৃষকের মেহমানদারিতে শহুরে ভদ্রলোকের কৃত্রিমতা থাকে না। গরিব কৃষক নিজে যা খায় তাই দিয়েই সে মেহমানকে আপ্যায়িত করে, মেহমানও তাতেই পরম পরিতুষ্ট হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে ভাটি এলাকার কৃষকের এরকম মেহমান হওয়ার আনন্দ আমি বহুবার পেয়েছি।

ধনী কৃষক বা জোতদারের আতিথ্যও আমি নিয়েছি দু'একদিন। তবে ভাটি এলাকায় প্রবাসের প্রায় পুরো সময়টাই আমি কাটিয়েছি গরিব ও মাঝারি কৃষকের বাড়িতে। এসব কৃষকের জীবনযাত্রার ধরন একান্তই সাদাসিধে। অভাবের ভেতর বাস করেও তাদের অভাববোধ খুবই কম। খাদ্যদ্রব্য সব তারা নিজেরাই উৎপাদন করে। খাল বিল নদী থেকে মাছ ধরে। বাড়িতে যে সবজি জন্মায় তার কিছুটা নিজেরা খায়, বাকিটা বাজারে বিক্রি করে তেল আর নুন কিনে আনে। কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে সন্ধ্যার পরপরই তারা রাতের খাওয়া সেরে ফেলে। এরপর তাদের অনেকের ঘরেই আর আলো জ্বলে না। রাত আটটার ভেতরেই সারা গাঁয়ে নেমে আসে মাঝ রাতের আঁধার ও স্তব্ধতা।

আমার ছাত্র নূরুল হকও সাধারণ মাঝারি কৃষক পরিবার থেকেই উঠে এসেছে। বাংলায় এমএ পাস করে একাত্তরে সে নেত্রকোনা কলেজের অধ্যাপক। বিএ পরীক্ষা দিয়ে যে মাস দুই আমি আশুজিয়া হাইস্কুলে মাস্টারি করি সে সময়েই নূরুল হককে আমি ছাত্র হিসেবে পাই। গ্রাম্য স্কুলের ক্লাস সিক্সের একটি ছাত্রের মধ্যে যে এমন মেধা ও কৌতূহল থাকতে পারে তা ভাবতে পারিনি। ওই সময়েই চমৎকার কবিতা লিখতো এবং তার গদ্যেরও একটি নিজস্ব স্টাইল তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। তার কথা শুনে ও লেখা পড়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। কবি-প্রতিভাদীপ্ত এই ছেলেটিকে আমি হেকিম ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এরপর আমি আশুজিয়া হাইস্কুলের মাস্টারি ছেড়ে চলে গেলে নূরুল হকই হয় হেকিম ভাইয়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। বাংলাদেশে একজন প্রথম শ্রেণীর কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করার মতো প্রতিভা, যোগ্যতা ও প্রস্তুতি সবই নূরুল হকের ছিলো। সে হতে পারতো একজন উঁচুমানের প্রবন্ধকার কিংবা কাব্যসমালোচকও। কিন্তু কেন যে সে এ সবের কোনো কিছুই হলো না কিংবা আত্মপ্রকাশের কোনো চেষ্টাই সে পরে আর করলো না—সে এক দুর্বোধ্য রহস্য। তবে এটুকু বলতে পারি যে, তিরিশ বছরেরও বেশিকাল ধরে স্কুল কলেজে মাস্টারি করে যতো ছাত্র আমি পেয়েছি তাদের কেউই মেধায় মননে ও মৌলিক চিন্তায় নূরুল হকের সমকক্ষ তো নয়ই, তার ধারে কাছে যাওয়ারও যোগ্যতা কারো নেই।

একান্তভাবে কৃষক-অধ্যুষিত গ্রাম বালালিতে নূরুল হকের আগের প্রজন্মের কেউই সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিতে পারেনি। ম্যাট্রিক পাসও কেউ ছিলো না বোধ হয়। সে গ্রামেরই মোতালেব নূরুল হকের খালাতো বড়ো ভাই—নাসিরাবাদ কলেজের নৈশ বিভাগে পঁয়ষট্টি-ছেষট্টির দিকে আমার ছাত্র হয়েছিলো। একাত্তরে দেখলাম বালালি গ্রামে স্কুল কলেজে পড়ুয়া কিশোর তরুণের সংখ্যা অনেক। বেশ কয়েকজন তো আমারই ছাত্র—নাসিরাবাদ কলেজে পড়ে। এরা সবাই মাঝারি কৃষকের ছেলে। এদের প্রায় সবারই ওপর নূরুল হকের কিছু না কিছু প্রভাব আছে। নূরুল হকের দৃষ্টান্তই, আমার মনে হয়, বালালি গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার দিকে টেনে এনেছে।

আমি যখন নূরুল হকের বাড়িতে আস্তানা গাড়ি তখন এই ছেলেরা আমার চারপাশে এসে জমায়েত হয়। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে ওরা জানতে চায় মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য ও গতি প্রকৃতি। সমাজ ও রাজনীতির নানা বিষয় নিয়েও তাদের অনেক জিজ্ঞাসা।

এ রকম আগ্রহ লক্ষ করে নূরুল হকের বাড়িতেই এদের নিয়ে একটা 'পাঠচক্র' বসালাম। মতিন, গিয়াস, মুজিবর, করিম এবং এরকম আরো কয়েকজন স্কুল কলেজের ছাত্র সেই পাঠচক্রে নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগলো। কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্লাসগুলোতে আমরা যা যা আলোচনা করতাম এখানেও মোটামুটি সে সব বিষয়েরই অনুশীলন চলতো। এই পাঠচক্রটি ওদের চেতনার পুরো রূপান্তর ঘটাতে পারেনি হয়তো, তবে ওদের বোধ বুদ্ধিতে যে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিলো—সে কথা মানতেই হবে। অদৃষ্টবাদ-নির্ভর কৃষক সমাজের প্রভাব কাটিয়ে রাতারাতি ওরা বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলো, সে রকম দাবি করলে তা অতিকথা হবে অবশ্যই। তবু, ওই অনানুষ্ঠানিক পাঠচক্রটি যে ওদের নতুনভাবে জীবনকে দেখতে শিখিয়েছিলো, পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলো, সে কথাটি না বলে পারছি না। ওই পাঠচক্রটি গ্রামীণ কৃষক সমাজ-থেকে-পাওয়া অভ্যস্ত ভাব ভাবনার বিপরীত মেরুতে তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো। সত্তরের নির্বাচনের মধ্যদিয়ে সারাদেশের মতো এ অঞ্চলেও আওয়ামী ভাবনার একটা হাওয়া বয়ে গিয়েছিলো, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনেও আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গিটিই সেখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু নূরুল হকের বাড়ির ওই পাঠচক্রটির সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট হয়েছিলো তারা তখন, স্বাভাবিকভাবেই, বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধটিকেও তারা বামপন্থিদের দৃষ্টিতে—আরো স্পষ্ট করে বললে 'মস্কোপন্থী' কম্যুনিস্ট পার্টির দৃষ্টিতে—দেখতে শুরু করে। কিছুদিন পর ওরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়, এবং সেখানেও ভাবনাচিন্তায় বামপন্থী অবস্থানটিকেই লালন করে চলে। যুদ্ধ শেষে গাঁয়ে ফিরে এসে ওরা বিপুল উৎসাহে কৃষক সমিতি ও ক্ষেতমজুর সমিতির মতো সংগঠন গড়ে তোলে। বালালি ও তার আশপাশের গ্রামগুলোতে কৃষকদের মধ্যে অধিকার চেতনার বিস্তার ঘটে ওদেরই কর্মতৎপরতায়। কিন্তু, দুঃখ এই, সে তৎপরতাকে ওরা সঠিক পরিণতির দিকে পৌঁছিয়ে দিতে পারেনি। মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে পাকিস্তান নিহত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রগতির রথযাত্রায় শুরু হয় যে উল্টোরথের পালা, তারই চাকায় পিষ্ট হয়ে অকালে মুখ থুবড়ে পড়ে বালালি গ্রামের স্বাপ্নিক তরুণদের সকল প্রগতি-প্রয়াস। তবে সে প্রসঙ্গ এখন নয়, সেটি আসবে পাকিস্তানের ভূতদর্শনের বেলায়।

স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্র তরুণরা সমাজনীতি ও অর্থনীতির যে সব বিষয় বুঝতে পারতো না, সেই সব বিষয়েও নিরক্ষর কৃষকদের অনায়াস উপলব্ধি দেখে অবাক হয়ে গেছি। একবার বালালি থেকে নৌকা করে অন্য এক গ্রামে যাচ্ছিলাম। সঙ্গী ছিলো পাঠচক্রের সদস্য ওই ছাত্র তরুণরা। নৌকায় বসেই সেদিন আমরা পাঠচক্রের কাজ চালাচ্ছিলাম। পড়া হচ্ছিলো নীহার সরকারের 'ছোটোদের অর্থনীতি' বইটি। 'থিওরি অফ সারপ্লাস ভ্যালু' বা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটি কিছুতেই বুঝতে চাইছিলো না পাঠচক্রের ওই তরুণরা। শ্রমিকের তৈরি-করা উদ্বৃত্ত মূল্য চুরি করেই পুঁজিপতিরা ফুলে ফেঁপে ওঠে—একথা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য। শ্রমিকের শ্রম দিয়ে কেবল উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে কেন? পুঁজিপতি যে পুঁজির যোগান দিলো তা না পেলে কি শ্রমিক ওই পণ্যটি উৎপাদন করতে পারতো? পুঁজিপতি যে ঝুঁকিটি নিলো তার কি কোনো দাম নেই? শ্রমিককে তার শ্রমের মূল্য চুকিয়ে দিয়েই তো পুঁজিপতি তার লাভের

অংশটি নিয়ে থাকে। লাভ না পেলে সে পুঁজি বিনিয়োগ করে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে যাবে কেন?—এ রকম হাজারো প্রশ্নে ওরা বর্ষার হাওড়ের বুকে প্রচণ্ড কোলাহলের সৃষ্টি করলো। ওদের প্রশ্নের তোড়ে আমার তো ভেসে যাওয়ার মতো অবস্থা!

হঠাৎ শুনি নৌকার মাঝির গলা। ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে ওই 'অশিক্ষিত' মাঝিটি তার গাঁয়ের 'শিক্ষিত' ছেলেদের থামিয়ে দিলো।

—'স্যার তো ঠিক কথাই কইছুইন। তোমরা তার কথাডা বুঝতাছো না ক্যারে (কেন)?'

সবাই হকচকিয়ে গেলো। মুহূর্তে সব কোলাহল স্তব্ধ।

আমি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা এখানে কী আলোচনা করছি তুমি তা বুঝতে পারছো?'

—'বুঝতাম না ক্যারে? আমার মনের কথাডাই তো আপনে কইছুইন। এই শিক্ষিত পোলাপানরা এই কথাডা বুঝতো পারে না। বুঝবো কী কইর‍্যা? শিক্ষিত অইলে কী অইবো? এরা তো আর আমার মতো খাইট্যা খায় না, নাও বাইয়া তারার সংসার চালানি লাগে না।'

আমার বিস্ময় তখন তুঙ্গে।

মাঝিটি তার জীবন বৃত্তান্তের কিছু অংশ তুলে ধরলো।

সে জাতে মাঝি নয়। ভাটি এলাকায় হাওড়ে নৌকা চালানো যাদের পেশা ছিলো তারা ছিলো আলাদা এক জাতের মানুষ—হিন্দু মাঝি। পাকিস্তান হওয়ার পর ওই জাত মাঝিদের অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এখন আর জাত-বেজাতের কোনো কথা নেই, মুসলমানরাও মাঝি হয়েছে। আমাদের নৌকার মাঝিটিও মুসলমান। তার বাপদাদা কখনো নৌকা বেয়ে পেট চালানোর কথা ভাবেনি। তারা ছিলো কৃষক। কৃষিকাজই ছিলো তাদের জীবিকা। সেও বাপদাদার মতো কৃষকই ছিলো। বাপদাদা যা জমি জিরেৎ রেখে গিয়েছিলো তাতে ফসল ফলিয়েই তার সংসার কোনো রকমে চলে যেতো। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে সেই জমি জিরেৎ সব তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন সে চাষের মওসুমে পরের জমিতে কামলা খাটে। আর বর্ষায় হাওড়ে নৌকা চালায়। আজ সে মাঝি।

যে নৌকাটি চালিয়ে সে আমাদের হাওড় পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই নৌকার মালিক গাঁয়েরই এক ব্যাপারি। ওই ব্যাপারি নৌকাটি বানিয়েছিলো দশ বছর আগে। নৌকা বানাতে তার খরচ পড়েছিলো মাত্র 'ছয় কুড়ি' মানে একশো বিশ টাকা। আমাদের আজকের এই মাঝিটিই দশ বছর ধরে ব্যাপারির এই নৌকাটি চালিয়ে আসছে। তাই এই নৌকা থেকে ব্যাপারির কী আয় রোজগার হয় সবই সে জানে।

—'আইজ যে আপনেরারে আমি নাও বাইয়া লইয়া যাইতেছি এর লাইগ্যা আপনেরা আমারে দিবাইন দশ ট্যাহা (টাকা)। এর থ্যাইক্যা আমার ব্যাপারিরে দেওন লাগবো পাঁচ ট্যাহা...এইরকম কইর‍্যা নাও বাইয়া ব্যাপারিরে আমি দশ বছর ধইর‍্যা ট্যাহা দিয়া আইতাছি। নাওডা বানাইতে ব্যাপারির খরচ অইছিলো মাত্র ছয় কুড়ি ট্যাহা। আর আমি যে কতো ছয় কুড়ি ট্যাহা এই কয় বছরে তারে দিয়া দিছি তার কি কোনো হিসাব আছে?....'

মাঝিটির কথা হচ্ছে : ব্যাপারি যে টাকা খরচ করে নৌকা বানিয়েছিলো তার কয়েকগুণ টাকা তো সে প্রথম দুই/তিন বছরেই পেয়ে গেছে। এরপর সাত/আট বছর ধরে যে টাকা সে মাঝির কাছ থেকে নিচ্ছে তা কি তার প্রাপ্য? ব্যাপারি যে নৌকাটির জন্যে পুঁজি খাটিয়েছে একথা অবশ্যই মানতে হবে। কিন্তু পুঁজি খাটিয়ে নৌকা বানিয়ে যদি তার ঘাটে বেঁধে রাখতো

তবে কি আপনা থেকেই নৌকাটি চলতে শুরু করতো? মাঝি যদি তার নিজের হাতে লগি ঠেলে নৌকাটি চালিয়ে নিয়ে না যেতো তাহলে কি যাত্রীরা কেউ ব্যাপারির নৌকায় এসে বসে থেকেই তাকে টাকা দিয়ে যেতো? ব্যাপারি যে নৌকা থেকে এতো টাকা পাচ্ছে তা তো মাঝিরই হাতের মেহনতের গুণে। আর কতো লাভ করবে ওই ব্যাপারি? এতো বছর নৌকা চালিয়ে মাঝি ব্যাপারিকে যে এতো টাকা দিয়েছে তাতে কি মাঝিরই এখন নৌকাটির মালিক হয়ে যাওয়া উচিত নয়? এখনো যে ব্যাপারি তার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে তা কি অন্যায় নয়?....

মাঝি যে প্রশ্নগুলো করছিলো সেগুলো ছিলো তার স্বগতোক্তি মাত্র। প্রশ্নের জবাব সে আমার কাছে চায়নি। তবে এই 'অশিক্ষিত' মাঝির প্রশ্নগুলো থেকেই বোধ হয় আমার পাঠচক্রের 'শিক্ষিত' তরুণরা তাদের সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গিয়েছিলো। 'উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব' আমি তাদের বোঝাতে পারিনি। শ্রমফল-বঞ্চিত ওই ভুক্তভোগী মানুষটির কাছ থেকেই সে তত্ত্ব তারা সেদিন শিখে নিয়েছিলো। শুধু তারা নয়, আমিও। পুঁথির অক্ষর আমার কাছে যা স্পষ্ট করতে পারেনি, এই নিরক্ষর মাঝিটি তাই করলো।

'ক্ষিদা লাগলে দারুণ পেট বাঘের চিৎকার মারে'

কৃষকের মনোলোকে অদৃষ্টবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। 'অদৃষ্ট' মানে যা দেখা যায় না, যার পূর্বাভাস পাওয়া যায় না, আগাম যার প্রতিকার করা যায় না, অকস্মাৎ অজান্তে যা ঘাড়ের ওপর চড়ে বসে। বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সর্পাঘাত, মহামারী সবই কৃষকের কাছে অদৃষ্ট। এবং এই অদৃষ্টই তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে বহুলাংশে। অদৃষ্টের হাতের মার খায় সে প্রতিনিয়ত। তাই সে অদৃষ্টবাদী না হয়ে পারে না।

ভাটির দেশের কৃষকদের জীবনে শিলাবৃষ্টিই সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টের পরিচায়ক। মূলত একটি ফসলের ওপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। সেটি বোরো ধান। চৈত্র বৈশাখে যখন বোরো ধান ফলনের সময় তখনই শিলাবৃষ্টিরও মওসুম। বৃষ্টির সঙ্গে শিলা তো বোরো ধানের ক্ষেতে পড়ে না, পড়ে একেবারে কৃষকের বুকের ভেতরে, তার হাড়গোড় সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে যায়। শিলাবৃষ্টির হাত থেকে বোরো ক্ষেত যদি রক্ষা পেয়ে যেতে পারে, তবেই ভাটির কৃষকের ঘরে সারা বছরের জন্যে ধান উঠবে। ধানই তার ধন, ধানের বদৌলতেই সে ধনবান। আর বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা যদি ধান ক্ষেতকে দেয় তছনছ করে, তবে তার গোলা হবে শূন্য, শূন্য উদরে সারা বছর তাকে দুঃখের গান গেয়ে যেতে হবে। অনেক ধনবান কৃষকও এক লহমায় হয়ে যাবে ধনহীন।

এই দুরদৃষ্টের প্রতিকার করার কোনো বাস্তব সাধন কৃষকের হাতে নেই। বিজ্ঞানও আজ পর্যন্ত সে রকম কোনো সাধন উদ্ভাবন করতে পারেনি। তাই অসহায় কৃষক কী করবে? অদৃষ্টকেই চূড়ান্ত নিয়ামক ধরে নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিই বা সে করতে পারে? না, একেবারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ যে সে করে বসে তা নয়। অদৃষ্টকে প্রচণ্ড শক্তিশালী বলে মানলেও মানুষ তাকে বরাবরই জয় করতে চেয়েছে। আদিম মানুষ অদৃষ্ট জয়ের জন্য হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছিলো 'ম্যাজিক বিলিফ' যা যাদু বিশ্বাসকে। সেই যাদু বিশ্বাস এখনো কৃষকের সঙ্গী। ভাটি দেশের কৃষক শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধের জন্যে আজও এক ধরনের যাদুবিশ্বাসের আশ্রয় নেয়। সেই যাদুর কারিগর বা গুণীদের বলে 'হিরালি'। ভাষাতত্ত্বের

পণ্ডিতরা বলেন, 'হিরালি' হচ্ছে আসলে 'শিলারি' অর্থাৎ শিলের অরি বা শত্রু। 'শ'-টাই ভাটির উচ্চারণে 'হ' হয়ে শেষে বর্ণবিপর্যয়ের ফলে 'শিলারি' হয়েছে 'হিরালি'। কৃষকের মনে হিরালির জন্যে পাতা আছে একান্ত সম্ভ্রমের আসন। এই বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের কোনো পার্থক্য নেই। আগে হিন্দু সমাজের 'নাথ' সম্প্রদায়ের মানুষরাই সাধারণত হিরালি হতো। এরপর মুসলমানরাও আসে এ পেশায়। হিরালি নানা তুকতাক করে কৃষকের ক্ষেতের রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করে যায়। এই সব তুকতাকের সঙ্গে হিন্দু বা মুসলমানের ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং বৈরিতা আছে। তবু কৃষক সমাজে হিরালিদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব লক্ষ করেই হিন্দু পুরোহিত বা মুসলমান মোল্লা কেউই ওদের ঘাঁটায় না, ঘাঁটাতে সাহস পায় না। যে বছর শিলাবৃষ্টি'র হাত থেকে বোরো ক্ষেত রক্ষা পায় সে-বছর কৃষক হিরালির শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। আর যে বছর এর বিপরীতটি ঘটে সে বছর সে শূন্য গোলার সামনে দাঁড়িয়ে তার অদৃষ্টকেই ধিক্কার দেয়, হিরালিকে দোষী করে না। বরং পরের বছর আবারো হিরালির কাছেই যায়।

জলজঙ্গলের দেশে সর্পাঘাতও অদৃষ্টের মার হয়েই আসে। সেই অদৃষ্টকে মোকাবেলা করার জন্যেও হিরালির মতোই 'ওঝা' হচ্ছে কৃষকের ভরসা। বসন্ত রোগের মহামারীতে যখন গাঁয়ের পর গাঁ উজাড় হতে থাকে তখনো কৃষক আশ্রয় নেয় 'কবিরাজ'-এর। ওঝা, কবিরাজ, হিরালি—যাদুবিশ্বাসমূলক নানা তুকতাকই এদের সকলের হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়েই কৃষক চায় সকল প্রাকৃতিক অদৃষ্টের মার ঠেকাতে। 'সাপান্ত শিলান্ত বসন্ত'—এ রকম তিনটি শব্দ পাড়া গাঁয়ের লোক আজও ব্যবহার করে। মন্ত্রশক্তি ছাড়া সাপ শিলা ও বসন্তের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই, কৃষক সমাজের এমনই লোকবিশ্বাস। ওঝা-হিরালি-কবিরাজের হাতে প্রতারিত হয়েও কৃষক ওদের ওপর বিশ্বাস হারাতে ভরসা পায় না।

তাই বলে এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই যে, বাস্তব বা বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকারের পথ দেখালেও কৃষক সে-পথ ধরে না-হেঁটে অদৃষ্ট-নির্ভর হয়ে যাদুবিশ্বাসের পথই আঁকড়ে ধরে থাকবে। শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধের পথ বিজ্ঞান আজও দেখাতে পারেনি। তবে যেখানে ডিজেল চালিত পাওয়ার পাম্প পৌঁছে গেছে সেখানকার কৃষকরা বৃষ্টি নির্ভরতা কিংবা মান্ধাতা আমলের সেচ পদ্ধতি ব্যবহারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে, কোথাও কোথাও কৃষক শিলাবৃষ্টির মওসুম এড়িয়ে ক্ষেতে ধান চাষের অন্য সময় বেছে নিয়েছে, এবং এভাবেই অদৃষ্টের একটি মার জয় করতে পেরেছে। খুবই ধীর গতিতে হলেও আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবদানগুলো গ্রামেও তো পৌঁছেছে কিছু কিছু। সে সবের সুফল তারা ভোগ করছে। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ মিললে কৃষক তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। অদৃষ্টের মারের মোকাবেলা করার জন্যে যাদু বিশ্বাসের চেয়ে বিজ্ঞানের শক্তি যে বেশি, এ কথা সে বোঝে।

কিন্তু এসব তো হচ্ছে প্রাকৃতিক অদৃষ্ট। কৃষকের কাছে সামাজিক অদৃষ্টগুলো আসে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ রূপ ধরে। দেশে বড়ো ধরনের দুর্ভিক্ষ হয় কোনো কোনো বছর। সে সময় পত্রপত্রিকায় তা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। সরকার পক্ষ বলে, দেশে প্রচুর খাদ্য মজুত আছে, কোনো লোককে না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না। সরকার-বিরোধীরা যখন অনাহারে মৃত মানুষদের নাম-ধাম প্রকাশ করে তখন সরকার জানায়, ওরা না খেয়ে মরেনি, মরেছে পেটের পীড়ায়। দুর্ভিক্ষকে নিয়ে চলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের এ রকম 'চাপান-উতোর'। দুর্ভিক্ষকে পুঁজি করে অনেকেই অনেক রকম ফায়দা তুলে নেয়।

তবে এ রকম ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ছাড়া প্রতি বছরই গরিব কৃষকরা অপরিহার্য রূপে যে মওশুমি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সেটিকে নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ফসল ওঠার আগে আগে (ভাটি এলাকায় যেটি হয় সাধারণত চৈত্র মাসের মাঝামাঝিতে) গরিব কৃষক বরাবরই অনাহারের মুখোমুখি হয়। তখন ধনী কৃষকের কাছে তাকে হাত পাততে হয়। ধনী কৃষকের দয়ার শরীর। দয়া করে গরিবের বাঁচার জন্যে তিনি ধান ধার দেন। এর জন্যে কোনো সুদ তিনি দাবি করেন না। বিশেষ করে পরহেজগার মুসলমান ধনিক যিনি, তিনি তো জানেন, সুদ খাওয়া হারাম। ওই হারাম খেয়ে তিনি কি তার পরকালটা নষ্ট করতে পারেন? তবে আল্লাহ্ তার জন্য সুদ হারাম করলেও তেজারতি হালাল করে দিয়েছেন। ওই হালাল তেজারতিই তিনি করেন। তার তেজারতির পদ্ধতিটা অবশ্য অন্যরকম।

চৈত্র মাসের অভাবের সময় ধানের দাম খুবই বেড়ে যায়। নগদ টাকা দিয়ে গরিব কৃষক তো আর সেই ধান কিনতে পারে না। পারলে আর সে গরিব হবে কেন? কিন্তু আল্লাহ্ যাকে দৌলত দিয়েছেন, সেই দৌলতের বদৌলতে যার নামের শেষে তালুকদার বা চৌধুরী বা ভূইঞার মতো কৌলিক উপাধি যুক্ত হয়েছে, ইতিমধ্যে যিনি হজব্রতও সমাপন করে এসে 'হাজি সাব' হয়েছেন, তিনি তো আর চোখের সামনে তাঁর পাশের বাড়ির মানুষটিকে না খেয়ে বৌ-বাচ্চা নিয়ে মরে যেতে দিতে পারেন না। আগেকার দিনের চশমখোর হিন্দু মহাজনরা উঁচু সুদে টাকা ধার দিয়ে ওদের সর্বস্বান্ত করে রেখে গেছে। এখন হাজি সাব শুধু ওর কাছে উপযুক্ত মূল্যে ধান বিক্রি করেন মাত্র, সুদের কারবার করেন না। এখন এই চৈত্রমাসে যে পরিমাণ ধানের দাম এক শো টাকা, সেই পরিমাণ ধানই তিনি বাকিতে ওকে দিয়ে দেন। এক/দেড় মাস পরে ওর ঘরে ধান উঠলে টাকাটা তাকে শোধ করে দেবে। অভাবের সময়টায় খেয়ে তো বাঁচুক বেচারা।

কৃষকের ঘরে ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হাজিসাব নৌকা নিয়ে হাজির হবেন। কারণ গরিবের সংসারে অভাবের তো শেষ নেই। যে কয় মুঠো ধান সে পেয়েছে সেটুকু খরচ করে ফেলতে ক'দিনই বা লাগবে। তাই তাড়াতাড়িই তিনি তার প্রাপ্য আদায় করে নিতে চান। খাতক কৃষক আর নগদ টাকা দেবে কোত্থেকে? ধান দিয়েই তাকে ধানের ধার শোধ করতে হবে। তখন একশো টাকা দাম ধরে যে পরিমাণ ধান সে নিয়েছিলো এখন সেই টাকায় ধান বিক্রি হয় আগের পরিমাণের প্রায় তিনগুণ। সেই তিন গুণ ধানই হাজি-মহাজনের নৌকায় সে তুলে দেয়। সেই কৃষকের যদি রবি ঠাকুরের কবিতা জানা থাকতো তাহলে সে মহাজনের ধানে ভরা নৌকার দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করতো—

এতকাল নদী কূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

রবি ঠাকুরের কবিতা সে না-ই জানুক, এটা সে জানে যে, পরের চৈত্র মাসেও এই তালুকদার বা চৌধুরী বা ভূইঞার কাছে যেতে হবে, একই কড়ারে ধান আনতে হবে, এবং একই রকমে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে, তার হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে ফলানো ধান ওই তালুকদার বা চৌধুরী বা ভূইঞার নৌকায় তুলে দিতে হবে।

প্রতিবছর কৃষকের আপন চোখে দৃষ্ট এই বিষয়টিকেও সে তার 'অদৃষ্ট' বলেই মনে করে, মনুষ্য-সৃষ্ট সকল দুর্ভোগের জন্যেও সে তার দুর্ভাগ্যকেই দায়ী করে। তবে অদৃষ্ট বা দুর্ভাগ্যকে

দায়ী করেই হাত-পা ছেড়ে সে বসে থাকতে পারে না। নিজের ও পরিবার পরিজনের সকলের 'পেট' নামক বৃহৎ গর্তটি ভরানোর জন্যেই উদয়াস্ত তাকে গতর খাটিয়ে যেতে হয়। তবু এই পেট ভরানো যায় না সেটি কেবলই শূন্য হয়ে যায়। যতোই সে অদৃষ্টের দোহাই দিক, 'দৃষ্ট' পেটের নির্দেশ না মেনে তার উপায়ান্তর নেই। এই পেটই তাকে দিনরাত বোঁ বোঁ করে ঘুরায়। এই পেটই তার হাতকে দিয়ে লাঙলের মুঠি ধরায়, দাঁড়-বৈঠা ধরে নৌকা বাওয়ায়, মাছ ধরার জন্যে খালে-বিলে জাল ফেলায়। আবার কাজের সব সুযোগ হারিয়ে তার কাজের হাত কখনো কখনো হয়ে যায় ভিক্ষার হাত। কখনো কখনো কেউ কেউ ওই হাত দিয়েই চুরি করার জন্যে সিঁদ কাটা ধরে। সবই ওই পোড়া পেটের কারণে।

'পোড়া পেট' কথাটা ভদ্রলোকের ভাষার। নেত্রকোনার ভাটি এলাকায় বলে 'মাইল্যা পেট'। 'মাইল্যা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমার জানা নেই। তবে ব্যবহারিক অর্থে অবাঞ্ছিত সব কিছুকেই বলে মাইল্যা। পেট ভরানোর দায় নিতান্ত কঠিন বলেই কৃষকের কাছে সেই পেট হয়ে গেছে একান্ত অপরিহার্য অথচ অবাঞ্ছিত, তাই তার নাম দিয়েছে 'মাইল্যা পেট'। কৃষক রমণীদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ বাক্য 'বাপ মরে মা মরে, মাইল্যা পেডে (পেটে) হাক করে (হা-করে)।' অর্থাৎ পেটের চাহিদা এমনই যে তা সন্তানের পিতৃ-মাতৃ শোকও ভুলিয়ে দেয়।

বালালি গ্রামে এক পল্লী কবির দেখা পেয়েছিলাম যিনি পেট নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন। কবির নাম রুকনউদ্দিন মুন্সী। ভাটি এলাকার গ্রাম্য ভাষায় লেখা তার 'পেটের কবিতা'র কয়েকটি ছত্র এরকম—

হায় পেট, হায় পেট, হায় মাইল্যা পেট,
তোর লাগি আর কতো করবাম ক্যাট ক্যাট।
বুঝ দিবার জিনিস নয়, বুঝ দিবাম কারে?
ক্ষিধা লাগলে দারণ পেট বাঘের চিৎকার মারে।

বাঘের মতো চিৎকার দিয়ে যে পেট ক্ষুধার কথা জানিয়ে দিয়ে যায়, সেই 'মাইল্যা পেটে'র অধিকারী কৃষকদের কাছে ক্ষুধাও তো অদৃষ্টেরই আরেক মার। এই মারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ খুঁজতে কৃষক কতোবার কতো রাজনীতিকের কাছে ছুটে গেছে। হক সাহেবের মুখে 'ডালভাতে'র কথা শুনে তাকে বিশ্বাস করেছে। আবার, এই পেটের ক্ষুধার সুরাহা হবে শুনেই পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়েছে। পাকিস্তানেও কেটে গেছে চব্বিশটি বছর, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় এখনো তার 'দারুণ পেট বাঘের চিৎকার মারে।'

তবে গাঁয়ের অন্যান্য কৃষকদের মতোই 'পেটের কবিতা'র কবি রুকনউদ্দিন মুন্সীকে দেখলাম দারুণ আশাবাদী। তিনি 'মুন্সী' মানুষ। মৌলানা বা মৌলবি বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা যাঁদের নেই, অথচ যাঁরা এমন ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী যার সাহায্যে গাঁয়ের লোকের আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কাজে সহায়তা করতে পারেন, গ্রামে তাঁরাই সাধারণত 'মুন্সী সাব' বলে পরিচিত হন। রুকন উদ্দিন ছিলেন এ রকমই একজন মুন্সী সাব, কিন্তু লক্ষ করলাম, 'মুন্সী'র চেয়ে তার কবিসত্তাটিই প্রবল। সেই কবিসত্তাটিই অন্যান্য মুন্সী-মোল্লা-মৌলবির বিপরীত অবস্থানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তিনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে 'জয়বাংলা'র সমর্থন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 'মাইল্যা পেটে'র জন্যে আর 'ক্যাট ক্যাট' করতে হবে না, তার চোখে-মুখে এমন আশাবাদের ঝিলিক।

স্বজাতি-বিরোধী কুকুর ও পাকিস্তানের দালাল

রুকন উদ্দিন মুন্সী স্কুল-কলেজে পড়েননি। মক্তব-মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন, কিন্তু মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সনদ নিয়ে আসতে পারেননি বলে মৌলবি বা মৌলানা হওয়ার সুযোগও তিনি পাননি। তবু, মুন্সী সাব নামে পরিচিত হয়েও, নিজের যোগ্যতা ও একান্ত আন্তরিকতার বলেই ধর্মপ্রাণ সাধারণ গ্রাম্যজনের শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেছিলেন। তার সঙ্গে মাত্র কয়েকদিন আলাপ করেই বুঝেছিলাম যে অন্য অনেক মোল্লা-মৌলবির সঙ্গে তাঁর চিন্তার তফাৎ আছে। শুধু তফাৎ নয়, রীতিমতো বৈপরীত্য। নিজে তিনি কবিপ্রাণ ছিলেন, গ্রাম্য বাউল কবিদের প্রভাবও তার ওপর বেশ সক্রিয় ছিলো। তাঁর কথাবার্তায় যথেষ্ট শ্লেষের পরিচয় পাওয়া যেতো। শ্লেষ বর্ষণ করতেন তিনি ধর্মধ্বজী ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা-মৌলবিদের প্রতি, ভালো মানুষের মুখোশধারী টাউট বাটপারদের প্রতি।

একদিন খুব উত্তেজিত হয়ে এসে আমাকে বললেন, 'শুনেছেন, অমুক জায়গার অমুক তো এসডিও আর অমুক এসপি হয়ে গেছে।'

তার প্রথম অমুক জায়গাটি সে সময়কার একটি মহকুমা শহর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অমুক ব্যক্তিদ্বয় দু'জন মশহুর আলেম। তারা ওই শহরের শান্তি কমিটির পদস্থ কর্মকর্তা হয়েছিলেন—সে-খবরটি ঘিরেই মুন্সী সাহেব তাদেরকে ব্যঙ্গ করেছিলেন 'এসডিও' এবং 'এসপি' আখ্যা দিয়ে।

আমি বললাম, 'সে তো খুব ভালো কথা। এরা তো আপনাদেরই লোক। ধার্মিক মানুষেরা এ রকম উচ্চপদ পেয়েছেন, সে জন্যে আপনার তো খুশি হওয়ারই কথা।'

—'হু, খুশি হওয়ার কথা! ধার্মিক মানুষ! ...কুকুর মানুষের এতো উপকার করে, তবু কুকুরের ছোঁয়া লাগলে অজু নষ্ট হয়ে যায় কেন বলতে পারেন?'

'তা আমি কি করে বলবো? এর জবাব তো আপনিই ভালো জানেন।'

'তা হলে শুনুন। কুকুর মানুষের উপকার করে ঠিকই, কিন্তু তার স্বজাতিকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। পরজাতি মানুষের জন্যে কুকুর জান দেয়, কিন্তু স্বজাতির কাউকে দেখলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কামড়াকামড়ি করে। কুকুর তার স্বজাতিকে অর্থাৎ অন্য কুকুরকে ভালোবাসে—এ রকম আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না। স্বজাতিকে এমন হিংসা করে বলেই কুকুর প্রাণীটা একেবারে না-পাক।'

একটু থেমে আবার সেই মহকুমা শহরের শান্তি কমিটির চাঁইদের কথা তুললেন রুকনউদ্দিন মুন্সী। বললেন, 'ওরাও ওই কুকুরের মতো। ওরা পরজাতি পাকিস্তানিদের জন্যে জান কোরবান করতে নেমেছে স্বজাতি বাঙালিদের সর্বনাশ করে। ওরাও না-পাক। যতো বড়ো আলেমই হোক এরা, এদের পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তা কবুল হবে না কিছুতেই।'

বড়োলোকদের কুকুর প্রীতি দেখলেই আমার রুকনউদ্দিন মুন্সীর কথাগুলো মনে পড়ে যায়। কুকুরের প্রতি ওদের ভালোবাসার মূলে কি আছে নিজেদেরই স্বজাতি-বিদ্বেষ ও পরজাতির প্রতি ভক্তির আতিশয্য? কুকুরের চরিত্রই কি ওদের আদর্শ? শাসক শ্রেণীর মানুষগুলো কি কুকুরের প্রতি যত্নের অতিরেক দেখিয়ে শাসিতদের সামনে কুকুরকেই আদর্শস্থানীয় করে তুলে ধরতে চায়?

আসলে এ প্রশ্নগুলো এ রকম করে আমার মনে কোনোদিনই জাগেনি। রুকনউদ্দিন মুন্সী সাহেবের কথাগুলো শুনেই আমার ভেতর প্রশ্নগুলোর উদয় ঘটেছিলো এবং সেগুলোর সন্তোষজনক উত্তরও পেয়ে গিয়েছিলাম। ঠিকই তো। কৃতজ্ঞতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে কুকুরের মতো আর কেউই উপস্থিত করতে পারেনি। অকৃতজ্ঞতা কিংবা অকৃতজ্ঞ আমাদের সকলের কাছেই নিন্দনীয় এবং সকৃতজ্ঞকে আমরা প্রশংসার চোখেই দেখি। কিন্তু তাই বলে, আমরা কি কখনো কৃতজ্ঞতার প্রতীক রূপে কুকুরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হই, কিংবা কাউকে কুকুরের মতো হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করি? কৃতজ্ঞতার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে লোকটি তাঁকেও যদি 'একজন কুকুরের মতো মানুষ' বলে আখ্যা দিই তবে সে আখ্যাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, না উল্টোটা হবেন?

গালি দেয়া বা নিন্দামন্দ করা ছাড়া কোনো মানুষের সঙ্গে কুকুরের তুলনা আমরা কখনই করতে পারি না। অথচ, মানুষকে 'বাঘের বাচ্চা' কিংবা 'সিংহ পুরুষ' বলে আমরা প্রশংসা করি। বাঘ বা সিংহ তো হিংস্র পশু, ওরা অন্য প্রাণী বা মানুষের প্রতি কখনো সদাচরণ করে না, কৃতজ্ঞতার প্রকাশও ঘটায় না। তবু, ওদের সঙ্গে তুলনা করে মানুষ নিজেকে সম্মানিত, আর কুকুরের মতো উপকারী পশুর সঙ্গে তুলনায় অপমানিত বোধ করে কেন?

রুকনউদ্দিনের মতো একজন স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের কাছে এ রকম সব প্রশ্নেরই একটি মাত্র উত্তর। অর্থাৎ পরম উপকারী ও গুণান্বিত হয়েও কুকুর ঘৃণ্য, কারণ সে স্বজাতিদ্রোহী। একাত্তরের বাংলাদেশে পাকিস্তানের দালালরাও সে-রকম ঘৃণ্যই হয়েছিলো, কারণ তারাও ছিলো সে-রকমই স্বজাতিদ্রোহী। এইসব দালালদেরও অনেকেরই অনেক গুণ ছিলো নিশ্চয়, তাদের মধ্যে অনেক আলেম বা বিদ্বানও ছিলো। তবু ঘৃণা ছাড়া এদের আর কিছুই প্রাপ্য হতে পারে না।

ঘৃণার এ-রকম প্রখর অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন যে মানুষটি সে মানুষটির অ্যাকাডেমিক শিক্ষার সঞ্চয় যতো কমই থাকুক, তিনি ছিলেন লোকসাধারণ ও লৌকিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে সংশ্লিষ্ট। সে জন্যেই এমন সরল, সবল ও সঠিক লৌকিক ঘৃণাকে তিনি অন্তরে ধারণ করতে পেরেছিলেন। আর যারা তথাকথিত উচ্চশিক্ষা পেয়ে লোকসাধারণের ও লৌকিক চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো তাদের অনেকেই এ-রকম ঘৃণাবোধও হারিয়ে ফেলেছিলো। তারাই অনায়াসে পাকিস্তানি হানাদারদের যোগসাজশে স্বজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো, তথাকথিত শান্তি কমিটির নেতা হয়েছিলো, আলবদর হয়েছিলো, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের ভয় দেখিয়ে বা অর্থলোভে প্রলুব্ধ করে রাজাকার বানিয়েছিলো।

স্বজাতিদ্রোহী অবস্থান নিয়েছিলো কি কেবল মক্তব-মাদ্রাসায় আরবি পড়া মানুষরাই? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি পড়া মানুষেরা নয় কি?

মক্তব-মাদ্রাসা আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় দু'রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই স্বদেশ-স্বজাতি-স্বসমাজ-বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ স্বার্থপর কিছু মানুষ তৈরি করে। তাই দু'রকম প্রতিষ্ঠান থেকেই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী পাকিস্তানি দালালরা বেরিয়ে আসে। এ-রকম দালাল বরং আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই বেশি তৈরি করেছে। আলবদর বাহিনীর অধিকাংশ ছেলেই তো ছিলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। এদের ভেতরও বিজ্ঞানের ছাত্রদের সংখ্যাটি ছিলো উল্লেখযোগ্য। তা হলে, প্রাচীন পন্থার ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষিতদের পার্থক্যটা থাকলো কোথায়?

আধুনিক শিক্ষিতদের কেউ কেউ যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলো, তেমনি এদেরই কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। আবার মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলানাদের সকলেই যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, এমনও নয়। রুকনউদ্দিনের মতো স্বল্পশিক্ষিত মুন্সী সাবই নন শুধু, সংখ্যায় কম হলেও, উঁচু দরের কিছু আলেম বা মৌলানাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন। কোনো কোনো মৌলানা দৃশ্যত হানাদার বাহিনীর পক্ষ সমর্থন করলেও কার্যত তাদের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন। এ-রকমই একজন মৌলানার কথা একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারছি না। তিনি মৌলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী।

গফরগাঁওয়ের পাঁচবাগের অধিবাসী বলেই মৌলানা পাঁচবাগী নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ভারতের রামপুর এস্টেট মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এই মৌলানা আরবি ফারসি উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলা ভাষাতেও ছিলেন পারদর্শী। গ্রামের লোকজন মনে করতো যে মৌলানা পাঁচবাগী অলৌকিক শক্তির অধিকারী, অলৌকিক শক্তি-বলেই তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। তাই তারা মুশকিল আসানের জন্যে তাঁর কাছে ছুটে যেতো, তাঁর দোয়া চাইতো, তাঁর কাছ থেকে তাবিজ-কবচ চেয়ে আনতো। অলৌকিক শক্তি তাঁর সত্যিসত্যিই ছিলো কি-না সে বিষয়ে আমরা সঙ্গতভাবেই সন্দেহ পোষণ করতে পারি। কিন্তু মানুষের লৌকিক সমস্যা সমাধানের জন্যে লৌকিক পদ্ধতিতেই যে তিনি সারা জীবন প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সে-ব্যাপারে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই। জমিদার মহাজনদের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করেও তিনি তাদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন, শোষিত কৃষক প্রজার অধিকার আদায় করতে গিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, সরকারি স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কারাবাসও করেছেন। ইংরেজ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত সারা জীবনই তাকে এ-সব করতে হয়েছে। ছেচল্লিশ সনে মুসলিম লীগের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ইমারত পার্টি'। সেই পার্টির প্রার্থীরূপে ইলেকশানে দাঁড়িয়ে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে দেন। ছেচল্লিশে মুসলিম লীগ-বিরোধী প্রার্থীর এ-রকম বিজয় ছিলো অচিন্তনীয়। সাতচল্লিশের পরও তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। পাকিস্তানকে প্রকাশ্যেই তিনি বলতেন 'ফাঁকিস্তান'। গ্রামের বাড়িতেই তিনি একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখান থেকে অজস্র পাকিস্তান-বিরোধী লিফলেট ছেপে বিলি করতেন। মুক্ত বাংলার দাবিতে লিফলেট ছেপে প্রচার করেছিলেন বলে পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করে দীর্ঘ দিন জেলে আটকে রেখেছিলো। এরপর আট বছর তাকে ময়মনসিংহ শহরে নজরবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছিলো। নজরবন্দি অবস্থায় থেকেও তিনি ভাষা-আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেন, হাজার হাজার প্রচারপত্র ও ইশ্‌তেহার বিলি করেন। পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের এবং উনসত্তরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদেও তিনি প্রচুর লিফলেট ছাড়েন।

এহেন পাকিস্তান-বিরোধী মৌলানা একাত্তরে গফরগাঁয়ে 'শান্তি কমিটি'র আহ্বায়ক বা চেয়ারম্যান হয়েছেন, এ খবরটি শুনে প্রথম আমি দুঃখই পেয়েছিলাম। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, এটি ছিলো তার একটি কৌশলগত অবস্থান। কৌশলগত অবস্থানের কথা বলে অনেক রাজনীতিকও অনেক সময় নানান স্ববিরোধী ও সুবিধাবাদী আচরণ করে থাকেন। নিজেদের সুবিধাবাদী চরিত্রকে আড়াল করার জন্যেই তারা কৌশলের কথা বলেন। মৌলানা পাঁচবাগীর অবস্থানে এ-রকম কোনো সুবিধাবাদ ছিলো না, ব্যক্তিগত মতলব হাসিলের কোনো প্রয়াস

ছিলো না। তিনি বরং কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে হানাদার পাকিস্তানিদের অনেক মতলব ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকে মিলিটারি ও পাক দালালদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মতলববাজ দালালরা মৌলানা পাঁচবাগীকে ডিঙিয়ে নিজেদের মতলব হাসিলের কোনো সুযোগ করে নিতে পারেনি। মৌলানা পাঁচবাগী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন কি-না জানি না। কিন্তু বাড়ির জোয়ান ছেলেটি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে এই অপরাধে সেই বাড়ির অন্য মানুষদের অত্যাচারিত হতে দেননি। তার এলাকার শান্তি রক্ষায় তিনি যথার্থ সহায়তা করেছেন। অন্য এলাকার 'শান্তি কমিটি' গুলোর মতো অশান্তির সৃষ্টি করেননি।

তার কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছে হিন্দুরা। সে এলাকার হিন্দুদের খুব কম লোকই দেশত্যাগ করতে পেরেছিলো। পাক মিলিটারিদের হিংস্র থাবার আওতায় তারা পড়ে গিয়েছিলো। সেই থাবা থেকে মৌলানা পাঁচবাগীই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের একেকটি মুসলমান নামকরণ করে সেই নামেই 'শান্তি কমিটি'র পক্ষ থেকে আইডেনটি কার্ড ইস্যু করে দিয়েছিলেন। অথচ একজন হিন্দুকেও তিনি ধর্মান্তিরিত করেননি। বরং মুসলমান নামধারী সেই হিন্দুরা যাতে বাড়িতে তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করে, আপন আপন বিশ্বাস ও অভ্যাস মতো পূজা অর্চনা করে, সে বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন। স্বাধীনতার পরে গফরগাঁয়ের বেশ কিছু হিন্দুর মুখে এ-সব কথা আমি শুনেছি। মৌলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একান্ত শ্রদ্ধা ও আবেগের প্রকাশ লক্ষ করেছি। তারা মৌলানার উদ্দেশে বারবার যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়েছে।

পাকিস্তানি হানাদারদের তথাকথিত 'শান্তি কমিটি'তে যোগ দিয়েছেন যে মৌলানা, তাঁকে কি নামে আখ্যায়িত করবো? পাকিস্তানের দালাল? রুকনউদ্দিন মুন্সী যাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন সেই 'আলেম'দের সঙ্গে এক কাতারে ফেলবো কি মৌলানা পাঁচবাগীকেও?

মুক্তাঞ্চলের মুক্ত মানুষ ও গণ-আত্মশাসন

রুকন উদ্দিন মুন্সী কথিত স্বজাতি-বিরোধী কুকুর বাংলাদেশের সব এলাকাতেই দু'চারটি করে ছিলো নিশ্চয়। কিন্তু সব জায়গায় ওরা ওদের স্বজাতিদ্রোহী চরিত্রের প্রকাশ ঘটাতে পারেনি, ঘটানোর সুযোগ পায়নি। সুযোগ পেয়েছে সেখানেই যেখানে ওরা পাক মিলিটারিদের সহজে নিয়ে যেতে পেরেছে। যেখানে তা পারেনি সেখানে ওরা বকধার্মিক বা বিড়াল তপস্বীর মতো আচরণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জনগণের সঙ্গে মিনমিন করে তাদের মনরাখা কথা বলেছে, আর নিজেদের সমমনা লোকদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে অন্তর্জ্বালা শান্ত করতে চেয়েছে। ভাটি এলাকার এরকম বহু লোকের কথা আমি গাঁয়ের কৃষকদের মুখেই শুনেছি। ও-রকম লোকদের ওপর গাঁয়ের মানুষ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে, প্রকাশ্যে ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি।

মদন থানায় আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের আগে পাক মিলিটারিরা যেতে পারেনি বলে ওখানে কোনো দালালের উপদ্রব হয়নি, রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এমন লোকেরও দেখা পাওয়া যায়নি। অন্তত আমি যে গ্রামে ছিলাম সেই বালালি বা আশপাশের গ্রামে কোনো

দালাল-রাজাকারের দেখা পাইনি। মদনের পুব দিকের থানা খালিয়াজুড়ি ছিলো হানাদার বাহিনীর জন্য একান্তই দুর্গম এলাকা। তাই দালালদের তালিকায় যুক্ত করার মতো একটি লোকও সেখানে ছিলো না। অথচ মদনেরই অন্য পাশের থানা আটপাড়ার তেলিগাতিতে জনৈক 'হাফিজ সাহেব' মিলিটারিদের ডেকে এনে গ্রামে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। নেত্রকোনা থেকে সড়কপথে মিলিটারিরা জিপ নিয়ে তেলিগাতিতে সহজে যেতে পারতো বলেই ওই হাফিজ ওদের দালালি করার সহজ সুযোগ পেয়ে গেছে। বিশেষ অত্যাচার চালিয়েছে, স্বভাবতই, আওয়ামী লিগার ও হিন্দুদের বাড়িতে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ—সবই করেছে। আমি যে জায়গায় ছিলাম সেটিকে বলা যেতে পারে 'মুক্ত এলাকা'। অন্তত আগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সেটি মুক্ত এলাকাই ছিলো। শুধু মুক্ত এলাকা বলাই যথেষ্ট নয়। আমার তো মনে হয়েছিলো, আমি যেন রাষ্ট্রহীন এক সমাজে বাস করছি। কারণ তখন সেখানে থানা-পুলিশ ছিলো না। দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত, জজ ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল-মোক্তার কিছুই ছিলো না। অথচ, এসব ছিলো না বলে জনগণের একটুও অসুবিধা হয়নি। এমন হয়নি যে মানুষ মানুষের মাথা খেয়েছে, অবাধে লুটপাট করেছে, সব ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে অমানুষ হয়ে গেছে। হয়েছে বরং তার উল্টোটা। রাষ্ট্রীয় আইন সেখানে মানবিক ন্যায়কে শাসন করতে পারেনি বলে সত্যিকার ন্যায়েরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আইনের ফাঁক গলিয়ে কোনো অন্যায়কারী রেহাই পেয়ে যায়নি।

থানা-পুলিশ, উকিল-মোক্তার, মামলা-মোকদ্দমা তথা রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার-প্রণালী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। চোর-ডাকাতের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়েও মানুষ সহজে থানায় যেতে চায় না। পুলিশের সংশ্রব এড়িয়ে চলতেই সকলে পছন্দ করে। 'বাঘে ছুলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুলে ছত্রিশ ঘা'—এ-রকম প্রবাদবাক্য মানুষের পুঞ্জীভূত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরি হয়েছে। থানার পুলিশের চেয়ে থানার টাউটরা আরো মারাত্মক। নিরীহ মানুষের শান্তিভঙ্গ করার জন্য প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে এ ধরনের টাউট। আরো আছে কিছু চিহ্নিত মামলাবাজ লোক। মামলা করাই যেন ওদের পেশা। ওরাই শহরের উকিল-মোক্তার-পেস্কারদের ভাত জোগায়। গ্রামের মানুষ ওদেরই কূটচক্রের প্যাঁচে পড়ে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে যায়। মামলা-মোকদ্দমা করে ন্যায়বিচার হয়তো পায়ও কখনো কখনো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবে কেবল হয়রানিই সার হয়। আর হয় টাকার শ্রাদ্ধ। টাকা ছাড়া কেউ উকিল-মোক্তারদের সেবা বা পরামর্শ পায় না, টাকা খরচ না করে কেউ মামলায় জিততে পারে না। অথচ, মতলববাজ লোকের প্ররোচনায় গাঁয়ের অনেক মানুষকেই মদগাঁজার নেশার মতো মামলা-মোকদ্দমার নেশায় পেয়ে বসে। মামলা করে অনেকে ফতুর হয়ে যায়। 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক'—এ যে কতো বড়ো অভিশাপ তা কেবল ভুক্তভোগীই টের পান। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্ত এলাকায় এই ভুক্তভোগীদের মধ্যে যেন অন্য এক রকম বোধের উদ্বোধন ঘটলো। এলাকায় যে সব চোর-ডাকাত দীর্ঘদিন ধরে উপদ্রব করে চলেছে, কেউ কেউ কিছুদিনের জন্য হাজতবাস বা কারাবাস করলেও থানা-পুলিশের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই যারা চুরি-ডাকাতির পেশা চালিয়ে গেছে, এখন থানা-পুলিশ-আদালতের অনুপস্থিতিতে গাঁয়ের মানুষ নিজেরাই তাদের বিচার করেছে। পরিচিত ও চিহ্নিত চোর বা ডাকাতটিকে তারা ধরে এনেছে, তার কৃতকর্মের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, এবং শেষে দায়ের কোপে বা অন্যভাবে তাকে হত্যা করেছে। এই বিচারের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আদালতের বিচারের মতো

লম্ব-লম্বা তারিখ পড়া, দুই পক্ষের উকিলের সওয়াল জবাব, দু'পক্ষেরই খোলাম কুচির মতো টাকা ছড়ানো—এ-রকম নানা কিছুর উপস্থিতিতে বিচারকে বিলম্বিত করার কোনো ব্যবস্থা সেখানে ছিলো না। এজাহার, জামিন, পেস্কার, উকিল, মক্কেল, হাকিম, কোর্ট ফি—এ-রকম কোনো শব্দের ব্যবহারই সেখানকার বিচারের বেলায় হয়নি। কিন্তু তাতে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়েছে, এমন কথা কেউই বলতে পারবে না। বরং সত্যিকার দোষী ব্যক্তিটিই সাজা পেয়েছে, রামের অপরাধে শ্যামের মাথা কাটা পড়েনি।

তবে ভুল যে মানুষের একটুও হয়নি তা নয়। পাকিস্তানি দালাল বা দুষ্ট লোক সন্দেহে, কিংবা নিতান্ত গোলেমালে পড়ে গিয়ে, দু'একজন ভালো মানুষও জনগণের হাতে নিগৃহীত ও নিহত হয়েছে বটে। কিন্তু এ-সব ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থাও জনগণই নিয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রতিশোধ-স্পৃহাও মুক্তিকামী ও শান্তিকামী জনগণের প্রচেষ্টাতেই সংযত থেকেছে। হাতে ক্ষমতা পেয়ে জনগণের দায়িত্ববোধ বেড়ে গেছে, তারা প্রজ্ঞার অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছে। ভাটির ওই মুক্তাঞ্চলে জনগণের দায়িত্ববোধ ও প্রজ্ঞার পরিচয়-জ্ঞাপক অসাধারণ একটি ঘটনা ঘটেছিলো জুনের শেষ সপ্তাহে। ওই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন আমার সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক আনোয়ারুল হাকিম খান। ওই ঘটনাটির সঙ্গে নিজেও তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। জনগণের প্রজ্ঞার সঙ্গে তাঁর নিজের প্রজ্ঞা মিশিয়ে ঘটনাটিকে একটা বাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। ওই এলাকারই কদমশ্রী গ্রামে আনোয়ারুল হাকিম খানের গ্রামের বাড়ি। শহর ছেড়ে এ সময়ে তিনি গ্রামের বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। এ সময়েই তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। প্রয়াত পিতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় চেহলাম অনুষ্ঠানের আয়োজনে যখন তিনি ব্যস্ত ঠিক তখনই ওই ঘটনাটি ঘটেছিলো।

শিবপাশা গ্রামের কুখ্যাত সুন্দরিয়া চোরের শ্বশুর বাড়ি ছিলো কদমশ্রী গ্রামে। এ সময়ে সে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এলে এ-গাঁয়ের লোক তাকে জামাই আদরে বরণ করেনি। বরং বহুদিন ধরে চৌর্যাপরাধ করেও রাজদণ্ড এড়িয়ে চলতে পেরেছিলো যে সুন্দরিয়া চোরা, এবার সে শ্বশুরের গাঁয়ে এসেই গণদণ্ডে নিহত হলো।

না, আমি যে ঘটনাটির কথা বলছি সেটি এই সুন্দরিয়া চোরার দণ্ডপ্রাপ্তির বিষয়ে নয়। সুন্দরিয়া চোরার এই পরিণতি সকলকে খুশিই করেছিলো। কিন্তু সকলের খুশিকে বিষাদে ও ভয়ে পরিণত করলো ওই চোরার সঙ্গে আর দু'জন নির্দোষ লোকের নিহত হওয়ার ঘটনাটি। এই দু'জনের একজন ছিলো একটি কিশোর। সে দেওসহিলা গ্রামের এক বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র। সে সময়ে সে ইস্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়তো। পিতৃহীন এই নিষ্পাপ বালকটির নির্মমভাবে নিহত হওয়ার খবর দেওসহিলা গ্রামে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামবাসীদের মধ্যে দেখা দিলো একান্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এ সব ক্ষেত্রে গ্রামীণ লোকসমাজের প্রতিক্রিয়া, আমরা আগেই দেখেছি, ব্যক্তির বদলে সমষ্টিকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। তাই ভিন গাঁ থেকে নৌকা বেয়ে দেওসহিলা গ্রামের পাশ দিয়ে ঘরে ফিরছিলো কদমশ্রীর যে চারজন লোক তারা বন্দী হয়ে গেলো দেওসহিলাবাসীদের হাতে। অন্য সময় হলে হয়তো 'খুনের বদলা খুন' হয়ে যেতো সঙ্গে সঙ্গেই, বন্দিদের একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতো না। তারপর দীর্ঘদিন ধরে চলতো থানা-পুলিশ, আইন-আদালত, মামলা-মোকদ্দমা, নিম্ন আদালতে সাজা ও উচ্চ আদালতে আপিলের ঘূর্ণিপাক ঘূর্ণন। কিন্তু এখন, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তাঞ্চলে, এসব কিছুর

বালাই নেই। তাই এখানে সামাজিক মানুষেরই দায়িত্ব-সচেতন হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এবং সত্যি সত্যিই সেই ক্ষেত্রটিতে সচেতনতার বীজ উপ্ত হয়ে যায়। সে কারণেই সম্ভবত, একটি আপোস ফর্মুলা উদ্ভাবনের লক্ষেই, দেওসহিলাবাসীরা কদমশ্রীর চার বন্দির দু'জনকে ছেড়ে দিলো, আর অন্য দু'জনকে আটকে রেখে দিলো। অর্ধেক সংখ্যক বন্দি মুক্তির তাৎপর্যটি কদমশ্রীবাসীদের কাছে মোটেই অস্পষ্ট রইলো না। বিশেষ করে অধ্যাপক আনোয়ারুল হাকিম খান বিষয়টি সঠিকভাবেই অনুধান করতে পারলেন। নিজে অগ্রণী হয়ে কয়েকজন লোক নিয়ে গেলেন দেওসহিলা গ্রামে। বলতে গেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই গেলেন। দেওসহিলার লোকেরা তাঁদের আতিথ্য যেমন দিলো, তেমনি তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেও ইতস্তত করলো না। বিধবা মায়ের ছেলেটির হত্যার প্রতিশোধ কদমশ্রীর কাউকে না কাউকে হত্যা করেই নিতে হবে—এমন উগ্র অভিমতের ধারকের সংখ্যাও সেখানে একেবারে কম ছিলো না। এ অভিমতকে কার্যকর করার শক্তিও তাদের ছিলো। তবু, একান্ত স্বস্তিকর ব্যাপারটি হলো যে, সেই শক্তিপ্রয়োগ থেকে গ্রামবাসী বিরত রইলো। গুরুত্ব আরোপ করলো আসল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটির—অর্থাৎ সেই বিধবা মায়ের-বিবেচনার ওপর। সেই মা বললেন, 'আমার বুক খালি করে ছেলে আমার চলে গেছে, এখন আরেক জনকে খুন করলে তো আরেক মায়ের বুক খালি হবে। তাতে কি আমার শূন্য বুক ভরে উঠবে?...তবে কেন এমনটি করা? পুত্রশোকের যে জ্বালা আমি বহন করছি সে জ্বালা আর কাউকে দগ্ধ করুক, তেমনটি আমি চাই না, তেমনটি যেন না হয়।'

নিরক্ষর হতভাগিনী গ্রাম্য মায়ের ভাষাটি নিশ্চয়ই এ-রকম পালিশ করা ছিলো না। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম এ-রকমই। সেই মায়ের কথা বলতে গিয়ে, সিকি শতাব্দী পরও, অধ্যাপক আনোয়ারুল হাকিম খান আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন। মাতৃহৃদয়ের সেই অনুভূতি সেদিন গ্রামের সকল মানুষের মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিলো। শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে—এমন একটি কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে ভাটি অঞ্চলের দেওসহিলা, কদমশ্রী ও আশপাশের গ্রামের কৃষক জনতাকে শোক শুধু শক্তিই দেয়নি, তাদের ভেতর প্রকৃত মনুষ্যত্বেরও জাগরণ ঘটিয়েছিলো। সেদিনের গণবিচারের রায়েও সেই মনুষ্যত্বের স্পর্শ লেগেছিলো। সেই রায়ে কোনো দণ্ড ঘোষিত হয়নি, কিন্তু সকলে আত্মসমালোচনা ও অনুতাপের আত্মদণ্ড গ্রহণ করেছিলো একান্ত স্বেচ্ছায়। কদমশ্রী গ্রামের অপরাধী মানুষদের কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায় করা হয়েছিলো পুত্রহারা মায়ের সাহায্যের জন্যই। প্রচলিত আদালতের অর্থদণ্ডের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে না। অনুতাপের আগুনে পুড়ে সকলে, অন্তত তখনকার মতো, খাঁটি মানুষে পরিণত হয়েছিলো।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মুক্তাঞ্চলে ওইসব গণবিচারের কথা স্মরণ করে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগে : সাম্যবাদী তাত্ত্বিকরা যে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রহীন সমাজে 'সাম্যবাদী গণ আত্মশাসন' (Communist Public Self Administration) প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, বাস্তবে তার প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্তভাবেই সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, এমনটি হতেই হবে। এ রকম হওয়া ছাড়া মনুষ্যত্বের মুক্তি ঘটবে না, মানুষ প্রকৃত স্বাধীন হবে না। চারদিকে পাকিস্তানি বর্বরতা তথা শ্রেণী শোষণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থেকেও মুক্তাঞ্চলের বাঙালি নিতান্ত স্বল্পদিনের জন্যে হলেও যে স্বাধীনতা ভোগ করেছিলো এবং রাষ্ট্রশাসন-মুক্ত স্বাধীনতার যে চমকপ্রদ প্রকাশ ঘটিয়েছিলো, সেই সব দেখে শুনেই আমার মনে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রহীন সমাজ

ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যয়টি দৃঢ়মূল হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ উল্টোপথে যাত্রা করতে দেখেও, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অচিন্তনীয় বিপর্যয় অবলোকন করেও, সারা পৃথিবী জুড়ে বাজার অর্থনীতির ঢক্কা নিনাদে কানে তালা লাগার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও, আমার সেই প্রত্যয়ে একটুও চিড় ধরেনি। গোপ্পদে আকাশ দর্শনের মতো মুক্তাঞ্চলে 'গণ-আত্মশাসনে'র যে অতি ক্ষুদ্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেটিই অনেক বড়ো পরিসরে ভবিষ্যতের মানুষ অর্জন করবে না, এ রকম ভাবলে মানুষের প্রতিই বিশ্বাস হারানো হয়। আর 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই মহাবাণীকে অবিশ্বাস করি কী করে?

নিরাপত্তার সন্ধানে দেশত্যাগ

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে উপদ্রুত বাঙালির মনোবলকে চাঙা করে রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা ছিলো 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র। বিশেষ করে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটির। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ধরে প্রচারিত হতো না। 'চরমপত্র' প্রচারেরও নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিলো না। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আমরা রেডিওর পাশেই বসে থাকতাম। 'আকাশবাণী', 'বিবিসি' বা 'ভয়েস অব আমেরিকা'র প্রতি আকর্ষণ অবশ্যই ছিলো। কিন্তু কোনমতেই চরমপত্র শোনা থেকে যাতে বঞ্চিত না হই সেদিকে থাকতো আমাদের সতর্ক দৃষ্টি। তাই একটু পরপর রেডিওর 'নব' ঘুরিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে চলে আসতাম। আর যখন কানে ভেসে আসতো 'বিচ্ছুর লাহান পোলাপানগুলার গাবুইর‍্যা মাইরো'র কথা, 'পাকিস্তানি মিলিটারির ভুমা ভুমা মুছুয়াগুলা'র 'ছ্যারাবেরা' অবস্থার কথা, তখন সাক্ষর-নিরক্ষর ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই নড়েচড়ে বসতো। মুহূর্তকাল আগেও যার মধ্যে ছিলো বিমর্ষতা আর হতাশা, চরমপত্রের যাদুমন্ত্র এক মুহূর্তেই তার মধ্যে খুশির জোয়ার বইয়ে দিতো, হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে দিতো। মানুষের মনে কীভাবে আশাবাদকে জাগিয়ে রাখা যায়, কীভাবে সকলকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, নেতিবাচক ভাবনার বিপরীতে ইতিবাচকতাকে কোন পন্থায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হয়—চরমপত্রকার সেই আর্টটি ভালো করেই জানতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার সুদক্ষ ব্যবহার ছিলো চরমপত্রের অসাধারণ শক্তির প্রধান উপাদান। মানুষের প্রাত্যহিক মুখের ভাষার যে কী বিস্ময়কর প্রকাশ ক্ষমতা এবং এর মধ্যদিয়ে লোকসমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কতো গভীরভাবে একাত্ম হওয়া যায়—সেটি চরমপত্র শুনে আমি নতুন করে উপলব্ধি করলাম। চরমপত্রকারের নাম-পরিচয় তখন জানতে পারিনি, জেনেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে। নিজেই তিনি সেদিন জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তার নাম—এম আর আখতার মুকুল। পরে জেনেছিলাম, আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুস্তাফা নূর-উল ইসলামের তিনি ছোট ভাই। স্বাধীনতার পরে মুকুল সাহেবের লেখা '*আমি বিজয় দেখেছি*' পড়ে যদিও খুশি হতে পারিনি, কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তার লেখা বই পড়ে তার ওপর একান্ত বিরূপতা জেগেছে যদিও, তবু মুক্তিযুদ্ধের সময়কার চরমপত্রের জন্যে শুধু আমি নই, সমগ্র বাঙালি জাতিই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। মুক্তকণ্ঠে বলবো : আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চরমপত্রের অবদান অসামান্য ও অবিস্মরণীয়।

শুধু 'চমরপত্র' নয়, গান, নাটিকা, কথিকাসহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল অনুষ্ঠানই সেই আশানিরাশার দ্বন্দ্বে দোলা দিনগুলোতে বাঙালি জাতির জন্যে প্রভূত মনোবলের

জোগান দিয়েছে। যুদ্ধের সময় সবার আগে নিহত হয় 'সত্য'—এ কথাটি মোটেই মিথ্যা নয়। যুধ্যমান সকল পক্ষই যুদ্ধকালে নানারকম তথ্যবিকৃতি ঘটায়, নির্জলা অসত্য পরিবেশন যেন যুদ্ধনীতিরই অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম দেখা গেছে। সংবাদভাষ্যে কিংবা বিভিন্ন কথিকায় অতিরঞ্জন কিছু থাকলেও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র যুদ্ধের খবর পরিবেশনে যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠ ছিলো। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা যে-এলাকায় অপারেশন চালিয়েছে সে-এলাকার মানুষ তো সঙ্গে সঙ্গেই সে-খবরটি জানতে পেরেছে। এবং দু'চারদিন পরে সেই খবরটিই যখন অবিকৃতরূপে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শুনতে পেরেছে তখন ওই বেতার কেন্দ্রটির ওপর তাদের আস্থা দৃঢ় হয়েছে। সকলে বিশ্বাস করতে পেরেছে যে, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র কোনো মিথ্যা খবর দেয় না। দু'একটি ভুল তথ্য কখনো কখনো পরিবেশিত হলেও সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এই বেতারকেন্দ্রটি কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেনি। এ কারণেই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র-পরিবেশিত খবরগুলোর একটা আলাদা মূল্য ছিলো।

বেতারে যুদ্ধের উদ্দীপনামূলক খবর শুনতে শুনতে বালালি গ্রামের যুবকরা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। বিশেষ করে আমাদের পাঠচক্রের সদস্যদের মধ্যে আবেগের সঙ্গে একটা যৌক্তিক দায়িত্ববোধ এসে যুক্ত হয়েছিলো। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারারও এলাকায় যাতায়াত করতে শুরু করেছে। ওদের কাছ থেকে দিশা পেয়েই মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখানোর জন্যে বালালির তরুণরা মন স্থির করে ফেললো।

আমি যখন ভাটি এলাকায় প্রায় পলাতক জীবন কাটাচ্ছি, তখন আমার বাবা ও ঠাকুরমা গ্রামের বাড়িতে। ছোটো ভাই মতীন্দ্র, মা, ছোটো বোন এবং একটি ভাগ্নিকে—অর্থাৎ আমার মাসতুতো বোনের মেয়েকে—বারহাট্টায় রেখে এসেছিলাম। কিন্তু ওখানে তাদের বেশিদিন থাকা হয়নি। কারণ এপ্রিলের শেষদিকে নেত্রকোনা শহরে পাক মিলিটারিরা পৌছে যাওয়ার পর থেকেই বারহাট্টা আর 'মুক্তাঞ্চল' থাকেনি, সেখানে পাক দালালদের তৎপরতা বেড়ে যায়। যান চলাচলের সুবিধা নিয়ে দালালরা পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে, রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলে, এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব চালায়। তাই মতীন্দ্রকে মা-বোন-ভাগ্নিদের সঙ্গে নিয়ে বারহাট্টা থেকে পালিয়ে নানা গাঁয়ে আশ্রয় নিতে হয়। মে মাসের শেষদিকে জানতে পেরেছিলাম যে, তারা কলমাকান্দা থানার রানাগাঁয়ে খগেশ কিরণ তালুকদারের বাড়িতে আছে। এরপর আর তাদের কোনো খবর পাইনি।

জুনের শেষদিকে আজিজুল ইসলাম খান (তখনকার ন্যাপ নেতা, বর্তমানে নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্র পার্টির সহসভাপতি) আমাকে খুঁজতে খুঁজতে ভটেরগাতি গ্রামে সামাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। সামাদকে দিয়ে খান সাহেব আমাকে খবর পাঠালেন যে, ফুলবাড়িয়ার শিবরামপুরে আমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তিনি আমার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। আমার শ্বশুর-পরিবারের সকলকে সহ ওরা সুস্থ আছে বটে, কিন্তু ফুলবাড়িয়া এলাকায় পাক মিলিটারি ও রাজাকারদের উৎপাত বেড়ে গেছে। একান্ত অনিশ্চয়তার ভেতর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় সকলের দিন কাটছে। অথচ এলাকা থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই একদল মুক্তিযোদ্ধা বালালি গ্রামে এলো। নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্র আবদুল জব্বার ছিলো সে দলের কমান্ডার। ময়মনসিংহ শহরে আমার প্রতিবেশী বিমল

পালও সে দলে ছিলো। জব্বার জানালো : মতীন্দ্রর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে সীমান্তের মুক্তাঞ্চল মহেশখোলায়। ওখানকার এক হাজং বাড়িতে সে মা-বোন-ভাগ্নিকে নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেয়ার অপেক্ষায় আছে। এর আগে নানা গাঁয়ে ঘুরে অনেক বিপদের মোকাবেলা তাদের করতে হয়েছে। খগেশদের বাড়িতে তারা বেশ কিছুদিন নিরাপদেই ছিলো। কিন্তু এক সময় সে বাড়িতেও তাদের ডাকাতের কবলে পড়তে হলো। মতীন্দ্র জানতো যে, আমি বালালি গ্রামে আছি, কিন্তু কিছুতেই সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলো না। জব্বার মদন থানায় অপারেশনে যাবে শুনে তাকে দিয়েই সে খবরটি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলে দিয়েছে, আমি যেন তাড়াতাড়ি বাবা আর ঠাকুরমাকে নিয়ে মহেশখোলায় চলে যাই, তারপর সকলে একত্র হয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে যাওয়া যাবে।

এ খবর পেয়ে দেশত্যাগের ব্যাপারে মনস্থির করতে আমার পক্ষে আর কোনো বাধা রইলো না। ফুলবাড়িয়ায় আমার স্ত্রী-পুত্র বা শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যে অসম্ভব, সে তো বুঝেই ফেললাম। এতোদিন মনে মনে আশা করছিলাম যে, ফুলবাড়িয়া থেকে কোনো-না-কোনোভাবে ওদের সকলকে এদিকে নিয়ে আসতে পারবো এবং তারপর সকলে একই সঙ্গে সীমান্তের ওপারে চলে যাবো। কিন্তু যেভাবে পাক মিলিটারি আর তাদের দোসর রাজাকাররা রাস্তায় রাস্তায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে তাতে সে আশা পুরোপুরিই ভেঙে গেলো। তাছাড়া বাবা আর ঠাকুরমার পক্ষেও গ্রামের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হয়ে গেছে। নেত্রকোনা শহরের পাক দালালরা এখন মিলিটারিদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিনিয়তই আমাদের গাঁয়ের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, আর এলাকার হিন্দু ও আওয়ামী লিগাররা কে কোথায় আছে তার খোঁজ নেয়। একদিন তো আমার বাবা, তার বন্ধু কামিনী চক্রবর্তী ও আমার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নগেন্দ্র নন্দী ওদের বন্দুকের গুলির মুখেই প্রায় পড়ে গিয়েছিলেন। প্রাণে বেঁচে যান নিতান্তই দৈবক্রমে।

তারা তিনজনে সেদিন কামিনী বাবুর বাড়ির ভেতরের ঘরে বসে গল্প করছিলেন। বাড়িটি বড়ো সড়কের পাশেই। সড়কে একটি জিপের শব্দ শুনেই তারা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ জিপটি বাড়ির কাছে এসেই থেমে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন দৌড়ে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। একটু পরই কয়েকজন সৈনিক ও নেত্রকোনার 'শান্তি কমিটি'র এক সদস্য বাড়ির ভেতরে এসে ঢোকে। শান্তি কমিটির ওই লোকটি কামিনী বাবুর বিশেষ পরিচিত এবং প্রায় বন্ধুস্থানীয়। এ বাড়িতে সে আগে অনেকবারই এসেছে, চা-নাস্তা খেয়েছে, বিনয়ে বিগলিত হয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে। কিন্তু আজ তার অন্য মূর্তি। বাড়িতে ঢুকেই কর্কশ কণ্ঠে কামিনী বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, 'কামিনী চক্রবর্তী কোথায় গেছে?'

—'কোথায় গেছেন জানি না। তিনি তো...'

একটি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে দালালটি ধমক দিয়ে কামিনী বাবুর স্ত্রীকে থামিয়ে দেয়। আর সৈনিকগুলোর সঙ্গে বিজাতীয় ভাষায় কী সব বলে। সঙ্গে সঙ্গে একটি সৈনিক জঙ্গলের দিকে গুলি ছোঁড়ে এবং অনুপস্থিত কামিনী বাবুর উদ্দেশে ক্রুদ্ধ বাক্যবাণ বর্ষণ করতে করতে চলে যায়।

বাবার মুখে ঘটনাটির বর্ণনা আমি শুনেছিলাম সামাদের বাড়িতে বসে। বাবা বলছিলেন 'আমরা জঙ্গলটি পেরিয়ে পশ্চিম পাড়ার দিকে চলে গিয়েছিলাম। একটু আগে যদি গুলিটি ছুঁড়তো তবে আমরা সবাই না হলেও তিনজনের কেউ-না-কেউ মারা পড়তামই।'

একটি বড়ো মহাজনী নৌকা ভাড়া করে নন্দীগ্রামের কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে—নারী-শিশুসহ জনা পঞ্চাশেক লোক—মহেশখোলার উদ্দেশে হাওড়ের জলে ভাসলাম। জলে ভেসেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। দেখা গেলো : হাওরের কিনারার কিছু কিছু গাঁয়েও—যেখান থেকে শহরে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা আছে—রাজাকার সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ রকমই বন্দুকধারী এক রাজাকার-দলের প্রায় সামনাসামনি আমরা পড়ে গিয়েছিলাম। মাঝিদের ডেকে ওরা নৌকা ভিড়াতে আদেশ করেছিলো। মাঝিরা তাদের আদেশ না মেনে দ্রুত নৌকাটিকে হাওড়ের মাঝখানে নিয়ে যায়। তাই আমরা রাজাকারের হাত থেকে বেঁচে যাই। দেখলাম : রাজাকাররা আমাদের নৌকা লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ছে, তবে তাদের স্বল্পশক্তি বন্দুকের গুলি আমাদের ক্ষিপ্রগতি নৌকাটিকে স্পর্শ করতে পারেনি।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কিছুদূরে একটি গ্রাম আগুনে পুড়ছে। বোঝা গেলো যে, মিলিটারিরা ওই হিন্দু গ্রামটিতে আগুন লাগিয়েছে। আগুনের লকলকে শিখা দেখে নৌকার ভেতর থেকে মেয়েরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। মাঝিরা সকলকে অভয় দিলো। জানালো হাওড়ে এখন অনেক জল, বলতে গেলে বিস্তৃত এলাকার সব মাঠই এখন হাওড়। মিলিটারিরা যে গ্রামে আগুন লাগিয়েছে সে গ্রামটি পাশ কাটিয়ে আমাদের নৌকাটিকে অন্য পথ দিয়ে অনায়াসে চালিয়ে নেয়া যাবে। তাই ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আমাদের নৌকার মাঝিরা আসলে ছিলো গোপালপুর গ্রামের কৃষক। কৃষিই তাদের মূল উপজীবিকা, বর্ষায় নৌকা বেয়ে তারা কিছু বাড়তি রোজগার করে মাত্র। কৃষকের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ তাদের সমগ্র সত্তায় মিশ্রিত। তাই ওই মাঝি তথা কৃষকরা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পরিচয়ে মুসলমান হলেও নৌকার হিন্দু যাত্রীদের প্রতি তাদের ব্যবহারে বা দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটে না। তাদের কথাবার্তায় ও আচরণে অসামান্য দরদের প্রকাশ দেখেছিলাম। মানবিক দরদের সঙ্গে মিশেছিলো মুক্তিযুদ্ধের আবেগ। কতকগুলো উপদ্রুত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তারা যেন সেই মহান আবেগের আগুনেই ইন্ধন জুগিয়েছিলো, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলো।

ঘুরপথে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময় বেশি লেগেছিলো। আমাদের নৌকার প্রধান মাঝিটি বললো যে, রাতে নৌকা চালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। গাগলাজোড় গ্রামে তার এক আত্মীয় আছেন, বেশ সম্পন্ন কৃষক। তার বাড়ির ঘাটে সন্ধ্যায় নৌকা বাঁধা হলো। বৃদ্ধ মানুষটি আমাদের পরম সমাদর করলেন। রাতে মহিলাদের শোবার জন্যে একটি বড়ো ঘর ছেড়ে দিলেন। আর নিজে তিনি সে ঘরের বারান্দায় একটা রামদা হাতে নিয়ে সারারাত জেগে কাটালেন। মহিলাদের বললেন, 'আম্মারা, আপনেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়ুইন। এই বুইড়্যা ছাওয়াল আপনেরার ঘরের দরজায় জাইগ্যা রইলো।'

টঙ্ক আন্দোলন-খ্যাত হাজংদের সঙ্গে

মহেশখোলা ভারতের মেঘালয়ের সীমানার একেবারে লাগোয়া একটি গ্রাম। গারো পাহাড়ের নিচেই গ্রামটির অবস্থান। পাহাড় ভারতের এলাকায়, নিম্নাঞ্চলের ভূমিটিই বাংলাদেশে। মহেশখোলা ও তার আশপাশের এলাকার কিছুটা অংশ পড়েছে সে-সময়কার সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অধীনে এবং কিছুটা ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমায়। একাত্তরের

মার্চের আগে গারো পাহাড়ের নিম্নাঞ্চলের এই মহেশখোলায় ছিলো পাকিস্তানি দাপট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের সদম্ভ বিচরণ। ছাব্বিশে মার্চের পরপরই রাইফেল্‌সের বাঙালি সদস্যরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে প্রত্যাখ্যান করে, পাকিস্তানি সহকর্মীরা বিরোধিতা করলে তাদের পরাভূত-করে এবং শেষে হত্যা করে। এরপর আর পাকিস্তানি সেনারা মহেশখোলায় যেতে পারেনি, পাকিস্তানি শাসনও আর সেখানে বলবৎ হয়নি। অর্থাৎ আমাদের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের প্রথম দিনেই মহেশখোলা ও তার আশপাশের বিস্তৃত এলাকা হয়ে যায় 'মুক্তাঞ্চল', পত্‌পত্‌ করে সেখানে উড়তে থাকে রক্তসূর্য-লাঞ্ছিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, কেউ এ পতাকা নামাতে পারেনি।

সেই মহেশখোলারই যে হাজং বাড়িতে মা-বোন-ভাগ্নিদের নিয়ে আমার ভাই মতীন্দ্র আশ্রয় নিয়েছিলো সেখানেই বাবা ও ঠাকুরমাকে নিয়ে গিয়ে উঠলাম। বিচ্ছিন্ন-হয়ে-থাকা পরিবারের সদস্যরা এতোদিন পরে একত্র হলাম, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে খুশির জোয়ার বয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু খুশিকে ছাপিয়ে উঠলো বিষাদ। আমার মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। কারণ তার পুত্রবধূ আর একমাত্র নাতিকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারিনি। আজিজুল ইসলাম খানের মারফৎ যতোটুকু খবর পেয়েছিলাম তা-ই মাকে জানালাম। মা এতে একটুও আশ্বস্ত হতে পারলেন না। মা তাঁর একান্ত আদরের নাতিকে ডাকতেন 'সোনাভাই' বলে। তার সেই 'সোনাভাইটি' কি আজো বেঁচে আছে? শত্রুবেষ্টিত দেশে তার কি বেঁচে থাকা সম্ভব? মা কাঁদেন আর তার আড়াই বছর বয়সী সোনাভায়ের আধো আধো কথাগুলো স্মরণ করেন। যেদিন সোনাভাই তার মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায় সেদিন তার গলা জড়িয়ে ধরে কী বলে গিয়েছিলো, অন্য কোন দিন কী দুষ্টুমি করেছিলো, কোন দিন কী বায়না ধরেছিলো সেই সব অতিমূল্যবান স্মৃতির কৌটো খুলে ধরেন আর তাঁর কান্নার বেগ কেবলই বেড়ে চলে। হাসির মতো কান্নাও সংক্রামক। স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্রকে দূরে অনিশ্চিত ও শঙ্কিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেও আমার কোনোদিন কান্না পায়নি, এমন কথা যদি বলি তাহলে কেউই আমাকে স্বাভাবিক মানুষ বলে মেনে নেবেন না। তবে পুরুষ মানুষ তার পৌরুষের অভিমান দিয়ে উদ্‌গত কান্নাকে চেপে রাখতে পারে, আমিও তা পেরেছিলাম। কিন্তু মায়ের কান্না আমার রুদ্ধ অশ্রুকে ঠেলে বের করে দিলো, আমি তার সামনে থেকে দ্রুত পালিয়ে গিয়ে তা গোপন করলাম।

আগের কয়েক মাস কাটিয়েছি মুসলমান কৃষকদের ভেতর। সেখানে থেকে কৃষক-মানসের অন্তরঙ্গ পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি, সে-সমাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বৈপরীত্যগুলো অবলোকন করেছি, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষক সন্তানদের চিন্তাচেতনার বাঁকগুলোও লক্ষ করেছি। এবার মহেশখোলায় এসে মুখোমুখি হলাম আদিবাসী হাজং কৃষকদের। মহেশখোলায় মাত্র অল্প কয়েকদিনই ছিলাম, তাই হাজং কৃষকদের একেবারে ভেতর মহলের খবর নেয়া সম্ভব হয়নি। যে লড়াকু হাজং কৃষকদের অংশগ্রহণে টঙ্ক আন্দোলন একটি অসাধারণ জঙ্গিরূপ লাভ করেছিলো বলে শুনেছি ও বইয়ে পেড়েছি, মহেশখোলার শান্ত নিরীহ হাজংদের চোখের সামনে দেখে আমার সেই শ্রুত ও পঠিত ইতিহাসের সঙ্গে তাকে কিছুতেই মিলিয়ে নিতে পারলাম না। এ-বিষয়টি নিয়ে পরে আমি কমরেড মন্মথ দের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। মন্মথ দা যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হলো, হ্যাঁ, হাজংরা খুবই শান্ত, নিরীহ ও সরল। কিন্তু এই নিরীহ মানুষগুলোর ভেতরে আছে প্রতিবাদের আগুন। উপযুক্ত ইন্ধন পেয়ে সেই আগুনই একবার জ্বলে উঠেছিলো, সৃষ্টি হয়েছিলো টঙ্ক আন্দোলনের মতো এক দাবানলের।

কিন্তু সেই দাবানল নিভে গেলো কেন? এ-প্রশ্নের এক কথার উত্তর কেউই দিতে পারেন না। কিংবা অনেকেই যার যা মনগড়া উত্তর দিয়ে সেটাকেই মোক্ষম উত্তর বলে চালাতে চান। মহেশখোলার নিশি মাস্টারকে আমি প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। এই হাজং যুবক বলেছিলেন, 'হাজংরা তো আন্দোলন থেকে হঠে আসেনি। তারা চরম আত্মত্যাগ করেছে।...কিন্তু আন্দোলনের নেতারাই আন্দোলন তুঙ্গে উঠে যাওয়ার পর এক সময় বললেন যে আন্দোলনে অনেক ভুল হয়ে গেছে, এবং সেই নেতারাই হঠাৎ করে আন্দোলনটি বন্ধ করে দিলেন।'

নিশি মাস্টারের কথাও হয়তো পুরো সত্য নয়। তার নিজস্ব স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কথাগুলো বলেননি। কারণ টঙ্ক আন্দোলনের সময় তার বয়স খুব বেশি ছিলো না, আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তিনি করতে পারেননি। তবে আন্দোলন-পরবর্তীকালের হাজংদের দুর্দশার তিনি অংশীদার। পাকিস্তান সরকারের নির্মম অত্যাচারে অধিকাংশ হাজংই দেশ ছাড়া হয়েছে, চলে গেছে ভারতের মেঘালয়ে ও আসামে। তবে অনেকেই দেশত্যাগ করতে পারেনি, সামান্য ফসলের জমি আঁকড়ে দেশের মাটিতে পড়ে থেকেছে। মহেশখোলা এ রকম দরিদ্র হাজংদেরই গ্রাম। মেয়ে-পুরুষ মিলে হাজংরা ক্ষেতে কাজ করে। মেয়েরা বরং পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী, নানা ধকলও তাদেরই সইতে হয় বেশি। ক্ষেতে যেমন কাজ করে তারা, তেমনি সন্তানের পরিচর্চা রান্নাবান্না ও ঘর গেরস্তালির সব কাজ করে সমান তালে, সমান নৈপুণ্যে। আবার এই মেয়েরাই বিয়ের বাসরে সুরেলা কণ্ঠে গীত গায়, ছেলে ভুলানো গল্প ও ব্রতকথা বলে, নানা শোলোক ও প্রবাদ আওড়ায়, সূক্ষ্ম সূচিকর্ম করে, গৃহসজ্জায় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। মহেশখোলার কলানিপুণা হাজং রমণীদের দেখে আমি ভাবছিলাম, বীরাঙ্গনা রাসিমণির কথা। টঙ্ক আন্দোলনে এই হাজং নারীর বীরত্বের কাহিনী কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। রাসিমণিতো এ-রকম একজন শান্ত স্বভাবের গৃহবধূই ছিলেন। অথচ, প্রবলের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়েই তিনি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রাসিমণি একা নন, তার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলো চাষবাস ও গৃহকর্মে নিরতা একদল হাজং রমণী। যে দা-বটি দিয়ে তারা কুটনা কুটতো, সেই দা বটি নিয়েই তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। রাসিমণি আর তাঁর নারীবাহিনীর কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে হয়েছিলো : প্রতিটি হাজং নারীর ভেতরই বোধ হয় একেক জন রণরঙ্গিনী রাসিমণি লুকিয়ে আছে, প্রয়োজনের মুহূর্তে তার প্রকাশ ঘটে।

আমার বোন মায়া ছিলো বাংলা অনার্সের ছাত্রী। তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন হাজং মেয়ের ভাব জমে যায়। ওদের কাছ থেকে শুনে শুনে হাজং ভাষার অনেকগুলো শোলোক সে খাতায় লিখে নিয়েছিলো। ওদের ভাষাটাও তার অল্পদিনেই রপ্ত হয়ে যায়। হাজংরা অবশ্যি বাংলাভাষীই। তবু বৃহত্তর বাঙালি সমাজের বাইরে অবস্থানকারী হাজংদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু ভাষায় নয়, জীবন-ভাবনা ও জীবন-আচরণেও তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রকট। হাজংদেরই প্রতিবেশী অন্য আদিবাসীগোষ্ঠীটির নাম গারো। সমতলের বাঙালিরা দুটো গোষ্ঠীর মানুষকেই অভিন্ন বা প্রায়-অভিন্ন বলে মনে করেন, একই সঙ্গে দু'য়ের নাম বলে 'গারো-হাজং'। কিন্তু দুটো গোষ্ঠীর মানুষের ভেতর নৃতাত্ত্বিক বিচারে ঐক্য থাকলেও দু'য়ের মধ্যে বহু বিষয়ে বিস্তর ফারাক। গারোরা মাতৃতান্ত্রিক, হাজংরা পিতৃতান্ত্রিক। গারোরা সর্বপ্রাণবাদী আদিম ধর্মের অনুসারিতা ছেড়ে উনিশ শতক থেকেই খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রভাবে খ্রিষ্টান হয়ে যেতে থাকে এবং বর্তমানে গারোদের শতকরা আটানব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ খ্রিষ্টান। হাজংরা

খ্রীষ্টান হয়নি, চৈতন্যদেবের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সংস্পর্শে এসে তারা আস্তে আস্তে হিন্দুকরণ প্রক্রিয়ার ভেতরে পড়ে গেছে। তবু, হিন্দু হয়েও বাঙালি হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের স্বাতন্ত্র্য ঘুচে যায়নি। আদিম লোকায়ত ধর্মের ঐতিহ্য তাদের ভেতর এখনো জীবন্ত। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু দেবদেবীদেরও তারা মানে, তবে সেই মান্যতার ক্ষেত্রেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি তারা হারিয়ে ফেলেনি, তাদের নিজস্ব দেবদেবীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেবতা-কল্পনাতেও তারা অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে। হাজংদের এই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাবজগৎটি সম্পর্কে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ধারণা নিতান্তই ভাসা ভাসা। এ বিষয়টি নিয়ে পণ্ডিতরাও তেমন একটা গরজ দেখাননি। এভাবেই নিকট প্রতিবেশিদের পরিচয়ও আমাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বেড়ে যায়।

মহেশখোলায় যে-হাজংদের আমি দেখেছিলাম তারা তখন শুধু দরিদ্র নয়, একান্তই অসহায়। টঙ্ক আন্দোলনের আংশিক সফলতা এবং পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির পর যে হাজংরা দেশত্যাগ করতে পারেনি তাদেরই দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি তাদের ওপর অমানুষিক বর্বর আচরণ করেছে, সর্বদা শারীরিক-মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। গ্রামে অনেকগুলো পোড়ো বাড়ি দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে ওই সব বাড়ির মানুষদের কেউই দেশত্যাগী হয়নি, মায়ের দয়ায় তারা ইহলোক ছেড়েই চলে গেছে। 'মায়ের দয়া' মানে বসন্ত মহামারী। যে বাড়িতে 'রোদন ভরা এ বসন্ত' ঢুকেছে সে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত রোদন করার জন্যেও কোনো লোকই জীবিত থাকেনি। মহামারীতে আক্রান্ত মানুষদের কোনো চিকিৎসা হয়নি, সুস্থ মানুষদের জন্যে প্রতিষেধক টিকা নিয়ে কোনো স্বাস্থ্যকর্মী সে গ্রামে কোনো দিন যায়নি। রাষ্ট্র এখানকার প্রজাদের জন্যে কল্যাণমূলক কাজ কিছুই করেনি, কিন্তু দমনমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে। হাজংরা যেহেতু হিন্দু, তাই মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তানের তারা শত্রু—পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই সরল সমীকরণ তো গোড়া থেকেই ছিলো। টঙ্ক আন্দোলনের পর সে সমীকরণটিই হাজংদের সম্পর্কে রাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে যায়। পাকিস্তানের পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষীরা প্রতিনিয়তই হাজংদের রাষ্ট্রবিরোধিতার প্রমাণ প্রস্তুত করতো। এবং সেই প্রস্তুত করা প্রমাণের সাহায্যে তাদের নানাভাবে হেনস্থা করতো। কোনো হাজংয়ের ঘরে হয়তো পাওয়া গেলো দু' প্যাকেট ভারতীয় বিড়ি কিংবা এ রকমই সামান্য কোনো ভারতীয় জিনিস। ব্যস, পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা ও সীমান্ত রক্ষাকারীদের বিচারে সে হয়ে গেলো ভয়ংকর একজন স্মাগলার, পাকিস্তানের অর্থনীতি-ধ্বংসকারী, এবং হিন্দুস্থানের চর। এ রকম 'স্মাগলার' বা হিন্দুস্থানের চরদের আদালতে খুব কমই সোপর্দ করা হতো, পুলিশ বা সীমান্তরক্ষীরা নিজেরাই তাদের বিচার করতো। অর্থাৎ প্রচণ্ড শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করে এবং ওদের হাতে সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থ তুলে দিয়ে তবে ওই কথিত অপরাধীরা রেহাই পেতো। এমনই চলেছে দিনের পর দিন।

মেঘালয়ের বাঘমারা শরণার্থী শিবিরে গিয়ে টঙ্ক আন্দোলনের দুই লড়াকু হাজং বীর ললিত সরকার ও বিপিন গুণের দেখা পেয়েছিলাম। (সরকার ও গুণের মতো বাঙালি হিন্দুর কৌলিক পদবিগুলো নাকি হাজংদের দিয়েছিলেন সুসঙ্গের মহারাজা।) ললিত সরকারের বাড়িঘরসহ সকল সম্পত্তি পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলো। এরপর তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। ভারতেও তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে নানা গণআন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলাকালে তিনি নানাভাবে আমাদের

সাহায্য সহযোগিতা করেন। বিপিন গুণ শত অত্যাচার সহ্য করেও আগে দেশত্যাগ করেননি, মুক্তিযুদ্ধের কালে আমাদের সঙ্গে তিনি একই শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। সেখানেও তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেননি। শরণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেন-দরবার করেছেন, শরণার্থীদের মধ্য থেকে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটে নিযুক্ত থেকেছেন।

কয়েক জন হাজং তরুণ আমার ছিয়াশি বছর বয়সিনী ঠাকুরমাকে বাঁশের তৈরি দোলায় চড়িয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে মহেশখোলা থেকে ষাট মাইল পাহাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে বাঘমারা শরণার্থী শিবিরে পৌছিয়ে দিয়েছিলো। আমাদের বাঘমারা যাওয়ার মাস তিনেক আগেই মহাদেব সান্যাল সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভারত সরকারের তৈরি করে দেয়া 'ক্যাম্পে'র খুপড়িতে থাকতেন না। বাঘমারা বাজারের পাশে মালিকোণা এলাকায় বেশ কিছু ফাঁকা জায়গা ছিলো। স্থানীয় গারো মালিকদের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে অনেকগুলো শরণার্থী পরিবার সে জায়গায় বাঁশের মাচার ওপর ঘর তৈরি করে নিয়েছিলো। মহাদেব বাবুও তাই করেছিলেন। ঘরের মূল নির্মাণ সামগ্রী বাঁশ সেখানে বেশ শস্তায় পাওয়া যেতো। তাই আমরাও মহাদেব বাবুর ঘরটির পাশেই একটি ঘর তৈরি করে নিলাম।

আমরা বাঘমারা শরণার্থী শিবিরে পৌছাই সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। পৌছানোর দু'তিন দিন পরেই ময়মনসিংহ থেকে একটি চিঠি পেলাম। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু (এবং পরে যার ছোট বোন হয় আমার স্ত্রী) শচীন আইচের এই চিঠিটি অনেক দিন পরে অনেক হাত ঘুরে আমার হাতে এসে পৌছায়। চিঠিতে শচীন জানিয়েছে যে, ফুলবাড়িয়ায় গ্রামের বাড়িতে রাজাকারদের অত্যাচারে ও পাক সেনাদের দৌরাত্ম্যে টিকতে না পেরে তারা ময়মনসিংহ শহরে চলে এসেছে। এবং এখানে এসে তার ছোট বোন অর্থাৎ আমার স্ত্রীসহ পরিবারের সকলকে নিয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া জীবন রক্ষার আর কোনো উপায় ছিলো না।

প্রাণের ভয়ে ধর্মান্তর গ্রহণের ছেলেখেলা

বাড়ির বউ তার বাবার পরিবারের সবার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছে—এই খবরে আমার বাবা-মার মধ্যে কোনো বিকার লক্ষ করলাম না। বরং তাঁরা অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন বলে মনে হলো। শচীনের চিঠিটা পড়ে তো এটুকু অন্তত বোঝা গেছে যে, মুসলমান হওয়ার ফলে ময়মনসিংহ শহরে তারা নিরাপদে থাকতে পারবে। আমার স্ত্রী একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মাস্টারি করতো। সেখানে সে আবার জয়েন করেছে। তার দাদা শচীনও সিটি কলেজিয়েট স্কুলের মাস্টারিটি ফিরে পেয়েছে। তাই তাদের জীবিকার ব্যাপারটিও এখন মোটামুটি নিশ্চিত। এই সব বিবেচনাতেই আমার মা বাবাকে বেশ আশ্বস্ত হতে দেখা গেলো।

হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়াটা যেন কোনো ব্যাপারই নয়, আমার মা বাবার ভেতর এমন একটা ভাবনার প্রকাশ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অথচ তারা যে ধর্ম কিংবা জাতপাত সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত, তা তো নয়। আমার মা তো বটেই, বাবাও মুসলমানের ছোঁয়া খাবার খেতে রাজি নন। স্টলে বসে তিনি চা খাননি কোনো দিন। কারণ সেখানে জাতপাত মানা হয় না। বাবা গ্রামসমাজের টিপিক্যাল হিন্দুদেরই একজন। ধর্ম সম্পর্কে উদার, কিন্তু জাতপাতের বিষয়ে রক্ষণশীল। ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনাও তিনি কম করেননি। আমি যে বস্তুবাদী মত পোষণ করি, এ বিষয়েও তিনি অবগত। শুধু অবগত নন, আমার এ মতকে তিনি

স্নেহসিক্ত প্রশ্রয়ও দেন। কিন্তু চিন্তার অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও তার ছেলে মেয়েরা হিন্দু আচারের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসবে, এমনটি তিনি মেনে নিতে পারেন না। বাবার ভেতর আমি অদ্ভুত স্ববিরোধিতা দেখেছি। শুধু আমার বাবা নন। গ্রামে যে হিন্দুরা থাকতেন তাদের প্রায় সবাই এরকম। এদের মধ্যে যারা 'গ্রামীণ এলিট' তাদের মধ্যেই চিন্তায় আচরণে স্ববিরোধিতাটা বেশি মাত্রায় প্রকট। তারা যথাসম্ভব পড়াশোনা করেন, আধুনিক নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতিরও খোঁজ খবর রাখেন। তাদের কথাবার্তার মধ্যে অনেক রেডিক্যাল ভাবনার প্রকাশ থাকে। কিন্তু আচার আচরণে তারা একেবারে ষোল আনা রক্ষণশীল হিন্দু। ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার নিয়মের পান থেকে চুন খসে পড়ার ব্যাপারেও তারা সদা সতর্ক। খাওয়া দাওয়ায় মুসলিম সংস্পর্শ তো বটেই, নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেন সব সময়। কোনো হিন্দু আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার মতো উদারতা ষাটের দশকেও কোনো হিন্দুর মধ্যে আমি দেখিনি। আমার বাবাও এর ব্যতিক্রম নন। অথচ সেই তিনিই কি না ছেলের বউ মুসলমান হয়ে গেছে শুনেও নির্বিকার—এমনটি কী করে হয়?

এও বোধ হয় মহান মুক্তিযুদ্ধেরই অবদান। মুক্তিযুদ্ধই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলো যে এখন আর হিন্দু বা মুসলমান নয়, বাঙালি হয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। তাই একাত্তরের এপ্রিলে আমি যখন মুসলমান কৃষকদের বাড়িতে আহার ও আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন বাবা সেটাকে খুব স্বাভাবিক বলেই মেনে নেন। গ্রামের সকল 'ভদ্র' হিন্দুর মতোই আমার বাবাও কোনোদিন লুঙ্গি পরে ঘরের বার হতেন না, এমনকি ঘরেও লুঙ্গি পরে থাকতে অস্বস্তি বোধ করতেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে শহর নগরে ধুতির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে কমে এলেও গ্রামের হিন্দুরা ধুতি ছেড়ে দেয়নি, অন্তত আমার বাবার প্রজন্মের হিন্দুরা তো নয়ই। স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দেখা গেলো ধুতি-লুঙ্গি সম্পর্কীয় সব সংস্কার হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, আমি যাকে বলি 'ধুতি-লুঙ্গি দ্বন্দ্ব সমাস' তা আর নেই। আমার বাবাসহ গায়ের সকল হিন্দুই লুঙ্গি পরে বৃহত্তর সমাজের মানুষদের সঙ্গে মিশে যেতে চাইলেন, লুঙ্গিকে মুসলমানের পোশাক বলে বিবেচনা করা ছেড়ে দিলেন, গাঁয়ের সকল মানুষ অভিন্ন পোশাক পরে একই উৎপীড়িত জনসংঘের সদস্য হয়ে গেলো। উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালো এই বিদ্রোহী জনসংঘ। সেই আপৎকালে তাদের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ এক, খাওয়া ছোঁয়া বা পোশাক পরিচ্ছদের বিরোধ বৈপরীত্যও প্রায় লুপ্ত। হিন্দুর জাতধর্ম নষ্ট হতো বেজাতের বা বেধর্মের মানুষের ছোঁয়া খাদ্য গ্রহণ করলে। এখন যেহেতু মুসলমানের ভাত খেলে হিন্দুর জাত যায় না, তাই তার ধর্ম নষ্ট হবে কিসে? বাবাও বোধ হয় ভাবলেন যে জাত যখন যাবে না তখন কলেমা পড়লেও তার পুত্রবধূর ধর্ম নষ্ট হবে না, হিন্দুই থেকে যাবে। আর 'মুসলমান' হয়ে গিয়ে যদি পাকহানাদার কবলিত বাংলাদেশে জীবন রক্ষা করা যায় তাতে একবার কেন একশ' বার 'মুসলমান' হতেই আপত্তিটা কিসের? ধর্ম রক্ষার আগে তো আত্মরক্ষা।

এ ব্যাপারে আমার মায়ের বিবেচনাটা আরো বেশি প্র্যাকটিক্যাল। তার কথা হলো, 'আমার বউমা আর আমার নাতি তো আমারই আছে, আমারই থাকবে। তারা মুসলমান হলেই কি, খ্রিস্টান হলেই কি?...ভালোয় ভালোয় যুদ্ধটা শেষ হয়ে যাক, আমরা দেশে ফিরে যাই, আমার সোনা ভাইকে কোলে তুলে নিই।'

তার সোনাভাই অর্থাৎ ছোট্ট নাতিটিই তার কাছে সব। দেশে ফিরে গিয়ে কখন সোনাভাইকে কোলে তুলে নিতে পারবেন সে-চিন্তাই তার সমস্ত সত্তাকে সব সময় ঘিরে রাখে। জাতধর্মের ভাবনা তার কাছে এখন একান্তই তুচ্ছ।

আমার শ্বশুর পরিবারের মুসলমান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতটি বর্ণনা করে লেখা আমার স্ত্রী শ্রীমতি কানন সরকারের একটি স্মৃতিকথামূলক প্রবন্ধ 'মর্মান্তিক ধর্মান্তর' রশীদ হায়দার সম্পাদিত *১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা* বইয়ে ছাপা হয়েছে। সে সময়ে ময়মনসিংহ শহরে অবস্থানরত প্রায় সকল হিন্দুই ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের আরো অনেক স্থানেই এ রকমটি ঘটেছিলো। কিন্তু কাগজেপত্রে সে সবের বিবরণ খুব কমই ধরে রাখা হয়েছে। মুসলমান হয়ে যাওয়া সব হিন্দুই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনা থেকেই হিন্দু হয়ে গেছে, গোবর খেতে হয়নি বা অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। এ রকম সকল হিন্দুই মুসলমান হয়ে যাওয়ার সেই মর্মান্তিক স্মৃতিটি ভুলে যেতে চেয়েছে। সেই সঙ্গে ভুলে যেতে চেয়েছে হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রের সব কঠিন কঠোর বিধিবিধানকে। বড়ো বড়ো সংস্কারকদের এক দেড়শো বছরের প্রচার ও প্রয়াসে যা হয়নি, রাষ্ট্রবিপ্লবের ধাক্কায় অতি অল্পদিনে তা হয়ে গেছে, বাঙালি হিন্দু অনেক অর্থহীন আচার সংস্কারের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। শুধু আচার সংস্কার নয়, জাতধর্মের সব ব্যাপারই হাসি ঠাট্টার বিষয় হয়ে গেছে।

স্বাধীনতার পর আমার বাবাকে দেখেছি তার বেয়াইয়ের (অর্থাৎ আমার শ্বশুর মহাশয়ের) মুসলমান হওয়া নিয়ে নানা রকম রসিকতা করতে। আমার ঠাকুরদা (পিতামহ) ছিলেন ঘোর শাক্ত। সেই হিসেবে, পারিবারিক ঐতিহ্যের দিক দিয়েই আমার বাবাও শাক্ত। আর আমার শ্বশুর মহাশয় তার পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্যের অনুসরণে দীক্ষা নিয়েছিলেন বৈষ্ণব গুরুর কাছ থেকে। তাই আমার বাবা আর তার বেয়াইয়ের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণবের কৃত্রিম ঝগড়া খুব জমে উঠতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে ঝগড়াতেই একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। শাক্ত বেয়াই তার বৈষ্ণব বেয়াইকে মুসলমান হওয়ার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। বলতেন, 'বেয়াই, মুসলমান হয়ে মসজিদে গিয়ে আপনি যখন আল্লাহ্‌র নাম করতেন তখন কি আপনার ইষ্ট দেবতা কৃষ্ণের কথা মনে পড়তো না?'

বেয়াই জবাব দিতেন, 'আরে, তা মনে পড়বে না কেন? আমার কৃষ্ণই তো আমাকে সে সময় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে মুসলমান হওয়ার বুদ্ধি জুগিয়ে দিয়েছিলেন। আর ঈশ্বরের নাম কি শুধু একটা? কৃষ্ণ যার নাম আল্লাহ্‌ও তো তারই নাম। কৃষ্ণ নামে তাকে ডাকলে যা আল্লাহ্‌ নামে ডাকলেও তা-ই। ডাকার মতো ডাকতে পারলে যে কোনো নামে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন...।'

এসব কথা বলতে বলতে দু বেয়াই শেষ পর্যন্ত রসিকতা বা ঠাট্টা তামাশার কথা ভুলে গিয়ে সিরিয়াস হয়ে উঠতেন। এদিক দিয়ে হিন্দুর খুবই সুবিধাজনক অবস্থান। 'রাম রহিম না জুদা করো ভাই' কিংবা 'ঈশ্বর আল্লাহ্‌ তেরে নাম'—এ সব কথা হিন্দুরা একান্ত গভীর বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারে। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম' (যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে যেভাবেই তুষ্ট করি)—হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের একান্ত মান্য গ্রন্থ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে এমন কথাই বলানো হয়েছে। তাই এক সময়ে হিন্দুর পক্ষে যে বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব ছিলো, বাস্তব পরিপার্শ্বের ধাক্কায় সেই 'জাতের বাঁধন' যখন আলগা হয়ে পড়েছে তখন ধর্মান্তরের ব্যাপারটিও, আমার শ্বশুরের মতো রক্ষণশীল হিন্দুর কাছেও নিতান্ত ছেলে খেলা হয়ে গেছে।

তবে ধর্মান্তরিত হয়েও সকল হিন্দুর পক্ষেই প্রাণে বেঁচে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ডিসেম্বরের দশ তারিখেই যদি ময়মনসিংহ শহর হানাদার মুক্ত না হতো, তবে আমার শ্বশুর পরিবারেরও

কেউই বাঁচতে পারতেন না। আমার স্ত্রীর ছোট ভাই সুকান্তর ওপর আল বদরদের নজর পড়েছিলো, বড়ো ভাই শচীন আইচের নাম ঘাতকদের তালিকায় উঠে গিয়েছিলো।

ময়মনসিংহ শহরের পাক দালালরা আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। তারা ধারণা করে নিয়েছিলো যে, আমি গোপনে শহরে এসে আমার স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে যাই। এই নিয়ে অনেক গুজব তারা ছড়িয়েছে। এসব গুজবের কথা সীমান্তের ওপারে বসেই আমি কিছু কিছু শুনেছি। আমার এক দুঃসাহসী ছাত্র ওপার থেকে এসে একদিন ময়মনসিংহ শহরের অনেক খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলো। সে বললো, 'স্যার, দালালরা নাহা দা আর আপনার ওপর ভীষণ খাপ্পা। ওরা বলে যে, আলোকময় নাহা আর যতীন সরকারকে একবার পেলে হয়।'

স্বাধীনতার পরে আহমদ তৌফিক চৌধুরী তার সম্পাদিত দ্বিমাসিক '*ঋতুপত্র*' পত্রিকায় একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা প্রকাশ করেন। তার সেই লেখায় তিনি আমার সম্পর্কে সে সময়কার 'পাকিস্তান কাউন্সিল' নামক সংস্থাটির ময়মনসিংহের রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তৌফিক চৌধুরী লিখেছেন, 'ডিরেক্টর সাহেব বললেন যে, যতীন সরকারের পরিবার মুসলমান হয়ে গেছে। তবে যতীন সরকার নেই এখানে। তিনি বললেন, যতীন সরকার এসে যদি মুসলমানও হয় তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে না। কারণ যতীন সরকার ক্ষমার অযোগ্য।'

আহমদ তৌফিক চৌধুরী আমার একজন বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। সিলেটের সেলবরষ পরগণার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান তৌফিক চৌধুরী 'আহমদীয়া' মুসলিম জামাতের সদস্য। (এই আহমদীয়ারাই সাধারণ্যে 'কাদিয়ানি' নামে পরিচিত। বর্তমানে, ১৯৯৬ সালে, আহমদ তৌফিক চৌধুরী বাংলাদেশ আহমদীয়া জামাতের প্রধান—ন্যাশনাল আমীর) সেই তৌফিক চৌধুরী একাত্তরের এপ্রিলের উনিশ তারিখে তার ময়মনসিংহের বাসা ছেড়ে ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি ময়মনসিংহ শহরে একজন বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—

"ময়মনসিংহ শহরের মহারাজ রোডে আমার বাসার (১ নম্বর) সংলগ্ন ৩ নম্বর বাসায় থাকতেন একজন হিন্দু (ব্রাহ্মণ) এডিশনাল জজ। তাদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। প্রথমে তিনি আমার বাসায়ই আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে ধানীখোলায় যাবার সময় তাকে খন্দকার সাহেবের ৭ নম্বর বাসায় রেখে যাই।"

"ধানীখোলা থেকে একদিন মোটর সাইকেলে করে মাথায় জিন্নাহ টুপি দিয়ে আমি শহরে এসেছিলাম বাসায় হাল হকিকত দেখতে। বাড়ি থেকে আসা চাল ছিলো কয়েক বস্তা। আশ্রয় প্রার্থীরা তিন মাস অনায়াসে খেতে পারবে। বাসায় আসার পর খবর দিলেন জজ বাবু। সাক্ষাতে বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আপনি আমার ভাই। আমাকে বাঁচান। আমাকে মুসলমান বানান। আপনারা তো দেশে বিদেশে প্রচার করেন। আমাকে আমার বাচ্চাগুলোসহ রক্ষা করুন।' বললাম, 'আপনি কি ইসলামের সৌন্দর্য দেখে মুসলমান হতে চান, না মুসলমানদের দানবীয় রূপ দেখে ভয় পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চান?' তিনি বললেন, 'যে কারণেই হোক আমাকে বাঁচান।' আমি বল্লাম, 'এভাবে কাউকে মুসলমান করা যায় না। আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করলে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না। মুসলমান সাজা যায় মাত্র।' তিনি নিরাশ হয়ে বড়ো মসজিদে গিয়ে কলেমা পড়লেন। বড়ো মসজিদের বড়ো ইমাম তার নতুন নাম দিলেন আশরাফ আলী চৌধুরী। আশরাফ আলী ইমাম সাহেবের পীরের নাম।"

ধর্মান্তরিত এই এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের আসল নাম ছিলো দ্বিজেন চৌধুরী। ভীষণ ভয় পেয়েই এমনভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার সেই ভয়ের কারণটিও সকৌতুক বর্ণনা দিয়েছেন আহমদ তৌফিক চৌধুরী। দ্বিজেন বাবু যখন খন্দকার সাহেবের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তখনই এই ভয়ের ব্যাপারটি ঘটেছিলো। তৌফিক চৌধুরী লিখেছেন—

"একদিন খন্দকার সাহেবের বাসায় দরজায় করাঘাতের শব্দ এবং উর্দুতে 'দরওয়াজা খোলো' হুঙ্কার শোনা গেলো। ব্যাপারটি বুঝে খন্দকার সাহেব জিন্নাহ টুপিটি জজ বাবুর মাথায় দিয়ে তিনি এসে দরজা খুললেন। পাকিস্তানি সেনা মিলিশিয়াটি ঘরে ঢুকে টুপি পরা জজ বাবুকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপ কৌন হ্যায়?' উত্তরে বললেন, 'এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ।' সেপাইটি বললো, 'আপ জজ সাহেব হ্যায়, তশরিফ রাখিয়ে।' এরপর ধরলো খন্দকার সাহেবকে। বললো, 'মালাউন তুম হো।' খন্দকার সাহেব কলেমা ও কুরআনের আয়াত পড়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে তিনি একজন পাক্কা মুসলমান। কিন্তু কিছুতেই ওরা বিশ্বাস করতে চাইলো না। বললো, 'মালাউন বহুত হুঁশিয়ার হ্যায়। কলেমা শিখ লিয়া।' শেষ পর্যন্ত এসডিও সাহেব এসে রক্ষা করলেন।

"মুসলমান সাজার (হওয়া বললাম না) পর জজ সাহেব শেরওয়ানি টুপি পরে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। ওই সময় পাড়ার আরো কিছু লোক মুসলমান সেজেছিলো প্রাণের ভয়ে।"

বাঘমারা শিবিরে শরণার্থী জীবন

'হিন্দু রাজাকার'—এরকম একটি কথা শুনলে সবাই হাসে। মনে হয়, এর চেয়ে বড়ো রসিকতা যেন কিছু কিছু হতে পারে না। কিন্তু কেন? হিন্দুদের জন্যে রাজাকার হওয়া কি নিষিদ্ধ ছিলো? না সব হিন্দুই এমন সৎ ও দেশপ্রেমিক যে তাদের সম্পর্কে রাজাকার হওয়ার কথা ভাবাই যায় না? কিংবা সকল হিন্দুই কি এমন বোকারাম যে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না?

না, এর কোনোটাই নয়। আসলে কোনো হিন্দুকে রাজাকার হওয়ার কোনো সুযোগই পাকহানাদাররা দেয়নি। তারা প্রথমেই এদেশের হিন্দুদেরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা করে ফেলতে চেয়েছিলো। মুসলমানি জোশ তুলে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধটাকেই হিন্দু ও হিন্দুস্তানের ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রমাণ করতে পারলেই এখানকার সব মুসলমান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং পাকিস্তান বেঁচে যাবে—এ রকমই তারা মনে করেছিলো। তাই, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ব্যবহার করার কোনো কৌশল গ্রহণের কথা তারা চিন্তা করেনি। পাকিস্তান যদি তখন তেমনটি করতো তবে হিন্দু রাজাকারও কম তৈরি হতো না, দালালিতে হিন্দুদের ভূমিকাও অনুল্লেখ্য হতো না, মুক্তিযুদ্ধে আরো জটিলতা ও বিভ্রান্তি তারা সৃষ্টি করতে পারতো।

তবু, এরপরও, সংখ্যায় সামান্য হলেও কিছু ধুরন্ধর হিন্দু যে রাজাকারির ব্যাপারেও যথেষ্ট কুশলতা দেখিয়েছে—এবং অন্য দালালসহ হানাদারদেরও বোকা বানিয়ে ছেড়েছে—এমন কিছু হিন্দু রাজাকারের কথা এর ওর মুখে শুনেছি। তবে ওই হিন্দু রাজাকাররা মতলব হাসিলের জন্যে আগে মুসলমান সেজেছে, তারপর রাজাকারি করেছে।

সুসং দুর্গাপুরের দুর্গাপ্রসাদ তেওয়ারির কাছে এ-রকমই একজন হিন্দু দালাল রাজাকারের গল্প শুনেছিলাম। ছিয়াত্তর সনে ময়মনসিংহ জেলখানায় দুর্গাপ্রসাদ বাবু আমার সহবন্দি ছিলেন।

কর্মহীন কারাবাসে সারাদিন ধরে কতো গল্পই যে চলে। একদিন উঠলো ঐ হিন্দু রাজাকার প্রসঙ্গ। দুর্গাপ্রসাদ যার কথা বললেন সে ছিলো একটা মহা ধড়িবাজ হিন্দু। সীমান্তের কাছাকাছি তার বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও সে দেশ ছেড়ে ওপারে যায়নি। তার পরিবারের অন্য সবাই অবশ্যি চলে গিয়েছিলো। সে এখানে থেকে 'যথারীতি' ইসলাম গ্রহণ করলো, মাথায় টুপি পরে 'পাক্কা মুসলমান' হয়ে গেলো। তারপর শুরু করলো পাকসেনাদের ক্যাম্পে যাতায়াত। ওদের অফিসারদের সঙ্গে তার গড়ে উঠলো রীতিমতো মহব্বতের সম্পর্ক। তার এই মিলিটারি ক্যাম্পে যাতায়াত আর অফিসারদের সঙ্গে দহরম মহরম সাধারণের চোখে তাকে ক্ষমতাধর করে তুললো। সেই ক্ষমতার সে ব্যবহার করলো পুরোদমে। দালালদের মধ্যে সে অনেক উঁচু পজিশন পেলো। তাই নিচু পর্যায়ের দালালরা তাকে রীতিমতো ভয় করতো এবং তাকে লুটপাটের ভাগ দিতো। নিজের ক্ষমতাকে এভাবে সংহত করে নেয়ার পর এই নও-মুসলিমটি আরো এক কদম এগিয়ে গেলো। মসজিদের যে ইমামের হাতে সে মুসলমান সেজেছিলো, সেই ইমামেরই সুন্দরী কন্যাকে তার শাদি করার খায়েশ হলো। সেই খায়েশের কথাই সে ব্যক্ত করলো মিলিটারি ক্যাম্পের কর্তাদের কাছে। কর্তারা সানন্দে তার খায়েশ পূরণের সাহায্যে এগিয়ে এলো, তার কাছে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে ইমামের ওপর চাপ সৃষ্টি করলো। নিজে মুসলমান বানালেও ইমাম সাহেবের কাছে ওই নও মুসলিমটির খাসলত তো আর অজানা ছিলো না। তাই, সজ্ঞানে তিনি কিছুতেই ওই ইবলিসের হাতে আপন কন্যাকে তুলে দিতে পারেন না। অথচ, না দিলে মিলিটারির হাত থেকে তাঁর রক্ষা নেই। অগত্যা বাড়িঘর ছেড়ে কন্যার হাত ধরে ইমাম সাহেবের পলায়ন এবং দেশের অভ্যন্তরে নানা স্থানে শঙ্কিত অবস্থান।

এমনই দাপট দেখিয়ে ছিলো এই 'হিন্দু রাজাকার'।

দুর্গাপ্রসাদ তেওয়ারির মুখে এই গল্পটি শুনতে শুনতে আমি অনেক কথা ভাবছিলাম। যে লোকটি পাকহানাদার কবলিত বাংলাদেশের ভেতরে থেকে এমন দাপটে রাজাকারি করছে, তারই সমচরিত্রের কতকগুলো লোককে তো আমি সীমান্তের ওপারেও দেখেছি। ওরাও সেখানে এক ধরনের রাজাকারিই করেছে। রাজাকার শব্দটির আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ এর এমন একটি অনুষঙ্গ তৈরি করে দিয়েছে যে, শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে কতকগুলো স্বজাতিদ্রোহীর চেহারা ভেসে ওঠে। কিন্তু স্বজাতিদ্রোহিতা কি কেবল এপারে যারা ছিলো তারাই করেছে? ওপারে যারা গিয়েছিলো তারা কি সবাই ছিলো ধোয়া তুলসী পাতা? সেখানে গিয়ে পাকহানাদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করার সুযোগ অবশ্যি তাদের ছিলো না। তবু, অন্যরকমে ওরা স্বজাতির মানুষদের ওপর কম উপদ্রব করেনি। ওদেরই বা রাজাকার বলবো না কেনো?

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বাঘমারা শরণার্থী শিবিরে এরকম অনেক রাজাকারি কার্যকলাপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এদের মধ্যে মুসলমানও অবশ্যই ছিলো কিছু কিছু, তবে অধিকাংশ ছিলো হিন্দু। বলতে পারি 'হিন্দু রাজাকার'। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃপদে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধটাকে একেবারে ভেতর থেকে নস্যাৎ করে দেয়ার লক্ষে খন্দকার মোশতাক বা মাহবুবুল আলম চাষীরা হয়েছিলো উঁচুদরের রাজাকার। আমি যাদের হিন্দু রাজাকার বলছি তারা যদিও ছিলো অন্য ধরনের—এবং নিতান্তই ছ্যাঁচড়া—তবু, দাপট তাদের কম ছিলো না। আমি যাদের দেখেছি তারা দাপট খাটাতো বাঘমারায় নিরীহ শরণার্থীদের ওপর।

পরিবার-পরিজন নিয়ে শরণার্থী শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো, শিবির ছেড়ে তাদের বাইরে কোথাও গিয়ে বসবাস করার অনুমতি ছিলো না। ভারতের অভ্যন্তর থেকে কোনো

আত্মীয়-স্বজন এসে অবশ্যি তাদের নিয়ে যেতে পারতো, তবে সে ক্ষেত্রে ছিলো বেশ কিছু শর্ত। বাঘমারা থানায় গিয়ে শরণার্থীর আত্মীয়কে একটি অঙ্গীকারনামায় সই করে আসতে হতো। সে অঙ্গীকারনামায় লেখা থাকতো যে নিজ দায়িত্বে তিনি তাকে শরণার্থী শিবির থেকে নিয়ে যাচ্ছেন, এই আত্মীয়ের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ তিনিই করবেন, কোন সরকারি সাহায্যের দাবি করতে পারবেন না। শিবিরত্যাগী শরণার্থীকেও অনুরূপভাবে অঙ্গীকার করতে হতো যে ভারতের অভ্যন্তরে গিয়ে তিনি কোনো সরকারি সাহায্য গ্রহণ করবেন না।

শিবির ত্যাগের এই প্রক্রিয়াটিতে খুব একটা জটিলতা থাকার কথা নয়। কিন্তু দেখলাম, সেখানেও কৃত্রিম জটিলতা তৈরি করে নিয়েছে যারা তারাও শরণার্থী শিবিরের আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালিই। দেশে যারা থানা-পুলিশের 'টাউট' ছিলো, বিভিন্ন অফিস-আদালতের দুর্নীতিবাজ কর্মচারিদের সঙ্গে যোগসাজশে টু পাইস বাগিয়ে নেয়াই ছিলো যাদের পেশা, দেশের বাইরে গিয়েও নতুন করে সেই পেশাটিই তারা জুটিয়ে নিলো। বাঘমারা থানার সামনে টুল পেতে বসে যাওয়া এই টাউটদের দেখে আমার চোখের সামনে আমাদের দেশের আদালত ভবনের সামনেকার বটতলা কিংবা সাবরেজিস্ট্রি অফিসের বারান্দার দৃশ্যটিই ভেসে উঠতো। সেই একই লোকজন। একই প্রক্রিয়া। বাঘমারা শরণার্থী শিবিরে এক লাখেরও বেশি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিলো। এরা ছিলো মূলত আমাদের নেত্রকোনা এলাকার অধিবাসী। অধিকাংশই কৃষক পরিবারের মানুষ। তাদের যেসব আত্মীয়-স্বজন পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন সময়ে বাস্তুত্যাগ করে ভারতের নাগরিক হয়েছে তারাও নিরক্ষর বা প্রায়-নিরক্ষর কৃষিজীবীই। দুপক্ষের মানুষগুলোই নিতান্ত সরল। অঙ্গীকার পত্রের ফরমটি কোথায় পাওয়া যাবে, কিভাবে তা পূরণ করতে হবে, থানায় কার কাছে তা নিয়ে যেতে হবে, কি বলতে হবে—কিছুই জানে না। তাই তারা সহজ শিকার হয় থানার সামনে বসা টাউটদের, যাদের আচরণ রাজাকারদের চেয়ে কম ন্যক্কারজনক নয়। শিবির-ত্যাগেচ্ছু লোকটিকে ও তার ভারতবাসী আত্মীয়টিকে সে নানা অবান্তর ও উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে প্রথমেই ঘাবড়িয়ে দেয়। তারপর নানা ধমক-ধামক দিয়ে তাদের আরো কাবু করে ফেলে। এরপর সেই টাউটকে তার দাবি অনুসারে অর্থ দিতে পারলেই ওই বেচারা শরণার্থীটি থানা থেকে ছাড়পত্র পাবে, নতুবা নয়। শেষ পর্যন্ত যারা শিবির ছেড়ে কোনো আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে যেতে না পেরেছে তাদেরও ওই টাউটদের হাতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। ওদের খুশি না করতে পারলে নিয়মিত রেশন পাওয়া যায় না, তাবুর জন্যে সরকারের বরাদ্দ করা ত্রিপল কিংবা রিলিফের কম্বলও ভাগে পড়ে না। অসহায় ও সর্বস্বহারা অনেক শরণার্থীর বধূ ও কন্যাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথাও কানে এসেছে। এবং এ ক্ষেত্রেও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে শরণার্থীদের স্বদেশীয় স্বজাতি ওই এসেছে। এবং এ ক্ষেত্রেও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে শরণার্থীদের স্বদেশীয় স্বজাতি ওই টাউটেরা। এক রাজাকারের ভয়ে দেশ ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরেও অন্য রাজাকার-প্রতিম টাউটেরা। এক রাজাকারের ভয়ে দেশ ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরেও অন্য রাজাকারদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি।

ভারতের অন্যান্য শিবিরগুলোতে শরণার্থীরা কি অবস্থায় দিন কাটিয়েছিলো জানি না। কিন্তু বাঘমারাতে যা দেখেছি তা একান্তই করুণ ও ভয়াবহ। বাঘমারার স্থায়ী বাসিন্দারা গারো উপজাতির লোক। এই স্থানীয়দের সংখ্যা যা, শরণার্থী সমাবেশ ঘটেছিলো তার অন্তত দশগুণ। বিপুল সংখ্যক বহিরাগতের চাপে স্থানীয় গারোদের তখন কোণঠাসা অবস্থা। গারোদের ভয় হচ্ছিলো এরা না আবার স্থায়ীভাবে ওখানেই থেকে যায়। সেই ভয়ের দরুণই বাঙালি শরণার্থীদের তারা সহজভাবে নিতে পারেনি। দুয়ের মধ্যে তখন গড়ে উঠেছিল বিশ্বাসের বদলে

সন্দেহ। সহযোগিতার বদলে বৈরিতার সম্পর্ক। মৃতদের নিয়েই হতো শরণার্থী হিন্দুদের সবচেয়ে করুণ দশা। বাঘমারায় কোনো শ্মশান ছিলো না। গারোরা তাদের এলাকায় কোনো মৃতদেহ দাহ করতে দিতো না। শরণার্থী পরিবারের কারো মৃত্যু হলে সেই মৃতদেহ কাঁধে করে বয়ে নিতে হতো বাংলাদেশ সীমানায়। সেখানেও সেই যুদ্ধের আতংকের দিনগুলোতে, কোন মৃতদেহ দাহ করা সম্ভব ছিলো না। মুখে একটু আগুন ছুঁইয়ে কোনো রকমে হিন্দু আচারের মর্যাদা রক্ষা করে সেই মরদেহকে নদীর চরে সামান্য বালির নিচে চাপা দিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হতো। আর পরক্ষণেই মহানন্দে ভোজ শুরু করতো বুনো শিয়ালের দল। বাঙালির মাংস খেয়ে খেয়ে শিয়ালগুলো হয়ে উঠেছিলো অস্বাভাবিক মোটা তাজা।

বাঘমারায় বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রায় মিলতোই না। পাহাড়ি ঝর্ণার দূষিত জল যারা সিদ্ধ করে খেতো তারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু সবসময় জল সিদ্ধ করে খাওয়া বেশিরভাগ শরণার্থীর পক্ষেই সম্ভব হতো না। সামান্য জ্বালানি কিনে আনার পয়সাও তাদের ছিলো না। তাই সেই শিবিরে পেটের পীড়ার চলছিলো সার্বক্ষণিক মহামারী। প্রতিদিনই প্রায় প্রতি পরিবারেই কেউ-না-কেউ মারা যেতো। কোনো কোনো পরিবারে শেষ পর্যন্ত একটি মানুষও জীবিত থাকেনি, একজনও স্বাধীন স্বদেশভূমি দেখে যেতে পারেনি। মৃত্যুটা সেখানে এমন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলো যে, একই ঘরে বাস করছে যে দুটো পরিবার তার একটির একজন শিশু বা যুবক বা বৃদ্ধ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে, সন্তানহারা মা কিংবা স্বামীহারা স্ত্রী কিংবা পিতৃহারা সন্তানের বুকফাটা কান্নার রোল আকাশ ভেদ করছে। অথচ সেই ঘরেরই অন্য পাশে শুয়ে থাকা অন্য পরিবারটির কেউ মাথা তুলে তাকিয়েও দেখছে না। অবিরাম মৃত্যু দেখতে দেখতে সকলে যেন অনুভূতিশূন্য পাথর হয়ে গেছে।

পেটের পীড়ায় যারা মরেনি তারাও জীবিত থেকেছে সারা শরীরে যন্ত্রণাকর খোশ পাচড়া নিয়ে। আর সেই সঙ্গে ক্ষুধার জ্বালা। ভারত সরকার প্রতিটি শরণার্থীর প্রতিদিনের জন্যে যে পরিমাণ চাল-ডাল-আটা বরাদ্দ করেছিলেন তাতে ক্ষুধার জ্বালা না মেটার কোনো কারণ ছিলো না। কিন্তু বাঘমারা ক্যাম্পে নিয়মিত সেই বরাদ্দ এসে পৌছুতো না। সে সময়েও মেঘালয়ের পাহাড়ি রাস্তাগুলো মালবাহী যানবাহনের জন্যে খুব সুগম ছিলো না, বিশেষ করে ভারি বৃষ্টি হলে তো সেগুলো একান্ত বিপজ্জনকই হয়ে উঠতো। তাই এক সপ্তাহ রেশন পাওয়া গেলো তো আর এক বা দেড় সপ্তাহ বন্ধ। বিনামূল্যের রেশন বন্ধ থাকলে বাজার থেকে চাল-আটা কিনে খাওয়ার সামর্থ খুব কম শরণার্থী পরিবারেরই ছিলো। ক্ষুধা আর মৃত্যু তাদের জন্যে হয়ে উঠেছিলো অপ্রতিরোধ্য।

দু'ভাইয়ে মিলে কিছু নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম বলে আমরা তো অন্যের তুলনায় অনেক স্বচ্ছন্দেই ছিলাম। সব সময় ফুটানো জল খেতাম, তাই পেটের পীড়ার কবলে পড়িনি।

ছোট মামা কুচবিহার থেকে চিঠি লিখেছিলেন যে তিনি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাঘমারায় আসবেন। চিঠির উত্তরে তাঁকে আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম। আমরা যদিও মেঘালয় ছেড়ে আর কোথাও যাইনি, তবু সেখানেই ভারতের বিভিন্ন জায়গার অনেক লোকের দেখা পেয়েছিলাম। আত্মীয়-শরণার্থীদের নিয়ে যেতে যাঁরা এসেছেন—বিশেষ করে মধ্যবিত্তশ্রেণীর চাকুরিজীবী বা পেশাজীবী—তাঁদের অনেকেই আমাদের বাঁশের ঘরটিতে এসে বসেছেন। প্রায় সারাদিন এখানে আড্ডা লেগেই থাকতো।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতমানস

বাঘমারা শরণার্থী শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষক সমাজের মানুষ হলেও মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবারের মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম ছিলো না। এদেরই আত্মীয়-স্বজনরা কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গা থেকে বাঘমারায় আসতেন। শিবির থেকে শরণার্থী আত্মীয়দের নিয়ে যাওয়ার অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্যে এই শিক্ষিত মানুষদের অবশ্যি টাউটদের খপ্পরে পড়তে হয়নি। তারা থানা থেকে নিজেরাই ফরম সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন এবং এদের অনেকেই আমার ঘরে বসে ফরম পূরণ করতেন। বাঘমারায় চা পাওয়া যেতো বেশ শস্তায়। কাজেই এদের চা পানে আপ্যায়িত করতে আমার খুব অসুবিধে হতো না। চা খেতে খেতে চলতো গল্প গুজব। সব গল্পই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শুরু হয়ে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছড়িয়ে পড়তো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, ভারত সরকারের নীতি কৌশল, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন ও অসমর্থনের প্রকৃতি এসব বিষয়ের পাশাপাশি দেশি বিদেশি রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির কোনো প্রসঙ্গই বাদ যেতো না। শিল্পসাহিত্যের কথাও উঠে পড়তো।

শরণার্থী শিবিরে আগন্তুক পশ্চিমবঙ্গের এই ভদ্রলোকেরা সকলে অবশ্যই অভিন্ন দলমতের অনুসারী ছিলেন না। তাই একই বিষয়ের ব্যাখ্যাতেও তাঁদের ছিলো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কারো ছিলো আন্তরিক সমর্থন, এর প্রতি একান্ত বিদ্বিষ্টও ছিলেন কেউ কেউ। এরা সবাই তো এক সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়েই ভারতে গিয়েছেন, এখনো তাদের গা থেকে 'রিফিউজি'র ছাপটি মুছে যায়নি। জন্মভূমির প্রতি টান এদের একটুও কমেনি, আবার দেশত্যাগের পূর্বেকার তিক্ত স্মৃতিগুলোও এরা ভুলতে পারছেন না। এইসব কারণে এদের চিন্তায় বড়ো জটিলতা। এদের কারো কারো মস্তিষ্ককোষ প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক ভাবনায় আচ্ছন্ন, মুসলিম-বিদ্বেষে ভরপুর। কী ধরনের অত্যাচার উৎপীড়নের মুখে বাড়িঘর সহায় সম্পদ ফেলে রেখে তাঁরা দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে সব কথা অত্যন্ত ঝাঁঝের সঙ্গে স্মরণ করেন আর বলেন, 'মুসলমানদের হাড়ে হাড়ে হিন্দুবিদ্বেষ, ওরা পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে আসবে না কখনো। ওই সব মুক্তিযুদ্ধ টুদ্ধ কিছুই না। কিছু চ্যাংড়া পোলাপানের হুজুগ, দু'চার দিন পরই সব শেষ হয়ে যাবে। তখন আবার সেই মুসলমানে মুসলমানে ভাই ভাই।'

কেউ কেউ আবার এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভারত-গৌরবে একেবারে ফেটে পড়তেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিতে চাইতেন। গলা চড়িয়ে বলতেন, 'ভারত হচ্ছে একটি মহান দেশ। তাই মানবতার খাতিরেই ভারত পূর্বপাকিস্তানের মানুষদের বিপদের সময় সাহায্য দিচ্ছে। ওদের রাজনীতিকরাও এদেশের বুকে বসে সেদেশের রাজনীতি করছে। ভারত আছে বলেই না ওদের মুক্তিযুদ্ধের যতো সব বড়ফট্টাই। আজ ভারত ওদের সাহায্য বন্ধ করে দিক, তখন কোথায় থাকবে ওদের ওই মুক্তিযুদ্ধ? তখন বুঝবে কতো ধানে কতো চাল।'

বাঘমারার শরণার্থী শিবিরে বসে শোনা এদের এ রকম কথার সঙ্গে আমি সে সময়কার পাকিস্তান সরকারের বক্তব্যের অনেক মিল খুঁজে পেতাম। তফাৎটা কেবল এই যে পাকিস্তান এসব বলতো ভারতকে গালাগালি করে, আর এরা বলতেন ভারতগৌরবে গদগদ হয়ে।

উভয়ের কাছেই বাংলাদেশের মানুষের আবেগ, উপলব্ধি, সংগ্রাম, আত্মদান এ সব ছিলো মূল্যহীন।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কোনো এক হিন্দিভাষী রাজ্য থেকে এক ভদ্রলোক তার আত্মীয়কে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। একটা সবজান্তা ভাব নিয়ে তিনি কথা বলেন। তার কথা শুনে মনে হয়, ভারত সরকার তার সঙ্গে পরামর্শ করে কোনো কাজ করে না বলে কেবলই ভুল করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারেও তাই। মুখে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'দেখলাম তো আপনাদের ওই মুক্তিযোদ্ধাদের চেহারা। একেক জন তালপাতার সেপাই। মালকোচা দিয়ে লুঙ্গি পরে তারা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। হু। যুদ্ধ করা এতোই সোজা। হুড়মুড় করে কতোকগুলো লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে ইন্ডিয়াতে ঢুকে পড়লো। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এদের আশ্রয় দিলো, খাবার দিলো। এই তো যথেষ্ট ছিলো। এর ওপর আবার এই উটকো ঝামেলা কাঁধে তুলে নেয়া কেন? স্বাধীন বাংলা টাংলা কিছু হবে না। মাঝখান থেকে ইন্ডিয়া পড়বে বিপাকে।'

কিছু কিছু লোক এ ধরনের সিনিক কথাবার্তা বললেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণকারী মানুষেরাই ছিলো সংখ্যায় ভারি। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের জন্যে ছিলো একটা আবেগাপ্লুত সহমর্মিতা। সে সহমর্মিতার মূল উৎস ছিলো বাঙালিত্ব। বাঙালিদের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সব কাজ কর্ম চলবে বাংলায়, আবহমান বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির ধারক বাহক হবে সেই রাষ্ট্রটি—এ রকম একটি সম্ভাবনা সকল বাঙালির বুকে শিহরণ জাগাতো। যে বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা অর্থাৎ 'ঘটি' নামে পরিচিত, আর 'বাঙাল' নামধারী যে বাঙালিরা এক কালের পূর্বপাকিস্তান থেকে রিফিউজি হয়ে গিয়ে ভারতের নাগরিক হয়েছে, 'জয়বাংলা' ধ্বনি এরকম সব বাঙালিরই কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মরমে প্রবেশ করে তাদের মন প্রাণ আকুল করে তুলেছিলো। সেই আকুলতা নিয়েই তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো। বহুজাতিক রাষ্ট্র ভারতের অন্য অন্য জাতির লোকেরাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিলো বটে, কিন্তু তাদের সে সমর্থনের পেছনে ছিলো বৌদ্ধিক যৌক্তিক রাজনৈতিক ও মানবিক বিবেচনা। তাদের হৃদয়ে বাঙালি জাতির মানুষদের মতো এমন উথালপাথাল করা আবেগ ছিলো না। না থাকাটাই স্বাভাবিক। আর যারা সে সময়ে ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিলেন, তারা? তারা যে সেদিন আবেগের তোড়ে ভেসে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন, তেমন তো নিশ্চয়ই নয়। আবেগ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার রাজনীতি চলে না।

তবু যে ভারতের শাসক ও শাসক শ্রেণীর মানুষেরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিলেন, সেও তো দিবালোকের মতো সত্য। ওই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বাঙালি আর ক'জন ছিলেন, সিংহভাগই তো অবাঙালি। এদের সমর্থনের পেছনে যা সক্রিয় ছিলো তা জাতীয় আবেগ নয়, তা হচ্ছে তাদের শ্রেণী ও শ্রেণীরাষ্ট্রের স্বার্থ। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দেয়া মানে পাকিস্তানের মাজা ভেঙে দেয়া। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের মাজা ভেঙে যাওয়া অবশ্যই ভারতের সামগ্রিক স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থনটা তো দেয়া হচ্ছে একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি। অথচ সেই বাঙালি জাতিরই একটি বড়ো অংশ আছে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। পাকিস্তানের শাসনাধীন

বাঙালিদের স্বাধীনতা লাভের অধিকার যদি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জন্যে তা হবে না কেন? ভারতীয় বাঙালিরা যদিও স্বাধীনতার দাবি তোলেনি, তবু যে দুর্দমনীয় আবেগ নিয়ে তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, সেই আবেগ যে সেখানেই আটকে থাকবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

এ বিষয়টি নিয়েও ভারতের শাসক শ্রেণী গভীরভাবে ভেবেছে, এর বিভিন্ন দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। তবে ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখেও সে সময়কার বর্তমানটিকে বাস্তবতার নিরিখে বিচার করে, অনেক যোগ বিয়োগের অঙ্ক কষে, তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সফল হতে দেয়াটাকেই তাদের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল বলে বুঝে নিয়েছে। একাত্তরে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের আবেগ যে উত্তুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছেছিলো তার বিরুদ্ধ স্রোতে গেলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে সম্পূর্ণ বিপদ দেখা দিতো। এমনকি বাঙালি জনউত্থানে ভারতের অখণ্ডতাই বিপর্যস্ত হয়ে যেতো, সে সময়কার সরকারি নীতি নির্ধারণে এ বিবেচনাটিও বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলো। শাসকগোষ্ঠীর বাইরে যাদের অবস্থান তাদেরও ছিলো নিজ নিজ বিবেচনা। কেউ কেউ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে একটি বর্বর ও অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিপীড়িত একটি গোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম হিসেবে দেখেছেন। ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলো যে কোনোভাবে মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তানকে খণ্ডিত ও বিপর্যস্ত দেখতে পারলেই খুশি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তাদেরও সমর্থন পেয়েছে। ভারতের বণিকরা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশকে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের অনুকূল বলেই ভেবেছে। বামপন্থীদের মধ্যে নানান ধারা থাকলেও, এই বুর্জোয়া নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সফল হতে পারে না বলে এদের কেউ কেউ তাত্ত্বিক বক্তব্য দিলেও, বামপন্থী কোনো গোষ্ঠীই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করেনি। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিআই) তো আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধের দৃষ্টিতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছে, এবং একে সফল করে তোলার জন্যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অর্থাৎ যার যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেই ভারতের নাগরিকদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছে, এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে একটি জাতীয় ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। এরই ফলে ভারতের সাধারণ মানুষও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে অনেক স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ করেছে, অতিরিক্ত করের বোঝা হাসিমুখে বহন করেছে। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকদের রক্ত বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে, পনেরো ষোল হাজার ভারতীয় সেনা আমাদেরই মুক্তির সোপানতলে আত্মবলি দান করেছে। ভারতের সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী তাদের শ্রেণী ও শ্রেণীরাষ্ট্রের স্বার্থেই আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিয়েছিলো নিশ্চিত, তবে এ কথাও তো সত্য যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থ সেদিন একবিন্দুতে মিলে গিয়েছিলো বলেই আমরা তাদের এ রকম সহযোগিতা পেয়েছিলাম ও নিয়েছিলাম।

তবু, একাত্তরেও দেখা গেছে যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষক্রিয়া সারা উপমহাদেশকেই কোনো-না-কোনো ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ এ ভূখণ্ডের মানুষের চেতনার জগতে এমনই বিকৃতি ঘটিয়ে রেখে গেছে যে, সে-বিকৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান থেকে মনুষ্যত্বের সুস্থ বিকাশকেই রুদ্ধ করে দিচ্ছে। পাকিস্তানের হিন্দুদের ভেতর এই

শাহবাগ, ঢাকা।

বিকৃতির দুষ্টক্ষত যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও। রাজনীতি-সচেতন বা প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত মুসলমানদের কথা বলছি না। বলছি ভারতের 'অ্যাভারেজ' মুসলমানদের কথা। ওই মুসলমানদের মনে পাকিস্তান সম্বন্ধে আছে একটা অব্যক্ত আবেগ। দ্বিজাতিতত্ত্ব-ভিত্তিক দেশ বিভাগই তাদের সেই আবেগ সৃষ্টি করে রেখে গেছে। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থান যেমন ছিলো নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষিত ভারতে মুসলমানদের অবস্থানেও খুব একটা ইতরবিশেষ ছিলো না। হিন্দুরা যে সংখ্যায় পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে গেছে, ভারতত্যাগী মুসলমানের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম নিশ্চয়ই। তবু বাস্তবে ভারতে বাস করেও অনেক মুসলমানেরই মানসিক আশ্রয় ছিলো পাকিস্তান। তাদের এ রকম একটি মানসিক আশ্রয়কে যারা ভেঙে দিচ্ছে সেই বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তারা প্রসন্ন ছিলো না। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের 'মুসলমান' পরিচয়ও তাদের অপ্রসন্নতাকে দূর করতে পারেনি। ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মুক্তিযোদ্ধাই তাদের চোখে ছিলো ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সহযোগী। বাংলাদেশের শরণার্থী বা মুক্তিযোদ্ধা মুসলমানদের যারা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন তারা অনেকেই ভারতীয় মুসলিম মানসের এ রকম পরিচয় পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী তো আমাদের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও *ইনসাফ* নাম দিয়ে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে। সে পত্রিকার মারফৎ তারা শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছে, এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রশস্তি পেয়েছে।

মেঘালয়ে বসেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশের এ রকম মানস প্রতিবন্ধের কথা শুনে দুঃখ পেয়েছি অবশ্যই। তবে অবাক হইনি। কিংবা এ জন্যে ভারতীয় মুসলমানদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেও আমার মন সায় দেয়নি। কারণ ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভেতর মানস প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হওয়ার বাস্তব কারণগুলোকে তো কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত হিন্দুদের যে মানস প্রবণতার প্রকাশ দেখেছি তাকেও সঙ্গত বলে মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তবু এ রকম মানস প্রবণতা গড়ে ওঠার বাস্তব পটভূমির দিক থেকেই বা চোখ ফিরিয়ে থাকি কী করে?

দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা ও বাড়তে থাকা সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গিকে একাত্তরের সেই উপপ্লবের দিনগুলোকেও সকলে পরিহার করতে পারেনি। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা আলবদর রাজাকার শান্তি কমিটির হয়ে পাক বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধাদের যেমন আঘাত হানছিলো, তেমনি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মুক্তি শিবিরের অভ্যন্তরেই এক অদ্ভুত ও বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বাঙালিই ছিলো। কোন সম্প্রদায়ের ক'জন যোগ দিলো এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি সেদিন। এর পরও কিছু কথা থেকে যায়। সর্বজনজ্ঞাত কারণেই শরণার্থীদের মধ্যে হিন্দুরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং তারা মূলত শরণার্থী হয়েই ভারতে গিয়েছিলো, যেতে বাধ্য হয়েছিলো। অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলমান, বিশেষ করে তরুণরা, দেশত্যাগ করেছিলো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার সচেতন ও সক্রিয় উদ্দেশ্য নিয়েই। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলো যে সব হিন্দু তরুণ তাদের একটা বড়ো অংশই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার ব্যাপারে গরজ করেনি। যদিও যোদ্ধা

হওয়ার শারীরিক ও অন্যবিধ যোগ্যতা এদের প্রায় সবারই ছিলো। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার বদলে এদেরই দু'চার জন বরং ভারতে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার মতলব এঁটেছে, কিংবা মুক্তিযুদ্ধ যদি সফলই হয়ে যায় তবে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে নিকট বা দূর অতীতের কোনো অত্যাচার উৎপীড়নের বদলা কার ওপর কীভাবে নেবে তারই দিবাস্বপ্ন দেখেছে, নানা চাপের মুখে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া জমি বা অন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেরৎ আনার প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছে। অনেকে নিজে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখেও দর্প করে বলেছে, 'এইবার মুসলমানরা বুঝুক আমাদের হিন্দুদের দেশে না এসে তারাও পার পায় না। যুদ্ধটা তো আমরাই করছি। আমাদের ইন্দিরা গান্ধী ওদের খাবার দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে, ট্রেনিং দিয়েছে—তবেই না মুক্তিযোদ্ধা নাম নিয়ে ওদের এতো চিকনাই।' বোঝা যায় চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তান থেকে যারা হিন্দুস্থানের চর বা দালালের অপবাদ শুনে এসেছে, বার বার যাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে হিন্দু বলে হিন্দুস্থানই তাদের আপন দেশ, তাদেরই এক অংশের অসুস্থ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে এ ধরনের মূঢ় বক্তব্যে। এরকম বক্তব্য তারা যে শুধু ঘরোয়া বা পারিবারিক পরিবেশে একান্ত নিভৃত সংলাপে উচ্চারণ করেছে, তা নয়। মুক্তিযুদ্ধের অনেক নেতা বা নেতৃস্থানীয় কর্মীকে সামনাসামনি এ সব কথা ক্ষোভ ক্রোধ বা বিদ্রূপের সঙ্গে শুনিয়ে দিয়েছে, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্র অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। কিছু সংখ্যক সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত হিন্দুর এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কথা বা আচরণ হয়তো মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উত্তেজিত করে সেদিনকার মুক্তিসংগ্রামে বিপর্যয়েরও সৃষ্টি করতে পারতো। আমাদের সৌভাগ্য যে, তেমনটি ঘটেনি। কারণ বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ঐক্যতানের সুর অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিলো, সেখানে দু'চারটি বেসুরো আওয়াজ এর সামগ্রিকতার তাল কেটে দিতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবদান

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সরকারসহ বিভিন্ন মহলের সহায়তার কথা অবশ্যই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণযোগ্য। তবে সরকারের বাইরে যে সংগঠিত শক্তিটির কার্যকর সহায়তার কথা বিশেষ করে স্মরণ না করলেই নয় সেটি হচ্ছে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিআই)। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহযোগিতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সিপিআইয়ের ছিলো খুব বড়ো ধরনের অনুঘটকের ভূমিকা। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধে যেটুকু অবদান রাখতে পেরেছে তারও পেছনে বিশেষভাবে কার্যকর ছিলো সিপিআইয়ের প্রযত্ন। সে-সময়েই সিপিআইয়ের কংগ্রেস (সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। শরণার্থী শিবিরে বসেই সে-কংগ্রেসের বিবরণ শুনেছিলাম কমরেড রবীন রেমার মুখে। কমরেড রেমা ছিলেন মেঘালয় রাজ্যের তুরার সিপিআই জেলা কমিটির সম্পাদক। একাত্তরের সেপ্টেম্বরে কোচিনে অনুষ্ঠিত সিপিআইয়ের পার্টি কংগ্রেসে তিনি প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, সিপিআইয়ের ওই কংগ্রেসে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির আলোচনা যতোটা হয়েছিলো তার চেয়ে কম আলোচিত হয়নি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। এক পর্যায়ে তো এরকমই মনে হয়েছিলো যে, পার্টির ওই কংগ্রেসে মূল এজেন্ডাই যেনো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। অন্য সব কিছু নিতান্তই গৌণ। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম (বারীণ দত্ত) যখন হলে এসে উপস্থিত হলেন তখন কংগ্রেসে আগত সকল প্রতিনিধি উল্লাসে একেবারে ফেটে পড়লেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর যেসব [illegible] যোগ দিয়েছিলেন তারাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংগ্রামী একাত্মতা প্রকাশ করলেন।

এরকম বাইশটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো। এর ফলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল মানুষদের সমর্থনের পথ আরো সুগম হয়েছিলো। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি অবশ্যি দেশে গণহত্যা শুরু হওয়ার বেশ কয়েকদিন আগেই—একাত্তরের চৌদ্দই মার্চে—সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পৃথিবীর প্রায় সব কম্যুনিস্ট পার্টির কাছেই 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়ে' চিঠি দিয়েছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর মে মাসে দিয়েছিলো অনুরূপ আরো একটি চিঠি। সে সময়কার বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা মণি সিংহ লিখেছেন, "আমাদের পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও শান্তির শক্তিসমূহের সমর্থন ও সাহায্য সমাবেশ করার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিলো। আমাদের পার্টি উদ্যোগী হয়ে এপ্রিল মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সহায়তায় তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল বিদেশে পাঠায়। এই দলের সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী (ফেরার পথে দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।) এবং কমিউনিস্ট পার্টির ডা. সারোয়ার আলী। এই 'শান্তি প্রতিনিধি দল' ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। এটাই ছিলো বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধি দল। তখন পর্যন্ত কোলকাতা ছাড়া কোথাও বাংলাদেশের সরকারের মিশন সংগঠিত হয়নি।"

এ-ভাবে গোড়া থেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্যে মস্কোপন্থী বলে পরিচিত বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলো তার পেছনে সিপিআইয়ের ছিলো অতন্দ্র সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা। শুধু তাই নয়। সিপিআইয়ের প্রভাব ভারতের কংগ্রেস সরকারের ওপরও যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকর হয়েছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের যে মৈত্রী চুক্তি একাত্তরের আগস্টে স্বাক্ষরিত হয়েছিলো তার পেছনেও সিপিআইয়ের ভূমিকার গুরুত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তা দানের ব্যাপারে ভারত সরকারকে সাহস জুগিয়েছে, সে-কথাই বা স্বীকার না করবে কোন মূর্খ?

সিপিআইয়ের মতো সিপিএমও অর্থাৎ 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)' ভারতের একটি সংগঠিত ও শক্তিশালী বামপন্থী দল। সিপিএম-এর সাংগঠনিক শক্তি বরং সিপিআই-এর চেয়ে বেশি। অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই। কিন্তু তখনকার শাসকদল ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম-এর মোটেই সদ্ভাব ছিলো না। এক সময়ে পিকিংপন্থী পরিচয়ে সিপিআই থেকে বেরিয়ে এসে এটি পৃথক দলে সংগঠিত হয়। কিন্তু পরে পিকিংয়ের সঙ্গেও এর সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে, এবং দলটির নীতি হয় 'মস্কো-পিকিং থেকে সমদূরত্ব'। এতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তার প্রভাব একেবারেই ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই, সাংগঠনিক দিক দিয়ে যতো শক্তিধরই হোক, ভারতের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে দূরত্ব ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাবহীনতার দরুণ সিপিএম-এর পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুব একটা কার্যকর

সহযোগিতা দেয়া সম্ভব ছিলো না। তবু এ-রকম সীমাবদ্ধতার ভেতরেও সিপিএম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকেনি। আমাদের দেশের পিকিংপন্থী নামে পরিচিত কিছু গ্রুপ (যারা মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে মনে করতো না) সিপিএমের সহায়তা লাভ করেছিলো। পিকিংপন্থী ছাত্রসংগঠন 'পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন' যে ভারতে গিয়ে ভাসানী ন্যাপ ও 'কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের' সমন্বয় কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলো, সেটি সিপিএমের সহায়তা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না।

তবু, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ও ভারতের কংগ্রেসী সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো তার প্রতি সিপিএমের দৃষ্টিটি ছিলো অনেকাংশেই নেতিবাচক। বুর্জোয়া নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সফল হতে পারে না—এ-বক্তব্যটিই তারা জোরের সঙ্গে প্রচার করতো। দলের তরুণ কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে এক রকম নেতিবাদী ভাবনাটাই বেশি পরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিলো বলে মনে হয়।

একবার বাসে চড়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি পথ ধরে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। বাসযাত্রীদের মধ্যে ছিলো অনেকগুলো ভারতীয় বাঙালি তরুণ। ওরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে মেঘালয়েরই কোথায় জানি যাচ্ছিলো। কথাবার্তায় বোঝা গেলো যে ওরা সিপিএম-এর কর্মি। আমার পরিচয় জেনে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি শরণার্থী শিবির ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন না?' আমি 'না' বললে ওদের রীতিমতো বিস্মিত হতে দেখলাম।

'ও, ভাবছেন যে ভারতের ইন্দিরা কংগ্রেসের সহায়তায় আপনারা বাংলাদেশ স্বাধীন করে ফেলবেন, আর সেই স্বাধীন দেশেই ফিরে যাবেন। সোভিয়েতের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয়েছে দেখে আপনারা বোধ হয় স্বাধীনতা পেয়ে গেছেন বলেই মনে করছেন।'

এই বলে একটি তরুণ বাঁকা হাসি হাসতে লাগলো। সে হাসিতে যোগ দিলো অন্য তরুণরাও। এরপর নানা বিদ্রূপাত্মক বাক্যে 'বুর্জোয়া' ভারত ও 'সংশোধনবাদী' সোভিয়েতের তীব্র নিন্দাবাদ করে চললো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে ব্যর্থ হতে বাধ্য সে-বিষয়ে 'অকাট্য' সব প্রমাণ হাজির করতে থাকলো। বাস থেকে নামবার সময় ওদেরই একজন আমাকে উপদেশ দিয়ে গেলো যে আমি যেন ভারতেরই কোথাও কর্মসংস্থানের চেষ্টা করে সেদেশেই থেকে যাই, কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

সংশোধনবাদী বলে পরিচিত সিপিআইয়ের বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেস তথা বুর্জোয়াদের লেজুড় বৃত্তির অভিযোগ তো ভারতের অন্য অন্য বামপন্থী দলগুলোর কাছ থেকে হরহামেশাই শোনা যেতো। সিপিআইয়ের মিত্র বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেও ছিলো একই রকম অভিযোগ। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তাদের মিত্র ও সহযোগী মোজাফফর ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন সবাই বুর্জোয়া আওয়ামী লীগের বি-টিম।

আমাদের যুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েই ভারতের এক শ্রেণীর বামপন্থীরা মিছিলে স্লোগান দিতো—'ইয়াহিয়া-ইন্দিরা এক হ্যায়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ'।

শুনেছি, সিপিআইয়ের বিশ্বনাথ মুখার্জি নাকি এই স্লোগানদাতাদের বলেছিলেন, 'ইয়াহিয়া-ইন্দিরা যে এক, সে তো ইন্দিরার দেশে তোমরা গলা উঁচিয়ে বলছো। এখন ইয়াহিয়ার দেশে গিয়ে ঠিক একই কথা বলে দেখে এসো না কি হয়। তখন বুঝতে পারবে ইয়াহিয়া আর ইন্দিরা এক, না দুই।'

যাই হোক, 'মস্কোপন্থী' বামেরা 'বি-টিম' আখ্যা পেয়েও কিন্তু আওয়ামী লীগের যথেষ্ট আস্থা অর্জন করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের একটা বড়ো অংশই ওদের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়,

রীতিমতো শত্রু বলে মনে করতো। মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই তারা এই শত্রুতার প্রকাশ ঘটাতে থাকে।

বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সমন্বয়ে একটি যৌথ বাহিনী গড়ার প্রস্তুতি মার্চ-এপ্রিলেই নেয়া হয়ে গিয়েছিলো। এই যৌথ বাহিনীর দুই নেতা কমরেড জ্যোতিষ বসু ও কমরেড আলতাব আলী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নেত্রকোনার কলমাকান্দা থানার লেঙ্গুরা হয়ে ভারতের মেঘালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সীমান্তের ওই এলাকাটি তখনই ছিলো মুক্তাঞ্চল। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য-ত্যাগকারী ইপিআরের বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা সেখানে ক্যাম্প তৈরি করে অবস্থান নিয়েছিলেন। প্রশাসন বলতে যা বোঝায় তার কিছু না থাকলেও একজন ইপিআর ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ওই ক্যাম্পটিই তখন সেখানে কর্তৃত্বশীল শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। ওই ক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের কারো কারো ভেতরে ছিলো তীব্র কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষ থেকেই ওরা সীমান্ত-অতিক্রমরত জ্যোতিষ বসু ও আলতাব আলীকে ইপিআর ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিলো। এই দুই ব্যক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী এবং পাকিস্তানের চর—এই অভিযোগ এনে ক্যাম্পেই তাদের 'বিচার' হলো। বিচারে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের 'রায়' দেয়া হলো। সেই রায় হয়তো কার্যকরও হয়ে যেতো। কিন্তু অচিরেই খবরটি লেঙ্গুরার হাজং কৃষকদের মধ্যে পৌছে গিয়ে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। পাকিস্তানের তীব্র দমন-পীড়ন এবং সাম্প্রদায়িক ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী লাগাতার প্রচারের পরও, টঙ্ক ও তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহ্য-লালিত লেঙ্গুরার কৃষকরা কম্যুনিস্ট নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেনি। হাজং কমরেড বিপিন গুণের নেতৃত্বে তারা তীর ধনুক ও বর্শা নিয়ে ক্যাম্প ঘেরাও করে ফেললো, আটক জ্যোতিষ বসু ও আলতাব আলীকে ছিনিয়ে আনতে উদ্যোগী হলো। একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে যাচ্ছিলো প্রায়। তখনই স্থানীয় একজন ডাক্তার মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরই প্রয়াসে জ্যোতিষ বসু ও আলতাব আলী মুক্তি পেলেন। পরিস্থিতি শান্ত হলো।

জ্যোতিষ বসু ও আলতাব আলীর মতো কমরেডগণ সীমান্তের ওপারে গিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, বাম প্রগতিশীল তরুণদের মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করানো খুবই কঠিন। আওয়ামী লীগের কট্টর দক্ষিণপন্থীরা সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতো যে কোনো মতেই যাতে কোনো বামপন্থী তরুণ মুক্তিবাহিনীতে ঢুকে পড়তে না পারে। এর ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্রইউনিয়নের যে সব কর্মী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে ভারতে গিয়েছিলো তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হলো। এ-সব সংগঠনের নেতারা তখন অন্য পথের খোঁজ করতে বাধ্য হলেন।

এ ব্যাপারেও কার্যকর সহযোগিতা পাওয়া গেলো সিপিআইয়ের কাছ থেকেই। তাদেরই সক্রিয় প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টি ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত গেরিলা বাহিনী ভারত সরকারের আনুকূল্য ও ট্রেনিং গ্রহণের সুযোগ পায়। ওই গেরিলা বাহিনীতে পাঁচ হাজার তরুণকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো হয়েছিলো, এবং কম্যুনিস্ট পার্টিরই উদ্যোগে আরো বারো হাজার তরুণ 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনী'তে সংযুক্ত হতে পেরেছিলো। এভাবেই সতেরো হাজার 'মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও যুদ্ধের জন্যে সংগঠিত' করে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট ও বামপন্থী দেশপ্রেমিকরা। মুক্তিযুদ্ধে এদের অবদান সম্পর্কে কমরেড মণি সিংহ বলেছেন—

"আমাদের গেরিলা টিম সকল জেলায় পাঠানো হয়েছিলো। ঢাকার খোদ রাজধানী, নরসিংদি, রায়পুরা, কুমিল্লায়, নোয়াখালিতে, চট্টগ্রামে, রংপুরসহ উত্তরবঙ্গের কয়েকস্থানে

আমাদের টিমগুলো গেরিলা অ্যাকশন করেছে এবং রণক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিয়েছেন। যারা ভারতে যাননি, সেই কমরেডরা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং এরাই ভারত থেকে আগত আমাদের গেরিলাদের অ্যাকশনে সাহায্য করেছেন।...আমরা নিজেরা, বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় সারাদেশে যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধ ছাড়া সংবাদ বহন, রেকি করা প্রভৃতি যুদ্ধের সহায়ক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমাদের কমরেডরা করেছেন। কেবল নিচু পর্যায়ের নয়, উঁচু পর্যায়েও যুদ্ধের সংগঠনে আমাদের ভূমিকা ছিলো। যেমন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বিমান বাহিনী গঠনে আমাদের পার্টির অবদান ছিলো। ছোট খাট গেরিলা অ্যাকশন ছাড়া আমাদের গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি জাহাজ ডুবিয়েছিলো। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে বেতিয়ারা নামক স্থানে আমাদের কমরেড আজাদ, মুনীর প্রমুখ আমাদের গেরিলা বাহিনীর ৯ জন সদস্য পাকবাহিনীর সঙ্গে এক লড়াইয়ে নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে নিহত হন।"

মুক্তিযুদ্ধে সংকট ও সম্ভাবনার জোয়ারভাটা

সেপ্টেম্বর মাসে যখন বাঘ মারা আশ্রয় শিবিরে গিয়ে পৌছাই তখন সেখানে কমরেড মহাদেব সান্যাল আর গঙ্গেশ সরকার বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)-র পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটের ব্যাপারে কর্মরত। এদের সঙ্গে ছিলেন হাজং কমরেড বিপিন গুণ ও প্রফুল্ল। মহাদেব বাবুর মুখে অনেক কথাই শুনলাম। মাস দুই আগে থেকে তিনি বাঘমারায় আছেন। তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করে গেছেন কমরেড মণি সিংহ ও কমরেড খোকা রায়। তাঁরাই তাঁকে পার্টির কিছু দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। যে সব প্রগতিশীল ছাত্র তরুণ সীমান্ত পার হয়ে বাঘমারা আশ্রয় শিবিরে এসে উঠতো তাদের দেখাশোনার ভার পড়েছিলো মহাদেব বাবুর ওপরই। আমি আসার পর তিনি আমাকেও কিছু কাজের ভাগ দিলেন। বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে হঠাৎ করে অনাত্মীয় পরিবেশের মধ্যে পড়ে আমাদের তরুণদের অনেকের ভেতরই একটা অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তার ভাব দেখা দিতো। বামপন্থী ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের কর্মিরাই এ অবস্থার বিশেষ শিকার হতো। তাদের এই বামপন্থী পরিচয়টিই যখন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতো তখন স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষোভ ও হতাশা তাদের আক্রমণ করতো। সে অবস্থায় আমরা তাদের মনোবল চাঙা রাখার চেষ্টা করতাম। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু বামপন্থী ছাত্র তরুণদের জন্যে ন্যাপ কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বাঘমারায় যে ছোট্ট ক্যাম্পটি তৈরি করা হয়েছিলো সেটি ছিলো আমার আর মহাদেব বাবুর ঘরের পাশেই। সেখানে ওই তরুণদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিতাম। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তরুণদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়ার ফলে তারা সহজেই হতাশামুক্ত হতো। এরপর তারা চলে যেতো বারেঙ্গাপাড়ায়। সেখানেই ছিলো কম্যুনিস্ট পার্টি ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ বাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পের মূল দায়িত্বে ছিলেন কমরেড জ্যোতিষ বসু। তার সহযোগী ছিলেন কমরেড অজয় রায় কমরেড মন্মথ দে ও ন্যাপ নেতা আজিজুল ইসলাম খান। আর ছিলেন কাজী আবদুল বারি। মেঘালয়ের সীমান্তে ওই যৌথবাহিনীর আরো দুটো ক্যাম্প ছিলো—একটি চান্দুডুইয়ে ও

আরেকটি সিসিং পাড়ায়। চান্দুভুই ক্যাম্পে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নূর মোহাম্মদ তালুকদারের সহযোগিতায় মূল দায়িত্ব পালন করতেন কমরেড আলতাব আলী, আর সিসিংপাড়ায় প্রদীপ চক্রবর্তী। চান্দুভুই কিংবা সিসিংপাড়ায় আমি যাইনি, বারেঙ্গা পাড়ায় গিয়েছি।

বারেঙ্গা পাড়া থেকেই বাঘমারায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এবং পার্টির বিভিন্ন নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত জানিয়ে যেতেন কমরেড শাহ আবদুল মোতালেব ওরফে সুরুজ মিঞা। মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী ছাত্র তরুণদের যুক্ত করার কাজে আমার দীর্ঘকালের রাজনৈতিক সুহৃদ সুরুজ মিঞার ছিলো অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা। বহুদিন পরে আমার কলেজ জীবনের বন্ধু ফরিদের সঙ্গে দেখা হলো ওই বারেঙ্গাপাড়াতেই। ন্যাপের সক্রিয় কর্মী ফরিদ যৌথবাহিনীতে যোগ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলো। কমরেড রবি নিয়োগী ও কমরেড পরেশ দাসকেও বারেঙ্গাপাড়া ক্যাম্পেই পেয়েছিলাম। আমার ছাত্র ও নাসিরাবাদ কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত সহ সভাপতি আতা এলাহিও সে ক্যাম্পে থেকে কাজ করছিলো। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কম্যুনিস্ট পার্টি ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মী যারাই সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অংশ নিয়েছিলেন তাদের প্রায় সবারই বারেঙ্গাপাড়া ক্যাম্পের সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ওই ক্যাম্পে বসেই মুক্তিযুদ্ধের নাড়ীর গতিটা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপের পাশাপাশি যথার্থ দেশপ্রেমিক আওয়ামী নেতাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআই নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের অবদান, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির টানাপোড়েন, এ সব সম্পর্কে অনেক কথাই বারেঙ্গাপাড়ায় কার্যরত আমাদের কমরেডদের কাছে শুনেছিলাম। অনেক সিপিআই নেতা এই ক্যাম্প পরিদর্শন করতে আসতেন। তাঁদের কাছ থেকেই আমাদের কমরেডরা অনেক অজানা বিষয় অবহিত হতেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যেসব সিপিআই নেতার বিশেষ অবদান ছিলো তাদের অন্যতম ছিলেন ভূপেশ গুপ্ত। নভেম্বরের শেষ দিকে ভূপেশ গুপ্ত বারেঙ্গাপাড়া ক্যাম্প পরিদর্শনে এলে কমরেড জ্যোতিষ বসু ও অন্যরা তার কাছে আমাদের নানা অভাব ও অসুবিধার কথা তুলে ধরেছিলেন। ভূপেশ গুপ্ত এর কয়েকদিন আগেই মস্কোতে গিয়ে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এসেছেন। তিনি বললেন, 'আপনাদের বেশিদিন আর কষ্ট করতে হবে না। শিগগিরই তো দেশে ফিরে যাচ্ছেন।' এবং হলোও তাই। মাত্র সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো।

বারেঙ্গাপাড়াতেই ছিলো ময়মনসিংহের মিন্টু কলেজের প্রিন্সিপাল ও আমার বন্ধু মতিউর রহমানের পরিচালনায় আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্ট শিবিরটিও। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে মতিউর রহমান অসাধারণ দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ছিলেন তরুণ শিক্ষক, বঙ্গবন্ধুর ডাকে সেই তারুণ্যকে তিনি নিবেদন করলেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে এমন একটি ক্যাম্প গড়ে তুলতে তাকে যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়েছে, অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তবে আমার সঙ্গে যখন মতিউর রহমান সাহেবের দেখা তখন তিনি ক্যাম্পে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। তখন তার শ্রম ও কষ্টের ফল ফলেছে। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি সংগঠিত করে চলেছেন।

ময়মনসিংহের অনেক আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গেই মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে আমার দেখা হয়েছিলো। এদের কারো মধ্যে প্রত্যয়ী মনোভঙ্গির প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলাম, কাউকে

দেখেছিলাম একান্ত হতাশ। ময়মনসিংহ শহরে আমার নিকটতম প্রতিবেশী আনিসুর রহমান খান এ্যাডভোকেট সাহেবের দেখা পেয়েছিলাম বাঘমারায়। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো হলেও তরুণের উৎসাহ নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সেদিন তার সঙ্গে আলাপ করে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, আওয়ামী লিগারদের মধ্যে চিন্তার বিভিন্নমুখী স্রোত থাকলেও তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার মোটামুটি একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। বাঘমারা যাবার পথে রংরা নামক একটি জায়গায় কয়েকদিন ছিলাম। সেখানেই দেখা হয়েছিলো ময়মনসিংহের আওয়ামী লীগ নেতা রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, নেত্রকোনার জোবেদ আলী ও ত্রিশালের ইমান আলীর সঙ্গে। রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের একজন। যদিও তিনি সত্তরের নির্বাচনে ময়মনসিংহের নান্দাইল আসনে নুরুল আমিনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, তবু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সেদিন তাকে একজন গণ প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধে ভূঁইয়া সাহেব অত্যন্ত দৃঢ় ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন।

বালালি গ্রামে যে ছাত্র তরুণদের নিয়ে আমি পাঠচক্র গড়ে তুলেছিলাম তাদের প্রায় সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। গিয়াস, মতিন, করিম, মুজিবর—বালালির এসব ছেলেদের বামপন্থী পরিচয়টি খুব প্রগাঢ় হয়ে ওঠেনি বলেই আওয়ামী লীগ পরিচালিত মুক্তিবাহিনীতে রিক্রুটেড হতে কোনো অসুবিধে দেখা দেয়নি। কিন্তু কলেজের তরুণ অধ্যাপক নূরুল হকের পক্ষে তেমনটি সম্ভব ছিলো না। তাকে যেতে হয়েছিলো বারেঙ্গাপাড়ায় কমরেড জ্যোতিষ বসু পরিচালিত ক্যাম্পে। সেখান থেকেই সে বামপন্থীদের যৌথবাহিনীতে যোগ দিয়ে আসামের তেজপুরে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো। সেই হয়েছিলো ওই প্রশিক্ষণার্থীদের টিম লিডার। আমাদের এলাকার বামপন্থী তরুণদের যারা এ সময় কম্যুনিস্ট ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো তাদের অনেকের কথাই এখন আমরা ভুলে গিয়েছি। প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ করে যে ক'টি নাম মনে করতে পেরেছি সেগুলো হচ্ছে—নজরুল ইসলাম খোকন, হান্নান, প্রতাপ দাশ, আবুল হাশেম, শফিকুল ইসলাম, প্রাণেশ, শামসুল আলম তালুকদার, অঞ্জন ভদ্র, ফরিদ, জিন্নাতুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম, ইসমাইল তরফদার, ইশরাত মুজতবা, ওয়ারেস হোসেন, আশুতোষ, লুৎফর রহমান, আশরাফুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, দিলীপ ধর, আবদুল বারি, আবদুল গফুর।

আইয়ুবের সামরিক শাসনে যাকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো, বেত্রাঘাতের ফলে যার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, সেই কাজী আবদুল বারি একাত্তর সনেও জঙ্গী উদ্যম হারিয়ে ফেলেননি। কাজী বারি ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদের আপন ভাগ্নে। মামা ভাগ্নের চেহারা চরিত্রে সাধারণ অনেক মিল থাকে। কিন্তু কাজী বারির সঙ্গে খোন্দকার মোশতাকের চেহারায় কিছু মিল থাকলেও চরিত্র ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজী বারির মতোই খোন্দকার মোশতাকের আরেক ভাগ্নে (অর্থাৎ কাজী বারির খালাতো ভাই)র সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে বাঙলাদেশের স্বাধীনতার অনেক পরে। এই ভদ্রলোকের নাম মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী। পেশায় ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। তিনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর মধ্যেও দেখেছি মামা মোশতাকের চরিত্রের বিপরীত বৈশিষ্ট্যাবলি। মোশতাক খল, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসহন্তা। তার ভাগ্নে মোসলেহ উদ্দিন সরল, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল।

মোসলেহ উদ্দিনের কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তবু তার কথা উল্লেখ করছি মামা ভাগ্নের চরিত্রের বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্যেই। নরাণাং মাতুলক্রমঃ—এরা বোধ হয় এই সংস্কৃত প্রবাদটিকে মিথ্যা করে দিয়েছেন। মামা মোশতাকের মার্কিন প্রীতির কথা তুলে লড়াকু ও নির্যাতিত মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট ভাগ্নে কাজী বারিকে আমরা ক্ষেপাতে চেষ্টা করতাম। তাকে ক্ষেপাতে অবশ্যি পারতাম না, তবে মামার চরিত্রের এমন সব অন্ধকারের কথা ভাগ্নের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো যে শুনে আমরা মূক হয়ে যেতাম। মোশতাককে রাজনৈতিক বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আমরা জানতাম, কিন্তু তার ব্যক্তি চরিত্রের নীচতা ও জটিলতার কথা ভাগ্নে কাজী বারির মুখেই প্রথম শুনি। আবার আশ্চর্যের বিষয় এই, ব্যক্তিগত চরিত্র ও রাজনৈতিক অবস্থানে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর হলেও মোশতাক সাহেব তার এই ভাগ্নেটিকে ভীষণ স্নেহ করতেন। ভাগ্নেও মামার এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়তেন না।

মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় মোশতাক সাহেবের সঙ্গে কাজী বারি একবার দেখা করে এলেন। ক্যাম্পে ফিরে এলে দেখা গেলো তার বেশ দরাজ দিল। বন্ধুদের কাউকে কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন, যখন তখন সিগারেট খাওয়াচ্ছেন। ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করলে একগাল হেসে কাজী বারি বললেন, 'মামার সঙ্গে দেখা হতেই বললাম যে, তুমি তো বরাবরই তোমার স্যাম চাচার দেশ থেকে অনেক টাকা পয়সা পাও। এবার নিশ্চয়ই আরো বেশি পাচ্ছো। এদিকে খুব কষ্টে আমরা ক্যাম্পে দিন কাটাচ্ছি। তোমার ওই ভাণ্ডার থেকে কিছু মালকড়ি ছাড়ো তো আমাদের জন্যে। মামার সঙ্গে আমি সব সময় এভাবেই কথা বলি মামাও তো আমাকে ভালো করেই চেনে। তাই বেশি ঘাটাতে সাহস পায় না। এবারো তার কাছ থেকে কিছু খসালাম।'

সে সময়েই নাকি খোন্দকার মোশতাক কাজী বারিকে বলেছিলেন, 'দেখ, মুক্তিযুদ্ধ বলিস আর যাই বলিস, আমেরিকা ছাড়া কিছু হবে না। ইন্ডিয়াই কি আমেরিকাকে চটিয়ে কিছু করবে নাকি? তোদের রাশিয়া কেবল বড়ো বড়ো কথাই বলবে, আসল কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাই একমাত্র ভরসা।'

খোন্দকার মোশতাকের মার্কিন প্রীতিতে একটুও খাদ ছিলো না। স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েও সেই নিখাদ মার্কিন প্রীতির সুবাদেই যে তিনি ভেতরে ভেতরে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে যাচ্ছিলেন, কাজী আবদুল বারির সে সন্দেহ পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিলো।

একটা খুব জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, মার্কিন মধ্যস্থতায় শিগগিরই পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সঙ্গে একটা আপসরফা হতে যাচ্ছে। কনফেডারেশন ধরনের একটা কিছু হয়তো হয়ে যাবে। এতে ভারতে আশ্রয় নেয়া প্রায় এক কোটি শারণার্থীর দুর্ভোগ দূর হবে, সকলেই দেশে ফিরে যাবে। যুদ্ধ করে পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে কি হারানো সম্ভব? তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, বঙ্গবন্ধুকে তো আমাদের চাই। একটা আপসরফা হয়ে গেলেই বন্দিদশা থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। তা না হলে তাকে যে পাকিস্তানিরা হত্যা করে ফেলবে এতো একেবারে সুনিশ্চিত।

এই রটনার খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। জীবন বাজি রেখে যারা ময়দানে থেকে লড়াই করেছিলো তারা আপস তো দূরের কথা, আপসের সামান্য সম্ভাবনাকে পর্যন্ত বরদাশত করতে রাজি নয়। বারেঙ্গাপাড়া যাওয়ার পথে একটি 'হাইড আউট' ক্যাম্পে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিলো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে। ওদের একজন

ছিলো ময়মনসিংহ এলাকারই ছেলে। আমাকে চিনতে পেরে ওরা সবাই আমার পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। পাকিস্তানের সঙ্গে সত্যি সত্যিই আপস হয়ে যাবে কিনা, ওরা আমার কাছে তাই জানতে চায়। প্রচারিত খবরটির সত্যাসত্য যাচাইয়ের সুযোগ বা ক্ষমতা যে তাদের মতো আমারও নেই, সে কথা তারা নিশ্চয়ই জানে। তবু আমার কাছে প্রশ্নটি উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হলো বিষয়টি নিয়ে কিছু কথা বলে তাদের ভেতরকার ক্ষোভের প্রকাশ ঘটানো। ওদের একজন বলছিলো, 'স্যার, আপসই যদি করে তবে আমাদের নেতাদের আমরা ছেড়ে দেবো না। আগে ওদের গুলি করে পরে নিজেদের বুকেও গুলি চালিয়ে দেবো। পরাধীন দেশে কিছুতেই ফিরে যাবো না।' স্থানীয় পর্যায়ের কিছু নেতার বিরুদ্ধেও দেখলাম তাদের প্রচণ্ড ক্ষোভ। ওদের তীব্র তীক্ষ্ণ কথাবার্তা শুনে ও চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে আমি স্থির নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, কিছু নেতা চাইলেও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। মুক্তিপাগল তরুণদের রুদ্ররোষের আগুনে সব মতলবি আপসের অপপ্রয়াস ছাই হয়ে যাবে।

এ সময়েই আরেকটি গুজবও বাজারে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। আমেরিকা নাকি ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী রাজনীতিকদের সাহায্য করা তোমরা ছেড়ে দাও। তাহলে তারা সবাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হবে, শান্তিপূর্ণভাবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তোমরাও ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে। শরণার্থী যারা এসেছে তাদের অধিকাংশই তো হিন্দু। একটা আপস হয়ে গেলে মুসলমানরা সব দেশে চলে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের বোঝা তো তোমাদের বরাবরই বইতে হয়। এখন যে হিন্দুরা এসেছে তারা যদি দেশে ফিরে না যেতে চায় তো তাদেরও এদেশেই তোমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নাও। এর জন্যে কতো টাকা লাগবে তার একটা হিসাব দাও, মার্কিন সরকার পুরো টাকাটাই তোমাদের হাতে তুলে দিতে রাজি আছে...

এ গুজবটি অবশ্যি খুব বেশি ছড়ায়নি। তবে বাঘমারা শরণার্থী শিবিরে দেখলাম কিছু মানুষের মধ্যে এটি বেশ সমাদর পেয়েছে। বিশেষ করে যে সব হিন্দু পরিবার দেশ ছাড়ার জন্যে কেবলই প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, অথচ কিছুতেই প্রস্তুতি শেষ করে ভিনদেশে গিয়ে বসবাসের ইচ্ছাটি বাস্তব করে তুলতে পারছিলো না, তারা তো মহাখুশি। কিসের মুক্তিযুদ্ধটুদ্ধ। স্বাধীন হলেই দেশে গিয়ে করবোটা কী? তার চেয়ে সত্যি সত্যিই যদি এমনটি হয়, তবে....

যাই হোক, এ রকম গুজবের কোনোটিই সত্য হয়নি, গুজবই থেকে গেছে। মুক্তিযুদ্ধই বরং দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিলো। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যুদ্ধ লেগে যাবে এমন সম্ভাবনাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। রণাঙ্গন থেকে বিজয়ের অসাধারণ সব খবর আসছিলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র' আর 'জল্লাদের দরবার' অনুষ্ঠান দুটো ক্রমেই বেশি বেশি উদ্দীপনাময় হচ্ছিলো। কাজেই হতাশার কারবারিরা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভীরুতার পণ্য আর ফেরি করতে পারছিলো না। সকলে বুঝে নিয়েছিলো, মুক্তি এখন আমাদের দোর গোড়ায়।

'সুতীক্ষ্ণ কৃপাণের প্রতি অজস্র সালাম'

শরণার্থী শিবিরে বসে রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে চলে যেতাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তো প্রায় সব অনুষ্ঠানই শুনতাম। সেই সঙ্গে আকাশ

বাণী, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা। রণাঙ্গনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের একেকটি সাফল্যের সংবাদে আমাদের উদ্দীপনা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। তবে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রেডিওর একটি খবর আমাদের পুরো শিবিরটিকে যেভাবে বিজয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা করে তুলেছিলো, তেমনটি এর আগে কোনো খবরই করতে পারেনি। খবরটি হলো : মুক্তিযোদ্ধার হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনায়েম খানের মৃত্যু। মোনায়েম খান তখন পাদপ্রদীপের সামনে ছিলেন না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় তার কোনো সক্রিয় ভূমিকার কথাও শোনা যায়নি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধাক্কায় গভর্নরের পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে করুণ বিদায় নেবার পর থেকেই তিনি আস্তে আস্তে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। তাই তাকে নিয়ে সাধারণের মধ্যে তখন কোনো কৌতূহল থাকার কথা নয়, ছিলোও না। তবু তার নিহত হবার সংবাদটি স্বদেশের বাইরে শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত মানুষগুলোর চৈতন্যে এমন উৎসাহ ও উল্লাসের জোয়ার বইয়ে দিলো কেন?

আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি যে ইতিমধ্যে তুঙ্গস্পর্শী হয়ে উঠেছে, মোনায়েম খান হত্যার সংবাদটি ছিলো তারই সংকেতবাহী। ঢাকার একটি অভিজাত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছিলেন যে মোনায়েম খান, মুক্তিযোদ্ধারা তাকেই যদি হত্যা করে নিরাপদে চলে আসতে পারে তবে তো মুক্তিযুদ্ধের একজন দুশমনও প্রাণে বাঁচতে পারবে না। কাজেই এরপর আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখবে কোন অপশক্তি? এছাড়া চৌষট্টি থেকে উনসত্তর পর্যন্ত পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুবের সকল অপকর্মের সহযোগী মোনায়েম খানের কথা তার মৃত্যুই মানুষকে চট করে আবার মনে করিয়ে দিয়েছিলো। মোনায়েম খানের শাসনকাল তো খুবই নিকট অতীতের। তাই তাকে এতো তাড়াতাড়ি পুরোপুরি ভুলে যাওয়ারও কথা নয়। ছয়দফা থেকে এগারো দফা পর্যন্ত এদেশের সকল গণআন্দোলন দমনে তার হিংস্রতার কথা সকলের মনের গভীরে তখনো দুঃস্বপ্নের স্মৃতিরূপে বিদ্যমান। সেই স্মৃতিই মোনায়েম-নিধনের সংবাদকে এতো উল্লাস মুখর করে তুলেছিলো।

অক্টোবরের তেরো তারিখে মোনায়েম খানের নিহত হওয়ার সংবাদটির পর মাস দেড়েক ঠিক এ রকম কোনো খবর পাওয়া যায়নি যার মধ্যে এমন মহা উত্তেজনা ও মহা উল্লাসের উপাদান ছিলো। সে সময়ে বরং মুক্তিযোদ্ধা শিবিরের অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও পাকিস্তানের সঙ্গে আপসরফার নানা গুজবই মানুষকে সংশয়ের দোলায় দোলায়িত করে তুলছিলো। এরপর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই সন্দেহ সংশয়ের কুয়াশা কেটে যেতে শুরু করলো। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই শুরু হলো চরম উত্তেজনার পালা। তিন তারিখে যখন সরাসরি পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বেধে গেলো আর ছয় তারিখে ভারত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানালো, শরণার্থীরা তখন উত্তেজনায় একেবারে ফেটে পড়লো, বাঁধন হারা উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতির সংবাদ প্রচারিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঘমারায় শরণার্থীদের এক বিরাট মিছিল পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে। কমরেড মহাদেব সান্যাল আর গঙ্গেশ সরকারই মিছিলটির আয়োজন করেছিলেন। প্রচুর মহিলারও জমায়েত হয়েছিলো। গঙ্গেশদার স্ত্রী আর আমার বোন মায়া শরণার্থী শিবিরের এই দুজন তখন রীতিমতো মহিলা নেত্রী। তাদের দুজনের হাতে দুটো জাতীয় পতাকা—ভারত আর বাংলাদেশের। মিছিলের স্লোগান 'জয় বাংলা' ও 'জয় হিন্দ'। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্যে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক কিছু স্লোগানও ছিলো। কিন্তু বাঘমারার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আপত্তিকর

ঠকলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগানগুলো। এই নিয়ে কিছু বাদ বিতণ্ডা হলো। আগেই লক্ষ করেছি যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্রনীতি যাই হোক, মেঘালয়ের এলিটরা ভীষণ মার্কিন ভক্ত। তাই বাংলাদেশের শরণার্থীদের মিছিলেও মার্কিন বিরোধী স্লোগানে তাদের আপত্তি। বাদ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হঠাৎ করে স্থানীয় একটি লোক মিছিলে মেয়েদের মধ্যে ঢুকে পড়ায় মিছিলটি বিশৃঙ্খল হয়ে গেলো। মিছিলের ওই মেয়েদের প্রায় সবাই ছিলো গ্রাম্য বালিকা ও গৃহবধূ। মিছিলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো, কেউ কেউ চিৎকার করে কেঁদেও উঠলো। থানা থেকে পুলিশও বেরিয়ে এলো। এরই ফাঁকে ধাক্কাধাক্কিতে এক সময় মায়ার হাত থেকে ভারতের জাতীয় পতাকাটি মাটিতে পড়ে যায়। মায়া সেই পতাকাটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয়, তার চিৎকারে কণ্ঠ মেলান বৌদি (গাঙ্গশদার স্ত্রী)। মিছিলে অনুপ্রবেশকারী লোকটি ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে—তাদের তীব্র চিৎকার এই অভিযোগটিরই অভিব্যক্তি ছিলো। সকলকে নিয়ে থানায় গিয়ে মায়া এই অভিযোগটি লিখিতভাবেও পেশ করে। এতে থানার দারোগা পড়ে গেলেন খুবই বিব্রতকর অবস্থায়। জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর। অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে তিনি গ্রেফতার করলেন বটে, কিন্তু এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা যে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করবে, সে কথা ভেবেই তিনি শঙ্কিত হলেন। তাই অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্যে ওই মহিলা নেত্রীদের তিনি রীতিমতো তোয়াজ তোষামোদ করতে শুরু করলেন। যাই হোক, ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত খুব বেশিদূর গড়ায়নি। তবে ছয় তারিখ থেকে পরবর্তী দশদিন আমরা কেবলই উত্তেজনার আগুনে গা গরম করে চলেছি। আবার এরই মধ্যে অনেক হতাশা, অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার খবরও আমাদের শুনতে হয়েছে। শুনেছি বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতির কথা, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন উদ্যোগে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের কথা, এবং সে প্রস্তাবে সোভিয়েত ভেটোর কথা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অনেক দীর্ঘায়িত হবে, বিজয় অবশ্যই বিলম্বিত হবে,—বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই এরকম ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো। শরণার্থী শিবিরে যে কম্যুনিস্টরা ছিলেন তারাও এ ধারণার ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাই বাঘমারা শিবিরেও তরুণদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণে আমরা এ বিষয়টির ওপরই জোর দিয়েছিলাম। শরণার্থীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। গঙ্গেশদা বললেন, 'এই শিবিরে মহিলা পরিষদ গড়ে তুলতে হবে।' আমি বললাম, 'মহিলাদের মধ্যে এখানে এমন মহিলা কে আছে যাকে নিয়ে মহিলা পরিষদ গড়ে তুলবেন?' গঙ্গেশদা হেসে বললেন, 'কেন, আমি তো আছি।' তারপর সত্যি সত্যিই একদিন তিনি কিছু শরণার্থী মহিলাকে একত্র করে মহিলা পরিষদ গঠন করে ফেললেন। আমি আড়াল থেকে তার বক্তৃতাটা শুনেছিলাম। গঙ্গেশদা বক্তৃতা শুরু করেছিলেন এভাবে—'আমরা যারা মহিলা আছি তাদের অনেক সমস্যা আছে, আমাদের সমস্যার সমাধান অন্য কেউ করে দিতে আসবে না, মহিলাদের সমস্যার সমাধান আমরা মহিলারাই করবো। এই মুক্তিযুদ্ধেও মহিলাদের দায়িত্বের কথা আমরা মহিলারা ভুলে থাকবো ...'

এই বক্তৃতাটি নিয়ে তাকে ক'দিন খুব ক্ষেপালাম। 'গঙ্গেশদা'র বদলে তাকে 'গঙ্গেশদি' বলে ডাকতে শুরু করলাম। তবু যতোই হাসিঠাট্টা করি, গঙ্গেশদার গড়া মহিলা পরিষদ যে

শরণার্থী মহিলাদের মধ্যে আত্মসচেতনা জাগানোতে একটুও সাহায্য করেনি—এমন কথা বলতে পারবো না। ওই মহিলা পরিষদের সদস্যরাই সেদিন আনন্দ মিছিল বের করে ও থানার ওসিকে পর্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন।

কম্যুনিস্টরা তো মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্বের কথা ভেবেছিলোই। সাধারণ মানুষদের অনেকের মধ্যেও এ ভাবটির সঞ্চার ঘটে গিয়েছিলো। এর ফলে বহু লোকের মধ্যে যেমন হতাশা দেখা দিয়েছিলো, তেমনি কেউ কেউ অবস্থাটি মেনে নিয়ে তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছিলো। ডিসেম্বরের শুরুতে তাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে যুদ্ধ আর দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না, জয় সন্নিকট, অচিরেই দেশে ফিরে যাওয়ার লগ্ন এসে যাচ্ছে।

কিন্তু আমরা তো আছি নিরাপদ দূরত্বে। যারা দেশের ভেতরে আছে তাদের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে? সেখানে যারা রয়ে গেছে এখন তো তাদের অবস্থান একেবারে দু'পক্ষের গোলাগুলির মুখে। পাকিস্তানি মিলিটারি বা তাদের দালালদের হাতে যারা মরেনি, এখন হিন্দুস্থানের বোমাই কি তাদের শেষ করে দেবে না? কিংবা শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানিরাই ওদের খতম করে যাবে না? প্রশ্নগুলো আমার মা-ই আমার মনে জাগিয়ে দিলেন। মোনায়েম খানের মৃত্যুসংবাদে আমার মায়ের উল্লাস নেই, খোন্দকার মোশতাক কি সব ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে সে সব আমার মা জানেন না, রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কোন পরিণতিতে নিয়ে যাবে সে প্রশ্ন আমার মাকে তাড়া করে না। আমার মায়ের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান তার সোনা ভাই অর্থাৎ তার আড়াই বছর বয়সের নাতিটি। সেই সোনা ভাইয়ের ভাবনাই তাকে দেশের ভেতরের অন্য সবার ভাবনা ভাবায়। আমিও মায়ের কথাতেই বিচলিত হয়ে পড়ি। স্ত্রী পুত্রের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু বান্ধবের ভাবনা আমাকে আক্রান্ত করে। কী করছেন আমার সেই বন্ধুরা যাদের নিয়ে বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির গঠন করে রাস্তায় রাস্তায় বাঙালির অধিকারের কথা বলে সভা করেছিলাম, গান গেয়েছিলাম, কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম?

সে সময়ে খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি। ছিটে ফোঁটা কিছু খবর অবশ্যি পেয়েছি সেই সব মুক্তিযোদ্ধার কাছে যারা তখন ময়মনসিংহে যেতো গোপনে হালচাল দেখে আসার জন্যে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তো সব কথাই শুনেছি ও জেনেছি।

আমার সহকর্মী অধ্যাপক রিয়াজুল ইসলাম ও অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী আতঙ্ক ও ভীতির মুখেও আমার স্ত্রী পুত্রের খোঁজ খবর রেখেছেন, বল-ভরসা দিয়েছেন। আর মুক্তিযোদ্ধাদের মারফত আমি যে সব চিরকুট দেশের ভেতরে পাঠিয়েছিলাম সেগুলো আমার স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দিয়েছেন আমার শিল্পী বন্ধু শাহতাব। অনেক ঝুঁকি নিয়ে শাহতাব মুক্তিযুদ্ধে প্রচুর সহায়তা করেছেন। আমার আরেক বন্ধু ডাক্তার মনোয়ার হোসেন তো এ কাজে যুক্ত হয়ে পাক মিলিটারির হাতে নির্মম নির্যাতন ভোগ করেছেন। মিলিটারির বন্দুকের মুখ থেকে বেঁচে এসেছেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। আমার এই বন্ধুটি তার স্ত্রীকে নিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে শহরে এসে নিয়মিত আমার স্ত্রী পুত্রের খোঁজ নিয়ে গেছেন। তাদেরই সঙ্গে থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এ আর এম মাসুদ, ডক্টর মোস্তফা হামিদ হোসেন ও তাঁর স্ত্রী (আমাদের সালেহা ভাবী)। আমার স্ত্রী পুত্র ও আমার শ্বশুরের পরিবারটিকে বাঁচাতে বহুত সাহায্য করেছেন অবাঙালি অধ্যাপক ও বিজ্ঞানি আশরাফুল হক। তিনিও বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের সদস্য ছিলেন, এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিলো তাঁর সক্রিয় সহানুভূতি। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর করিমের স্ত্রী মিসেস সোফিয়া করিম যেন হয়ে

গিয়েছিলেন আমার পরিবারেরই একজন। তিনিও একেবারে গোড়া থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমরা যখন ভারতের শরণার্থী শিবিরে আসন্ন জয়ের উল্লাসে মাতায়োরা, ঠিক তখনই, ডিসেম্বরে তিন তারিখে পাকিস্তানি হানাদার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমির মোহাম্মদ খানের স্বাক্ষরিত একটি শান্তি পরোয়ানা জারি হয়ে যায় ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। শান্তি পরোয়ানার নাম ছিলো ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দশজন অধ্যাপক, একজন কর্মচারী ও একজন ছাত্রের। অধ্যাপকরা হলেন ডক্টর মোস্তফা হামিদ হোসেন, আলি নেওয়াজ, শামসুজ্জামান খান, আবুদর রাজ্জাক, আবদুল বাকী, এআরএম মাসুদ, আবুদল হক ও আবুদল হালিম। আরো নাম ছিলো পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুহাম্মদ হোসেন ও ছাত্রনেতা *শামসুল আলম তালুকদারের*।

পাকহায়েনারা অবশ্যি এই শান্তি পরোয়ানা কার্যকর করার সময় পায়নি। ডিসেম্বরের তিন তারিখে জারি করা ওই পরোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছেছিলো ছয় তারিখে। আর দশ তারিখেই সব পাক সেনা ময়মনসিংহ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা শামসুল হক অবশ্যি আগেই শহীদ হয়েছিলেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের আরেক অগ্রজপ্রতিম বন্ধু নাইব উদ্দিন আহমেদ। তিনি অধ্যাপক, নন আলোকচিত্র শিল্পী। আলোকচিত্র শিল্পে তার খ্যাতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে এসে তার মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেক অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হিসেবে বিভিন্ন স্থানে তাকে আলোকচিত্র তুলতে যেতে হয়েছে। এই সূত্রে তাকে পাকহানাদার বাহিনীর অফিসারদের সংস্পর্শেও আসতে হয়েছে। ওদের ক্যামেরা মেরামত করে দেয়ার ছলে ওদের অপকীর্তির অনেক ছবি ওদের ক্যামেরার ভেতর থেকে বের করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। ওগুলোই পরে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান দলিল হয়ে গেছে।

ক্যামেরার খুঁটিনাটি বুঝে নেয়ার জন্যেই পাঞ্জাবি মেজর কাইয়ুম আসতো নাইবউদ্দিন সাহেবের বাসায়। নাইবউদ্দিনের ছেলে নিপুণের বয়স তখন মাত্র পাঁচ। মেজর তার পিস্তলটি টেবিলের ওপর রেখে গল্প করছিলো। বালক নিপুণের কৌতূহল ওই পিস্তলটির প্রতি। সে সেটি নিতে চায়। মেজর নিপুণকে আদর করে কাছে টেনে নেয়। জিজ্ঞেস করে, 'এই পিস্তল নিয়ে তুমি কী করবে?' নিপুণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'একটা পাঞ্জাবি মারুম।' মেজরের মুখ অন্ধকার। আর সস্ত্রীক নাইবউদ্দিন সাহেব ভয়ে একেবারে কাঠ।

যাই হোক মেজর আর কিছুই করে না। শুধু যে কথা বলে সে চলে যায় তার নির্গলিতার্থ হলো—'যে দেশের একটি অবুঝ বালকের পর্যন্ত পাকিস্তানি পাঞ্জাবিদের প্রতি এতো ঘৃণা, সে দেশের মানুষকে কেউ পাকিস্তানের ঘেরাটোপে আটকে রাখতে পারবে না। তারা স্বাধীন হবেই।'

কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই নাইবউদ্দিন সাহেবকে এর কিছুদিন পর পাকিস্তানের করাচি লাহোর পিন্ডি পেশোয়ার সফর করতে যেতে হয়েছিলো। লাহোরে গিয়ে তিনি দেখা করেন প্রখ্যাত প্রগতিশীল উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সঙ্গে। নাইবউদ্দিন সাহেব বুঝতে পারলেন যে ওই এলাকার সাধারণ মানুষের মতোই কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাও বাংলাদেশ পাক সেনাদের বর্বরতার খবর রাখেন না। রাখলেও অতি সামান্য। নাইবউদ্দিন সাহেবের ডায়রিটা টেনে নিয়ে

কবি ফয়েজ তাতেই লিখে ফেললেন একটি কবিতা। সেই কবিতাটির স্বল্প বাংলা অনুবাদ দাঁড়িয়েছে এরকম—

১। তোমার স্মৃতি এই দেশ তোমার আবেগ/সুতীক্ষ্ণ কৃপাণের প্রতি অজস্র সালাম।
২। আমার দেশ যা ছিলো তোমার আঁচল/আজ তা ছিন্নভিন্ন/তাই তোমার দেশত্যাগ।
৩। রক্তের মাঝ দিয়ে সৃষ্ট তোমার দৃঢ় প্রত্যয়দীপ্ত/ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার অভিবাদন।
৪। তোমার এ দেশ ত্যাগের মানসিক ক্ষত/ ও যন্ত্রণা আমার সজীব অনুভূতি।'

'নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত'

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যুদ্ধ চলে মাত্র তেরো দিন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সংযোগে তৈরি হয়ে যায় যৌথ বাহিনী। এই যৌথবাহিনীর হাতেই পতন ঘটে পাক হানাদার বাহিনীর। ডিসেম্বরের ষোল তারিখে পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়েই সমাপ্তি ঘটে যুদ্ধের।

তেরোটি দিন বড়ো দ্রুত চলে যেতে থাকে। রণাঙ্গন থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন খবর আসে। যুদ্ধের খবরের পাশাপাশি আমাদের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নানা অপতৎপরতার খবর আতঙ্কিত করে তোলে আমাদের। সেই সঙ্গে আসে কম্যুনিস্ট চীনের শত্রুতার খবর। ষাটের দশকে *পিকিং রিভিউ*য়ে সোভিয়েত 'সংশোধনবাদী'দের বিরুদ্ধে চীনের অনেক অভিযোগের কথাই পড়তাম। শুধু সংশোধনবাদী নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেছে *পিকিং রিভিউ*য়ে সে বিষয়েও অনেক লেখা পড়েছি। জেনেছি যে, স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্যুতি শুরু হয়েছে। এবং বিচ্যুতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সহযোগিতা করে যাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। সমাজ বিপ্লব ও মানব প্রগতির পক্ষে সোভিয়েত এখন কোনো ভূমিকাই রাখবে না। সোভিয়েতের শাসকরা লেনিনের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে স্তালিনের মৃত্যুর পরই। এখন লেনিনবাদের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে মাও সেতুঙ-এর মহান চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ গণচীন।

গণচীনের এ-রকম গরম বক্তব্য আমাদের অবশ্যই আলোড়িত করতো। সে-সময়কার পূর্বপাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টিতেও এক সময় ভাঙন ধরেছিলো চীনা কম্যুনিস্টদের গরম কথার তাপেই। 'সংশোধনবাদী'দের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে 'বিপ্লবী'রা আলাদা গ্রাউন্ড অবস্থাতেই নতুন পার্টি গড়লেন। 'সংশোধনবাদী' আর 'বিপ্লবী'রা পরস্পরের বিরুদ্ধে এতো বিষোদগার করলেন যে এর শতাংশের একাংশ যদি তারা ঢেলে দিতে পারতেন তাদের সাধারণ শত্রু অর্থাৎ ধনতন্ত্রী শোষক গোষ্ঠীর ওপর তা হলে সে-গোষ্ঠীর কবেই উচ্ছেদ হয়ে যেতো।

তবে, আমাদের দেশের 'সংশোদনবাদী' কম্যুনিস্ট পার্টিটি 'মস্কোর দালাল' ছিলো বলেই মস্কো যতদিন কম্যুনিজমের সাইনবোর্ডটি অন্তত ধরে রেখেছিলো, ততোদিন এ পার্টিতে কোন ভাঙন দেখা দেয়নি। কিন্তু পিকিংপন্থী বলে পরিচিত বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা এক পার্টিতে মিলিত হয়ে থাকতে পারেনি, পঁয়ষট্টি থেকে একাত্তর সালের মধ্যেই বহুধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। পিকিং বোধ হয় বহুধা বিভক্ত পিকিং পন্থীদের কোনো অংশকেই নিরঙ্কুশ সমর্থন দেয়নি। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে তারা ভর্ৎসনার পাত্র হয়েছিলো। আমাদের

পিকিংপন্থীদের পিকিংপন্থা তথা মাও সেতুঙ-এর চিন্তাধারার ব্যাখ্যাতেও ছিলো বহু বৈচিত্র্য। সে-সব বিচিত্র ব্যাখ্যার সবগুলো কিংবা কোনো একটাকে সঠিক বলে অনুমোদন দেয়াও সম্ভবত পিকিং-এর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী উভয়গোষ্ঠীর মধ্যেই সুবিধাবাদী, মতলববাজ ও দুর্বলচিত্ত কিছু লোক অবশ্যই ছিলো। সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে কম্যুনিস্ট ও বামপন্থীরা অনেক আত্মঘাতী ঘটনাও ঘটিয়েছে। বামপন্থী শিবিরে অবস্থান নিয়েই কিছু লোক প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শোষকদের দালালিও করেছে। তবু কিছু বলতেই হবে যে, সামগ্রিকভাবে কম্যুনিস্ট ও বামপন্থীরা ছিলো প্রকৃত অর্থেই দেশপ্রেমিক, দেশের অধিকার-বঞ্চিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ ও সমাজ বিপ্লবের জন্যে আত্মোৎসর্গে সদা প্রস্তুত। তাই আমরা দেখেছি একাত্তরে বামপন্থী পরিচয়দানকারী কিছু লোক যদিও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদারদের সহযোগিতা করেছে, তাদের জন্যে 'মুরগি সাপ্লাই'য়ের কাজও করেছে কেউ, তবু এ-ধরনের কুলাঙ্গারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়ই ছিলো। মস্কোপন্থী পিকিংপন্থী নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মী বরং যে যে অবস্থায় যেখান থেকে পেরেছেন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালনে কেউই পিছিয়ে থাকেননি। এমন কি পিকিংপন্থীদের যে গোষ্ঠীটি মুক্তিযুদ্ধকে আখ্যা দিয়েছিলো 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে, তারাও নিজেদের মতো করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, একই সঙ্গে পাক হানাদার বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে জীবন দিয়েছে। এদের এই আচরণকে বিভ্রান্ত, উদভ্রান্ত, উন্মাদ, হঠকারী, আত্মঘাতী, বালখিল্য কিংবা বাংলা ভাষায় প্রচলিত এ-রকম হাজারো বিশেষণ প্রয়োগ করেও সঠিকভাবে প্রকাশ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। তবু একান্ত স্ববিরোধী হবে জেনেও—এই বিপথগামী তরুণদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এদের বিভ্রান্তিমূলক করুণ পরিণতিতে আমি গভীর বেদনাহত হই। এরা বিপজ্জনক বিপথে পা দিয়ে নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে বটে, কিন্তু এদের লক্ষ্যের মহত্ব সম্পর্কে আমি একটুও সন্দেহ পোষণ করি না।

এদের এই সর্বনাশা বিপথগামিতার জন্যে বরং ধিক্কার জানাতে হয় এদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বি গণচীনের ভ্রান্তিবিলাসমত্ত নেতাদের। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ও মার্কসবাদের বিকাশ সাধনে মাও সেতুঙের অবদানকে যাঁরা পুরোপুরি অস্বীকার করেন কিংবা একান্তই খাটো করে দেখেন, আমি তাঁদের দলে নই। নব্বইয়ের দশকে, সমাজতন্ত্রের এই একান্ত দুঃসময়েও, মাও সেতুঙের রচনাবলি পাঠ করে আমি গভীর আশাবাদে উদ্দীপ্ত হই। কিন্তু সেই মাও সেতুঙ-নেতৃত্বাধীন গণচীনই যখন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করে নিতান্ত সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, 'বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতা'র অভিযোগ উত্থাপনকারী চৈনিক নেতৃত্বই যখন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়ার জন্যে আমেরিকার সঙ্গে মিলে পাকিস্তানকে মদদ দেয়, তখন ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষই বা তা পারে?

আমাদের সৌভাগ্য যে, সে সময়ে 'মুক্ত বিশ্বের নেতা' 'গণতন্ত্রী' আমেরিকা ও বিপ্লবী গণচীনের বিপরীতে 'সংশোধনবাদী' ও 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' সোভিয়েত ইউনিয়ন, সোভিয়েত ব্লকের অন্যান্য দেশ ও সারা দুনিয়ার 'মস্কোপন্থী' কম্যুনিস্ট পার্টিগুলো একান্ত দৃঢ়ভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভে সহায়তা করেছিলো।

ভারতের 'মস্কোপন্থী' পার্টিটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বুর্জোয়া কংগ্রেসী সরকারের কার্যক্রম সমর্থন করলেও বুর্জোয়াদের শয়তানি সম্পর্কে সচেতনতা পরিত্যাগ করেনি। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের বাংলাদেশ-প্রেম যে 'কামগন্ধহীন নিকষিত হেম' ছিলো না, কম্যুনিস্টরা তা বুঝতো। তাই ৩ ডিসেম্বর থেকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর অগ্রাভিযানের খবর দিতে গিয়ে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একটি পত্রিকা যখন 'যশোর আমাদের দখলে', 'হিলি আমাদের দখলে' এরকম শিরোনাম জুড়ে দিচ্ছিলো, তখন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির বাংলা মুখপত্র *কালান্তর* তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যাপারটির প্রতিই ভারতের অনেক কম্যুনিস্ট নেতা অন্তর থেকে সায় দিতে পারেননি। বাংলাদেশের মুক্তিসেনারাই তাদের মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করবে, ভারত তাদের সহায়তা করবে মাত্র—প্রগতিশীল মানুষদের এরকমই প্রত্যাশা ছিলো। তবু ঘটনা-পরম্পরা যখন শেষে পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্তই গড়ালো এবং তৈরি হলো যৌথ বাহিনী, তখন ভারতীয় সেনাদের সকর্মক ভূমিকাকে মেনে নিতেই হলো। তবে ভারতীয় বাহিনীর ভেতর যাতে দখলদার বাহিনীর মনোবৃত্তি দেখা না দেয়, ভারতীয় বুর্জোয়াদের বৃহৎ শক্তির দম্ভ প্রকাশিত হতে না পারে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি থাকে শ্রদ্ধাবোধ—ভারতের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের এমনটিই কাম্য ছিলো। বামপন্থীরা এ ব্যাপারেও যথাযথ ভূমিকা রেখেছিলো।

সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীরাই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলো, তাদেরই ছিলো মূল ভূমিকা। এ যুদ্ধে ভারতেরও মূল ও সক্রিয় সহায়তাটি এসেছিলো একটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের তরফ থেকেই। তবু মুক্তিযুদ্ধের আনুপূর্বিক ঘটনাধারার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সাম্যবাদী বামপন্থীদের সক্রিয় সংযোগের মধ্যদিয়েই এ যুদ্ধ সফল পরিণতিতে পৌঁছেছিলো, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল এলাকার একটি ভূখণ্ডে পাকিস্তান নামক একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটিয়ে বাংলাদেশ নামক একটি যৌক্তিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলো।

পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্ম ঘটানোতে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের সংযোগের গুরুত্ব ও তাৎপর্যটি অনেকেই ধরতে পারেননি। অনেক বাঘা বাঘা রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরও বোধ এ ব্যাপারে একান্ত ভোঁতা। অথচ একজন বাঙালি কথাশিল্পীর ভেতর এ বোধের জাগরণ ঘটেছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরুতেই। এই কথাশিল্পীর নাম আনোয়ার পাশা। ইনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক। অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে বসেই ইনি একাত্তরের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে রচনা করে ফেলেছিলেন একটি উপন্যাস—*রাইফেল রোটি আওরাত*। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম তখনো মোটেই সংহত হয়ে ওঠেনি। তখনকার বর্তমান ছিলো একান্তই সংকটময় ও ভবিষ্যত নিতান্তই অনিশ্চিত। তবু সেই সংকট ও অনিশ্চিতির ভেতরই কথাশিল্পী আনোয়ার পাশা ভবিষ্যত দ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলেন যে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সফল হবেই। তিনি উপন্যাসের যে নায়ক চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম সুদীপ্ত। সেই সুদীপ্ত আসলে আনোয়ার পাশারই প্রতিরূপ। সুদীপ্তও তার স্রষ্টা আনোয়ার পাশার মতোই জীবন বাঁচানোর তাগিদে হানাদার কবলিত ঢাকার এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। উপন্যাসটিতে সুদীপ্ত তথা কথাশিল্পীর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সেকালের পূর্বপাকিস্তানের নাগরিক মধ্যবিত্তের চরিত্রের নানা অসঙ্গতির

দিকগুলো উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুদীপ্তর অন্তরে ক্ষোভের অন্ত নেই। বাংলাদেশের জন্য হোক এমনটিই তার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। অথচ সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি ঘটার মতো অনুকূল অবস্থাও সে তার চারপাশে দেখতে পায় না। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে এসে দেখি, সুদীপ্ত পরিচিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী জামাল আহমদ ও কম্যুনিষ্ট নেত্রী বুলার সঙ্গে। সুদীপ্ত দেখলো, এই দু'জনের কর্মপ্রয়াস বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে একত্র সংযুক্ত হয়েছে। আর তখনই সুদীপ্ত তথা তার স্রষ্টা আনোয়ার পাশার চকিত উপলব্ধি—

'পুরনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা, তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সেই আর কতো দূরে? বেশি দূর হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো! মা ভৈঃ। কেটে যাবে।'

আনোয়ার পাশা তার উপন্যাস *রাইফেল রোটি আওরাত*-এর এই শেষ কথাগুলো লিখেছিলেন একাত্তরের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তখনই 'রাত কেটে যাবে' বলে তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জেগেছিলো। এরপর ছয় মাসের মাথাতেই রাত কেটে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু আনোয়ার পাশা তা দেখে যেতে পারেননি। শুধু আনোয়ার পাশা নয়। তার মতো বোধির অনুশীলনে যারা রত ছিলেন, পাকিস্তানের নিশ্ছিদ্র তমসার ভেতরে বসেই আপন আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে যারা নতুন একটি প্রভাতের আগমনী রচনা করে চলেছিলেন, বিপ্লব স্পন্দিত বুকে যারা পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্মের মুহূর্তটির জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন, তাদের অনেকেরই সৌভাগ্য হলো না সেই একান্ত কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণটি প্রত্যক্ষ করার। তার আগেই কতকগুলো অন্ধকারের জীব ওই আলোক-তাপসদের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলো।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখেই যে ময়মনসিংহ শহর মুক্ত হয়ে গেছে, সে খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গিয়েছিলাম। ১৬ ডিসেম্বরে পাকবাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পর আর ভিনদেশে শরণার্থী শিবিরে বসে থাকতে পারছিলাম না। অস্থির হয়ে পড়েছিলাম মুক্ত স্বদেশের মাটি স্পর্শ করার জন্যে। ১৮ কি ১৯ তারিখেই মহাদেব বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলাম। অনুভব করলাম : মানুষের অন্তরে অন্তরে বয়ে যাচ্ছে আনন্দের এক ঝর্ণাধারা। পরিচিত যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বুকে জড়িয়ে ধরে। 'কেমন আছেন?' এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করে না। চোখ বড়ো বড়ো করে শুধু বলে, 'বেঁচে আছেন?' পাকিস্তানি বর্বরদের সেই মারণযজ্ঞের ভেতরেও যার জানটা কেবল বেঁচে রয়েছে, সেই তো মহা ভাগ্যবান। সে কেমন আছে—সে প্রশ্ন তখন একান্তই অবান্তর। কতো প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর শুনতে শুনতেই না হালুয়াঘাট থেকে ময়মনসিংহ শহর পর্যন্ত পথটুকু পাড়ি দিলাম।

রাস্তার সব সেতু ও কালভার্ট ভাঙা। যুদ্ধ চলার সময় এর কতকগুলো ভেঙেছিলো মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা। অবশিষ্ট ছিলো যেগুলো, পাকসেনারা পলায়নের সময় সেগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। কাজেই রাস্তায় কোনো মোটরযানের চলাচল নেই। পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিচ্ছিলাম দীর্ঘ পথ। সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যা নামলো সরচাপুর নামক একটি গ্রামের ধারে এসে। সে গ্রামেই মহাদেব বাবুর পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত কাটালাম। শুয়ে শুয়ে রেডিওতে খবর শুনছিলাম। হঠাৎ কানে এলো এক মর্মান্তিক সংবাদ। পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের মাত্র দু'দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর ওদের এদেশীয় দালালরা বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে তাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। এই বুদ্ধিজীবীদের বিকৃত মরদেহ পাওয়া গেছে ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। সে রাতে আকাশবাণীর

খবরে সম্ভবত মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শহীদুল্লা কায়সার, ডাক্তার আলিম চৌধুরী, ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার মোর্তজা—এই ক'জন বুদ্ধিজীবীর শহীদ হওয়ার কথা শুনি। এরপর আরো কয়েকজনের নাম জানতে পারি। শুনি আনোয়ার পাশার নামটিও। আনোয়ার পাশার লেখার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিলো, তেমন কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাতে খুঁজে পাইনি। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের অল্পদিন পরেই যখন সেই আনোয়ার পাশার উপন্যাস *রাইফেল রোটি আওরাত* প্রকাশিত হলো, তখন সেটি পড়ে যেন একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীর সাক্ষাত পেলাম। দিব্যদৃষ্টিতে যিনি বাংলাদেশের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছিলেন চর্মচক্ষে সেই দেশটিকে প্রাণভরে দেখার সৌভাগ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলো এদেশেরই কতকগুলো মনুষ্যরূপী সারমেয়।

সম্ভবত ডিসেম্বরের ২০ তারিখে ময়মনসিংহ শহরে এলাম। স্ত্রী পুত্রসহ আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হলাম দীর্ঘ নয় মাস পরে।

একাত্তরে আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। এই বয়সেই ত্রিকালদর্শী দার্শনিক হয়ে গেলাম। ব্রিটিশ শাসনের অবসান আর পাকিস্তানের জন্ম দর্শন করলাম। আবার দর্শন করলাম পাকিস্তানের মৃত্যু আর বাংলাদেশের জন্মও। বাংলাদেশের জন্মের ক্ষণটিতে কিন্তু মোটেই ভাবতে পারিনি যে অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশেই আমাকে পাকিস্তানের ভূত দেখতে হবে।

প্রথম আলো

বর্ষসেরা বই : ১৪১১

মননশীল শাখা

যতীন সরকারের 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন'

শংসাবচন

যতীন সরকার তার 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থে শুধু ব্যক্তিজীবনের কথা বলেন নি তার কালের কথাই বেশি করে বলেছেন। এ বই ঘনিষ্ঠভাবে ইতিহাস-সংলগ্ন একটি আত্মজীবনী।

এ বই পাকিস্তান পূর্ব সময়ের ও পাকিস্তান পর্বের সিকি শতাব্দীর মফস্বলবাসী হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সমাজের বিশ্বস্ত ছবিতে পূর্ণ এক চিত্রশালা, যেখানে ভিড় করেছেন সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ বহু ব্যক্তি। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উত্থান দেখেছেন লেখক, আর এই ভেদবুদ্ধির শিকার হিন্দুদের মন-মানসিকতার অত্যন্ত খোলামেলা বিবরণ দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদারতা-সাম্প্রদায়িকতা, মানবিকতা-অমানবিকতার এক স্মরণীয় বিবরণ দিয়েছেন প্রাঞ্জল ভাষায়, এক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিকোণ থেকে।

বাম রাজনীতির প্রভাবে লেখকের চিন্তা-চেতনার বিকাশের কথা, মফস্বলবাসী বেশ কিছু মুক্তবুদ্ধি ও ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গ, অনক্ষর কৃষকের ভাবলোক, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রগতিবাদী কম্যুনিস্ট ভাবধারা, '৪৭-এর স্বাধীনতা, দূর মফস্বলে ভাষা-আন্দোলনের ঢেউ, '৫৪-র নির্বাচন, '৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি জাতির জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ ও বিশ্লেষণ একদিকে যেমন উপন্যাস পাঠের মোহনীয়তা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে পাঠকের ভাবনাকে অনবরত জাগ্রত রাখে। পাঠক শুধু একজন রুচিশীল যুক্তিবাদী অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির পরিচয় নয়, একই সঙ্গে পাকিস্তানের জন্মপূর্ব কাল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক সময়ের পরিচয় ও তাৎপর্য-সমন্বিত উচ্চমানের সাহিত্যকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেন।

একটি স্বপ্নভঙ্গের ও স্বপ্নের পুনরুদ্ধারের অতুলনীয়, অনবদ্য কাহিনী

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন'।

ISBN 984-70000-0009-5